সাতরঙ

দ্বিতীয় খণ্ড

রবি বসু

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

আমাদের গর্ব, ভারতের গৌরব
সত্যজিৎ রায়
স্মরণীয়েষু

এতে আছে

অহীনবাবু

নাটকের শেষ দৃশ্য। কারারুদ্ধ বৃদ্ধ পিতার কাছে দুর্বিনীত পুত্র ক্ষমা চাইছে। পুত্রের কাতর আবেদনে পুত্রের সব দোষ ভুলে সেই ছোটবেলার মতোই পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন পিতা। মিলনের সেই মহান মুহূর্তে উজ্জ্বল এক ঝলক আলো এসে পড়েছে স্নেহাতুর বৃদ্ধ পিতার মুখে। দর্শকের করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে দেখা গেল পিতার ভূমিকাভিনেতার মুখে বিরক্তির কুঞ্চনরেখা। দর্শকরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সমাপ্তির যবনিকা নেমে এল।

গ্রিনরুমে এসে দাড়ি খুলতে খুলতে বৃদ্ধ পিতার ভূমিকাভিনেতা ড্রেসারকে হুকুম করলেন : একবার লাইটম্যানকে ডেকে পাঠাও তো।

খবব পেয়ে লাইটম্যান তটস্থ ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল : কী বলছেন বাবা?

বৃদ্ধের ভূমিকাভিনেতা মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বলে উঠলেন : শেষ সিনে বাঁদিকের কপালের কোণে একটা শেড পড়ল কেন?

কথাটা শুনে লাইটম্যান আকাশ থেকে পড়ল। বলল : তা কী করে হবে বাবা! আমি তো কই কিছু বুঝতে পারিনি।

আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে অভিনেতা সরাসরি লাইটম্যানের দিকে তাকালেন। ক্রোধকম্পিত স্বরে বললেন : তাহলে বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি?

লাইটম্যান বিব্রত ভঙ্গিতে বলল : না না, তা বলবেন কেন! আচ্ছা আমি দেখছি।

এই বলে লাইটম্যান গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল মিনিট দশেক পরে মাথা নিচু করে। বললে : লাইটের গ্লাসের এক কোণে সরু মতন একটা স্ক্র্যাচ পড়েছে।

অভিনেতা ঘাড়ে গলায় ওডিকোলন দিতে দিতে বলে উঠলেন : তোমার মাইনের খাতায় ওইরকম যদি একটা স্ক্র্যাচ পড়ে তাহলে কেমন লাগবে?

লাইটম্যান ঘাড় হেঁটে করে দাঁড়িয়ে রইল।

অভিনেতা বললেন : এবার থেকে শোয়ের দিন সকালে এসে সবক'টা গ্লাস চেক্-আপ করে যাবে। ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটলে সত্যি সত্যিই মাইনের খাতায় স্ক্র্যাচ পড়ে যাবে। চাই কি চাকরিটাও চলে যেতে পারে।

লাইটম্যান মাথাটা আরও একটু নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে ফিস ফিস করে সহকর্মীদের বলল : এত বছর কাজ করছি, কিন্তু এরকম সেনসিটিভ গায়ের চামড়া কারও দেখিনি। সত্যিই নমস্য পুরুষ।

এই নমস্য অভিনেতাটি কে হতে পারেন আন্দাজ করুন তো! না, আপনারা পারবেন না। তিরিশ কিংবা চল্লিশের দশকে যাঁরা নিয়মিত থিয়েটার দেখতেন তাঁরা অবশ্যই পারবেন। আলোকসম্পাতের সামান্যতম তারতম্য যাঁর অভিনয়ে ব্যাঘাত ঘটাতে পারত তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন অভিনেতা সে যুগে ওই একজনই ছিলেন। তিনি হলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি।

অহীনবাবু এই শতাব্দীর মানুষ নন। তাঁর জন্ম ১৮৯৫ সালের ৪ আগস্ট কলকাতা শহরে। বাবার নাম চন্দ্রভূষণ চৌধুরি। শৈশবের পড়াশোনা মিশনারি স্কুলে। সাধারণত মিশনারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন অন্য খাতে বয়। কিন্তু অহীনবাবুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছিল। যৌবনের শুরুতেই তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন অভিনয়ের দিকে। ভবানীপুরের বান্ধব নাট্য সমাজে যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু। ১৯২৩ সালে যোগ দিলেন স্টার থিয়েটারে। সেখানে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের চরিত্রে অহীনবাবুর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ।

তবে তার আগে ১৯২১ সালে তাঁর সিনেমার পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটে গেছে। অবশ্যই নির্বাক

চলচ্চিত্রে। ক'জন বন্ধু মিলে ফটো প্লে সিন্ডিকেট নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ওই প্রতিষ্ঠানের 'সোল্ অফ এ স্লেভ' ছবিতে অহীনবাবুর ছিল মুখ্য ভূমিকা। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ওঁর বন্ধু হেম মুখার্জি। যতদূর জানি ওটিই ওই প্রতিষ্ঠানের প্রথম এবং শেষ ছবি।

রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভাবেই অহীনবাবু ভিনি ভিডি ভিসি করেছিলেন। স্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনেব চরিত্রে কী দর্শক কী সমালোচক সকলের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন। ওই একই নাটকে বিকর্ণ চরিত্রে সুদর্শন নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মঞ্চাবতরণ। কর্ণ করতেন তিনকড়ি চক্রবর্তী মশাই।

১৯২৭ সালে বিখ্যাত অনাদিনাথ বসুর সৌজন্যে অরোরা সিনেমা কোম্পানির হয়ে অহীনবাবু 'কৃষ্ণসখা' নামে একখানি নির্বাক ছবি পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল অভিনেতা নয়, ফিল্মমেকার হবেন। যে কারণে কৃষ্ণসখা ছবিতে তিনি অভিনয় করেননি। কিন্তু ওই ছবির অসাফল্য তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ওই রাস্তা অহীনবাবুর জন্য নয়। তাই তিনি সমস্ত মনপ্রাণ অভিনয়ে সমর্পণ করলেন। ওই সময়ে আরও দু'খানি নির্বাক ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শান্তি' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'। দুটি ছবিতেই তাঁর মুখ্য ভূমিকা।

সবাক চিত্রে অহীনবাবুর প্রথম অভিনয় ১৯৩১ সালে ম্যাডান থিয়েটার্সের 'প্রহ্লাদ' ছবিতে। শেষ অভিনয় ১৯৫৭ সালে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছবিতে। এই ছাব্বিশ বছরে তিনি শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। কখনও নায়ক কখনও নায়কের বাবা। কখনও রাজা কখনও ভিক্ষুক। কখনও ডাকাত কখনও সাধু। কখনও ভিলেন আবার কখনও বা কমেডিয়ান। অহীনবাবু কিন্তু সর্বত্রই ছিলেন মানানসই। তাঁর অভিনীত বিখ্যাত ছবিগুলির তালিকায় রয়েছে বিষ্ণুমায়া, কৃষ্ণকান্তের উইল, চাঁদ সদাগর, প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের রূপলেখা, মহুয়া, দক্ষযজ্ঞ, বিদ্রোহী, প্রফুল্ল, কণ্ঠহার, তরুবালা, কৃষ্ণ সুদামা, পরপারে, রজনী, সরলা, সোনার সংসার, টকি অফ টকিজ, ইন্দিরা, অভিনয়, খনা, জনকনন্দিনী, যকের ধন, রিক্তা, রুক্মিনী, শর্মিষ্ঠা, চাণক্য, বামন অবতার, তটিনির বিচার, কমলে কামিনী, শুকতারা, ডাক্তার, অমর গীতি, রাজকুমারের নির্বাসন, কর্ণার্জুন, নন্দিনী, জীবনসঙ্গিনী, যোগাযোগ, মাটির ঘর, দুই পুরুষ, মানে না মানা, গৃহলক্ষ্মী, পথের সাথী, স্যার শঙ্করনাথ, বিদ্যাসাগর, মা ও ছেলে, মন্ত্রশক্তি, দেবত্র, ব্রতচারিনী, চিরকুমার সভা, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, শ্যামলী এবং আরও অনেক অনেক ছবি। সারা জীবনে অহীনবাবু একশোরও ওপর ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং সবগুলিতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়।

কিন্তু চিত্রাভিনেতা অপেক্ষা মঞ্চাভিনেতা হিসেবেই অহীন্দ্র চৌধুরি ছিলেন বেশি জনপ্রিয়। সাড়ে তিন দশক ধরে তিনি অজস্র নাটকে অভিনয় করেছেন এবং সর্বত্রই প্রধান ভূমিকায়। তাঁর আমলে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে সাজাহান, মিশরকুমারী, চরিত্রহীন, রিজিয়া, তটিনির বিচার, ভোলা মাস্টার, চন্দ্রগুপ্ত, চিরকুমার সভা, বাংলার প্রতাপ, চন্দ্রনাথ ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাট্যাভিনয়ে অহীনবাবুর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তৎকালীন বিদ্বৎসমাজ তাঁকে 'নটসূর্য' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পুরো তিরিশের দশক জুড়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চের দর্শক সমাজ দু'জন অভিনেতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সেই প্রশ্নে আলোড়িত হতেন। একজন অহীন্দ্র চৌধুরি আর অন্যজন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে একই নাটকের একই চরিত্রে উভয়েই অভিনয় করতেন। সাজাহান নাটকে সাজাহনের চরিত্রে এবং মাইকেল মধুসূদন নাটকে মধুসূদনের চরিত্রে। তার মধ্যে সাজাহান হিসেবে অহীন্দ্র চৌধুরি দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ি। শিশির অনুরাগীর দল অহীনবাবুকে ব্যঙ্গ করে বলতেন 'গ্যালারি অ্যাক্টর'। পক্ষান্তরে অহীন্দ্রভক্তের দল শিশিরকুমারকে ব্যঙ্গ করতেন 'শূন্য প্রেক্ষাগৃহের হালুমবীর' বলে। যেহেতু শিশিরবাবুর মঞ্চে তেমন দর্শক হত না, তাই এই ব্যঙ্গোক্তি।

যাই হোক অহীনবাবু যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, তার প্রমাণ 'সাজাহান' নাটকে। এই নাটকে বৃদ্ধ সাজাহানের ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয় ছিল দেখার মতো। শত শত রজনী অভিনীত হয়েছে এই নাটক, কিন্তু দর্শক আকর্ষণে ভাঁটা পড়েনি কোনদিন। সেইরকম ছিল 'মিশরকুমারী' নাটকে তাঁর

অভিনীত আবনের ভূমিকা। যে কোন কম্বিনেশন নাইটে ওই চরিত্রে অহীনবাবু ছিলেন অবধারিত।

জীবনচর্যার ক্ষেত্রে অহীনবাবু ছিলেন একজন অতি সুশৃঙ্খল মানুষ। বাজে আড্ডা, অহেতুক সময় নষ্ট এসব তাঁর ধাতে ছিল না। থিয়েটারে আসতেন শো-এর ঠিক এক ঘণ্টা আগে। এসেই মেক্-আপে বসে যেতেন। অপ্রয়োজনীয় একটা কথাও বলতেন না। কাজের কথা যা বলবার তা মেক-আপ করতে করতেই বলতেন। ছবির ক্ষেত্রেও তাই। ঠিক ন'টাব সময় স্টুডিওয় ঢুকতেন। ঠিক পাঁচটার সময় বেরিয়ে যেতেন। ডেলি বেসিসে পেমেন্ট নিতেন। ভাউচারে সই করে টাকা নেবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নিজের কাছে একটি ছাপানো ফর্ম থাকত, সেটি সই করিয়ে নিতেন প্রোডিউসারকে দিয়ে। ওটা ইনকাম ট্যাক্স সাবমিট করার সময় কাজে লাগত। জীবনে একটি পয়সাও ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেননি তিনি। থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এটাই করতেন। ওখানে তিনি প্রতি শো পিছু পারিশ্রমিক নিতেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হয় তখন তাঁকে কোথাও মাস-মাইনেয় কাজ করতে দেখিনি। আগে কী কবেছেন তা বলতে পারব না।

ইনকাম ট্যাক্স ঠিক ঠিক দিয়েও তিনি নিজের চেষ্টায় অজস্র সম্পত্তি করতে পেরেছিলেন। প্রচুর বই কিনতেন। ওঁর গোপালনগরের বাড়ির লাইব্রেরিটি ছিল দেখার মতো। শচীনদা, মানে সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন অহীনবাবুর লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলাম। শচীনদার ছিল ও-বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। অহীনবাবু 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' বলে যে আত্মজীবনীটি লিখেছিলেন সে কাজে শচীনদার কিছু সহায়তা ছিল বলে শুনেছি। অহীনবাবুর লাইব্রেরিতে সবরকম সাবজেক্টের ওপর প্রচুর বই আছে। সেগুলি যে কেবল লোক-দেখানো নয়, অহীনবাবু যে সেগুলি নিষ্ঠা সহকারে পড়তেন, তা ওঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেই বোঝা যেত। অহীনবাবুর এই পাণ্ডিত্যেব কথা আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকেও শুনেছি।

তাঁর এই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরীশ লেক্চারার ছিলেন।

১৯৬৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেন। ১৯৬৭ সালে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭২ সালে সাধারণ নাট্যশালার শতবার্ষিকীতে তিনি স্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন। রবীন্দ্রভারতীর 'ডিন' হয়েও কাজ করেছিলেন অনেকদিন।

অহীনবাবু মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন। এই মিতব্যয়িতার কারণে পরিচিত এবং বন্ধুমহল তাঁকে 'কৃপণ' আখ্যা দিয়েছিলেন। নিজের রোজগারের টাকায় তিনি বিশাল সম্পত্তি, নিজের দেশ শান্তিপুরের বাগআঁচড়া গ্রামে বিরাট বাড়ি, কলকাতা শহরের ওপর পাঁচ-ছ'খানি বাড়ি ইত্যাদি করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো লোকে তাঁকে কৃপণ ভাবত। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আসলে তিনি ছিলেন ম্যান অব প্রিন্সিপ্‌ল।

একটা ঘটনার কথা বলি।

প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও অহীনবাবু তাঁর নিজের একমাত্র পুত্রকে সাধারণ গৃহস্থবাড়ির আর পাঁচটা ছেলের মতোই অতি সাধারণভাবে মানুষ করতেন। চেতলা থেকে ট্রামে-বাসে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যাতায়াত করতে হত তাঁকে।

একদিন বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ির চোখে পড়ল ঘটনাটা। অহীনবাবু আর নির্মলবাবু দু'জনে খুব বন্ধু ছিলেন।

সেদিন থিয়েটারে এসে নির্মলবাবু অহীনবাবুকে বললেন : খোকার এখন পরীক্ষা চলছে না ইউনিভার্সিটিতে?

অহীনবাবু বললেন : হ্যাঁ। ও এম এ পরীক্ষা দিচ্ছে।

নির্মলবাবু বললেন : তা এই পরীক্ষার ক'দিন কি ওকে একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেত না! কিংবা আপনার গাড়িতে? ওকে দেখলাম বাসে ঝুলতে ঝুলতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে।

অহীনবাবু আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা পেন্সিল দিয়ে চোখের নিচে শেড আঁকতে আঁকতে উত্তর

দিয়েছিলেন বাপের পয়সায় গাড়ি চড়ার বিলাসিতা কি ঠিক? পড়াশোনা শেষ করে নিজে রোজগার করুক, গাড়ি কিনুক, তারপরে চড়বে।

ছেলেকে এই অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনা শেখানোব ফল হয়েছিল মারাত্মক। অভিমানী পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। পিতার কাতর অনুরোধ, মায়ের চোখের জল তাঁকে আর দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বাড়ি-গাড়ির ছবি তুলে বাবাকে পাঠিয়েছেন। শেষ বয়সে বৃদ্ধ পিতা সেইসব ছবি বার বার দেখেছেন আর চোখের জলে তাঁর দু'গাল ভেসে গেছে। এ সব ঘটনা আমার সরযূবালা দেবীর মুখ থেকে শোনা।

সরযূদেবীকে অহীনবাবু নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। 'সাজাহান' নাটকে জাহানারার মতো আরও বহু নাটকে সরযূদেবী অহীনবাবুর মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও ওঁদের ছিল পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক।

শেষ জীবনে যখন গোপালনগরের বাড়িতে সরযূদেবী যেতেন তখন দেখতেন বৃদ্ধের দুটি গাল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। সরযূদেবীকে দেখে বলে উঠতেন : এই দ্যাখো সরযূ, তোমার দাদা ছবি পাঠিয়েছে। কত বড় বাড়ি, কত বড় গাড়ি।

বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেলতেন। কাঁদতে কাঁদতেই বলতেন : ছেলেবেলায় খোকার ওপর এতটা নির্মম না হলেই পারতাম। বড় ভুল হয়ে গেছে। এখন বৃদ্ধ বয়সে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

টাকা-পয়সার ব্যাপারে অহীনবাবু ছিলেন ভয়ানক পার্টিকুলার। কেউ যদি ওঁর পারিশ্রমিকের অঙ্ক কম করার কথা বলতেন তাহলে উনি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করতেন : আপনার লাভ বেশি হলে আপনি কি আমাকে বাড়ি বয়ে বেশি টাকা দিয়ে আসতেন?

তখনকার দিনে থিয়েটাবপাড়ায় বেনিফিট নাইটের রেওয়াজ ছিল। এক একজন শিল্পীর সম্মানে বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা করা হত। সেদিনকার বিক্রির সব টাকাটাই সেই শিল্পী পেতেন। এই বেনিফিট নাইটে কোন শিল্পীই পারিশ্রমিক নিতেন না।

অহীনবাবু ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর টাকা ছাড়তেন না। এমন কি যে সরযূ দেবীকে তিনি নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন তাঁর বেনিফিট নাইটেও হাত পেতে টাকা নিতে তাঁর বাধত না।

এই বেনিফিট নাইট নিয়েও একটা ঘটনা আছে।

বিখ্যাত নাট্যকার এবং অভিনেতা যোগেশ চৌধুরি মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী খুব অর্থকষ্টে পড়লেন। থিয়েটারপাড়ার সবাই মিলে ঠিক করলেন যোগেশবাবুর স্ত্রীর সম্মানে একটা বেনিফিট নাইট দেওয়া হবে। উদ্যোক্তারা এসে অহীনবাবুকে অনুরোধ করলেন, যেহেতু যোগেশবাবু থিয়েটার মহলে সকলের শ্রদ্ধেয় তাই তাঁর লোকান্তরিত আত্মার সম্মানে তাঁর স্ত্রীকে বেনিফিট নাইট দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা স্পেশাল কেস্। এক্ষেত্রে অহীনবাবু যদি তাঁর পারিশ্রমিক না নেন তাহলে খুব ভালো হয়।

অহীনবাবু ধীরভাবে উদ্যোক্তাদের কথা শুনলেন। তারপর বললেন : দেখুন, আমি একটা প্রিন্সিপল্ মেনটেইন করি। সেটা হল 'হাতে টাকা মুখে রঙ'। সেখান থেকে আমাকে সরে আসতে বলবেন না। তার চেয়ে বরং এবারের এই বেনিফিট নাইট থেকে আমাকে বাদ দিন।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। অহীনবাবু তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। তিনি না থাকলে টিকিট বিক্রি দারুণভাবে ব্যাহত হবে। যে উদ্দেশ্যে এই নাইট করা সেটাই বানচাল হয়ে যাবে। তাই গুনে গুনে তাঁর হাতে আড়াইশো টাকা ধরে দিতে হল। তিনিও সেটা গুনে গুনে পকেটে পুরে নিলেন।

সেদিন অহীনবাবুর নামেই হাউস ফুল হয়ে গেল। অহীনবাবু সেদিন অভিনয়ও করলেন চুটিয়ে। স্বর্গত যোগেশ চৌধুরির স্ত্রীও সেদিন দর্শকদের আসনে উপস্থিত ছিলেন। ইন্টারভ্যালে তাঁর হাতে এক ভদ্রলোক একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটি লিখেছেন অহীন্দ্র চৌধুরি। চিঠিতে লেখা : বৌঠান, শো শেষ হবার পর আপনি যদি দয়া করে গ্রিনরুমে আসেন তাহলে ভালো হয়। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

শো শেষ হবার পর যোগেশবাবুর স্ত্রী গ্রিনরুমে এলেন। সেখানে তখন উদ্যোক্তারা ছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত। যোগেশবাবুর স্ত্রীকে দেখে অহীনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : আসুন বৌঠান, বসুন।

তারপর সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে অহীনবাবু বললেন : আচ্ছা বৌঠান, যোগেশদা আমাকে যে পরিমাণ স্নেহ করতেন তার দাম কি আড়াইশো টাকা?

যোগেশবাবুর স্ত্রী কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন অহীনবাবুর প্রশ্ন শুনে। বললেন : তা তো জানি না!

অহীনবাবু উদ্যোক্তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন . আপনি না জানালেও এঁরা জানেন। তাই এঁরা আমাকে আপনার বেনিফিট নাইটে আমার পারিশ্রমিক আড়াইশো টাকা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি সেটা ছাড়িনি।

এই বলে অহীনবাবু একটা মোটাসোটা খাম যোগেশবাবুর স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরে সবিনয়ে বললেন : যোগেশদার কাছ থেকে যে স্নেহ পেয়েছি টাকা দিয়ে তো সে ঋণ শোধ করা যায় না। কিন্তু আপনাদের প্রতি আমার ভালবাসা হিসেবে এই সামান্য আড়াই হাজার টাকা যদি আপনি গ্রহণ করেন তাহলে মনে কিছুটা শান্তি পাব।

হাতে করে খামটা নিতে গিয়ে সেদিন সেই মুহূর্তে কেঁদে ফেলেছিলেন নাট্যকার-অভিনেতা যোগেশ চৌধুরির স্ত্রী। এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরিও।

এই হলেন অহীন্দ্র চৌধুরি। এ ম্যান অব প্রিন্সিপল্। ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর সেই মানুষটি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে একটা যুগ।

দুর্গাদাস

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমরা যখন উত্তমকুমারকে নিয়ে খুব হইচই লাফালাফি করছি, সেই সময়ে পাঁচুবাবুর সঙ্গে আমাদের প্রায়শই তর্ক বেঁধে যেত। ভদ্রলোকের নাম পাঁচুগোপাল দে। বয়স ষাটের কোঠায়। তিনি ছিলেন একজন মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ। তাই কর্মসূত্রে প্রায় প্রত্যহই তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটত। উত্তমকুমারকে নিয়ে আমাদের গদগদ ভাব দেখে তিনি বলতেন ঃ আরে উত্তম তো সেদিনকার যুগী। এখনও অভিনযের আড় ভাঙেনি। দুগ্গাবাবুব অভিনয় যদি দেখতিস্ তাহলে বুঝতিস্ অ্যাকটিং কাকে বলে।

আমি বুঝতে পারতাম 'দুগ্গাবাবু' বলতে পাঁচুবাবু কাকে মিন্ করছেন। তবু ওঁকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বলতাম ঃ কেন দেখব না দুর্গাবাবুর অভিনয। এই তো 'গঙ্গা' ছবিতে ওঁকে দেখলাম। ভদ্রলোক দারুণ ভাল কমেডি-অ্যাকটিং করেন।

পাঁচুবাবু রেগে গিয়ে বলতেন ঃ আ মোলো! আমি কার কথা বলছি আর উনি কাকে টেনে আনছেন। আরে আমি বলছি দুগ্গা বাঁড়ুজ্যের কথা। আহা! সে কী রাজকীয় চেহারা। থিয়েটার সেরে যখন রঙমহল থেকে গাড়ি করে বেরোত, তখন সারা কর্নওয়ালিস স্ট্রিট সেন্টের গন্ধের সঙ্গে মদের গন্ধ মিশে মাতোয়ারা করে দিয়ে যেত। তোরা তো আর সেসব দেখতে পেলি না।

পাঁচুবাবুর কথার প্রতিবাদ করে আমি বলতাম ঃ কে বলে আমি ওঁর থিয়েটার দেখিনি! ১৯৪২ সালে যখন কলকাতায় পাকাপাকি থাকতে এলাম, সে বছর ওঁর 'কাঁটা ও কমল' নাটক দেখেছি। তখন আমার কাঁচা বয়েস। অ্যাকটিং-এর ভাল-মন্দ তেমন বুঝতাম না। তবে হলের সবাই দুর্গাদাসকে নিয়ে মাতামাতি করছিলেন, এটা স্পষ্ট মনে আছে।

পাঁচুবাবু বলতেন ঃ আরে ওটা তো ওঁর শেষ বয়েসের ভাঙা হাটের অভিনয়। তার আগেকার নাটকগুলো যদি দেখতিস্ তাহলে বুঝতে পারতিস্ অভিনয় কাকে বলে। আমি তো ওঁর 'কর্ণার্জুন' থেকে শুরু করে এমন কোনও নাটক নেই যা দেখিনি।

পাঁচুবাবুকে বলতাম ঃ আমি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও সামনাসামনি দেখিনি। ওই 'কাঁটা ও কমল' ছাড়া ওঁর আর কোন নাটকও দেখিনি। কিন্তু আমি ওঁর সিনেমার দু-একটা ছাড়া সবক'টা ছবিই দেখেছি। ছোটবেলা থেকেই আমি সিনেমার পোকা। তমলুকের টেম্পোরারি সিনেমা হলে ওঁর অজস্র ছবি দেখেছি। কলকাতায় এসে সেকেন্ড রিলিজে 'দিদি' দেখেছি, 'দেশের মাটি' দেখেছি। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে চিত্রা সিনেমায় (বর্তমানে মিত্রা) ফার্স্ট রিলিজে 'প্রিয় বান্ধবী' দেখেছি। ওঁর ওই ছবির অভিনয় দেখে তো আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কী অসাধারণ অভিনয়!

পাঁচুবাবু একটু হেসে বলতেন : তাহলে তোরা উত্তমকুমারকে নিয়ে অত মাতামাতি করিস কী বলে?

আমি বলতাম : উত্তমকুমারকে নিয়ে মাতামাতি করা মানে কি দুর্গাদাসকে ছোট করা? উনি ওঁর পিরিয়ডের একজন গ্রেট অ্যাক্টর। উত্তমকুমার তাঁর পিরিয়ডের। এতে আপনাদের আপত্তিটা কোথায়?

পাঁচুবাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকতেন।

আমি ওঁর নীরবতার সুযোগ নিয়ে বলে যেতাম : তাছাড়া দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যত বড় অভিনেতাই হোন না কেন, ওঁর অভিনয়ে মাদকতা ছিল না। উনি আমাদের মাতাল করতে পারতেন না। যেটা পারতেন প্রমথেশ বড়ুয়া। কী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর। দর্শকরা ওঁর হাবভাব নকল করে কথা বলত, চলত ফিরত। বড়ুয়া-কাফ পাঞ্জাবি অঙ্গে চড়াত। এখন যেমন উত্তমকুমারকে নিয়ে করে। সেলুনে বসে ইউ-ছাঁটে চুল ছাঁটে।

এইসব অকাট্য যুক্তি দেখানোর পর পাঁচুবাবু রণে ভঙ্গ দিতেন।

তর্কের খাতিরে পাঁচুবাবুকে যা-ই বলি না কেন, দুর্গাদাস কিন্তু অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৪৩

সালের মাঝামাঝি উনি প্রয়াত হয়েছেন, তবে তার পরও পুরো একটি দশক দর্শকের মনে তাঁর অশরীরী উপস্থিতি থেকেই গেছে। মূলত শারীরিক কারণে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিভা তখন স্তিমিত। আসর মাতাচ্ছেন ছবি বিশ্বাস আর জহর গাঙ্গুলি। কিন্তু এক-একটি ছবি রিলিজ করে আর দর্শকের মুখে মুখে স্বর্গত দুর্গাদাসের স্তুতি ঘুরে ফিরে আসে। মোট কথা পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও দুর্গাদাসের স্মৃতি দর্শকের মন থেকে মুছে যায়নি।

দুর্গাদাসের জন্ম ১৮৯৩ সালে চব্বিশ পরগনার কালিকাপুরে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। ওঁর বাবা তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অঞ্চলের এক ধনী ব্যক্তি। ছোটখাটো জমিদারও বলা চলে। দুর্গাদাসের আসল নাম দুর্গাচরণ। যখন অভিনয় করতে এলেন তখন নামটা পাল্টে দুর্গাদাস করে নিয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই দুর্গাদাস যাত্রা নাটক ইত্যাদির প্রচণ্ড অনুরাগী। অবশ্যই দর্শক হিসেবে। পড়াশোনায় ছিলেন সেই পরিমাণে অমনোযোগী। কৈশোর পেরোতে না পেরোতেই দুর্গাদাস স্থানীয় শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ে ভিড়ে গেলেন। এ ব্যাপারটা অভিভাবকরা সুনজরে দেখলেন না। মতিগতি পরিবর্তনের চেষ্টা হিসেবে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই ওঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাতেও খুব একটা কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই নিয়ে বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি।

কুড়ি-একুশ বছর বয়সে দুর্গাদাস আঁকা-টাকা শেখার জন্যে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন। মন দিয়ে শিখতেও লাগলেন। কিন্তু অভিনয়ের তৃষ্ণা যে যাবার নয়। ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগলেন দুর্গাদাস।

১৯১৯ সাল থেকে বাংলাদেশে নির্বাক ছবি তোলা শুরু হয়ে গেল। অভিনয়ের এই মাধ্যমটি দুর্গাদাসকে ভয়ানকভাবে আকর্ষণ করল। কিন্তু কে তাকে সুযোগ দেবে?

নির্বাক ছবিতে বিভিন্ন দৃশ্যে ক্যাপশান লেখার জন্য লোকের প্রয়োজন হল ম্যাডান থিয়েটার্সের। দুর্গাদাস ওই পদের জন্য আবেদন করলেন। আর্ট কলেজে শিক্ষার দৌলতে দুর্গাদাসের হাতের লেখা ম্যাডান সাহেবের পছন্দ হয়ে গেল। অভিনেতা হিসেবে নয়, ক্যাপশান-লেখক হিসেবে বায়স্কোপ-জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন দুর্গাদাস। দুধের বদলে পিটুলিগোলা।

এই যে ক্যাপশান লেখকের কাজ নেওয়া, এটা দুর্গাদাস একটা পরিকল্পনা করেই গ্রহণ করেছিলেন। বাইরে থেকে অভিনেতা হবার জন্যে উমেদারি করে ফল পাওয়া মুশকিল। ক্যাপশান লেখক হিসেবে ওঁদের চোখের সামনে থাকতে থাকতে যদি একদিন সুযোগ এসে যায়! ওই একই উদ্দেশ্যে তিনি স্টার থিয়েটারে দৃশ্যপট আঁকার কাজটাও নিয়েছিলেন।

দুর্গাদাসের কপাল খুলল ওই স্টার থিয়েটারে এসেই। স্টার থিয়েটার তখন চালাচ্ছে আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড। ক'দিন পরেই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কর্ণার্জুন' নাটক মঞ্চস্থ হবে। অপরেশবাবুই পরিচালক। পুরোদমে মহলা চলছে। ১৯২৩ সালের ৩০শে জুন নাটকটি মুক্তি পাবার কথা। ২৯শে জুন সন্ধেবেলা খবর পাওয়া গেল, ওই নাটকে বিকর্ণর রোল্ যে করবে সে ঘোরতর অসুস্থ। তাহলে কী হবে? ওই নাটকে এত শিল্পীর দরকার হয়েছে যে অতিরিক্ত কোনও শিল্পী হাতে নেই। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন অপরেশবাবু।

হঠাৎ দুর্গাদাসের প্রতি নজর পড়ল অপরেশবাবুর। দুর্গাদাস তখন একমনে কৌরবসভার দৃশ্য আঁকছিলেন। আঁকা শেষ, তখন ফিনিশিং টাচ চলছে। এমন সময়ে অপরেশবাবু ডাকলেন : ওহে ছোকরা, এদিকে শোনো!

ডাক শুনে দুর্গাদাস এসে দাঁড়ালেন অপরেশচন্দ্রের সামনে। অপরেশবাবু পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখলেন দুর্গাদাসের। সুদর্শন এই তরুণের চেহারাটা বেশ পছন্দ হল তাঁর। বললেন : এক সিনের একটা ছোট পার্ট আছে। করতে পারবে?

দুর্গাদাসের হাতে তখন চাঁদ। বললে : নিশ্চয় পারব স্যার।

অপরেশবাবু বললেন : তাহলে প্রম্পটের খাতাটা নিয়ে বিকর্ণর পার্টটা মুখস্থ করে ফ্যালো এক্ষুনি। ভয় নেই, অল্প ডায়লগ আছে।

অপরেশবাবু বিস্মিত হলেন। বললেন : সে কী! পার্ট মুখস্থ করলে কী করে? 'কর্ণার্জুন' তো বই হয়ে বেরোয়নি এখনও!

দুর্গাদাস বললেন : আপনাদের রিহার্সাল শুনতে শুনতে পার্ট মুখস্থ হয়ে গেছে। শুধু বিকর্ণর কেন, সবগুলো পার্টই আমার মুখস্থ।

দুর্গাদাসেব কথা সুনে অপরেশবাবু আর একবার খুঁটিয়ে দেখলেন দুর্গাদাসকে। তারপর বললেন ঃ ঠিক আছে। এখন তাহলে একবার সকলের সঙ্গে সিনটার রিহার্সাল করে নাও। কালকের প্রথম শো-তে যদি উতরে যাও, লোকের যদি ভাল লাগে তোমার অভিনয়, তাহলে ওই রোলটাকে আর একটু ঘষামাজা করে কিছু ডায়লগ বাড়িয়ে দেব।

তা কর্ণার্জুন-এর প্রথম রজনীর অভিনয়ে দুর্গাদাসের প্রশংসা জুটেছিল। দর্শক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ওই একই নাটকে পরবর্তীকালে তিনি অর্জুন করেছেন, কর্ণও করেছেন।

এরপর থেকে থিয়েটার জগতে দুর্গাদাসকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বরং সিনেমাই পূর্ণচক্ষু মেলে তাকিয়েছিল দুর্গাদাসের দিকে। ১৯২২ সালে ম্যাডান কোম্পানিতে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতায় 'বিষবৃক্ষ' ছবিতে কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু তেমন আলোড়ন তুলতে পারেননি। স্টার থিয়েটারে কর্ণার্জুন-এর সাকসেসের পর পরিচালক নরেশ মিত্রের নজরে পড়ে গেলেন। তাঁর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' এবং শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' ছবিতে দুর্গাদাস এতই সুখ্যাতি পেলেন যে এর পর থেকে ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অভিনেতা হিসেবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী থেকে গেছেন। কী সিনেমায় আর কী থিয়েটারে।

নির্বাক যুগে বেশির ভাগ ম্যাডান থিয়েটার্সের ছবিতেই কাজ করেছেন দুর্গাদাস। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষ্ণকান্তের উইল, মিশররানি, ধর্মপত্নী, জেলের মেয়ে, দুর্গেশনন্দিনী, সরলা, শাস্তি কি শান্তি, কপালকুণ্ডলা, রজনী, রাধারানি, বুকের বোঝা, কণ্ঠহার ইত্যাদি।

কিন্তু ছবি যখন কথা বলতে শিখল সেই সবাক যুগে দুর্গাদাস নিউ থিয়েটার্সকেই বেছে নিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে। এখানে তাঁর প্রথম ছবি 'দেনা পাওনা'। তারপর চিরকুমার সভা, চণ্ডীদাস, কপালকুণ্ডলা, মীরাবাঈ, মহুয়া, ভাগ্যচক্র, দিদি, বিদ্যাপতি, দেশের মাটি ইত্যাদি। এই সব ছবিতেই যে দুর্গাদাস নায়ক তা নয়। বেশ কয়েকটি ছবিতেই তিনি চরিত্রাভিনেতা। নায়ক ছাড়া করব না এমন মানসিকতা দুর্গাদাসের ছিল না। ছোট-বড় যে কোনও ভূমিকাকেই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতেন। অনেক ছবিতেই দেখা গেছে দুর্গাদাস নায়ক না হয়েও দর্শকের কাছে নায়কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

'দেশের মাটি' ছবির পর দুর্গাদাসের সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের বিচ্ছেদ ঘটে। এর জন্যে দায়ী দুর্গাদাস নিজেই। দুর্গাদাস ছিলেন অতিরিক্ত সুরারসিক। অত্যধিক মদ্যপান করতেন তিনি। সময়-অসময় স্থান-অস্থানের বাছবিচার করতেন না। অনেকের ধারণা এই অতিরিক্ত সুরাপানই তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ। ১৯৪৩ সালের ২০শে জুন তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর মাত্র একান্ন বছর বয়স। এটা নিশ্চয় বাংলা সিনেমা এবং থিয়েটার জগতের দুর্ভাগ্য।

অতিরিক্ত মদ্যপান করলে দুর্গাদাস হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। রীতিমত কটু-কাটব্য করতেন সবাইকে। তেমনই একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় তাঁর সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের দীর্ঘকালের সম্পর্কের ছেদ ঘটে। এরপর তিনি শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে যোগদান করেন। এখানে তিনি পরশমণি, ঠিকাদার, অবতার ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেন। মৃত্যুর পূর্বে ১৯৪২ সালে আবার তিনি নিউ থিয়েটার্সে ফিরে আসেন এবং একটিমাত্র ছবিতে অভিনয় করেন। 'প্রিয় বান্ধবী'। এটিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

আমি যখন কলকাতায় এলাম তখন দুর্গাদাস-অনুরাগীদের মুখে তাঁর সম্পর্কে নানা ঘটনার কথা শুনতে পেতাম। সেগুলির সত্যি-মিথ্যে যাচাই করা খুবই মুশকিল। যেমন উনি নাকি একবার তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (তখন এই পদটিকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ফজলুল হক সাহেবকে বলেছিলেন : হক্ সাহেব, আপনি চলে গেলে আপনার পোস্ট শূন্য থাকবে না, আর একজন কেউ প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু আমি মারা গেলে আমার জায়গাটা খালিই থাকবে। আর একজন দুর্গাদাস জন্মাবে না।

বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা কে এল সায়গলকে নাকি দুর্গাদাস একবার বলেছিলেন : দ্যাখ্ সায়গল, তোর সঙ্গে আমার তফাতটা কী জানিস? তোকে কষ্ট করে গলা ফাটিয়ে গান গাইতে হয়, আর আমি কথা বললেই সেটা গান হয়ে যায়।

এসব ঘটনার সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে এসব ঘটনা সেই চল্লিশের দশকে বাজারে খুব চালু ছিল।

দুর্গাদাস খুব স্পষ্টবক্তা ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন সোচ্চারে। একবারের একটা ঘটনা বলি। একদিন দুর্গাদাস থিয়েটার করতে এসে গ্রিনরুমে ঢুকেছেন মেক্-আপ নেবার জন্যে, এমন সময় থিয়েটারের চার-পাঁচজন কর্মী এসে বললেন : দাদা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

দুর্গাদাস একটু অবাক হলেন ওদের দল বেঁধে আসতে দেখে। বললেন : কী ব্যাপার?

কর্মীদের একজন বললেন : দাদা, আমরা আজ তিন মাস মাইনে পাইনি, বালবাচ্চা নিয়ে আধপেটা খেয়ে দিন চলছে। আর তো পারি না। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন দাদা।

কথাটা শুনে দুর্গাদাস গুম হয়ে গেলেন। একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : তোদের কেউ একজন গিয়ে মালিককে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি আমি ডাকছি। এক্ষুনি যেন আসে। না এলে ড্রপ উঠবে না।

এত্তালা পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে মালিক এসে হাজির। তাঁকে দেখে দুর্গাদাস বললেন : আপনি এক্ষুনি এদের মাইনে মিটিয়ে দিন। না হলে আমি অভিনয় করব না।

মালিকটি ছিলেন একটু উগ্র প্রকৃতির। তিনি বললেন : অভিনয় করবেন না মানে। আমার সঙ্গে চুক্তিমত আপনি অভিনয় করতে বাধ্য। আপনার টাকা তো আমি বাকি রাখিনি।

দুর্গাদাস শান্ত কণ্ঠে বললেন : শুধু আমাকে টাকা দিলেই চলবে? এরা কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবে নাকি?

মালিক বললেন : ওদের সঙ্গে ব্যাপারটা আমি বুঝব। আপনি মেক্-আপে বসে যান।

দুর্গাদাস বললেন : বুঝব বললে চলবে না। এখুনি বুঝতে হবে। দশ মিনিটের মধ্যে যদি ওদের টাকা না মিটিয়ে দেন তাহলে আমি অভিনয় করব না।

দুর্গাদাসের কথা শুনে মালিক রেগে বেরিয়ে গেলেন গ্রিনরুম থেকে। সোজা স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন : অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দুর্গাদাসবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ আর অভিনয় করতে পারবেন না। আপনারা দয়া করে বুকিং কাউন্টার থেকে টিকিটের টাকা ফেরত নিয়ে যান।

ওঁর কথা শেষ হতে না হতে দুর্গাদাস স্টেজের ওপর এসে দাঁড়ালেন। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : এই লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ইনি গত তিন মাস ধরে থিয়েটারের ওয়ার্কারদের একটি পয়সাও মাইনে দেননি। আমি ওঁকে দশ মিনিটের মধ্যে টাকাটা মিটিয়ে দিতে বলেছি। তা হলেই আমি অভিনয় করব। এখন আপনারাই ঠিক করুন আমার অভিনয় দেখবেন না টিকিটের টাকা ফেরত নেবেন।

দর্শকরা সমস্বরে বলে উঠল : আমরা টিকিটের টাকা ফেরত চাই না। আপনার অভিনয় দেখতে চাই।

তারপর থিয়েটারের মালিকের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন : ও মশাই, ভাঁওতাবাজির জায়গা পাননি। যান যান, তাড়াতাড়ি টাকাটা মিটিয়ে দিন। না হলে হলের একখানা চেয়ারও আস্ত থাকবে না। আপনাকে জামা-কাপড় রেখে দিয়ে নেংটি পরে বাড়ি ফিরতে হবে।

ওই প্রচণ্ড জনরোষের সামনে থেকে মালিক সুড় সুড় করে সরে পড়লেন।

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে থিয়েটারের ড্রপ উঠেছিল সেদিন।

এই ছিলেন দুর্গাদাস। আজকের দর্শক অনেকে তাঁর নামও শোনেননি। ছবিও দেখেননি। সেসব ছবি আর বোধহয় দেখার সুযোগও নেই। দুর্গাদাস এখন বেঁচে আছেন পাঁচুবাবুদের মতো কিছু পুরনো মানুষের স্মৃতিতে।

পাহাড়ীদা

পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল একটা বিশ্রী ঘটনার মধ্যে দিয়ে। তার আগে পাহাড়ীদার সঙ্গে পরিচয় ছিল। কর্মসূত্রে তিনি আমাকে চিনতেন। কিন্তু তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা হয়নি। হল ওই বিশ্রী ঘটনাটার পর।

সেটা ঠিক কোন সাল মনে নেই। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বছর দেহত্যাগ করেন সেই বছরেই। আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার পক্ষ থেকে 'মানিক স্মৃতি উপন্যাস প্রতিযোগিতা'-র আয়োজন করা হয়েছিল। কোনও লেখকের প্রথম রচিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন মতি নন্দী, দ্বিতীয় পূর্ণেন্দু পত্রী, এবং তৃতীয় হয়েছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই এখন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক।

প্রতি বছরই উল্টোরথ-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মানিত করা হত। সে বছর উৎসব হয়েছিল রঙমহল থিয়েটারে। সেই উৎসবেই ওই তিন লেখককেও পুরস্কৃত করা হয়। উৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা। যেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে সেইজন্য জ্যোতিবাবুর মতো একজন কম্যুনিস্টকে প্রধান অতিথি করার কথা ভেবেছিলেন উল্টোরথের কর্ণধার প্রসাদ সিংহ। আমরাও আশা করেছিলাম জ্যোতিবাবু মানিক-সাহিত্য এবং তাঁর বামপন্থী মতবাদ সম্পর্কে কিছু সারগর্ভ আলোচনা করবেন।

কিন্তু জ্যোতিবাবু আমাদের নিরাশ করলেন। ভাষণ দিতে উঠে তিনি মামুলি দু-চারটি কথা বলে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

এই ব্যাপারটা আমাদের মতো ইয়াং গ্রুপকে খুবই বেদনাহত করল। জ্যোতিবাবু তখন আমাদের হিরো। বিপ্লবের প্রতীক। খুব আশা করেছিলাম অন্তত আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার তাঁর মুখ থেকে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনব। সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর ভেসেলটি সে এম্পটি সেটা তো তখন বুঝিনি।

রঙমহলের বাইরে লবিতে দাঁড়িয়ে আমরা এই নিয়ে আক্ষেপ করছিলাম। এমন সময় প্রসাদদা এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। বললেন : দোষটা তো তোদেরই। তোরা তো গোড়াতেই একটা মারাত্মক ভুল করেছিস্।

প্রসাদদার কথায় বিস্মিত হলাম। বললাম : কী ভুল?

প্রসাদদা বললেন : স্টেজের ওপর ব্যাকড্রপটা ব্ল্যাংক রাখা উচিত হয়নি তোদের।

বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ল। বললাম : তার মানে?

প্রসাদদা বললেন : দেখলি না, জ্যোতিবাবু ভাষণ দিতে উঠে একবার পেছন ফিরে দেখে নিলেন। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভাষণ শেষ।

হতভম্বের মতো বললাম : তাতে কী হল?

প্রসাদদা বললেন : জ্যোতিবাবুর পেছনের পর্দায় যদি একটা মনুমেন্টের ছবি এঁকে দিতে পারতিস তাহলে ঘণ্টাখানেকের আগে জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা থামত না। বরাবর পেছনে মনুমেন্টকে রেখে ভাষণ দেওয়া অভ্যেস তো। ওটাই ওঁর ইন্স্‌পিরেশন।

প্রসাদদার কথায় হেসে ফেললাম। এই জাতীয় ইন্স্ট্যান্ট রসিকতা ওঁর পক্ষেই সম্ভব। অসাধারণ রসবোধ ছিল ভদ্রলোকের।

কথাটা বলেই দাঁত খুঁটতে খুঁটতে প্রসাদদা চলে গেলেন আর তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ট্রামরাস্তা পেরিয়ে পাহাড়ী সান্যালকে আসতে দেখা গেল রঙমহলের দিকে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ীদাকে অভ্যর্থনা জানালায়। বললাম : এত দেরি করে এলেন পাহাড়ীদা! জ্যোতিবাবু একটু আগেই চলে গেলেন।

পাহাড়ীদা হাসতে হাসতে আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার শেষ কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন : হোয়াট ডু ইউ মিন্?

পাহাড়ীদার বলার ভঙ্গিতে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। বললাম : বলছিলাম কী, এত দেবি করে এলেন...

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই পাহাড়ীদা চিৎকার করে উঠলেন . তোমার সাহস তো বড় কম নয়' আমাকে বলো কি না সময়জ্ঞানহীন' আমি জানতে চাই আমাকে এতবড অপমান করার দুঃসাহস তোমার কোথা থেকে এল! ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু নো!

বলতে বলতে পাহাড়ীদাব মুখটা রাগে লাল টকটকে হয়ে উঠল। তাঁব চিৎকাবে আশেপাশে দু-চারজন লোকও জমে গেল।

পাহাড়ীদার এ হেন ব্যবহারে আমি তো হতভম্ব। বুঝতে পারলাম না, আমার অপরাধটা কোথায়! মিন মিন করে বললাম : আমি তো আপনাকে অপমানসূচক কোন কথা বলিনি পাহাড়ীদা। কেবল বলেছি আপনি একটু দেরি করে এলেন।

পাহাড়ীদা তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : এটা অপমান নয়। আজ পর্যন্ত আমি কোথাও এক মিনিট লেট করে যাইনি। সময় সম্পর্কে আমি এতটাই সচেতন। সাহেবরা পর্যন্ত টাইম সম্পর্কে আমার পাংচুয়ালিটি দেখে অবাক হয়ে যায়, আর তুমি কিনা অর্বাচীনের মতো বললে আমি দেরি করে এসেছি! ডাকো তোমার মালিকদের। জেনে নাও আমি ক'টার সময় আসব বলে কথা দিয়েছিলাম! আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না।

এমন সময় পাহাড়ীদার চিৎকার চাঁচামেচির আওয়াজ পেয়ে গিরীনদা অর্থাৎ গিরীন সিংহ দৌড়ে এসে পাহাড়ীদার হাত দুটো ধরে বলে উঠলেন : আরে আসুন আসুন পাহাড়ীদা। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। কথা দিয়েছিলেন দশটায় আসবেন। একেবারে সাহেবদের মতো কাঁটায় কাঁটায় দশটাতে এসে হাজির হয়েছেন।

বলে পাহাড়ীদাকে টানতে টানতে হলের মধ্যে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় একবার পিছন ফিরে আমাকে চোখের ইঙ্গিতে শান্ত হতে বলে গেলেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বিনা দোষে সকালবেলা কতগুলো গালাগালি শুনলাম। এরপর আর হলের মধ্যে না ঢুকে বাইরেই ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলাম।

খানিকক্ষণ পরে পাহাড়ীদাকেও দেখলাম হল থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে এর-ওর-তার সঙ্গে গল্পগুজব করছেন আর মাঝে মাঝে আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। আমিও বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু পরে দেখলাম পাহাড়ীদা কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পরম বন্ধুর মতো আমার কাঁধে হাতখানা রাখলেন। এতক্ষণ যে অভিমানটা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছিলাম এবারে সেটা অশ্রু হয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ীদা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বুকে জাপটে ধরে বলে উঠলেন : এই দেখো বোকা ছেলের কাণ্ড! আরে এই নিয়ে কেউ কান্নাকাটি করে। অ্যাই, মুখ তোল্, আমার দিকে তাকা, আমি তো তোর দাদা রে! পাহাড়ীদা বলে ডাকিস্ না আমাকে! দাদার কি ভাইকে বকাবকি করবার অধিকারটুকুও নেই।

বলতে বলতে পাহাড়ীদার গলার স্বরটা কেমন ভারি হয়ে এল। পকেট থেকে ফরাসি সেন্টে সুরভিত রুমাল বার করে আমার চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন : আজ বিকেলেই একবার ডাক্তারের কাছে যাব। প্রেশারটা চেক্ করানো দরকার।

এই হলেন পাহাড়ীদা! অভিনেতার গ্ল্যামারের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা স্বতন্ত্র একটি মানুষ, যে পাহাড়ীদার জীবনের শেষ দিনগুলি পর্যন্ত আমি তাঁর বুকের কাছাকাছি ওই একই ভাবে থাকত পেরেছিলাম।

পাহাড়ীদারা তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালি। উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ের মানুষ। পাহাড়ীদার জন্ম

১৯০৮ সালে দার্জিলিঙ শহরে। আসল নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। কিন্তু পাহাড়ে জন্মেছিলেন বলে ওঁর ডাকনাম ছিল পাহাড়ী। এবং সেই নামেই উনি বিখ্যাত।

পাহাড়ীদার হবার কথা ছিল সঙ্গীতজ্ঞ, ঘটনাচক্রে হয়ে গেলেন অভিনেতা। ছোটবেলাতেই পাহাড়ীদা মাতৃহারা। বাবার কোলে বসে সংগীতশিক্ষার শুরু। বাবার মৃত্যুর পর লখনৌ থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষা সেরে বেনারসে গেলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু গানের টানেই পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে ফিরে এলেন লখনৌতে। ম্যারিস মিউজিক কলেজে ভর্তি হলেন সংগীতের উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য। ওই সময় স্বনামখ্যাত অতুলপ্রসাদ সেনের স্নেহ-সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কাছেই পাহাড়ীদার অতুলপ্রসাদের গানে দীক্ষা।

পাহাড়ীদার সারা জীবনটাই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা। শেষ বয়সে আমি পাহাড়ীদার কলমচি ছিলাম। 'দেশ' পত্রিকায় উনি যখন ধারাবাহিক ভাবে অতুলপ্রসাদ সেন সম্পর্কে লেখেন তখন দিনের পর দিন ওঁর লেখার ডিক্‌টেশান নিতাম। সেই সময়ে একটু একটু করে তাঁর নাটকের চেয়েও রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী শুনেছিলাম। তরুণ বয়সে কীভাবে প্রেমে পড়ে সংসার এবং আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিয়ের পর কী কষ্টেই না সংসার চালাতেন, প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কী অসহনীয় শোক পেয়েছিলেন এবং কেমন করে চলচ্চিত্র জগতের সংস্পর্শে আসেন—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়।

ফিল্মে পাহাড়ীদার প্রথম প্রবেশ প্রমথেশ বড়ুয়ার হাত ধরেই হবার কথা ছিল। বড়ুয়াসাহেব তাঁর নিজের স্টুডিওর তরফ থেকে 'অনাথ' নামে একটি ছবি তৈরির কথা ভাবছিলেন। কিন্তু ওঁদের চুক্তিপত্র পাহাড়ীদার মনঃপুত হয়নি। এর বছর দুই পরে দেবকী বসুর সঙ্গে পাহাড়ীদার পরিচয় হয়। তিনি পাহাড়ীদাকে নিউ থিয়েটার্সে নিয়ে যান। সেখানেই পাহাড়ীদার প্রথম চিত্রাবরতণ 'মীরাবাঈ' ছবিতে। মাসিক মাইনে দেড়শো টাকা।

'মীরাবাঈ' ছবিতে পাহাড়ীদার অভিনয়ের যেমন প্রশংসা হল, তেমনি হল গানের। আগেই বলেছি পাহাড়ীদা উত্তরপ্রদেশের বাঙালি। চোস্ত উর্দু ও হিন্দি বলতে পারেন। অতএব তখনকার নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি ছবিগুলিতেও পাহাড়ীদা অভিনয় করতে লাগলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে পাহাড়ীদা নিউ থিয়েটার্সের তিরিশখানি ছবিতে অভিনয় করেন। এর মধ্যে 'মীরাবাঈ' ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল 'ভাগ্যচক্র', 'বিদ্যাপতি', 'বড়দিদি', 'রজত জয়ন্তী', 'সাপুড়ে', 'প্রতিশ্রুতি' ইত্যাদি। শেষোক্ত ছবিতে অভিনয় করে তিনি সাংবাদিকদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বি এফ জে এ পুরস্কার পান।

১৯৪২ সালে পাহাড়ীদা নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বম্বে চলে যান। সেখানেও খান কুড়ি ছবি করেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কিসিসে না কহ্‌না', 'মজাক্', 'ইনকার', 'ম্যায় কেয়া করুঁ', 'শ্রবণকুমার', 'বড়ে নবাব সাহেব' ইত্যাদি ছবি।

১৯৪৭ সালের শেষের দিকে পাহাড়ীদা আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। এই পর্বে তাঁর প্রথম ছবি 'প্রিয়তমা'। তারপর থেকে আমৃত্যু কলকাতায়। অন্তত শ'দুয়েক ছবি তাঁর অভিনয়ে সমৃদ্ধ। হিরো থেকে শুরু করে হিরোর বাবা, ঠাকুর্দা ইত্যাদি অনেক ধরনের চরিত্রই করেছেন। তাঁর ক্রেডিটে দু'খানা বায়োগ্রাফিক্যাল ছবিও আছে। 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' এবং 'বিদ্যাসাগর'।

এই 'বিদ্যাসাগর' ছবিতে অভিনয়ের প্রাক্কালে পাহাড়ীদার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে পাহাড়ীদা একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ বুঝলে ভায়া, আমি তো বাংলাদেশের বাইরের মানুষ। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তেমন গভীর কোন ও পরিচয় আমার ছিল না। এম পি প্রোডাকসন্স যখন আমাকে বিদ্যাসাগরের চরিত্র করার অফার দিলেন তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। লোকমুখে শুনেছি বিদ্যাসাগর এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সেই শোনা কথার ওপর নির্ভর করে এতবড় একটা চরিত্রের রূপায়ণ তো সম্ভব নয়। তাই আমি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নানাবিধ রচনা পড়তে লাগলাম। বিদ্যাসাগরের লেখা বইগুলো পড়তে পড়তে বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করলাম। পড়ার নেশায় আমাকে পেয়ে বসল। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। তারপর তিন বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে

পড়লাম। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। সন্তোষকুমার ঘোষ আমার এই পড়ার নেশাকে আরও উস্‌কে দিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য এখন আমাব কাছে জীবনধারণের একটা অবলম্বন। 'বিদ্যাসাগর' ছবি করতে না হলে বোধহয় আমার জ্ঞানচক্ষু খুলত না। এই রবি, তোমার কাছে সন্তোষবাবুর 'শেষ নমস্কার' বইটা আছে নাকি? থাকলে আমাকে একবার পড়তে দিও তো।

'শেষ নমস্কার' বইটা আমার কাছে ছিল। সন্তোষদার নিজের হাতে সই কবা বই, যাতে আমার সম্পর্কে সন্তোষদার মনের কথার কিছু প্রতিফলন ছিল। সেই বইটাই পাহাড়ীদাকে পড়তে দিয়েছিলাম। তার কিছুদিন পরেই পাহাড়ীদা প্রয়াত হয়েছিলেন। ওই বইটা আমার কাছে আর ফেবত আসেনি। মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি যে, ওটা পাহাড়ীদার প্রতি আমার শেষ নমস্কার।

শেষ জীবনে পাহাডীদা প্রচণ্ড অর্থকষ্ট ভোগ করেছেন। ব্যয় নির্বাহের জন্যে তাঁকে গানের টিউশনি কবতে হয়েছে। গানের স্কুলে গিয়ে গান শেখাতে হয়েছে। একদিন আক্ষেপ করে বলছিলেন ঃ আমি যে একসময়ে অভিনয় করতাম সেটা সিনেমাপাড়ার লোকেরা বোধহয় ভুলে গেছে। আর কিছুদিন এবকম চললে আমিও নির্ঘাত ভুলে যাব।

সারা জীবনে একটিমাত্র নাটকে অভিনয় করেছেন পাহাড়ীদা। বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে 'আসামী হাজির' নাটকে একটি অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায়। অথচ একটা সময়ে পাহাডীদাকে পাবাব জন্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চ কত না লালায়িত ছিল।

সেটা বোধহয় ১৯৩৬-৩৭ সাল। তরুণ নায়ক-গায়ক হিসেবে পাহাড়ীদার তখন প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা। ওদিকে আর এক জনপ্রিয় নায়ক তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। তাঁর নাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দুর্গাবাবু একদিন পাহাড়ীদাকে বললেন : ওহে পাহাড়ী, ফিল্মে অ্যাকটিং করে তুমি তৃপ্তি পাচ্ছো?

পাহাড়ীদা বললেন : তা তো পাচ্ছিই। দেবকীবাবু, বড়ুয়াসাহেব, পুতুলবাবু (নীতীন বসু), মল্লিকমশাই (অমর মল্লিক)—এঁদের সঙ্গে কাজ করে রীতিমতো থ্রিল্‌ড হচ্ছি। সেইসঙ্গে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয়। বেশ ভালো লাগছে আমার। তাছাড়া কাগজে ছবি-টবি বেরোচ্ছে। অতৃপ্তির তো কোনও কারণ নেই।

দুর্গাবাবু বললেন : এরচেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পেতে যদি তুমি স্টেজে অ্যাকটিং করতে। সত্যিকারের অভিনয় শেখার জায়গা হল স্টেজ। পাবলিক থিয়েটার। তাছাড়া একটা নগদ-নারায়ণের ব্যাপারও আছে।

পাহাড়ীদা বললেন : টাকা-পয়সার কথা বলছেন?

দুর্গাবাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো আছেই। তোমার এখন রোরিং পপুলারিটি। টাকা-পয়সা তুমি ভালোরকমই পাবে। তার চেয়েও একটা বড় পাওনা আছে।

পাহাড়ীদা জিজ্ঞাসা করলেন : সেটা কী?

দুর্গাবাবু বললেন . এই যে তুমি একটা ছবিতে অভিনয় করছো, সেটা ভালো হল কি মন্দ হল সেই পাবলিক ওপিনিয়নটা কবে পাচ্ছো?

পাহাড়ীদা বললেন : ছ'মাস কি আট মাস পরে। হলে রিলিজ করলে।

দুর্গাবাবু বললেন : আর স্টেজে! একেবারে হাতে হাতে। তুমি ভালো অ্যাকটিং করলে হাততালি পাবে। খারাপ অ্যাকটিং করলে দুর-ছাই। প্রতি মুহূর্তে তুমি নিজেকে যাচাই করতে পারছো। নিজেকে শুধরে নিতে পারছো।

একটু থেমে পাহাড়ী সান্যালের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে দুর্গাদাস বললেন : করবে নাকি স্টেজে অ্যাকটিং? থিয়েটারপাড়ায় যোগাযোগ করব?

পাহাড়ীদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন না। এটা তো বেশ ভালো ব্যাপার।

দুর্গাবাবু বললেন : এক কথায় হ্যাঁ করে দিলে! ভালো করে ভেবে-চিন্তে বলো। তোমার জন্যে কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত আমাকে বে-ইজ্জৎ না হতে হয়।

পাহাড়ীদা বললেন : আমি ভেবেই বলছি। আপনি যোগাযোগ করতে পারেন।

সত্যি কথা বলতে কি পাহাড়ীদা এই স্টেজ-অ্যাকটিংয়ের ব্যাপারটাকে সেই মুহূর্তে তেমন গুরুত্ব

দেননি। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তখন বাঘা-বাঘা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমারোহ। শিশির ভাদুড়ি, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরি, ছবি বিশ্বাস স্টেজ আলো করে সমাসীন। তার ওপর দুর্গাদাস আছেন, জহর গাঙ্গুলি আছেন। থিয়েটারওলাদের বয়ে গেছে তাঁর মতো একজন অর্বাচীনকে দিয়ে অভিনয় করাতে। দুর্গাবাবু নির্ঘাৎ রসিকতা করেছেন, আমিও হ্যাঁ বলে দিয়েছি। এইরকমই মনোভাব ছিল পাহাড়ীদার।

দিন পনেরো পরে দুর্গাদাসবাবু পাহাড়ীদার হাতে একটা পোস্টার ধরিয়ে দিয়ে বললেন : দেখো কেমন হয়েছে!

পোস্টার দেখে তো পাহাড়ীদার চক্ষু স্থির। বড় বড় হরফে তাঁর নাম ছাপা হয়েছে। নামের আগে আছে 'চিত্রজগতের জনপ্রিয় গায়ক-নায়ক' ইত্যাদি বিশেষণ। নামের পরে আছে 'রঙমহল থিয়েটারে স্থায়ীভাবে যোগদান করিলেন'।

ব্যাপারটা তো আর রসিকতার স্তরে নেই। পোস্টার দেখে সারা শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল পাহাড়ীদার। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনরকমে উচ্চারণ করলেন : বাঃ, বেশ হয়েছে।

দুর্গাবাবু হাসতে হাসতে বললেন : দু-একদিনের মধ্যে ওরা আসবে তোমার সঙ্গে টাকা-পয়সার কথাবার্তা বলতে। তার আগে শ'পাঁচেক পোস্টার দিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে। এর জন্যে তুমি কিছু মনে করো না।

পাহাড়ীদা একটু শুকনো হেসে বললেন : না না, এতে মনে করবার কী আছে।

সেদিন সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না পাহাড়ীদা। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলেন তিনি যেন স্টেজে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করছেন আর দর্শকরা সিটে বসে তারস্বরে তাঁকে দূর-ছি দূর-ছি করছে।

পরের দিন পাহাড়ীদা স্টুডিওতে না গিয়ে হাজির হলেন মিস্টার বি এন সরকারের নিউ সিনেমার অফিসে। মিস্টার সরকার নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যাঁকে পাহাড়ীদা আমরণ শ্রদ্ধা করে এসেছেন। ওঁর ঘরে ঢুকে পোস্টারটা মিস্টার সরকারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে দিলেন পাহাড়ীদা।

মিস্টার সরকার গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। স্বল্পভাষী। পোস্টারটা একমনে খুঁটিয়ে পড়লেন। তারপর পাহাড়ীদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি আমার কাছ থেকে অফিসিয়ালি পারমিশান চাইছেন?

পাহাড়ীদা উত্তর দিলেন : না। আমি চাইছি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

মিস্টার সরকার বললেন : আপনি স্টেজে যেতে ইচ্ছুক নন?

পাহাড়ীদা বললেন : একদম না। আমি ভাবতে পারিনি দুর্গাদা ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেবেন।

মিস্টার সরকার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। আপনি যান। আমি দেখছি কতদূর কী করা যায়।

সেদিন বিকেলে মিস্টার সরকার স্টুডিওতে গিয়ে দুর্গাবাবুকে বললেন : পাহাড়ীবাবু স্টেজের জন্যে আমার পারমিশান চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁকে নিয়ে আমাদের পর পর কয়েক মাস ডে-নাইট প্রোগ্রাম আছে। ওঁকে স্পেয়ার করতে পারছি না। আই অ্যাম সরি!

এই কথা কটি বলে ওই স্বল্পভাষী মানুষটি চলে গেলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে থেকে।

এই তঞ্চকতা, এই মিথ্যাচারণ সারা জীবন পাহাড়ীদাকে দগ্ধে মেরেছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন জীবনের শেষ বছরটিতে এসে। ১৯৭৩ সালে বিশ্বরূপা মঞ্চে পাহাড়ীদা 'আসামী হাজির' নাটকে অভিনয় শুরু করলেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

এত কথা তো আমি জানতাম না। ওই ১৯৭৩ সালে একদিন পাহাড়ীদার কাছে অনুযোগ জানালাম বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটি অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখে।

উত্তরে পাহাড়ীদা নিজের পেটটা দেখিয়ে বলেছিলেন : পেটের দায়ে মানুষকে কত উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় তা তো তোমার জানা নেই। তাছাড়া আরও একটা বড় দায় ছিল।

এই বলে পাহাড়ীদা উপরোক্ত ঘটনাটি শোনালেন। তারপর বললেন : এখন প্রতিদিন স্টেজে ঢুকে মনে মনে দুর্গাদার উদ্দেশ্যে বলি, আমার সেদিনের অপরাধের জন্যে ক্ষমা করো দুর্গাদা। এই দেখো, শেষ বয়েসে তোমার সেদিনের সেই আসামী হাজির। তাকে তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো।

রবিদা

এক বর্ধিষ্ণু বনেদি বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে আমাদের কয়েকজনের মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ। টেবিল-চেয়ারে নয়, খেতে বসা হল পুরনো বাঙালি কায়দায় মাটিতে আসন বিছিয়ে। রান্নাবান্নার আইটেমগুলিও সনাতন বাঙালি পদ্ধতির। ডাল ভাজা-ভুজি সুক্তো চচ্চড়ি মাছের কালিয়া আর টক। শেষ পাতে পরমান্ন অর্থাৎ পায়েস। পাতের চারপাশে বৃত্তাকারে সব কাঁসার বাটি সাজানো। ছোট্ট একটি রুপোর বাটিতে অল্প গব্য ঘৃতও ছিল।

এহেন রুচিশীল পরিবেশে যে কোনও অশিল্পীর মনেও শিল্পের ছোঁয়া লাগে। আমরা যারা ওখানে ভোজনে বসেছিলাম তারা সকলেই শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর সংযুক্ত। তবে খাওয়ার পাতে আমাদের কোনও শিল্পের প্রকাশ ঘটছিল না। প্রত্যহ যেভাবে ফেলে-ছড়িয়ে খাই সেইভাবেই খাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার পাশে যে মধ্য চল্লিশের ভদ্রলোক বসে খাচ্ছিলেন তাঁর পাতের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমরা সবাই উচ্ছিষ্ট ফেলেছিলাম পতের পাশে মেঝেতে। কিন্তু তিনি সেগুলি পাতেরই এক কোণে এমন সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলেন যেন একখানা মন্দির। তার চেয়েও বড় বিস্ময় মাছের কাঁটা নিয়ে। কালিয়ার দুটি আলু পাতের এক কোণে রেখে তার ওপর কাঁটাগুলি এমন সুন্দর করে গেঁথে গেঁথে রেখেছিলেন যেন মনে হচ্ছিল ছোটখাটো দুটি পিন-কুশন পাতের ওপর রাখা। উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপও যে এমন শৈল্পিক হতে পারে তার প্রমাণ সেইদিনই পেলাম।

মনে মনে নমস্কার জানালাম আমার পার্শ্ববর্তী সুদর্শন মানুষটিকে। বুঝলাম তিনি শুধু ছায়াছবির পর্দার জনপ্রিয় শিল্পীই নন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একজন প্রকৃত শিল্পী।

ভদ্রলোকের নাম রবীন মজুমদার। আমার কাছে তিনি রবিদা। এবং তাঁর সমকালীন আরও অনেকের কাছেও।

বাংলা-ছায়াছবিতে সিংগিং-স্টার অর্থাৎ গায়ক-অভিনেতার সংখ্যা আঙুলের কর গোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে কয়জন ছিলেন তাঁরা হলেন কুন্দনলাল সায়গল, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিনয় গোস্বামী, মৃণালকান্তি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং রবীন মজুমদার। বিখ্যাত গায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিককে অভিনেতার শিরোপা দেওয়াতে অনেকের হয়তো কপালের কুঞ্চনরেখায় জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠবে। কিন্তু তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, পঙ্কজদা নিউ থিয়েটার্সের অনেকগুলি হিন্দি ও বাংলা ছবিতে ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আর নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন 'আলোছায়া' এবং 'ডাক্তার' ছবিতে। এর মধ্যে শেষোক্ত ছবিতে তাঁর অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। কাজেই তাঁকে অনায়াসে অভিনেতার সার্টিফিকেট দেওয়া যায়।

তবে গায়ক-অভিনেতা হিসেবে বাংলা ছায়াছবির শেষতম শিল্পী হলেন রবীন মজুমদার। তাঁর পর আর কোনও গায়ক-অভিনেতা বাংলা ছবিতে, যতদূর জানি, আসেননি। ইদানীংকালের শক্তি ঠাকুরকে আমি এই তালিকাভুক্ত করতে পারছি না বলে দুঃখিত। শক্তিবাবু নিয়মিত অভিনয় করলেও উনি গায়কই। অভিনেতা নন।

যাই হোক রবিদার কথাতেই ফিরে আসি। রবিদার জন্ম ১৯১৭ সালে ক্রিসমাসের সময়। অঙ্কের হিসেবে আমার থেকে ঠিক দশ বছরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে সখ্যতায় এবং ব্যবহারে রবিদা এই বয়সের দূরত্বটাকে আদৌ পাত্তা দেননি। ওঁর শেষ জীবনে তো আমরা উভয়েই উভয়ের পরিপূরক ছিলাম। আমি প্রায়ই ওঁর শ্যামপুকুরের বাড়িতে যেতাম গল্পগাছা করতে। উনিও আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও ওঁর প্রিয়জনের তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

রবিদারা মূলত হুগলি জেলার মানুষ। কিন্তু ওঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষা সব কাটিহারে। ওঁর বাবা অমূল্যকুমার মজুমদার ওখানে বড় চাকরি করতেন। ম্যাট্রিক পাস করে রবিদা কলকাতায় এসে স্কটিশচার্চ

কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে বি এস সি পাস করেন ১৯৪০ সালে এবং ওই ১৯৪০ সালেই তাঁর পরবর্তী জীবনপথ নির্ধারিত হয়ে যায়। উনি প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'শাপমুক্তি' ছায়াছবির নায়ক নির্বাচিত হয়ে যান।

সেইসব পুরনো দিনের কথা রবিদার মুখ থেকে আমি বহুবার বহুরূপে শুনেছি। পরে তা নিয়ে একটা বিরাট লেখা লিখেছিলাম 'আনন্দলোক' পত্রিকার তৎকালীন একটি পুজো সংখ্যায়। নাম দিয়েছিলাম রবিদার একটি বিখ্যাত গানের প্রথম লাইনের অনুসরণে। 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ'। লেখাটি পাঠকরা দারুণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সে কৃতিত্ব আমার নয়। রবিদার জীবনে এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল যে সেটা যেমন-তেমন করে লিখলেও পাঠকের ভালো লাগতে বাধ্য। তারই কিছু কিছু এখানে শোনাব। যেমন ওঁর প্রথম ছবিতে সুযোগ পাবার ঘটনাটা। রবিদার মুখ থেকেই সেটা শুনুন।

রবিদা বলতেন : কলকাতায় আসার পর থেকেই আমি প্রমথেশ বড়ুয়ার দারুণ ফ্যান হয়ে গেলাম। দেবদাস, মুক্তি, অধিকার—এক একটা ছবি দেখছি আর সর্বান্তঃকরণে বড়ুয়াময় হয়ে যাচ্ছি। তাঁর অনুকরণে হাঁটা-চলা করি, তাঁর মতো বড়ুয়া-কাফ পাঞ্জাবি অঙ্গে চড়াই, তাঁর মতো আধো-আধো ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করি। আমরা ইয়াং বেঙ্গলের দল তখন সিনেমার আর কাউকে নিয়ে নয়, কেবল প্রিন্স প্রমথেশ বড়ুয়াকে নিয়ে মাতামাতি করি। আমাদের শয়নে-স্বপনে তখন কেবল বড়ুয়া আর বড়ুয়া।

নাইনটিন ফর্টিতে আমাদের কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে যাবার পরই আমাদের কলেজের ফাংশান। আমি তখন কলেজ ইউনিয়নের কাল্চারাল সেক্রেটারি। মনে মনে ঠিক করলাম, যেমন করে হোক হাতে পায়ে ধরে একবার মিস্টার বড়ুয়াকে আমাদের ফাংশানে আনতেই হবে। সেটা করতে পারলে অন্য সব কলেজ ইউনিয়নের ওপর টেক্কা দেওয়া যাবে।

অনেক খোঁজ-খবর, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে একদিন মিস্টার বড়ুয়ার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে গিয়ে তাঁর দর্শন পেলাম। সব শুনে তিনি বললেন : আমি তো ভাই কোন ফাংশান-টাংশানে যাই না। তোমাদের ওখানে আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।

এবারে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। বললাম : আপনি না গেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে স্যার।

আমার কথা শুনে মিস্টার বড়ুয়া বললেন : সে কী! সর্বনাশ হয়ে যাবে কেন?

আমি বললাম : বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরেছি আপনাকে নিয়ে যাব। না পারলে একশো টাকা বাজি হেরে যাব।

মিস্টার বড়ুয়া গম্ভীর গলায় বললেন : খুব বাজে কাজ করেছো। আমি তোমাকে একশোটা টাকা দিচ্ছি। তুমি তোমার বন্ধুদের টাকাটা দিয়ে দাও।

আমি বললাম : কিন্তু ওটা দেওয়ার পরও যে টিটকিরি, যে অসম্মান আমাকে ভোগ করতে হবে, তার পরও কি আমার বেঁচে থাকা উচিত?

এবারে মিস্টার বড়ুয়া হেসে ফেললেন। বললেন : ঠিক আছে। আমি তোমাদের ফাংশানে যাব। তবে দশ মিনিটের বেশি থাকতে পারব না।

ওঁর কথা শুনে হঠাৎ ঝপ্ করে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেললাম। বললাম : আমি তাহলে ওইদিন গাড়ি নিয়ে আসব আপনাকে নিতে।

মিস্টার বড়ুয়া বললেন : না না, তোমাকে গাড়ি নিয়ে আসতে হবে না। আমি নিজের গাড়ি করেই যাব। স্কটিশচার্চ কলেজ আমি চিনি।

বাইরে বেরিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। গাড়ি আনতে যখন নিষেধ করলেন তখন উনি নির্ঘাত যাবেন না। এরকম তো অনেকেই বলেন তারপর আর যান না। তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার আমার এই অভিযানের কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

ফাংশানের দিন একটা ক্ষীণ আশা ছিল উনি হয়তো এসে পড়লেও পড়তে পারেন। কিন্তু যত সময় যেতে লাগল ততই হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার স্বপ্নের রাজকুমার তাহলে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই। আমাকে সেদিন উনি মিথ্যাই আশা দিয়েছিলেন।

সেদিন ফাংশানে আমার একখানা গান গাইবার কথা ছিল। কিন্তু গান গাইতে একদম ভালো লাগছিল

না। বন্ধুরা যতবার আমাকে গাইতে বলছিল ততবারই আমি নানা অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, প্রমথেশ বড়ুয়া একখানা গাড়ি করে গেটের কাছে এসেছেন। আমার নাম ধরে খোঁজাখুঁজি করছেন।

কথাটা শোনামাত্র একে-ওকে ধাক্কা দিয়ে এক দৌড়ে হাজির হলাম মিস্টার বড়ুয়ার সামনে। আমাকে দেখে উনি বললেন : এই যে রবীন, আমি আমার কথা রেখেছি। এবারে তুমি নিশ্চয়ই তোমার কথা রাখবে। ঠিক দশ মিনিট।

ওঁকে ডায়াসে না তুলে অডিটোরিয়ামে বসালাম। ছাত্রবন্ধু এবং দর্শকদের মধ্যে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। আমি সেসব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে দৌড়ে গিয়ে উঠলাম ডায়াসে। বসলাম একেবারে হারমোনিয়ামের সামনে।

আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম মিস্টার বড়ুয়াকে আমার গান শোনাতে। আমার গানের আগে ওঁকে ডায়াসে তুললে উনি দু-চার কথা বলে নিশ্চয় বিদায় নিতেন। তাহলে তো আমার গান শোনানো হত না। তাই সেদিন এই কাণ্ডটা করেছিলাম।

রবিদার বক্তব্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ কী গান গেয়েছিলেন সেদিন?

রবিদা বললেন : কাজীদার একটা গান। 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে।'

আমি বললাম : আপনি কি ছোটবেলা থেকেই গান-টান শিখতেন?

রবিদা বললেন : না না, আমি যাকে বলে বাথরুম সিঙ্গার থেকে পাবলিক সিঙ্গার হয়ে গিয়েছিলাম। দিনাজপুরের বীরেন নিয়োগী মশাইয়ের কাছে কিছুদিন ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা করেছিলাম। পরে 'শাপমুক্তি' ছবির সময় অনুপমদা, মানে অনুপম ঘটক খুব যত্ন করে গান শিখিয়েছিলেন। তারও পরে এ ব্যাপারে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে আমার মিতে, তারও নাম রবীন, রবীন চট্টোপাধ্যায়। অনুপমদার সহকারী। পরে ও খুব বড় মিউজিক ডাইরেক্টর হয়েছিল। 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' গানটার সুর ওরই দেওয়া। তাছাড়া ভীষ্মদা মানে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও বছর তিনেক তালিম নিয়েছি।

আমি বললাম : কিন্তু 'শাপমুক্তি' ছবিতে কীভাবে চান্স পেলেন সেটা তো বললেন না।

রবিদা বললেন : তাই তো বলছি। সেদিন গানটা শেষ করে মিস্টার বড়ুয়ার সামনে এসে দাঁড়াতেই উনি বললেন : বাঃ, বেশ ভালো গেয়েছো তুমি। ছবিতে অভিনয় করবে?

ওঁর কথা শুনে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন : কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

পরের দিন সকালে ওঁর ঘুম ভাঙার আগেই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় দেখলেন, বাড়ির সব খবরাখবর নিলেন, তারপর জানতে চাইলেন সিনেমায় নামলে বাড়ির তরফ থেকে কোন আপত্তি হবে কি না?

আপত্তি তো হতই। হয়েওছিল। বাবা চেয়েছিলেন আমি এঞ্জিনিয়ার হই। তা কিছুদিনের মধ্যেই সে সব মান-অভিমানের পালা মিটেও গিয়েছিল। তবে মিস্টার বড়ুয়াকে আমি সে সব কিছু বলিনি। উল্টে বলেছিলাম : না না, আপত্তি হবে কেন।

মিস্টার বড়ুয়া তখন বলেছিলেন : তোমার ঠিকানাটা আমার কাছে রেখে যাও। ইয়েস্ অর নো মাস খানেকের মধ্যেই জানতে পারবে।

আমি ওঁকে আমার কাটিহারের ঠিকানা দিয়েছিলাম। আমার তো আর কলেজ নেই, কাজেই কলকাতায় থাকার প্রশ্নও নেই। এখন শুধু বি এস-সির রেজাল্ট বেরোনোর অপেক্ষা।

দেশে ফেরার পর মাসখানেক ছেড়ে মাস দেড়েক কেটে গেল কিন্তু বড়ুয়া সাহেবের চিঠি আর আসে না। রোজই একবার করে পোস্ট অফিসে যাই খবর নিতে। আমাদের ওখানে এক বুড়ো পিওন ছিল, সে তো একদিন বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলল : কী ব্যাপার বলো তো ছোটবাবু। কলকাতায় কি লুকিয়ে বে-থা করে এসেছো নাকি যে রোজ একবার করে বৌমার চিঠির খোঁজ করতে আসো?

আমি বিব্রত হয়ে বলে ফেললাম : না না, সেসব কিছু নয়। একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে

এসেছিলাম তো! তাই খোঁজ দিতে আসি।

অবশেষে একদিন মিস্টার বড়ুয়ার অফিস থেকে চিঠি এল। পত্রপাঠ কলকাতায় চলে এলাম। আমার স্ক্রিন টেস্ট হল, ভয়েস টেস্ট হল, গানও শোনাতে হল। তারপর 'শাপমুক্তি'-র হিরোর রোল্‌টা পেয়ে গেলাম।

শাপমুক্তির-র পর রবিদা ছবির পর ছবি করেছেন, গানের পর গান গেয়ে বাংলা দেশকে মাতিয়ে দিয়েছেন। 'গরমিল' ছবিতে ওঁর 'এই কি গো শেষ দান', 'দম্পতি' ছবিতে 'নীলপরি স্বপ্নে জাগলো রে জাগলো', 'যোগাযোগ' ছবিতে 'এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি' এবং দেবকী বসুর 'কবি' ছবিতে 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে' আর 'এই খেদ মোর মনে', 'ভালোবেসে এই বুঝেছি' ইত্যাদি গানগুলি দর্শকের স্মৃতিতে চিরকালীন সঞ্চয় হয়ে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় রয়েছে 'অশোক', 'নন্দিতা', 'নারীর রূপ', 'পাষাণ দেবতা', 'নিরুদ্দেশ', 'ভাঙাগড়া', 'না', 'জবানবন্দী', 'টাকা আনা পাই' ইত্যাদি। হিন্দি 'অ্যারেবিয়ান নাইটস্' ছবিতে কানন দেবীর বিপরীতে নায়ক করেছেন, গান গেয়েছেন।

ছবির কাজ কমে যাবার পর রবিদা থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন এবং অজস্র নাটকে অভিনয় করেছেন রঙমহলে এবং বিশ্বরূপায়। ছবির কাজ কমে যাবার কারণটি বড় ট্র্যাজিক। চলচ্চিত্র জগতের এক শ্রদ্ধেয় দাদার পাল্লায় পড়ে তিনি নেশার স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুরাপানেও শানাত না। মর্ফিন নিতেও শুরু করেছিলেন। সেই অবক্ষয়ের হাত থেকে ওঁকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনেন বিখ্যাত সংগীত পরিচালক ডাঃ নচিকেতা ঘোষ। এজন্য নচিদার প্রতি আমরণ কৃতজ্ঞ ছিলেন রবিদা।

রবিদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : ফিল্মের জগতে আপনি কার কাছে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ? দেবকীবাবুর কাছে না বড়ুয়াসাহেবের কাছে?

উত্তর দিতে এক মিনিটও সময় নেননি রবিদা। বলেছিলেন : 'কবি' ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে দেবকীবাবুর কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ। তাঁর ছবিতেই আমি অভিনেতা হিসেবে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পেয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ মিস্টার বড়ুয়ার কাছে। তিনি কুমোরেরা যেভাবে কাদামাটি ছেনে ছেনে মূর্তি গড়ে, আমাকে সেইভাবেই গড়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার অন্য এক ধরনের মানসিক সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : সেটা কী রকম?

প্রশ্নটা শুনে রবিদা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। যেন কোন্ সুদূর অতীতে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন : তাহলে তোমাকে একটা ঘটনার কথা শোনাই শোনো। 'শাপমুক্তি' ছবি রিলিজের দিন সন্ধেবেলা ব্রডওয়ে হোটেলে ওই ছবির প্রোডিউসার বি এল খেমকা এবং কে এস দরিয়ানি একটা পার্টি দিয়েছিলেন। মিস্টার বড়ুয়ার সঙ্গে আমিও ওখানে গিয়েছিলাম। ওরকম জায়গায় ওরকম পরিবেশে আগে কখনও এসে দাঁড়াইনি। কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম রকমারি পোশাকে সুসজ্জিত অনেক মানুষ। উজ্জ্বল আলোয় তাঁদের ব্যক্তিত্ব যেন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সকলের দৃষ্টি আমাদেরই দিকে।

হোটেলের সামনে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই উচ্চ গুঞ্জনধ্বনি কানে গিয়েছিল। মিস্টার বড়ুয়ার পাশাপাশি কাঁপা কাঁপা পায়ে যখন হলঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম তখন চারিদিকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের সুর। কে একজন যেন চেঁচিয়ে উঠলেন : টু দ্য নিউ হিরো। ডানদিকের এক কোণ থেকে আর একটি ভয়েস শোনা গেল : টু আওয়ার নিউ সিংগিং স্টার—।

সঙ্গে সঙ্গে সারা হল জুড়ে অনেকগুলি হাত ওপরদিকে আন্দোলিত হল। হাতে ধরা গ্লাসগুলির তরল পানীয়ের ওপর থেকে উজ্জ্বল আলো ছিটকে এসে আমার চোখ ঝলসে দিল। সব মিলিয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ ডানদিকের পাঁজরে একটা মৃদু ধাক্কা আর সেই সঙ্গে মিস্টার বড়ুয়ার চাপা কণ্ঠ : কী করছো রবীন, একটা গ্লাস তুলে নাও, এঁদের উইশ করো।

যন্ত্রচালিতের মতো আমিও একটা গ্লাস হাতে তুলে নিলাম। সামান্য মাথা নিচু করে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করলাম।

এরপর পরিচয়ের পালা। আমার নবজীবনের জন্মদাতা মিস্টার বড়ুয়া একের পর এক টেবিলের সামনে আমায় নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বড় বড় লোকেরা সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এসেছিলেন সাংবাদিকরা। মিস্টার বড়ুয়ার নিউ থিয়েটার্সের পুরনো বন্ধুরাও এসেছিলেন। যেমন বি এন সরকার, ছোটাই মিত্র, রাইচাঁদ বড়াল এবং আরও অনেকে। এতকাল এঁদের নামই শুনেছিলাম, কখনও চোখে দেখিনি। এইসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেমন আনন্দ পেলাম তেমনি নার্ভাসও হয়ে পড়ছিলাম। নিজের টেবিলে এসে যখন বসলাম তখন দেখলাম সামনের টেবিল থেকে জীবেন বসু মুচকি মুচকি হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। উনিও এই ছবির শিল্পী। ওঁর হাসি দেখে নার্ভাসনেসটা আরও বেড়ে গেল। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে টেবিলে রাখা ড্রিংকসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে লম্বা করে একটা চুমুক দিয়ে ফেললাম। একরাশ আগুনের হলকা যেন কণ্ঠনালী বেয়ে বুকটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর একটা স্পর্শ পেয়ে মুখ তুলে তাকালাম। পাশে দাঁড়িয়ে মিস্টার বড়ুয়া। তিনি একটু ঝুঁকে পড়ে চাপা কণ্ঠে বললেন : নো নো রবীন, নট সো কুইক্। আস্তে আস্তে সিপ্ করো। আই থিংক দিস ইজ ফার্স্ট টাইম ইন ইওর লাইফ।

হ্যাঁ, এমনি করেই আমার সুখ-দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন মিস্টার বড়ুয়া। কখনও শাসন করতেন, কখনও প্রশ্রয় দিতেন, কখনও তিরস্কার করতেন, কখনও বা অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল পিতার মতো, বন্ধুর মতো, শিক্ষকের মতো। পরে, অনেক পরে, আমার চিত্রজীবনে যখন মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তি, তখন একটা সময়ে আমি ভেসে গিয়েছিলাম ওই তরল পানীয়ের স্রোতে। তখন এক-একটা মুহূর্তে আমার মনে পড়ত মিস্টার বড়ুয়ার কথা, মনে পড়ত তাঁর সতর্কবাণী। কিন্তু তখন তো তিনি আর বেঁচে নেই। পরলোকের সেই প্রান্ত থেকে তাঁর হাত তো আমার কাঁধ স্পর্শ করতে পারত না। তা যদি পারত তবে আমার জীবন অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হত, আমার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। আবার ওই পার্টির কথাতেই ফিরে আসি।

পার্টি যখন ভাঙল তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। আমন্ত্রিতরা সকলেই প্রায় চলে গেছেন। মিস্টার বড়ুয়া বললেন : রবীন, আজ রাতে তোমার আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই। আমার সঙ্গে চলো, আমার বাড়িতেই থাকবে। তথাস্তু। মিস্টার বড়ুয়ার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে রাত কাটাতে গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা পার্টিতেই সারা হয়ে গিয়েছিল। শুতে যাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ মিস্টার বড়ুয়া আমার সঙ্গে গল্প করলেন। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে মিস্টার বড়ুয়ার এই প্রথম ছবি। সুতরাং এ ছবি নিয়ে অনেকের অনেক কৌতূহল ছিল। বিশেষ করে নতুন হিরো আর নতুন হিরোইন নিয়ে। আমি আর পদ্মা দেবী। তাছাড়া মিস্টার বড়ুয়া থাকছেন একটি সাইড রোলে। এই প্রথম তিনি একটি পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করলেন। দর্শকরা সেটা সহজভাবে মেনে নেবেন কিনা এ সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেরই সন্দেহ ছিল। মিস্টার বড়ুয়া নিজেও কিছুটা সন্দিহান ছিলেন ছবির শেষ দৃশ্যটি নিয়ে। পর পর তিনটি চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর আমি পাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি—এত বড় একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার দর্শকরা সহ্য করতে পারবেন কিনা এটা নিয়ে ভয়ানক ভয় ছিল।

সেদিন বিকেলে উত্তরা সিনেমায় ম্যাটিনি শো-এর শেষে দর্শকদের চিৎকারে প্রথমটায় আমরা সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ছিলাম ওপরে ব্যালকনিতে। ছবি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিচে থেকে চিৎকার ভেসে এলো : 'এ কী করলে বড়ুয়া!' চিৎকার শুনে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল আমার। ছবি যদি দর্শকের ভালো না লেগে থাকে তবে তো হয়েই গেল। আমার কেরিয়ারের ইতি। ছবির ওই তিনটি চিতার আগুনে আমার সব স্বপ্নও পুড়ে ছাই হয়ে গেল বোধহয়।

কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলাম দর্শকদের ওই চিৎকার তাঁদের স্বীকৃতিরই অভিব্যক্তি। আমাদের তাঁরা বাতিল করে দেননি। দুঃখটা বড় বেশি করে বুকে গিয়ে বেজেছে বলেই তাঁদের ওই আর্ত চিৎকার।

তারপর সে আর এক দৃশ্য। দর্শকরা কেমন করে জানি না খবর পেয়েছিলেন যে আমরা হলে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখবার জন্যে চিৎকার। মিস্টার বড়ুয়া এমনিতে খুব লাজুক ছিলেন।

তাঁর ছবির ট্রেড শো কিংবা প্রথম প্রদর্শনীতে তিনি কখনও আসতেন না। ছবি রিলিজের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যেতেন। কখনও কখনও ভারতবর্ষের বাইরেও। এই প্রথম তার ব্যতিক্রম। তার একটা কারণও ছিল। মুক্তির দিন পর্যন্ত এই ছবির কিছু কিছু দৃশ্য রি-টেক করা হয়েছে। এডিটিং শেষ হবার পর থেকে তিনি বার বার প্রোজেকশান দেখেছেন আর প্রতিবারই কিছু না কিছু খুঁত বার করে রি-টেক করেছেন। এমন কি ছবি যখন শুক্রবার দিন হলে চলছে সেদিনও তিনি একটি দৃশ্য রি-টেক করেছেন। সেদিন যে নার্ভের ওপর কী প্রেসার গেছে আমার।

রিলিজের আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে প্রোজেকশান দেখলাম। ছবি দেখার পর তিনি আমাকে, ক্যামেরাম্যানকে আর এডিটারকে ডেকে বললেন : কাল সকাল আটটায় স্টুডিওতে হাজির থাকবেন। পাঁচ নম্বর রিলের একটা সিন আমি রি-টেক করতে চাই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম : সে কী! কাল তো ছবি রিলিজ!

মিস্টার বড়ুয়া গম্ভীর হয়ে বললেন : সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়। যা বললাম মনে থাকে যেন। জাস্ট অ্যাট এইট—

এই বলে তিনি গট গট করে বেরিয়ে চলে গেলেন।

জানতাম মিস্টার বড়ুয়ার কথার ওপর কথা বলা চলে না। কিন্তু কী করে জানি না মুখ ফসকে বাক্যটি বেরিয়ে এসেছিল। একটা বিরাট রিস্ক নিতে যাচ্ছেন ভেবেই হয়তো কথাটা বলে ফেলেছিলাম। কী হবে জানি না বাবা!

পরদিন দৃশ্যটি নতুন করে টেক করা হল। আগের তোলা দৃশ্যের খুঁতটা কোথায় সেটা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিলেন মিস্টার বড়ুয়া। সত্যিই তো, এটা তো আমাদের কারও নজরে পড়েনি। বুঝলাম, ওঁর চোখ ঈগল পাখির চোখ।

মিস্টার বড়ুয়ার ছবিতে ক্যামেরাম্যান কিংবা এডিটার নামেই থাকতেন। যা করবার উনি নিজেই করতেন। দৃশ্যটি নতুন করে তোলা হল। ডেভেলপ করতে পাঠানো হল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মিস্টার বড়ুয়া নির্বিকার। একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। একটি সিগারেট আধখানা ছাই হবার আগেই ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরাচ্ছেন।

দৃশ্যটি এডিট করে যখন প্রিন্ট করা হচ্ছে তখন ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছি উত্তরায় ছবি শুরু হয়ে গেছে। পাঁচ নম্বর রিলটি বাদ দিয়েই ছবি পাঠানো হয়েছে সেখানে। যদি ঠিক সময়ে নতুন রিল গিয়ে না পৌঁছোয় কী হবে তাহলে? আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নিজের স্বার্থের কথাই বড় করে ভেবেছিলাম সেদিন। ছবির শো পণ্ড হলে আর কার কী ক্ষতি হতে পারে সেসব ভাবনা মাথায় আসেনি, নিজের কেরিয়ারের কতটা মারাত্মক ক্ষতি হবে আমার স্বার্থপর মন সেই চিন্তাই করেছিল সর্বাগ্রে।

কিন্তু না, আমার কেরিয়ার মাটি হবার কোনও সুযোগ দেননি মিস্টার বড়ুয়া। ধীরে সুস্থে সব কাজ সেরে পাঁচ নম্বর রিলটি এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছিলেন। গাড়ি স্টার্ট নেবার পর একবার শুধু হাতের ঘড়িটার দিকে দেখে নিয়ে ড্রাইভারকে বলেছিলেন : একটু জোরে চালিও। তারপর সিটের এক কোণে মাথা রেখে চোখ দুটি বুজেছিলেন। মনে হয় যেন একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। সারা পথ ওঁকে আর চোখ খুলতে দেখিনি। আমি কিন্তু অতটা নির্বিকার থাকতে পারিনি। সারাক্ষণ অস্বস্তিতে ছটফট করেছি।

উত্তরা সিনেমার প্রোজেকশান রুমে যখন পাঁচ নম্বর রিলটি গিয়ে পৌঁছল তখন পর্দায় চলছে চার নম্বর রিলের মাঝামাঝি অংশ। প্রোজেকশান রুমে দাঁড়িয়ে দু-একটা কী যেন নির্দেশ দিলেন মিস্টার বড়ুয়া। তারপর বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : রবীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে এবারে কিছুটা নিশ্চিন্ত করতে পেরেছি বোধহয়—অ্যাঁ—

উনি রসিকতার সুরে কথাটি বললেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমার স্বার্থচিন্তার কথাটা উনি ঠিকই বুঝে ফেলেছেন। ছি ছি ছি—কী লজ্জা, কী-লজ্জা!

এক মুহূর্ত পরে সেই লজ্জা থেকে উনিই বাঁচিয়েছিলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বুকের কাছে

একটু টেনে নিয়ে বলেছিলেন : ভয় কী, আমি তো আছি। চলো হলে গিয়ে বসা যাক।

এই কথা আর ওই ব্যবহারের পর আমার চোখ দুটি যে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সেকথা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। জলভরা চোখে অপাঙ্গে ওঁর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম, মানুষটি কত উঁচু। এই মানুষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কি কোনদিনই শোধ করা যাবে?

সেদিনের সেই ঘটনাটি বলতে বলতে দীর্ঘ চার দশক পরেও রবিদাব চোখ দুটি জলে ভরে এসেছিল। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করেছিলেন।

আমার বাড়িতে যে হেলান-চেয়ারটিতে বসে রবিদা তাঁর জীবনের নানা ঘটনার স্মৃতিচারণ করতেন, সেই চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে এখনও আমার মাঝে মাঝে দু'চোখ জলে ভরে আসে। রবিদা কতবড় গায়ক কিংবা কতবড় অভিনেতা ছিলেন সে সব চুলচেরা বিচার অন্য কেউ করে করুক, আমি করতে রাজি নই। আমি কেবল সেই প্রয়াত রুচিশীল হৃদয়বান মানুষটির উদ্দেশ্যে কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস আর দু ফোঁটা চোখের জল নিবেদন করতে পারি।

বড়ুয়া সাহেব

মহারানি প্রয়াত হয়েছেন। সারা প্রাসাদে শোকের ছায়া। খুব ধুমধাম সহকারে শ্রাদ্ধ হচ্ছে। মুণ্ডিত মস্তকে শ্রাদ্ধে বসেছেন মহারানির জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বাদশ পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করে চলেছেন ঊর্ধ্বতন পিতৃ ও মাতৃপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায়। এই শোকার্ত পরিমণ্ডলে রাজকুমারের ঈষৎ সজল চোখ দুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অদূরে উপবিষ্ট রয়েছেন মহারাজা স্বয়ং। তাঁর সারা মুখমণ্ডল শোকের ভারে থমথমে।

এমন সময় বাইরে রব উঠল 'বাঘ বেরিয়েছে! বাঘ বেরিয়েছে!'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিবেশটাই বদলে গেল। কোথায় রইল শ্রাদ্ধ আর কোথায় রইল মন্ত্রপাঠ। কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন সবাই। সকলের পুরোভাগে রয়েছেন মহারাজার মুণ্ডিতমস্তক জ্যেষ্ঠপুত্র।

কিছুক্ষণের জন্য শ্রাদ্ধকর্মের বিরতি। বাঘ মেরে ফিরে এসে আবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শুরু। আবার মন্ত্রপাঠ এবং পিণ্ডদান ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, শিকারটা এমনই একটা ব্যাপার ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গৌরীপুরের রাজপরিবারে, যে পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। বাংলা ছবির দর্শকদের অতি প্রিয় 'বড়ুয়া'। ফিল্ম ইনডাসট্রির দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'বড়ুয়া সাহেব'।

বড়ুয়া সাহেবের চলচ্চিত্র জীবনের পরিচয় দেবার আগে ওঁর বাল্যজীবনের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি।

গৌরীপুর রাজবাড়িতে একটা মজার ব্যাপার চালু ছিল। ওখানে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি শুরু হবার আগেই হত বন্দুকে হাতেখড়ি। ছ-সাত বছর বয়সের মধ্যে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে বন্দুক চালানো শিখতে হত। রাজারা বলতেন, লেখাপড়া শেখার দরকার তোমার নেই। তুমি রাজার ছেলে, নাম সই করতে পারার মতো বিদ্যে অর্জন করতে পারলেই যথেষ্ট। লেখাপড়া করবে তারা, যাদের চাকরি করে খেতে হবে। তুমি তো চাকরি দেবার মালিক, তোমার লেখাপড়া শেখার দরকার কী? বরং বন্দুক চালানো শেখো। কলম তোমাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। সেখানে বাঁচাবে বন্দুক। তাছাড়া তুমি আমাদের জঙ্গলের দেশের মানুষ। দিনেদুপুরে বাঘ গণ্ডার আর পাগলা হাতির সঙ্গে মোকাবিলা করে তোমাকে বাঁচতে হবে। অতএব বন্দুক তোমার জীবনে অপরিহার্য।

প্রমথেশচন্দ্রের পিতা রাজা প্রভাতচন্দ্রও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে লেখাপড়াটা বাদ দিয়ে নয়। দুটোই চাই। অতএব তিন রাজকুমার প্রমথেশ, প্রকৃতিশ ও প্রণবেশ এবং দুই রাজকুমারী নীহার ও নীলিমার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা হল। তবে স্কুলে নয়, বাড়িতে। একজন গার্জেন টিউটরের অধীনে। ওঁদের গার্জেন টিউটর ছিলেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব ধার্মিক মানুষ। বই খোলার আগেই কীর্তনের সুরে দেবদেবীর বন্দনা করিয়ে নিতেন সকাল-সন্ধে দুই বেলা। রবিবার পড়াশোনার ছুটি কিন্তু কীর্তনের ছুটি নেই। পাছে কুমার-কুমারীরা কীর্তনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন তাই রবিবারদিন ভিজে ছোলা, বাতাসা, গরম গরম জিলিপি ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। কড়া করে ভাজা গরম জিলিপির ওপর ছিল প্রমথেশচন্দ্রের দারুণ দুর্বলতা। সুতরাং রবিবারের কীর্তনের ক্লাস কামাই হত না বললেই চলে। এই যে নিয়মিত সংগীত শিক্ষা এটা প্রমথেশচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল।

গানের ব্যাপারে প্রমথেশচন্দ্রের একটি সহজাত দক্ষতা ছিল। তিনি পিয়ানো বাজাতেন অসাধারণ। এস্রাজেও রীতিমতো দখল ছিল তাঁর। রাজাবাহাদুর ডি পি নাইডু নামক একজন দক্ষিণী সংগীতকারকে ট্রেনার রেখেছিলেন ছেলেমেয়েদের এস্রাজ শেখানোর জন্য। তবে প্রমথেশের গলায় গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা অবাক হয়ে ভাবতেন, ভদ্রলোক গানের লাইনে গেলেন না কেন! সেখানেও তিনি অনেক উঁচুতে

উঠতে পারতেন।

এই গান গাওয়া নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে। সেটা অনেককাল পরের কথা। প্রমথেশ বড়ুয়া তখন নিউ থিয়েটার্সের একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফিল্ম ডিরেক্টর। সেই সময়ে ওঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে কী একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুন্দনলাল সায়গল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ বড় বড় গাইয়েরা গান গাইতে এসেছেন। ওঁদের গান শেষ হবার পর সকলে মিলে প্রমথেশকে ধরলেন একটি গান শোনানোর জন্যে।

এর আগে ওঁর গুনগুন করা গান অনেকে শুনেছেন। জানতেন গানে ওঁর জ্ঞান বেশ গভীর। বিখ্যাত সুরকার অনুপম ঘটক পরবর্তীকালে আমার কাছে বলেছিলেন, তাঁর সুর করা অনেক গানের মুখড়াটুকু প্রমথেশচন্দ্রের কাছ থেকেই পাওয়া। পরিচালক সুশীল মজুমদারও, যিনি একটা সময়ে প্রমথেশের সহকারি ছিলেন, তিনিও অনুপমবাবুর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। কিন্তু খোলা গলায় প্রমথেশের গান তখনও কেউ শোনেননি। অন্তত সেদিন যাঁরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রমথেশচন্দ্র ছিলেন একটু লাজুক প্রকৃতির। গানের প্রস্তাব শুনে তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন : মাফ করো ভাই, ওসব গান-টান আমার দ্বারা হবে না। এখানে বাঘা-বাঘা গাইয়ে বসে আছেন। তাঁদের সামনে গান! পাগল নাকি!

কিন্তু সকলে তখন নাছোড়বান্দা। অগত্যা হারমোনিয়ামের সামনে বসতে হল প্রমথেশচন্দ্রকে। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে তিনি ধরলেন রবীন্দ্রনাথের একখানি গান : 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ/আমার মন ভোলায় রে'।

চোখ বুজে গান গেয়ে চলেছেন প্রমথেশ, আর সবাই অবাক হয়ে শুনছে একটি আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে খেলা করছে কী অপূর্ব ভাবের ব্যঞ্জনা। গানের মধ্যে দিয়ে প্রমথেশ যেন তখন উধাও হয়ে গেছেন এই বালিগঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে, হয়তো তাঁর শৈশব আর কৈশোরের লীলাভূমি গৌরীপুরের সেই গদাধর নদীর তীরে, যেখান থেকে একখানি রাঙামাটির পথ এঁকে বেঁকে উধাও হয়ে গেছে কোন এক নাম না জানা স্বপ্নে দেখা গ্রামের দিকে। কিংবা লালমাটির যে পথটি পাহাড়ের বুক চিরে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে তাঁদের মাটিয়াবাগ প্যালেসের দিকে—হয়তো সেই পথটিই তখন ভাসছিল প্রমথেশের দুটি নিমীলিত চোখের সামনে।

গান শেষ হতেই সবার আগে ছুটে এসে প্রমথেশের দুখানা হাত জড়িয়ে ধরলেন সায়গল। বললেন : আহা, আহা! কী গানই না শোনালেন স্যার। মন ভরে গেল একেবারে। এমন একখানা কণ্ঠ নিয়ে আপনি চুপচাপ বসে আছেন, আর আমরা কোতো কম মশল্লা নিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রমথেশের তখন লজ্জায় সারা মুখ লাল। সায়গলের হাত ছাড়িয়ে এই ঘর থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচেন। তা এসব অনেক পরের কথা। তার আগে শিকারি প্রমথেশের কথাটা বলে নিই।

সন্তানদের শিকার-শিক্ষার ভার রাজা প্রভাতচন্দ্র নিজের হাতেই রেখেছিলেন। খুব দক্ষ শিকারি ছিলেন তিনি। ছেলে-মেয়েদের বন্দুক ছোড়ার কায়দাকানুন শিখিয়ে চাকর-বাকরদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তারা লক্ষ্যভেদের ট্রেনিং দিত। লক্ষ্যভেদ শুরু হত গাছের ফল দিয়ে। পরে উড়ন্ত পাখি। তারই সঙ্গে চলত ঘোড়ায় চড়া, গাছে চড়া, নৌকো চড়ার ট্রেনিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হত, বৃষ্টিতে ভেজানো হত। যাতে করে শিকারির উপযুক্ত শরীর তৈরি হয়। বছর আষ্টেক বয়স হলেই বার্ষিক শিকার উৎসবে যোগ দিতে নিয়ে যাওয়া হত। মুখ্য লক্ষ্য ছিল বাঘ শিকার। ছোটদের মন থেকে ভয় ভাঙাবার জন্য বড়রা গুলি করে বাঘের কোমর ভেঙে দিতেন, তারপর ছোটরা গুলি করে তার জীবনান্ত ঘটাত। যন্ত্রণাজর্জর ক্রুদ্ধ বাঘের সেই বীভৎস মুখ ও জ্বলন্ত চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে গুলি করানো হত, যাতে ভয়টা পুরোপুরি ভাঙে।

প্রমথেশ প্রথম বাঘ শিকার করেন তাঁর তেরো বছর বয়সে। ১৯০৩ সালের ২৪ অক্টোবর ওঁর জন্ম। কেউ কেউ বলেন উনি নাকি আরও দু বছর আগেই অর্থাৎ এগারো বছর বয়সে বাঘ শিকার করেন। কিন্তু ওঁর ছোট ভাই লালজির শিকারের খাতায় ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রমথেশচন্দ্রের প্রথম বাঘ শিকারের উল্লেখ আছে। তাহলে তো তেরো বছরই দাঁড়াচ্ছে।

এমনিতে শিকারে খুব উৎসাহ ছিল না প্রমথেশচন্দ্রের। মনটা ভয়ানক নরম ছিল তাঁর। তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া এবং কথা কাটাকাটিও হয়েছে। একবার তো ছেলের ওপর রাগ করে রাজাবাহাদুর বার্ষিক উৎসব অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসেন। পরে এক বছর প্রমথেশ বার্ষিক শিকার উৎসবে যোগ দিতে যাননি বলে সারা গৌরীপুরে ঢি ঢি পড়ে যায়। সেটা যেন সামাজিকতা ভ্রষ্ট হবার মতো একটা ব্যাপার।

এতদ্‌সত্ত্বেও প্রমথেশচন্দ্রের মোট শিকারের হিসাব হল : ৫৪টি রয়াল বেঙ্গল টাইগার, ২৩টি চিতা বাঘ, ১টি গণ্ডার। এছাড়া ভাল্লুক, হরিণ এবং অন্যান্য প্রাণী অগুন্‌তি। কিন্তু এই হিসাবটাও রাজবাড়ির অন্যান্য শিকারিদের অনুপাতে অনেক কম।

প্রমথেশ শিকার করতে যেতেন হাতিতে চড়ে। অন্যান্য শিকারিবাও তাই। হাতিগুলি ছিল ওয়েল-ট্রেন্‌ড। বাঘ থেকে কতখানি দূরত্বে এবং কী অবস্থায় দাঁড়ালে শিকারির সুবিধা হবে, এই হাতিগুলির সেসব বিষয়ে ছিল গভীর জ্ঞান। গুলি খাওয়া বাঘের শেষ নিঃশ্বাস পড়ত এইসব হাতির পায়ের চাপে। তারপর শুঁড়ে তুলে মরা বাঘটিকে নিয়ে বিজয়-উল্লাসে ফিরে আসত হস্তী মহারাজ। প্রত্যেকেই তাঁদের প্রিয় হাতি নিয়ে শিকারে যেতেন। প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রিয় হাতিটির নাম ছিল জংবাহাদুর। নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' ছবিতে ওই হাতিটিকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা গেছে।

এই শিকারেও একদিন বিতৃষ্ণা এসে গেল প্রমথেশের। সম্ভবত মা সরোজবালার নরম মনের প্রভাব পড়েছিল প্রমথেশের ওপর। রানি সরোজবালার পিতৃপুরুষ ছিলেন বৈষ্ণব। দলকুমার ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা শংকরদেবের বংশ তাঁদের। দয়া ক্ষমা সহনশীলতা ইত্যাদি বিশিষ্ট গুণগুলি প্রমথেশ মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সরোজবালা মাছ-মাংস বিশেষ পছন্দ করতেন না। প্রমথেশচন্দ্রও তাই। তাঁর খাবার তালিকা শুনলে অবাক হতে হয়। আট বছর বয়স পর্যন্ত কেবল দুধ খেয়েই কাটিয়েছেন। না, উনুনে জ্বাল দেওয়া দুধ নয়, গরুর বাঁট থেকে সদ্যদোয়া গরম দুধই ছিল তাঁর শিশুকালের খাদ্য। ন'বছর বয়সে প্রথম যেদিন ভাত খেলেন সেদিন সারা গৌরীপুরে আনন্দের ঘনঘটা। রাজপ্রাসাদে দীয়তাং ভুজ্যতাং।

ওই সময়ে প্রমথেশের খাদ্যতালিকায় ছিল ফ্যানফ্যানে গলা ভাত, সঙ্গে কড়া করে ভাজা আলু, কড়াইশুঁটি ও বাঁধাকপি সেদ্ধ এবং তাতে বেশ খানিকটা ঘানির সর্ষের তেল। ভাতের সঙ্গে 'তুলিয়া' লেবু থাকত। কিছুদিন পরে ভাতের সঙ্গে খেতেন ডাল, শাকভাজা এবং কড়া করে আলুভাজা। রাত্রে লুচির সঙ্গে ঠিক দু টুকরো মাংস। তাঁর আর একটি প্রিয় খাদ্য ছিল খিচুড়ি। মিষ্টির মধ্যে প্রিয় ছিল পিঠে আর কড়া করে ভাজা জিলিপি। সময় সময় মুড়ির সঙ্গে বাতাসাও খেতেন। তরুণ বয়সে যখন স্টেট থেকে মাসে আড়াই হাজার টাকা অ্যালাউনস পেতেন তখনও তাঁর ওই একই খাদ্য। তখনকার দিনের আড়াই হাজার টাকার দাম এখন কত হবে? প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার মতো। অত টাকা হাতে পেয়েও তিনি খাদ্যতালিকা বদলাননি কোনদিন। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে যখন অন্য ধরনের খাবার খেতেন তখনই তাঁর শরীর খারাপ করত। বিলেতটিলেত গেলে সেদ্ধ ভেজিটেবল আর স্যুপ খেয়েই কাটাতেন। বিলেত যাওয়া ছিল তাঁর কাছে নেশার মতো। সারা জীবনে মোট এগারোবার তিনি বিলেত গেছেন।

শিকারের ব্যাপারে বিতৃষ্ণা নিয়ে বাবার সঙ্গে প্রচণ্ড মনকষাকষি ঘটে গিয়েছিল প্রমথেশের। আসলে প্রমথেশের চরিত্রটাই ছিল অদ্ভুত। যখন যে জিনিসটা ধরতেন তার চূড়ান্ত সাফল্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি ছিল না। তারপর হঠাৎ দুম করে সে কাজটি ছেড়ে দিতেন। তাঁর মতি ছিল অত্যন্ত চঞ্চল। জীবনে তাঁর কোন স্থির লক্ষ্য ছিল না। সারা জীবনটাই ভয়ানক এলোমেলো ভাবে কাটিয়ে গেছেন তিনি। তার জন্য তাঁকে কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। সে কথায় পরে আসছি।

আশুতোষবাবুর তত্ত্বাবধানে বাড়িতে লেখাপড়া করার পর প্রমথেশকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় ক্লাস নাইনে। কিন্তু তিনি ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা কলকাতা থেকে দিতে পারেননি। দিয়েছিলেন গৌহাটি থেকে। পাস করার পর তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেটা ১৯১৮ সাল। তখন তাঁর পনেরো বছর বয়স।

১৯২৪ সালে প্রমথেশ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি এস সি পাস করেন।

তার আগে ১৯২১ সালে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল মাধুরী দেবীর সঙ্গে। মাধুরী দেবী কলকাতার মেয়ে। শ্যামবাজারের বিখ্যাত মিত্র বাড়িতে তাঁর পিত্রালয়। রানি সরোজবালা নিজে দেখে পছন্দ করেছিলেন তাঁকে।

বিয়ে সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র ধারণা তখন প্রমথেশের তৈরি হয়েছে। তাঁর মানসিকতাটা বরাবরই একটু রোম্যান্টিক। যাকে বিয়ে করব, তাকে ভালো করে জানব, বুঝব, তার সঙ্গে কিছুটা মনের ভাব বিনিময় হবে, তবেই না বিয়ে। বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির তরফ থেকে কোনও ভাবনা-চিন্তা শুরু হবার আগে থেকেই প্রমথেশ তাঁর জীবনসঙ্গিনীর খোঁজ করে বেড়াতেন। এ কাজে তাঁর একান্ত সহায়ক ছিলেন গৌরীপুরের বন্ধু এবং সম্পর্কিত আত্মীয় রবীন অধিকারি। প্রমথেশ গোপনে গোপনে সুন্দরী এবং গুণসম্পন্না মেয়েদের খোঁজ করতেন। খোঁজ পেলে বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে প্যালেসের প্যাডে পাত্রীপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হত। ছেলে এবং ছেলের বন্ধু অমুক দিন অমুক সময়ে মেয়ে দেখতে যাচ্ছে।

যথাদিনে যথাসময়ে মেয়ের বাড়িতে হাজির হতেন ওঁরা। রবীনবাবুকে একটু ভালো করে সাজগোজ করিয়ে দিতেন প্রমথেশ। তিনি পাত্রের প্রক্সি দেবেন। আর প্রমথেশ সাজতেন ছেলের বন্ধু। রবীনবাবু গিয়ে গো-বেচারার মতো চুপচাপ বসে থাকতেন আর প্রমথেশ বন্ধু সেজে খোলামেলা আলাপ করতেন মেয়ের সঙ্গে। সাহিত্য সংগীত ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে হত আলোচনা। এমনি করে তিন-চারটি মেয়ে দেখার পর এন্টালি অঞ্চলে একটি মেয়ে প্রমথেশের খুব পছন্দ হয়ে গেল। রবীনবাবুর মারফত বাবার কানে সে কথা তোলালেন। কিন্তু ততদিনে রানি সরোজবালা মাধুরী দেবীকে নির্বাচন করে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন। অগত্যা সব রোম্যান্টিসিজমের ইতি। মনটা খুঁত খুঁত করেছিল ঠিকই। তবে শুভদৃষ্টির সময় মাধুরী দেবীর চোখে চোখ রাখার পর সে খুঁতখুঁতানি যে উধাও হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন প্রমথেশ সেই মা মনে আঘাত পাবেন এটা ভেবেই তিনি তাঁর মায়ের আদেশ মান্য করে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। কিন্তু ওই বিয়ে যদি কোনও কারণে না হত তাহলে প্রমথেশের জীবন যে কোন্ খাতে বইত তা বলা যায় না। ওঁর পরবর্তী জীবনে যত বিপর্যয় এসেছে সেই সব মুহূর্তে এই সর্বংসহা মাধুরী দেবী যে কী মহত্ব কী উদারতা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। প্রমথেশ সারা জীবন তাঁকে দেবীর সম্মান দিয়ে গেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় থেকেই প্রমথেশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারের প্রতি আগ্রহী হন। থিয়েটার দেখা তাঁর নেশার মতো দাঁড়িয়ে যায়। শুধু দেখাই নয়, থিয়েটার করাও। না, কলকাতায় নয়, পরের বছর ছুটিতে গৌরীপুরে গিয়ে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে তিনি একটি নাটকের ক্লাব খুলে ফেলেন। নাম দেন গৌরীপুর ইয়ংমেন্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন।

এঁরা যে শুধু নাটক অভিনয় করতেন তাই নয়, সবরকম খেলাধূলা এবং সমাজসেবার কাজও এঁরা করতেন। খেলাধূলা বলতে ফুটবল আর ক্রিকেটই প্রধান। প্রমথেশচন্দ্র নিজে ভালো ফুটবল খেলতেন। একবার বোধহয় স্টেটকে রিপ্রেজেন্টও করেছেন। ক্রিকেট এবং বিলিয়ার্ড এই দুটো খেলাতেও তাঁর দারুণ দখল ছিল। গৌরীপুর প্যালেসের স্টাডিতে বিরাট বিলিয়ার্ড টেবলে স্টেটের গেস্ট হিসেবে যে সব সাহেবসুবো আসতেন তাঁরা অবাক হয়ে যেতেন প্রমথেশের খেলার ধরন দেখে।

সমাজসেবার নানা কাজে প্রমথেশ যে কী পরিমাণ আগ্রহী ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিই। গৌরীপুরের এক ভদ্রলোক, এক সময়ে তাঁর অবস্থা বেশ ভালোই ছিল, নানা বিপর্যয়ে পড়ে ভয়ানক দারিদ্রের মুখোমুখি হন। দুবেলা অন্ন জোটাই দায়। প্রমথেশচন্দ্র এগিয়ে এলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। ইচ্ছে করলেই তিনি বাবাকে বলে স্টেট থেকে তাঁদের একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। কিংবা নিজের অ্যালাউন্সের টাকা থেকে কিছু টাকা সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে প্রত্যেক রবিবার সকালে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা করে গোপনে সেই ভদ্রলোককে সাহায্য করতে লাগলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমত ক্লাবের ছেলেদের সমাজসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত গৌরীপুরের সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা। মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। যার ফলে স্টেটের কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব পাবার

পর তিনি একদিন রাজাবাহাদুরকে গিয়ে বলেন : এই কাবলিওলার কাজ আমি করতে পারব না। এর থেকে আমায় মুক্তি দাও।

রাজাবাহাদুর সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন পুত্রের দিকে। প্রশ্ন করেছিলেন : এটাকে কাবলিওলার কাজ বলছ কেন?

প্রমথেশ উত্তর দিলেন : নয়তো কি! খাজনা আদায় করব কার কাছ থেকে? যারা দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায় না, তারা খাজনা দেবে কোথা থেকে?

রাজাবাহাদুর বললেন : তা বললে তো চলবে না। খাজনা আদায় না হলে স্টেট চলবে কী করে?

প্রমথেশ বললেন : কী করে চলবে তা তোমরা জানো। আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

তা এসব অনেক পরের কথা। তখন তিনি বি এস সি পাস করে বেরিয়েছেন। তার আগে নাটকের কথাটা বলে নিই।

প্রমথেশ যে পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিলেন তার সুচনা কিন্তু নাট্যভিনয় থেকেই। ১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি গৌরীপুরে অন্তত ষোলখানি নাটকে অভিনয় করেছেন। সেগুলি হল 'খাসদখল', 'পরপারে,' 'চন্দ্রগুপ্ত', 'ইরানের রানি', 'সমাজ', 'দুর্গাদাস', 'বিরাজ বৌ', 'ফেলারামের স্বাদেশিকতা', 'ফুলশর', 'সিংহল বিজয়', 'নূরজাহান', 'প্রফুল্ল', 'বঙ্গনারী', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'কিন্নরী', এবং 'ষোড়শী'। এই সবগুলি নাটকের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন প্রমথেশ। পরিচালনার দায়িত্বও তাঁরই। ষোড়শী নাটকে তিনি করেছিলেন জীবানন্দ। কলকাতায় শিশিরকুমার ভাদুড়ি অভিনীত ওই চরিত্রটি প্রমথেশকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি সব মিলিয়ে এগারোবার ওই একখানি নাটকই দেখেন। পরবর্তীকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র অলকেশকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন : প্রতিভা যদি দেখতে চাও তো দেখে এসো শ্রীরঙ্গমে। শিশিরকুমারকে দেখলে বুঝতে পারবে প্রতিভা কাকে বলে।

যে মাকে এত ভালোবাসতেন প্রমথেশ সেই মা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন ১৯২৫ সালে। মায়ের মৃত্যুর পর বড় মনমরা হয়ে পড়লেন প্রমথেশ। কিছুই ভালো লাগছে না। কলকাতা তার উজ্জ্বলতা এবং উচ্ছলতা নিয়ে প্রমথেশকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। গৌরীপুর তার শান্ত প্রকৃতি এবং হিংস্র বন্যতা নিয়েও প্রমথেশের মনে শান্তি আনতে পারছে না। কী করবেন। অগত্যা বিলেত চলে গেলেন বেড়াতে।

সেটা ১৯২৬ সাল। ওই সময়ে বিলেতে থাকতে থাকতেই প্রমথেশচন্দ্র আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ওই খবর পাবার পর বিলেত থেকে ফিরে এলেন এবং সংবাদ পেলেন আসামের গভর্নর স্যার লরি হ্যামন্ড তাঁর খোঁজ করেছেন কয়েকবার।

স্যার লরি হ্যামন্ড ছিলেন প্রমথেশের পিতা রাজা প্রভাতচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর ধারণা ছিল প্রমথেশকে তিনি তাঁর সঙ্গে পাবেন। প্রমথেশের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি তাঁকে মন্ত্রিপদ গ্রহণে আহ্বান জানালেন। কিন্তু প্রমথেশ তখন রীতিমত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। কলকাতায় পড়াশোনার সময়েই তিনি কিছুটা রাজনৈতিক উত্তাপের চেহারা দেখেছেন। কলকাতা তখন ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন বাংলার জনপ্রিয়তম নেতা। তিনি স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন। আসামের রাজনীতিতে প্রমথেশ সেই স্বরাজ্য পার্টিতেই যোগ দিলেন। উনি হলেন অ্যাসেম্বলিতে পার্টির চিফ হুইপ।

প্রমথেশের এই সিদ্ধান্তে গভর্নর লরি হ্যামন্ড বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি রাজা প্রভাতচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন প্রমথেশের মত পরিবর্তন করাতে। কিন্তু রাজাবাহাদুর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্ণ দায়িত্ব প্রমথেশচন্দ্রের ওপরেই ছেড়ে দেন। উপরন্তু স্টেটের দেখাশোনার ভার তিনি এখন থেকে প্রমথেশের ওপরেই ছেড়ে দিলেন।

প্রমথেশচন্দ্র রাজনীতি করেছিলেন ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি আসামের রাজনীতিক্ষেত্রে বেশ কিছুটা আলোড়ন তুলেছিলেন। এই সময়কার তাঁর একটি বড় কাজ হল গোয়ালপাড়া প্রজাস্বত্ব আইনের পরিকল্পনা। কিন্তু রাজনীতি তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি দীর্ঘকাল। কারণ আর একটি ঘটনা তখন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ অন্য একটি জগতের সংস্পর্শে এসে পড়লেন।

সেই জগতটির নাম চলচ্চিত্র জগৎ। প্রমথেশের জীবনে সেই যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটে ১৯২৯ সালে।

প্রমথেশকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলেন দু'জন মানুষ। তাঁদের একজন হলেন পরিচালক-অভিনেতা ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি-জি) এবং অন্যজন হলেন সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অভিনেত্রী আইরিশ গ্যাসপার। সে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রমথেশ বড়ুয়ার যোগাযোগ একটা আকস্মিক ব্যাপার। ১৯২৯ সালে বাংলাদেশে তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। সেই সময় কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা হলেন ধীরেন গাঙ্গুলি ওরফে ডি-জি, দেবকীকুমার বসু, সাহিত্যিক দিনেশরঞ্জন দাস, রোটারিয়ান নীতীশ লাহিড়ি প্রভৃতি। এঁরা সবাই মিলে প্রতিষ্ঠা করেন বৃটিশ ডোমিনিয়ানস ফিল্ম কোম্পানি। ওঁদের প্রথম ছবি 'পঞ্চশর' পরিচালনা করেন দেবকী বসু। সেই ছবির একদিন শুটিং দেখতে গিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

কী এক সূত্রে প্রমথেশের সঙ্গে আলাপ হয় ধীরেন গাঙ্গুলির। তিনি প্রমথেশকে আমন্ত্রণ জানান দমদমের এক বাগানবাড়িতে ওঁদের ছবির শুটিং দেখতে।

তার আগে প্রমথেশ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অনেক থিয়েটার দেখেছেন। নিজেও নাটক-টাটক করেছেন। গান-বাজনা খেলাধুলোতেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কিন্তু ফিল্ম সম্পর্কে কোনও আগ্রহই ছিল না।

ধীরেনবাবুর শুটিং দেখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন প্রমথেশ। নির্ধারিত দিনে নিজের ক্যাডিলাকে চড়ে লোকেশানে হাজির হলেন তিনি। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন প্রমথেশের আবাল্য বন্ধু গৌরীপুরের নির্মল বরকাকতি। নির্মলবাবু তখন প্রমথেশের পার্শ্বচর এবং গাড়ির চালক দুই-ই।

সেদিন লোকেশান একটি দৃশ্য ছিল, নায়ক নায়িকাকে পাশে নিয়ে বন্দুক ছুঁড়বে। দৃশ্যটির রিহার্সাল দেওয়ানো হল। কিন্তু প্রমথেশ দেখলেন নায়ক ভদ্রলোক বন্দুকটা ঠিকভাবে ধরছেন না। ওভাবে কেউ বন্দুক ছোঁড়ে না। আর সে ভুলটা কেউ ধরিয়েও দিচ্ছেন না। থাকতে না পেরে প্রমথেশ শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন কথাটা। তখন তাঁর কাছেই প্রস্তাব দেওয়া হল : বন্দুক ছোঁড়ার দৃশ্যটায় আপনিই অভিনয় করে দিন।

অভিনয়! সর্বনাশ! প্রমথেশ বললেন : না না, ফিল্মে অভিনয় করা আমার দ্বারা হবে-টবে না।

দেবকীবাবু বললেন : অভিনয় আপনাকে করতে হবে না। আপনি শুধু বন্দুকটা ছুঁড়বেন। আমরা অন্যভাবে শটটা নেব। ছবিতে আপনার মুখ দেখা যাবে না—কাজেই সংকোচের কোন কারণ নেই।

তখন রাজি হলেন প্রমথেশ। ছবিতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হিসেবে ওই ঘটনাটিই চিহ্নিত হয়ে রইল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমথেশ ফিল্ম সম্পর্কে উৎসাহিত হলেন। কয়েকজন শিক্ষিত রুচিশীল যুবক। একটা নতুন মিডিয়াম। একটা কিছু সৃষ্টি করার ব্যাপারে সকলের এত উৎসাহ। সব মিলিয়ে প্রমথেশের মনে দাগ কাটল বেশ গভীর ভাবে।

ওঁকে উৎসাহিত দেখে ততোধিক উৎসাহিত হয়ে পড়লেন ডি-জি। একজন রাজকুমারের সহায়তা যদি পান তবে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানস ফিল্ম কোম্পানির ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। ওঁদের পরের ছবি 'টাকায় কি না হয়'—যার ইংরেজি নাম ছিল 'মানি মেক্‌স্ হোয়াট নট্'—তাতে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হলেন প্রমথেশ।

চরিত্রটা আর কিছু নয়, নায়িকা সবিতা দেবী, যাঁর আসল নাম ছিল মিস আইরিশ গ্যাসপার—তাঁকে নিয়ে মোটরে করে বেড়াতে বেড়াতে একটু অন্তরঙ্গ হবেন—ব্যস এইটুকুই মাত্র। প্রমথেশের ক্যাডিলাক গাড়িটিও ওই দৃশ্যে ব্যবহৃত হবে বলে ঠিক হল। গাড়ি ড্রাইভ করবেন নির্মল বরকাকতি।

তা সেই এক দিনের কাজ বাড়তে বাড়তে সাত দিনে গিয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। এ ছবি ধীরেন গাঙ্গুলি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন। ওই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকাটি কেন যে দিনের পর দিন বেড়ে চলল তা নির্মলবাবু কোনওদিনই বুঝে উঠতে পারেননি। তবে ড্রাইভারের আসনে বসে তিনি সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন যে, ছবির শুটিং ডেট যতই বাড়ছে মিস গ্যাসপারের সঙ্গে প্রমথেশের অন্তরঙ্গতা ততই বাড়ছে। অগত্যা নির্মলবাবু এ ব্যাপারে প্রমথেশচন্দ্রকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন।

সেই সাবধানতার ফলও ফলেছিল। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের পরের ছবি 'চরিত্রহীন'-এ সতীশের

ভূমিকা পেয়েও প্রমথেশ তা করেননি। কিরণময়ী করার কথা ছিল আইরিশ গ্যাসপারের। মিস গ্যাসপার ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের। তখনকার নির্বাক ছবির যুগে ওই সমাজের অনেক মহিলাই ছবিতে অভিনয় করতেন।

এই অভিনয় না করার একটা বড় কারণ সম্ভবত নির্মলবাবুর সাবধানবাণী। আরও একটা কারণ, ঠিক এই সময়েই প্রমথেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য ইউরোপ পাড়ি দেন ওই ১৯৩০ সালেই।

ইউরোপ চলে গেলেন প্রমথেশ, কিন্তু ফিল্মের ব্যাপারটা মাথা থেকে গেল না। ফিল্ম সম্পর্কে নানা আইডিয়া তখন তাঁর মাথার মধ্যে বুড়বুড়ি কাটছে। একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কী করবেন তখনও ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগেই তিনি খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানস ফিল্ম কোম্পানির অবস্থা ভালো নয়। দেবকী বসু ওঁদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপালও তাই। তাহলে নিজেদের একটা নতুন কোম্পানির পত্তন করলে ক্ষতি কী?

মাত্র কিছুদিনের আলাপ-পরিচয়ের পরই দেবকী বসুর মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভার আঁচ পেয়েছিলেন প্রমথেশ। দেবকী বসুও প্রমথেশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আগামী দিনের এক উজ্জ্বল প্রতিভাকে। সুতরাং এই দুই প্রতিভার মেলবন্ধন ঘটতে অসুবিধে হয়ন তেমনি। ইউরোপ যাত্রার পথে জাহাজে বসেই ফিল্মের ব্যাপারে দেবকীবাবুর সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ করেছিলেন প্রমথেশ।

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রমথেশ-প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ কলকাতার গীতা ভবনে রূপাঞ্জলি পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছিলাম। সেই সভায় দাঁড়িয়ে দেবকীবাবু সজল চোখে তাঁর ও প্রমথেশের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছিলেন। অনেক অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

আরও একজন সর্বক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করেছিলেন সেই সভায় বসে। তিনি সরযূবালা দেবী। সরযূ দেবী ছিলেন প্রমথেশের জীবনের নানা সুখ-দুঃখের সমব্যথী। সরযূ দেবীর সঙ্গে প্রমথেশের একটি আন্তরিক বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আমরণ সে সম্পর্ক বজায় ছিল। তাঁর অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা প্রমথেশ অকপটে সরযূ দেবীর কাছে জানাতেন। সরযূ দেবীও সমব্যথীর মতো তাঁর এই দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন।

প্রমথেশ ইউরোপ গেলেন চিকিৎসার জন্য, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল যে সুযোগ যদি পান তাহলে ওদেশে বসেই ফিল্ম সম্পর্কে হাতে-কলমে একটু শিক্ষা নেবেন। তা সে সুযোগও জুটে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ইউরোপ পরিভ্রমণ করছিলেন। প্রমথেশ তাঁকেই গিয়ে ধরলেন একটা পরিচয়পত্রের জন্য। প্রমথেশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলেন রবীন্দ্রনাথ। একটা পরিচয়পত্র লিখে দিলেন তাঁকে। সেই পত্র নিয়ে প্রমথেশ ফ্রান্সের কক্স স্টুডিওতে প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান মিঃ রোজার্সের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর অধীনে ফিল্মের চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে হাতে-কলমে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর প্রমথেশচন্দ্র নিজেকে পুরোপুরিভাবে চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন। ১৯৩১ সালের গোড়াতেই তিনি বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিট-এর প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে রইলেন পরিচালক দেবকী বসু এবং ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল। দেবকীবাবুর কাহিনী ও পরিচালনায় ওঁদের প্রথম ছবি 'অপরাধী'। ইউরোপ থেকে প্রমথেশচন্দ্র শিখে এসেছিলেন আর্টিফিশিয়াল লাইট বা কৃত্রিম আলোর ব্যবহার। এটিই প্রথম ছবি যাতে শিল্পীর মুখের ওপর রিফ্লেক্টার দিয়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে দৃশ্য গ্রহণ করা হল, সেই সঙ্গে ব্যবহৃত হল বৈদ্যুতিক আলোর ফ্লাডলাইট। 'অপরাধী' ছবিতে অভিনয় করলেন প্রমথেশ, রাধিকানন্দ মুখার্জি, শান্তি গুপ্তা, প্রভাবতী এবং আইরিশ গ্যাসপার। এই নির্বাক ছবিটি ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়।

এই কোম্পানির পরবর্তী ছবি 'একদা'। কাহিনী প্রমথেশ বড়ুয়ার। পরিচালক ছিলেন সুশীল মজুমদার। ১৯৩২ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। এই দুটি ছবিরই কিছু কিছু শুটিং হয় বড়ুয়া স্টুডিওতে।

মুলেন স্ট্রিটের বাড়ির বিস্তীর্ণ অংশ নিয়ে বড়ুয়া স্টুডিওর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রমথেশচন্দ্র চিরকালের

বেহিসেবী মানুষ। স্টুডিও তৈরিতে জলের মতো অর্থ ব্যয় হতে লাগল। সে টাকার কতটা কাজে আর কতটা অকাজে ব্যয় হল তার হিসেব কে রাখে! ওদিকে প্রমথেশচন্দ্র তাঁর সৃষ্টিকর্মে মশগুল। তিনি পরবর্তী ছবি 'অনাথ'-এর চিত্রনাট্য নিয়েই ব্যস্ত।

কিছুদিনের মধ্যেই অর্থের অনটন শুরু হয়ে গেল। স্টুডিও তৈরিতে যে টাকা খরচ হবার কথা তার দ্বিগুণ খরচ হয়ে গেছে। অবশেষে অর্থাভাবে স্টুডিওর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। স্টুডিও তৈরির অ্যাকাউন্টে যে টাকা রাজা বাহাদুরের কাছ থেকে এনেছিলেন তা যে কোথায় গেল তার খোঁজ পাওয়া গেল না। উল্টে ঘাড়ের উপর চেপে বসল বেশ কিছু টাকার দেনা। ওই দেনার দায়েই স্টুডিও বিক্রি হয়ে গেল।

রাজা প্রভাতচন্দ্রের টাকার অভাব ছিল না। গৌরীপুর এস্টেটের বার্ষিক আয় ন'লক্ষ টাকার মতো। তা সত্ত্বেও রাজাবাহাদুর কেন যে প্রমথেশকে স্টুডিওর ব্যাপারে আর টাকা দিলেন না সেটাও ভেবে দেখার মতো। অবশ্য স্টুডিও তৈরির শুরুতেই দেওয়ানজি রাজাবাহাদুরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তখন গৌরীপুর এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি একদা রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব বিখ্যাত কবি অমিয় চক্রবর্তীর পিতা। দেওয়ানের কাজে দ্বিজেশবাবু অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। রাজা প্রভাতচন্দ্র দ্বিজেশবাবুর উপর খুব নির্ভরশীল ছিলেন।

সেই দেওয়ানজির সতর্কবাণীও রাজাবাহাদুর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : আপনি আর সব ব্যাপারে হাত দেন ক্ষতি নেই, কিন্তু মণির (প্রমথেশচন্দ্রের ডাক নাম) ব্যাপারে হাত দেবেন না।

সেই রাজাবাহাদুরও শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বলা যায়, নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটা জিনিস স্থির বুঝেছিলেন, মণির দ্বারা আর যাই হোক ব্যবসা কোনওদিন হবে না। ওর টাকা পাঁচজনে লুটেপুটে খাবে। শেষ পর্যন্ত হয়েওছিল তাই।

প্রমথেশচন্দ্রও ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলেন। তাই একদিন দেওয়ানজিকে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন। স্টুডিওর ভাঙা ইট-কাঠগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে তাঁকে বললেন : যত তাড়াতাড়ি পারেন এগুলো এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান দেওয়ানজি। আমার স্বপ্নের ওই ভগ্নদশা আমি আর সহ্য করতে পারছি না—কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না!

বলতে বলতে বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা এক ঝলক কান্না লুকোবার জন্যেই যেন ঘরের মধ্যে ছুটে পালালেন বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত একটি মানুষ।

প্রমথেশের যখন এইরকম মানসিক অবস্থা, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল ক্ষিতি দেবীর। ক্ষিতির ভালো নাম ছিল রমলা। ওঁদের বাড়ি শিলং-এ। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে প্রমথেশদের পরিবারের খুবই হৃদ্যতা ছিল। দু'বাড়িতে আসা-যাওয়া লেগেই ছিল।

আগে যেটা নিছক পরিচয়, প্রমথেশ ও ক্ষিতির জীবনে সেটাই একদিন পরিণত হল ভালোবাসায়। আর সে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছিল একান্ত সংগোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

ব্যাপারটা যখন জানাজানি হল রাজা প্রভাতচন্দ্র স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হলেন। প্রথম কথা প্রমথেশ বিবাহিত। বাড়িতে লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো স্ত্রী। তার ওপর দু'টি ছেলে হয়েছে। এমতাবস্থায় আর একটি গোপন ভালোবাসার সংবাদ অভিভাবকদের ক্ষুব্ধ না করে পারে না।

কিন্তু প্রমথেশের দিক থেকেও একটা বক্তব্য ছিল। সেটা একদিন ছোটভাই লালজিকে বলেওছিলেন। লালজি একবার প্রমথেশকে প্রশ্ন করেছিলেন : দাদা, এই যে তোমার জীবনে মহিলাদের নিয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে, তাদের কেউ কেউ তোমাকে দিনের পর দিন যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে, সেটা তুমি সহ্য করো কী করে!

প্রমথেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন লালজির দিকে। তারপর বলেছিলেন : সবই আমার ভবিতব্য। তুমি বিশ্বাস করো লালজি, একজন কি দু'জন ছাড়া আমি কোনও মহিলার দিকে এগিয়ে যাইনি। তারা যদি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তবে আমি কী করতে পারি বলো। আমিও তো একটা মানুষ। কতক্ষণ সেই আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করব।

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিলেন : তবে একটা কথা তোমায় জানাচ্ছি যে, যদি কোনও মহিলার সঙ্গে আমার কখনও দৈহিক সংযোগ ঘটে তবে তার পরবর্তী সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করার

জন্যে আমি তৈরি থাকি। তুমি তো জানো আমি জীবনে কাউকে ঠকাইনি, ঠকাতে পারি না, ঠকাতে পারবও না। তাতে আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক।

কথাটা সর্বাংশে সত্য। পিতামাতার দেওয়া বিবাহ ছাড়াও প্রমথেশ আরও দুটি বিয়ে করেছিলেন। এবং তাঁদের দুজনকেই তিনি সামাজিক মর্যাদা দিয়েছেন। দিয়েছেন প্রচুরতর আর্থিক নিশ্চয়তা।

যাই হোক, ক্ষিতির ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম। একটু জটিল। প্রমথেশের হাজারো নিষেধ সত্ত্বেও ক্ষিতি প্রমথেশকে তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান সম্বল করে কলকাতা চলে এসেছিলেন। প্রমথেশ অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে ফেরত পাঠাতে। অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষিতি নাছোড়বান্দা। তিনি প্রমথেশের দুটি হাত ধরে সজল চোখে বলেছিলেন : আমি আর কিছু জানি না, কিছু জানতে চাই না, কেবল তোমাকেই জানি। তুমি যদি আশ্রয় না দাও তবে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, কিন্তু বাড়ি আর ফিরতে পারব না।

অতএব ক্ষিতিকে আশ্রয় দিতেই হল। এ ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ হই-চই হল গৌরীপুরে। পরিবারের সকলের মাথা হেঁট। রাজাবাহাদুর হলেন ক্রোধে অগ্নিশর্মা। হয়তো এই ঘটনা নিয়ে কিছু উত্তপ্ত বাক্য অথবা পত্র বিনিময় হয়েছিল পিতা ও পুত্রের মধ্যে। পিতা যেমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পুত্রও তো তাই। এবং প্রচণ্ড অভিমানীও বটে। সেই অভিমানেব বশেই তিনি আর গৌরীপুরমুখো হলেন না। ঠিক করলেন গৌরীপুর এস্টেট থেকে একটি কপর্দকও গ্রহণ করবেন না।

এই ঘটনার ফলেই হয়তো পরে রটিত হয়েছিল যে প্রমথেশচন্দ্র পিতার ত্যাজ্যপুত্র হযেছিলেন। সংবাদটি ঠিক নয়। রাজা প্রভাতচন্দ্র যতই ক্রুদ্ধ হয়ে থাকুন না কেন তাঁর অতি আদরের জ্যেষ্ঠপুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করবার মতো নীচতা তাঁর ছিল না। এবং তাঁর মতো একজন স্নেহপরায়ণ পিতার পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না।

এসব ঘটনা এবং প্রমথেশ ও ক্ষিতির দাম্পত্যজীবনের নানা ঘটনা আমি সরযূ দেবীর মুখ থেকে শুনেছি। সেসব ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। বিশেষ করে ক্ষিতির প্রমথেশকে ছেড়ে চলে যাওয়া এবং অবশেষে মৃত্যু। কিন্তু সেসব আলোচনার ক্ষেত্র এই রচনা নয়।

ক্ষিতিকে নিয়ে গৌরীপুবের সঙ্গে প্রমথেশের যে মান-অভিমানের পালা চলছিল সেটা কিছুদিনের মধ্যে মিটে গেল। মানসিকভাবে একটু স্থিত হয়ে প্রমথেশ নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিলেন ১৯৩৩ সালে। নিউ থিয়েটার্সে তাঁর প্রথম ছবি 'রূপলেখা'। প্রমথেশের তোলা এটিই প্রথম সবাক-চিত্র। এই ছবিতেই যমুনা দেবী প্রথম অভিনয় করেন।

যমুনা দেবীর সঙ্গে প্রমথেশচন্দ্রের পরিচয় হবার পর তিনিই ওঁকে প্রথমে অভিনেত্রী হিসেবে তৈরি করেন এবং পরে জীবনসঙ্গিনী করে নেন। যমুনাদেবীর দিদির সঙ্গে প্রমথেশের পরিচয় ছিল। তিনিও তাঁর দু-একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

রূপলেখার পর প্রমথেশ হাত দিলেন 'দেবদাস' ছবির কাজে। ১৯৩৫ সালে। এই ছবিতেই বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা কে এল সায়গল প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এই শরৎ-কাহিনীর চিত্ররূপায়ণ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। দেবদাসের চরিত্রে পরবর্তীকালে আরও অনেকে অভিনয় করেছেন কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়াকে কেউই অতিক্রম করে যেতে পারেননি। আমার পরিচিত এক প্রযোজক একবার উত্তমকুমারকে ওই রোলটি করবার জন্য অফার দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তমকুমারের মতো অতবড় অভিনেতাও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন : পাগল হয়েছেন! ওই রোলে বড়ুয়াসাহেব যা করে গেছেন তার পরে আর কারও ওই রোল করার কথা ভাবাই উচিত নয়।

১৯৩৬ সালে প্রমথেশ দুখানি ছবি করেন। 'গৃহদাহ' এবং 'মায়া'। দুটি ছবিই দর্শকের কাছে গৃহীত হয়। এরপরেই তিনি হাত দেন 'মুক্তি' ছবির কাজে। গতানুগতিকতার পথে না গিয়ে এই ছবিটি তিনি একটু অন্যভাবে করতে চেয়েছিলেন। করেওছিলেন তাই। এই ছবিতেই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হয়। ছবির নামকরণও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'মুক্তির' পর প্রমথেশ হাত দেন 'অধিকার' ছবির কাজে। এটি একেবারেই অন্য ধরনের ছবি। বলা যায় ওটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। আজ আমরা যে ধরনের ছবি নিয়ে গর্ববোধ এবং মাতামাতি করি,

প্রমথেশ তেমন ছবির জন্ম দিয়ে গেছেন সেই ১৯৩৯ সালেই।

তারপর 'রজত জয়ন্তী'। মাত্র কুড়ি-একুশ দিনে তোলা একটি হাসির ছবি—যা আজও শ্রেষ্ঠ হাসির ছবির মর্যাদা পেয়ে আসছে। প্রমথেশ যে কত বড় প্রতিভা ছিলেন তা তাঁর ওই সময়কার ছবিগুলি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায়। বড় দুঃখ হয় যখন দেখি আজ আমরা অনেকেই তাঁকে ভুলে যেতে বসেছি।

ওইসব বাংলা ছবির পাশাপাশি কয়েকটি হিন্দি ছবিও নিউ থিয়েটার্সের হয়ে করেন প্রথমেশ। এবং ওই ১৯৩৯ সালেই তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ হয় নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে।

১৯৪০ সালে প্রমথেশ কৃষিণ মুভিটোনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন 'শাপমুক্তি' ছবি পরিচালনার জন্য। এই ছবিতে তিনি একেবারে নতুন দুই শিল্পীকে সুযোগ দেন নায়ক-নায়িকার চবিত্রে যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলা ছবির দুই জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁরা হলেন রবীন মজুমদার ও পদ্মাদেবী। ছবি শেষ করেছিলেন পর পর তিনটি চিতা জ্বালিয়ে। এই দুঃসাহস আর কোনও পরিচালক দেখাতে পেরেছেন বলে শুনিনি। প্রমথেশ নিজে একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন। ছবিটি দারুণ জনপ্রিয় হয়।

১৯৪০ সালের শেষাশেষি প্রমথেশ বড়ুয়া মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে এম পি প্রোডাকসন্সের পত্তন করেন। এখানে তাঁর প্রথম ছবি 'মায়ের প্রাণ'—যার নায়িকা ছিলেন তৎকালীন মঞ্চসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী।

১৯৪১ সালে কবলেন 'উত্তরায়ণ'। একেবারে অন্য ধরনের ছবি। নায়িকা ছিলেন যমুনা দেবী। পরের ছবি 'শেষ উত্তর' ১৯৪২ সালে। প্রধান ভূমিকায় তখনকার দিনের টপ গ্ল্যামার প্রমথেশ বড়ুয়া এবং কাননদেবী। ছবি সুপার হিট। ওই সাফল্যের ভিত্তিতেই ছবিটি হিন্দিতে করেন। নাম 'জবাব'। এবং তারপরই এম পি প্রোডাকসন্সের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ।

রাজা প্রভাতচন্দ্র ঠিকই ধরেছিলেন যে প্রমথেশের দ্বারা ব্যবসা হবার নয়। এম পি-র ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। ব্যবসার টেমপারামেন্টের সঙ্গে আর্টিস্টের টেমপারামেন্ট বোধহয় কিছুতেই মেলে না। মিলতে পারে না।

এরপর পুরো দুটি বছর প্রমথেশ বড়ুয়ার নতুন কোনও ছবি দেখা যায়নি কলকাতার বাজারে। ১৯৪৪ সালে আবার তাঁর তোলা ছবি মুক্তি পেল। নাম 'চাঁদের কলঙ্ক'। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর কারনানিরা বাংলা এবং হিন্দি দুই ভাষাতেই তাঁকে দিয়ে ছবিটি করিয়েছিলেন। হিন্দি সংস্করণের নাম 'সুবে সাম'।

১৯৪৫ সালে রাজা প্রভাতচন্দ্র মারা গেলেন। এস্টেটের দায়িত্ব নেবার ডাক পড়ল প্রমথেশের। কিন্তু তিনি তখন শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ভয়ানক ক্লান্ত। তাছাড়া ও কাজটাকে তিনি কাবুলিওয়ালার কাজ মনে করতেন। তাঁরই নির্দেশমতো তাঁর ছোট ভাই প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া অর্থাৎ লালজি জমিদারি দেখাশোনা করতে লাগলেন।

১৯৪৫ সালে প্রমথেশ একখানি হিন্দি ছবি তোলেন। সেটির নাম 'আমিরি'। তার আগে 'রানী' নামে একটি হিন্দি ছবি করেছিলেন। আমিরির পর করলেন 'অগ্রগামী'। প্রধান ভূমিকায় প্রমথেশ আর অঞ্জলি দেবী। এরপর তাঁর শেষ ছবি 'মায়াকানন' যেটি আর তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। বিভূতি চক্রবর্তী এবং তাঁর অন্যান্য সহকারীরা মিলে ছবিটি শেষ করেন। কিছু কিছু দৃশ্যে প্রমথেশের ডামি ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেটি করেছিলেন অবনী মজুমদার।

প্রমথেশের শেষ জীবনটা বড়ই দুঃখে কেটেছে। আর্থিক কষ্ট ছিল দারুণ। তার চেয়েও বেশি ছিল রোগের যন্ত্রণা। এখানকার ডাক্তাররা ওই সময় সন্দেহ করেন তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য ১৯৪৮ সালে যমুনা দেবীকে নিয়ে সুইজারল্যান্ড গেলেন। সেখানকার ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানালেন ওঁর যক্ষ্মা হয়নি। তবে রক্তাল্পতা এবং অন্যান্য রোগ কিছু কিছু আছে। উপযুক্ত চিকিৎসা হলে জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই।

ফেরবার পথে বড়ুয়া সাহেব লন্ডন হয়ে আসেন। সেখানে এ জে আর্থার র‍্যাংক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ভারতে যুগ্মভাবে ছবি প্রযোজনার ব্যাপারে। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র। তাই নিয়ে এখানে ভারত সরকারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন। কিন্তু এ উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

এসব তথ্য আমি বড়ুয়া সাহেবের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম। লন্ডন থেকে ফিরে তিনি

সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর বাড়িতে। আমি তখনও পুরোপুরি সাংবাদিক হইনি। বলা যায় হবু সাংবাদিক। ওই একবারই আমি বড়ুয়া সাহেবের মুখোমুখি হয়েছিলাম। ওই প্রথম, ওই শেষ। তাঁর সেদিনের সেই উচ্ছল চঞ্চল মূর্তিটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসে।

১৯৫১ সালে বড়ুয়া সাহেবের রোগযন্ত্রণা আরও বাড়ল। অসুস্থতা নামক বস্তুটি তার আগে তিন-চার বছর তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। রোগযন্ত্রণা বেশি বাড়তে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আর একবার বিলেত গেলেন। এইবার নিয়ে এগারো বার। কেউ কেউ বলেন, না অতবার নয়, সাতবার তিনি বিলেতে গেছেন। যাক, ও তর্কে গিয়ে লাভ নেই।

তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। ১৯৫১ সালের ২৯ নভেম্বর। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। বিকেল চারটের মধ্যেই সব শেষ। একটি দুরন্ত মানুষ এবং দুর্দান্ত প্রতিভার চিরকালের মতো ইতি।

আর ইতির পরেই তো শুরু হয় ইতিহাস। প্রমথেশ বড়ুয়াও এখন একটি ইতিহাস। বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

পঙ্কজদা

সেটা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি একটা সময়। সারা পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ এবং পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপার নিয়ে ডাঃ বিধান রায়ের সরকার তখন নাজেহাল। এখানকার বামপন্থী মহল তখন মানুষের বিক্ষুব্ধ মানসিকতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাইছে। ছোটবড় নানা কারণে থেকে থেকেই ধর্মঘট ডাকা হচ্ছে। এখানে ওখানে প্রায়শই বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটছে।

তেমনই একদিন দুপুরে এক ভদ্রলোক রসা রোড ধরে টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছেন নিজেই গাড়ি চালিয়ে। তাঁর সারা মনে দুর্ভাবনা। কপালে চিন্তার বলিরেখা। একটু আগেই টেলিফোনে খবর পেয়েছেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুমূর্ষু অবস্থা। প্রলাপের ঘোরে বার বার তাঁর নাম ধরেই খুঁজছেন।

খবরটা পাবার পরই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। দ্বিপ্রাহরিক আহারটাও সারা হয়নি। খানিকটা পথ এগোবার পর বুঝতে পারলেন গাড়ি নিয়ে বেরনোটা উচিত হয়নি। রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই। মধ্যে মধ্যে দু-একটা জালঢাকা পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। ভাঙা ইটের টুকরো পথের উপর ইতস্তত ছড়ানো। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা।

টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছাকাছি হতেই কিছু মানুষ তাঁর গাড়ি আটকাল। বলল : আপনার লজ্জা করে না! আজকের দিনে গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন! যান, ফিরে যান।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন : কী ব্যাপার ভাই, কী হয়েছে কী?

একজন উদ্ধতভাবে জবাব দিলেন : কী হয়েছে সারা শহরের লোক জানে আর আপনি জানেন না! আজ সকালে ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। একজন ছাত্র মারা গেছে। সারা শহরে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে ফিরে যান। নাহলে একটা অঘটন ঘটে যাবে।

ভদ্রলোক বললেন : বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানতাম না। আমার এক বন্ধু ডেথ-বেডে। তার কাছে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার। আপনারা প্লিজ আমায় ছেড়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি তেমন কিছু না ঘটলে আমি ওখানে গিয়ে গাড়ি রেখে দেব। ফেরার সময় পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরব।

সমবেত জনতার মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক বললেন : আপনার অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি। আমরা না হয় আপনাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু অন্য জায়গায় গাড়ি আটকালে তারা কি ছাড়বে?

ভদ্রলোক বললেন : তাঁদের কাছেও এইভাবেই অনুরোধ করব। আমার অবস্থাটা তাঁরাও নিশ্চয়ই বুঝবেন। আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন।

কিন্তু ভদ্রলোকের এই আশা যে ভুল তার প্রমাণ পেলেন টালিগঞ্জের মোড়ে এসে। এখানে যারা তাঁর গাড়ি আটকাল তারা রীতিমত মারমুখি। গাড়ি ঘিরে ধরে অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগল তাঁর উদ্দেশ্যে। একজন তো ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলেই উঠল : অত কথার দরকার কী! লোকটাকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে গাড়িটা জ্বালিয়ে দে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি যুবক প্রস্তাবটি কার্যকর করবার জন্য এগিয়ে এল স্টিয়ারিং-এ বসা ভদ্রলোকের দিকে। তারপর হঠাৎ যেন তড়িতাহতের মতো দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠল : আরে, এ যে পঙ্কজ মল্লিক।

সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে আওয়াজ উঠল : কই, কই, কোথায় পঙ্কজ মল্লিক? দেখি দেখি।

বলতে বলতে ভিড়টা প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল গাড়ির ওপরে। তারপর সমস্বরে আওয়াজ উঠল : গান শোনান, গান শোনান। আমাদের গান শোনাতে হবে। তবেই ছাড়ান পাবেন।

পঙ্কজবাবু বললেন : তা কী করে সম্ভব! শুনলেন তো আমি আমার মুমূর্ষু বন্ধুকে দেখতে যাচ্ছি। আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে গলা দিয়ে গান বেরোবেই না।

জনতার মধ্যে থেকে চিৎকার উঠল : ওসব কোনও কথা শুনতে চাই না। আমাদের গান শোনাতেই হবে। নইলে গাড়ি জ্বলে যাবে।

ওদের চিৎকার শুনে রাগে পঙ্কজবাবুর চোখ-মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত অন্তরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গাড়ির দরজা খুলে জনতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। সারা শরীর তখন ঘৃণায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে গেয়ে উঠলেন : 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব/ঘোর কুটিল পন্থ তারি লোভ জটিল বন্ধ।'

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত মানুষ ছিল। ছাত্রও ছিল অনেক। এই গানের মর্মার্থ তাদের অজানা নয়। আস্তে আস্তে তাদের মাথা হেঁট হয়ে এল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। গান শেষ করে পঙ্কজবাবু একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর গাড়িতে বসে স্টার্ট দিয়ে ফুল স্পিডে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনাটা আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে আমি পঙ্কজদার সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের বাড়িতে বসে শুনেছিলাম। ওই সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় আমি পঙ্কজদা সম্পর্কে একটা বড় লেখা লিখেছিলাম। তারই তথ্য সংগ্রহের জন্য মাস তিনেক ওঁর সঙ্গে আমায় নিয়মিত বসতে হয়েছিল। তার আগে পঙ্কজদার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। কিন্তু এত কাছে থেকে এমন গভীরভাবে তাঁকে অবলোকন করবার সুযোগ হয়নি। সেই সময়ে দেখেছিলাম আপাতশান্ত এই মানুষটির ভেতরকার অগ্নিময় রূপ।

ঘটনাটা শোনার পর পঙ্কজদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা পঙ্কজদা, আপনি তো পরম ঈশ্বর বিশ্বাসী। মনেপ্রাণে বৈষ্ণব। আপনাকে সেদিন ওই আনরুলি মবের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস কে যুগিয়েছিলেন? সে কি আপনার ঈশ্বর?

পঙ্কজদা শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন : না, সেদিন সেই মুহূর্তে আমার ঈশ্বরের কথা মনে পড়েনি। • আমাকে শক্তি যুগিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : রবীন্দ্রনাথ?

পঙ্কজদা বলেছিলেন : হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ওই 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটিই আমার সাহস যুগিয়েছিল।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গান ছিল পঙ্কজদার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। রবীন্দ্রসংগীত যে তাঁর মারফতই জনপ্রিয়তা পায় সে কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। রবীন্দ্রসংগীত যখন ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন তিনিই তাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জনগণের দরবারে। বাংলা ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার প্রথম তাঁর দ্বারাই হয। সে এক বিচিত্র ঘটনা। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে পঙ্কজদার প্রথম জীবনের কথা একটু বলে নিই।

পঙ্কজদার জন্ম ১৯০৫ সালে উত্তর কলকাতার চালতাবাগান অঞ্চলে। এখন যেখানে বিবেকানন্দ রোড এবং আমহার্স্ট স্ট্রিট (বর্তমানে রামমোহন সরণি) মুখোমুখি হয়েছে সেইখানে ছিল পঙ্কজদাদের বাড়ি। বাবার নাম মণিমোহন মল্লিক। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। বাড়িতে ছিল জগন্নাথদেবের বিগ্রহ। সেই উপলক্ষে বারো মাসে তেরো পার্বণ। সেইসব উৎসবে বসত গানের আসর। শ্রুতিধর পঙ্কজকুমার সেই সব গান নিজের কণ্ঠে তুলে নিতেন। এইভাবেই তাঁর গান গাওয়া শুরু।

পঙ্কজদা আনুষ্ঠানিকভাবে গান শেখা শুরু করেন বৌবাজারে দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর ক্ষেত্রমোহন সংগীত শিক্ষায়তনে। পরে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শেখেন। শুধু গান শেখাই নয়, রবীন্দ্রনাথের গান কীভাবে শেখাতে হয় সে বিদ্যাটিও দিনুবাবুর কাছ থেকেই আয়ত্ত করেন পঙ্কজদা। পরবর্তীকালে যখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সংগীত শিক্ষার আসরে প্রবর্তন করেন তখন তাঁর এই অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে লেগেছিল। বস্তুত এই সংগীত শিক্ষার আসরের মাধ্যমেই রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এসব অনেক পরের ঘটনা। তার আগে ১৯২১-২২ সালে পঙ্কজদা যখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়ছেন তখন থেকেই বিভিন্ন ফাংশানে গান গাইতে থাকেন। ওই সময় থেকেই পঙ্কজদা আরও একটি বিচিত্র কাজ করতেন। বিভিন্ন কবির প্রকাশিত কবিতায় নিজে সুরারোপ করে ফাংশানে ফাংশানে

গাইতেন। ওই করতে করতে একদিন হিমালয়ের চূড়োতে হাত দিয়ে ফেললেন। সেই ঘটনার কথা পঙ্কজদার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক। ব্যাপারটা জমবে তাহলে।

পঙ্কজদা বললেন, 'একদিন একটা কাণ্ড করে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা নজরে এল, যার আরম্ভটা হচ্ছে 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ওই ছায়া/ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ'। কবিতাটি সত্যিই কাজ ভুলিয়ে দিল আমার। ভাবলাম, এটার নিশ্চয়ই সুর করা আছে। বেশ ভালো গান তো। ওটা গাইতে হবে। কিন্তু স্বরলিপির রাজত্ব তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ও-গানের কোন হদিস পেলাম না। অথচ গানটি না গাইলেই নয়।

পুরনো অভ্যেস অনুযায়ী একদিন সুর করতে বসে গেলাম কবিতাটির এবং একটা সুরও করে ফেললাম। আজ ভাবলে হাসি পায় কী বালখিল্য ব্যাপারই না করেছি। কবিতাটির সময়কাল সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু আমি তাতে সুর বসিয়ে দিলাম প্রভাতী রাগের।

সুরটা করে নিজেরই খুব ভালো লেগে গেল। গানটা তুলে নিয়ে বেশ দরদ দিয়ে গাইতে লাগলাম এখানে ওখানে। শ্রোতারাও খুব তারিফ করতে লাগলেন। বস্তুত এই গানটিকে কেন্দ্র করেই আমার একটু-আধটু খ্যাতি রটে গেল গাইয়ে হিসেবে।

এমন সময় একদিন সকালে আমাদের বাড়ির কড়া নেড়ে এক ভদ্রলোক জানিয়ে গেলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। উনি আমায় ঠাকুরবাড়িতে ডেকেছেন।

খবরটা পাবার পরই আমার বুকের মধ্যে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি—সে তো আমার কল্পনার জগতে এক রূপকথার সাম্রাজ্য—যেখানে অধিষ্ঠান করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেখান থেকে এমন অযাচিত আমন্ত্রণ আসবে এটা কল্পনাও করতে পারিনি।

কিন্তু এটা আমন্ত্রণ না অন্য কিছু? এটা আদালতের সমনের মতো ব্যাপার নয় তো? যাই হোক, যা থাকে ভাগ্যে। ডেকে যখন পাঠিয়েছেন তখন যেতে তো হবেই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে খবর নিয়ে জানলাম রথীন্দ্রবাবু ওপরে দোতলার হলঘরে আছেন। সিঁড়ি ভেঙে হলঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুকে প্রচণ্ড কাঁপুনি। দেখলাম একজন গৌরবর্ণ সুদর্শন ভদ্রলোক একটি চেয়ারে বসে কী যেন পড়ছেন। আমি একটু গলা খাঁকারি দিলাম। মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলেন : কাকে চাই?

বললাম : রথীন্দ্রবাবুকে।

—আমিই, বলুন।

—আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

—আমি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—মানে—আমার নাম পঙ্কজকুমার মল্লিক।

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। আপ—মানে তুমিই পঙ্কজ—বসো বসো।

আমি বসলাম। উনি বললেন : তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম একটা কারণে। তুমি নাকি বাবামশাইয়ের কী একটা ছায়া ছায়া গান গেয়ে থাকো?

আমি বললাম : ছায়া ছায়া গান? আজ্ঞে ঠিক বুঝতে পারছি না তো। কী যেন গানটা—সবাই বলছে—

রথীবাবু বললেন : বুঝতে তো আমিও পারছি না।

এমন সময় তাঁর নজর গেল বারান্দার দিকে। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। উনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন : রমা, শোনো।

ওঁর ডাকে ঘরে ঢুকলেন এক সুদর্শনা সুবেশা তরুণী। অভিজাত্যের ঝলক সর্বাঙ্গে। আমায় দেখিয়ে রথীবাবু বললেন : এরই নাম পঙ্কজ মল্লিক। সেদিন যে গানটার কথা হচ্ছিল সেটা কী যেন—

রমাদেবী বললেন : দিনের শেষে ঘুমের দেশে।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরটিও ভারি মিষ্টি। সেদিন জানতে পারিনি, পরে জেনেছিলাম উনি সৌম্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের বোন।

রথীবাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ। দিনের শেষে ঘুমের দেশে। ওই গানটা তুমি গাও?

বুঝলাম লুকিয়ে লাভ নেই। এঁরা পাকা খবরই পেয়েছেন। তা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সংকুচিতভাবে বললাম : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রথীবাবু বললেন : গানটা তুমি কোথায় পেলে?

আত্মরক্ষার জন্যে এবরে একটা মিথ্যা কথা বললাম। গানটার সুর যে আমারই দেওয়া সে কথা বললেই কেলেঙ্কারি হবে। হয়তো গর্জে উঠবেন—তোমার এত সাহস রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতায় সুর দাও! সুতরাং অম্লাবদনে মিথ্যা কথা বললাম : গানের বইতেই তো আছে।

—গানের বই! কোন গানের বই?

—আজ্ঞে ঠিক মনে পড়ছে না।

রথীবাবু চিন্তিত হলেন। বললেন : স্বরলিপি আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও তো আছে।

—আশ্চর্য! আমরা কেউ মনে করতে পারছি না। সে বইটা তোমার কাছে আছে?

—আজ্ঞে ছিল তো। কিন্তু এখন নেই।

—কোথায় গেল?

—আমার এক আত্মীয় কাশী গেছে। সে নিয়ে গেছে।

—কবে ফিরবে?

—এই দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই।

—ফিরলে একবার বইটা এনো তো।

—নিশ্চয়ই আনব। এখন যেতে পারি?

—হ্যাঁ যাও।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন। বাব্বা, একসঙ্গে এতগুলো মিথ্যে জন্মে বলিনি। পরেও আর কখনও বলেছি বলে মনে পডছে না। আপাতত তো কল্পিত আত্মীয়কে কাশী পঠিয়ে রেহাই পাওয়া গেল। পরে যা হয় দেখা যাবে।

কিন্তু এত সহজে কি রেহাই পাওয়া যায়। মাসখানেক পরেই একটি চিঠি এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। দিন ও সময় তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন তাঁর একান্তসচিব শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী।

চিঠি পেয়ে আমার দিনের আনন্দ আর রাতের ঘুম দুটোই চলে গেল। দেখা করতে চেয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এটা একটা সৌভাগ্য নিশ্চয়। কিন্তু আমর বরাতে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বুঝতে পারছি না। রথীবাবু নিশ্চয় তাঁর বাবামশাইয়ের কাছে আমার কথা দিয়ে কথা না-রাখার কথা বলেছেন। তাই কবির কাছে কী ব্যবহার পাব এ নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না।

এল সেই নির্দিষ্ট দিনটি। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই জোড়াসাঁকো রওনা হয়ে গেলাম। কবির আদেশ অমান্য করা যাবে না। তাছাড়া ভাগ্যে যাই থাক, তাঁর দর্শন তো পাব। দুটো কথা তো তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাব। এমন সৌভাগ্য কজনেরই বা হয়। মনটাকে শক্ত করে নিলাম। ঠিক করলাম যদি সুযোগ পাই তো চোখের জলে কবির দু'খানা চরণ ভিজিয়ে দিয়ে নিজের সব অপরাধ, সব মিথ্যাচার স্বীকার করে আসব।

ঠাকুরবাড়ি এসে অমিয় চক্রবর্তীর খোঁজ করলাম। তিনি নেই। তবে নির্দেশ আছে আমায় যেন রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি তিনি আমার মুখ থেকে শুনতে চান।

আমায় নিয়ে যাওয়া হল রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে বসে আছেন সেখানে। একটি হেলান চেয়ারে কবি বসে আছেন। পাশে একটি ছোট জলচৌকিতে কিছু কাগজ রাখা। ইচ্ছে ছিল সটান গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিই, কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। আমায় যিনি নিয়ে গেছেন তিনি ঘরে ঢোকামাত্রই

ইঙ্গিতে অর্গানের দিকে দেখিয়ে দিলেন। ঘরের অপর প্রান্তে সেটি রাখা।

আমি খুব ধীরে পায়ে গিয়ে অর্গানে বসলাম। এ ঘরে পাঁচ-ছ'জন কি তারও বেশি লোক উপস্থিত, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছেন না। এমনকি তাঁদের চলাফেরাতেও কোনও শব্দ হচ্ছে না। চতুর্দিক নির্জন, শান্ত। দূরে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন, তাঁর চোখে দুটি বোজা। অর্গানে বসেও আমি গান আরম্ভ করতে ইতস্তত করছি, যদি কবির ধ্যানভঙ্গ হয়।

সেই ভদ্রলোক আবার ইঙ্গিত করলেন আমায় গান শুরু করতে। আমি আস্তে আস্তে অর্গানের রিডে হাত রাখলাম। অর্গানটি ভারি সুন্দর। হ্যামিলটনের বাড়ির জিনিস। এ-বাড়িতে এসব জিনিস ছাড়া মানায় নাকি।

গান ধরলাম একটু নিচু গলায়। গলা ছেড়ে গান গাইবার শক্তি আর সাহস দুটোর কোনওটাই বোধহয় অবশিষ্ট নেই আমার। তবে প্রাণ ঢেলে, সবটুকু দরদ দিয়ে গান শুরু করলাম। গাইতে গাইতেই মাঝে মাঝে কবির মুখের দিকে দেখছিলাম। কোনও ভাবান্তর নেই সেখানে। তবে একবার যেন তাঁর ঘন শ্মশ্রু-গুম্ফের মাঝখান থেকে ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল বলে মনে হল। সেটা তারিফ না বিরক্তি প্রকাশ কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

গান যখন শেষের মুখে তখন হঠাৎ যেন কিসের চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম উপস্থিত মানুষগুলির মধ্যে। ওঁদের মধ্যে একজন কবির কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব নিচু গলায় কী যেন বললেন। কবি একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার চোখ বুজে আত্মস্থ হয়ে গেলেন। এতটা দূরত্বে থেকেও বুঝতে পারলাম তাঁর কপালে চিন্তার রেখা, মুখের ভাব বিচলিত।

গান শেষ হবার আগেই দেখলাম উপস্থিত সবাই আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর থেকে। বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী ঘটল। গান শেষ করে হতবুদ্ধির মতো অর্গানেই বসে রইলাম কয়েক সেকেন্ড। ঘরে কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বসে আছেন নিশ্চল পাথরের মতো চোখ বুজে। কি করব বুঝে উঠতে না পেরে অর্গান ছেড়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। রীতিমতো অবাক হয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

হঠাৎ কেমন একটা ভয় পেয়ে গেলাম। তবে কি আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথ কুপিত হয়েছেন? তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর কবিতায় সুর-সংযোগ, উপরন্তু নানা মিথ্যাচারণ। হয়তো এখনই সেই আত্মস্থ মানুষটি চোখ মেলে দেখবেন আমি অর্গানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাউকে ডেকে নির্দেশ দেবেন : রাজকোষ হতে চুরি, ধরে আন চোর।

অতএব? যঃ পলায়তে স জীবতি। যেমনভাবে পা টিপে টিপে নামছিলাম সেইভাবেই চলার গতিটা একটু দ্রুত করে নিলাম। লনে নেমে কোনদিকে না তাকিয়ে গতিটা আরও একটু বড়িয়ে দিলাম। তারপর যে মুহূর্তে কম্পাউন্ডের বাইরে পা দিলাম সঙ্গে সঙ্গে দৌড়।

পরে, অনেক পরে, যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তখন বুঝতে পেরেছি ওইভাবে ওখান থেকে পালিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি। ওইভাবে মাঝে মাঝে আত্মস্থ হয়ে যাওয়া কবির অভ্যাস। ওঁর চিন্তা নানাভাবে কাজ করে। হয়তো আমার গান শুনছেন, তারই মধ্যে ওঁর চিন্তা ধাবিত হয়েছে কোন কবিতার পেছনে। তাই বলে আমার গানের প্রতি যে ওঁর মনঃসংযোগ নেই, একথা ঠিক নয়।

তবে সেদিন কবি কী কথা শুনেছিলেন, যা শুনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল সেটা পরবর্তীকালে ওঁকে জিজ্ঞসা করে জেনে নেবার সাহস হয়নি। হয়তো সেদিনও কোনও দুঃসংবাদ উনি পেয়েছিলেন, যেমন একবার পেয়েছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা'-র রিহার্সাল দিতে দিতে।

একবার ওইরকম 'চিত্রাঙ্গদা'-র রিহার্সাল চলছে। কবি বসে বসে শুনছেন আর দেখছেন। হঠাৎ সংবাদ এল দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনশনের পর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে মারা গেছেন বিপ্লবী যতীন দাস।

সেদিনও ঠিক ওইভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রিহার্সাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর ওই একইভাবে তাঁর পাশে রাখা কাগজের উপর মর্মভেদী হাহাকারের মতো রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি লাইন : 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ...।'

এ ঘটনা অবশ্য আমার কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আরও বেশ কিছুদিন পরের কথা। এটা ১৯২৯ সালের ঘটনা। আমার রবীন্দ্রনাথকে গান শোনানোর ঘটনা আরও চার-পাঁচ বছর আগের ব্যাপার। তখন আমি কলেজের ছাত্র।

যাই হোক, সেদিন ওইভাবে পালিয়ে আসার পর আমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। অমন এক ঋষিতুল্য মানুষের সামনে এসে কোথায় ভক্তির ভাবটাই বড় হবে, তা নয় আমি একেবারে ভয়েই মরে গেলাম। না হয় কিছু তিরস্কারই শুনতাম ওঁর কাছে, কিন্তু সেটাও একটা পুরস্কার হয়ে থাকত আমার জীবনে।

'দিনের শেষে' গানের প্রসঙ্গে পঙ্কজদার জবানিতে এত কথা শোনাবার কারণ হল তিনি মনে প্রাণে কতটা রবীন্দ্রময় হয়ে ছিলেন সেটাই বোঝানো। এই 'দিনের শেষে' গানের মূল সুরকারের প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় একটা বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল। প্রয়াত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সুরকার হিসেবে দাবি পেশ করেছিলেন। এই নিয়ে পঙ্কজদা ও বীরেনদার মধ্যে কিছু পত্রযুদ্ধও চলেছিল। ওই সময়কর আর এক প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়াত হীরেন বসু সেই পত্রযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পঙ্কজদা ও বীরেনদা উভয়েই কবিতাটিতে সুর দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী অনুমোদিত সুরটি পঙ্কজদারই দেওয়া। বীরেনদাও অবশেষে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করেছিলেন।

পঙ্কজদার কর্মজীবন পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি তাঁর গায়ক-জীবন, দ্বিতীয়টি বেতার-জীবন, তৃতীয়টি সিনেমায় সুরকারের জীবন, চতুর্থটি অভিনয়-জীবন এবং পঞ্চম ও শেষ অধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার দায়িত্বভার গ্রহণ। এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনের বর্ণনা দেওয়া স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবু যতটা পারা যায় চেষ্টা করতে দোষ কি!

পঙ্কজদার গায়ক জীবনের মোটামুটি একটা ছবি আঁকা হল। ১৯২৬ সালে ভিয়েলোকোন কোম্পানি থেকে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। গানটির প্রথম লাইন : 'নেমেছে আজ প্রথম বাদল'। এর অল্পকাল পরেই তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। তখন থেকে শুরু হল তাঁর সংগীতের পেশাদারি জীবন।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে পঙ্কজদার প্রথম যোগাযোগের ঘটনাটি যেমনই অদ্ভুত তেমনই আকস্মিক। সেই ঘটনাটা পঙ্কজদার মুখ থেকেই শোনা যাক।

পঙ্কজদা বললেন : 'তখন আমি পাশ-টাশ করে বেরিয়ে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছি। চাকরি মানে কোন বড়সড় ফার্মে নয়। আমার কর্মস্থল ক্যানিং স্ট্রিটে। পেশা জুট ব্রোকারি। সাদা বাংলায় পাটের দালালি। পেটের জন্যে পাট, কিন্তু আমার মনে তার কোনও প্রভাব নেই। সেখানে আমি সংগীতে ভরপুর। গানকে তখনও পণ্য করিনি, কোনওদিন পণ্য করতে হবে তাও ভাবিনি।

সাল তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে। ১৯২৭ সালের ১২ আগস্ট। সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে গেছে বলা যায়। আমি সেদিন বিকেলে ক্যানিং স্ট্রিট থেকে ফিরছি। কাপড় মালকোঁচা মারা। হাতে জুতো। সোজা বাড়ি যাব। কলুটোলার মোড়ের কাছাকাছি এসেছি, বৃষ্টিটা আবার জাঁকিয়ে এল। ছুটতে ছুটতে মোড়ের মাথায় একটা গাড়িবারান্দা পেলাম, তার নিচে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এধার ওধার থেকে আরও লোক এসে ভিড় করতে লাগল সেখানে। ভিড়ের চাপে আমি উঠে দাঁড়ালাম, একটা ডিসপেনসারি ছিল গাড়িবারান্দার নিচে, তারই রোয়াকে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। কিন্তু বৃষ্টির চাপে চারদিক অন্ধকার লাগছিল। আমি গুন গুন করে গাইতে শুরু করেছিলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় 'গান দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। নিজের মনেই গাইছিলাম পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে।

কিছু পরে হঠাৎ আমার পিঠে একটা টোকা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সাদা স্যুট পরা এক ভদ্রলোক। তিনি অবাঙালি। পরে জেনেছিলাম দক্ষিণ ভারতীয়। ওই ডিসপেনসারির ডাক্তার। আমি মুখ ফিরিয়ে তাকাতে আমায় বললেন : কাম ইন্।

আমি একটু অবাক হলাম। কিন্তু ভেতরে যাবার আহ্বান পেয়ে মনে মনে খুশি হলাম। এই ভিড়, তার উপর একটানা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো টন টন করছে। ভদ্রলোক ভিতরে ডেকে আমায়

একটি চেয়ারে বসতে দিলেন। ভাঙা বাংলায় বললেন : তুমি একটা খুব সুন্দর গান গাইছিলে গুন গুন করে। আমার খুব ভালো লাগছিল। গানটা আর একবার গেয়ে শোনাবে?

এইরকমভাবে গান গাওয়ার ফরমাশ এলে একটু অস্বস্তি হয়। কিন্তু ভদ্রলোক খাতির করে ভেতরে ডেকে বসতে দিয়েছেন। ওঁর অনুরোধ আমার রাখা উচিত। আমি গানটি গেয়ে শোনালাম। একজন উৎসুক শ্রোতা পেয়ে বেশ দরদ দিয়েই গাইলাম।

ভদ্রলোক দারুণ খুশি হলেন আমার ওই গান শুনে। বললেন : ডু ইউ লাইক টু ব্রডকাস্ট? কলকাতায় একটা রেডিও কোম্পানি হয়েছে। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। তুমি যদি চাও আমি ওখানে তোমার গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

রেডিওর খবরটা আমি জানতাম। মাস ছয়েক হল কলকাতায় রেডিও হয়েছে। বেতারের ব্যাপার নিয়ে কলকাতার মানুষের মনে তখন নানা কৌতূহল। এমন একটা সুযোগ অযাচিতভাবে আমার কাছে আসবে এটা কল্পনা করিনি। আমি সাগ্রহে স্বীকৃতি জানালাম। ভদ্রলোক আমার নাম ঠিকানা নিয়ে রাখলেন।

বাড়ি এসে আমি এ খবরটা কাউকে দিলাম না। কী জানি, হবে কি হবে না। আগে থেকে বলে লাভ কী?

মাসখানেক মাস দেড়েক পরে আমাদের বাড়ির সামনে একটি ল্যান্ডো এসে দাঁড়াল। ডাক্তারবাবু নিজেই এসেছেন ৭৯ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রিটের ঠিকানা খোঁজ করে। তিনি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন টেম্পল চেম্বার্স-এ। ওখানেই ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির অফিস।

সাকুল্যে তিন-চারখানি ঘর নিয়ে রেডিওর অফিস। একটা বড় হল ঘর। তাতে সারি সারি মাদুরের উপর মাইক বসানো। ঘরের মধ্যে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র রাখা। পাশের ঘর যন্ত্রপাতির ঘর। সেখানে ট্রান্সমিটার বসানো। ব্রডকাস্ট করা হয় বরানগর থেকে।

টেম্পল চেম্বার্সের অফিসে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন এক ভদ্রলেকের সঙ্গে। তাঁর নাম নৃপেন মজুমদার। উনিই ওখানকার সর্বেসর্বা।

নৃপেনবাবু আমার গান শুনলেন। খুব খুশি হলেন। সেইদিনই আমার গান ব্রডকাস্ট করার ব্যবস্থা করলেন। আমি যে গান গাইলাম তার প্রথম লাইন 'একদা তুমি প্রিয়ে'। সেদিনকার তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সাল।

শুধু গান ব্রডকাস্ট করাই নয়। নৃপেনবাবু আমার এবং আমার বাড়ির অন্যান্য সব খবরাখবর নিলেন। তারপর বললেন : আপনি আমাদের এখানে যোগ দেবেন?

এ তো মেঘ না চাইতেই জল। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি। আমার তখন সত্যিই একটা কাজ দরকার। পাটের বাজারে আমি বেমানান। পাটের দালালিতে অনেক পাটোয়ারি বুদ্ধি দরকার। আমার সে সবের একান্তই অভাব। নৃপেনবাবুর প্রস্তাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। ১৯২৭ সালের ১ অক্টোবর থেকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে গেলাম।

রেডিওতে আমি যখন যোগ দিলাম তখন তার বয়স ছ'মাস। আমার আগে কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন এবং আমার অব্যবহিত পরে আরও কেউ কেউ। আগেই বলেছি আমাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন নৃপেন মজুমদার। সংগীত বিভাগে ছিলাম আমি আর রাইচাঁদ বড়াল। নিউজ ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব ছিল রাজেন সেনের ওপর। আর গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করতেন যোগেশ বসু। অল্প কয়েকদিন পরে যোগ দিলেন বিখ্যাত গীতিকার বাণীকুমার ও স্বনামখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

আমাদের ওই টিমের টিমওয়ার্ক ছিল দেখবার মতো। কেমন করে বেতারকে জনপ্রিয় করা যায় তা নিয়ে আমাদের চিন্তার অন্ত ছিল না। রেডিওতে গান বাজনা নাটক কথিকা ইত্যাদি তো প্রচার করা হতই, সেইসঙ্গে বাঙালি জীবনের প্রতিটি উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা অনুষ্ঠান সাজাতাম। তখনকার এমন একটি অনুষ্ঠানের নাম করা যায় যা সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমান জনপ্রিয়। অনুষ্ঠানটির নাম 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

ওই অনুষ্ঠানের আইডিয়া প্রথম আসে বাণীকুমারের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লুফে নিলাম

প্রস্তাবটি। রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল বাণীকুমারকেই। বাণী তখন চলে গেল তার বন্ধু অশোক শাস্ত্রীর কাছে। অশোকবাবু ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাঁর সহায়তায় বাণী তৈরি করল 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র স্ক্রিপ্ট। আলাদা করে গান লেখা হল। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল আমাকে। প্রথমে ঠিক হল মহাষষ্ঠীর দিন সকালে অনুষ্ঠানটি হবে। প্রথম বছর বোধহয় তাই হয়েছিল। ঠিক মনে পড়ছে না। পরে নৃপেনদা ঠিক করলেন দেবীপক্ষ যখন শুরু মহালয়ার পর থেকে, তখন মহালয়ার দিনই ওই অনুষ্ঠান হোক। আর এটাকে বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান করা হোক। ভোর হয়ে আসবে, ব্রাহ্মমুহূর্তে ধর্মপ্রাণ বাঙালিরা গঙ্গা অভিমুখে যাবেন পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই শুরু হবে আমাদের অনুষ্ঠান। যাঁরা তখনও ঘুমিয়ে থাকবেন তাঁদের ঘুম ভাঙবে পূত মন্ত্রোচ্চারণ আর পবিত্র সংগীতের ঝংকারে। বাঙালি শ্রোতা ভক্তিভরে উপলব্ধি করবেন : মা আসছেন! মা আসছেন!

ধর্মের ব্যাপারটি সারা জীবন আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে এসেছে। মহিষাসুরমর্দিনীর সংগীত নিয়ে তাই আমার সর্বক্ষণ চিন্তা। এমন সুর করা দরকার যা মানুষের মনকে একই সঙ্গে ভক্তিরসে আপ্লুত করবে, আবার সুরের মায়ায় অভিভূত করবে। প্রচণ্ড খেটেছিলাম গানগুলি নিয়ে। তার কী ফল হয়েছে তা তোমরা সবাই জানো। ওই অনুষ্ঠানের পর প্রচুর প্রশংসাসূচক চিঠি আসতে লাগল রেডিওর দফতরে। আর বীরেন মন্ত্রপাঠ ও ভাষ্যপাঠ করেছিল চমৎকার। আগে ঠিক ছিল যন্ত্রশিল্পীরা গানের সঙ্গে বাজনা বাজাবে আর ভাষ্যপাঠের সময় তা বন্ধ থাকবে। কিন্তু যন্ত্রশিল্পীদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। বীরেন এমন সুরেলা গলায় মন্ত্র ও ভাষ্য পাঠ করে গেল যে মুসলিম ভাইয়েরা সেটাকেও গান মনে করে তার সঙ্গে বাজিয়ে গেল। এর ফল হয়েছিল আরও ভালো। ওই ব্যবস্থাই বলবৎ রাখা হল পরবর্তী বছরগুলিতেও। বেতারের এই অনুষ্ঠানটি কলকাতা বেতার কেন্দ্রকে বিশেষ জনপ্রিয় করে দিল। তখন বাড়িতে বাড়িতে রেডিওর এত চল ছিল না। এক বাড়িতে রেডিও থাকলে আশেপাশের বাড়ির লোকেরা রেডিও শুনতে আসতেন। কিন্তু পরের বছর দেখা গেল মহালয়ার কাছাকাছি অনেক বাড়িতেই রেডিও এসে গেছে। অনেক বাড়ির মাথায় বাঁশ খাটিয়ে এরিয়াল টাঙানো শুরু হয়ে গেছে।

১৯২৯ সালে বেতারে সংগীত শিক্ষার আসর-এর প্রতিষ্ঠা। প্রথম শিখিয়েছিলাম অলোক গাঙ্গুলির রচনা করা একটি গান। সে গানের ভাষা এখন আর মনে নেই। তবে দ্বিতীয় গানটির কথা মনে আছে। কাজি নজরুলের 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর'। রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়েছিলাম আরও অনেক পরে। তখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এত চল ছিল না। জনতার শ্রুতি আকর্ষণ করতে তাই প্রথম প্রথম অ-রাবীন্দ্রিক গান দিয়েই শুরু করেছিলাম। পরে যখনই অবস্থা একটু অনুকূল বুঝেছি তখনই শুরু করেছি রবীন্দ্রসংগীত শেখানো। নিজের মুখে বলা হয়তো ঠিক হবে না, তবে আমার মনে হয় এই সংগীত শিক্ষার আসরের মাধ্যমেই রবীন্দ্রসংগীতকে বেশি করে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি সাধারণ মানুষের মধ্যে।'

ওই রেডিওতে কাজ করতে করতেই সিনেমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল পঙ্কজদার। যোগাযোগ করিয়ে দিলেন বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ। সে এক বিচিত্র এবং নাটকীয় ঘটনা।

সংগীত পরিচালনায় পঙ্কজদার প্রথম হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফটের নির্বাক ছবি 'চোরকাঁটা'-তে। পঙ্কজদা একা নয়, সঙ্গে রাইবাবু, মানে রাইচাঁদ বড়ালও ছিলেন।

বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ, মশাইয়ের সঙ্গে পঙ্কজদা আর রাইবাবুর আগে থেকেই আলাপ ছিল। হরেনবাবুকে তখনকার দিনে সবাই এক ডাকে চিনতেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় হরেনবাবু বীভৎসভাবে নিহত হন।

যাই হোক, সেই হরেনবাবু একদিন রেডিও স্টেশনে এসে বললেন : শ্যামবাজারে 'চিত্রা' বলে একটা সিনেমা হাউসে 'চোরকাঁটা' বইটা খোলা হচ্ছে। ছবিটা সাইলেন্ট। তোমরা তাতে মিউজিক দিতে পারবে?

রাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : মিউজিক দেওয়া মানে?

হরেনবাবু বললেন : ছবিটা পর্দায় দেখানো হবে। তোমরা সামনের বক্সে মিউজিক হ্যান্ডদের নিয়ে বসে থাকবে। ছবি চলবার সময় ঘটনার সিচুয়েশন বুঝে বুঝে সেই অনুযায়ী বাজাবে।

রাইবাবু পঙ্কজদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কী করবে?

পঙ্কজদা বললেন : নিয়ে নেওয়া যাক।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। হরেনবাবু চলে গেলেন। বলে গেলেন, কোম্পানির লোক এসে বাকি সব কথা বলে যাবে।

হরেনবাবু চলে যাবার পর রাইবাবু পঙ্কজদাকে বললেন : কাজটা তো নেওয়া হল, এখন কী করে কী হবে?

পঙ্কজদা বললেন : হওয়াহয়ির কী আছে। এ তো সোজা কাজ। একটা কনসার্ট পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিলেই হবে। ছবিটা আগে একবার দেখে নোটেশান করে নিতে হবে। দুঃখের জায়গায় করুণ সুর আর আনন্দের জায়গায় সরস করে বাজালেই তো হয়ে গেল। আর ছবিতে যদি হাসির সিচুয়েশন থাকে তবে তো আর কথাই নেই।

রাইবাবু খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। কনসার্ট বাজাবার জন্যে ঠিক করা হল অরফিক্ ক্লাবের কয়েকজনকে।

কিন্তু চিত্রা সিনেমায় 'চোরকাঁটা' ছবিতে বাজাতে গিয়ে ওঁরা একটা মুশকিলে পড়ে গেলেন। ওঁদের হিসেব মতো ছবিতে আনন্দ, বিষাদ এবং কমিক সিচুয়েশন ছাড়াও এমন সব দৃশ্য ছিল যেগুলি ওইসব হিসেবের মধ্যে পড়ে না। সেখানে কী করা হবে? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল পঙ্কজদার। তিনি ওইসব জায়গাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের সুর বাজিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা খুব জমে গেল।

পরের ছবি ছিল 'চাষার মেয়ে'। সেটাতেও ওঁরা মিউজিক দিলেন। এবং এবার আরও গুছিয়ে। পুরো ছবিটাই রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে কম্পোজ করে নিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে তো সব রসের গানই অফুরন্ত। ফলে ওই ছবির মিউজিক অনেক বেশি ভালো হল আগের ছবির চেয়ে। পঙ্কজদা আর রাইবাবু প্রচুর প্রশংসা পেলেন দর্শক এবং কোম্পানির কর্তাদের কাছ থেকে।

এই দুটো ছবিতে কাজ করে পঙ্কজদার একটা বড় অভিজ্ঞতা হল। উনি বুঝতে পারলেন একজন বড় সংগীত পরিচালকের গুরুত্ব বিবেচিত হয় তাঁর করা গানের সুরে নয়, তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্রয়োগের মুনশিয়ানার উপর।

ওই দুটো ছবির পর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট কোম্পানি তুলে দিয়ে নতুন নাম হল নিউ থিয়েটার্স। পঙ্কজদা আর রাইবাবু ওই কোম্পানিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলেন পাকাপাকিভাবে। শুরু হল পঙ্কজদার চলচ্চিত্র জীবন।

নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা'। সেটা ১৯৩১ সাল। ছায়াছবি তখন কথা বলতে শিখেছে। পঙ্কজদা এবং রাইচাঁদ বড়াল দুজনে মিলে ওই ছবিতে সংগীত পরিচালনার কাজ করলেন। একটি গাজনের গান ছিল ওই ছবিতে। আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করলেন আগেকার পদ্ধতিতে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বাজিয়ে। ওই ছবির পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। আজকের অনেক দর্শক হয়তো প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর নামও শোনেননি। সেকালে তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড় চিত্র পরিচালক এবং সাহিত্যিক। তাঁর লেখা 'মহাস্থবির জাতক'-এর কয়েকটি খণ্ড বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। ওই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস, অমর মল্লিক, কুসুমকুমারী, নিভাননী, উমাশশী এবং শিশুবালা। ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন পঙ্কজদাদের পাশের পাড়া বাদুড়বাগানের নীতীন বসু।

এই নীতীন বসুর সঙ্গে আলাপ হয়ে পঙ্কজদার ভালোই হয়েছিল। ওঁরা বিরাট বড়লোক। ওঁর বাবার বিরাট কারবার। এইচ বোস অ্যান্ড কোম্পানি। তখনকার দিনের জনপ্রিয় কুন্তলীন তেলের মালিক ছিলেন ওঁরা। নীতীনবাবুর ডাক নাম পুতুল। কী বাড়িতে, কী পাড়ায়, কী স্টুডিওতে ওঁর ওই ডাক নামটাই চলত। নীতীন বসু গাড়িতে করে স্টুডিও যেতেন। পঙ্কজদাও সকালে ওঁদের বাড়িতে চলে আসতেন। এক সঙ্গে গাড়িতে করে স্টুডিও যেতেন।

'দেনা পাওনা' রিলিজ করল। ছবি দেখতে গিয়ে পঙ্কজদা একটা বিরাট আঘাত পেলেন। দেখলেন ছবির টাইটেল কার্ডে সংগীত পরিচালক হিসেবে বড় বড় অক্ষরে লেখা রাইচাঁদ বড়াল। তার নিচে

অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে পঙ্কজকুমার মল্লিক। পঙ্কজদার মনে এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল সেটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক।

পঙ্কদজা বললেন : 'পর্দার বুকে লেখাটা পড়েই মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করে উঠল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কাজের দায়িত্ব তো দুজনেই সমান ভাবে পালন করেছি। তবু কেন এই হেরফের? সেটা কি রাই ধনীর দুলাল আর আমি নগণ্য এক মধ্যবিত্তের সন্তান বলে?

একবার ভাবলাম প্রতিবাদ করি। আমাদের মালিক মিস্টার বি এন সরকারকে ঘটনাটা জানাই। ব্যাপারটা হয়তো তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। আবার ভাবলাম, যদি তারপরও এর প্রতিকার না হয়, যদি আরও কোন বেদনা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, তবে সেটা সহ্য করতে পারব কি? সরকার সাহেবকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, ভালোবাসি। তাঁর কাছ থেকে সরাসরি কোন আঘাত এলে আমি সইতে পারব না।

বাড়ি ফিরে ছুটে গেলাম ঠাকুরের কাছে। দু'চোখ ভরা জল নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালাম, ঠাকুর, জীবনে যত আঘাতই আসুক, আমায় সহ্য করবার শক্তি দাও। আমি যেন কোন আঘাতেই ভেঙে না পড়ি।'

এরপর পঙ্কজদা বাংলা সিনেমার এক যুগান্তকারী ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন ১৯৩৫ সালে। সে ঘটনা দারুণ রোমাঞ্চকর। পঙ্কজদার মুখ থেকেই সেই ঘটনার বিবরণ শোনা যাক। সেদিনের সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্তর বছর বয়সেও পঙ্কজদা উত্তেজিত এবং রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন।

পঙ্কজদা বললেন : 'পুতুল অর্থাৎ নীতীন বসু স্বাধীনভাবে চিত্র পরিচালনার কাজ পেলেন নিউ থিয়েটার্সে। এতদিন তিনি ছিলেন ক্যামেরা বিভাগের দায়িত্বে। তাঁর তোলা ছবি যেন কথা বলত। ওঁর এই পদোন্নতিতে আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছিলাম। আমার খুশির মাত্রাটা আরও বেশি। কারণ একই সঙ্গে একই গাড়িতে প্রত্যহ স্টুডিও যাতায়াত করতে করতে আমাদের মধ্যে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। এখন আর সকালে আমাকে পুতুলদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে হয় না। পুতুলদাই আমায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান তাঁর গাড়িতে।

পুতুলদা প্রথম যে ছবি পরিচালনার ভার পেলেন তার নাম 'ভাগ্যচক্র'। সেটা বোধহয় ১৯৩৫ সালের কথা। কেষ্টদা অর্থাৎ অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন প্রধান চরিত্রে। তাঁকে ভেবেই গল্পটি লেখা। লিখেছিলেন কবি ও গীতিকার শৈলেন রায়। ছবির নায়ক একটি নতুন ছেলে। লখনৌ থেকে এসেছে। খুব স্মার্ট, আর উজ্জ্বল চেহারা। তার নাম পাহাড়ী সান্যাল। আর নায়িকা ছিল উমাশশী। বিশ্বনাথদা অর্থাৎ বিশ্বনাথ ভাদুড়ি আর মল্লিকমশাই (অমর মল্লিক) ছিলেন দুটি বড় চরিত্রে। পুতুলদা প্রাণপণ খাটছিলেন ছবিটির পেছনে। তাঁর প্রথম ছবি। এটাকে সফল করতেই হবে।

এই ছবির সময় পুতুলদা আরও সকাল সকাল স্টুডিও যাওয়া শুরু করলেন। সুতরাং আমাকেও সকাল সকাল রেডি হয়ে নিতে হত। সেদিন সকালে তখন আমি বাথরুমে। পাশের বাড়িতে একটি বিখ্যাত ইংরিজি গানের রেকর্ড বাজছিল। আমি রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাথরুমের ভেতরেই গানটি গাইছিলাম। এমন সময় রাস্তা থেকে পুতুলদার গলার আওয়াজ কানে এল : পঙ্কজ—

পুতুলদার আওয়াজ কানে এসেছিল। কিন্তু সাড়া দিতে পারছিলাম না। কারণ আমার মুখে তখন গান। পুতুলদা আবার চিৎকার করলেন : এই পঙ্কজ—

গানটা তখন শেষের মুখে। তাই এবারও সাড়া দিতে পারলাম না। পুতুলদা আরও গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন : এই শালা পঙ্কজ—

পুতুলদার আওয়াজ পেয়ে বাবা দরজা খুলে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তার মুখে অমন শ্যালক সম্বোধন শুনে লজ্জায় নিজেই পিছিয়ে এলেন। ভিতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললেন আমায় খবরটা দিতে।

তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে যখন নিচে নামলাম তখন দেখলাম পুতুলদার কপালে চিন্তার রেখা। মুখটা গম্ভীর গম্ভীর। আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। সামনের সিটে পুতুলদা আর মুকুল। পিছনের সিটে আমি। মুকুল হল পুতুলদার ভাই। নিউ থিয়েটার্সের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মুকুল বসু। মুকুল গাড়ি

চালাচ্ছে। গাড়ি চলতে শুরু করলে আমি পুতুলদাকে বললাম : কিছু মনে কোরো না পুতুলদা, তোমার ডাক আমি শুনতে পেয়েছিলাম, কিন্তু সাড়া দিতে পারিনি, কারণ একটা ইংরিজি গান রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গে গাইছিলাম।

পুতুলদা দেখলাম নিস্তব্ধ। আমার কথায় একটা হুঁ-হাঁও দিলেন না। নীরবে সিগারেট খেতে লাগলেন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমি তো আমার দোষ স্বীকার করে নিলাম, তা সত্ত্বেও পুতুলদা রাগ করছেন। কেমন একটা অভিমান হল। আমিও চুপ করে রইলাম।

গাড়ি যখন জানবাজার ছাড়িয়ে চৌরঙ্গিতে এসে পড়ল তখন আর একবার চেষ্টা করলাম পুতুলদার রাগ ভাঙাতে। কিন্তু এবারেও পুতুলদার দিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ নিউ মার্কেটের কাছাকাছি আসতেই পুতুলদা একবার ইঙ্গিতে গাড়িটা থামাতে বললেন। মুকুল গাড়ি থামাতেই পুতুলদা গাড়ি থেকে নেমে গট গট করে নিউ মার্কেটের ভিতর ঢুকে গেলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে বসে রইলাম। অভিমানটা আরও বাড়ল। ঠিক আছে, পুতুলদা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে না চান আমিও আর বলব না।

একটু পরেই পুতুলদা ফিরে এলেন। হাতে একটা খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট। গাড়ি চলতে লাগল স্টুডিওর দিকে। সামনের সিটে বসে পুতুলদা একমনে সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে গেলেন আর পিছনের সিটে আমিও মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম। গাড়ি স্টুডিওর ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুতুলদা চট করে নেমে হন হন করে কোনদিকে হাওয়া হয়ে গেলেন। অন্যদিন গাড়িতে বসে বসে কত কথা বলেন, কত কথা হয়, আর আজ কী এমন ব্যবহার করলাম যে পুতুলদা এক মুহূর্তে পর হয়ে গেলেন!

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গিয়ে গোলঘরের একটা বেঞ্চে চুপ করে বসে রইলাম।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, চমক ভাঙল পুতুলদার চিৎকার। উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন: পঙ্কজ তুমি এখানে, আর আমি তোমায় অফিস, ফ্লোর চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চলো চলো, শীগগির চলো।

বলে উনি একরকম টানতে টানতেই আমাকে মিউজিক রুমের দিকে নিয়ে চললেন। আমার সব অভিমান মুহূর্তে উধাও। চলতে চলতেই কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম : পুতুলদা, সকালের ওই ব্যাপারটার জন্যে কিছু মনে কোরো না। আমি কিন্তু ঠিক—

পুতুলদা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন : ওসব কথায় এখন গুলি মারো। তুমি একটা কাজ করো দিকি। এইখানে দাঁড়াও, এইখানে দাঁড়িয়ে সকালে বাথরুমের ভিতর যে গানটা গাইছিলে সেটা রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গে গাও।

এই বলে তিনি কাকে যেন কী ইঙ্গিত করলেন।

আমি বললাম : আমিও ঠিক সেই কথাটাই বলতে চাইছিলাম পুতুলদা। সকালে তুমি যখন ডাকছিলে তখন—

এবারে চিৎকার করে উঠলেন পুতুলদা : আঃ—তুমি থামবে পঙ্কজ! ওই দেখো ওদিকে রেকর্ডটা চালু হয়ে গেছে। গাও গাও—রেকর্ডের সঙ্গে গাও—

মিউজিক রুমে রেকর্ডটি তখন পূর্ণ বেগে বাজছে। আমি কিছু না বুঝেই সেই বিখ্যাত ইংরিজি গানটি রেকর্ডের সঙ্গে গাইতে লাগলাম। আর পুতুলদা একবার দূর থেকে একবার পাশ থেকে, একবার খুব সামনে এসে আমাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

গানটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুতুলদার সে কী নাচ। স্থান কাল ভুলে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে মাতালের মতো নাচতে লাগলেন আর চিৎকার করতে লাগলেন : পেয়েছি পেয়েছি, আর কোনও ভাবনা নেই। অল প্রবলেম্ সলভড্।

আমার অবস্থা তখন বোঝো। না পারছি কিছু বুঝতে, না পারছি হাসতে, আর না পারছি নাচতে। কেবল পুতুলদার নাচের দাপট সামলাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি। কী করে জানব যে সেই মুহূর্তে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেল বাংলা সিনেমার জগতে। আবিষ্কৃত হয়ে গেল প্লে-ব্যাকের পদ্ধতি।

এখন থেকে আর সুন্দর সুন্দর নায়ক-নায়িকার অভাব হবে না। তারা গান না জানলেও চলবে। অন্যের গানে তারা শুধু ঠোঁট নেড়ে যাবে। এখন থেকে আর পরিচালক কিংবা ক্যামেরাম্যানকে বিব্রত হতে হবে না দৃশ্যগ্রহণের সময়। মিউজিক হ্যান্ডসরা যাতে ছবিতে এসে না যায় গানের দৃশ্যে, কিংবা সাউন্ড বুম যাতে দেখা না যায় তার জন্যে ভাবতে হবে না। এখন ইচ্ছামতো লং শট, মিড শট, ক্লোজ-আপ ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা।

সর্বনাশ! এত কাণ্ড! এই জন্যেই পুতুলদা আজ সকাল থেকে এমন চিন্তান্বিত আর বাক্যহীন। আইডিয়াটা ওঁর মাথায় আসে আমার ওই বাথরুমে পাশের বাড়ির রেকর্ডের সঙ্গে গান গাওয়া শুনে। নিউ মার্কেটে গাড়ি থামিয়ে উনি রেকর্ডটি কেনেন। তারপর আমায় নিয়ে ওই পরীক্ষা।

এই পদ্ধতি প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল পুতুলদার 'ভাগ্যচক্র' ছবিতেই। সখিদের গাওয়া 'এক আসনে বসবে বাজা' গানটি গাইবার জন্য পুতুলদা ফিরিঙ্গিপাড়া থেকে জনাকতক সুন্দর সুন্দর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে ধরে এনেছিলেন। তাদের মুখে বাংলা গান দর্শকদের শুনিয়ে দেওয়া হল কেবল প্লে-ব্যাকের কেরামতির জোরে। গানটি আগে টেপ করে নেওয়া হয়েছিল। লিড ভয়েস ছিল সুপ্রভা ঘোষের—যিনি এখন সুপ্রভা সরকার নামে পরিচিত। সুতরাং প্রথম প্লে-ব্যাক গায়িকার সম্মান শ্রীমতী সুপ্রভাই দাবি করতে পারেন।'

এবারে পঙ্কজদার অভিনয় জীবন প্রসঙ্গে আসা যাক। পঙ্কজদা জীবনে কোনও দিন কল্পনাও করেননি যে তিনি অভিনেতা হবেন। বড়ুয়া সাহেব মানে পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া তাঁকে একরকম জোর করেই অভিনয়ের জগতে নিয়ে আসেন। সেটাও এক বিচিত্র ঘটনা।

পঙ্কজদা এবং বাইবাবু যুগ্মভাবে নিউ থিয়েটার্সের অনেকগুলি ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। এককভাবে সংগীত করা শুরু করেন নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি 'ইহুদি কি লেড়কি' ছবি থেকে। এই সময়ে বড়ুয়া সাহেব 'মুক্তি' ছবির তোড়জোড় করছিলেন। তিনি তাঁর ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে পঙ্কজদাকেই চাইলেন। এই 'মুক্তি' ছবি থেকেই বাংলা ছবির সংগীতের ক্ষেত্রে একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেল। সে সম্পর্কে পঙ্কজদার মুখ থেকেই শোনা যাক।

পঙ্কজদা বললেন : 'মুক্তি' ছবি করার সময় বড়ুয়া সাহেব আমাকেই চাইলেন তাঁর সংগীত পরিচালক হিসেবে। এর আগে বড়ুয়া সাহেব নিউ থিয়েটার্সের হয়ে 'রূপলেখা', 'দেবদাস', 'গৃহদাহ' এবং 'মায়া'—এই চারটি ছবি করেছিলেন। কিন্তু 'মুক্তি' ছবির ব্যাপারে তাঁর ভাবনা-চিন্তা যেন অন্য খাতে বইতে শুরু করল। তিনি আমায় ডেকে বললেন : পঙ্কজ, আমি একটু অন্য ধরনের ছবি করতে চাই। সচরাচর যেমন হয় তেমন ছবি করতে আমার ভালো লাগছে না। আমি চাই আরও গভীরে যেতে।

বড়ুয়া সাহেব সম্পর্কে আমার বরাবরই একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ধনীর সন্তান অথবা রাজকুমার বলে নয়, তাঁর কর্মনিষ্ঠা, চিন্তার গভীরতা, সুন্দর ব্যবহার আর অসাধারণ সময়জ্ঞান ইত্যাদি গুণগুলি দিনে দিনে আমাকে তাঁর ভক্ত করে তুলেছিল। কী অসাধারণ পাংচুয়ালিটি। ঠিক সময়ে স্টুডিওতে আসতেন, ঠিক সময়ে কাজ শুরু করতেন, কাজে কেউ অবহেলা দেখালে তার নিস্তার ছিল না। সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও তিনি সহ্য করতেন না। বড়ুয়া সাহেবকে তাই স্টুডিওর ওয়ার্কাররা বাঘের মতো ভয় করত এবং শ্রদ্ধাও করত।

বড়ুয়া সাহেব বললেন : দেখো পঙ্কজ, এই ছবিটায় আমাকে যেমন খাটতে হবে তোমাকেও তেমনিভাবে প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। আমি সাধারণত কাউকে স্ক্রিপ্ট শোনাই না, কিন্তু তোমায় শোনাব। এ ছবির একটা আউটস্ট্যান্ডিং মিউজিক হওয়া দরকার। ছবির বক্তব্যটা তাই ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

শুরু হয়েছিল স্ক্রিপ্ট শোনার পালা। ছবির নায়ক এক আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। অন্তরের দিক থেকে একেবারেই নিঃসঙ্গ। খুবই জটিল চরিত্র। চিত্রনাট্যে ওই মানুষটির গল্প শুনতে শুনতে আমার বার বার রবীন্দ্রনাথের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ওই লাইনটি : 'ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে/সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে'। ওই গানের সঙ্গে চরিত্রের দারুণ মিল।

স্ক্রিপ্ট শুনছি। শুনতে শুনতে অবচেতন মন থেকে গানটি গুন গুন করে বেরিয়ে এল গলা বেয়ে।

বড়ুয়া সাহেব স্ক্রিপ্টের মধ্যে ডুবে আছেন, কিছুই খেয়াল করছেন না। হঠাৎ সচকিত হলেন গানের ওই অংশটি শুনে : ফুলের বা'র নেইকো যার ফসল যার ফলল না/ চোখের জল ফেলতে হাসি পায়।' বড়ুয়া সাহেব স্ক্রিপ্ট থেকে মুখ তুলে বললেন : কেন কেন, চোখের জল ফেলতে হাসি পাবে কেন?

আমি বললাম : তা আমি কী করে বলব। গানটি তো আর আমার লেখা নয়, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়ুয়া সাহেবের কপালে চিন্তার রেখা। উনি বললেন : পুরো গানটা ভালো করে শোনাও তো।

আমি গাইলাম। শেষ করলাম 'ওরে আয়/আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়/ওরে আয়'—

গান শুনে বড়ুয়া সাহেব কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। বললেন : স্ক্রিপ্ট পড়া আজ থাক। বড় ভাবিয়ে দিলে তুমি আমায়। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। কাল এই সময় এসো। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসব।

বড়ুয়া সাহেব কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন।

পরের দিন আসতেই বড়ুয়া সাহেব বললেন : এই গানটি আমার ছবিতে চাই।

আমি বললাম : তা কেমন করে হবে। এটা তো রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। গান হিসেবে তিনি ব্যবহার করতে দিতে রাজি হবেন কেন! তাছাড়া সুরটাও যে আমার দেওয়া। এতটা আবদার করা কি উচিত হবে?

বড়ুয়া সাহেব বললেন : আঃ, একবার যাওই না। দেখো না চেষ্টা করে। যেমন করে হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাও। গানটি আমার ছবিতে চাইই চাই!

আমি পড়লাম মুশকিলে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এত বড় দাবি নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একদিন সাহস করে চলে গেলাম কবির কাছে। উনি ধীর স্থির ভাবে আমার সব কথা শুনলেন। গল্পের কিছুটা আঁচ দিলাম। বড়ুয়া সাহেব যেভাবে ট্রিটমেন্ট করেছেন সেই ধাঁচেই ছোট করে গল্পটা শোনালাম। শুনে মনে হল তাঁর ভালো লেগেছে। স্ক্রিপ্টের প্রথমেই ছিল নায়ক একের পর এক দরজা খুলে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সেটা শুনে বললেন : প্রথমেই দ্বারমুক্ত। লোকটি বোধহয় মুক্তি চাইছে কিছু থেকে।

ছবির নাম বড়ুয়া সাহেব তখনও ঠিক করেননি। রবীন্দ্রনাথের ওই কথা ওঁকে বলতে বড়ুয়া সাহেব লাফিয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন : এই তো নাম পেয়ে গেছি। ছবির নাম হবে 'মুক্তি'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেছিলাম। 'দিনের শেষে' গানটা আরও একবার শোনালাম ওঁকে। উনি সেদিন পুরনো কথা তুললেন। বললেন : সেদিন কিছু না বলে চলে গিয়েছিলে কেন? তোমার গান তো আমার ভালো লেগেছিল। সুন্দর সুর দিয়েছো তুমি। তোমাদের ছবিতে ব্যবহারের অনুমতি দিলেম। তবে দু-একটা জায়গায় পরিবর্তন কোরো। ওই যেখানে আছে ফুলের বা'র ওটাকে করো ফুলের বাহার, নেইকো যার-এর জায়গায় নেইকো যাহার, ফসল যার-এর জায়গায় যাহার, আর চোখের জল কথাটা বাদ দিয়ে দাও, ওখানে করো অশ্রু যাহার।

এই পরিমার্জনা কবিতাকে কতটা উন্নত করল বলতে পারব না, তবে গান হিসেবে সুরটা ওখানে আরও ভালো করে জমে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন : আরও দু-একটি গান রেখো। 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানটি আমার বড় প্রিয়। ওটা রাখা যায় কি না ভেবে দেখো।

আমি তখন আমার অনেক দিনের সযত্নলালিত একটি আর্জি পেশ করেছিলাম। বলেছিলাম : গুরুদেব, আপনার গানে তালবাদ্য ব্যবহার করলে কি আপনি রাগ করবেন?

রবীন্দ্রনাথ বললেন : কেন, তালবাদ্য ছাড়া কি গানে মাধুর্য আনা যাচ্ছে না? ওটা থাক না।

আমি বললাম : এমন কিছু কিছু গান আপনার আছে যেখানে তালবাদ্যের সংগত পেলে সুরটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। বললেন : ঠিক আছে। তেমন বুঝলে ব্যবহার কোরো। কিন্তু সতর্ক থেকো, গানের ভাবমাধুর্য যেন তাতে নষ্ট না হয়।

বললাম : নিশ্চয়। আপনার গানের ভাববিকৃতি ঘটাব—ইহজীবনে যেন সে দুর্মতি না হয়।

তালবাদ্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সংকোচের কারণটা যে না বুঝতাম এমন নয়। সে যুগটা ছিল টপ্পা-ঠুংরির যুগ। সমাজের বুকে বাবুতন্ত্রের তখন পূর্ণ আধিপত্য। জোড়াসাঁকোর অদূরে রামবাগান কিংবা সোনাগাছির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তবলার বোল যে রসের জন্ম দিত তাতে রবি ঠাকুরের ভাবসমৃদ্ধ গানে তার ব্যবহারে সঙ্কোচ হবারই কথা। কিন্তু তালবাদ্যের তো একমাত্র উগ্র রূপই নয়, তার শান্ত রূপও আছে। যথাযথ প্রয়োগে তা গানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে পারে। আমি রবীন্দ্রসংগীতে তবলা এবং মৃদঙ্গের সেই রূপই ব্যবহার করেছিলাম। পরে কবির নিজস্ব ঘরনাতেও তা ব্যবহৃত হয়েছে।

যাই হোক, সেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলাম বড়ুয়া সাহেবকে। বড়ুয়া সাহেব তো খুব খুশি। উনি আমার নিজের গলায় 'দিনের শেষে' গানটি গাওয়াতে চান। সেই অনুযায়ী ভাঁটিখানার মালিকের চরিত্র তৈরি হল। বড়ুয়া সাহেব বললেন : ওটাতে তোমাকেই অভিনয় করতে হবে পঙ্কজ।

আমি চমকে উঠলাম বড়ুয়া সাহেবের কথা শুনে। বললাম : অভিনয়! ওরেব্বাবা! ও আমার দ্বারা হবে না। আপনি অন্য কাউকে দিন।

বড়ুয়া সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন : ওটা তোমাকেই করতে হবে। তোমার গান গাওয়ার পুরো এক্সপ্রেশন আমার চাই। যারা গানের সঙ্গে ঠোঁট নাড়ে তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি ওই এক্সপ্রেশন আমি পাব না। আমি চিন্তা না করে কোন ডিসিশন নিই না।

আমি বললাম : তাহলে চরিত্রটার প্রতি একটু সুবিচার করুন। লোকটি দারিদ্র্যের চাপে ভাঁটিখানার মালিক কিন্তু মানসিক ভাবে সে অন্য জগতের। তাহলে তার মুখে 'দিনের শেষে' গান যেমন দেওয়া যায় তেমনি আরও দু-একটি রবীন্দ্রসংগীত রাখা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার মর্যাদা আমরা রেখেছিলাম। 'দিনের শেষে' ছাড়াও আমার চরিত্রের মুখে আর একটি রবীন্দ্রসংগীত ছিল। 'আমি কান পেতে রই'। জীবনের গূঢ় তত্ত্বের ওই গানখানি আপাতদৃষ্টিতে এক ভাঁটিখানার মালিকের মুখে বেমানান হতে পারে, কিন্তু ছবিতে তা খাপ খেয়ে গিয়েছিল। আমার চরিত্রটিকে দিয়েছিল দার্শনিকের মর্যাদা। আর নায়িকার মুখে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানখানি। 'মুক্তি' ছবির নায়িকা হয়েছিল কানন। কী প্রচণ্ড দরদ দিয়ে গানটি গেয়েছিল সে না শুনলে বিশ্বাস হবে না।

এই হল আমার প্রথম অভিনয়ের ইতিহাস। কিছু না জেনে না বুঝেই আমি অভিনেতার খাতায় নাম লিখিয়ে ফেললাম।'

পঙ্কজদা যতই বিনয় করে বলুন না কেন, প্রমথেশ বড়ুয়া যে তাঁকে 'মুক্তি' ছবির ওই চরিত্রের সঙ্গে ইনভলভ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন, সেটা তাঁর অভিনয় দেখলেই বোঝা যায়। যে কারণে এর পর তাঁকে 'আলোছায়া' ছবিতে নায়কের ভূমিকা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ।

এরপরে পঙ্কজদা বিভিন্ন ছবিতে ছোট বড় বেশ কিছু চরিত্রে অভিনয় করেন। সেগুলি হল হিন্দিতে কপালকুণ্ডলা, আঁধি, ধরতিমাতা, এবং বাংলায় 'দেশের মাটি', 'অধিকার' ইত্যাদি। কপালকুণ্ডলা ছবিতে তাঁর গাওয়া 'পিয়া মিলন কো যানা' এবং অধিকার ছবিতে 'মরণের মুখে রেখে' গান খুবই জনপ্রিয় হয়।

তবে পঙ্কজদার অভিনয় প্রতিভার সর্বাধিক স্ফুরণ ঘটেছিল 'ডাক্তার' ছবিতে। ওই ছবির তিনি নায়ক। ওই একই কাহিনী নিয়ে অনেক পরে শক্তি সামন্ত 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটি ছবি করেন। সেই ছবিতে উত্তমকুমার যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, পঙ্কজদা সেই চরিত্রেই রূপদান করেছিলেন। ওই ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে পঙ্কজদা ১৯৪১ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে বি এফ জে এ পুরস্কার পান।

সংগীত পরিচালক হিসেবে পঙ্কজদা এককভাবে এবং রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনেক ছবিতে সুর রচনা করেন। তার মধ্যে দেশের মাটি, ডাক্তার, নর্তকী, জীবন মরণ, কাশীনাথ, বড়দিদি, মীনাক্ষী, প্রতিবাদ, রামের সুমতি, রূপকথা, লৌহকপাট, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' অবলম্বনে পল জিল্‌স পরিচালিত হিন্দি জলজলা ছবিতে সুরারোপ করে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত হন।

পঙ্কজদা তাঁর শিল্পীজীবনে বহু সম্মান লাভ করেছেন। ১৯৩২ সালে সারস্বত মহামণ্ডল তাঁকে 'সুরসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭০ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' পান এবং ১৯৭৩ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' পান। তার পাঁচ বছর পরে ১৯৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পঙ্কজদার জীবনের একটি বড় কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে লোকরঞ্জন শাখার প্রতিষ্ঠা। সেই অধ্যায়ের কথা বলে আমার এই স্মৃতিলিখন শেষ করব। তবে আমার মনে হয় সে ঘটনার কথা পঙ্কজদার মুখ থেকে শোনাই ভালো।

পঙ্কজদা বলেছিলেন : 'সেটা বোধহয় ১৯৫৩ সাল। একটি চিঠি এল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশের কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিককে ডেকেছেন। তাঁর কী একটা পরিকল্পনা আছে। সেটা নিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমি চিনতাম। একদা আলাপ হয়েছিল আমার মায়ের অসুখকে কেন্দ্র করে। তখন তাঁর ব্যবহারে আমি খুশি হইনি।

সেটা ১৯৩৫ সাল। আমার মা বেশ কিছুদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন। সেই সময়টায় তাঁর অসুখ বেশ বাড়াবাড়ি। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাঃ দত্ত পরামর্শ ছিলেন ডাক্তার বিধান রায়কে দেখানো হোক। বিধান রায়ের তখন ডাক্তার হিসেবে দারুণ নাম। সেই বাজারেই চৌষট্টি টাকা ভিজিট। ডাঃ দত্ত তাঁকে কল্ দিলেন। একদিন বিকেলে তিনি আমার মাকে দেখতে এলেন। গাড়ি থেকে নেমে ডাঃ দত্তর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। ডাঃ দত্ত চলতে চলতেই মায়ের অসুখ সম্পর্কে দুচার কথা বলতে লাগলেন। বিধানবাবুর মুখের ভাব দেখে মনে হল না যে তিনি কথাগুলি শুনছেন। কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। ওই তাচ্ছিল্যের ভাবটা আমার কিংবা আমার জ্যেঠতুতো দাদা কারুরই ভালো লাগল না।

যাই হোক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে মায়ের ঘরের দরজার সামনে ওঁরা এলেন। আগে থেকে ঘরের মধ্যে চেয়ার পেতে রাখা হয়েছিল ডাঃ রায়ের জন্যে। কিন্তু উনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেনই না। দরজার সামনে থেকেই রোগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, পাশ ফিরে শোন।

উনি ঘরে ঢুকলেন না দেখে আমি চেয়ারটা এগিয়ে দিতে গেলাম ডাঃ রায়কে। কিন্তু ডাঃ দত্ত আমাকে চোখের ইংগিতে নিরস্ত করলেন। ডাঃ রায় তখন এক পা এগিয়ে একটা হাত মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাতটা ধরুন।

কিন্তু যে রোগীর পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতা নেই সে হাত ধরবে কী করে! তা সত্ত্বেও ডাঃ রায় আর একবার ডাক দিলেন তাঁর হাত ধরবার জন্য। রোগীর কোনও সাড়া না পেয়ে যেমনভাবে গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন তেমনিভাবে নেমে চলে গেলেন। যাবার আগে চলতে চলতেই ডাঃ দত্তকে কী যেন বললেন বিধানবাবু। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছিল দু মিনিট কি আড়াই মিনিট।

ডাঃ রায়কে বিদায় দিয়ে ডাঃ দত্ত ঘরে এলেন। তাঁর মুখ চিন্তান্বিত। আমাদের মনে যত ক্ষোভ জমা হয়েছিল সব উদ্‌গীরণ করতে লাগলাম ডাঃ দত্তের কাছে। এ কীরকম রোগী দেখা!

ডাঃ দত্ত বললেন, তোমরা মিছিমিছি রাগ করছো। ওঁর রোগী দেখা ওইরকম। যা দেখার তিনি এর মধ্যেই দেখে নিয়েছেন। তোমরা বরং এক কাজ করো। সন্ধেবেলা একবার আমার দর্জিপাড়ার চেম্বারে এসো। আমি একটা রিপোর্ট তৈরি করে রাখব। সেটা নিয়ে কাল ভোরবেলা চলে যাবে ডাঃ রায়ের ওয়েলিংটনের বাড়িতে। উনি সাতটার সময় চেম্বারে বসেন। রিপোর্টটা ওঁকে দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

পরদিন সকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ওয়েলিংটনে ডাঃ রায়ের বাড়িতে গেলাম। অত সকালেই বেশ ভিড় জমে গেছে। আমরা ডাঃ দত্তের রিপোর্টটা জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক সাতটার সময় ডাঃ রায় ওপর থেকে নামলেন। চেয়ারে বসেই কোন কথা না বলে একের পর এক রিপোর্ট দেখতে লাগলেন। আর তখনই আসতে লাগল ফোনের পর ফোন। ওঁর বসবার চেয়ারের দুদিকে দুটো ফোন। একটা থামে তো আরেকটা বাজে। ফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন আর রিপোর্ট দেখছেন। আমাদের রিপোর্ট যখন তাঁর হাতে এল তখনও ফোনে কথা চলছে। আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কোনও উত্তর

নেই। আমার কথা কানে গেছে বলেও মনে হল না। রিপোর্টটায় দু একটা কী যেন দাগ দিয়ে অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিলেন আমার দিকে। ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। রাগে গর গর করতে করতে ডাঃ দত্তের কাছে গিয়ে ফেটে পড়লাম। রিপোর্টটা তাঁর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, এই দেখুন আপনার বড় ডাক্তারের নমুনা। রিপোর্টটা একবার ভালো করে দেখলেন না পর্যন্ত।

ডাঃ দত্ত রিপোর্টটা দেখে বললেন, কে বললে ভালো করে দেখেননি। এই তো পুরো রিপোর্টটা দেখেছেন। সাজেশান যা দেবার তা দিয়েও দিয়েছেন। এক কাজ করো, কটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। মাকে খাওয়াও।

কদিন পরেই মা মারা গেলেন। শোকের বেগ একটু সামলে ওঠবার পর ডাঃ দত্ত আসল কথাটা ফাঁস করেছিলেন। ডাঃ রায় যেদিন মাকে দেখতে আসেন সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন এ রোগীর বাঁচবার কোনও আশা নেই। দিন সাতেকের মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে। আমরা হিসেব করে দেখেছিলাম ঠিক সাতদিনের দিনই মা মারা গিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যু হয়তো অবশ্যম্ভাবী ছিল কিন্তু বিধানবাবুর ওই দাম্ভিক ভাব সহ্য করতে পারিনি। তাই সেদিন যখন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সভায় যোগ দেবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি এল তখন ব্যাপারটায় কোনও গুরুত্বই দিইনি। তবে ডেকেছেন যখন তখন একবার দেখা করে আসতে ক্ষতি কী। সেটাই তো ভদ্রতা।

রাইটার্সের রোটান্ডায় সেদিন বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিক কবি এবং বুদ্ধিজীবীর সমাবেশ হয়েছিল। সংগীত জগতের একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ আসেননি। বিধানবাবু সেদিন আমাদের সামনে বললেন, তাঁর সোনারপুর-আরাপাঁচ পরিকল্পনার কথা। বোঝালেন এই পরিকল্পনা সফল হলে ওখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাট চাষ হতে পারবে। দেশের সমস্যা মিটবে। কিন্তু নানা দিক থেকে বাধা আসছে। তিনি চান দেশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সাহায্য করুন। জনসাধারণকে বোঝানোর দায়িত্ব সরকারের সঙ্গে তাঁরাও নিন।

সে সভায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ ইত্যাদি আরও অনেকেই ছিলেন। সকলেই কিছু না কিছু বলতে লাগলেন। আমি কেবল অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখের দিকে। এ যেন অন্য বিধান রায়। চেহারায় কথাবার্তায় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, কিন্তু আগেকার সেই দম্ভের লেশমাত্র নেই। তার বদলে সারা মুখে জ্বল জ্বল করছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভালো করার আকাঙ্ক্ষা। সুখী ও সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গকে দেখবার জন্য তিনি যেন ব্যাকুল হয়ে আছেন।

কিন্তু আমি কী করতে পারি। আমার মূলধন বলতে তো কেবল সংগীত। তা দিয়ে আমি ওঁকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মুকুন্দদাসের কথা। গান গেয়েই তো তিনি দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কথা। বঙ্গভঙ্গের কথা। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গান গেয়েই তো তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এমনি নানা চিন্তা ক্রিয়া করতে লাগল আমার মনে।

অনেকের অনেক কথা শোনা হল। কিন্তু কোনও পথের ইঙ্গিত পাওয়া গেল বলে মনে হল না। সবাই সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন কিন্তু কীভাবে তা করবেন সেটা প্রকাশ পেল না। এমন সময় নাট্যকার মন্মথ রায় মশাই উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, অনেক গুণী ব্যক্তির এই সমাবেশে অনেক কথাই আমরা শুনলাম। সংগীত জগতের পক্ষ থেকে পঙ্কজ মল্লিক মশাই এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁর কাছে কিছু শুনতে চাই।

সকলের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হল আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাদের মতো এমন গুছিয়ে আমি বক্তৃতা করতে পারব না। সমস্যা সমাধানের গভীর কোন ইংগিতও আমি দিতে পারব না। তবে এই সভায় বসে বলেই একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। ডাঃ রায় যদি অনুমতি করেন তবে সেটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি।

ডাঃ রায় এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, আপনি আমার ঘরে আসুন।

এই বলে তিনি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে তাঁর ঘরে

গেলাম। ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে উনি বললেন, এবার বলুন আপনার প্ল্যান কী।

আমি বললাম, আমায় একটা চারণ দল তৈরি করে দিন। তাদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে যাব। নতুন করে গান লেখাতে হবে। মাটির গান। ফসলের গান। গান গেয়েই তাদের বোঝাতে হবে সরকার কী চান।

ডাঃ রায় এক মিনিট ভাবলেন। তারপর বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু নতুন করে গান লেখাতে হবে কেন? আমাদের বাংলা গানের ভাণ্ডার কি নিঃশেষ হয়ে গেছে?

আমি বললাম, কিন্তু এইসব পরিকল্পনা নিয়ে তো কোনও গান লেখা হয়নি আজ পর্যন্ত।

ডাঃ রায় বললেন, সেদিন যখন টালিগঞ্জের রাস্তায় কয়েক শো মানুষ আপনাকে ঘিরে ধরেছিল সেদিন কোন্ গান গেয়ে আপনি তাদের বশ করেছিলেন? নতুন কোনও গান সঙ্গে সঙ্গে রচনা করে নিয়েছিলেন নাকি?

আশ্চর্য। ডাঃ রায় সে কথা কেমন করে জানলেন। এসব কথা তো তাঁর জানবার কথা নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কী করে জানলেন সে কথা?

ডাঃ রায় বললেন, আমায় সব জানতে হয়। বলুন কী গান গেয়েছিলেন সেদিন?

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথের গান। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'।

ডাঃ রায় বললেন, তবে? যাঁর গান গেয়ে অত মানুষকে বশ করতে পেরেছিলেন তাঁর গান গেয়েই তো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তেমন কোন গান কি রবীন্দ্রনাথ লেখেননি?

আমি বললাম, লিখেছেন বৈকি। 'ফিরে চল্ মাটির টানে'।

ডাঃ রায় বললেন, তবে? খোঁজ করলে রবি ঠাকুর ছাড়া আরও অনেক গান পাবেন। আপনি একটা দল তৈরি করুন, আর একটা ভালোরকম কর্মসূচি তৈরি করে দিন আমাকে। একটু থেমে বললেন, ওই মাটির টানে গানখানা একটু শোনান তো।

আমি শুরু করলাম গাইতে। 'ফিরে চল মাটির টানে/যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে'। এমন সময় দরজা ঠেলে উঁকি দিলেন প্রফুল্ল সেন। উনি তখন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁকে দেখে ডাঃ রায় বলে উঠলেন, আরে এসো এসো প্রফুল্ল। বসো। পঙ্কজের গান শোনো। ও একটা ভালো আইডিয়া দিয়েছে। সেটা নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করার আছে।

সেদিন গান শুনিয়ে যখন ডাঃ রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি তখন ঘরের বাইরে দেখা হল সজনীকান্ত দাশের সঙ্গে। উনি বললেন, কী ব্যাপার খুব গান-টান হচ্ছিল ভেতরে?

আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি গান শুনতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথের গান।

সজনীবাবু বিস্ময়ের সুরে বললেন, বিধানবাবু গান শুনতে চাইলেন। আশ্চর্য!

দিন সাতেকের মধ্যে আমার পরিকল্পনার খসড়াটির তৈরি করেছিলাম। নামকরণ করা হল লোকরঞ্জন বিভাগ। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। দেড়শো জন শিল্পী নিয়ে তৈরি হয়েছিল একটি দল। দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আমাকে। পরে দায়িত্বভার ত্যাগ করেও ছুটি পাইনি। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবেও অনেক দিন থাকতে হয়েছিল।'

সেই ১৯৭৩ সালে বেশ কয়েকদিন পঙ্কজদার মুখোমুখি বসে একটু একটু করে তাঁর জীবনকাহিনী শুনেছিলাম। তারই ভিত্তিতে একটি বড় লেখা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটা শেষ করে যেদিন তাঁকে শুনিয়েছিলাম সেদিন বার বার ইমোশ্যনাল হয়ে পড়ছিলেন তিনি। বার বার অশ্রুমোচন করছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ যখনই আসছিল। লেখাটা কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় একটি কাগজে কাঁপা কাঁপা হাতে লিখে দিয়েছিলেন, আমার জীবনীকার শ্রীরবি বসুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। নীচে স্বাক্ষর করেছিলেন শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিক।

এক কুৎসিত চক্রান্তে পঙ্কজদার দেওয়া সেই সার্টিফিকেটখানা আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। তার জন্য আমার আফসোসের অন্ত নেই। ১৯৭৮ সালে যেদিন রেডিওতে শুনলাম পঙ্কজদা আর ইহলোকে নেই সেদিন মধ্যপ্রদেশের এক পাহাড়ঘেরা প্রান্তরে বসে প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথায় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। ঠিক যেমন করে আমার সামনে বসে একদিন চোখের জল ফেলেছিলেন পঙ্কজদা। সেসব কথা ভাবলে আজও চোখে জল আসে।

কেষ্টবাবু

ছেলেটার ওই এক মহাদোষ। ঘুড়ি ঘুড়ি করে পাগল। সারা ঘরময় ঘুড়ি ডাঁই করে রাখা। চাঁদিয়াল, ময়ূরপঙক্ষী, মুখপোড়া—কতরকম নাম সে সব ঘুড়ির। সক্কালবেলা উঠে পড়তে বসে আর দশটায় খেয়ে দেয়ে ইশকুল যায়। তারই মাঝখানে একচক্কর ঘুড়ি উড়িয়ে তবে ইশকুলের দিকে পা বাড়াবে। আবার বিকেলবেলা ইশকুল থেকে ফিরেই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাদে ছুটবে। মাত্র তো বারো বছর বয়েস। এই বয়েসে এত ঘুড়ির নেশা কেমন করে হল কে জানে! এই সিমলে-কাঁসারিপাড়ায় ওর যারা সমবয়েসি তারা কেমন ইশকুল থেকে এসে জল-টল খেয়ে খেলাধূলা করে। ওর কিন্তু সে সব ভালো লাগে না। দিনরাত কেবল ঘুড়ি আর ঘুড়ি।

অথচ এর জন্যে যে ওকে বকাঝকা করা যাবে তারও কোন উপায় নেই। লেখাপড়ায় তো নেহাত খারাপ নয়। বৌবাজারের ইশকুলে এই তো এবার ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে প্রমোশন পেয়েছে ভালোরকম নম্বর পেয়ে। তাছাড়া ওর ডাগর ডাগর চোখের মায়াময় মুখখানার দিকে তাকিয়ে বকাঝকা করাও যায় না।

এই তো বাংলা ১৩০১ সালে ৯ ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন ওর জন্ম। ওর জন্মের পর পাড়াপড়শিরা ছেলের মুখ দেখতে এসে বলেছিল : তোমরা খুব পুণ্যিমান। জন্মাষ্টমীর দিন তোমাদের বাড়িতে কেষ্টঠাকুর এয়েচে গো।

তা সেই কথা শুনে ওর বাবা শিবচন্দ্র তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের নাম রাখলেন কৃষ্ণচন্দ্র। ডাকনাম কেষ্ট। মা রত্নমালা আবার সোহাগ করে বলতেন : এ ছেলে তো আমার শুধু কেষ্ট নয়, প্রাণকেষ্ট। ওর ডাগর ডাগর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে প্রাণ আমার জুড়িয়ে যায়।

তা সেই চোখ দুটোর নিষ্পাপ সৌন্দর্য বুঝি সহ্য হল না ঈশ্বরের। ওই বারো বছর বয়সে দু চোখের আলো নিভে গেল কৃষ্ণচন্দ্রের।

তখন কেষ্টর স্কুলের সামার ভেকেশন চলছে। পড়াশোনা মাথায় উঠেছে। সকালে একবার নমো নমো করে বইপত্র ছুঁয়েই ছুটে হাজির হত ছাদে। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ যখন সারা আকাশটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তখন একদৃষ্টে সেই জ্বলন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়ি ওড়ানোয় মত্ত থাকত সে। বেলা বারোটা নাগাদ একবার দুটি ভাত মুখে গুঁজেই আবার ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছুটত ছাদে।

একদিন পড়ন্ত দুপুরে কেষ্ট ছাদ থেকে নেমে এল দু চোখ হাতে ঢেকে। বললে : আমার চোখ দুটো খুব ঝাপসা লাগছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

বাবা শিবচন্দ্র তখন অফিসে। মা রত্নমালা ধমক দিয়ে বললেন : তা আর হবে না। সারা দুপুর ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়ালে চোখে যন্ত্রণা তো হবেই। এই কাঠফাটা রোদ্দুরে কাক-পক্ষী পর্যন্ত বাসা ছেড়ে বেরোয় না, আর উনি গেছেন ভোকাট্টা করতে। যা, কলতলায় গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ বুজিয়ে শুয়ে থাক গে।

কেষ্ট তাই করল বাধ্য ছেলের মতো। কিন্তু দু-তিন ঘণ্টা কেটে যাবার পরও যন্ত্রণা কমার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং তা বাড়তে লাগল। বাবা অফিস থেকে ফিরে কেষ্টকে নিয়ে ছুটলেন চেনাশোনা এক চোখের ডাক্তারের কাছে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন : একটা আইড্রপ দিচ্ছি, ওটা চোখে দিয়ে দেখুন। যন্ত্রণা যদি না কমে তাহলে কাল সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। চোখের ব্যাপার, একদম নেগলেক্ট করবেন না।

বেশ কিছুদিন ধরে চোখের চিকিৎসা চলল কেষ্টর। তারপর একদিন তার দু চোখের আলো একেবারেই নিভে গেল। বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করলেন। নানা দেবতার কাছে মানত করলেন। কিন্তু দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়াই সার হল।

দিনের পর দিন যায়। বাড়ির সবাই কেষ্টকে চোখে চোখে রাখে। তাকে নাইয়ে দিতে হয়, খাইয়ে দিতে হয়। বিশ্বকর্মা পুজো আসে। রাস্তা থেকে পাড়ার ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানোর হই-হল্লা কানে আসে আর কেষ্টর দুই অন্ধ চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা।

এমনিভাবে চার-পাঁচটি বছর কেটে গেল। কিশোর কৃষ্ণচন্দ্রের সারা শরীরে যৌবনের পদচারণা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মনে? সেখানে তখন গভীর অন্ধকার। একলা ঘরে চুপচাপ বসে বসে ভাবেন আর ভাবেন। কী হবে এই জীবনটাকে নিয়ে? সারা জীবন এইভাবে অন্যের করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? তার থেকে এখনই এই জীবনটার ইতি ঘটিয়ে দিলে ক্ষতি কী?

এমন সময় একটি ছোট্ট ঘটনায় কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনবোধটাই বদলে গেল। ওঁদের পাড়ায় এক অন্ধ ভিখারি বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। সেদিনও সে ভিক্ষার আশায় কেষ্টদের মদন ঘোষ লেনের বাড়ির দরজায় এল গান গাইতে গাইতে। গানের ভাষাগুলি হল : 'নয়ন মুদিলে দেখা যদি পাই অন্ধ করিয়া দাও গো/দারা সুত দিলে যদি প্রেম মিলে লহ লহ সব লহ গো।'

গানটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেল কৃষ্ণচন্দ্রের। ছোটবেলা থেকে এই গান তো কতবার শুনেছেন, কিন্তু এমন করে তো কোনওদিন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা থর থর করে কেঁপে ওঠেনি। ভিখিরি তখনও গেয়ে চলেছে: 'লহ ধন মান মোহ মোহন/লহ গরবিত রূপ যৌবন/যাহা পেলে হায় হৃদি ভরে যায় কণিকাটি তারই দাও গো। নয়ন মুদিলে...'

গান শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না কৃষ্ণচন্দ্র। হাতড়ে হাতড়ে ঘর থেকে দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভিক্ষুকের কাছাকাছি এসে বললেন : আহা, কী গান শোনালে বোষ্টম ঠাকুর, আমার মনের সব আঁধার কাটিয়ে দিলে তুমি। আর একবার গানটা গাও না গো।

আর একবার নয়, পর পর চার-পাঁচবার ওই একই গান শুনলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সন্ধ্যাবেলা শিবচন্দ্র অফিস থেকে ফিরলে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন : আমি গান শিখব বাবা। আপনি আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে দিন।

শিবচন্দ্র বললেন : এ তো খুব ভালো কথা। গান তো তুমি ছোটবেলাতেও গাইতে। খেলার ছলে। এখন মাস্টার রেখে শেখো। বাকি জীবনটা গান নিয়েই কাটাতে পাববে। আমি কালই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কয়েকদিন পরেই জন্মাষ্টমী। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মদিন। সেই পুণ্য দিনে কৃষ্ণচন্দ্র নাড়া বাঁধলেন সেকালের খেয়ালের বিখ্যাত ওস্তাদ শশিভূষণ দে-র কাছে। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সংগীতসাধক অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সংগীত জীবনের সূচনা ঘটল এইভাবেই।

কেষ্টবাবুর অন্ধত্বপ্রাপ্তি এবং সংগীত জীবনে উত্তরিত হবার এই ঘটনা আমি তাঁর ভাইপো মান্না দে-র মুখ থেকে শুনেছি। কেষ্টবাবু তাঁর সংগীতের সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে গেছেন তাঁর তিন ভাইপোকে। বড় ভাইপো প্রণব দে—যাঁকে আমরা নীলুবাবু বলে ডাকতাম, তিনি এখন স্বর্গত। নীলুবাবুর প্রতি কেষ্টবাবুর অনেক আশা ছিল। উনি কথায় কথায় বলতেন : নীলু আমার থেকেও বড় গাইয়ে হবে।

কিন্তু কী এক আশ্চর্য কারণে নীলুবাবু নিজেকে সংগীত জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কেষ্টবাবুর সঙ্গে উনি বম্বে গিয়েছিলেন। সংগীত পরিচালনার কাজে দীর্ঘকাল উনি কেষ্টবাবুকে অ্যাসিস্ট করেছেন। ১৯৫৩ সালে বাংলা 'পথনির্দেশ' ছবির সংগীত পরিচালনাও করেছিলেন। কিন্তু কেন যে উনি সংগীত জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সেটা আমার কাছে যেমনই রহস্যময় তেমনই বিস্ময়কর।

মেজ ভাইপো প্রবোধ দে। তাঁর ডাকনাম মানা। বম্বেতে গিয়ে ওই মানা-ই মান্নাতে রূপান্তরিত হয়েছে। মান্নাবাবুও কেষ্টবাবুর সঙ্গে বোম্বাই গিয়েছিলেন। কিন্তু উনি আর কাকার সঙ্গে বাংলায় ফিরে আসেন নি। বম্বেতেই কর্মকেন্দ্র করে নিয়েছেন। এ নিয়ে কাকা-ভাইপোয় কিঞ্চিৎ মনান্তরও হয়েছিল। কিন্তু মান্নাবাবু সংগীত জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে কাকার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ছোট ভাইপো প্রভাস দে-র ডাকনাম ভেলু। কেষ্টবাবুর শেষ জীবনের শিষ্য এবং সর্বক্ষণের সঙ্গী। কেষ্টবাবু তাঁর কীর্তনাঙ্গের গানের ভাণ্ডারটি ভেলুবাবুকে উজাড় করে দিয়ে গিয়েছিলেন। ভেলুবাবু নিজেকে সুরকার হিসেবেও প্রকাশিত করেছেন। মান্নাবাবুর গাওয়া অনেকগুলি আধুনিক গানের উনি সুরকার।

এই তিন ভাইপোর কাছ থেকেই আমি কেষ্টবাবুর কর্মময় জীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। তা নিয়ে একটি বড় লেখা লিখেছিলাম 'দেশ পত্রিকায়। লেখাটির নাম ছিল 'সুরের সূর্য কৃষ্ণচন্দ্র'। ওই লেখার লেখক হিসেবে আমি মান্না দে-র নাম ব্যবহার করে ওঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম।

অথচ কেষ্টবাবুকে যে আমি চিনতাম না তা নয়। আমরা প্রায় এক পাড়ারই মানুষ। উনি থাকতেন হেদুয়ার ও-পারে আর আমি এ-পারে। আমার তরুণ বয়স থেকেই তাঁকে দেখতাম বলাইবাবুর কাঁধে হাত রেখে রাস্তা দিয়ে যেতে। বলাইবাবু ওঁর শিষ্য এবং পার্শ্বচর। কোঁচানো ধুতি এবং গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে যখন ফুলবাবু সেজে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন কেষ্টবাবু তখন সশ্রদ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। কোনদিন কাছে গিয়ে দাঁড়ানো কিংবা কথা বলার দুঃসাহস হয়নি। উনি চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওঁর গমনপথটি সেন্টের গন্ধে সুরভিত হয়ে থাকত।

শুধু ওঁর দিকেই নয়, ওঁর ছবির দিকেও কতদিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। উনি যখন রঙমহল থিয়েটারের মালিক ছিলেন তখন রঙমহলের লবিতে ওঁর একটি বড় ছবি টাঙানো থাকত। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করার চেষ্টা করতাম ওঁর দুটো চোখই অন্ধ কি না? দেখে মনে হত দুটো চোখই পাথরের। কিছুতেই ভেবে পেতাম না, কেন তাহলে লোকে ওঁকে 'কানাকেষ্ট' বলে সম্বোধন করে। এই 'কানাকেষ্ট' শব্দটি যেদিন প্রথম শুনেছিলাম সেদিন রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম এবং আহত হয়েছিলাম।

সেদিন সকালে বলাইবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে কেষ্টবাবু হেদুয়ার ফুটপাথ ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর নাতিকে বললেন : ওই দেখ্ দেখ্ কানাকেষ্ট যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মনটা ঘৃণায় রি রি করে উঠেছিল। এ কী অভদ্রতা! আমাদের গুরুজনরা ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছেন, কানাকে কানা কিংবা খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই। তাতে তারা মনে ব্যথা পায়। আর এই ভদ্রলোক একমাথা পাকাচুল নিয়ে এইরকম অসভ্যের মতো কথা বলছেন। ওঁর এই বাচ্চা নাতিটা তাহলে কী শিখবে!

কথাটা কেষ্টবাবুর এত কাছ থেকে বলা হয়েছে যে নিশ্চয় তাঁর কানে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই ওই ভদ্রলোককে দু-কথা শুনিয়ে ছাড়বেন। কিন্তু কেষ্টবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে বিরাজ করছে ক্ষমাসুন্দর হাসি। তিনি হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত করে বলে উঠলেন . ঠিক বলেছো ভাই, আমি কানাই বটি। তবে শুধু আমি একাই নয়। ওপরে যে ব্যাটা বৈকুণ্ঠে বসে বসে মৌজ করছে সেই কেষ্ট ব্যাটাও তো কানা। নইলে দুনিয়ার মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশা দেখেও সে চুপ করে বসে আছে।

হ্যাঁ, এমনি মহৎ মনের মানুষ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। রাগ, অভিমান, ঘৃণা ইত্যাদি কুৎসিত বস্তুগুলি তিনি বর্জন করতে পেরেছিলেন মহত্ত্বের অনুশীলনের দ্বারা।

কেষ্টবাবু ছিলেন সংগীত জগতের এক বিরল বিস্ময়। মাত্র আঠারো বছর বয়েসে তাঁর প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় এইচ এম ভি থেকে। গানটির ভাষা ছিল 'আর চলে না, চলে না মা গো/তোমা বিনা দিন চলে না'। তারপর থেকে অজস্র রেকর্ড বেরিয়েছে তাঁর। থিয়েটারে গাওয়া গান, ফিল্মে গাওয়া গান, আর তার বাইরে রাগপ্রধান, আধুনিক, কীর্তন ইত্যাদি নানা ধরনের গান। একটা সময়ে তো গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রতি মাসে একটা করে রেকর্ড বেরাত তাঁর। দেবকী বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস' ছবিতে কেষ্টবাবুর গাওয়া সেই বিখ্যাত গান 'ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে' যে কী পরিমাণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তা এই প্রজন্মের কিছু মানুষ, যাঁরা চটুল গানের প্রতি মোহগ্রস্ত, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। শহরবাসীদের মুখে তো বটেই, বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে খেটে খাওয়া মানুষের মুখে মুখে ওই গান শোনা যেত। অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া নয়, এটা আমার নিজের কানেই শোনা।

কেষ্টবাবুর থিয়েটারের গানগুলিও কি কম জনপ্রিয় ছিল! 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী', 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে', 'স্বপন যদি মধুর এমন', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে', 'আমার কবিতা হারায়ে ফেলেছি' ইত্যাদি গানের রেকর্ড ঘরে ঘরে বাজত, লোকের মুখে মুখে ফিরত। শুনেছি

অনেকে নাকি এক-একটি নাটক একাধিকবার দেখতে যেতেন শুধু কানাকেষ্টর গান শোনবার জন্যেই।

সেই প্রজন্মের কথা থাক। আজকের প্রজন্মের কাছেও কেষ্টবাবুর ওইসব গানের কি কম জনপ্রিয়তা! এ সম্পর্কে মান্না দে-র কাছে একটি ঘটনার কথা শুনেছি। সেটা মান্নাবাবুর মুখ থেকেই শুনুন।

মান্নাবাবু বললেন : 'বছরের পর বছর নানা ধরনের আধুনিক গান গাইতে গাইতে একটু টায়ার্ড ফিল করছিলাম। তাই ভাবলাম এবার পুজোয় একটু অন্য ধরনের গান গাইব। কী করা যায় কী করা যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম, কাকার গাওয়া চারখানা পুরনো গান রি-প্রোডিউস করব। ডিসিশন নেবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানিকে সে কথা জানিয়ে দিলাম।

আমার ওই সিদ্ধান্তের কথা শুনে গ্রামোফোন কোম্পানির এক কর্তা বললেন : ওসব গান কি এখনকার পাবলিক নেবে? আপনি ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখুন।

আমি বললাম : আমার ভাবা হয়ে গেছে। অনেক ভেবেই এই ডিসিশন নিয়েছি। ভালো জিনিসের কদর আজও আছে কি না তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

আমি বরাবরই একটু জেদি ধরনের মানুষ। আমার ওইরকম নাছোড়বান্দা জিদ্ দেখে কোম্পানি কাকার গান রি-প্রোডিউস করতে রাজি হল বটে, কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, এ ব্যাপারে তাঁদের অন্তরের সায় নেই।

কোম্পানি রাজি হবার পর ভাবতে বসলাম, কাকার তো এককালের অজস্র হিট্ গান আছে, তার মধ্যে কোন্ চারখানা রেকর্ড করা যায়? ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম, কাকার চারখানা থিয়েটারের গান রেকর্ড করব। ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের চারখানা গান বাছলাম। গানগুলি হল 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী', 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে', 'স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা আর 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে'।

গান চারখানা তুলতে আমার কালঘাম ছুটে গেল। কী প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে কাকা গানগুলি গেয়েছেন। ওই মেজাজ আর ওই দাপট আমার গানে যদি না থাকে তাহলে তো আমাকে দারুণ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। কাকার গাওয়া ওইসব গান কানে ভাসছে এমন মানুষ তো এখনও অনেকেই বেঁচে আছেন। তার ওপর রয়েছেন আপনারা—সাংবাদিক। একবার ফেল করলে আপনারা তো তুলোধোনা করে ছাড়বেন।

দিনের পর দিন রিহার্স করতে করতে একটা সময়ে এসে বুঝলাম, কাকার গানের মান রাখতে পারব। কাকার ছবিকে প্রণাম করে, মনে মনে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে একটা নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলাম গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডিং রুমে।

যথা সময়ে রেকর্ডিং শেষ হল। রেকর্ডিং-এর পর দেখলাম কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তেতোমুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন তাঁদের কেউ কাঁচা উচ্ছে বেটে খাইয়ে দিয়েছে। কেবল দুটি মাত্র মুখে উজ্জ্বলতার আভাস। তাদের একজন আমার ছোটভাই ভেলু, মানে প্রভাস দে। আর একজন ওই গ্রামোফোন কোম্পানির কো-অর্ডিনেটার বিমান ঘোষ—যিনি আগে অল্ ইন্ডিয়া রেডিওতে ছিলেন। বিমানদা এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন : ওয়েল ডান্ মান্না। তুমি একটা খুব বড় মাপের কাজ করলে।'

মান্নাবাবুর কথার মাঝখানে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : ওই রেকর্ডটার বিক্রির রেসপন্স কী রকম ছিল?

মান্নাবাবু বললেন : সাংঘাতিক। কোম্পানি তো প্রথমে বেশি প্রিন্ট করেনি। তারপর এমন ডিমান্ড হল যে সাপ্লাই দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে কি কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গানের চাহিদা আজকের দিনের শ্রোতাদের কাছে যে এতটা হবে তা আমিও ভাবতে পারিনি। তবে একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভালো জিনিসের কদর চিরকালই থাকে। থাকবেও।

শুধু গাইয়ে হিসেবেই নয়, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবেও কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন প্রথম সারিতে। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে অনেকগুলি ছবিতে তিনি সুরসংযোজনা করেন। তার মধ্যে কালী ফিল্মসের 'বিরহ' এবং 'প্রফুল্ল', ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মসের ধীরেন গাঙ্গুলি (ডি জি) পরিচালিত 'বিদ্রোহী

এবং দেবকী বসু পরিচালিত 'সোনার সংসার', চন্দ্র ফিল্মসের 'পরপারে', মোতিমহল পিকচার্সের 'রাঙা বৌ', নিজের প্রযোজনার 'পূরবী' ছবির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও বেশ কিছু ছবিতে তিনি সুরযোজনা করেছেন যেগুলির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে কেষ্টবাবু বম্বে চলে যান হিন্দি ছবিতে সুর করতে। হিন্দি ছবিতে গানও গাইতেন। ওখানে উনি পরিচিত ছিলেন কে সি দে নামে। তবে বম্বেতে থাকলেও বাংলার জন্যে ওঁর প্রাণ ছটফট করত। সে সম্পর্কে একটা মজার ঘটনা শুনেছি ওঁর বড় ভাইপো প্রণব দে অর্থাৎ নীলুবাবুর মুখ থেকে।

নীলুবাবু বললেন : 'কাকার সঙ্গে আমি আর মানা (মান্না দে) বম্বে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানকার ফিল্ম ইনড্রাসট্রিতে ওঁর কী খাতির! অনেক রইস আদমির বাড়িতে ওঁর পুরনো সব রেকর্ড থরে থরে সাজানো। উনি মন দিয়ে কাজ শুরু করলেন। আমরাও ওঁকে অ্যাসিস্ট করতাম। কিছুকাল পরে দেখলাম কাকা কেমন ছটফট করছেন। ঘুরে ফিরে কলকাতার কথায় আসতেন। উনি প্রত্যেক দিন সকালে আমাকে আর মানাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন। আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত রেখে সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন বেশ কিছুক্ষণ। প্রায়দিনই ওঁর মুখে গুন গুন করে শুনতে পেতাম 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে'। পাঁচ-সাত বছর কেটে যাবার পর দেখলাম একদিন গাইছেন 'ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।' ঠিক তার পরদিনই বম্বে মেলে হাওড়ার টিকিট কাটতে লোক পাঠালেন। কলকাতার জন্যে ওঁর মন তখন ছটফট করছিল।'

বম্বে থেকে ফিরে এসে কেষ্টবাবু বোধহয় তাঁর হারানো আসনখানি আর ফিরে পাননি। বাংলা ছায়াছবিতে তখন চটুল গানের চোরাস্রোত ঢুকে পড়েছে। তাই তিনি নিজেই একখানি ছবি প্রযোজনা করলেন যার নাম 'পূরবী'। পরিচালনা করেছিলেন চিত্ত বসু। ছবির মূল বক্তব্য সুস্থ রাগপ্রধান গানের সঙ্গে চটুল গানের সংঘাত। মুখ্য চরিত্রে তিনিই অভিনয় করেছিলেন। বিষয়বস্তু এবং কেষ্টবাবুর অভিনয় ও গানের জন্য ছবিটি প্রশংসিত হয়েছিল।

কেষ্টবাবু যে কতবড় অভিনেতা ছিলেন তার সঠিক মূল্যায়ন আমাদের দেশে হয়নি। শিশির ভাদুড়ির 'চন্দ্রগুপ্ত' সহ কত নাটকেই তো তিনি অভিনয় করেছেন, কিন্তু সেসব চরিত্রে তাঁকে আনা হয়েছে কেবল তাঁর অনুপম কণ্ঠের গান দর্শককে শোনানোর জন্য। সিনেমাতেও তাই। চণ্ডীদাস, দেবদাস, সাবিত্রী, দেশের মাটি, সাপুড়ে, আলোছায়া, দৃষ্টিদান ইত্যাদি ছবিতে তাঁর গায়ক চরিত্র। 'দৃষ্টিদান' ছবিতে তিনি রবীন্দ্রসংগীতও গেয়েছিলেন। 'তোমরা যা বলো তাই বলো।' উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে। গীতিকার কবি শৈলেন রায় তাঁর কথা ভেবেই ওই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। ছবির মুখ্য চরিত্র তাঁরই। একবারে প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত কেবল গান নয়, দুর্দান্ত অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন কেষ্টবাবু।

শেষ বয়সে ১৯৬২ সালের ২৮ নভেম্বর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কেষ্টবাবু ধর্মমূলক গানের প্রতিই ঝোঁক দিয়েছিলেন বেশি। বিশেষ করে কীর্তনাঙ্গের গান। তবু ওই সময়কার একখানি দেশাত্মবোধক গান 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান' বাঙালি শ্রোতার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আজও যে কোন দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানে ওই গানটির রেকর্ড বাজবেই বাজবে।

কেষ্টবাবু ছিলেন একজন মহৎ মনের মানুষ। তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা-সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে শুনেছি। পঙ্কজদার জবানিতেই ঘটনাটি বলি।

পঙ্কজদা বললেন : 'কেষ্টদার সঙ্গে আমার আলাপ প্রথম নিউ থিয়েটার্সেই। দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস' ছবিতে কাজ করবার সময়। কেষ্টদা আর আমি পাশাপাশি পাড়ায় বসবাস করি। ওঁরা থাকেন সিমলেয় আর আমরা চালতাবাগানে। কিন্তু এতকাল পরিচয়ের কোন সুযোগ হয়নি।

কেষ্টদাকে দেখে মনে হত সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। অল্প বয়সে ঈশ্বর ওঁর চোখ দুটি কেড়ে নিয়েছেন। চক্ষুহীন ওই মানুষটির বুকের মধ্যে কত দুঃখ জমা হয়ে আছে, কিন্তু বাইরে তাঁর হাসিমুখ দেখে কে বলবে যে সর্বদা একটি দুঃখের হিমালয় বুকে বয়ে চলেছেন তিনি। অমন একজন সংবেদনশীল মানুষকে পেয়ে আমার অনেক দুঃখের কথা জানিয়েছিলাম তাঁকে। কেষ্টদা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে

দিয়ে বলেছিলেন : পঙ্কজ, ভাই, দুঃখকে জয় করতে শেখো। কর্মে বিশ্বাস রাখো, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখো। সব সময়ে মনে রেখো, যা কিছু ঘটছে সবই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। দেখবে, দুঃখের আঘাত আর তত বড় হয়ে বাজবে না।

কেষ্টদার মধ্যে একটা দার্শনিক মন লুকিয়ে ছিল। আর সংগীতের প্রতি কী আশ্চর্য নিষ্ঠা। ওঁকে যখন কোন গান তোলাতাম তখন মনেই হত না আমি সুরকার আর উনি গায়ক। আমরা যেন এক হয়ে, একাত্ম হয়ে সুরের রাজ্যে বিচরণ করতাম।

কেষ্টদা ছিলেন একজন মানুষের মতো মানুষ। গাইয়ের মতো গাইয়ে। এমন অহংবর্জিত মানুষ আমি জীবনে কমই দেখেছি। কেষ্টদা যখন খ্যাতির তুঙ্গে তখনকার একটা ঘটনা বলি। এই অসাধারণ গায়কটিকে চিনতে সুবিধে হবে।

ভারতী পত্রিকার অফিসে তখন একটা বড় আড্ডা বসত। সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন ওখানকার মধ্যমণি। ওই আড্ডায় তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং কলারসিকরা নিয়মিত আসতেন। আমিও মাঝে মাঝে ওই আড্ডায় যোগ দিতে যেতাম। হেমেন্দ্রকুমার রায়কে আমরা হিমুদা বলে ডাকতাম। একদিন আড্ডা বসেছে সন্ধেবেলা। হিমুদা আছেন, মণিলাল গাঙ্গুলি আছেন, দিনুদা অর্থাৎ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেদিন এসেছেন। উনি আসতেন কালে ভদ্রে। আরও কে কে যেন আছেন। আমি আর বাণী অর্থাৎ বাণীকুমার সেদিন রেডিও থেকে বেরিয়ে ওই আড্ডায় গেছি। উদ্দেশ্য দিনুদার সঙ্গে দেখা আর হিমুদার সঙ্গে কিছু রসিক মুহূর্ত কাটানো।

জমজমাট আড্ডা চলছে। এমন সময় কেষ্টদা এলেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী, এক কথায় বলা যায় অন্ধের যষ্ঠি বলাইবাবুর কাঁধে হাত রেখে। সঙ্গে এনেছেন একটি পোর্টেবল্ গ্রামোফোন। কেষ্টদা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন : হিমুদা, তোমার সেই গানের রেকর্ডটা বেরিয়েছে। তোমায় শোনাব বলে নিয়ে এলাম।

হিমুদা বললেন : আরে এসো এসো, বসো।

বসবার জায়গা ছিল না। আমরা সব চেপেচুপে বসে কেষ্টদাকে জায়গা করে দিলাম। কেষ্টদা আমার পাশেই বসলেন। কেষ্টদা জানতেন সেদিন ওখানে দিনুদা আসবেন। তাই বসেই খোঁজ করলেন : দিনুবাবু কোথায়? দিনুবাবু?

দিনুদা আমার ডান পাশে ছিলেন। সাড়া দিলেন : এই যে, আমি এখানে।

কেষ্টদা হাতড়ে হাতড়ে দিনুদার হাতটা একটু স্পর্শ করলেন। তারপর জোড়হস্তে বললেন : আমার প্রণাম নিন।

দিনুদাও হাত জোড় করে প্রতি-নমস্কার করলেন।

হিমুদা তাড়া দিলেন : কই এবার গান শোনাও।

কেষ্টদার ইঙ্গিতে বলাইবাবু তাড়াতাড়ি গ্রামোফোন খুলে রেকর্ডটা চালিয়ে দিলেন। গানটি হিমুদার লেখা, কেষ্টদা গেয়েছেন। 'বধূ চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর চোখের টানে'। অপূর্ব গেয়েছেন কেষ্টদা। মাঝে মাঝে 'এ্যা-বধূ' করে সাপাট তান দিয়েছেন। কণ্ঠের কত কারিকুরি দেখিয়েছেন গানটিতে। শুনে মন ভরে যায়।

গান শুনে হিমুদা তো আহা আহা করে উঠলেন। ঘরের সকলেই প্রশংসা করতে লাগলেন কেষ্টদার গাওয়ার। চুপ করে রইলেন কেবল দিনুদা। তাঁকে নির্বাক দেখে কেষ্টদা জিগ্যেস করলেন : আপনার কেমন লাগল দিনুবাবু?

দিনুদা সরস গলায় বলে উঠলেন : কই, লাগেনি তো।

কেষ্টদা সঙ্কুচিত হয়ে নড়েচড়ে বসলেন। ভাবলেন দিনুদার পায়ে হয়তো ওঁর পা লেগে গেছে। তাই কোঁচানো ধুতি সামলে হাত জোড় করে বললেন : কিছু মনে করবেন না দিনুবাবু। অজান্তে লেগে গেছে।

দিনুদা আবার তেমনি সরস গলায় বললেন : কই, লাগেনি তো!

কেষ্টদা এবার থতমত খেয়ে গেলেন। কী বলবেন অথবা কী করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

এবার হিমুদা বলে উঠলেন : কেষ্ট জিগ্যেস করছে গানটা আপনার কেমন লাগল?

দিনুদা আবারও বললেন : লাগেনি তো!

এবার ও-কথার অর্থ বোঝা গেল। অর্থাৎ দিনুদার গান ভালো লাগেনি। একটু পরে দিনুদা বললো: কিছু মনে করবেন না কেষ্টবাবু। আপনার গাওয়া ভালোই, তবে এ গানের গায়কী অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। আপনি তো বধূকে চরণ ধরে বারণ করছেন, তাহলে মাঝে মাঝে 'এ্যা-বধূয়া' করে অমন ধোবির পাট ছেড়েছেন কেন? একটা নম্র ভঙ্গি, একটা ব্যাকুল আবেদন তো এ গানে থাকা উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টদা দু কানে হাত দিয়ে বলে উঠলেন : ঠিক কথা, ঠিক কথা। তাই তো হবে। এটা তো আগে ভাবিনি। এ হে হে, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও এমন ভুল করব না।

এই হলেন কেষ্টদা। এমন নিরহংকার। এমনি সংগীতপ্রেমী। আজ কেষ্টদার কথা বলতে গিয়ে বুকটা হু হু করে আসছে। এমন মানুষের দেখা আর পাব না।'

বলতে বলতে স্পষ্ট দেখলাম পঙ্কজদার চোখ দুটি জলে ভরে এল।

একবার কেষ্টবাবুর গান শুনে আমারও এমনি দু চোখ ভরে জল এসেছিল। সেটা অনেকদিন আগেকার ঘটনা। আমার তখন তরুণ বয়েস।

রঙমহল থিয়েটারে একটা গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বাংলার বিখ্যাত সব শিল্পীরা সেখানে গাইবেন। প্রথম শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে। ওই অনুষ্ঠানে টিকেট কেটে প্রবেশ করার সামর্থ্য আমার নেই। উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজনের অনুগ্রহে উইংসের পাশে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেয়েছি। আমার থেকে মাত্র ছ-সাত হাত তফাতে কেষ্টবাবু গান গাইতে বসেছেন।

মাত্র একখানি গান সেদিন তিনি গেয়েছিলেন। 'মাগো নিয়েছো নয়ন তারা/আসে দিন যায় জাগে বিভাবরী/সকলই আমার সমান শঙ্করী ..'। এই একটি গান কখনও বিলম্বিত লয়ে, কখনও মধ্য লয়ে, কখনও বা দ্রুত লয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তিনি গেয়েছিলেন। কতরকম সুরের কারুকার্য প্রকাশ করছিলেন গানের মধ্যে। কিন্তু আমাকে দুলিয়ে দিচ্ছিল গানের ভাষা। একটি অন্ধ মানুষ এই গান গাইলে শ্রোতাদের মনে তার একটা প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক।

কেষ্টবাবুর কণ্ঠের অপূর্ব মূর্ছনায় সারা হল নিস্তব্ধ। গান শেষ হবার মুখে দেখলাম ওই অন্ধ গায়কটির দু চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

একজন দৃষ্টিহীন মানুষের অন্তর্বেদনা যদি এইভাবে অশ্রুবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ে, তখন কি আর চক্ষুষ্মান মানুষের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা সম্ভব?

আজ তিরিশ বছর হল কৃষ্ণচন্দ্র দে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। একদিন যাঁর গানে সারা বাংলা মুখরিত ছিল আজ তিনি বিস্মৃত। এই প্রজন্মের কাছে তাঁর নাম পৌঁছে দেবার কোন আয়োজনই তো দেখি না। তাঁর স্মৃতিতে একটা গানের স্কুলও বোধহয় নেই। কলকাতা দূরদর্শন প্রতিষ্ঠার বছরে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল মাত্র। মান্না দে এবং আমি সেই অনুষ্ঠানে কৃষ্ণচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেছিলাম। কিছু পুরনো গান বাজিয়ে শোনানো হয়েছিল। তখন ক'টা বাড়িতেই বা টেলিভিশন ছিল। ক'টা মানুষই বা সে অনুষ্ঠান দেখেছেন। ব্যস্ সেই শেষ।

মণিদা

উত্তমকুমার গান গাইলেন।

অসিতবরণ তবলা বাজালেন।

ষাটের দশকের প্রথম দিককার সিনেমা থিয়েটারের তাবড় তাবড় শিল্পীদের একত্র করে একটি নাটক অভিনীত হল।

দর্শকের ভিড়ে প্রেক্ষাগৃহ উপচে পড়ল। একদিন পোস্টার আর একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেই বুকিং অফিস খোলামাত্র হাউস ফুল।

একরাত্রের মধ্যেই সংগৃহীত হল কয়েক হাজার টাকা।

এই বিরাট কর্মকাণ্ডের জন্যে কত টাকা খরচ হল বলতে পারেন? আজ্ঞে না, যা ভাবছেন তার ধারে কাছেও নয়। খরচ হয়েছিল মাত্র পঁচিশটি টাকা। তাও মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য গাড়িভাড়া বাবদ।

ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না? গল্প গল্প মনে হচ্ছে? তা মনে করতে পারেন। তবে এটা গল্প হলেও সত্যি। আজকের যুগে যা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, ষাটের দশকের গোড়াতে সেটাই ঘটেছিল। একটি মহৎ কাজের জন্য সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি।

মণি শ্রীমানীকে আপনারা চেনেন তো? নামটা শোনা শোনা ঠেকলেও মুখটা মনে পড়ছে না, তাই না? তাহলে আপনার স্মৃতিটা একটু উসকে দিই। এই তো কিছুদিন আগে সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণের পর তাঁর 'অপরাজিত' এবং 'পরশপাথর' ছবি দুটো দূরদর্শনের পর্দায় দেখানো হল। ওই 'অপরাজিত' ছবিতে স্কুল ইন্সপেক্টরের কথা মনে আছে? হ্যাট মাথায় দিয়ে ক্লাসে এসে দাঁড়ালেন, ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কিংবা 'পরশপাথর' ছবির সেই ডাক্তার, যাঁর চোখের সামনে কালী ব্যানার্জির পাকস্থলীর ভেতরে পরশপাথরটা আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে গেল। ডাক্তারের কণ্ঠে সেই বিস্ময়কর 'অ্যামেজিং' 'অ্যামেজিং' শব্দ। এবারে মনে পড়ছে? ওই স্কুল ইন্সপেক্টর আর ডাক্তার যিনি করলেন তাঁর নামই হল মণি শ্রীমানী।

আর যে মহৎ কাজের জন্য ওই উত্তমকুমারের গান, অসিতবরণের তবলা, নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয়, সেই মহৎ কাজটি হল মণিদার কন্যার বিবাহ।

মণিদা তখন বিশ্বরূপা মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেন। তার আগে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয় করতেন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। তখন কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পেয়েছেন। এখন আর তেমন কিছু পান না। যা পান তাকে চরিত্র বলাও বোধহয় সঙ্গত হবে না। তবু একটা নিয়মিত মাস মাইনের ব্যবস্থা তো আছে। সেটাই তাঁর পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের একটা বড় বল ভরসা।

মণিদা ছিলেন একজন নির্বিরোধী ভালোমানুষ। প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নিয়মিত বিশ্বরূপা মঞ্চে এসে মন দিয়ে নিজের কাজটুকু করেন। সকলের সঙ্গে হেসে হেসে কথাবার্তা বলেন। সকলের কুশল সংবাদ নেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটে চালতাবাগানের গলির গলি তস্য গলির ভিতরকার দমবন্ধ করা আস্তানাটিতে ফিরে যান।

একদিন গ্রিনরুমের ভিতর মণিদাকে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে তরুণকুমার তাঁকে প্রশ্ন করলেন: কী ব্যাপার মণিদা, মুখখানা অমন হাঁড়িপানা করে বসে আছো কেন?

তরুণকুমার তখন বিশ্বরূপার নিয়মিত শিল্পী। তাঁর প্রশ্নে মণিদা একবার তরুণকুমারের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন: দুঃখের কথা কী আর বলব ভাই বুড়ো (তরুণকুমারের ডাক নাম), একটা ভালো পাত্র পেয়েও হাতছাড়া করে দিতে হচ্ছে। মেয়েটারও বয়েস হয়ে যাচ্ছে। এরপরে কি আর কোনওদিন বিয়ে দিতে পারব।

মণিদার কথা শুনে তরুণকুমার এগিয়ে এসে মণিদার পাশে বেঞ্চিটার ওপর বসলেন। তারপর বললেন : কী ব্যাপারটা কী খুলে বলো দিকি?

মণিদা গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠনালীর কফটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন : অনেকদিন ধরে মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র খুঁজছিলাম। অনেকবার দেখাশোনা হয়েছে, কিন্তু উভয় তরফের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা নিয়ে ভেস্তে গেছে। কখনও হয়তো ছেলে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু দাবি দাওয়ার ব্যাপারে আটকে গেছে। এবার এই ছেলেটি সব দিক থেকেই উপযুক্ত। ওদেরও আমার মেয়েকে পছন্দ। দাবি দাওয়াও বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু নমো নমো করে বিয়েটা সারতে গেলেও যে টাকাটা লাগবে সেটার সংস্থানও আমার নেই। আজ সকালে এক বড়লোক আত্মীয়ের কাছে গিয়েছিলাম কিছু টাকা সাহায্য পাবার আশায়। কিন্তু তিনি আমাকে সোজা বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই মনটা বড় খারাপ। মেয়েটাকে বোধহয় সারা জীবন আইবুড়োই থেকে যেতে হবে।

তরুণকুমার একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : মোটামুটিভাবে বিয়েটা দিতে গেলে কীরকম কী খরচ পড়বে হিসেব করেছো কিছু?

মণিদা বললেন : তা নয় নয় করেও হাজার বারো টাকা তো লাগবেই।

তরুণকুমার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার হাতে কত টাকা আছে?

মণিদা একটু ম্লান হেসে বললেন : বারোটা টাকাও নেই। যা রোজগার করি তা তো তুমি জানো। ওই টাকায় পেটে খেতে কুলোয় না, তা আবার—

তরুণকুমার মণিদার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন : ব্যস ব্যস, তোমাকে আর দুঃখের পাঁচালী শোনাতে হবে না। তুমি মাস দুয়েক পরে একটা শুভদিন দেখে দিনস্থির করে ফ্যালো। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তরুণকুমারের কথা শুনে মণিদা কেমন হকচকিয়ে গেলেন। বললেন : টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে? অত টাকা? তুমি বলছো কী বুড়ো?

তরুণকুমার হাসতে হাসতে বললেন : তবে কি ঠাট্টা করছি নাকি! মেয়ের বিয়ে বলে কথা, সেটা কি ঠাট্টা তামাশার জিনিস?

মণিদা আবেগে তরুণকুমারের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন : টাকাটা কি তুমি ধার দেবে? কিন্তু অত টাকা আমি শোধ করব কী করে?

তরুণকুমার বলে উঠলেন : আরে না না, আমি ধার দোব কেন? ও টাকা তুমি নিজেই রোজগার করবে।

মণিদা বললেন : আমি রোজগার করব? এটা কি ঠাট্টার কথা নয় ভাই? বলে জীবনে কোনদিন বারোশো টাকা একসঙ্গে রোজগার করতে পারলাম না, তো বারো হাজার।

তরুণকুমার মণিদার পিঠে হাত রেখে বললেন : না গো মণিদা, আমি আদৌ ঠাট্টা করছি না। তোমার প্রবলেমটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেছে। একটা চ্যারিটি শো করে আমরা ওই টাকাটা তুলে ফেলতে পারব। এখন দরকার শুধু দাদার একটা ডেট।

তা মাস খানেকের মধ্যেই তরুণকুমার আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বরূপার অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে একটা প্ল্যান চকআউট করে ফেলেছিলেন। উত্তমকুমার গান গাইবেন। সঙ্গে তবলা বাজাবেন অসিতবরণ। এ যেন সোনায় সোহাগা। উত্তমকুমারের তখন যা জনপ্রিয়তা তাতে তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যেই লোকে দশ-বিশ টাকার টিকিট কাটতে রাজি। তার ওপর অসিতবরণের তবলা সঙ্গত। এ জিনিস কি আর দেখতে পাওয়া যাবে!

শুধু ওঁরাই নয়। মণিদার মেয়ের বিয়েতে অর্থ সংগ্রহের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন অন্যান্য স্টেজ আর সিনেমার শিল্পীরাও। বিশ্বরূপার মালিক রাসবিহারী সরকার মশাই বিনা ভাড়ায় হল ছেড়ে দিলেন এক রাত্তিরের জন্যে। আরও কী কী সাহায্য যেন করেছিলেন। হইহই করে টাকাটা জোগাড় হয়ে গেল।

আর বিয়েটাও হল প্রচণ্ড হইহই সহকারে। শিল্পী আর সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মণিদার মেয়ের বিয়ের আসর দারুণ জমজমাট। মাটিতে পাতা পেতে কবজি ডুবিয়ে সবাই পরিতৃপ্তি সহকারে খেলেন।

প্রাণভরে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। মণিদার ওই সূর্যালোকহীন ঘুপচি বাড়িটাকে সেদিন আমার স্বর্গ মনে হচ্ছিল।

সিনেমা-থিয়েটার লাইনে এমনধারা মহৎ অনুষ্ঠান আজকাল আর হয় কিনা জানি না। এমন করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয় কিনা তাও জানা নেই আমার। দূষিত পরিবেশে দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে মানুষের বুকের খাঁচাটা ক্রমশই ছোট হয়ে যাচ্ছে। কবে যে আবার প্রসারিত হবে তা জানি না।

মণি শ্রীমানী এমন একটি মানুষ, যিনি অন্যের ভালোবাসা পেয়েছেন অজস্র ধারায়। দিয়েছেনও তেমনি। আমি ওই মানুষটিকে খুব কাছ থেকে গভীর ভাবে দেখেছি বলেই কথাটা বলতে পারলাম।

মণিদার জন্ম ১৯১১ সালে, সেই যে বছর মোহনবাগান গোরাদের হারিয়ে প্রথম আই এফ এ শিল্ড পেল। কোথাও কোথাও মণিদার জন্ম সন ১৯১০ বলে উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ মণিদা একাধিকবার নিজেই আমাকে বলেছেন তাঁর জন্ম সন ১৯১১। এবং সেটা বলতে গিয়ে গর্বভরে নিজের বুকে দুটো থাপ্পড় মেরে মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়ের রেফারেন্স দিতেন। যেন উনি ওই সনে না জন্মালে মোহনবাগান কিছুতেই বুটপরা গোরাদের হারিয়ে শিল্ড পেত না।

মণিদার অভিনয় আমি প্রথম দেখি চল্লিশের দশকে। সম্ভবত ১৯৪৩ সালে। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে (বর্তমানে বিশ্বরূপা) শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকে। শিশিরবাবু করতেন মাইকেল আর মণিদা করতেন তাঁর বন্ধু গৌর বসাকের রোল। ওই বয়সে অভিনয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার তেমন বুঝতাম না, তবে মণিদার নরম্যাল অ্যাকটিং খুব ভালো লেগেছিল। পরে জানতে পেরেছিলাম, ওই স্বাভাবিকতার ব্যাপারটা শিশিরবাবুরই অবদান।

এর কিছুদিন পরেই কাঁসারিপাড়ায় সিমলা স্ট্রিটের ওপর একদিন দেখলাম স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। আমি তখন ওই পাড়ায় একটা প্রেসে কম্পোজিটারি করি। কাজে আসার পথে দেখলাম স্টেজের জন্যে যে বাঁশ পোঁতা হচ্ছে তারই একটিতে হাতে লেখা পোস্টার লাগানো। তাতে লেখা : 'অদ্য রাত্র দশ ঘটিকায় 'বঙ্গেবর্গী' নাটক অভিনীত হইবে। নাট্য-পরিচালনা এবং ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন বিখ্যাত নট মণি শ্রীমানী।'

ব্যস ওই পর্যন্ত পড়েই ঠিক করে ফেলেছিলাম সেদিন সারারাত জেগে 'বঙ্গেবর্গী দেখতেই হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে বসে গিয়েছিলাম ত্রিপল বিছানো সিমলা স্ট্রিটের ওপর।

তা সে রাত্রে মণি শ্রীমানীর অভিনয়ের দাপট দেখেছিলাম বটে। একাই ফাটিয়ে দিলেন তিনি। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে, যখন 'অষ্টমীতে দেবীকে বিসর্জন দিয়েছি' বলে হাহাকার করে উঠছিলেন, তখন তো চোখের জল ধরে রাখা যাচ্ছিল না।

এর দিন চার-পাঁচেক পরেই মণি শ্রীমানীকে অন্য একটি ভূমিকায় দেখতে পেয়েছিলাম। বিবেকানন্দ রোড আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের (বর্তমানে বিধান সরণি) মোড়ের কাছে একটি কাগজের দোকান ছিল। দোকানটির নাম এ সি পাল, পেপার মার্চেন্ট। মণি শ্রীমানীকে দেখলাম সেই দোকানে বসে দোকানদারি করছেন। একটু খটকা লেগেছিল। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আর দোকানদারি করা দুটোকে একসঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না। আমার ধারণা ছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা স্বপ্নের জগতের মানুষ। তাঁরা বিশাল অট্টালিকায় বসবাস করেন, নানা ধরনের সুখাদ্য ভোজন করেন, বেশবাস বহুমূল্য, সর্বদা গাড়িতে করে ঘোরাফেরা করেন। সেই ভাবনার সঙ্গে গৌর বসাক অথবা ভাস্কর পণ্ডিতের দ্বারা কাগজ বিক্রি করা কিছুতেই যেন মিলছিল না।

একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে নিলাম, ইনি মণি শ্রীমানীই বটে তো? তারপর নিশ্চিত হয়ে বিনা প্রয়োজনেই এক দিস্তা ফুলস্কেপ কাগজ কিনে ফেললাম ভদ্রলোকের কাছাকাছি হবার জন্যে।

পরবর্তী জীবনে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে যখন সত্যিই মণিদার কাছের মানুষ হতে পেরেছি তখন একদিন মণিদার কাছে আমার ওই বালখিল্য ব্যাপারটির উল্লেখ করেছিলাম। মণিদা তখন প্রায় প্রতিদিন

রাত্রে দোকান বন্ধ করে বিবেকানন্দ রোডে আমাদের উল্টোরথের অফিসে আড্ডা দিতে আসতেন। আমার কথা শুনে মণিদার সে কী হাসি! মণিদার মনটা এত সরল ছিল যে অনায়াসে উচ্চকণ্ঠে হাসতে পারতেন। চাপা হাসি অথবা চাপা কান্নার ধার ধারতেন না। মণিদার উচ্চকণ্ঠের হাসিও যেমন শুনেছি, উচ্চগ্রামের কান্নাও তেমন দেখেছি। সে কথায় পরে আসছি।

মণিদার জন্ম এই কলকাতা শহরে। লেখাপড়া উত্তর কলকাতার ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে। ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর পড়াশোনায় ইতি। কারণ ততদিনে সংসারের জোয়ালটি ওঁর ঘাড়ে চেপে বসেছে। ছোটবেলায় আবৃত্তি করতেন। তরুণ বয়সে সেটা রূপান্তরিত হয় অভিনয়ে। ওই বয়সে তাঁকে কখনও দেখা গেছে খাটানো শামিয়ানার নীচে যাত্রা করতে, কখনও বা ম্যারাপ বেঁধে থিয়েটার করতে। এই প্রচণ্ড অভিনয়তৃষ্ণাই তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় নাট্যচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির পদপ্রান্তে।

শিশিরবাবু সাধারণত শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে সহবাস পছন্দ করতেন না। অভিনয়ের ব্যাপারে উৎসাহও দিতেন না। কিন্তু মণি শ্রীমানীকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিষ্পাপ মুখ, সহজ-সরল ব্যবহার এবং অভিনয়ের প্রচণ্ড আকাঙক্ষা দেখে। মণিদার প্রথম নাট্যাভিনয় রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' নাটকে। শিশিরবাবু নব নাট্য মন্দিরের হয়ে স্টার থিয়েটারে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। মণিদাকে দিয়েছিলেন ভেস্কটস্বামীর চরিত্রটি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ওই নাটক দেখতে এসেছিলেন। মণি শ্রীমানীর অভিনয় তাঁব ভালো লেগেছিল। মণিদা মনে করতেন এটা তাঁর অভিনয়জীবনের এক পরম প্রাপ্তি।

এরপর থেকে শিশিরবাবু যখন যেখানে গেছেন মণিদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেছেন। যে অবস্থায় রেখেছেন সেভাবেই থেকেছেন। বেশি অর্থের আকাঙক্ষায় দল বদল করেননি।

শেষ জীবনে শিশিরবাবু অভিনয় ছেড়ে দেবার পর মণিদা অন্য মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটকে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছেন। ওই সময়েই তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়।

আমার ধারণা ছিল ওই এ সি পালের কাগজের দোকানের মণিদাই মালিক। পরে জেনেছিলাম উনি ওই দোকানের একজন কর্মচারী মাত্র। দীর্ঘদিন ওখানে চাকরি করছেন তাই মালিকের মতোই মনে হত।

আমার সঙ্গে আলাপের বেশ কিছুদিন পরে মণিদা ওই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। না দিয়ে উপায়ও ছিল না। মণিদা তখন নিয়মিত স্টেজে অভিনয় করছেন, সিনেমাতেও টুকটাক কাজ পাচ্ছেন। শুটিং-এর কাজের জন্য দোকানের কাজে প্রায়শই কামাই করতে হত। দোকানের মালিক তা নিয়ে আপত্তি তোলেননি। কিন্তু মণিদার সততা তাঁকে বাধ্য করেছিল চাকরিতে ইস্তফা দিতে।

আগেই বলেছি মণিদা প্রায় প্রতিদিন রাত্রে আমাদের উল্টোরথ অফিসে আড্ডা দিতে আসতেন। এর ফলে মণিদার কিছু উপকার হয়েছিল। আমাদের অফিসে সন্ধের পর বেশ কিছু প্রযোজক আর পরিচালক আড্ডা দিতে আসতেন। মণিদার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতাম। আমরা অনুরোধ করতাম মণিদাকে কিছু কাজ দিতে। তাঁদের অনেকেই আমাদের অনুরোধ রাখতেন।

ওই সময়ে মণিদার সংসারজীবনে একটু সচ্ছলতা এসেছিল। চেহারাতেও একটা চেকনাইয়ের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কথায় আছে না, আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। মণিদারও হয়েছিল সেই অবস্থা। কাজের পরিমাণ যেমন বাড়তে লাগল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল অনাদায়ের পরিমাণও। পাঁচদিন কাজ করে তিনদিনের টাকা হয়তো পেলেন। বাকি দু'দিনের পাবার কথা রিলিজের পর। কিন্তু ছবি রিলিজ হতে দেখা গেল ছবিও ডুবেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজকও। তিনি তখন বেপাত্তা।

এ তো গেল ভাগ্যহীন প্রযোজকের কথা। কিন্তু যিনি ভাগ্যবান, যাঁর ছবি টাকা পেয়েছে, সাড়ম্বরে পরের ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন, তেমন প্রযোজকের কাছ থেকেও টাকা আদায়ের জন্যে মণিদাকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। তেমন একটা ঘটনার কথা বলি।

সেদিন সন্ধেবেলা অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় মণিদা এলেন ক্লান্ত ঘর্মাক্ত অবস্থায়। এসেই ধপ করে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। ওঁর সারা মুখে কেউ যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। আমি উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম : কী ব্যাপার মণিদা, শরীর খারাপ নাকি?

মণিদা ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন : এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো?

আমি বেয়ারাকে ডেকে এক গ্লাস জল দিতে বললাম। জলটা খেয়ে মণিদা চেয়ারের ওপর শরীরটা

এলিয়ে দিলেন। তাই দেখে বলে উঠলাম : নিশ্চয় আপনার শরীর খারাপ লাগছে। ডাক্তারকে খবর দেব?

মণিদা ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে বললেন : না না, শরীর-টরির খারাপ নয়। একটা ব্যাপারে মনটা বড় খারাপ।

শরীর খারাপ নয় শুনে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : কী কারণে মন খারাপ?

মণিদা একজন প্রযোজকের নাম করে বললেন : ওঁর কাছে তিনশোটা টাকা পাব। ছবি রিলিজের পর দেবেন বলেছিলেন। ছবি হিট্ করেছে, আবার নতুন ছবি শুরু করেছেন, কিন্তু আজ তিনমাস ধরে আমাকে ঘোরাচ্ছেন। টাকাটা কিছুতেই দিচ্ছেন না। আজ টাকাটার খুব দরকার ছিল। আজ তাই নিয়ে একটু কড়া কথা বলেছিলাম। তাতেই সোজা আমাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই মনটা খুব খারাপ।

তারপর একটু গলাটা নিচু করে বললেন : রবি, তোমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা হবে ভাই! আমি মাসকাবার হলে দিয়ে দেব।

আমার কাছে অত টাকা ছিল না। তবু আমি মণিদাকে বললাম : আপনি একটু বসুন, আমি ভেতর থেকে আসছি।

এই বলে ভেতরে প্রসাদ সিংহের বসবার ঘরে গিয়ে বললাম : প্রসাদদা, পঞ্চাশটা টাকা দিন তো!

প্রসাদদা তাঁর হাফ-পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে টাকাটা বার করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন : এত রাতে টাকা কী হবে রে?

আমি তখন প্রযোজকের হাতে মণিদার দুর্ভোগের কথাটা প্রসাদদাকে খুলে বললাম। প্রসাদদা শুনে কিছুটা গুম্ হয়ে গেলেন। কিছু বললেন না।

এর দিন দশেক পরে সেই প্রযোজক ভদ্রলোক তার নতুন ছবির একগুচ্ছ স্টিলফটো নিয়ে প্রসাদদার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। উদ্দেশ্য উল্টোরথে ছবি ছাপা। কিন্তু প্রসাদদা তাঁকে নিভৃতে কী বললেন বুঝতে পারলাম না, দেখলাম ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে স্টিলগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। প্রসাদদা আমাকে ডেকে বললেন : কাল সন্ধেবেলা একবার মণি শ্রীমনীকে অফিসে আসতে বলিস তো!

পরদিন সন্ধেবেলা মণিদা যথারীতি আমার সামনে বসে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় সেই প্রযোজক এলেন। এসেই কোন কথা না বলে মণিদার হাতে তিনশোটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে একটা ভাউচার সই করিয়ে নিয়ে গটগট করে প্রসাদদার ঘরে ঢুকে গেলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে বেরিয়েও গেলেন। তার একটু পরে মণিদাও চলে গেলেন।

আমি প্রসাদদাকে বললাম : ভদ্রলোক বোধহয় মণিদাকে আর কোনদিন তাঁর ছবিতে কাজ দেবেন না।

প্রসাদদা দাঁতটা খুঁটতে খুঁটতে বললেন : না দিক গে! ও জোচ্চোরের বাড়ির ফলার না খাওয়াই ভালো।

এবারে মণিদার কান্নার কথাটা বলি।

মণিদা চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন ১৯৩৭ সাল থেকে। তাঁর প্রথম ছবি 'টকি অব টকিজ' বা 'দস্তুরমত টকি'। পরিচালক ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তারপর থেকে তিনি প্রচুর ছবিতে কাজ করেছেন, কিন্তু হইচই ফেলে দেবার মতো কোন চরিত্র পেয়েছেন বলে মনে হয় না। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, সুশীল মজুমদার, সত্যেন বসু, হেমচন্দ্র চন্দ্র, ফণী মজুমদার, রাজেন তরফদার প্রমুখ বিখ্যাত চিত্রপরিচালকদের ছবিতে কাজ করেও তাঁর দুর্ভাগ্যের অবসান হয়নি। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁকে কাজের জন্যে উমেদারি করে বেড়াতে হয়েছে। অথচ তিনি যে কত বড় মাপের অভিনেতা ছিলেন তা সলিল সেন পরিচালিত আমাদের 'মণিহার' ছবিতে বোঝা গেছে। ওখানে তাঁর ছিল ভিলেনের ভূমিকা।

একদিন বিকেলের দিকে আমি পত্রিকার কাজের প্রয়োজনে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। সন্ধের মুখে স্টুডিওর গোলঘরের বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম একজনের জন্যে। এমন সময় দেখলাম ইন্ডিয়া ল্যাবরেটরির দিক থেকে স্টুডিওর আলো-আঁধারি পথ পেরিয়ে ঝুপ ঝুপ করে এগিয়ে আসছেন মণি শ্রীমানী। আমি মণিদাকে ডাকতেই তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। বসার পর কোঁচার

খুঁট দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে বললেন : সাতদিন ধরে হাঁটাহাঁটি করেও শেষ পর্যন্ত কাজটা পেলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন?

মণিদা বললেন : পাঁচ দিনের কাজ ছিল। প্রোডিউসার আমাকে কথাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এক বন্ধু, বউবাজারে চশমার দোকান আছে, তাঁর শখ হয়েছে ওই চরিত্রে অভিনয় করবেন। পয়সাকড়ি নিচ্ছেন না। অতএব আমাকে আর দরকার নেই। কী ব্যাপার বলদিকি ভাই, একজনের শখ মেটাবার জন্যে আমার বউ-বাচ্চা উপোস করে মরবে! এইভাবে আমাদের মুখের গ্রাসটুকু কি কেড়ে না নিলেই চলত না।

মণিদার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু তো বলার নেই, তাই চুপ করেই রইলাম।

হঠাৎ মণিদা যেন ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন : অভিনয়কে ভালোবেসে, সারা জীবন সেটাকে আঁকড়ে পড়ে থেকে আমি কি অন্যায় করেছি বলতে চাও। আমি তো গাড়ি চাই না, বাড়ি চাই না, সৎ পথে থেকে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে চেয়েছি কেবল! সেটুকু সুযোগও কি তোমরা আমাকে দেবে না? হায় ভগবান!

বলতে বলতে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললেন শিশিরকুমারের শিষ্য, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য ক্ষুদ্র চরিত্রের অভিনেতা মণি শ্রীমানী। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিয়ে হন হন করে স্টুডিওর গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে মণিদাব সেই অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে কখন যে আমার চোখ দুটোও জলে ভিজে উঠেছিল বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমার আর কিই বা করার ছিল কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া।

কানুদা

১৯৪৩-৪৪ সালে সিমলে-কাঁসাড়িপাড়া, রায়বাগান, গোয়াবাগান, চালতাবাগান আর ঠনঠনে অঞ্চলের কিছু তরুণের কাছে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (বর্তমানে বিধান সরণি) আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পোস্ট অফিসটি একটা বড় আকর্ষণ ছিল। ওই সব অঞ্চলের কিছু তরুণ কখনও দল বেঁধে, কখনও বা একক ভাবে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে কোনও না কোনও সময় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পোস্ট অফিসে হাজির হত। হাঁ করে তাকিয়ে থাকত কাউন্টারের ওপাশে বসা এক ভদ্রলোকের মুখের দিকে। তাঁব পরনে সিল্কেব শার্ট আর ধুতি, সারা মুখখানিতে কমনীয়তা মাখানো। মাথায় ঘন কালো একমাথা চুল।

আমার এক বন্ধু আমাকে ওই ভদ্রলোকের হদিশ দেয়। সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়েও দেয়। দেখামাত্রই আমি চিনতে পারি। ওই ভদ্রলোককে তো সিনেমার পর্দায় প্রায়শই দেখা যায়। ছোট ছোট রোল করেন, কিন্তু দারুণ করেন। ভদ্রলোকের নাম কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাঃ)।

প্রথম দিন কানুবাবুকে মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলাম। ভদ্রলোককে কাজকর্ম প্রায় কিছুই করতে হচ্ছে না। উনি যে কাউন্টারে বসেন, সেই কাউন্টারের সামনে পারতপক্ষে কেউ আসেনও না। তবে প্রায় সকলেই খাম পোস্টকার্ড কেনার পর অথবা মানি অর্ডার করার পব এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে যান ভদ্রলোকের মুখের ওপর।

সেই প্রথম দর্শনের পর কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাঃ)কে দেখতে যাওয়া আমার কাছে একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একটু অবসর পেলেই হাজির হতাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পোস্ট অফিসে। কানুবাবু কেমন করে হাসেন, কেমন করে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, কেমন করে হাই তোলেন, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম। দেখতাম একটু দূরত্ব বজায় রেখে, ওঁর কাউন্টারের বিপরীতে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে।

আমাদের ওইভাবে দেখাটা ভদ্রলোকের নিশ্চয় বিরক্তির উদ্রেক করত। মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকাতেন। কিন্তু কোনদিন কিচ্ছু বলতেন না। একদিন কিন্তু আর সামলাতে পারলেন না। প্রচণ্ড রেগে গেলেন।

সেদিন দর্শনার্থী হিসেবে আমি একাই ছিলাম। এবং সাহস করে একেবারে কানুবাবুর কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পেতলের রডগুলোর ফাঁক দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে দেখছিলাম ওঁর দিকে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কানুবাবু রুক্ষ গলায় ধমকে উঠলেন : অ্যাই খোকা, এখানে কী চাই কী? খাম পোস্টকার্ড কিনতে হয় তো ওদিকের কাউন্টারে যাও। যত্ত সব আদেখলের দল।

অমন কড়া ধমক খেয়ে ভয় আর লজ্জা দুটোই পেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি পালিয়ে বেঁচেছিলাম ওঁর সামনে থেকে। এরপর আর মাস দুই তিন ওই পোস্টাপিসমুখো হইনি।

পরে একদিন সত্যি সত্যিই পোস্ট কার্ড কিনতে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। কানুবাবুর সিটে দেখলাম নতুন লোক কাজ করছেন। শুনলাম উনি ওই ব্রাঞ্চ থেকে বদলি হয়ে অন্য ব্রাঞ্চে চলে গেছেন।

তবে ওই কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পাশে ব্র্যাকেটে 'অ্যাঃ' শব্দটির অর্থ বহুদিন আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। পরে আমাদের পাড়ার এক দাদার কাছে জানতে পেরেছিলাম 'অ্যাঃ' শব্দটির অর্থ 'অ্যামেচার'। সরকারি দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সিনেমায় কিংবা মঞ্চে অভিনয় করবার সময় 'অ্যাঃ' শব্দটি ব্যবহার করেন। এতে নাকি আইনগত কোনও ঝামেলা ঘটে না। কানুবাবু যেহেতু পোস্ট অফিসে কাজ করেন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মী, তাই নামের পাশে আইন বাঁচাতে 'অ্যাঃ' শব্দটি ব্যবহার করতেন। অনেক পরে অবশ্য উনি চাকরি ছেড়ে দেন এবং নামের পাশ থেকে ওই 'অ্যাঃ' নামক

লেজুড়টিও বর্জিত হয়।

সেই কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হল ১৯৫০ সালে। আমি তখন 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকার কনিষ্ঠ সাংবাদিক। আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হত। তাতে যেসব শিল্পী পুরস্কার পেতেন তাঁরা তো আসতেনই, যাঁরা পেতেন না তাঁরাও আসতেন। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতাম আমরা।

ওই বছরের অনুষ্ঠানে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণের দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। উনি থাকতেন টালা পোস্ট অফিসের পাশে বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। ফটোগ্রাফার তারাপদ ব্যানার্জি ওই একই পাড়ার লোক। তারাপদ অবশ্য তখনও ফটোগ্রাফির লাইনেই আসেনি।

কানুবাবুর বাড়িটার নম্বর ছিল, যতদূর মনে পড়ছে, ১৬ জে, বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কিন্তু বার বার ঘুরপাক খেয়েও বাড়ি আর খুঁজে পাই না। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই বলতে পারে না। শেষকালে কানুবাবুর নাম করতেই একসঙ্গে পাঁচজন এগিয়ে এল বাড়ি দেখাতে। তারা বলল : বলবেন তো কানুদার বাড়ি যাবেন, তা নয় তখন থেকে ষোলর জে ষোলর জে করছেন।

ওই প্রথম অভিজ্ঞতা হল, সিনেমা আর্টিস্টদের বাড়ি নাম্বার ধরে খুঁজতে নেই, নাম ধরে খুঁজতে হয়।

কানুবাবুর বাড়িতে যখন ঢুকলাম, উনি তখন বাথরুমে। একটু অপেক্ষা করতে হল। উত্তর কলকাতার পুরনো আমলের বাড়িগুলি যেমন হয়, এ বাড়িটাও তাই। ঘরগুলি একটু চাপা চাপা। ঘরের সর্বত্র মধ্যবিত্ত বাড়ির অপ্রাচুর্যের ছাপ। দেওয়ালে মামুলি ক্যালেন্ডার। তার পাশে কানুবাবুর কম বয়সের একটি ছবি। হয়তো কোনও চলচ্চিত্রের স্টিল। বসে বসে এইসবই দেখছিলাম।

এমন সময় কানুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। আদুড় গা। গলায় ধবধবে সাদা একগাছি পৈতে। স্নান সেরেই যে এ ঘরে ঢুকেছেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। কানের দু'পাশে কিছু চুল থেকে দু এক ফোঁটা জল তখনও ঝরছে। ঘরে ঢুকেই বললেন : কী চাই ভাই?

উঠে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যটা বললাম। হাতে আমন্ত্রণলিপিটা ধরিয়ে দিলাম। উনি বললেন : রূপাঞ্জলির উৎসব যখন, তখন যেতে তো হবেই। কিন্তু ভাই রবিবারে ডেটটা ফেললে কেন? আমার আবার ওইদিন স্টেজ আছে। ডবল শো।

সেটা জানা ছিল। কানুবাবু তখন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে (বর্তমানে বিশ্বরূপা) নিয়মিত অভিনয় করছেন শিশিরবাবুর সঙ্গে। ওঁর কথার উত্তরে বললাম : আমাদের ফাংশান তো সকাল ন'টায়। আর আপনার শো তো দুপুর তিনটেয়। মাঝে অনেকটা সময়।

কানুবাবু এবার চিঠিটা খুলে দেখতে দেখলে বললেন : ও, সকাল ন'টায় বুঝি? কোথায় যেন? রূপবাণী সিনেমায়। বাঃ তাহলে আর কোন অসুবিধা নেই। আমি যাব, নিশ্চয়ই যাব।

কানুবাবুর সঙ্গে সেই প্রথম আলাপেই মানুষটিকে ভালো লেগে গিয়েছিল। বেশ সাদাসিধে ধরন। আটপৌরে কথাবার্তা। মনেই হয় না যে সিনেমা আর্টিস্ট। নাক উঁচু ব্যাপারটা একেবারেই নেই।

আমার একটা ভয় ছিল, উনি যদি আমাকে চিনে ফেলেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ধমকানির কথাটা মাথায় ছিল তো! কিন্তু উনি চিনতে পারেননি। না পারবারই কথা। এই ছ'সাত বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে তো।

কালক্রমে আমি রূপাঞ্জলি ছেড়ে উল্টোরথ পত্রিকায় যোগ দিয়েছি। পদোন্নতি ঘটেছে। সেই সঙ্গে ঘটেছে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ততদিনে তিনি আমার কানুদা হয়ে গেছেন। শুটিং দেখতে গেলে তাঁর সঙ্গে গল্প গুজব করে সময় কাটাই। থিয়েটার দেখতে গেলে গ্রিনরুমে বসে আড্ডা দিই। একটু একটু করে জানতে পারি তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু কোনদিন তাঁর কাছে আমার প্রথম যৌবনের সেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পোস্ট অফিসের বালখিল্য ব্যাপারটির কথা প্রকাশ করিনি। সেদিন যেভাবে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন সেই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেই ভয়েই প্রকাশ করিনি।

কানুদার জন্ম ১৯০৫ সালে। না, কলকাতায় নয়, এমন কি বাংলাদেশেই নয়। উনি জন্মেছিলেন

রাজস্থানের যোধপুরের পচভদ্রা নামক একটা জায়গায়। ওঁর বাবা শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সেখানে চাকরি করতেন। ছোটবেলা থেকেই গান-বাজনা, আবৃত্তি অভিনয় ইত্যাদির দিকে ঝোঁক। সে ব্যাপারে বাবাও উৎসাহ দিতেন।

কানুদা ম্যাট্রিক পাশ করেন বাগবাজারের মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক থেকে। তারপর সিটি কলেজে ভর্তি হলেন। হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলে। প্রথমে ভেবেছিলেন চাকরি করতে করতে প্রাইভেটে পড়বেন। কিন্তু রেলের চাকরিতে সেটা সম্ভব নয়। অতএব পড়াশোনায় ইতি।

পড়াশোনায় ইতি ঘটলেও আবৃত্তি অভিনয় ইত্যাদি ব্যাপারে ইতি ঘটতে দিলেন না। পাড়ার অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করতে লাগলেন। চেহারাটা বেশ লালটু লালটু মার্কা ছিল তো, তাই তাঁর ভাগ্যে বেশিরভাগ ফিমেল রোলই জুটত। তখনকার দিনে অ্যামেচার ক্লাবে ফিমেল নিয়ে অভিনয়ের চল ছিল না। ভদ্রবাড়ির মেয়েরা অভিনয় করতে আসতেনই না। তাই গোঁফ কামানো ফিমেল দিয়েই আসর মাত করতে হত।

ফিমেল রোলে তখন কানুদার একটু নামডাক হয়েছিল। যে কারণে সুকিয়া স্ট্রিটের সান্ধ্য সমাজ তাঁকে নিয়ে যান তাঁদের ক্লাবে অভিনয় করাতে। ওই ক্লাবে পেশাদার মঞ্চের বেশ কিছু তরুণ শিল্পীও অভিনয় করতেন। তাঁদের মধ্যে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করবার মতো। এই রতীনবাবু পরবর্তীকালে অনেক ছবির নায়ক হয়েছেন। বেশ দাপটের সঙ্গে বিভিন্ন থিয়েটার কাজ করেছেন।

সান্ধ্য সমাজ ক্লাবে রতীনবাবুর সঙ্গে কানুদার পরিচয় তাঁর অভিনয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ওখানে কানুদা বিখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পুত্র ভুবনেশ মুস্তাফির পরিচালনায় 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে প্রতাপের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। কানুদার অভিনয় রতীনবাবুর খুব ভালো লাগে। তিনিই জোর করে কানুদাকে নিয়ে যান রঙমহল মঞ্চে। সেখানে 'আলমগীর' নাটকে কামবক্সের চরিত্রে কানুদার প্রথম পেশাদারি মঞ্চে আত্মপ্রকাশ। সেটা ১৯৩২ সাল।

কথায় কথায় কানুদা একদিন বলেছিলেন : জানো ভাই, রতীনদার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। উনি জোর করে, জবরদস্তি করে, সাহস যুগিয়ে যদি আমায় প্রফেশ্যনাল স্টেজে না দিয়ে যেতেন তবে তোমাদের কানুদাকে চিরকাল কেরানিগিরি করেই কাটাতে হত। রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসবার সৌভাগ্য কোনদিনই হত না।

হ্যাঁ, কানুদার জীবনে সে এক চাঞ্চল্যকর সৌভাগ্যের মুহূর্ত। ওই রঙমহলে অভিনয় করতে করতেই শিশিরকুমার ভাদুড়ির নজরে পড়ে গেলেন। যোগ দিলেন শিশিরবাবুর দলে। শিশিরবাবু কানুদাকে সত্যিকারের অভিনেতা করে তোলেন উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে। এর পরেই শিশিরবাবু যখন তাঁর দল নিয়ে ভারত পরিক্রমায় বেরোন তখন কানুদা ছিলেন সেই দলের এক বিশিষ্ট সদস্য। রেলের চাকরিটাও সেই সময় ছেড়ে দেন কানুদা। শিশিরবাবু নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি শোনেননি। পরে কানুদা কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগে চাকরি পান। কালক্রমে সে চাকরিও ছেড়ে দেন সিনেমার কাজের চাপে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কানুদার দেখা হয় 'যোগাযোগ' নাটকে অভিনয়ের সূত্রে। শিশিরবাবু তখন স্টার থিয়েটার হাতে নিয়েছেন। সেখানেই অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ। কানুদা ওই নাটকে নবীনকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই নাটক দেখতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কানুদা বলেছিলেন : সেদিন যে কী ভয় করছিল সে কী বলব। স্টেজে অ্যাপিয়ারের আগের মুহূর্তে সারা শরীর কাঁপছিল। অডিটোরিয়ামে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। তাঁর সামনে অভিনয় করতে হবে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রের। এ কি সোজা কথা! সেদিন একটা ঘোরের মধ্যে অভিনয় করেছিলাম। পরের দিন বড়বাবু (শিশিরকুমার) বললেন : ওহে কানু, তোমার সমন এসেছে। জোড়াসাঁকোয় যেতে হবে। কবিগুরুর আদেশ।

বলতে বলতে কানুদা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। যেন ফিরে গেলেন সুদূর অতীতের সেই স্বপ্নময় মুহূর্তে। তারপর একসময়ে ফিরে এলেন সেখান থেকে। বললেন : বড়বাবুর কথা শুনে বুকের মধ্যে আবার কাঁপুনি শুরু হয়েছিল। তবে কি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি আমার অভিনয়। তাই তলব

করেছেন তিরস্কার করতে। একবার মনে হল কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ি। তারপর মনে হল, ডেকে যখন পাঠিয়েছেন তখন যাওয়াই তো উচিত। যা থাকে ভাগ্যে। না হয় দুটো কটু কথাই শুনব, তবু দেবদর্শন তো হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : দেবতা কী বললেন?

কানুদা একটু লজ্জিত মুখে বললেন : যা বললেন সেটা নিজের মুখে বলতে লজ্জা করে। তিনি বললেন : 'তোমার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যে মহিলাটি তোমার স্ত্রী করলেন তার অভিনয়ও আমি উপভোগ করেছিলাম।' আর এই কথা শোনার পর আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। জীবনে যদি আর কোন কিছু নাও পেতাম, তোমাদের ওই সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালীর জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিও যদি না পেতাম, তাতেও কোন কিছু আসত যেত না। কবিগুরুর ওই সামান্য ক'টি কথা আমার কাছে অমৃত সমান হয়ে বেঁচে থাকত।

'পথের পাঁচালী'র কথা যখন উঠল তখন কানুদার সিনেমার জীবনের কথাতেই আসা যাক। এই জীবনে প্রবেশের মূলেও রয়েছেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি তাঁর 'শশীনাথ' ছবিতে কানুদাকে ছোট্ট একটি চরিত্র দেন। কানুদা সেই অকিঞ্চিৎকর চরিত্রটিতেও অসাধারণ অভিনয় করেন এবং তারপর থেকে অন্য পরিচালকদের ছবিতেও তাঁর ডাক আসতে থাকে। সেটা ১৯৩৭ সাল।

এই তথ্য আমার কানুদার কাছ থেকেই পাওয়া। পরে আমি শুনেছি কানুদা নাকি ১৯২৭ সালে নির্বাক 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং ১৯৩৪ সালে মন্মথ রায় পরিচালিত সবাক ছবি 'শুভ ত্র্যহস্পর্শ'য় কাজ করেছিলেন। কিন্তু কানুদা এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেননি। কাজেই কানুদা অভিনীত প্রথম ছবি কোন্‌টি এটা আমার কাছে রহস্যাবৃত হয়ে রইল।

কানুদা সারা জীবনে তিনশোর বেশি ছবিতে কাজ করেছেন। আর বিভিন্ন ধরনের সব চরিত্র। কমেডি আর ট্রাজেডি দুই ধরনের অভিনয়েই ওস্তাদ। তবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জীবনে খুব বেশি পাননি। পেয়েছেন মাত্র দু'বার। এক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী'তে হরিহর এবং তারই জের হিসেবে 'অপরাজিত'তে। আর দ্বিতীয়টি হল প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ছবিতে রামকৃষ্ণের চরিত্রে। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে কানুদা অভিনীত কয়েকটি ছোট চরিত্রের কথা বলে নিই, যেগুলির কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বোসার্ট প্রোডাকসন্সের 'প্রিয়তমা' ছবিতে কানুদাকে এক মোটর মেকানিকের ছোট্ট চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করতে দেখেছিলাম। ওই ছবিতে হেমন্ত মুখার্জির সেই বিখ্যাত গান 'স্মরণের এ বালুকাবেলায়' এবং নায়ক পাহাড়ি সান্যালের অভিনয় ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেছি। কেবল ভুলতে পারিনি কানুদার অভিনয়। ভুলতে পারিনি অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রযোজিত এবং চিত্ত বসু পরিচালিত 'পূরবী' ছবিতে কানুদার অভিনয়। এখানেও তিনি মিস্ত্রি। আগের ছবিতে কমেডির টাচ। আর এখানে কমেডির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চোখে জল এনে দেওয়া। অজয় কর পরিচালিত 'জিঘাংসা' ছবিতেও ওঁর অভিনয় ভুলতে পারিনি। জলার পেত্নীকে কেন্দ্র করে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নির্দোষ হয়েও উনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কী মারাত্মক সব এক্সপ্রেশান! আমার তো মনে হয় কানুদার মতো একজন বড় মাপের শিল্পীর আরও বড় মাপের কাজ পাওয়া উচিত ছিল।

১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবিতে অভিনয়ের-সূত্রে কানুদাকে নিয়ে দেশ জুড়ে হইচই পড়ে গেল। এত স্বাভাবিক তাঁর অভিনয়। কিন্তু ওই ছবির মাস চারেক পরে কানুদা 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ছবিতে যে অসাধারণ অভিনয় করলেন তা নিয়ে কোন হইচই পড়ল না। এতদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে যতগুলি ছবি হয়েছে তার সবগুলিতেই রামকৃষ্ণ একজন পাগল পাগল ন্যালাখ্যাপা চরিত্র। কিন্তু আসল রামকৃষ্ণ তো তা নয়। তিনি একজন সরল, ধার্মিক এবং প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। তাঁর সেই বুদ্ধির দীপ্তির পরিচয় পেয়েই তো বিবেকানন্দ, গিরীশ ঘোষ, কেশব সেনের মতো ইনটেলেকচুয়ালের দল তাঁর চরণে শরণ নিয়েছিলেন।

সেই রামকৃষ্ণকে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কানুদা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। এজন্য তাঁর

বিশেষ সম্মান পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ইনটেলেকচুয়াল দর্শকরা তার ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। এত বড় মাপের একটা কাজ অনুল্লেখ্যাই রয়ে গেল।

এ নিয়ে কানুদারও অনেক আপসোস ছিল। বললেন : জানো ভাই, এই চরিত্র হাতে পেয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলাম। পড়তে পড়তে রামকৃষ্ণদেবের ইনটেলেক্টটাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। যত পড়ছিলাম, ততই মুগ্ধ হচ্ছিলাম। আমার নিজের মধ্যেই নানা ভাঙচুর শুরু হয়ে গিয়েছিল। কী বলব বলো, আমারই দুর্ভাগ্য। ছবিটা ভালো করে কেউ দেখলই না।

'পথের পাঁচালী'র ওই দুর্দান্ত পাবলিসিটি পাওয়ার পর কানুদার যেন কিছুদিনের জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজের মধ্যে একটা দম্ভ এসে গিয়েছিল। আগেকার মতো যে কোন চরিত্রের অফার এলে ফিরিয়ে দিতেন। যা তা রেট চাইতেন। একটা চরিত্রাভিনয়ের জন্যে নায়কের সমান টাকা দাবি করতেন। ফলে ওঁর ছবির সংখ্যা কমে গেল। তেমন কোন অফারও আসত না। উনি নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়ে গেলেন।

পরে কানুদা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। নিজেকে স্বাভাবিক করে ফেলেছিলেন। ওই সময় বিশ্বরূপার 'ক্ষুধা' নাটকে এক পাগল অধ্যাপকের চরিত্রে দারুণ অভিনয় করলেন। আবার ওঁর কাছে কাজ আসতে শুরু করল।

কানুদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা কানুদা, 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' ছবিতে অত সুন্দর অভিনয় করার পরও সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য ছবিতে আপনার আর ডাক পড়ল না কেন বলুন তো?

এক বুক অভিমান নিয়ে কানুদা উত্তর দিয়েছিলেন : সত্যজিৎবাবু তো তাঁর ওই ছবি দুটোতে কানু বাঁড়ুজ্যেকে কাস্ট করেননি, করেছিলেন নিশ্চিন্দপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ হরিহর রায়কে। তা কাশীতে তার দেহ রাখার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। ব্যস, খেল খতম।

বলতে বলতে গলাটা ধরে এসেছিল কানুদার।

সেই এক বুক অভিমান নিয়েই কানুদা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। রেখে গেছেন আমার মতো কিছু মানুষের বুকের ভিতর একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কানুদার মতো একজন দুর্দান্ত অভিনেতাকে তেমন করে তো ব্যবহারই করা হল না আমাদের দেশের ছবিতে আর নাটকে। একমাত্র সুশীল মজুমদারই যা ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর প্রায় সব ছবিতেই কানুদাকে নিতেন। মোটামুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র দিতেন। বাকি আর কাউকে তো তেমন করতে দেখা যায়নি।

এই অবহেলাই কানুদার আয়ুকে সীমিত করে দিয়েছিল কিনা কে জানে।

কালোদা

পাহাড়ীদা ছোট্ট এক টুকরো মঘাই পান মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে বলে উঠলেন : সে কী! তোমার এখনও কালোর সঙ্গে আলাপ হয়নি। বলো কী হে! কদ্দিন হল তোমার ফিল্ম লাইনে—মানে এই ফিল্মের জার্নালিজমের লাইনে?

আমি বললাম : তা প্রায় সাত বছর হয়ে গেল। কিন্তু আমি তো আপনাকে কালোবাবুর কথা বলিনি। অসিতবরণের কথা বলেছি। অসিতবরণের সঙ্গে আমার আজও আলাপ হয়নি—সেই কথাটাই বলতে চাইছি।

পাহাড়ীদা হাসতে হাসতে বললেন : অসিত শব্দের অর্থটা কী বলো তো বাপু? তোমরা তো সব বাংলা ভাষায় দিগ্‌গজ। দেখা যাক তোমার বিদ্যের দৌড়টা।

আমি বললাম : এটা এমন কিছু কঠিন প্রশ্ন নয়। অসিত শব্দের অর্থ যে কৃষ্ণবর্ণ—এটা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে।

পাহাড়ীদা বললেন : আর তুমি যখন বাচ্চার বাবা তখন তো জানবেই। আর শুধু বাচ্চার বাবাই নয়, আমাদেরও বাবা।

আমি বললাম : এ আবার কী কথা।

পাহাড়ীদা বললেন : কেন, মিথ্যেটা কী বলেছি! একখানা ছবি কি দু'লাইন নিউজ ছাপাবার জন্যে তোমাদের বাবা-বাছা করতে হয় না?

পাহাড়ীদার কথায় আমি হেসে ফেললাম।

পাহাড়ীদা বললেন : তা বাবামশাই, কৃষ্ণবর্ণ শব্দের চল্‌তি বাংলা মানে যে কালো, এই কথাটা বুঝতে এত সময় লাগছে কেন?

আমি বললাম : অসিতবরণবাবুর নাম কি সত্যিই কালো, না কি আপনি অসিত শব্দের মানে নিয়ে রসিকতা করছেন?

পাহাড়ীদা বললেন : না রে বাবা না, আমি রসিকতা করছি না। তোমাদের ওই অসিতবরণের ডাকনাম সত্যিই কালো। আর ওই নামেই ও ফেমাস্। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার সঙ্গে কালোর এতদিনেও আলাপ হল না কেন?

আমি বললাম : আলাপ মানে, উই আর নোন্ টু ইচ আদার বাই আওয়ার ফেসেস্। কিন্তু মৌখিক কোনও বাক্যালাপ হয়নি।

পাহাড়ীদা উকিলের মতো জেরা করার ভঙ্গিতে বললেন : হয়নি কেন? তোমার অনীহা, না ওর দিক থেকে আগ্রহের অভাব?

অমি বললাম : না না, সেসব কিছু নয়। আসলে কেউ আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি বলেই আলাপ হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া উনি সর্বক্ষণ যেরকম গম্ভীর হয়ে থাকেন তাতে যেচে আলাপ করবার ভরসা পাইনি।

পাহাড়ীদা বললেন : না হে না, কালো খুব ভালো ছেলে। একবার আলাপ হলেই সেটা বুঝতে পারবে। ওই যে গম্ভীর হয়ে থাকার কথা বলছো, ওটা কিছুই নয়। আসলে ও ভীষণ লাজুক। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না, কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় থাকে না। সর্বক্ষণ নিজের কাজ নিয়েই মেতে থাকে। কাজটি ফুরোল তো বাড়ি গিয়ে হাজির। কিন্তু তুমি হঠাৎ কালোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইছো কেন? উদ্দেশ্যটা কী?

আমি বললাম : উদ্দেশ্যটা আর কিছুই নয় ওঁকে নিয়ে একটু লেখবার ইচ্ছে। তাই তো আপনাকে ধরেছি ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে।

পাহাড়ীদা বললেন : তার মানে ওর লাইফ নেবে? জীবনী লিখবে? উত্তম প্রস্তাব। তা তোমাকে যে তার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে হবে। ও এখন সেটে আছে। শট্ দিচ্ছে। সেট থেকে বেরোলেই তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আমি বললাম : তা অপেক্ষা করছি। কিন্তু ওই 'লাইফ' নেওয়াটা কী বস্তু?

পাহাড়ীদা হাসতে হাসতে বললেন : এটা আমার কথা নয় হে! তোমারই মতো এক অর্বাচীন সাংবাদিকের কথা।

আমি বললাম : তার মানে?

পাহাড়ীদা বললেন : সেদিন এক ছোকরা এসে আমাকে বললে, পাহাড়ীবাবু, আপনার সঙ্গে একটু বসতে চাই। আপনার লাইফটা নেব। তা আমি তাকে বললাম, হে প্রিয় মহাশয়, আমার পিতা-মাতা অনেক কষ্ট করে আমার জন্ম দিয়েছেন তাঁদের নামটি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে। আপনি চাইলেই তো আর সেটা দিয়ে দিতে পারি না। আমাকে মার্জনা করবেন। এই বলে তাকে আর কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলাম।

পাহাড়ীদার কথা শুনে হেসে ফেলেছিলাম। রঙ্গ-রসিকতা করবার সময় পাহাড়ীদা কখনও কখনও সাধু ভাষা ব্যবহার করতেন। তার ফলে ব্যাপারটা বেশ জমে যেত। আমরা প্রাণ ভরে উপভোগ করতাম।

পাহাড়ীদার কথায় হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে ভয়ানক লজ্জা বোধ করলাম। আজকাল এরকম কিছু কিছু সাংবাদিক নামধেয় ব্যক্তি বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে। তাদের কোন ট্রেনিং নেই। ছোটখাট কোন পত্রিকার পক্ষ থেকে তারা আসে। স্টুডিওতে ঘুরে বেড়াবার, আর্টিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ নেয়। তাদের এইসব বোকা-বোকা কাণ্ডকারখানার জন্যে আমাদের সকলের বদনাম হয়ে যায়।

প্রথম প্রথম আমিও প্রায় এইরকমই ছিলাম। কারও ইন্টারভিউ নিতে গেলে আপনি কবে জন্মেছেন, লেখাপড়া কতদূর, কেন ফিল্ম করতে এলেন, ইত্যাদি বোকা-বোকা কয়েকটি প্রশ্ন লিখে নিয়ে যেতাম। কিন্তু আমাকে সেই ভ্রান্তির জগৎ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার স্বর্গত বি এন সরকার। একেবারে প্রাসঙ্গিক না হলেও সে ঘটনাটা বলে নেওয়া দরকার। আগামীকালের চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের এটা উপকারেও আসতে পারে।

১৯৫০ কি '৫১ সালে মনে নেই, রূপাঞ্জলি পত্রিকার একটা 'চলচ্চিত্র সংস্কার সংখ্যা' প্রকাশ করা হয়েছিল। তার জন্যে মিস্টার বি এন সরকারের ইন্টারভিউ নেবার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। আমি ওই কারণে নিউ সিনেমা বিল্ডিং-এ মিস্টার সরকারের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর প্রতি আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল : একজন চলচ্চিত্র প্রযোজকের দায়িত্ব কী?

মিস্টার সরকার খুব গম্ভীর মানুষ। অল্প কথা বলেন। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন : সে অনেক।

এরপর আমি অপেক্ষা করছিলাম উনি আর কী বলেন তা শোনাবার জন্যে। উনিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমাকে বিস্মিত করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন : নেক্সট?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। বললাম : শুধু অনেক বললে তো সবটা বলা হল না। একটু ডিটেলে বলুন।

উনি বললেন : এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজিয়ে কতটুকু আর জানতে পারবেন। তার চেয়ে আমাদের নিউ থিয়েটার্সের ছবিগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করুন। দেখাবেন প্রযোজকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে অনেক কথাই আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে আমার মুখ থেকে। কখন কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোন্ ছবির কাজ শুরু করেছিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, এসব অনেক কথাই জানতে পারবেন।

মিস্টার সরকারের কথা শুনে নিজেকে লজ্জায় ধিক্কার দিয়েছিলাম। সেই থেকে আর কখনও কাউকে কোন প্রশ্ন করিনি। যাঁর সম্পর্কে লিখতে চাই তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে গেছি। প্রয়োজনে দিনের পর দিন। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার যতটুকু প্রার্থিত তার থেকে অনেক বেশি পেয়ে গেছি।

কিন্তু আমার আজকের রচনা পাহাড়ীদাকে নিয়েও নয়, আর মিস্টার বি এন সরকারকে নিয়েও নয়। আজকের রচনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন অসিতবরণ। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে তাঁর প্রসঙ্গে যাওয়াই

ভালো।

সেদিন স্টুডিওতে পাহাড়ীদার সঙ্গে আর দু'চারটে কথাবার্তা হয়েছে, এমন সময় ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এলেন অসিতবরণ। তাঁকে দেখেই পাহাড়ীদা চিৎকার করে ডাক দিলেন : এই কালো, এদিকে শোন্।

পাহাড়ীদার ডাকে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন অসিতবরণ। বললেন : কী বলছো পাহাড়ীদা?

পাহাড়ীদা আমাকে দেখিয়ে বললেন : এই যে, এই হতভাগাটিকে চিনে রাখো। ইনি হলেন শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ। সাংবাদিক হিসেবে এক নম্বরের বিচ্ছু। এ বলছে তোমার লাইফ নেবে। তা একদিন সময় সুযোগ করে তোমার লাইফটা একে দিয়ে দাও।

অসিতবরণ আমার দিকে ফিরে সুস্মিত মুখে ছোট্ট একটি নমস্কার করে পাহাড়ীদাকে বললেন : পাহাড়ীদা, আপনি হাতে ধরে এ লাইনে এনেছেন, আবার আপনিই আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন! আমার তো এই একটিমাত্র লাইফ। তা এটি ওঁকে দিয়ে দিলে আমার চলবে কী করে। ফিল্ম লাইনের কত সাধ-আহ্লাদ মেটানো বাকি রয়ে গেল যে!

বাঃ, ভদ্রলোক বেশ রসিক আছেন তো! আমি তো এঁকে ভেবেছিলাম রসকষহীন মানুষ। এখন তো দেখছি একটি ঝুনো নারকেল। ওপরের শক্ত খোলাটি ছাড়াতে পারলেই শাঁসে জলে টইটম্বুর।

পাহাড়ীদাও রসিকতার প্রত্যুত্তর দিতে কম যান না। বললেন : আরে দূর দূর! তোর আবার সাধ-আহ্লাদ! এতদিন ফিল্ম লাইনে আছিস, একটা স্ক্যান্ডাল পর্যন্ত করতে পারলি না! একেবারে অপদার্থ!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : রবি ভাই, আমার যা করণীয় করে দিলাম। এবারে তোমরা দু'জনে বোঝাপড়া করে নাও। আমি যাই, একবার ওদিকটা দেখি। এক হারামজাদা ডেট্ নিয়ে বসে আছে অথচ তার পাত্তা নেই। তার একটু পাত্তা লাগাই। আমার তো আর এই একটা কেস নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না!

এই বলে মৃদু হেসে আমার পিঠে একটি মোলায়েম চাপড় মেরে 'চলি রে কালো' বলে পাহাড়ীদা তার ছোটখাট হোল্ডলসদৃশ ব্যাগটি নিয়ে স্টুডিওর ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

অসিতবরণ আমার দিকে ফিরে বললেন : আপনার সঙ্গে তো আলাপ হয়েই গেল। এবারে চলে আসুন একদিন সকালে আমাদের বাড়িতে। রোববার হলে ভালো হয়। আমি এই কাছেই থাকি। কালীঘাটে। আমার বাড়ির ঠিকানা পাঁচিশ নম্বর প্রতাপাদিত্য প্লেস।

আমি বললাম : নাম্বার বলতে হবে না। শুধু রাস্তার নামটা জানলেই চলবে। রাস্তার নাম জানা থাকলে ফিল্ম আর্টিস্টের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু রবিবার না হয়ে অন্যদিন হলে কি অসুবিধে হবে?

অসিতবরণ বললেন : রবিবারে আপনার বুঝি অসুবিধে? আপনি থাকেন কোথায়?

আমি বললাম : নর্থ ক্যালকাটায়। বিবেকানন্দ রোডে। উল্টোরথ অফিসের কাছেই।

অসিতবরণ বললেন : ও বাবা, সে তো অনেক দূর। তা আপনি এক কাজ করুন। আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দিন। ফোর সিক্স ওয়ান সেভেন থ্রি সিক্স। একটা ফোন করে জেনে নেবেন। শুটিং না থাকলে আপনার সঙ্গে জমিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে।

তা বার চারেক ফোন করেও অসিতবরণকে ধরতে পারিনি। যখনই ফোন করি শুনি বেরিয়ে গেছেন। অগত্যা এক রবিরারেই হানা দিলাম ওঁর প্রতাপাদিত্য প্লেসের বাড়িতে।

না, বাড়ি গিয়েও দেখা পেলাম না। শুনলাম উনি বাজারে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ বাজারে?

উত্তর পেলাম : ঠিক বলা যাচ্ছে না। সাদার্ন মার্কেটও হতে পারে, লেক মার্কেটও হতে পারে, আবার দু'মাইল দূরের গড়িয়াহাট মার্কেটেও যেতে পারেন।

পুনর্বার জিজ্ঞাসা : কখন ফিরবেন?

এবারের উত্তর : সেটাও ঠিক বলা যাচ্ছে না। দশ মিনিটেও ফিরতে পারেন, আবার ঘণ্টা দুইও লেগে যেতে পারে।

অতএব শুরু হল আমার মার্কেট পরিক্রমা। সার্দান, লেক ইত্যাদি মার্কেট ঘুরে ওঁর দেখা পেলাম গাড়িয়াহাট মার্কেটে। অসিতবরণ তখন অতি সতর্ক গৃহস্থের মতো মাছের কানকো তুলে পরীক্ষা করছেন আর ধস্তাধস্তি করে দরদস্তুর করছেন।

আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমাকে দেখে একগাল হেসে বললেন : ও, আপনি এসে গেছেন। চলুন বসা যাক।

যেন এক্ষুনি বাজারের থলি হাতে নিয়েই কোন রকে বসে যাবেন ইন্টারভিউ দিতে। বড় সরল মানুষ এই অসিতবরণ।

এমন সময় পাশ থেকে এক যুবক বলে উঠল : এই যে অসিতবরণদা, কাল বসুশ্রীতে 'চলাচল' দেখলাম। টেরিফিক অ্যাকটিং করেছেন আপনি।

অসিতবরণ বিগলিত ভঙ্গিতে তরুণটির দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমার ভালো লেগেছে ভাই?

ছেলেটি বললে : দারুণ লেগেছে।

অসিতবরণ বললেন : তাহলে আর একবার দেখো। তোমার বন্ধু-বান্ধবদেরও দেখতে বোলো। প্রোডিউসার দুটো পয়সা পাবে।

এই হলেন অসিতবরণ। অমায়িক, সরল এবং সাদাসিধে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তুলনাবিহীন একটি মানুষ।

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম এই কলকাতা শহরে ১৯১৬ সাল। বাবার নাম তারাপদ মুখোপাধ্যায়। তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে অসিতবরণ মাকে হারান। উনি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। অভাবের সংসার, বিশৃঙ্খল পরিবেশ। অনতিবিলম্বে পড়াশোনায় ইতি।

ছোটবেলায় শ্যামবর্ণের এই সন্তানটিকে মা আদর করে কালো বলে ডাকতেন। কালক্রমে প্রতিবেশীদের কাছে ওঁর ডাকনামটাই থেকে গেল। অসিত নামটা সবাই ভুলে গেল।

মায়ের জীবদ্দশাতেই অসিতবরণ বৌবাজারের সার্পেন্টাইন লেনে অরফিক্ ক্লাবে যেতেন গান-বাজনার চর্চা করতে। গানের চেয়ে তবলাতেই ওঁর হাত খুলত বেশি। পড়াশোনা ছেড়ে দেবার পর বাবা চেষ্টা চরিত্র করে আলিপুরের টেলিগ্রাফ কারখানায় একটা কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু কাজে মন বসত না। তবলা পেটাতেই আগ্রহ ছিল বেশি। সেই সূত্রে তবলার জাদুকর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের নজরে পড়ে গেলেন। তাঁরই সহায়তায় তবলা বাজিয়ে দু'পয়সা রোজগার হতে লাগল। কালক্রমে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে তবলা বাজানোর চাকরিই পেয়ে গেলেন। তবলাটাকেই তখন মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরলেন অসিতবরণ।

রেডিওর বাইরে গানের ছোট ছোট আসরে তবলা বাজানোর সুযোগ পেতে লাগলেন অসিতবরণ। ক্রমে ছোট আসর থেকে বড় আসরে। অল্ ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সের তেমনি এক বড় আসরে অসিতবরণের বাজনা শুনলেন সিনেমার তৎকালীন জনপ্রিয় নায়ক পাহাড়ী সান্যাল।

অনুষ্ঠানের শেষে পাহাড়ীদা অসিতবরণকে ডেকে বললেন : দেখো বাপু, আমাদের দেশে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার একটা রেওয়াজ আছে। তা তোমার নামটি দেখছি সঠিক রাখা হয়েছে। অসিতবরণ। একেবারে গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নাম।

অসিতবরণ বললেন : আজ্ঞে আমার ডাকনামটাও ঠিক ঠিক রেখেছেন মা। কালো।

পাহাড়ীদা বললেন : বাঃ বাঃ, তোমার কথাবার্তাগুলি ভারি মিষ্টি তো হে! তোমার তবলার হাত মিষ্টি, ব্যবহারটা মিষ্টি, চেহারাটা মিষ্টি, মুখের হাসিটাও মিষ্টি। আর কী কী মিষ্টি আছে তোমার মধ্যে বলো দেখি?

অসিতবরণ সলজ্জে বললেন : আজ্ঞে আমি একটু-আধটু গানও গাইতে পারি।

পাহাড়ীদা বললেন : তাহলে তোমার গানের গলাটাও মিষ্টি হবে বলছো? তবে তো সোনায় সোহাগা। তাহলে আর বিলম্ব কেন? এবারে সিনেমায় নেমে পড়ো।

অসিতবরণ মাথা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দিলেন : না স্যার। আমি সিনেমায় নামব না। ওতে

তবলচির রোলগুলোয় কিচ্ছু করার থাকে না।

পাহাড়ীদা আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন : তবলচির রোলের কথা তোমাকে কে বলছে! আমি যেটা বলছি সেটা সেকেন্ড হিরোর রোল্। 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে আমার ভাই করতে হবে। আমরা বাইশ-তেইশ বছরের মিষ্টি চেহারার একটি ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে একবার লাক্ ট্রাই করে দেখতে পারো।

অসিতবরণ বললেন : এটা তো একটা দারুণ ব্যাপার। আমাকে কী করতে হবে বলুন?

পাহাড়ীদা বললেন : তুমি কাল বিকেলে এন-টি এক নম্বর স্টুডিওতে চলে এসো। হেমদা (পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র) থাকবেন, মিস্টার সরকার (বি এন সরকার) থাকবেন। আমি তোমার জন্যে ওঁদের কাছে জোরালো সুপারিশ করব। তারপর তোমার ভাগ্য।

তা অসিতবরণের ভাগ্যেই শিকেটা ছিঁড়েছিল। আরও দু-তিন জন ক্যানডিডেট ছিলেন, কিন্তু অসিতবরণকে পরীক্ষা করে দেখার পর তাঁরা বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন।

সেই ১৯৪১ সালে নিউ থিয়েটার্সে তরুণ শিল্পীর একটু অভাব যাচ্ছিল। 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে ছোট ভাইয়ের যা রোল্ তাতে তিরিশের দশকের নায়কদের মানাচ্ছিল না। এটা অসিতবরণের সৌভাগ্য।

অসিতবরণের সঙ্গে গড়িয়াহাট মার্কেটে দেখা হবার ঘণ্টা দুই পর থেকেই তিনি আমার 'কালোদা' হয়ে গিয়েছিলেন। 'আপনি'-র দূরত্ব পেরিয়ে আমরা অবিলম্বে 'তুমি'-তে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

তা কালোদা 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে চুটিয়ে অভিনয় করেছিলেন। আর কার পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয়। পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী, সুপ্রভা মুখার্জি, জহর গাঙ্গুলি, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ বাঘা বাঘা শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে। ওই ছবিতে কালোদার নায়িকা হয়েছিলেন ভারতী দেবী। উনিও তখন প্রায় নতুন। তার আগে একটি মাত্র ছবি 'ডাক্তার'-এ কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অসিতবরণ ও ভারতী দেবী নিউ থিয়েটার্সের একটি জনপ্রিয় জুটি হয়ে দাঁড়ান।

কালোদা তাঁর দ্বিতীয় বাংলা ছবি 'কাশীনাথ'-এর নামভূমিকায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। যেমন গান তেমনই অভিনয়। বিশেষ করে সেই দৃশ্যটির কথা আজও ভুলতে পারিনি। ওই ছবিতে ওঁর নায়িকা ছিলেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্বশুরবাড়ির অন্নদাস কাশীনাথকে যখন তাঁর স্ত্রী খেতে বসিয়ে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করছেন তখন ভাতের থালা ফেলে উঠে দাঁড়ানোর সময় তার চোখের জল আর দর্শকের চোখের জল একাকার হয়ে গিয়েছিল।

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি ছবি 'সৌগন্ধ' (প্রতিশ্রুতি'-র হিন্দি) এবং 'ওয়াপস'-এ অভিনয় করার পর কালোদার খ্যাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি পরিচালক বিমল রায়ের আহ্বানে বম্বে টকিজের 'পরিণীতা' ছবিতে গিরীনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অশোককুমার ও মীনাকুমারীর সঙ্গে। যে কোনও বঙ্গসন্তানের এই সৌভাগ্য ঘটলে তার আঙুল ফুলে কলাগাছ অথবা লাঙ্গুল ফুলে অজগর হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কালোদা ছিলেন নির্বিকার। আর এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শন। কোথাও আশাভঙ্গের কারণ ঘটলেও তিনি সহজভাবে সেটা মেনে নিতে পারতেন। কোথাও আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটলেও তিনি মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়তেন না। তাঁর এই সংযম ছিল দেখার মতো।

সারা জীবনে প্রায় দুশোর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন কালোদা। তার মধ্যে যেগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলি ছাড়া আর উল্লেযোগ্য ছবি হল নিউ থিয়েটার্সের 'নার্স সিসি', 'রূপকথা', রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে নীতীন বসুর 'দৃষ্টিদান' এবং 'যোগাযোগ', এম পি প্রোডাকসন্সের 'কার পাপে?', মধু বসু পরিচালিত 'রাখী' ও 'মহাকবি' গিরিশচন্দ্র', শৈলজানন্দ পরিচালিত 'ব্লাইন্ড লেন' ও 'কথা কও', চিত্ত বসু পরিচালিত 'বন্ধু', 'মা' ও 'মন্ত্রশক্তি', কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'রাণী রাসমণি', বিকাশ রায় পরিচালিত 'অর্ধাঙ্গিনী' ও 'নতুন প্রভাত,' অসিত সেন পরিচালিত 'চলাচল' ও 'পঞ্চতপা', প্রভাত মুখার্জি পরিচালিত 'মা', সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'দানের মর্যাদা' ও 'কালস্রোতে', অগ্রগামী পরিচালিত 'শিল্পী', তপন সিংহ পরিচালিত 'কালামাটি' ও 'হারমোনিয়াম', গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু পরিচালিত 'ধূমকেতু' ও 'ভয়', অগ্রদূত পরিচালিত 'সূর্যতোরণ', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ও 'বাদশা', তরুণ মজুমদার (যাত্রিক) পরিচালিত 'স্মৃতিটুকু থাক', 'কাঁচের স্বর্গ' 'আলোর পিপাসা' ও 'পলাতক', বিজয় বসু পরিচালিত

'ভগিনী নিবেদিতা' ও 'রাজা রামমোহন', অর্ধেন্দু মুখার্জি পরিচালিত 'রাধাকৃষ্ণ', ভূপেন রায় পরিচালিত 'মহাতীর্থ কালিঘাট,' সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', মৃণাল সেন পরিচালিত 'অবশেষে'। এছাড়া কালোদার উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় নিশ্চয় আরও অনেক ছবি বাদ পড়ে গেল, যেগুলির নাম আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

তালিকাটা হয়তো একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এই তালিকার দ্বারা আমি বোঝাতে চেয়েছি প্রায় সব নামকরা পরিচালকের ছবিতে তিনি কাজ করেছেন।

কালোদা খুব নর্মাল অ্যাকটিং করতেন। সেটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। কিন্তু সেই স্বাভাবিকতার মধ্যেও তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির আনন্দ বেদনা তাঁর বুকের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয়ে দর্শকের বুক জুড়ে বসত। কোন চরিত্রকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য অতিরিক্ত অঙ্গসঞ্চালন অথবা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন তাঁর হয়নি।

মঞ্চেও তিনি নর্মাল অ্যাকটিং-এর পক্ষপাতী ছিলেন। স্টারে 'পরিণীতা' কিংবা বিশ্বরূপার 'সেতু' নাটকে আমরা তাঁর সে পরিচয় পেয়েছি। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম মিনার্ভার 'ডাঃ শুভঙ্কর' নাটকটি। তিনি যে প্রয়োজন হলে অতি-অভিনয়ও করতে পারতেন তার প্রমাণ দিয়েছেন ওই নাটকে।

কালোদাকে আমি কখনও রাগতেও দেখিনি কিংবা দুঃখ পেতেও দেখিনি। একটু ঋষিতুল্য ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল। স্টুডিও থেকে বাড়ি আর বাড়ি থেকে স্টুডিও—এই ছিল তাঁর পরিক্রমার পরিধি।

কালোদাকে আমি রাগাবার কিংবা দুঃখ পাওয়াবার চেষ্টা করেছি কয়েকবার। যেমন একবার বলেছিলাম : কালোদা, আপনি তো এত নর্মাল অ্যাকটিং করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে আপনাকে ডাকেন না কেন বলুন তো?

কালোদা সশ্রদ্ধায় কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিলেন : ওরে বাবা, উনি হলেন গ্রেট মাস্টার। প্রয়োজন হলে নিশ্চয় ডাকবেন একদিন। এই কলকাতা শহরে আমরা তো দু'জনেই আছি। নিশ্চয় একদিন ডাক পড়বে।

কিন্তু সে ডাক আর পড়েনি। কয়েক বছরের ব্যবধানে কালোদা আগে আর তারপরে সত্যজিৎ রায় পৃথিবী ছেড়েই চলে গেলেন। ডাকাডাকির ব্যাপারটা আর ঘটল না। এ নিয়ে আমার মনেও কালোদার মতোই অক্ষেপ থেকে গেছে।

হরিধনদা

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভূমেন রায়। ভাবতে লাগলেন, এ কীরকম হল ব্যাপারটা। বিপ্লবী হিসেবে তাঁর ওই জ্বালাময়ী সংলাপের পর সারা প্রেক্ষাগৃহ তো করতালিতে ফেটে পড়ার কথা। তার বদলে দর্শকদের কণ্ঠে হাসির হররা। তাও আবার দাঁত বার করে। আর হাসি বলে হাসি। সে হাসি যেন আর থামতেই চায় না।

কিন্তু এরকম তো হবার কথা নয়। এর আগে 'পথের দাবী' নাটকে যতবার অভিনয় করতে নেমেছেন, ঠিক ওই জায়গাটিতে তুমুল হাততালি আদায় করে ছেড়েছেন। আজও প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছেন ওই অংশটিতে। অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দর্শকদের তো রোষে ফেটে পড়ার কথা! ওই আগুন ঝরানো সংলাপের বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে পাবেন দর্শকের করতালি আর রোষতপ্ত চিৎকার। তার বিনিময়ে হাসি! এ যে ভাবাই যায় না!

তবে কি আবেগের বশে অভিনয় কবতে গিয়ে তিনি নিজেই কোন বিপত্তি ঘাটিয়ে ফেলেছেন। চকিতে একবার তাকিয়ে নিলেন নিজের পরিধেয় পোশাকের দিকে। বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে। যাচাই করে নিলেন সেখানে কোন অঘটন ঘটে গেছে কিনা।

না, সবই তো ঠিকঠাক আছে। তবে এই হাসির কারণটা কী? আর দর্শকরা হাসছে তো হাসছেই। থামবার নামটিও নেই। বরং সে হাসি ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে। নিজের অজান্তে এমন কী অঘটন তিনি ঘটিয়ে ফেলেছেন যাতে দর্শকের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা মুশকিল হয়ে উঠেছে। ভেবে কোনও কুলকিনারা পেলেন না ভূমেন রায়।

হঠাৎ তাঁর মনে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সন্দেহ দেখা দিল। চকিতে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন হাস্যরসাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় তাঁকে মুখ ফেরাতে দেখে তটস্থ হয়ে গঙ্গাজলের পাত্রটি হাতে নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। হরিধনের সেই পলায়মান ভঙ্গি দেখে দর্শকরা পুনরায় তারস্বরে হেসে উঠলেন।

ভূমেন রায় সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। ক্রোধে তাঁর চোখমুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। এই দৃশ্যে তো হরিধনের এখানে থাকার কথা নয়। তবে ও এল কী করে? নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। এখনই এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। মুখ ফিরিয়ে তিনি ইশারায় ড্রপ ফেলবার নির্দেশ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেলেন স্টেজ থেকে।

সত্যিই ওই দৃশ্যে হরিধন মুখার্জির উপস্থিত থাকার কথা নয়। দৃশ্যটি ছিল বর্মায় ভারতীয় বিপ্লবী দল 'পথের দাবী'র এই আস্তানায় সংঘের সদস্যদের কাছে দলের সর্বাধিনায়ক সব্যসাচী তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখবেন। সব্যসাচীর চরিত্রে কমল মিত্র যথারীতি সেটি করেছেন এবং দর্শকদের করতালি নিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন দলের অন্যান্য সকলে। কেবল থেকে গেছেন আর এক বিপ্লবী ভূমেন রায় সব্যসাচীর এবং ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণটি দেবার জন্যে। তাঁর সেই ভাষণের মধ্যে আর কারও কোন সংলাপ নেই। কেবল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এক মুহূর্তের জন্যে একটি ফুলের সাজি হাতে নিজের মনে উঠে চলে যাবেন দোতলায়। সেই ফাঁকে ভূমেন রায় তাঁর দৃপ্ত ভাষণটি শেষ করবেন আর বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বেরিয়ে যাবেন।

এই দৃশ্যে ভূমেন রায় আজ পর্যন্ত যতদিন অভিনয় করেছেন ততদিনই ক্ল্যাপ পেয়েছেন। কোনদিনই তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কেবল আজই এমন একটা অঘটন ঘটে গেল যার জন্যে ভূমেন রায়কে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসতে হল স্টেজ থেকে।

এবারের এই 'পথের দাবী' হচ্ছিল কম্বিনেশন নাইটে। অর্গানাইজ করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। অভিনয় হচ্ছিল রঙমহল মঞ্চে। স্টেজ থেকে রাগে গর গর করতে করতে বেরিয়ে ভূমেন রায় সোজা এসে

হাজির হলেন ছবি বিশ্বাসের কাছে। উত্তেজিত হয়ে বললেন : এটা কী হল ছবি? হরিধন আমার ওই সিনে ঢুকল কী করে?

ছবিবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কোন সিনে?

ভূমেন রায় বললেন : যে সিন্‌টা আমি এইমাত্র করে এলাম।

ছবিবাবু বললেন : ও, তোমার সেই পার্মানেন্ট ক্ল্যাপ পাওয়ার সিনে?

ভূমেনবাবু বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। ওরকম সিরিয়াস সিনটাকে একেবারে তচনচ করে দিয়েছে। আমার বক্তৃতা শুনে লোকে কোথায় রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠবে, তার জায়গায় কিনা দাঁত বার করে খ্যা খ্যা করে হাসছে। হরিধনের কী দুঃসাহস! আমার সিনে ও ঢুকল কেন? আমি এক্ষুনি এর একটা বিহিত চাই। নইলে আমি মেক-আপ তুলে ফেলব।

ছবি বিশ্বাস বললেন : না না, মেক-আপ তুলবে কেন! আমি দেখছি কী হয়েছে। এই, কেউ একবার হরিধনকে ডাক তো!

একটু আগে ভূমেন রায়ের সিরিয়াস সিন তচনচ করবার যে ঘটনাটি ঘটে গেল, তার পিছনে আর একটি ঘটনা আছে। ভূমেন রায় এমনিতে খুব সহৃদয় মানুষ। দুর্দান্ত অভিনেতা তো বটেই। কার্ভালো, রডা, ক্রেভারিং ইত্যাদি বিদেশী চরিত্রে তাঁর সমকক্ষ অভিনেতা তাঁর যুগে আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। সেসব ভূমেন রায় সম্পর্কে যখন লিখতে বসব তখন বলব। আপাতত ভূমেন রায় এবং হরিধনকে নিয়ে রঙমহল থিয়েটারে আজ যে ঘটনাটি ঘটে গেল তার নেপথ্যের ইতিহাসটুকু বলি।

আগেই বলেছি ভূমেন রায় খুব সহৃদয় মানুষ, বন্ধুবৎসল। মানুষের নানা উপকার করতেন। কিন্তু তাঁর একটি বদ দোষ ছিল। মদ্যপান করলে ছোট ছোট অভিনেতাদের কটাক্ষ করতেন। যদিও তিনি নিজে অনেক কমেডি অ্যাকটিং করেছেন, কিন্তু কমেডিয়ানদের অভিনেতা হিসেবে গণ্য করতেন না।

এই নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকবার বাদানুবাদ হয়ে গেছে হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হরিধনবাবু ভূমেন রায়ের চেয়ে প্রায় সাত বছরের ছোট। ইয়ং ব্লাড। কমেডিয়ানদের প্রতি ভূমেন রায়ের কটাক্ষের তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তাই নিয়ে দু'জনে খুব উত্তেজিত হয়ে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিতেন।

একবার এইরকম এক উত্তেজনার মুখে হরিধন ভূমেন রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। বললেন : কমেডিয়ানদের ক্ষমতা আছে কিনা তা আমি একদিন আপনাকে দেখিয়ে দেব।

ভূমেন রায়ও উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন : তুমি কাঁচকলা করবে। আর্শুলা আবার পাখি, কমেডিয়ান আবার অভিনেতা। কমেডি যদি করতে পারে তো সিরিয়াস অ্যাকটররাই পারে।

হরিধনবাবুও সতেজে জবাব দিলেন : বেশ তো, একদিন আপনাকে দেখিয়ে দেব কমেডিয়ান কী করতে পারে। আপনাকে ল্যাজে গোবরে করে ছাড়ব।

তা এসব অনেক দিনের কথা। এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা কিন্তু ছবি বিশ্বাসের জানা ছিল। তাই রঙমহলে যখন 'পথের দাবী'-র কম্বিনেশন নাইট ঠিক হল তখন হরিধন মুখার্জিকে একটি রোল দিয়ে ছবি বিশ্বাস বললেন : কী রে হরে, এবারে কম্বিনেশনে তো ভূমেনকে পেয়েছিস। তা তোর সেই চ্যালেঞ্জের কেরামতিটা এবারে দেখিয়ে দিবি নাকি?

হরিধন বললেন : দেখাতে পারি, তবে আপনারা কেউ ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবেন না। এটা যদি খেলাচ্ছলে নেন তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কারণ আমি যদি সাকসেসফুল হই তাহলে তো ভূমেনদা আপনার কাছেই কম্‌প্লেন করবেন।

ছবিবাবু বললেন : সে আমি ম্যানেজ করব এখন। তবে মারাত্মক কিছু করে বসিস না যেন। সব কিছু যেন হাসিঠাট্টার মধ্যেই থাকে।

ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে এমনি একটা ক্লিয়ার অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং-এ এসে হরিধন খুঁজতে লাগলেন কী করে ভূমেন রায়কে টাইট দেওয়া যায়।

যে দৃশ্যে ভূমেন রায় টাইট খেলেন, সেই দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ছোট্ট একটু অ্যাপিয়ার ছিল। ভূমেন রায় যখন কথা বলছেন তখন সাবিত্রী পুজোর ফুলের সাজি নিয়ে ধীরে ধীরে ভূমেনবাবুর পিছনের

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে চলে যাবেন। তা সাবিত্রী সেদিন যে কোন কারণেই হোক, বোধহয় আঁচলটা খুলে-টুলে পড়েছিল, সিঁড়িতে ওঠবার আগে ফুলের সাজিটা একবার মেঝেতে নামিয়ে আঁচল ঠিক করে আবার সাজিটা তুলে নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

এটা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু হরিধনের চোখে যখনই এটা পড়ল তখনই তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন স্টেজে যাবার। সাবিত্রী সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড়ে গিয়ে একটা ছোট্ট কমণ্ডলুতে খানিকটা জল ঢেলে নিয়ে দ্রুত স্টেজে ঢুকে গেলেন।

ভূমেন রায় তখন বীরদর্পে গলা চড়িয়ে তাঁর ডায়লগ বলে যাচ্ছেন। তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর পিছনে কী ঘটনা ঘটছে। দর্শকরাও তখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ভূমেন রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ওদিকে হরিধন তখন করেছেন কী গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে নদবদ নদবদ করতে করতে স্টেজে ঢুকে গেছেন। স্টেজে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। যেন কোন অপরাধ করে ফেলেছেন এমনি ভঙ্গিতে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে ফেলেছেন। অডিটোরিয়ামে হাসির শুরু তখন থেকেই। তবে তেমন উচ্চগ্রামে নয়। তারপর কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নানা ভঙ্গিমায় জল ছড়াতে লাগলেন সাবিত্রী যেখানে ফুলের সাজি বসিয়েছিলেন সেই জায়গাটিতে। তারপর যতরকম অঙ্গভঙ্গি করা যায় তা করতে করতে নিঃশব্দে জায়গাটি পরিষ্কার করতে লাগলেন।

দর্শকদের হাসি তখন উচ্চগ্রামে উঠেছে। ভূমেন রায় কিছু বুঝতে না পেরে আরও বেশি করে কণ্ঠস্বর তুলে ডায়লগ বলতে লাগলেন। ওদিকে হরিধনও অঙ্গভঙ্গির মাত্রা বাড়িয়ে গঙ্গাজল দিয়ে জায়গাটিতে পাপমুক্ত করতে লাগলেন। ভূমেনবাবু বিস্মিত হয়ে নিজের পোশাক পরিচ্ছদ ডিস্‌প্লেসড হয়ে গেছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর যেই মুহূর্তে পেছন ফিরে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে হরিধন কমণ্ডলু নিয়ে আবার নদবদ নদবদ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন, একটু আগে যেখান দিয়ে সাবিত্রী নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। ভূমেন রায়ের ইঙ্গিতে যখন দৃশ্যটির ওপর পর্দা পড়ে গেল তখনও দর্শকদের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে।

ভূমেন রায়ের অভিযোগের তদন্ত করবার জন্য ছবি বিশ্বাস হরিধন মুখার্জিকে ডেকে পাঠালেন। যদিও তিনিই ছিলেন নাটের গুরু। তবু অভিযোগের তদন্ত তো তাঁকে করতেই হবে।

ছবিবাবুর ডাকে হরিধনবাবু হাজির হলেন। ছবিবাবু কপট গাম্ভীর্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার হরিধন, তুমি নাকি ভূমেনের সিনে ঢুকে পড়ে তার সিন্ মাটি করে দিয়েছো?

হরিধন উত্তর দিলেন : আমি সিনে ঢুকেছি সেটা সত্যি কথা, কিন্তু মাটি করেছি এ অভিযোগটা ঠিক নয়। কারণ স্টেজের ওপর এক মুঠোও মাটি ছিল না।

ওঁর কথা শুনে ভূমেন রায় ছাড়া আর সবাই হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে ছবিবাবু বললেন : কিন্তু সিনে ঢুকেছিলে কেন? ও সিনে তো তোমার ঢোকার কথা নয়।

হরিধন উত্তর দিলেন : তা ছিল না। কিন্তু একটা মহাপাপ চোখের সামনে ঘটবে এটা সহ্য করি কী করে! তাই বাধ্য হয়েছিলাম ঢুকে পড়তে।

ওঁর কথায় সবাই চমকে উঠলেন। মায় ভূমেন রায় পর্যন্ত। ছবি বিশ্বাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: মহাপাপ? সেটা আবার কী?

হরিধন বললেন : ওই সিনে সাবিত্রী সাজিতে করে ফুল নিয়ে যাবে। তা আজকের রিকুইজিশনে ফুল আসেনি। বাধ্য হয়ে গ্রিনরুমের ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি থেকে মালাটা খুলে নিয়ে সাজিতে দেওয়া হয়েছিল। পরে আবার সে মালাটা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছবিবাবু বললেন : তাতে কী হল। তার মধ্যে মহাপাপ কোথায়?

হরিধন উত্তর দিলেন : না, মহাপাপ তাতে নয়। তবে সাবিত্রী সিনে ঢুকে সাজিটা একবার স্টেজের ওপর রেখেছিল কিনা। তা ওই জায়গাটা মাড়িয়ে তো সবাইকে স্টেজে ঢুকতে বেরোতে হবে। তাই একটু গঙ্গাজল দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছিলাম। আর ওতে যে পাবলিক হাসবে তা জানব কী করে। আমি তো আর হাসিনি, পাবলিক হেসেছে। পাবলিককে গিয়ে ধরুন।

ছবি বিশ্বাস গম্ভীর হয়ে বললেন : তা ঠিকই করেছো। ঠাকুরের গলার মালা যেখানে রাখা হয়েছে

সেখানে তো আর আমরা পা দিয়ে হাঁটতে পারি না। তবে স্টেজে ঢোকবার আগে ভূমেনের একটা পাবমিশান নেওয়া উচিত ছিল।

হরিধন উত্তর দিলেন : সেটাও একবার ভেবেছিলাম। কিন্তু ভূমেনদা তখন যেরকম বীরদর্পে অ্যাকটিং করছেন আর পাবলিক যেরকম মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেটা শুনছে তাতে আর ওঁকে ডিস্টার্ব করতে চাইনি। চুপিসাড়ে কাজটা সেরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। তা আর হল কই। পাবলিকের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তারপর আবার আপনাদের কাছে।

ছবিবাবু বললেন . যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। ভূমেন, তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও। ও তো আমাদের ভালোর জন্যেই কাজটা করতে গিয়েছিল। আর কখনও যেন ওসব করতে যেও না। বিশেষ করে আমার সিন্ থাকলে কক্ষনো না। মনে থাকবে তো?

হরিধনবাবু বললেন : তা থাকবে। তবে আমারও একটা রিকোয়েস্ট আছে। এই যে সবাইকে মহাপাতক থেকে বাঁচালাম, এব জন্যে একটা পুরস্কার চাই।

ছবিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কী পুরস্কার?

হরিধন বললেন · কম্বিনেশন নাইট হলেই একটা করে রোল্।

ওর কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। এমন কি ভূমেন রায়ও। তিনি বলে উঠলেন: এতক্ষণে·আমার মগজে ঢুকেছে কেন হরিধন এই কাণ্ডটা করেছে। আমি একবার বলেছিলাম না, কমেডিয়ানরা·অ্যাকটর নয়। ও তারই প্রতিশোধ নিয়েছে। আচ্ছা বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। নেশার ঝোঁকে কী বলতে কী বলেছি তার ঠিক নেই। দোহাই তোমার, আর কখনও এমন করে টাইট-ফাইট দিও না।

এই হলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। কমেডি অ্যাকটব হিসেবে ভানু-জহর অজিত-নৃপতির সঙ্গে যাঁর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়।

হরিধনদার বয়স এখন ছিয়াশি বছর। সবে ছিয়াশিতে পড়েছেন। ১৯০৭ সালে জন্ম। বাবার নাম ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। মাত্র দু'বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন। কাজেই বাবার কোনও স্মৃতি নেই হরিধনদার মনে। তবে মায়ের স্মৃতি একেবারে টগবগে। মাকে চিরকাল দেবীর আসনে বসিয়ে রেখেছেন হরিধনদা।

ছোটবেলার অনেক স্মৃতিই এখন হরিধনদার কাছে ঝাপসা। কিন্তু একটি স্মৃতি এখনও তীব্র। সেটা হল দারিদ্র্যের স্মৃতি। দারিদ্র্যের সে চেহারা যে কী নিষ্ঠুর, কী মর্মান্তিক তা ভাবতে গিয়ে আজও শিউরে ওঠেন হরিধনদা। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে মাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যে কী লড়াই করতে হয়েছে তা চোখের সামনে দেখেছেন তিনি। আর সেই অসহনীয় অবস্থাটাই হরিধনদার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কিন্তু এত অভাবের মধ্যেও হরিধনদার মায়ের মুখের হাসিটি ছিল অম্লান। দারিদ্র্য যতই তার নখদন্ত বিস্তার করুক, মায়ের মুখের হাসিটি কেড়ে নিতে পারেনি কোনদিনই। ওই অত দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি জিনিস যা কোনদিনও করেননি। তা হল ঋণ। মা বলতেন, 'জগতে অ-ঋণী আর অ-প্রবাসী মানুষই সবচেয়ে সুখী।' এ কথাটা হরিধনদা চিরকাল মনে রেখেছেন। তিনিও জীবনে কারও কাছে এক পয়সাও ঋণ করেননি। নিজের কষ্টার্জিত উপার্জনের পয়সা তিল তিল করে জমিয়ে সল্ট লেকে একটি বাড়ি করেছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে কারও কাছে হাত পাততে হয়নি।

আর অ-প্রবাসী? হ্যাঁ, জীবনে তেমন হাতছানি এসেছে কয়েকবার। একবার তো তাঁর এক সুহৃদ বোম্বাইয়ে হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের ব্যবস্থাটা পাকা করেই ফেলেছিলেন। কিন্তু হরিধনদা সে লোভও জয় করেছেন। মায়ের সেই অ-ঋণী আর অ-প্রবাসী হবার মন্ত্রটা সব সময় তাঁর কানে বাজত।

তবে ঋণ যে একেবারেই করেননি, সে কথা বলা যাবে না। একবার তাঁকে ঋণ করতে হয়েছিল। তখন তাঁর বয়েস দশ কি এগারো। মায়ের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন একটি টাকা। আর সে টাকার বিনিময়ে যা করেছিলেন সেটাও রীতিমতো একটা নাটক। কিন্তু সে কথা এখন থাক। সে কথায় পরে আসছি।

হরিধনদার শিক্ষা উত্তর কলকাতায় রাজবল্লভপাড়ায় শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে। চলতি কথায় নাম ছিল জগবন্ধু পণ্ডিতের ইশকুল। এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবাদপুরুষ, বিখ্যাত নট ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু।

এই স্কুলের বার্ষিক উৎসবে সেবার একটি নাটক হল। 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ'। সিদ্ধার্থের ভূমিকাটি পেলেন হরিধনদা। বয়েস তখন কত? সাত কি আট হবে। রিহার্সালের সময় অমৃতলাল নিজে বসে থাকতেন। ভুলচুক হলে শুধবে দিতেন।

এই রিহার্সাল দিতে দিতেই অমৃতলালের নজরে পড়ে গেলেন হরিধনদা। ওঁর পরিষ্কার উচ্চারণ আর যথাযথ অভিব্যক্তি দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি এর আগে কখনও অভিনয় করেছো?

হরিধনদা ভাবলেন, রিহার্সালে নিশ্চয় কোন ভুলচুক হয়েছে। তাই ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে জবাব দিলেন : না।

রসরাজ জিজ্ঞাসা করলেন : এই প্রথম?

হরিধনদা বললেন . আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবারে হরিধনদাকে আরও কাছে টেনে নিলেন রসরাজ অমৃতলাল। তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন : বাঃ বাঃ, খুব ভালো। তোমার তো অভিনয়ের ন্যাক্ আছে হে! বেশ ভালো করছো তুমি।

রসরাজ অমৃতলালের সেই পিঠ চাপড়ানো আজীবন মনে রেখেছেন হরিধনদা। তার কম্পন এখনও সারা শরীরে অনুভব করেন। ওটা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

হরিধনদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : ওই সময় থেকেই কি আপনার মনে অভিনেতা হবার স্পৃহা জেগে উঠল?

হরিধনদা একটু হেসে বলেছিলেন : না না, ওসব স্পৃহা-টিহা কিছু জাগেনি। তখন কি ওসব কিছু বুঝি নাকি! তবে হ্যাঁ, সিদ্ধার্থের পার্ট করতে করতে একটা অন্যরকম কিছু মনে হত। আবেগের জায়গাগুলিতে বুকের মধ্যে কেমন যেন করত। যে বাবাকে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখিনি তাঁর জন্যে মনটা হু হু করত। আমাদের অভাবের কথা, মায়ের দুঃখের কথা ভেবে চোখ দুটো চিক চিক করে উঠত। সংলাপ বলতে বলতে গলাটা কেঁপে যেত। সবাই তখন হাততালি দিয়ে বলে উঠত, আমি নাকি দারুণ অ্যাকটিং করছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন অ্যাকটিং-ফ্যাকটিং কিছু বুঝতাম না। তবে আবেগে বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠত।

হরিধনদা পরে বুঝেছেন, এই যে আবেগ, এর উৎসটাই হল অ্যাকটিং-এর মূল জায়গা। তা সে জায়গায় পৌঁছতে হরিধনদাকে অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছিল। তবেই না নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছ থেকে ডাক এসেছিল 'মায়া' নাটকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে।

কিন্তু শুধু কি ঘাম? অনেক রক্তও তো ঝরাতে হয়েছিল তার জন্যে। সেই রক্তের চিহ্ন আজও হরিধনদা বয়ে বেড়াচ্ছেন শরীরে। সে এক রোমহর্ষক ঘটনা।

হরিধনদাকে অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে জীবনে এগোতে হয়েছে। কেউ তাঁর জন্যে এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দেয়নি। যা পেয়েছেন, যতটুকু পেয়েছেন, সবটাই লড়াই করে আদায় করে নিতে হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও হরিধনদা নিঃশত্রু। তাঁর শুভকামীর সংখ্যা অজস্র নয়, কিন্তু অশুভকামীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। এমন কি, প্রফেশ্যনাল জেলাসির কবলেও তাঁকে পড়তে হয়নি কোনদিন। তিনি কমেডি অভিনয় করতেন তাঁর নিজের মতো। কারও সঙ্গে তা মিলত না। তিনি কাউকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতেন না। তাঁকেও কেউ না। তিনি ফাংশান করতে যেতেন না। কাজেই সে ক্ষেত্রেও তাঁকে কোন প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। ভাবতে বিস্ময় লাগে, অর্ধ শতাব্দীর ওপর তিনি অভিনয় জগতে কাটিয়ে দিলেন কারও হিংসা আর দ্বেষের শিকার না হয়েও। সকলের ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। দিয়েছেনও।

এর পিছনে হরিধনদার মায়ের উপদেশ কাজ করেছে। আগেই বলেছি, মাকে অসম্ভব ভক্তি করতেন হরিধনদা। ঠিক দেবতার মতো। এই মা তাঁকে সেই শৈশবকালেই উপদেশ দিয়েছিলেন : হাত খুলে

দান করবি আর প্রাণ খুলে ভালোবাসবি। দেখবি তোর জীবনে কোন দুঃখ থাকবে না।

হরিধনদা মায়ের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে হাত খুলে দান করবার সামর্থ্য দেননি। কিন্তু প্রাণ খুলে ভালোবেসেছিলেন সবাইকে।

সেই শৈশবকালেই মায়ের দুঃখ, মায়ের কষ্ট দেখে হরিধনদা বিচলিত হয়ে পড়তেন। চোখের সামনে দেখতে পেতেন কী কষ্ট করে মা সংসার চালাচ্ছেন, কত কষ্ট করে তাঁদের মানুষ করছেন। মায়ের দুঃখে বুকটা ফেটে যেতো হরিধনদার। তাই ওই মায়ের কাছ থেকেই একটি টাকা ঋণ করে ব্যবসায় নেমে পড়েছিলেন সেই হাফপ্যান্ট পরা বয়েসেই। স্কুলে পড়তে পড়তেই।

বছর দেড়েক আগে হরিধনদার সঙ্গে কয়েকদিন বসেছিলাম তাঁর জীবনের নানা ঘটনা শোনবার জন্যে। তখনই জানতে পেরেছিলাম মায়ের দুঃখমোচনের জন্য তাঁর ব্যবসা কবার কথা। তখন তাঁর কতই বা বয়েস। বছর এগারো কি বারো। ওই বয়েসে স্কুলে পড়তে পড়তেই ব্যবসায় নেমে পড়েছিলেন। ক্যাপিট্যাল ছিল একটি টাকা। তাও ওই মায়ের কাছ থেকেই ধার করেছিলেন। সেই ঘটনাটা হরিধনদার মুখ থেকেই শোনা যাক।

হরিধনদা বললেন : ওই ছোটবেলায় সংসার চালানোর জন্যে মায়ের কষ্ট দেখে মনে হত আমিও কিছু রোজগার করে মায়ের হাতে দিই। কিন্তু ওই অতটুকু বয়স রোজগারের কোন পন্থা তো আমার জানা নেই। এমন সময় একটা আইডিয়া মাথায় খেলে গেল। টিফিনের সময় রোজই দেখতাম স্কুলের ছেলেরা বন্ধ গেটের গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে চানাচুর বাদাম লজেন্স—এইসব কিনে খায়। আমি ভাবলাম, আমিও তো এইরকম একটা কিছু ব্যবসা করতে পারি। তাহলে মায়ের দুঃখ ঘোচানো যাবে। ক্লাসের ছেলেরা নিশ্চয় আমার কাছ থেকে কিনে খাবে।

কিন্তু কিসের ব্যবসা করা যায়? বাদামের অনেক ঝামেলা। কাঁচা বাদাম কিনতে হবে, তারপর ভাজতে হবে। সে জন্যে আবার মায়েরই শরণাপন্ন হতে হবে। মা জানতে পারলে কিছুতেই আমাকে এসব ব্যবসা-ট্যাবসা করতে দেবেন না। চানাচুরেও সেই একই ঝামেলা। একদিন বিক্রি না হলে পরের দিন মিইয়ে যাবে। ব্যবসায় লস্ হয়ে যাবে। তার চেয়ে লজেন্সই ভালো।

লজেন্সওলাকে গিয়ে ধরলাম। বললাম : তোমরা কোথা থেকে লজেন্স নিয়ে আসো গো?

লজেন্সওলা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত যে আমি তার ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছি, তাহলে নিশ্চয় সে আমাকে লজেন্স কেনার জায়গাটির কথা জানাত না। সে ভাবল এটা এক স্কুল ছাত্রের নিছক কৌতূহল। তাই বলল : ওই তো শ'বাজারে লেবেঞ্চুসের কারখানা আছে, সেখান থেকে নিয়ে আসি।

শ'বাজার অর্থাৎ শোভাবাজার। তখনকার দিনে অশিক্ষিত লোকেরা ওই উচ্চারণই করত। কাজেই আমার বুঝতে কষ্ট হল না। স্কুল ছুটির পর চলে গেলাম শোভাবাজারে।

রাজবল্লভপাড়ায় আমাদের স্কুল থেকে শোভাবাজার বেশি দূরে নয়। খুঁজে খুঁজে লজেন্সের কারখানা বার করে ফেললাম। দেখলাম একটি লোক বসে বসে লজেন্স বিক্রি করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : লজেন্স কত করে?

লোকটি অন্য খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল : এক পয়সায় সাতটা।

সর্বনাশ! এক পয়সায় সাতটা হলে আমার কী লাভ! স্কুল গেটে এক পয়সায় ছ'টা করে বিক্রি হয়। এক পয়সার বিক্রি করলে একটামাত্র লজেন্স লাভের ঘরে থাকে। সাত পয়সার বিক্রি করতে পারলে এক পয়সা লাভ। তাহলে দশ টাকা লাভ করতে হলে সারা স্কুল জীবনটাই তো কাবার হয়ে যাবে।

মনে মনে যখন এইসব লাভ লোকসানের অঙ্ক কষছি, তখন লোকটি তাগাদা দিল : কই খোকা, তোমাকে ক'পয়সার লজেন্স দেব বল?

আমি কাচুমাচু হয়ে বললাম : আমি তো লজেন্স বিক্রি করব। আমাকে আর একটু বেশি করে দেবেন?

লোকটি এবার ভালো করে আমার দিকে তাকাল। আমার মলিন বেশ, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত চেহারা ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। হাতের বইপত্তরগুলিও তার নজর এড়াল না। তারপর বলল : তুমি তো ইশকুলে পড়ো বলে মনে হচ্ছে। তুমি লজেন্স বিক্রি করতে চাইছো কেন? কী নাম তোমার?

আমি বললাম : হরিধন। হরিধন মুখোপাধ্যায়।

লোকটি বলল : বামুনের ছেলে, তায় ইশকুলে পড়ো। তুমি করবে লজেন্স বিক্রি। কী ব্যাপারটা কী বলো দিকি?

আমি বললাম : আমরা তো খুব গরিব। বাবা নেই। মা খুব কষ্ট করে সংসার চালান। লজেন্স বিক্রি করে যা লাভ হবে সেই টাকা মাকে দেব।

লোকটি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। কী যেন ভাবল। তারপর বলল : শোন খোকা, আমি টাকায় সাতশো লজেন্স পাইকারি বিক্রি করি। তোমাকে এক টাকায় সাড়ে সাতশো লজেন্স দেব। আমি এক টাকার লজেন্স তোমাকে ধারে দিচ্ছি। তুমি বিক্রি করে আমার টাকা শোধ করে দিও। কিন্তু তুমি এসব কাজ পারবে কি? এসব যারা করে তারা পারে। তোমার দ্বারা সম্ভব হবে বলে তো মনে হয় না।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম : খুব পারব। দেখবেন, আমি ঠিক পারব। কিন্তু আমি তো আপনার কাছ থেকে ধারে জিনিস নিতে পারব না। আমার মা বলেছেন, কারও কাছে ধার করা উচিত নয়। আমার মাও কারো কাছে ধার করেন না।

লোকটি এবার আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। তারপর বললে : বাঃ, বড় চমৎকার কথা শোনালে খোকা। তোমার মায়ের কথা শুনে যদি সারা জীবন চলতে পারো তাহলে নিশ্চয় একদিন খুব বড় হবে তুমি। তবে আমি তার সঙ্গে আর একটি কথা বলব। তুমি যেমন কারও কাছ থেকে ধার করবে না, তেমনি কাউকে ধারে মালও দেবে না। তাহলেই তোমার ব্যবসা দাঁড়াবে। যাক, তুমি একটা টাকা যোগাড় করে আমার কাছে এসো। লজেন্স নিয়ে যেও।

উৎফুল্ল চিত্তে শোভাবাজার থেকে বাড়িমুখো হলাম। রাস্তায় আসতে আসতে হিসেব করতে লাগলাম। অঙ্কে আমি বরাবরই ভালো। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ নামতা শতকিয়া ইত্যাদি আমার কণ্ঠস্থ। চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা। পয়সায় যদি সাতটা করে লজেন্স বিক্রি করি তাহলেও আমার দেড়া লাভ। ইশকুলের লজেন্সওলা তো পয়সায় ছ'টা করে দেয়। আমার কাছে একটা বেশি পেলে ছেলেরা নিশ্চয় আমার কাছ থেকেই কিনবে।

কিন্তু সমস্যা হল মূলধনের। ওই একটা টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? স্কুল থেকে ফিরে মাকে গিয়ে ধরলাম। বললাম : মা, আমাকে একটা টাকা দেবে?

শুনে আঁতকে উঠলেন মা! বললেন : এক টাকা! সে যে অনেক পয়সা! কত পয়সায় এক টাকা হয় তা জানিস্?

বললাম : হ্যাঁ। চৌষট্টি পয়সায়।

মা বললেন : তবে। তুই ছেলেমানুষ। অত পয়সা তুই কী করবি রে!

আমি বললাম : করব একটা জিনিস। তুমি দাও না। আমি তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে দোব।

মা বললেন : ফেরত দিবি ! কোথা থেকে দিবি?

আমি বললাম : সে দোব এক জায়গা থেকে। কাজটা যদি ঠিক ঠিক করতে পারি—। সে তোমাকে পরে সব কথা বলব এখন। তুমি টাকাটা দাও না মা।

মা খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন : হ্যাঁরে, টাকা নিয়ে তুই জুয়া-টুয়া খেলবি না তো? বদমাইস ছেলেরা রাস্তায় বসে টাকা দিয়ে তাসের জুয়া খেলে সব।

আমি বললাম : ছি ছি, তুমি যে কী বল মা! আমাকে ওইসব বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেখছো কখনো?

মা আর কোন কথা বললেন না। চুপচাপ বাক্স থেকে একটি টাকা বার করে আমার হাতে দিলেন।

তা আমাকে একেবারে একটা গোটা টাকা চাইতে দেখে মায়ের তো আঁতকে ওঠবারই কথা। ওই ১৯১৮-১৯ সালে এক টাকার অনেক দাম। এক টাকায় আধ মণ ভালো চাল পাওয়া যেত। এক টাকার কাঁচা বাজার করলে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঝাঁকামুটে ডাকতে হত। এক টাকায় দেড় কেজি খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যেত। পাওয়া যেত একখানা বড় সাইজের কাতলা মাছ। হায় রে, কী সব দিন ছিল তখন!

পরের দিন থেকে শুরু হল আমার লজেন্স ব্যবসা। প্রথম প্রথম চুপি চুপি বন্ধুদের ডেকে লজেন্সের বাণিজ্য করতে লাগলাম। ক্রমশ সাহস বাড়ল। অন্যান্য ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লজেন্স বিক্রি করতে লাগলাম। দিন সাতেকের মধ্যে তিন-চার টাকার লজেন্স বিক্রি হয়ে গেল। আসলের ওপর টাকা দেড়-দুয়েক লাভও এসে গেল হাতে।

সাতদিন পরে মাকে তাঁর টাকা ফেরত দিয়ে দিলাম। মা কোনও প্রশ্ন করলেন না। শুধু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু আমার এই বেপরোয়া বাণিজ্যের একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে। তিনি এটা ভালো চোখে দেখলেন না। প্রথমে তো যৎপরোনাস্তি বকাবকি করলেন। তারপর হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ধরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন হেডমাস্টারমশাইয়ের সামনে।

আমাদের হেডমাস্টারমশাই ছিলেন পুলিনবাবু। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁকে ধরে-করেই আমি ফ্রিশিপ পেয়েছিলাম স্কুলে। 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নাটক দেখার পর আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সব শুনে তিনি অভিযোগকারী স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন : এতে হরির দোষ কোথায় তা তো আমি বুঝতে পারছি না। ও গরিবের ছেলে। ফ্রিশিপে পড়ে। ও যদি সৎপথে দুটো লজেন্স বিক্রি করে থাকে তাতে আপনার আপত্তিটা কোথায়?

স্যার বললেন : বলেন কী স্যার! আপত্তি হবে না! স্কুলটা লেখাপড়ার জন্যে। সেখানে আজ একজন লজেন্স বিক্রি করবে, কাল কেউ আলু-পটল বিক্রি করবে, পরশু আর একজন মাছ-টাছ নিয়ে বসবে। স্কুলটা তো তাহলে বাজার হয়ে গেল স্যার?

হেডস্যার বললেন : আপনার এই দূরপ্রসারী ভাবনা তারিফ করবার মতো। কিন্তু একটা কথা কি জানেন, আমাদের যা পঠন-পাঠন পদ্ধতি তাতে বছরের পর বছর একরাশ কেরানি তৈরি হচ্ছে। যদি সত্যিই আপনার অনুমান মতো কয়েকজন ব্যবসায়ী তৈরি হয় আমাদের ছাত্রদের মধ্যে, তাহলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

হেডস্যারের এই কথা শুনে অভিযোগকারী স্যার চুপ করে রইলেন। হেডস্যার আবার বললেন : হরির ব্যাপারটা একটু মানবিক দিক থেকে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি আপনাকে। স্কুলের ডিসিপ্লিন না ভেঙে ও যদি সৎভাবে যৎসামান্য রোজগার করতে পারে তাহলে সে ব্যাপারে আমাদের তো উৎসাহ দেওয়াই উচিত। আপনি কী বলেন?

অভিযোগকারী স্যার বললেন : আপনি যা চাইছেন তাই হবে স্যার।

ব্যস, আমি তো লজেন্স ব্যবসার লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। নিজের এবং অন্যের পড়াশোনার কোনও ক্ষতি না করে দ্বিগুণ উৎসাহে লজেন্স বিক্রির কাজে লেগে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশ টাকার মতো জমে গেল আমার হাতে।

সেই টাকাটা নিয়ে একদিন মায়ের হাতে দিলাম। মা অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: কিসের টাকা রে?

মাকে তখন সব ঘটনা খুলে বললাম। লজেন্স বিক্রির কথা, লজেন্স কারখানার মালিকের কথা, দুই স্যারের কথোপকথন—সব কিছু।

টাকা হাতে নিয়ে আমার কথা শুনতে শুনতে মায়ের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো থর থর করে একবার কেঁপে উঠল। তারপরই ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতেই ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানার উপর আছড়ে পড়লেন। কান্নার দমকে তাঁর সারা শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

আমার ব্যবসার প্রথম টাকাটা হাতে পেয়ে মা যে সেদিন কেন কেঁদে উঠেছিলেন তার কারণ আমি খুঁজে পাইনি। আজও পাইনি। তবে মায়ের চোখে জল দেখে সেদিন আমারও দুই চোখে জল নেমে এসেছিল। দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়া সেই জলে সারা পৃথিবী তখন আমার চোখের সামনে অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার।

বারো বছর বয়েসের সেই চোখের জলের কয়েকটা টুকরো সেদিন আবার ফিরে এসেছিল হরিধনদার চোখে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, হরিধনদার চোখের দুই কোণে দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু চকচক করছে।

এ ভি স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করার পরই হরিধনদা পড়াশোনা ছেড়ে দিলেন। লজেন্সের ব্যবসা তখন হরিধনদার সমস্ত মন অধিকার করে বসে আছে। পড়াশোনা থেকে মনোযোগ ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। উনি ঠিক করে ফেললেন পুরোপুরি ব্যবসাতেই আত্মনিয়োগ করবেন।

এই নিয়ে বাড়িতে বেশ অশান্তি হল। মা মুখ ভাব করলেন। দাদা রাগারাগি করলেন। কিন্তু হরিধনদা অচল অনড়। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াখেলায় মেতে গেলেন তিনি।

স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লজেন্সের ব্যবসাও বন্ধ। এখনকার দিনে যেমন ট্রামে বাসে বয়ম হাতে পঞ্চাশ পয়সায় তিনটে করে লজেন্স ফিরি হয়, তখনকার দিনে তেমন ছিল না। স্কুলের চৌহদ্দিতে লজেন্সের ক্রেতা হিসেবে যেমন ছাত্র বন্ধুদের পাওয়া যেত, এখন তো আর তেমন পাওয়া যাবে না। কাজেই হরিধনদাকে ব্যবসার সামগ্রী বদলাতে হল। কখনও কম দামি সাবান আর পাউডার, কখনও বা ঢেঁকিছাঁটা চাল। কিন্তু কোনওটাই তেমন জমল না।

হরিধনদারা তখন থাকতেন হাতিবাগান বাজারের পিছনে গ্রে স্ট্রিটের ওপর ডালিমতলা লেনে। দাদার এক বেকার বন্ধুর প্রস্তাব দিলেন : আয়, হাতিবাগান বাজারে বসে আলুর ব্যবসা করি। আমার টাকা, তোর পরিশ্রম।

রাজি হয়ে গেলেন হরিধনদা। এবং এ ব্যবসাটা মোটামুটি ভালোই চলল। যত অল্পই হোক, দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেলেন।

কিন্তু এটা তো হল পেটের খিদের সুরাহা। মনের খিদে তো এতে মেটে না। তার কী হবে?

হরিধনদা ছিলেন শ্রুতিধর মানুষ। যে গান একবার শুনতেন তা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠে তুলে নিতেন। এ অভ্যেসটা সেই ছোটবেলা থেকেই ছিল। সেটাই এখন মনের খিদে মেটানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগল হরিধনদাকে।

উত্তর কলকাতায় তখনকার দিনে যাত্রা-থিয়েটার, কবিগান-পাঁচালী, রামায়ণ-কীর্তনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় এপাড়া ওপাড়ায় এইসব লোকসংস্কৃতির আসর বসতই। হরিধনদা শ্রোতা হিসেবে মজে গেলেন ওইসব আসরে। দিনের বেলা আলু বেচা আর রাতের বেলা সংস্কৃতিচর্চা।

এর মধ্যে রামায়ণ গানটাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করল। একবার দু'বার শুনেই গানগুলি কণ্ঠে তুলে নিতে লাগলেন। তারপর একটি অসমসাহসিক কাণ্ড করে বসলেন। ডালিমতলার গরিবপাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি রামায়ণের দলই খুলে ফেললেন। অর্থাভাব? কুছ পরোয়া নেই। ছোটখাটো লাঠির আগায় পাট ঝুলিয়ে তাতে ভুষো কালি মাখিয়ে চামর তৈরি হয়ে গেল। পরিচিত পরিবেশে ওই দল নিয়ে রামায়ণ গেয়ে বেড়াতে লাগলেন হরিধনদা।

এই যে সুরের মধ্যে মজে গেলেন, এটাই তাঁকে টেনে নিয়ে গেল সংগীতের আরও বৃহত্তম ক্ষেত্রের দিকে। নাড়া বেঁধে গান শিখতে বসলেন শিবা মিশ্র আর পশুপতি মিশ্রের কাছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। হরিধনদা যে মোটামুটি ভালো গান গাইতে পারেন এটা আজ সর্বজনস্বীকৃত। তরুণ মজুমদারের 'ফুলেশ্বরী' ছবিতে তাঁর গাওয়া গানের কিঞ্চিৎ প্রচারও ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে একাধিকবার জোড়াসাঁকোয় গিয়ে নানা ধরনের গান শুনিয়ে বিশ্বকবির প্রশংসা অর্জন করেছেন বলেও শুনেছি। জানি না হরিধনদার গানের কোনও রেকর্ড আছে কিনা। অথবা ক্যাসেট। যদি না থাকে তবে সেটা অবিলম্বে করিয়ে রাখা দরকার। এই সেদিনও সল্ট লেকের বাড়িতে বসে তাঁর কণ্ঠস্বরের যৎসামান্য যা নমুনা পেয়েছি, তাতে আমি রীতিমতো বিস্মিত। আর কিছু না হোক, ওঁর গানের একটা আর্কাইভ্যাল ভ্যালুও তো আছে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বেশ মনোযোগ সহকারে হরিধনদা গান শিখতে লাগলেন শিবা আর পশুপতি মিশ্রের কাছে। শাস্ত্রীয় সংগীত। হরিধনদার ভাষায় রাগরাগিনীর গান।

হরিধনদা বললেন : ওই রাগরাগিনীর গান গাইতে গাইতে এক সময়ে বুকে ব্যথা ধরে গেল। ওসব

গান গাইতে হলে কল্‌জের জোর দরকার। আর কল্‌জের জোর পেতে গেলে ভালো খাওয়া-দাওয়া দরকার। তা ভালো খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ্য তো আমাদের ছিল না। কাজেই প্রাণ বাঁচাতে গান পরিত্যাগ করতে হল।

কিন্তু গান ছাড়া বেঁচে থাকতে কি প্রাণ চায়। তাই যাতে বুকে বেশি জোর না লাগে, সেই জন্যে নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন শিখতে লাগলাম। কীর্তনের মধ্যেই মনটা বিভোর হয়ে রইল।

এদিকে বুকের ব্যথাটা থেকে থেকেই চাগাড় দিয়ে ওঠে। মা আর দাদা দু'জনেই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষকালে মা একদিন বললেন : চল্ তোকে পুরী ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। সমুদ্রের হাওয়ায় শুনেছি শ্বাসকষ্ট কমে। আরও নানা রোগের উপশম হয়।

মায়ের সঙ্গে চলে গেলাম পুরী।

আর এই পুরীতে গিয়েই হরিধনদার জীবনে এমন একটা পরিবর্তন ঘটে গেল যাতে তাঁর জীবনের ছকটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল।

সন্ধ্যালগ্ন সমাগত। সেদিনের মতো যুদ্ধশেষের ভেরির আওয়াজ একটু আগেই শোনা গেছে। ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে বীর সৈনিকদের মৃতদেহ। নেপথ্য থেকে ভায়োলিনের করুণ সুর ভেসে আসছে। এমন সময়ে একটি নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদে সারা প্রেক্ষাগৃহ সচকিত হয়ে উঠল।

দেখা গেল পাগলিনীর মতো রাজমহিষী জনা ছুটে এসেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত রণভূমিতে। খুঁজে খুঁজে বার করছেন অর্জুনের শরাঘাতে জর্জরিত প্রবীরের মৃতদেহ। তাঁর করুণ কণ্ঠের অশ্রুবিজড়িত সংলাপ ভেসে বেড়াচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের কোণে কোণে। দর্শকের চোখ হয়ে উঠেছে অশ্রুসজল। কান পেতে শুনলে হয়তো তাঁদের দু-একটি দীর্ঘশ্বাসও কানে আসতে পারে।

সবাই তখন অবাক হয়ে ভাবছে কে এই অভিনেত্রী? সৌখিন দলের অভিনয়ে তখনকার দিনে কোন মহিলা শিল্পী না থাকারই কথা। কিন্তু আজ এই জনার চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন তিনি মহিলা না হয়েই যান না। কোন পুরুষের সাধ্য নেই এমন নিখুঁতভাবে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করার।

কিন্তু ইনি কে?

কেউ বললেন, নীহারবালা। কেউ বললেন, কুসুমকুমারী। এই নিয়ে ছোটখাটো তর্কও শুরু হয়ে গেল নাটকের যবনিকা পতনের পর। সন্দেহভঞ্জনের জন্য দু-চারজন দল বেঁধে হাজির হলেন গ্রিনরুমে। খোঁজ করে জানা গেল, জনার চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন তিনি এখন মেক-আপ তুলছেন।

কথাটা শুনে থমকে যেতে হল। একজন মহিলা, যিনি মেক-আপ তুলছেন, তাঁকে গিয়ে বিরক্ত করা বোধহয় সঙ্গত নয়। বিশেষ করে এখন হয়তো জামা-কাপড় বদলাচ্ছেন তিনি!

কিন্তু উদ্যোক্তারা অভয় দিলেন : যান না, ভেতরে যান। আপনারা তো ওঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন? আপনারা গেলে উনি খুশিই হবেন।

উদ্যোক্তাদের কথা শুনে সবাই হুড়মুড় করে মেক-আপ রুমে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন, এক ভদ্রলোক গেঞ্জি গায়ে আন্ডারওয়্যার পরে আয়নার সামনে বসে মেক-আপ তুলছেন।

যাঁরা ঘরে ঢুকেছিলেন তাঁরা আবার ছিটকে বেরিয়ে এলেন। উদ্যোক্তাদের ডেকে বললেন, যে ভদ্রমহিলা জনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

উদ্যোক্তাদের একজন বলে উঠলেন, ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা কোথায় পাব? আমাদের দলে তো কোনও ভদ্রমহিলা নেই।

দর্শকদের একজন বললেন : কেন, যিনি জনার পার্ট করলেন তাঁর কথা বলছি।

উদ্যোক্তাদের আর একজন কথাটা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, জনার পার্ট যিনি করেছেন তিনি ভদ্রমহিলা হতে যাবেন কেন! তিনি তো ভদ্রলোক। ওই তো বসে বসে মেক-আপ তুলছেন। ওঁর নাম হরিধনবাবু। হরিধন মুখার্জি।

ভদ্রলোক! ভারি আশ্চর্য তো! সবাই আবার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন মেক-আপ রুমে। অভিনন্দন জানানোর ফাঁকে ফাঁকে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ভদ্রলোককে। কী আশ্চর্য! এতক্ষণ

মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিখুঁত মহিলা সেজে সবাইকে যিনি কাঁদিয়ে ছাড়লেন তিনি এই ভদ্রলোক? বিশ্বাস হয় না।

উদ্যোক্তাদের দিকে তাকিয়ে একজন দর্শক বললেন, আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন না তো? নাকি যে মহিলা জনা করেছেন তাঁর সঙ্গে যাতে দেখা করতে না পারি তার জন্যে এই কৌশল ধরেছেন?

এ কথার উত্তর দিলেন হরিধনদা। বললেন : কী করলে আপনাদের সন্দেহভঞ্জন হবে? আর একবার মেক-আপ নিয়ে শাড়ি-টাড়ি পরে গড় গড় করে জনার পার্টটা করলে হবে কি? বলেন তো তাই করি।

দর্শনেচ্ছু দর্শকরা এ কথায় লজ্জা পেয়ে গেলেন। একজন বলে উঠলেন : না না, সে কথা নয়। আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি না। অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, মহিলা সেজে হল ভর্তি দর্শককে একদম বোকা বানিয়ে দিলেন! এক মুহূর্তের জন্যে কাউকে বুঝতে দেননি যে আপনি মহিলা নন, পুরুষ! অসাধারণ আপনার আজকের এই অভিনয়।

বছর দেড়েক আগে এক দুর্দান্ত গ্রীষ্মের দুপুরে লোলচর্ম ন্যুব্জদেহ অশীতিপর বৃদ্ধ হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সল্টলেকের বাড়িতে বসে তাঁর মুখ থেকে এইসব ঘটনা শুনতে শুনতে আমার মনেও সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। ভাবছিলাম, হরিধনদা আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন না তো? উনি তো রঙ্গ ব্যবসায়ী। সিনেমার পর্দায় আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই সেদিন পর্যন্ত নিয়মিত রঙ্গরস বিতরণ করেছেন। আমার মতো একজন নিখাদ মুখ্যুকে সামনে পেয়ে সেই রঙ্গবিতরণের প্রবৃত্তি হয়তো আবার জেগে উঠেছে তাঁর।

এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও হরিধনদার দৃষ্টিশক্তি যে এখনও খুবই তীক্ষ্ণ তা বুঝতে পারলাম তাঁর পরবর্তী সংলাপে। আমার মুখের ওপর যে অবিশ্বাসের মৃদু ছায়া ফুটে উঠেছিল, সেদিকে তাকিয়ে হরিধনদা বললেন : কী, আমার ফিমেল পার্ট করার কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি? আগে যদি জানতে পারতাম যে এই শেষ বয়েসে তুমি আমার জীবন-কাহিনী শুনতে আসবে তাহলে না হয় দু-একটা মেয়ে সাজার ছবি খুঁজেপেতে যোগাড় করে রাখতাম।

সর্বনাশ! একেবারে কট্ রেড হ্যান্ডেড। যাকে বলে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমতা আমতা করে বললাম : না না হরিধনদা, আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি না। আমি ভাবছি, কতবড় নিপুণ অভিনেতা হলে এ ব্যাপারটা ঘটানো যায়। একসঙ্গে এতগুলি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।

আমার কথায় হরিধনদা একটু যেন খুশি হলেন বলেই মনে হলো।

তা লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার কথায় হরিধনদার জীবনের আর একটি বদমায়েশির কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা শুনেছিলাম আমাদের অগ্রজ সাংবাদিক তখনকার দিনের নামকরা সিনেমা-পত্রিকা 'রূপমঞ্চ'-র সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে।

কালীশদার সঙ্গে হরিধনদার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার অফিস ছিল হাতিবাগান বাজারের ওপর দোতলায়। রাধা সিনেমার উল্টোদিকের ফুটপাথে একটি সিঁড়ি আছে সেটা দিয়ে বাজারের দোতলায় উঠে গেলে রূপমঞ্চের অফিস। থিয়েটারপাড়ার কাছে হওয়ার দরুন তখনকার দিনের নামকরা সব সিনেমা-থিয়েটারের শিল্পীরা কালীশদার অফিসে প্রায়শই আড্ডা দিতে আসতেন। হরিধনদাও ছিলেন সেই আড্ডার শরিক।

একবার কালীশদা ঠিক করলেন একটা সংখ্যায় হরিধনদার একটা ইন্টারভিউ ছাপবেন। সেদিন যাতে কেউ আড্ডা দিতে না আসেন সে ব্যবস্থা করে কালীশদা হরিধনদাকে সন্ধের পর ওঁর অফিসে আসতে বললেন। সেদিনটা ছিল থিয়েটার ডে। হরিধনদা জানালেন উনি একটু রাত্তির করে থিয়েটার সেরে রূপমঞ্চ অফিসে চলে আসবেন।

কালীশদা রূপমঞ্চ অফিসে সংলগ্ন অন্য ঘরে সপরিবারে বসবাস কবতেন। সেদিন কি কারণে জানি না বৌদি বাড়িতে ছিলেন না। হয়তো পিত্রালয়ে গেছেন অথবা অন্য কোথাও। নিউজ ডিপার্টমেন্টের অন্য সবাই কাজ সেরে বাড়ি চলে গেছেন। কালীশদা একা অপেক্ষা করছেন হরিধনদার জন্যে।

রাত ন'টা নাগাদ দরজায় খুট খুট করে নক্ করার শব্দ শোনা গেল। কালীশদা উঠে গিয়ে দরজা

খুলে দেখলেন বারান্দার আলো-আঁধারিতে এক সুশ্রী উগ্র-প্রসাধিতা মহিলা দাঁড়িয়ে।

কালীশদা একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কাকে চাই?

ভদ্রমহিলা একটা ভ্রূভঙ্গি করে জবাব দিলেন : কালীশবাবুকে।

কালীশদা বললেন : আমিই কালীশবাবু। আপনার কী দরকার বলুন?

ভদ্রমহিলা একটা কটাক্ষ হেনে বললেন : কী দরকার তা তো আপনিই জানেন। আপনিই তো আমাকে আসতে বলেছিলেন।

কালীশদা একটু অবাক হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলার কথা শুনে। বললেন : সে কী! আমি আপনাকে আসতে বলেছিলাম? কই, মনে পড়ছে না তো?

ভদ্রমহিলা বললেন : বা রে! আপনিই তো সেদিন বললেন, একটু বেশি রাত করে আসতে। যখন কেউ থাকবে না। আপনি আমার ইন্টারভিউ নেবেন। সরুন, দরজা ছাড়ুন। ভেতরে গিয়ে বসতে দিন। তারপর আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন। বাইরের কোন লোকের সামনে ইন্টারভিউ দিতে আমার ভয়ানক লজ্জা করে।

সর্বনাশ! এ ভদ্রমহিলা বলেন কী! কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে কী! তাছাড়া এক্ষুনি হরিধনবাবুর এসে পড়বার কথা। তিনি কালীশদাকে এইভাবে নিভৃতে সুন্দবী মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখলে কী ভাববেন কী! চারিদিকে তো ছিছিক্কার পড়ে যাবে।

কালীশদা ভদ্রমহিলাকে অনুনয় করে বললেন : দেখুন, আমার মনে পড়ছে না আপনাকে আসতে বলেছিলাম কি না। বাড়িতে এখন কেউ নেই। আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে দেখলে লোকে নানা কুৎসিত সন্দেহ করবে। তাছাড়া এক্ষুনি আমার এক বন্ধুর এসে পড়বার কথা। আপনি বরং কাল সকালেব দিকে আসবেন।

ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দার মতো বললেন : তা বললে কি চলে! আপনি আগ্রহ করে ডেকে পাঠাবেন, তারপর আবার ফিরিয়ে দেবেন সেটা হবে না। আমি আজ আপনাকে ইন্টারভিউ দিয়ে তবে যাব!

কালীশদা এবারে রেগে গেলেন ভদ্রমহিলার ওপর। বললেন : কে আপনি যে আপনার ইন্টারভিউ নিতে হবে আমাকে! আপনার নাম কি?

এবারে ভদ্রমহিলা পুরুষকণ্ঠে বলে উঠলেন : আজ্ঞে আমার নাম শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়।

নামটা শুনে কালীশদা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর সংবিত ফিরে পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন : আরে হরিধনবাবু, আপনি এই বেশে? আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

ভেতরে এসে হরিধনদা একটা চেয়ারে বসলেন। কালীশদা তাঁর মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে বললেন : কী ব্যাপার কি বলুন দিকি, হঠাৎ আপনার এরকম বিদ্‌ঘুটে বদখেয়াল কেন?

হরিধনদা হাসতে হাসতে বললেন : বদ্‌খেয়াল নয় মশাই। আপনি আমার ইন্টারভিউ নেবেন, তাই মনে হল আমি যে কিছু-কিঞ্চিৎ অভিনয় করতে পারি তার একটু নমুনা পেশ করে রাখি। আমি যে এককালে ফিমেল রোল করতাম, আর সেসব করে যে মেডেল-টেডেল পেয়েছিলাম, তা আজকালকার উঠতি ছোঁড়াগুলো তো বিশ্বাসই করতে চায় না। ভাবে যে আমি চিরকাল এইরকম কমেডি রোলেই পেছন নাচিয়েছি।

কালীশদা হাসতে হাসতে বললেন : তা তার একটা মোক্ষম নমুনা রাখলেন বটে! আমি তো মশাই রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বাড়িতে গিন্নি নেই, কাজের লোকটাও কোথায় আড্ডা মারতে বেরিয়েছে কে জানে! এই ফাঁকা ঘরে একজন আলট্রা মডার্ন তরুণী এসে ঢুকলে তো ভয়ের কথা মশাই। আমার বুকের ভেতরটা এখনও কাঁপছে। তা এইসব পোশাক-আশাক পেলেন কোথা থেকে?

হরিধনদা বললেন : কেন, আজ থিয়েটার ডে না! ড্রেসারকে বললুম সেকেন্ড হিরোইনের পোশাকটা একবার দে দিকি! কাল ফেরত নিয়ে আসব। তা সে হারামজাদাকে গাঁজা খাবার জন্যে আট গণ্ডা পয়সা দিতে হল। স্টেজ ম্যানেজার অবিশ্যি সব কথা জানে। তা আমার অ্যাকটিংটা কীরকম হল বললেন না তো?

কালীশদা হাসতে হাসতে বললেন : টেরিফিক! আমি কিন্তু ইন্টারভিউতে আপনার এইসব

কাণ্ডকারখানার কথা লিখব। তাতে কোনও আপত্তি নেই তো?

হরিধনদা বললেন : না না, আপত্তি কিসের। একদিক দিয়ে বরং ভালোই হবে। ছোঁড়াগুলোকে পড়াতে পারব।

তা এইরকম মজার মজার ঘটনা জীবনে বহু ঘটিয়েছেন হরিধনদা। এখন অথর্ব হয়ে পড়েছেন, সেসব আর ঘটাতে পারেন না। তবে এই ছিয়াশি বছর বয়সেও মনটা এখনও রসস্থ আছে।

যাক, আবার ফিরে যাই আমাদের সেই পুরনো আলোচনায়।

জনার চরিত্রে ওঁর অসাধারণ অভিনয়ের ব্যাপারে আমার প্রশংসাসূচক মন্তব্যে হরিধনদা বেশ খুশি হলেন বলে মনে হল। তিনি বললেন : তখনকার দিনে অ্যামেচার থিয়েটারে তো মেয়েদের নেওয়া হত না। পুরুষদেরই ফিমেল পার্ট করতে হত। যাত্রাতেও তাই ছিল। একমাত্র প্রফেশনাল বোর্ডেই মেয়েদের দেখা যেত। অভিনয়ের লাইনে তখন তো বেশি মেয়ে ছিলও না। যাঁরা ছিলেন তাঁরা অন্য জগতের। অন্য জগতের বলতে আমি কোন জগতের কথা বলছি বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। গেরস্তবাড়ির মেয়েরা সিনেমা-থিয়েটার করবে এটা তো কল্পনাই করা যেত না। করা তো দূরের কথা, থিয়েটার দেখতে এলেও তাঁরা সর্বাঙ্গ ঢেকে আসতেন। ঢাকা দেওয়া ফিটন গাড়িতে একেবারে থিয়েটারের দরজায় এসে নামতেন। একগলা ঘোমটা দিয়ে সোজা ওপরে চলে যেতেন। আমাদের অ্যামেচার পার্টির থিয়েটারের সময় মেয়েদের বসবার জায়গার সামনে চিকের পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হত। তার ভেতর দিয়ে তাঁরা সবকিছু দেখতে পেতেন, কিন্তু তাঁদের মুখ দেখতে পেতেন না কেউ।

আলোচনাটা তৎকালীন পরিবেশের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা হরিধনদা, আপনি কি কেবল ওই গিরিশবাবুর 'জনা' নাটকেই ফিমেল পার্ট করেছেন, নাকি, অন্য কোন নাটকেও করেছেন?

হরিধনদা বললেন : করেছি মানে! অঢেল করেছি। রাশি রাশি করেছি। সবগুলোর নাম তো এখন মনে পড়ছে না। যে কটা মনে করতে পারছি বলছি। 'পথের শেষে' নাটকে সুখদার পার্ট করেছি। 'বিবাহ বিভ্রাট'-এ ঝি, 'জোরবরাত'-এ ঘটকী, 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এ নীহারিকা। ওই নাটকে আবার মেল পার্টও করেছি। রাজেন বাড়ুই। তবে সবচেয়ে বেশি মনে আছে 'আলিবাবা' নাটকে মর্জিনা করার কথা। সেদিন এক কাণ্ড হয়েছিল। এই ফিমেল পার্ট করতাম বলে সেদিন প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি। নাহলে আজ যে এই সামনাসামনি বসে আমার কথা শুনছো, সে সুযোগই পেতে না। হয়তো সেদিনই আমার জীবনের ইতি হয়ে যেত।

কিন্তু সে কথা এখন থাক। হরিধনদার জীবনের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের সেই লোমহর্ষক বিবরণ শোনবার আগে আবার ফিরে যাই পুরীর সমুদ্রতীরে, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল হরিধনদার জীবনের পট পরিবর্তন।

হরিধনদা বললেন : সেই যে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছিলাম, তার উপশমের জন্যে মায়ের সঙ্গে চলে গেলাম পুরী। প্রভু জগন্নাথের কৃপায়, না কি সমুদ্রের হাওয়ার গুণে জানি না, আমার বুকের ব্যথাটা দেখলাম একেবারেই কমে গেল। আর এই পুরীতেই ঘটে গেল আমার জীবনের পট পরিবর্তন।

পুরী থেকে যেদিন কলকাতা ফিরব, তার আগের দিন বিকেলে সমুদ্রের ধারে বসে আছি। সূর্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলে যাচ্ছেন। একটি বৃহদাকার লাল বল যেন টুপ করে দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের জলের মধ্যে ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রঙও যেন বদলে গেল। গোধূলির ম্লান আলোয় ছেয়ে গেল চারিদিক। আমার কণ্ঠ থেকে যেন কোন্ মন্ত্রবলে একখানা গান বেরিয়ে এল। গানখানা পূরবী রাগের ওপর।

'দিবা অবসান হলো
কী করো বসিয়ে মন
আদি সূর্য অস্ত যায়
করেছো কি আয়োজন।'

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গানখানা গাইছি, এমন সময় মনে হল কে যেন

পাশে এসে বসল। গানখানা গাইতে গাইতেই একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক। তাঁর চোখে-মুখে মুগ্ধতার আবেশ। আমি দ্বিগুণ উৎসাহে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গানখানা গাইতে লাগলাম।

হঠাৎ ভদ্রলোক ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও সুরলোকে তালভঙ্গ ঘটে গেল। তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পেলাম তাঁর পাশে বাঘ দাঁড়িয়ে। বাঘের গলা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এল : বাঃ, চমৎকার!

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম : সে কী! বাঘের গলায় মানুষের আওয়াজ?

হরিধনদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বাঘ। সে বাঘ আবার যে-সে বাঘ নয়, বাংলার বাঘ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঝাঁটার মতো বিখ্যাত গোঁফ। খবরের কাগজে তো প্রায়ই তাঁর ছবি বেরোয়।

ব্যাপারটা আরও গুলিয়ে গেল। বললাম : তার মানে? আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

হরিধনদা বললেন : তোমার মাথায় কি গোবর পোরা আছে নাকি হে? কার কথা বলছি বুঝতে পারছো না? স্যার আশুতোষ। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল। বলালাম : তাই বলুন।

হরিধনদা বললেন : স্যার আশুতোষের পাশে দাঁড়িয়ে আরও দুই ভদ্রলোক। তার মধ্যে একজনের খুবই সৌম্য চেহারা। মাথায় টুপি। পাশে লাঠি হাতে বরকন্দাজ। সৌম্য চেহারার ওই মানুষটি আমার পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন : মাস্টার, ওকে আমাদের বাড়িতে সন্ধেবেলা নিয়ে এসো। ভালো করে গান শোনা যাবে।

এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। আমি পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : স্যার আশুতোষকে চিনতে পেরেছি কিন্তু ওঁকে তো চিনতে পারলাম না। উনি কে বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন : উনি হলেন মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। কাশিমবাজারের। আর ওঁর পাশে আর একজন যিনি ছিলেন তিনি ইংলিশ আর হিস্ট্রির প্রফেসর অধর মুখোপাধ্যায়।

এবার ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আর আপনার পরিচয়টা?

উনি বললেন : আমি ভায়োলিন বাজাই। একটা স্কুলে স্টুডেন্টদের ভায়োলিন শেখাই। মহারাজ আমাকে খুব স্নেহ করেন।

ওই বেহালার মাস্টারের সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় কাশিমবাজারের মহারাজার পুরীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। মনের আনন্দে অনেকগুলি গান শুনিয়েছিলাম সেদিন। বেশিরভাগই কীর্তন। রাত্তিরে রাজবাড়িতে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া। প্রচুরতর সমাদর।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এই যে এত আপ্যায়ন, এত সমাদর, এটা কিসের দৌলতে? নিশ্চয় চটে বসে লুঙ্গি পরা হাতিবাগান বাজারের এক আলুওয়ালাকে এ সমাদর জানানো হয়নি। সেই মুহূর্তে স্থির করে ফেললাম, বাকি জীবনটা সংগীত আর অভিনয়কেই উৎসর্গ করব।

কলকাতায় ফিরে হাতিবাগান বাজারের আলুর ব্যবসাটা তুলে দিলাম।

ব্যবসা তো তুলে দিলাম, কিন্তু পেট চলবে কেমন করে?

এই পেটের চিন্তাই হরিধনদাকে টেনে নিয়ে গেল অভিনয়ের জগতে। আর ওঁর জীবনের সেই অধ্যায়টাই সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর।

হরিধনদাকে যিনি হাতে ধরে টালিগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাম মাধব ঘোষাল। আমরা ওঁকে ডাকতাম মাধুদা বলে। মাধব ঘোষাল ছিলেন রাধা ফিল্ম স্টুডিওর মালিক। বেশ করিৎকর্মা পুরুষ। ওঁর দাদা মোহন ঘোষাল অভিনেতা হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় যখন 'গোরা' উপন্যাসটি চিত্রায়িত হয় তখন সে ছবির দ্বিতীয় নায়ক ছিলেন মোহন ঘোষাল। মাধুদারা ছিলেন রীতিমতো বর্ধিষ্ণু পরিবারের মানুষ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ওঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

মাধুদার সঙ্গে হরিধনদার আলাপ হয়েছিল ওঁর বন্ধু অসিত ঘোষালের মাধ্যমে। আবার অসিত ঘোষালের সঙ্গে হরিধনদার আলাপ এবং বন্ধুত্ব হয়েছিল এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। নতুবা ওঁরা যে সমাজের মানুষ তাতে হাতিবাগান বাজারের আলু বিক্রেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাই নয়। কিন্তু সেটা ঘটেছিল।

ওই যে পুরীতে ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ আর কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীকে গান শুনিয়ে প্রশংসা আর সমাদর পেলেন, তারপর থেকেই হরিধনদার জীবনের প্যাটার্নটাই বদলে গেল। শুরু হল জীবনের আর এক সংগ্রামী অধ্যায়। সেসব কথা হরিধনদার মুখ থেকেই শোনা যাক।

হরিধনদা বললেন : আলুর ব্যবসা তো তুলে দিলাম, কিন্তু খরচ চলবে কীভাবে? শুরু করলাম অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। বিজনেস উইদাউট ক্যাপিটাল। চেনাশোনা বড়লোকদের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে তাঁদের মাসকাবারি প্রয়োজনীয় জিনিসের ফর্দ আর টাকা চেয়ে নিতাম। তারপর ঘুরে ঘুরে সেইসব জিনিস কেনাকাটা করতাম। কাস্টমাররা ন্যায্য দামেই পেতেন, আর আমি পেতাম দোকানদারের কাছ থেকে কমিশন আর পাইকারি দামের মার্জিন-মানি। খাটুনি একটু বেশি হত বটে, কিন্তু মাস গেলে হাতে মন্দ আসত না।

দিনের বেলা কেনাকাটা আর সন্ধের পর থেকে সংগীতচর্চা। সংগীত অর্থে কীর্তন গান। আস্তে আস্তে ছোটখাটো একটা কীর্তনের দল তৈরি করে ফেললাম। বিভিন্ন ধর্মমূলক অনুষ্ঠানে গাইতাম, পুজোবাড়িতে গাইতাম, শ্রাদ্ধবাড়িতেও মাঝে মাঝে ডাক পড়ত। সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে থুয়ে যে টাকাটা উদ্বৃত্ত থাকত, সেটা আমার পরিশ্রমিক।

গান গেয়ে তৃপ্তি পেতাম ঠিকই, কিন্তু আর একটা ব্যাপার আমাকে ভয়ানকভাবে হাতছানি দিত। সেটা হল অভিনয়। থাকি উত্তর কলকাতার থিয়েটারপাড়ায়, পথেঘাটে কত রঙ-বেরঙের থিয়েটারের পোস্টার, ওই আকর্ষণ এড়িয়ে চলি সাধ্য কী! কখনও টিকিট কেটে, কখনও বা চুরি করে থিয়েটার দেখা শুরু হল। আর ঠিক সেই সময়েই পেয়ে গেলাম শখের দলে অভিনয় করার সুযোগ।

এই ঘটনার মূলেও ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। না, ইনি ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ নন, ইনি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। থাকতেন তখনকার কর্নওয়ালিস থিয়েটারের (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) উল্টোদিকে নলিন সরকার স্ট্রিটের তিনের সি নম্বর বাড়িতে। ওই বাড়ির উল্টোদিকে ছিল ক্যাম্পবেল হাসপাতালের (বর্তমানে এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ) ডাক্তারদের হস্টেল। সেই হস্টেলের সরস্বতী পুজোয় আমার ডাক পড়েছিল গান গেয়ে শোনাবার জন্যে।

গান-টান শেষ হয়েছে, সবাই আহা-উহু করে আমাকে সাধুবাদ জানাচ্ছে, এমন সময় কুড়ি-বাইশ বছরের এক সুদর্শন তরুণ আমার সামনে এসে বললে : আপনাকে একবার আমার দাদু ডাকছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার দাদু?

যুবকটি বললে : আমার দাদুর নাম ডাঃ আশুতোষ মুখার্জি। আমরা ওই সামনের বাড়িতে থাকি।

সামনের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন সম্ভ্রান্ত চেহারার বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে যুবকটির দিকে তাকালাম। বললাম : আপনার নামটি তো জানা হল না।

যুবকটি বললে : আমার নাম অসিতকুমার ঘোষাল। বাবার নাম সনৎকুমার ঘোষাল। আমাদের বাড়ি পাথুরেঘাটায়। কিন্তু আমি এখানে দাদু-দিদিমার কাছে থাকি। এটা আমার মামাবাড়ি। তবে নিজের বাড়ির থেকেও বেশি। দাদু-দিদিমা আমাকে ভয়ানক ভালোবাসেন।

অসিতের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেলাম। অসিতের দাদু আশুতোষবাবু আমার নিবাস, বংশপরিচয় ইত্যাদির খোঁজখবর নিলেন। আমি মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন : একটু আগে হস্টেলে যে কীর্তনখানি গাইছিলে সেটি আর একবার গাও তো বাবা।

আমি তখন দরদ দিয়ে কীর্তনখানি গাইলাম। গান শুনে আশুবাবু বলে উঠলেন : বাঃ বাঃ, বড় সুন্দর তোমার কণ্ঠস্বর। ব্যবহারটিও বড় মিষ্টি। তুমি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসো। আমাকে তোমার

গান শুনিয়ে যেও। এ বাড়িটাকে তোমার নিজের বাড়ি ভাববে।

তারপর অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন : খোকা, এখন থেকে তুমি হরিধনের সঙ্গে খেলাধুলা করবে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও। ও খুব ভালো ছেলে।

সেদিন থেকে অসিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অসিতের কাছে শুনেছিলাম, ওর কাকা হলেন মাধব ঘোষাল। তিনি বাংলা ফিল্মের একজন নামকরা লোক। টালিগঞ্জে রাধা ফিল্ম স্টুডিওর মালিক। একথা শুনে খুব আশান্বিত হয়েছিলাম। মাধববাবুর সঙ্গে আলাপ হলে তিনি নিশ্চয় ফিল্ম লাইনে আমার অভিনয়ের সুযোগ করে দিতে পারবেন।

কালক্রমে তাই হয়েওছিল। এই যে আমাকে আজ সকলে কমেডি-অভিনেতা বলে জানে, চেনে, তাঁর মূলে কিন্তু ওই মাধববাবু। তিনিই আমাকে কমেডি-অ্যাকটিং করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নইলে আমি তো সিরিয়াস চরিত্র ছাড়া চিন্তাই করতাম না। কমেডি অভিনয়কে মনে মনে ঘেন্নাই করতাম।

আমি বললাম : কিন্তু আপনি তো শেষ পর্যন্ত কমেডির জগতেই পা রাখলেন?

হরিধনদা বললেন : কী করব বলো। অনন্যোপায় হয়ে রাখতে হল। মাধববাবু আমাকে বোঝালেন, সিরিয়াস অ্যাকটিংয়ে দারুণ কম্পিটিশন। অনেক মাথা খুঁড়ে ছোটখাটো একটা চান্স পেলেও পেতে পারো, তবে তা নিয়ে কি বেশিদূর এগনো যাবে? কিন্তু কমেডি অ্যাকটিংয়ে কমপিটিশনটা কম। চট করে ঢুকে পড়তে পারা যাবে। একটু চেষ্টা করলে লোকের নজরে পড়া যাবে। অগত্যা সেই রাস্তাটাই বেছে নিলাম। আস্তে আস্তে নিজের অভিনয়ের একটা প্যাটার্ন তৈরি করে নিলাম।

আলোচনার ধারাটা এক লাফে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। ওটাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা দরকার। তাই হরিধনদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : ওই যে আপনি বলেছিলেন আপনার অভিনয় করার আকাঙ্ক্ষা, তা সেটার সুরাহা হল কীভাবে?

হরিধনদা বললেন : ওই যে অসিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, তারপর থেকেই। অসিতের হাবভাব থেকে বুঝতে পারলাম, ওরও খুব নাটক করার শখ। তাই দুজনে মিলে একটা অ্যামেচার থিয়েটারের আখড়া খুলে ফেললাম ওদের নলিন সরকার স্ট্রিটের বাড়িতে। নাম দেওয়া হল 'দীনবন্ধু সম্মিলনী'।

আমি বললাম : কিছু মনে করবেন না হরিধনদা, ওই দীনবন্ধু সম্মিলনী নামটা কিন্তু নাটকের দলের পক্ষে বেমানান। শুনলেই মনে হয় যেন কোনও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

হরিধনদা বললেন : তুমি ঠিকই ধরেছো। আমাদের দীনবন্ধু সম্মিলনীর মাধ্যমে সমাজসেবার কাজই করা হত। আমাদের যারা মেম্বার তারা প্রতি রবিবার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাল-ডাল কাপড়-চোপড় টাকা-পয়সা সংগ্রহ করত। দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে সেইসব বিলি করা হত। অনেক দুঃস্থ মধ্যবিত্ত বাড়ি, যারা সামনাসামনি হাত পেতে সাহায্য নিতে সঙ্কোচ বোধ করত, তাদের গোপনে অর্থ সাহায্য করা হত।

আমি বললাম : তবে যে বললেন ওটা ছিল আপনাদের অ্যামেচার থিয়েটারের আখড়া?

হরিধনদা বললেন : তাই তো ছিল। একেবারে শুরুতেই যদি থিয়েটার করব বলে কাজ শুরু করতাম তাহলে অসিতের বাড়ি থেকে আপত্তি উঠত। তাই সমাজসেবা দিয়ে শুরু। তারপর নাটকের মহড়া। তারও পরে মেয়ে-কীর্তনের দল। ভদ্রবাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল ওটা। আমার তো মনে হয় তার আগে এরকম কোনও মেয়ে-কীর্তনের দল ছিল না কলকাতায়। তাছাড়া দীনবন্ধু নামটার ওপরে আমার একটা দুর্বলতা ছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম : কেন?

হরিধনদা বললেন : দীনবন্ধু হল আমার রাশি-নাম। পরে এক সময় কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে (এখন বিধান সরণি) স্কটিশ স্কুলের পাশে একটা স্টেশনারি দোকান করেছিলাম। দোকানটার নামও দিয়েছিলাম 'দীনবন্ধু ভাণ্ডার'। সেখানে আবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জের আমাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে। আজও হচ্ছে।

হরিধনদা সেই ঘটনাটার কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমিই থামিয়ে দিলাম। বললাম : ওটা তো পরের ঘটনা, কাজেই পরে শুনব। এখন আপনি আপনাদের নাটকের দলের কথা বলুন।

হরিধনদা বললেন : দল আর কোথায়, তখন তো নাটক করার ভাবনা কেবল আমার আর অসিতের

মাথার মধ্যে। একদিন ভয়ে ভয়ে অসিতের দাদুর কাছে কথাটা পাড়া হল। প্রথমে মনে হয়েছিল উনি এই প্রস্তাবে হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন। কিন্তু না, তেমন কিছুই ঘটল না। উনি বললেন, নাটক করতে চাও করো, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে নাটক করা চলবে না। কাজেই স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত নাটক বাছাই করা হল। প্রথম বই 'ভক্তিব ডোর', তারপর 'কুলগুরু'—সবই স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত। জোর কদমে রিহার্সাল চলতে লাগল।

রিহার্সালের পর নাটক নামাবার পালা। সেটা কোথায় হবে? অসিতদের একটা টিনের শেড দেওয়া বিরাট গ্যারাজ ছিল। তা প্রায় চারশো লোক বসতে পারে। সেইখানেই স্টেজ বেঁধে মঞ্চস্থ হল আমাদের প্রথম নাটক 'ভক্তির ডোর'। সকলেব বেশ প্রশংসা পেল। আমাদেরও মনের জোর বেড়ে গেল। সজ্ঞানে সেই আমার প্রথম অভিনয় জগতে পা রাখা।

কিন্তু এই নিরিমিষ ব্যাপারটা বেশিদিন ভালো লাগল না। আমিষ খেতে খুব ইচ্ছে করতে লাগল।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : তার মানে?

হরিধনদা বললেন : ওই যে স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত নাটক, ওটাকেই নিরিমিষ বলছি। দীনবন্ধু সম্মিলনীতে আমরা তখন যারা নাটক করছি তাদের সব তরুণ বয়েস। ওইসব বাচ্চা ছেলেদের জন্যে লেখা স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত নাটক তাদের বেশিদিন ভালো লাগবে কেন! মনটা ছটফট করতে লাগল স্ত্রী-চরিত্রযুক্ত নাটক করবাব জন্যে।

কিন্তু মনটা ছটফট করলেই তো চলবে না, আমাদের মধ্যে স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করবে কে? অসিতের চেহারার মধ্যে একটা মেয়ে-মেয়ে ভাব ছিল। ওর সারা মুখে একটা ঢলঢলে লাবণ্য। বললাম : অসিত, তুই ফিমেল পার্ট কর।

অসিত বললে · ওরে বাবা! দাদু জানতে পারলে মেরে পিঠের ছাল তুলে দেবে।

ওটা বাজে কথা। ও দাদুব আদরের নাতি। জীবনে কখনও ওর গায়ে হাত তোলেননি তিনি। আসলে ওই অজুহাতে অসিত পাশ কাটিয়ে গেল।

তাহলে উপায়? আমাদের দলেব আর কেউ রাজি নয় ফিমেল পার্ট করতে। অনন্যোপায় হয়ে একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের একখানা শাড়ি পরে, ঘোমটা দিয়ে, কপালে টিপ লাগিয়ে আয়নার সামনে নিজেকে দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মন্দ লাগছে না তো! হাইটটাও শর্ট আছে। কাজেই মানিয়ে যাবে।

এরপর শুরু হল আমার অবজার্ভেশনের পালা। আগেই তো বলেছি, আমি এক-একটি মানুষের চলা-বলা হুবহু নকল কবতে পারতাম। পরিচিত মহলে সেগুলি দেখিয়ে অনেক মজা পেয়েছি। দিয়েওছি। এখন থেকে শুরু হল মহিলাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। বিভিন্ন বয়েসের। বিভিন্ন সমাজের। তারপর একদিন সদর্পে আমাদের আখড়ায় গিয়ে ঘোষণা করলাম : আর কোনও চিন্তা নেই। এবার থেকে আমিই ফিমেল পার্ট করব।

আমার প্রথম ফিমেল পার্ট, যতদূর মনে পড়ছে, 'পথের শেষে' নাটকে সুখদার চরিত্র। তারপর 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকে ঝি-এর পার্ট করেছি। 'জোর বরাত'-এ ঘটকী করেছি। রবীন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকে হিরোইন নীহারিকার রোলও করেছি। এছাড়া আরও কত যে ছোট ছোট রোল করেছি তা এখন আর মনে নেই।

এইসব ফিমেল রোলগুলোতে আমি বেশ ভালো প্রশংসাই পেয়েছিলাম সকলের। প্রথম প্রথম ফিমেল রোল করতে ভয় করত। কী জানি বাবা, লোকের কেমন লাগবে কে জানে। সাহস পেয়ে গেলাম মায়ের একটি কথায়। আমাদের একটা নাটক দেখে এসে মা বললেন : তুই কী রে! থিয়েটার করতে গিয়ে নিজের মাকে এমন করে নকল করতে আছে। আমি তো লজ্জায় অন্যদের সামনে মুখ তুলতে পারছিলাম না।

কথাটা মা অনুযোগের সুরে বললেও তাঁর সারা মুখে দেখলাম আনন্দ ঝলমল করছে। বুঝলাম, আমি পরীক্ষায় পাশ করে গেছি।

সত্যি কথা বলতে কী, এই সময়ে আমাদের দীনবন্ধু সম্মিলনীর নাটকগুলির বেশ প্রশংসা ছড়িয়েছিল চারদিকে। এতটা সাফল্য আমরাও আশা করিনি। তাই সাহস করে ঠিক করলাম আমরা আরও বড়

জায়গায় আমাদের নাটক মঞ্চস্থ করব।

এখন যেমন অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অভিনয় করা যে কোনও গ্রুপ থিয়েটারের কাছে একটা গৌরবের ব্যাপার, তখনকার দিনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মঞ্চে অভিনয় করা তেমনি গৌরবের ব্যাপার ছিল। আমরা সাহস করে সেখানে আবেদন করলাম গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকটা অভিনয় করব বলে। ওটা হবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে প্রতিষ্ঠিত দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে। বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের পিতা) ছিলেন ওই স্মৃতি ভাণ্ডারের ট্রেজারার। তিনি আমাদের সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলেন। সেটা বোধহয় ১৯২৫ কি ১৯২৬ সাল হবে।

এতবড় ব্যাপারে উত্তেজনার বশে নেমে পড়লাম বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। কত নামীদামি লোক ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, পারব তো তাঁদের খুশি করতে?

রিহার্সাল যত এগোচ্ছে আমার বুকের ধুকপুকুনিও তত বাড়ছে। একে তো ফিমেল ক্যারেকটার, তায় আবার জনার মতো চরিত্র। তার ওপরে আবার ব্ল্যাংক ভার্স। কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আবার শুরু করলাম থিয়েটার দেখা। এবারে আমার নজর রইল ফিমেল চরিত্রগুলির দিকে।

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী তখন রিটায়ার করেছেন কিন্তু তারাসুন্দরী আছেন। আছেন বসন্তকুমারী, কুসুমকুমারী, মৃণালিনী দেবী, নরীসুন্দরী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি), নীহারবালা প্রমুখ তাবড় তাবড় শিল্পীরা। তাঁদের অনেকগুলি নাটক দেখলাম, কিন্তু আমার কোনও কাজে লাগল না।

জিগ্যেস করলাম : কেন?

হরিধনদা বললেন : কারণ তখন যে ক'টা বই হচ্ছে সবগুলোই সামাজিক, পৌরাণিক নয়। কাজেই ব্ল্যাংক ভার্সের ওপর অভিনয় দেখার কোন সুযোগই পাওয়া গেল না। তবে ওইসব নামকরা মহিলা শিল্পীদের অভিনয় দেখতে দেখতে আমার অভিনযের অনেক কিছু শুধরে নিতে পারছিলাম।

আমি বললাম : আচ্ছা হরিধনদা, আপনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের অভিনয় দেখেছেন কখনও?

হরিধনদা কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন : না ভাই, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে আমি ওঁর ছেলে দানীবাবুর শেষ বয়েসের অভিনয় দেখেছি। স্টার থিয়েটারে একটা কম্বিনেশন নাইটে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে দানীবাবুর চাণক্য দেখেছি। উনি তখন অন্ধ। উইংসের পাশে একটা টেবিলে ওঁর জন্য যে সব সিনে যা যা দরকার সেগুলি পর পর গুছিয়ে রাখা হত। ওঁর অনুমানশক্তি এতই প্রখর ছিল যে উনি কারও সাহায্য ছাড়াই প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে স্টেজে চলে যেতেন।

আমি বললাম : আর রসরাজ অমৃতলাল বসু, সেই যিনি ছোটবেলায় 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নাটকের রিহার্সাল দেখে আপনার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাঁর কোন নাটক দেখেননি?

হরিধনদা বললেন : দেখিনি আবার! কত দেখেছি! ওই স্টার থিয়েটারেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকে ওঁর কৃষ্ণকান্ত দেখেছি। অমর দত্ত করতেন গোবিন্দলাল, রোহিণী করতেন কুসুমকুমারী আর ভ্রমর সাজতেন বসন্তকুমারী। অমৃতলালের সে কী দাপটের অভিনয়। ওই স্টার থিয়েটারেই ওঁর নিজের লেখা 'খাসদখল' নাটক দেখেছি। উনি করতেন নিমাই বলে একটা চরিত্রে। ওই নাটকে বড় সুশীলার একটা গান ছিল, 'ওগো কেউ বলো না গো ভাতার কেমন মিষ্টি।' আর সেই গানের সঙ্গে দর্শকের কী হাততালি আর এন্‌কোর এন্‌কোর চিৎকার। সুশীলাও নানা রঙ-ঢঙ করে গানটি অনেকক্ষণ ধরে গাইতেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

বললাম : এগুলো কিন্তু খুব খারাপ ব্যাপার ছিল তখনকার থিয়েটারে।

হরিধনদা বললেন : কী আর করবে বলো! তখনকার দিনে রাত আটটায় থিয়েটার শুরু হত, ভাঙত সকাল ছটায়। সারারাত ধরে জাগতে জাগতে যখন ক্লান্তিতে দর্শকের ঢুলুনি আসত, তখন ঘুম তাড়ানোর ওষুধ হিসেবে এইসব গরমাগরম গানের দরকার হত। না হলে যে সব ঘুমিয়ে নেতিয়ে যেত হে।

দেখলাম হরিধনদা আবার আলোচনার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ওঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম : কিন্তু আপনার সেই 'জনা' নাটকের ব্ল্যাংক-ভার্সের সমস্যার সমাধান কীভাবে হল সেটা তো বললেন না?

হরিধনদা বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথাটা তো বলতেই হবে। ওটা আমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই আমলের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সঙ্গে তো আমার ওই সূত্রেই পরিচয় হয়।

তারাসুন্দরী থাকতেন স্টার থিয়েটার আর রূপবাণী সিনেমার মাঝখানে রাজাবাগান অঞ্চলে। ওঁর দুখানা বাড়ির পরেই থাকতেন বিনোদিনী। বিনোদিনী তখন অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। ধর্মকর্ম নিয়ে আছেন। খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। সে সময়ে ওঁকে দেখেছি। সারা শরীরে শ্বেতী! মুখে একটা স্বর্গীয় আভা। ওঁর একটা রথ ছিল। রথের দিন সেটা বার করতেন। স্টার লেনের ওপর দিয়ে ওঁর রথ যেত। নিজে হাতে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে বেগুনি, পাঁপরভাজা, জিলিপি ইত্যাদি বিলি করতেন।

তারাসুন্দরীও রোজ ভোরে গঙ্গাস্নানে যেতেন। বিরাট ঘোমটা দিয়ে রিকশায় উঠতেন। বাড়ি ফিরে ঘণ্টাখানেক ঠাকুরঘরে কাটাতেন। পূজা-অর্চনা করতেন। তৎকালীন সমাজের বিচারে তিনি ছিলেন অধঃপতিত। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ভক্তি, মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা লক্ষ করেছি তা সমাজের তথাকথিত অনেক ভদ্র মানুষের মধ্যেও দেখিনি। তাঁর সামনাসামনি হলে শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনিই নুয়ে আসত।

প্রথম দর্শনে আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে আমার এতটুকুও বাধেনি। উল্টে মনে হয়েছিল, আমি যেন ঈশ্বরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারলাম।

প্রণাম করে মাথা তুলতেই তারাসুন্দরী আমার চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কে বাবা?

নিজের পরিচয় দিলাম। উনি তখন বেতের একটা ছোট্ট ধামায় এক ধামা মুড়ি নিয়ে খাচ্ছিলেন। পাশে এক কেটলি চা আর একটা পাত্র। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : মুড়ি খাবে?

আমি বললাম : আজ্ঞে না। আমি আপনার কাছে এসেছি বিশেষ একটা প্রয়োজনে। এটা আমার ধৃষ্টতা। কীভাবে বলব বুঝে উঠতে পারছি না।

তারাসুন্দরী একটু হাসলেন। বললেন : সঙ্কোচের কী আছে। বলো না বাবা কী বলতে চাও?

বললাম : আমরা গিরিশবাবুর 'জনা' অভিনয় করব। আমি জনার পার্ট করছি। ব্ল্যাংক-ভার্সের অভিনয়ে আপনি তো এখন সবার সেরা। আপনি যদি ওই পার্টটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতেন—।

তারাসুন্দরী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : তুমি করছো জনার পার্ট? কল্‌জেয় কুলোবে? বিশেষ করে প্রবীর মরে যাবার পরের সিন?

আমি বললাম : আপনি একটু দেখিয়ে দিলে নিশ্চয় পারব।

শুনে বোধহয় খুশি হলেন তারাসুন্দরী। আমি বইটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি একটা রিডিং দিলেন। ছন্দ, যতি ইত্যাদির ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন : এবারে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো। পরে আমাকে একবার শুনিয়ে যেও কতটা কী করলে। কোন রকম সঙ্কোচ কোরো না যেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পরে আর গিয়েছিলেন নাকি?

হরিধনদা বললেন : না যাইনি। অতবড় অভিনেত্রী, তাঁকে বারবার বিরক্ত করা কি ভালো! যেটুকু দেখিয়েছিলেন সেটাই অনুসরণ করেছিলাম। আর তার ফল কী পেয়েছিলাম সেটা তো আগেই বলেছি। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেদিন সকলের মুখে আমার জনা-র অভিনয়ের কেবল প্রশংসা, প্রশংসা আর প্রশংসা।

আর তার কিছুদিন পরেই আমার জীবনের সেই যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটে গেল।

আরও একবার অভিনয়ের সূত্রে প্রশংসার বন্যায় ভেসে গিয়েছিলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। সেবার আর স্ত্রী চরিত্রে নয়, পুরুষ চরিত্রে। 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায়। ওঁর অভিনয়ে খুশি হয়ে কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ওঁর গলায় একটা সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে হরিধনদা বললেন : ১৯৩০ সাল নাগাদ অসিতের বিয়ের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল। আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম এই উপলক্ষে একটা নাটক করতে হবে। বিয়েবাড়িতে

অনেক গণ্যমান্য অতিথি আসবেন। তাঁদের সামনে আমাদের কেরামতি প্রকাশের এটা একটা সুবর্ণসুযোগ। অতএব এ সুযোগটাকে হাতছাড়া করা চলবে না।

ঠিক হল 'আলমগীর' অভিনয় করা হবে। শিশিরকুমার ভাদুড়ি তখন কর্নওয়ালিশ মঞ্চে (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) 'আলমগীর' করে দারুণ আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। ওঁর আলমগীর আর কুসুমকুমারীর উদিপুরীর কথা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। আমরা নয় নয় করে বার চারেক করে দেখেছি ওই নাটকটা। সবাই বলল আমাকেই আলমগীর সাজতে হবে। তথাস্তু। অসিত অবশ্য এবারের নাটকে অভিনয় করতে পারবে না। তাকে সেদিন এর চেয়ে দুরূহ একটি ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

হাতে সময় খুব অল্প। পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল আমাদের। শিশির ভাদুড়িমশাই তখন ওই নলিন সরকার স্ট্রিটেই থাকতেন। আমাদের চিৎকৃত রিহার্সাল হয়তো ওঁর কানে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে দু-একদিন আমাদের এই গ্যারাজে এসে রিহার্সাল দেখতেন। দু-এক মিনিট। খুব গম্ভীর মানুষ তো। চুরুট খেতে খেতে বিশেষ করে আমার দিকেই ওঁর দৃষ্টি থাকত।

শিশিরবাবু অসিতদের বাড়িতে অপরিচিত নন। অসিতের বাবা সনৎকুমার ঘোষালের সঙ্গে শিশিরবাবুর পরিচয় ছিল আগে থেকেই। তবে শিশিরবাবুর ওই মাঝে মাঝে রিহার্সালে আসাটা আমার অস্বস্তি ঘটাত। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেলে কার না মনে ভয় থাকে বলো।

অবশেষে বৌভাতের দিনটি এল। বৌভাতে আমন্ত্রিত হিসেবে এসেছেন সিনেমা-ওয়ার্ল্ডের অনেক নামী-দামি মানুষ। যেমন পরিচালক দেবকী বসু, বিখ্যাত অভিনেতা ধীরেন গাঙ্গুলি ওরফে ডি জি, প্রমথেশ বড়ুয়া, দিনেশরঞ্জন দাস এমনি আরও অনেকে। মাধব ঘোষাল মশাইয়ের আমন্ত্রণে তাঁরা এসেছেন।

আমরা মেক-আপ নিয়ে রেডি। আর কিছু অতিথি সমাগম হলেই প্লে আরম্ভ হবে। এমন সময় ডি জি এসে ঢুকলেন আমাদের সাজঘরে। বললেন : কই, তোমাদের আর কত দেরি গো? এবারে আরম্ভ করো।

বলতে বলতে আমার দিকে তাঁর নজর পড়ে গেল। বলে উঠলেন : এ কী। আলমগীরের এই অদ্ভুত মেক্-আপ কে দিয়েছে?

বলতে বলতে আমার মুখে লাগানো দাড়িটা তিনি টেনে ছিঁড়ে দিলেন। তারপর নিজে হাতে মিনিট দশেক ধরে আমার মুখে দাড়ি বসালেন খুব যত্ন করে। তারপর বললেন : যাও, আয়নায় গিয়ে নিজের মুখটা একবার ভালো করে দেখো।

দেখে চমকে উঠলাম। আগের মেক্-আপের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত। ছিলাম দু'হাজারি মনসবদার, হয়ে গেছি খাঁটি দিল্লিশ্বর। ওই মেক্-আপই আমার মনে সাহস এনে দিল। চুটিয়ে অভিনয় করলাম সেদিন। যে ছেলেটি আমার সঙ্গে উদিপুরী করছিল, তার অভিনয়ে একটু খামতি ছিল। কিন্তু আমি এমন দাপটে অভিনয় করলাম যে সেসব ত্রুটি কারও নজরেই এল না। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম সেদিন।

ড্রপ পড়ার পর একটানা হাততালির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। তারপর চমকে উঠলাম একটি ঘোষণা শুনে। কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া আমার অভিনয়ে খুশি হয়ে আমাকে একটি সোনার মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

হরিধনদার কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : বড়ুয়াসাহেব আপনার অভিনয় সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

হরিধনদা বললেন : একটি কথাও বলেননি। ড্রপ ওঠার পর আমার গলায় সোনার মেডেলটি পরিয়ে দিয়ে আমার পিঠে তিনবার মৃদু চাপড় দিয়েছিলেন। তাঁর ওই স্পর্শের মধ্যে দিয়েই অনেক কথা বলা হয়ে গিয়েছিল।

হরিধনদা তাঁর জীবনে আর একবার একটি রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন। তবে সেটি অভিনয়ের জন্যে নয়, কীর্তন গানের জন্যে। মেডেলটি দিয়েছিলেন অপর্ণা দেবী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কে অপর্ণা দেবী?

হরিধনদা বললেন : অপর্ণাদেবীকে চেনো না? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ে। ওই যে তোমাদের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মা গো। ভদ্রমহিলা ব্রাহ্ম, কিন্তু প্রাণে কী ভক্তি! আমার গান শুনতে শুনতে বার বার চোখের জল মুছছিলেন। সামনা সামনি প্রশংসা তো করলেনই। কিছুদিন পরে একটা রুপোর মেডেল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। পরে তিনিও একটা কীর্তনের দল করেছিলেন বলে শুনেছি।

হঠাৎ একটা পুরনো কথার খেই ধরিয়ে দিলাম হরিধনদাকে। বললাম : আপনি আপনার সেই স্টেশনারি দোকান দীনবন্ধু ভাণ্ডারে কী একটা ঘটনা ঘটেছিল বলছিলেন, যার জের আপনাকে আজও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সেটা কী?

হরিধনদা বললেন : সে এক রক্তারক্তির ব্যাপার।

বললাম : রক্তারক্তি! তার মানে কারও সঙ্গে মারামারি-টারামারি নাকি?

হরিধনদা বললেন : না না, সেসব কিছু নয়। ওই অসিতের বিয়ে হয়ে যাবার পর আমাদের দীনবন্ধু সম্মিলনীর নাটকের ব্যাপারটায় একটু ঘাটতি পড়ে গেল। তখন কেবল মন দিয়ে কীর্তন করে বেড়াচ্ছি। হাতে টাকা-পয়সার টানাটানি। এমন সময় স্কটিশ স্কুলের পাশে দোকানটা দিলাম।

এই সময়ে স্টার থিয়েটারে 'আলিবাবা' দেখলাম একদিন। ন্যাপা বোসের আবদাল্লা আর কুসুমকুমারীর মর্জিনা তখন সারা শহরের আলোচ্য বস্তু। দেখে এত ভালো লাগল যে, মনে হল আবার একবার তোড়জোড় করে 'আলিবাবা' নাটকটা করতে পারলে বেশ হত। কিন্তু তার তো কোন উপায় নেই। কাজেই নিজের মনে মর্জিনার পার্ট প্র্যাকটিস করি।

আমার দোকানে নানারকম জিনিস পাওয়া যেত। তখনকার দিনে বাঙালি পল্টন বলে এক ধরনের কাপড়কাচা সাবান ছিল। সেটাব খুব বিক্রি। আমি এক এক বাক্স করে দোকানে এনে রাখতাম। একদিন ওই সাবানের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ওপর থেকে কী একটা জিনিস পাড়ছি, এমন সময় মর্জিনা এসে হাজির আমার মনের মধ্যে। স্থান কাল ভুলে ওই সাবানের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ঠোঁটে এসে গেল 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' আর সঙ্গে সঙ্গে পা দুটিও নেচে উঠল কুসুমকুমারীর মতো নাচের তালে তালে।

ফলে যা ঘটার তাই ঘটল। বাক্সের ওপর থেকে টাল খেয়ে পড়ে গেলাম পাশে রাখা একরাশ কাচের গ্লাসের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রক্তের বন্যা। চার-পাঁচটা গ্লাস একসঙ্গে ভেঙে বাহুর মধ্যে ঢুকে গেছে। কিছুতেই আর রক্ত বন্ধ হয় না। ছুটতে হল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পুরো একটা মাস শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। ক্রমে ঘা-টা সারল কিন্তু দাগটা রয়ে গেল সারা জীবনের মতো।

সেরে ওঠার পর মা বললেন : দোকান বিক্রির ব্যবস্থা কর্।

সেই সময়ে আমরা ডালিমতলা থেকে উঠে গেলাম গৌরীবেড়েতে। এবং 'বন্দেমাতরম' গানের দৌলতে কলকাতা কর্পোরেশনে একটা চাকরি পেয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম : কলকাতা কর্পোরেশনে গানের কোনও ডিপার্টমেন্ট ছিল নাকি?

হরিধনদা বললেন : আরে না না, গানের ডিপার্টমেন্ট থাকবে কেন। সেবার সুধীর রায়চৌধুরী কর্পোরেশনের ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে। সুধীর রায়চৌধুরীকে চেনো তো? নামকরা সলিসিটার ছিলেন। তোমাদের এই যে মন্ত্রী অজিত পাঁজা, উনি সুধীরবাবুর জুনিয়ার ছিলেন। সুধীরবাবু পরে বার তিন চার বার এম এল এ-ও হয়েছিলেন।

তা এর আগে আমি ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটের গানের কমপিটিশনে কীর্তনে ফার্স্ট হয়েছি। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক সুধীরবাবুর ইলেকশন মিটিং-এ আমাকে নিয়ে গেলেন বন্দেমাতরম্ গাইবার জন্যে। আমার গান সুধীরবাবুর খুব ভালো লেগেছিল। মিটিং-এর পর উনি আমাকে বললেন, তিনি যদি কাউন্সিলার হতে পারেন তাহলে আমার জন্যে কর্পোরেশনে একটা চাকরির চেষ্টা করবেন।

তা সুধীরবাবু সেবার ইলেকশনে জিতে কাউন্সিলার হয়ে আমার একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে মানুষের কথার দাম ছিল। চাকরিটা ছিল কর্পোরেশনের ইলেকশন ডিপার্টমেন্টে টেম্পোরারি ক্লার্কের। চল্লিশ টাকা মাইনে। পরে ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের গান-টান শুনিয়ে খুশি করে ইনস্পেক্টর হয়ে গেলাম! পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে হয়ে গেল। কাজটা ছিল ভোটার্স লিস্ট তৈরি করার। তা সে বাজারে পঁয়ষট্টি টাকার দাম কম নয়। যৎকিঞ্চিৎ সুখের মুখ দেখতে পেলাম।

ওদিকে অসিতও তখন চাকরিতে ঢুকে পড়েছে। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কে। হাতিবাগান ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। দীনবন্ধু সম্মিলনী তখনও টিকে আছে, কিন্তু তার সে রবরবা নেই। কোনরকমে সাইনবোর্ডটুকুই দাঁড়িয়ে আছে।

এই সময়ে মেদিনীপুরে হল প্রচণ্ড বন্যা। বন্যা ওখানে প্রতি বছরই হত, কিন্তু সে বছর বন্যার তীব্রতা প্রচণ্ড। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে গেল, শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মারা পড়ল। খবরের কাগজে সেইসব মর্মান্তিক ছবি ছেপে বেরোতে লাগল। ওইসব অসহায় মানুষদের সাহায্য করবার জন্যে এখানে-ওখানে রিলিফ ফান্ড খোলা হতে লাগল।

অসিতদের ব্যাঙ্কও এ ব্যাপারে এগিয়ে এল। অসিতই ঠিক করল দীনবন্ধু সম্মিলনীকে দিয়ে একটা নাটক করাবে রিলিফ ফান্ডে টাকা তোলবার জন্যে। আমি সাজেস্ট করলাম 'পতিব্রতা' নাটকটা করা হোক। এর আগে এই নাটকটার কিছু কিছু রিহার্সাল হয়েছিল, কিন্তু নাটক নামানো যায়নি। হাতে সময় তো বেশি নেই, তাই অল্প কয়েকদিনের রিহার্সালের পর স্টার থিযেটারে 'পতিব্রতা' নাটক করলাম আমরা।

এই নাটকটায় আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম। অসিত করেছিল নরেন্দ্রর রোল, আমি সেজেছিলাম কালীনাথ। রোলটা ভিলেনের, কিন্তু আমি ওই চরিত্রের ভিলেনিটা প্রকাশ করেছিলাম কমেডি-অ্যাকটিংয়েব মধ্যে দিয়ে। দর্শকরা তা দারুণভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন। সমালোচকরাও। তখনকার দিনের নামকরা পত্রিকা 'খেয়ালী' লিখল : 'কালীনাথের চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায কমেডির ওপর কী করে ভিলেন করা যায় তার একটা নতুন রূপ দিয়েছেন। অনবদ্য তাঁর অভিনয়।'

পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মশাইয়ের আছে শুনেছিলাম 'খেয়ালী'-র ওই সমালোচনাটি লিখেছিলেন পণ্ডিত অশোক শাস্ত্রী মশাই। বীরেনবাবু আমার খুব পরিচিত। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। তাঁরই দৌলতে আমি রেডিও-নাটকে নিয়মিত অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই কী এক অজ্ঞাত কারণে দীনবন্ধু সম্মিলনী চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক ওই সময়ে আবাব কর্পোরেশনের চাকরিটিও চলে গেল। অস্থায়ী চাকরি, একদিন যাবে জানতাম, তবে এত তাড়াতাড়ি যাবে বুঝতে পারিনি। ভোটার্স লিস্ট তৈরি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী কর্মীদের ছুটি দিয়ে দিলেন।

মনের দুঃখ মনে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আবার একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল আমার জীবনে। আচমকা সিনেমায় নামার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম : সিনেমার ব্যাপারটায় তখনও পর্যন্ত উৎসাহ বোধ করেনি কেন? তখন তো বাংলা সিনেমা নিয়ে চাবিদিকে হৈ-চৈ। দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস', বড়ুয়া সাহেবের 'দেবদাস' ইত্যাদি ছবি নিয়ে দর্শকরা মাতোয়ারা। ওঁদের দু'জনের সঙ্গেই তো আপনার আলাপ ছিল বলছেন। তাহলে সিনেমায় নামার চেষ্টা করেননি কেন?

হরিধনদা বললেন : করিনি, কারণ নিজেরই মনে একটা ভীতি ছিল যে! অ্যামেচার থিয়েটার করে একটু আধটু প্রশংসা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু এমন একটা তালেবর অভিনেতা তো নয় যে ওঁদের গিয়ে ধরলেই চান্স পেয়ে যাব। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে ওদিকে আর এগোইনি।

বললাম : তাহলে চান্সটা এল কেমন করে?

হরিধনদা বললেন : নিউ থিয়েটার্সে সেই সময়ে একজন নামকরা প্রোডাকশন কন্ট্রোলার ছিলেন। তাঁর নাম চানী দত্ত। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল ফিল্মের ডিরেকটার হবেন। হঠাৎ একটা বড়সড় ফিনান্স এসে গেল তাঁর হাতে। ঠিক করলেন নিজেই স্টুডিও করে ফিল্ম তুলবেন। আমাদের পাড়ায় একটা বড় গোডাউন ছিল গ্রে স্ট্রিটের ওপর। পরে যেটার নাম হয় মতিমহল সিনেমা। ওই গোডাউনটা চানী দত্ত মশাই ভাড়া নিলেন স্টুডিও করবার জন্যে।

ওঁর একজন স্থানীয় লোক দরকার সাহায্যকারী হিসেবে। উনি বোধহয় লোকমুখে আমার সম্পর্কে শুনে থাকবেন যে আমি থিয়েটার, গান-বাজনা ইত্যাদি করি। তাই তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ

করলেন। ওঁর প্রস্তাব পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

আমাদের দীনবন্ধু সম্মিলনীর কিছু আঁকা সিন-সিনারি ছিল, পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল, এখানে কাজে লাগবে ভেবে সেগুলো গিয়ে চাইলাম অসিতের বাবার কাছে। উনি সব শুনে বললেন : নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। সিন-সিনারি চেয়ার-টেবিল যা আছে সব নিয়ে যাও। ওগুলো আর পড়ে থেকে কী হবে এখানে।

ভালোই হল। স্টুডিওর কাজে সবকিছুই লাগবে। চানী দত্ত একদিন গাড়ি ডেকে সব উঠিয়ে নিয়ে এলেন নতুন তৈরি স্টুডিওতে।

আমাদের প্রথম ছবি রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল'। ধুমধাম করে কাজ শুরু হল। চানী দত্ত পরিচালক। অভিনয় করলেন মোহিতের চরিত্রে ভূমেন রায়, গিরিবালার চরিত্রে রেণুবালা। পরবর্তীকালে যিনি বিখ্যাত নায়িকা রেণুকা রায়। ওই 'খাসদখল'-ই ওঁর প্রথম ছবি। মোক্ষদার চরিত্রে করলেন পদ্মাবতী। ঠাকুর্দা করলেন যোগেশ চৌধুরি। নিতাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করলেন চানী দত্ত নিজেই। আর আমি করলাম ওঁরই এক মোসাহেব সারদার চরিত্রে।

ছবি একদিন শেষ হল। বিলিজ করল ছায়া সিনেমায়। একদম চলল না। ফলে কোম্পানি এবং স্টুডিও দুটোই উঠে গেল। সুতরাং আমি আবার বেকার।

বেকারত্ব মোচনের আর কোনও রাস্তা না পেয়ে আবার ব্যবসা শুরু করলাম। এবারে ঢেঁকিছাঁটা চাল, ঘানির তেল ইত্যাদির ব্যবসা। তখনকার দিনে লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে এই জাতীয় খাদ্যই পছন্দ করত। আমার কাস্টমার ছিল সব বন্ধুবান্ধব। অর্ডার নিয়ে ওই সমস্ত জিনিস তাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতাম।

এই সময় আবার জড়িয়ে পড়লাম সোশ্যাল ওয়ার্কে। গৌরীবেড়ে সর্বজনীন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে এমন একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল যারা পুজো ছাড়াও অনেক সামাজিক কাজকর্ম করতেন। আমিও জড়িয়ে গেলাম ওদের ওই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। এই কমিটির নানা সোশ্যাল ওয়ার্ক ছিল কিন্তু কোন রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা ছিল না। মূলত আমার উদ্যোগেই ওখানে একটা নাট্যবিভাগ খোলা হল।

ওখানে আমি অনেক নাটক করেছি। বেশ কয়েকটির কথা এখনও মনে আছে। 'রীতিমতো নাটক'-দিগম্বর, 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাপ্রসন্ন, 'পথের সাথী'-তে অমর মাস্টার, 'চন্দ্রগুপ্ত'-য় চাণক্য। শিশির ভাদুড়ি অভিনীত নাটকগুলিই বেশি করতাম। কারণ সেই সময়ে আমি উন্মাদের মতো একের পর এক শিশির ভাদুড়ির নাটক দেখে বেড়াতাম।

প্রশ্ন করলাম : শিশিরবাবুর আর কী কী নাটক আপনি দেখেছেন?

হরিধনদা বললেন : সব সব। শিশিরবাবুর একটা নাটকও আমি বাদ দিইনি। সব দেখেছি। এমন কি অনেকেই যা দেখেনি সে নাটকও আমি দেখেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কী?

হরিধনদা বললেন : উনি বৌবাজার ওল্ড ক্লাবের হয়ে গিরিশবাবুর লেখা 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের রোল করেছিলেন—সেটাও দেখেছি। আহা, সে সব কী অভিনয়।

হরিধনদা খানিকক্ষণ চোখ বুজে সেইসব পুরনো দিনের স্মৃতিসুখ উপভোগ করলেন। তারপর বললেন : গৌরীবেড়েতে ওই সময়টা আমার খুব আনন্দে কেটেছে। পুজোর মাসখানেক আগে থেকে একদিকে রিহার্সাল আর অন্যদিকে আঁকাজোকা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। প্রতিমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যেসব পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, নদী-নালার সিন্ থাকত সে সব আমি নিজের হাতে আঁকতাম।

এল ১৯৪২ সাল। সারা বাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দেশের যে এই দুরবস্থা তার প্রতিফলন আমরা ঘটালাম পুজোর মণ্ডপে। দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী—সববাইকে সেবারে কোরা কাপড় পরিয়ে দুখিনী সাজে সাজালাম। পুজোর সমস্ত আড়ম্বর বর্জন করে টাকা বাঁচিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সেবারে আমরা ঠিক করলাম টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করব। যে টাকা উঠবে সেটা রিলিফ ফান্ডে দেওয়া হবে। তা টিকিট বিক্রির জন্যে তো একটা পপুলার নাটক চাই। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল 'আলিবাবা' করব। অনেকদিন আগে মর্জিনার নাচের অনুকরণ করতে গিয়ে হাত কেটে রক্তারক্তি

ঘটিয়েছি। এবার সুযোগ এসেছে সেই রক্তের ঋণ শোধ করার।

অভিনয়েব দিন অতবড় প্যাণ্ডেল লোেে লোকারণ্য। মেয়েদের আর ছেলে-ছোকরাদের ভিড় বেশি।

সেবারে আমাদের সাজগোজ হয়েছে ঝলমলে পোশাকের। বি ব্রাদার্সকে বলা ছিল সব নতুন পোশাক দিতে হবে। অনেকদিন বাদে আবার ফিমেল পার্ট করছি। বেশ লাগতাই মেক-আপ নিয়েছি মর্জিনার। রমেশ মিত্তির সেজেছে দস্যুসর্দার। সে আবার একটা ঘোড়া ভাড়া করে এনেছে। ঘোড়ায় চেপে স্টেজে ঢুকবে। আড়ম্বরের কোনও ত্রুটি নেই।

শো শুরু হল। বেশ জমে গেছে নাটক। অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত দৃশ্যটি এল। আবদাল্লা আর মর্জিনার যুগল নাচ এবং গান 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল'। বেশ দরদ দিয়ে গাইছি আর লচক দিয়ে নাচছি। এমন সময় কয়েকটি ফাজিল ছোঁড়া একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : 'মরে যাই, মরে যাই!' 'কী বাহার, কী বাহার!' সেই সঙ্গে দু-চারটি গগনবিদারী শিস্।

শুনে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। নাচ-গান থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম : লজ্জা করে না তোমাদের! এখানে সব পাড়াব মা-বোনেরা বসে আছে আব তোমরা কুৎসিত ভাষায় রিমার্ক পাস করছো। তোমাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

জন্য আট দশেক ছেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে আমার দিকে আগুন-চোখে তাকাতে তাকাতে গেল।

আবার নাচ-গান শুরু করলাম। কিন্তু আগের মেজাজটা আর পেলাম না। দৃশ্যান্তরের ড্রপ পড়ল এক সময়। পরের দৃশ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দস্যুসর্দারের প্রবেশ। ড্রপ উঠল। রমেশ মিত্তির ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্টেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজের কাঠের পাটাতনটা হুড়মুড় করে নিচে নেমে গেল। ওই ছোঁড়াগুলো ড্রপ পড়ার বিরতির ফাঁকে স্টেজের তলায় ঢুকে দড়ি কেটে দিয়ে চলে গেছে।

রমেশের ওই অবস্থা দেখে মানুষজন দাঁড়িয়ে পড়ল হই-হই করতে করতে। কাঠের খোঁচা লেগে রমেশের শরীরের দু-এক জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে। সুখের কথা, আঘাত তেমন গুরুতর নয়। তাড়াতাড়ি ড্রপ ফেলে দেওয়া হল।

এমন সময় শুরু হল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। প্যান্ডেলটা করা হয়েছিল একটু নিচু জায়গায়। মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে জল জমে গেল সেখানে। প্লে শুরু হবার আশা নেই দেখে মেক্-আপ তুলতে বসে গেলাম।

এমন সময় কানে এল ছোঁড়াগুলো দল বেঁধে বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছে। আমি বেরনোমাত্র আমাকে ধরে পেটাবে। হয়তো জানেই মেরে দেবে।

মেক্-আপ তুলতে তুলতে ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেয়েরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে স্টেজের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি থামলে তবে বেরোবে। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বি-ব্রাদার্সের লোকজনদের বললাম : তোমরা আমাকে একটা শাড়ি আর ব্লাউজ দাও। আমি ওটা পরে বাড়ি যাব। আমার জামা-কাপড় তোমাদের কাছে রইল। কাল সকালে ওগুলো আমার বাড়িতে ফেরত দিয়ে তোমাদের কস্টিউম নিয়ে যেও।

বৃষ্টি একটু কমতে সেই নারীসাজে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিশে বাড়ি ফিরে এলাম। আসতে আসতে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, কয়েকটি ছেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে স্টেজ থেকে বেরোবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় আমারই প্রতীক্ষায়।

পথে আসতে আসতে মনে মনে ঠিক করে নিলাম, এই শেষ। আর অভিনয় করব না। অভিনয় করে নিজে আনন্দ পেতে চেয়েছি, অন্যকে আনন্দ দিতে চেয়েছি। এই তার পুরস্কার? চোরের মতো মুখ লুকিয়ে পালাতে হচ্ছে। ঘেন্না ধরে গেল অভিনয়ের ওপর।

পুরো অক্টোবর-নভেম্বর দুটো মাস চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম। অভিনয় তো করবই না, গানেও তেমন স্পৃহা নেই। কিছুই ভালো লাগে না। কেমন যেন জবুথবু অবস্থায় দিনগুলো কাটছিল।

ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই রামদা এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। রামদা মানে রাম চৌধুরি।

আমার দাদাব বন্ধু। রামদা কলকাতা পুলিশের একজন দুঁদে সাব-ইনস্পেকটর। অভিনয়পাগল মানুষ। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতায় কালিকা থিয়েটার উনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে ওটা সিনেমা হল হয়ে যায়। তারও পরে ওঁর স্বর্গত পুত্র তপনের নামে তপন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

সেই রামদা একদিন সকালে আমাদের বাড়িতে এসে বললেন : এই, তোকে বড়বাবু একবার ডেকেছেন। ভীষণ জরুরি দরকার।

মনটা খিঁচড়ে গেল রামদার কথা শুনে। একে মন-মেজাজ খারাপ, তার ওপর পুলিশের ডাকাডাকি। একটু ঝাঁঝালো গলাতেই বললাম : কেন, আমি কি চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি যে থানার বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছে?

শুনে রামদা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন · ওরে না না, সে বড়বাবু নয়। ওরা তো ইউনিফর্মেব দৌলতে বড়বাবু। তোকে ডেকে পাঠিয়েছে আসল বড়বাবু। শিশিরবাবু। শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

নামটা শুনে শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠলাম। বিশ্বাস হয না। রামদা নিশ্চয় আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। বললাম . আপনি সত্যি বলছেন রামদা, শিশিরবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

রামদা বললেন : তবে কি তোর সঙ্গে সাতসকালে রসিকতা করতে এলাম নাকি! উনি ওঁর নতুন স্টেজে 'মায়া' বলে একটা নাটক নামাচ্ছেন। তাতে অভিনয় করার ব্যাপারেই তোর খোঁজ করছেন।

এ খবরটা আমি জানতাম। পুজোর আগে প্রবোধ গুহ মশাইয়ের নাট্যনিকেতন বিক্রি হয়ে গেছে। শিশিরবাবু ওটা নিয়েছেন। নাম দিয়েছেন শ্রীরঙ্গম। বড়দিনের আগেই ওঁর নতুন নাটক নামবে। তা সেই নাটকে অভিনয়ের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শিশিরকুমার, এটাই তো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

হ্যাঁ, এই 'মায়া' নাটকের নায়কেব ভূমিকা দিয়ে শুরু করে হরিধনদার পেশাদারি অভিনয় জীবন শুরু। তারপব থেকে বিভিন্ন মঞ্চে অজস্র নাটকে অভিনয় করেছেন এই আশির দশক পর্যন্ত। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, যুগদেবতা, দেবদাস, শ্যামলের স্বপ্ন, সন্তান, বাংলার প্রতাপ, এক পেয়ালা কফি, উল্কা, দূরভাষিণী, স্বীকৃতি, চক্র, শেষ লগ্ন, সাহেব বিবি গোলাম, নাম বিভ্রাট, সেমসাইড, সুবর্ণগোলক, বাবা বদল, কৃষ্ণকান্তের উইল ইত্যাদি। শুরু করেছিলেন নায়ক হিসেবে, শেষ করেছেন কমেডিয়ান রূপে।

সিনেমাতেও অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন হরিধনদা। শুরু 'খাসদখল'-এর পর 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে একটি গানে লিপ দিয়ে। আর শেষ করেছেন সন্দীপ রায়ের 'শেষ দেখা হয় নাই' ছবি দিয়ে। মাঝখানে অন্তত শ'পাঁচেক ছবিতে কাজ করেছেন। হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। দুটি ছবির নাম উল্লেখ করব বিশেষ করে। একটি হল সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর'—যেখানে হিটলারি গোঁফ লাগিয়ে পুলিশ অফিসার সেজে হাসিয়েছেন। আর অন্যটি হল তরুণ মজুমদারের 'ফুলেশ্বরী'—যেখানে রেলের পয়েন্টসম্যান হিসেবে দর্শককে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির নাম করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। এখন তো দূরদর্শনে প্রায়ই পুরনো দিনের ছবি দেখানো হচ্ছে। সেখানেই দেখে নেবেন হরিধনদাকে। বুঝতে পারবেন তিনি কী দরের অভিনেতা ছিলেন।

হরিধনদার বয়েস এখন ছিয়াশি। স্মৃতি এখনও সতেজ। সেই স্মৃতির খনি থেকে যৎসামান্য উদ্ধার করে পাঠকদের উপহার দিলাম। হরিধনদা তো জীবনটাকে অপচয় করেননি, তাই তাঁর আয়ু যে শতাধিক বর্ষে পৌঁছোবে এ আশা নিশ্চয় করতে পারি।

হরিধনদা যে তরুণ শিল্পীদের কী পরিমাণ স্নেহ করতেন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এই রচনা শেষ করব।

অভিনেতা প্রসেনজিৎ যখন সিনেমা লাইনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে লড়াই শুরু করেছিল। তখন বেশ কিছুদিন থিয়েটারেও অভিনয় করেছিল। আশির দশকে স্টার থিয়েটারের একটি নাটকে প্রসেনজিৎ

হরিধনদার সঙ্গে কাজ করত। নাটকের প্রথম দিন গ্রিনরুমে হরিধনদাকে একান্তে ডেকে প্রসেনজিৎ বলল: দাদু, একটা যে মুশকিলে পড়ে গেছি। কী করি বলুন দেখি!

হরিধনদা বললেন : কী মুশকিল? পার্ট মুখস্ত হয়নি বুঝি?

লাজুক হেসে প্রসেনজিৎ বললে : হ্যাঁ।

হরিধনদা বললেন : ও তুই কিচ্ছু ভাবিস না। তোর পুরো পার্টটাই আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। আমি আমার ডায়লগের সঙ্গে কায়দা করে তোর ডায়লগগুলোও বলে দোব। তুই শুধু মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে যাবি। সেটা পারবি তো?

প্রসেনজিৎ বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা পারব।

সেদিন স্টার থিয়েটারের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের একজন দর্শকও বুঝতে পারেননি হরিধনদা কী কৌশলে একজন তরুণ শিল্পীকে ডানা আড়াল দিয়ে উতরে দিলেন।

এই হলেন হরিধনদা। এক প্রচণ্ড স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব। এইসব মানুষগুলি আজও বেঁচে আছেন বলেই না পৃথিবীর বাতাস এখনও কিছুটা বিশুদ্ধ আছে।

মিহিরদা

সেদিন দুপরে কলেজ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একটা ট্যাক্সির জন্যে। বরানগরে যেতে হবে একটা জরুরি দরকারে। যাত্রা জগতের অকৃত্রিম বন্ধু সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী তখন ওই বরানগরে থাকতেন। দরকারটা তাঁর সঙ্গেই।

তা ভর দুপুরে ট্যাক্সি পাওয়া এখন যেমন, তখনও তেমনি দুর্ঘট ব্যাপার ছিল। অথচ দরকারটা এতই জরুবি যে বাসে যাওয়ারও উপায় নেই। চাতক পাখির মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় ইউনিভার্সিটির দিক থেকে একটি খালি ট্যাক্সিকে আসতে দেখে পড়ি-মরি করে সেই দিকেই ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে মনে হল আমার প্রায় পাশে পাশেই আর এক ভদ্রলোকও দৌড়োচ্ছেন ওই ট্যাক্সিটার দিকে।

কৃষ্ণদাস পালের স্ট্যাচুটার উল্টোদিকে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন ট্যাক্সিটা অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম : ট্যাক্সি-ই-ই। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: এ্যাই ট্যাক্সি! রোখকে!

কার ডাক শুনে জানি না ট্যাক্সিটা আমাদের সামনে এসে থেমে গেল। ট্যাক্সিব দরজার হাতলে আমার হাত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা আদ্দিব পাঞ্জাবি পরা বলিষ্ঠ হাতও এসে পড়ল হাতলের ওপর। এবার ওই হাতের মালিকের দিকে তাকানোর দরকার হল। কারণ 'ট্যাক্সি-ই-ই' ডাকটা তো আমিই প্রথম দিয়েছি।

কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আরে, এ তো মিহিরদা! মিহির ভট্টাচার্য। আমার প্রিয় অভিনেতা।

মিহিরদাও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেছেন। বলে উঠলেন : আরে, আপনি!

বরানগরে আমার যত জরুরি কাজই থাক না কেন, এই মুহূর্তে মিহিরদার সঙ্গে ট্যাক্সি ধরার কম্‌পিটিশনে যেতে চাইলাম না। বললাম : ঠিক আছে মিহিরদা, ট্যাক্সিটা আপনিই নিন।

মিহিরদা বলে উঠলেন : তাই কখনও হয়! গাড়িটা তো আপনিই আগে ডেকেছেন। এটা আপনিই নিন।

আমি বললাম : না না, তা হয় না। আপনি আর্টিস্ট মানুষ। অনেকে আপনাকে চেনে। আপনি রাস্তায় ট্যাক্সি ধরার জন্যে ছোটাছুটি করছেন, এটা তো ভালো দেখাবে না। ট্যাক্সিটা আপনিই নিন।

মিহিরদা বললেন : তা হয় নাকি! আপনারা সাংবাদিক মানুষ। কত জরুরি কাজ থাকে। তাছাড়া আমি তো বে-আইনি কাজ করছিলাম। প্রথম ডাকটা তো আপনিই দিয়েছিলেন। অতএব ওটা আপনারাই প্রাপ্য।

আমরা যখন এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটা কে নেবে তা ঠিক করতে পারছিলাম না, তখন ট্যাক্সিটা হঠাৎ মিটার ডাউন করে উত্তরমুখো ছুটতে আরম্ভ করল। আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে আর এক ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসেছেন। গাড়িটা স্পিড নেবার আগে ড্রাইভারটি মুখ বাড়িয়ে বলে গেল : আপনারা কোথাও বসে আগে ঠিক করে নিন, কে আগে ট্যাক্সি ডাকবেন। তারপর ট্যাক্সি থামাবার জন্যে হাত দেখাবেন। বুঝলেন?

গাড়িটা আমাদের বোকার মতো হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে হুস্ করে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই আমরা দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ হাসি হাসলাম। মিহিরদা বলে উঠলেন : ওই লখনৌ-এর ব্যাপারটাই আমাদের সব গোলমাল করে দিলে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : এর মধ্যে আবার লখনৌ এল কোথা থেকে?

মিহিরদা বললেন : ও হরি! সে গল্পটা আপনি জানেন না বুঝি! লখনৌ স্টেশনে ট্রেনে ওঠবার জন্যে দু ভদ্রলোক এসেছেন। ট্রেনটা ছাড়বার জন্যে সিগন্যাল দিয়েছে দেখে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোককে বললেন : আপ উঠিয়ে। দ্বিতীয় ভদ্রলোক বিনয়াবনত ভঙ্গিতে বললেন : পহ্‌লে আপ উঠিয়ে। প্রথম ভদ্রলোক বললেন : নেহি নেহি, পহ্‌লে আপ' করতে করতে হুইশল্ দিয়ে ট্রেন ছেড়ে চলে গেল। দুই ভদ্রলোক সেদিকে তাকিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তা আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা। 'আপনি নিন, আপনি নিন' করতে করতে অন্য একজন ট্যাক্সি নিয়ে ভেগে গেল। গল্পের ওই লখনৌয়া ভদ্রতাই আমাদের কাল করল।

আমি বললাম : ভারি মজার গপ্পো তো! আপনি শুনলেন কোথা থেকে?

মিহিরদা বললেন : এ গপ্পো তো আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। সত্যি ঘটেছিল কিংবা কেউ বানিয়েছিলেন কিনা তা বলতে পারব না। অতিরিক্ত ভদ্রতার কোনও উদাহরণ দিতে গেলে লোকে এই গল্পটাই বলে। তা থাকগে সে কথা। আপনি কোনদিকে যেতে চাইছেন বলুন দেখি?

আমি বললাম : আমি তো বরানগরে যাব প্রবোধবন্ধু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের উল্টোরথ পত্রিকায় যাত্রার বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কথা বলতে হবে। আপনি কোনদিকে?

মিহিরদা বলে উঠলেন : আরে আমিও তো ওইদিকেই যাব। রাধা সিনেমায়। তাহলে মিছিমিছি আমরা দুটো ট্যাক্সির জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছি কেন? একটা ট্যাক্সি হলেই তো চলবে। আপনি আমার নাবিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।

মিহিরদার কথা শেষ হতে না হতেই ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। ড্রাইভার চোখের ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন, আমাদের ট্যাক্সির প্রয়োজন কিনা? আমরাও ইঙ্গিতে সম্মতি জানিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। বললাম : হাতিবাগান হয়ে বরানগর চলুন।

এখন যেমন সাত-সতেরো কৈফিয়ত দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে হয়, একটু দূরে যেতে হলেই মিটারের ওপর এক্সট্রা টাকার দাবি ওঠে, যিনি ভাড়া করেছেন তাঁর সম্মতি না নিয়েই দু-তিনজন যাত্রীকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়, সেই সব বিষাক্ত এবং বিরক্তিকর ব্যাপার থেকে তখনও কলকাতা শহর মুক্ত ছিল।

গাড়িতে বসে মিহিরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাধা সিনেমায় যাচ্ছেন, কোনও শো-টো আছে নাকি?

মিহিরদা বললেন : আরে না না। আমি তো ওই বিল্ডিং-এই থাকি। পনেরো নম্বর ফ্ল্যাটে। একদিন আসুন না আমার বাড়িতে। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। কালীশবাবু তো প্রায়ই আসেন আমার ফ্ল্যাটে।

আমি বললাম : কালীশদার তো কোনও অসুবিধে নেই। ওঁর রূপমঞ্চ পত্রিকার অফিস তো আপনাদের উল্টোদিকে হাতিবাগান বাজারের ওপরে। আর আমাদের অফিস বিবেকানন্দ রোডে। তাছাড়া কালীশদার তো মাসে একটা ইস্যু বার করতে হয়, আর আমাদের মাসে দুটো। উল্টোরথ আর সিনেমা জগৎ। কাজের যা চাপ তাতে আড্ডা দেবার জন্যে সময় করাই মুশকিল।

মিহিরদা বললেন : তবু একদিন সময় করে আসুন। আমার শালির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করব।

আমি অবাক হয়ে বললাম : আপনার শালি? তাঁর আবার কী ব্যাপার?

মিহিরদা বললেন : আমার শালির নাম কুন্তলা। কুন্তলা চ্যাটার্জি। ও একটা ছবিতে চান্স পাচ্ছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। ওর শুটিং শুরু হলে একটা এক্সটেন্‌সিভ পাবলিসিটির দরকার। সেই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

আমি বললাম : তার জন্যে অসুবিধে হবে না। নতুন কেউ লাইনে এলে আমরা তার জন্যে যথাসাধ্য পাবলিসিটি করেই থাকি। তার পরে তার ক্ষমতা আর তার ভাগ্য।

মিহিরদা বললেন : ঠিকই বলেছেন। ভাগ্য। ওই ভাগ্যটা একটা বড় ফ্যাকটর। আগে ওসব মানতাম না। এখন ঘোরতর ভাবে মানি। দেখলেন না, ভাগ্যের সহায়তা পেলাম না বলে আমার জীবনে তেমন কিছুই হল না।

আমি বললাম : কিছু হল না বলবেন না। আপনার যা হয়েছে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্য অনেকের ক্ষেত্রে তার সিকির সিকিও হয়নি। তবে সিনেমার চেয়ে আপনার থিয়েটারের লাক্‌টা অনেক ভালো

বলতে হবে।

মিহিরদা আর কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। গাড়িটা যখন রূপবাণী সিনেমার সামনে এসেছে তখন মিহিরদা ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এটা কী?

মিহিরদা বললেন : কেন! আমার ভাড়াটা!

আমি বললাম : ধ্যাৎ! এটা আপনি কী বলছেন। আমি তো এইদিক দিয়েই যাচ্ছি, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে গেলাম। তার জন্যে আবার ভাড়া কী?

মিহিরদা বললেন : ঠিক আছে। আপনি কিন্তু একদিন খুব তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে চলে আসুন। সন্ধের দিকে আসবেন। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

ওঁর কথা শেষ হতে না হতে গাড়িটা রাধা সিনেমার সামনে পৌঁছে গেল। মিহিরদার নির্দেশে গাড়ি ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে মিহিরদা দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে সিটের ওপর পাঁচ টাকার নোটটি রেখে দিয়ে বললেন : এটা ভাড়া হিসেবে নয়। আমার বাড়িতে যেদিন আসবেন সেদিন আপনাদের পাড়ার চাচার হোটেল থেকে পাঁচখানা ফাউল কাটলেট আনবেন। খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

এই বলে আমি কিছু বলার আগেই মিহিরদা ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি ছেড়ে দিতে। আমি পেছনের কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলাম মিহিরদা একমুখ হাসি নিয়ে গাড়ির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন।

মিহিরদার জন্ম ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে। কলকাতায়। কোথাও কোথাও ওঁর জন্ম সন ১৯১৪ সাল বলে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সেটি বোধহয় ঠিক নয়। মিহিরদা নিজের মুখে ওঁর জন্ম সন ১৯১৭ বলে জানিয়েছেন। আমি ওঁর মুখের কথাটিকেই বেশি প্রাধান্য দেব।

কলকাতায় জন্মালেও মিহিরদারা নবদ্বীপের মানুষ। খুব নামকরা পরিবার। ওঁর ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য ছিলেন রায়বাহাদুর। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপের মানুষ যে অতিশয় শিষ্ট এবং বিনয়ী হন, এ কথা সর্বজনবিদিত। মিহিরদাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক। ওঁর ভদ্র ব্যবহারের জন্য ওঁর পেশার মানুষজন তো বটেই, তার বাইরেও সবাই ওঁকে ভালোবাসতেন।

মিহিরদা নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর ভর্তি হন বিদ্যাসাগর কলেজে। কিন্তু পড়াশোনা মিহিরদাকে কোনদিনই আকর্ষণ করতে পারেনি। খুব ছোটবেলা থেকে যাত্রা দেখতেন, থিয়েটার দেখতেন। অভিনয়ের ব্যাপারটা সেই ছোটবেলা থেকেই তাঁর সারা মনপ্রাণ জুড়ে বসেছিল।

একটু বড় হয়েই মিহিরদা শৌখিন সম্প্রদায়ে নাটক করা শুরু করলেন। পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিলেন অভিনেতা হবার বাসনায়।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে মিহিরদার হাতেখড়ি এমন এক ব্যক্তির কাছে যিনি অভিনেতা এবং প্রয়োগপ্রধান হিসেবে সারা ভারতের নমস্য। তিনি হলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। আর শিশিরবাবুর কাছে যিনি নাড়া বেঁধেছেন তিনি যে অচিরেই অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরবাবুর নির্দেশনায় শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' নাটক দারুণভাবে চলেছিল। ওই নাটকে বিপ্রদাস করতেন শিশির-অনুজ বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, বন্দনা করতেন মলিনা দেবী, আর দ্বিজদাসের ভূমিকায় অভিনয় করতেন মিহির ভট্টাচার্য। এই একটি নাটকে অভিনয় করেই মিহিরদা অভিনেতার শিরোপা পেয়ে গেলেন, আর পেলেন দর্শকসমাজের অবিমিশ্র প্রশংসা। এতদিনের দেখা স্বপ্ন তাঁর সার্থক হল।

মিহিরদা যখন পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করতে আসেন তখন কলকাতায় চারটি থিয়েটার রম রম করে চলছে। শ্রীরঙ্গম, স্টার, রঙমহল আর মিনার্ভা। আগে যেটি ছিল নাট্যনিকেতন, সেটারই নাম হয়েছে শ্রীরঙ্গম। হ্যারিসন রোডে আর একটি থিয়েটার ছিল। তার নাম নাট্যভারতী। সেটি উঠে গিয়ে সিনেমা হল হয়ে গেল। নাম হল গ্রেস সিনেমা। কিছুদিন পরে দক্ষিণ কলকাতায় একটি থিয়েটার হয়েছিল। কালিকা থিয়েটার। কয়েক বছর পরে সেটিও সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়।

ওই যে শ্রীরঙ্গম, স্টার, রঙমহল আর মিনার্ভা এই চারটি থিয়েটার রম রম করে চলছিল, তার সব কটিতেই মিহিরদা অভিনয় করেছেন। কখনও নায়ক, কখনও বা সহ-নায়ক। সেই সময়ে কোন্ কোন্ অভিনেতা গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচিত হত কম্বিনেশন নাইটে চান্স পাওয়ার উপর। তা মিহিরদা তাঁর অভিনয়ের সেই প্রথম আমল থেকেই কম্বিনেশন নাইটে চান্স পেতেন। আমি তাঁর দু-একটি কম্বিনেশন অভিনয় দেখেছি। কম্বিনেশন নাইটে বিভিন্ন মঞ্চের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নিতেন। রঙমহলে কম্বিনেশন নাইটে 'চরিত্রহীন' নাটকে আমি মিহিরদাকে দিবাকরের চরিত্রে দেখেছি। ওই নাইটে উপীন করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরি, সতীশ করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। সাবিত্রী করেছিলেন রানিবালা আর কিরণময়ী শান্তি গুপ্তা। আবার ওই একই নাটকে আর একটি কম্বিনেশনে ছবিদা অসুস্থ থাকায় সতীশ করতে পারেননি। তখন মিহিরদা সতীশের চরিত্রে করেছিলেন।

মিহিরদা তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষের জন্য 'নটচন্দন' উপাধি পেয়েছিলেন। এটা পেয়েছিলেন রঙমহলে 'সন্তান' নাটকে ভবানন্দের চরিত্রে অভিনয় করবার সময়। শুধু মিহিরদা একাই নয়। ওই নাটকে যাঁরা যাঁবা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা সকলেই এইরকম 'নট' যুক্ত উপাধি পেয়েছিলেন। অহীন্দ্রবাবুর তো নটসূর্য উপাধি ছিলই, সেইসঙ্গে অমল বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছিলেন নটসেবক। শরৎ চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন নটসাধক। মিহিরদা নটচন্দন। বিজয়কার্তিক দাস নামে একজন দাপুটে অভিনেতা ছিলেন, তিনি পেয়েছিলেন নটপাবক। আর আশু বসু, যিনি হাস্যরসাত্মক চরিত্রে অভিনয় করতেন, তিনি পেয়েছিলেন নটরসিক। আরও অনেকে এইরকম উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নাম আর উপাধি আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এই 'সন্তান' নাটক করা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়েছিল। 'সন্তান' নাটকটি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত। যে কোন কারণেই হোক বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশ কিছু ব্যক্তি এই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটিকে সেই সময়ে খুব প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। তখন বাংলাদেশে মুসলিম লিগ মিনিস্ট্রি। খাজা নাজিমুদ্দিন সম্ভবত তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে সেই আমলে প্রধানমন্ত্রী বলা হত।

তা সেবার রঙমহলে 'আনন্দমঠ' নাটক ঘোষিত হবার পর দু-একটি মুসলিম সংগঠন এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপত্তি জানান। প্রধানমন্ত্রী শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় রঙমহল কর্তৃপক্ষকে নাটকটি বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু ততদিনে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন। অনেক খরচপত্র হয়ে গেছে নাটকের পেছনে। রঙমহল কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত। অবশেষে তাঁরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হলেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সমস্ত ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনলেন। নাটকটা পড়তে চাইলেন। পড়বার পর দু-একটি জায়গায় যৎসামান্য পরিবর্তন করে নাম বদলের পরামর্শ দিলেন। সেই অনুসারে নাটকের আনন্দমঠ-এর কাহিনী অবলম্বনে নাটকের নাম রাখা হল 'সন্তান'।

তখন যে কোন নাটক মঞ্চস্থ করার আগে পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে পাস করিয়ে নিতে হত। 'সন্তান' নাটকের মধ্যে পুলিশ বিভাগ আপত্তিকর কিছু না পেয়ে অভিনয়ের ছাড়পত্র দিয়ে দিল।

নির্দিষ্ট দিনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে 'সন্তান' নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকের চরিত্রলিপির কথা আগে বলেছি। নাটক দারুণভাবে চলতে লাগল। এই নাটকে ভবানন্দের চরিত্রে অভিনয় করে মিহির ভট্টাচার্য 'নটচন্দন' উপাধি পেয়েছিলেন।

'সন্তান' নাটক সম্পর্কে এইসব তথ্য আমি মিহিরদার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। 'সন্তান' নাটক যখন মঞ্চস্থ হয় তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি। কিন্তু সারা দেশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে এই ধরনের একখানি দেশাত্মবোধক নাটকে অভিনয় করে মিহিরদা দারুণ রোমাঞ্চবোধ করেছিলেন।

মিহিরদার চলচ্চিত্র এবং নাট্যজীবনের মধ্যে শেষোক্ত জীবনটিই বেশি উজ্জ্বল ছিল। শ্রীরঙ্গম থেকে শুরু করে স্টার, রঙমহল এবং মিনার্ভা মঞ্চে তিনি অজস্র নাটকে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল : চন্দ্রশেখর, বাংলার প্রতাপ, বঙ্গেবর্গী, বিপ্রদাস, মা, সিরাজদ্দৌলা, পৃথ্বীরাজ, জনা, কঙ্কাবতীর ঘাট, মহারাজা নন্দকুমার, বাংলার মেয়ে, টিপু সুলতান, গৈরিক

পতাকা, দুই পুরুষ, পথের ডাক, পি ডব্লিউ ডি, শ্যামলী ইত্যাদি। উল্লিখিত চারটি মঞ্চ ছাড়া আর কোন মঞ্চে মিহিরদা অভিনয় করেছিলেন কি না তা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

মিহিরদার চলচ্চিত্রজীবনটিও রীতিমতো গৌরবময়। শতাধিক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে। প্রথম চিত্রাবতরণ ১৯৪০ সালে সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায়। তারপর তিনি ছবির পর্দায় কখনও নায়ক, কখনও সহ-নায়ক, কখনও বা বাবা-কাকা-মামা-দাদা ইত্যাদি। এবং সর্বত্রই তিনি সার্থক এবং স্বচ্ছন্দ।

মিহিরদার অভিনয়ের বড় গুণ ছিল স্বাভাবিকতা। কী নাটকে আর কী চলচ্চিত্রে তিনি কখনও অতি অভিনয়ের ধার দিয়েও যেতেন না। তাঁর অভিনয় এত স্বাভাবিক ছিল যে মনেই হত না তিনি অভিনয় করছেন। এমন কি কমেডি-অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি স্বাভাবিকতা বর্জন করতেন না। একটা উদাহরণ দিই।

উত্তমকুমার অভিনীত 'ছদ্মবেশী' ছবি আপনারা অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কাহিনী নিয়ে প্রথম যে ছবিটি হয় তার নায়ক ছিলেন জহর গাঙ্গুলি। এবং পরিচালক ছিলেন স্বর্গত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। দুঃখের কথা ছবিটির রিলিজ তিনি দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ছবিতে ডাঃ অবনীশের ভূমিকায় মিহিরদা অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এতটুকু বাড়াবাড়ি না করেও যে হাস্যরসের সৃষ্টি করা যায়, তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

এছাড়া নায়ক হিসেবে 'গৃহলক্ষ্মী' ছবিতে কিংবা 'পথের দাবি' ছবিতে অপূর্ব চরিত্রে এত স্বাভাবিক এবং চরিত্রানুগ অভিনয় করেছিলেন যা আজও আমার কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। মিহিরদা অভিনীত সবকটি ছবির নাম আজ আর মনে নেই আমার। যেগুলি মনে আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পতিব্রতা, কর্ণার্জুন, ভাবীকাল, নারী, প্রথম কদম ফুল, দুটি মন, হারানো সুর ইত্যাদি। তাঁর শেষ অভিনীত ছবি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ছবিটি মুক্তি পাবার আগেই ১৯৭১ সালে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।

নাটক ছিল মিহিরদার প্রাণ। কিন্তু জীবনের শেষ পর্বে কোন মঞ্চেই তাঁর সম্মানজনক স্থান জোটেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই একটি ভ্রাম্যমান নাটকের দল তৈরি করে নিয়েছিলেন। গ্রামে-গঞ্জে অভিনয় করে বেড়াতেন। এজন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে, কখনও কখনও আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মুখের মিষ্টি হাসিটি কখনও ম্লান হয়নি।

সেই যেদিন রাধা সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে চাচার হোটেলের কাটলেটের নাম করে আমার হাতে সুকৌশলে ট্যাক্সির ভাড়া ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং হাসি হাসি মুখে হাত নাড়তে শুরু করেছিলেন সেই হাসিমুখটি আমি আজও, এতদিন পরেও ভুলতে পারিনি। বোধহয় কোনওদিনই পারব না।

অনুভাদি

আজ থেকে উনপঞ্চাশ বছর আগে ১৯৪৮ সালে রূপবাণী সিনেমার পর্দায় মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা বলার ভঙ্গি, অথচ নামটা অন্য। এর নাম তো দেখছি অনুভা গুপ্তা। কিন্তু আমাদের পাড়ার গুরুদাস মল্লিকের বাড়ির নিচের তলার হলঘরে যে মেয়েটিকে কয়েক বছর আগেও রোজ বিকেলে ড্রাম পিটোতে দেখেছি, তার নাম তো যতদূর জানি মৃদুলা ছিল।

সেই সময়ে রীতিমত মারপিট দাঙ্গা করে প্রথম শো-তে সিনেমা দেখা আমাদের কাছে একটা বীরত্বের কাজ বলে মনে হত। এই 'বিশ বছর আগে' ছবির প্রথম শো-তে রূপবাণীর চার আনার লাইনে দাঁড়িয়ে সেইভাবে মারপিট করে হলে ঢুকেছি। এর আগে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' নাটক হয়ে গেছে। খুব রমরম করে চলেছে। কিন্তু সে নাটক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। টিকিটের বড্ড দাম। সবচেয়ে কম দামের টিকিট আট আনা করে। ওই পয়সায় দুটো সিনেমা দেখা হয়ে যায়। তবে কিছু কিছু নাটক কষ্ট করে পয়সা যোগাড় করে আট আনা দিয়ে দেখতাম বৈকি। বিশেষ করে শিশির ভাদুড়ির নাটকগুলো।

'বিশ বছর আগে' নাটক দেখা হয়নি। তবে ওই নাটকটার অনেক প্রশংসা শুনেছি। তাই ছবি রিলিজ হওয়ামাত্রই প্রথম শো-তে লাইন দিয়েছিলাম রূপবাণী সিনেমার চার আনা দামের সারিতে। কিন্তু ছবি দেখতে বসে মৃদুলার মতো একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ও কি সত্যিই মৃদুলা না অন্য কেউ? এই সন্দেহের যতক্ষণ না নিরসন হচ্ছে ততক্ষণ কোনমতেই তৃপ্তি পাচ্ছি না।

'বিশ বছর আগে' ছবিতে আমার কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন দেবী মুখার্জি। এর আগে 'উদয়ের পথে' থেকে 'পথের দাবী' পর্যন্ত তাঁর অজস্র ছবি দেখেছি। আমার চোখে তিনি তখন সবচেয়ে গ্ল্যামারাস শিল্পী। 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেছেন। তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গলের তিনি নয়নের মণি। 'বিশ বছর আগে' তাঁর শেষ ছবি। এই ছবি করতে করতেই তিনি মারা গেছেন। দু-একটা দৃশ্য তাঁর ছোট ভাই গৌতম মুখার্জিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেবী মুখার্জির ছিল 'গোল্ডেন ভয়েস'। ওঁর ভাই গৌতমবাবুরও তাই।

কিন্তু দেবী মুখার্জির অত সুন্দর অভিনয় দেখার ফাঁকে ফাঁকে যখনই পর্দায় অনুভা গুপ্তা আসছেন, নাচছেন কিংবা গাইছেন, তখনই আমার বার বার মৃদুলার মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে। দুটি মানুষের মুখের এমন হুবহু মিল হয় কী করে!

পর্দায় ছবিটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলাম রূপবাণীর লবিতে। সেখানে দেওয়ালের গায়ে সেঁটে রাখা স্টিল ফটোগুলোতে অনুভা গুপ্তাকে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম।

না, আর কোন সন্দেহ নেই। এ আমাদের পাড়ার ড্রাম বাজানো মেয়ে মৃদুলা ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। যদিও মৃদুলার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, কিন্তু গুরুদাস মল্লিকের ক্লাবে ওকে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাম পিটতে দেখেছি। নববর্ষের দিন প্রভাত ফেরির সময় ইয়া একখানা বিগ ড্রাম বুকে জাপটে দমাদ্দম পিটোতে পিটোতে ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় মার্চ করতে দেখেছি। মাঝে মাজে ড্রামের কাঠিটাকে শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কতরকম কসরৎ করতে দেখেছি।

কিন্তু ড্রাম বাজাতে বাজাতে কি অভিনয় করা শেখা যায়, না ড্রাম পিটোতে পিটোতে অভিনেত্রী হওয়া যায়? ড্রামের সঙ্গে অভিনয়ের কী সম্পর্ক? নাঃ, মনে একটা ধন্দ থেকেই গেল।

সেদিন সিনেমা থেকে ফিরেই গুরুদাস মল্লিক মশাইকে পাকড়াও করলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম : গুরুদাসকাকা, আপনি কি জানেন আপনাদের মৃদুলা সিনেমা করছে?

গুরুদাসকাকা তখন জনা আষ্টেক মেয়েকে ড্রাম বাজানোর কসরৎ শেখাচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন : জানি তো। সিনেমায় ওর নাম হয়েছে অনুভা

গুপ্তা। তা এতে এত হাঁফাবার কী আছে?

গুরুদাসকাকার কথা শুনে আমি একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম। এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন মৃদুলা সিনেমায় নামায় আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের পাড়ার সম্পত্তি যেন লুঠ হয়ে গেছে। এ কী অদ্ভুত মনোবৃত্তি আমার!

এই লজ্জার হাত থেকে নিজেকে সামলাতে কিছুটা সময় নিলাম। তারপর গুরুদাসকাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম : একটা ব্যাপারে আমার একটা খটকা লাগছে গুরুদাসকাকা। ক্লাব পর্যায়ে ড্রাম বাজানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে কি অভিনেত্রী হওয়া যায়?

গুরুদাসকাকা এবারে একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন : মৃদুলার অন্য কোন অভিজ্ঞতা নেই সে কথা তোমাকে কে বললে? ও নাচ জানে, গান জানে, মাস্টার রেখে সেগুলো শিখেছে খুব যত্ন করে। তাছাড়া ও তো অ্যামেচারে অভিনয়ও করেছে। তোমাদের পাড়ায় ড্রাম বাজানো শিখতে আসে বলে তোমরা ভাবলে ওর আর কোন গুণই নেই। দুম্ করে সিনেমায় চান্স পেয়ে গেছে। তোমার ভাবনাকেও বলিহারি।

ও বাবা! ওই ড্রাম পেটানো গুণ্ডাগোছের মেয়েটার মধ্যে যে এত গুণ ছিল তা কেমন করে জানব। গুরুদাসকাকার কথা শুনে আমার লজ্জাটা আরও বেড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

ওই মৃদুলাই বলুন আর অনুভাই বলুন, তার সঙ্গে আমার আলাপ আরও কয়েক বছর পরে ১৯৫১ সাল নাগাদ। ততদিনে আমার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়ে গেছে। সুধাংশু বক্সী সম্পাদিত 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকায় চাকরি করি। ওই রূপাঞ্জলি পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করবার আবেদন নিয়ে আমাকে অনুভা গুপ্তার বাড়িতে যেতে হয়েছিল।

ততদিনে আমার জানা হয়ে গেছে অনুভা গুপ্তা গানও গাইতে পারেন। মৃদুলা গুপ্তা নামে প্রফেশ্যনাল গায়িকা ছিলেন। গান শিখেছেন ভবানীচরণ দাসের কাছে। স্বর্গত জে এন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মেগাফোন কোম্পানি থেকে তাঁর রেকর্ডও বেরিয়েছে। এছাড়া অনেকগুলি ছবিতেও তিনি নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন। ওই জগতে তাঁকে নিয়ে আসেন স্বর্গত গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। 'সম্রাট অশোক' ছবিতে মৃদুলা প্রথম গান গেয়েছেন। সুতরাং অনুভা গুপ্তাকে স্টেজে তুলে গান গাওয়ালে সেটা আমাদের রূপাঞ্জলি পত্রিকার অনুষ্ঠানের পক্ষে একটা জমজমাট ব্যাপার হবে।

অনুভা গুপ্তা তখন থাকতেন তালতলার একটি বাড়িতে। দরজায় নক্ করতেই যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁকে দেখে তো আমি হতবাক্। তিনি হলেন আমার তখনকার সবচেয়ে প্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় অনিল দে। পি কে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামীদের আগের যুগে কলকাতার ময়দানকে যাঁরা নিজেদের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন, তাঁদেরই অন্যতম হলেন অনিল দে।

অনিলদা মোহনবাগানের রাইট হাফে খেলতেন। প্রতিটি খেলাতেই মাঠকে মাতিয়ে তুলতেন। ১৯৪২ সাল থেকে নিয়মিত ওঁর খেলা দেখেছি ক্যালকাটা মাঠের র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে। একটি দিনের জন্যেও ওঁকে খারাপ খেলতে দেখিনি। খেলা শেষ হতেই ছুটে এসে দাঁড়াতাম ক্যালকাটা মাঠের গেটে ফুটবল-তারকাদের খুব কাছ থেকে দেখব বলে। এখন যেটা মোহনবাগান মাঠ, তখন সেটাই ছিল ক্যালকাটা মাঠ। ক্লান্ত ঘর্মাক্ত প্লেয়াররা যখন বিজয়ী হয়ে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠ থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসতেন তখন তাঁদের দেবদূতের মতো মনে হত। অনিল দে, টি আও, রাম ভট্চাজ, নিমু বোস, নন্দ রায়চৌধুরি, শরৎ দাস, সন্মথ দত্ত ইত্যাদি বল প্লেয়ারদের দু'চোখ ভরে দেখতাম।

অনিলদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন কারবালাপাড়ার সত্যেন ঘোষাল। সত্যেনদা থিয়েটার করতেন। জহর গাঙ্গুলির বন্ধু ছিলেন। ওঁরা সব মোহনহবাগান ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। কলকাতায় পা দেওয়া ইস্তক শুনে আসছিলাম নিজেকে ক্যালকেশিয়ান বলে জাহির করতে গেলে দুটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমটি হল ট্রামের মান্থলি টিকেট, আর দ্বিতীয়টি হল মোহনবাগান ক্লাবের একটি মেম্বারশিপ কার্ড। তার প্রথমটি ম্যাংগো লেনের ট্রাম কোম্পানির অফিসে লাইন দিয়ে অনায়াসে পেয়ে গিয়েছিলাম। আর দ্বিতীয়টির জন্যে ধরেছিলাম সত্যেনদাকে।

সত্যেনদা আমার অভিলাষ শুনে বলেছিলেন : মোহনবাগানের মেম্বারশিপ পাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার

রে। আমি তো পারব না। তোকে অনিল দে-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ও পারলেও পারতে পারে।

তা সেই সূত্রে অনিলদার সঙ্গে আলাপ। অনিলদা বললেন : ঠিক আছে। আমার কাছে পঁচিশটা টাকা রেখে যাস্। দেখব চেষ্টা করে।

সেই চল্লিশের দশকে পঁচিশ টাকার দাম অনেক। আমার মতো একজন আধা-বেকারের পক্ষে পঁচিশ টাকা সংগ্রহ করা যে কী সুকঠিন কাজ সেটা নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না। অনেক কষ্টে সেটা সংগ্রহ করে অনিলদার হতে তুলে দিয়েছিলাম।

তারপর দিন যায়, মাস যায়, এমন কি বছরও ঘুরে গেল, কিন্তু মোহনবাগানের মেম্বারশিপ কার্ড আর আমার হাতে আসে না। অনিলদা যখন যেখানে সময় দেন সেখানে হাজির হই, কিন্তু অনিলদার আব দেখা পাই না। আবার খেলার দিন ওঁকে মাঠে গিয়ে ধরি। উনি আবার পরবর্তী দিনক্ষণ ঠিক করে দেখা করতে বলেন। কিন্তু সবটাই হয় ভস্মে ঘি ঢালা।

শেষ পর্যন্ত একদিন বিরক্ত হয়ে অনিলদাকে বললাম : আমার আর কার্ডের দরকার নেই। আপনি আমার টাকাটা ফেরত দিন।

কথাটা শুনে অনিলদাকে একটু বিচলিত মনে হল। উনি বললেন : টাকাটা কি আমার কাছে আছে নাকি! ওটা তো তোর দরখাস্তের সঙ্গে ক্লাবে জমা দিয়েছি। তাহলে আবার একটা দরখাস্ত করে দে টাকাটা ফেরত পাবার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত সত্যেনদার চেষ্টায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনিলদার কাছ থেকে টাকাটা ফেরত পেয়েছিলাম। এই নিয়ে রীতিমত উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল ওঁর সঙ্গে।

সেই অনিলদাকে আবার দেখলাম অনুভা গুপ্তার সঙ্গে দেখা করতে এসে। অনিলদার পরনে পায়জামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি। বেশ খানিকটা মুটিয়ে গেছেন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তুই এখানে! তোর টাকা তো কবে মিটিয়ে দিয়েছি।

আমি বললাম : আমি এসেছি অনুভা গুপ্তার সঙ্গে দেখা করতে। উনি এখানে থাকেন বলে শুনেছি।

অনিলদা বললেন : হ্যাঁ, থাকে তো। তা অনুর সঙ্গে তোর কী দরকার?

ওঁর কথার টোনে বুঝলাম অনুভা এখন অনিলদার ঘরবাসিনী। এটা কেমন করে সম্ভব হল তার অনুসন্ধান পরে করলেও চলবে। আপাতত অনুভা গুপ্তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তাঁকে আমাদের ফাংশানে গান গাইতে রাজি করানো দরকার।

বললাম : আমি তো এখন 'রূপাঞ্জলি' পত্রিকায় কাজ করি? সম্পাদকমশাই পাঠিয়েছেন ওঁর সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলতে।

আমার কথা শুনে অনিলদা বললেন : তাই নাকি! তাহলে ভেতরে এসে বোস। আমি অনুকে ডেকে দিচ্ছি। আর শোন, অনুর কাছে যেন সেই টাকা পয়সার ব্যাপারটা বলবি না।

আমি বললাম : পাগল হয়েছেন! সেসব তো কবেই মিটমাট হয়ে গেছে।

অনিলদার পেছনে পেছনে আমি ঘরে গিয়ে বসলাম। অনিলদা ভেতরে চলে গেলেন অনুভাকে খবর দিতে।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন অনুভা। অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ওঁর দিকে। সেই ড্রাম পেটানো মৃদুলা এখন অনুভা গুপ্তা। আগে রঙটা একটু কালোর দিকে ঘেঁষা ছিল। এখন তাতে উজ্জ্বল দীপ্তি।

অনুভা আমার সামনের সোফাটায় বসলেন। আমি কোনও কথা না বলে আমাদের সম্পাদক সুধাংশু বক্সীমশাইয়ের অনুরোধপত্রটা ওঁর হাতে তুলে দিলাম।

অনুভা মন দিয়ে চিঠিটা পড়লেন। তারপর বললেন : আমি তো এখন আর গান গাই না। কবে ছেড়ে দিয়েছি।

আমি তখনও মনে মনে ঠিক করে উঠতে পারিনি অনুভাকে আমি কী বলে সম্বোধন করব। কত বয়েস হবে ওঁর? আমার চেয়ে ছোট না বড়? ওঁর যা হট্টাকট্টা চেহারা তাতে ওঁর কাছে আমার রোগা ভোগা চেহারাটাকে গালিভারের কাছে লিলিপুট বলে মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললাম ওঁকে

'দিদি' বলেই ডাকব।

বললাম : অনুভাদি, আমাদের এটা তো আর পাবলিক ফাংশান নয়। পুরস্কার বিতরণী উৎসব। কিছু আমন্ত্রিত ব্যক্তির সামনে আপনি যেমন পারেন একখানা গান গাইলেই চলবে।

অনুভাদি বললেন : তা হয় না ভাই। এককালে সুরের সাধনা করেছি। এখন বেসুরো কিছু করলে পাপ হবে। তার চেয়ে বরং আমি আমার মায়ের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাব।

আমি বললাম . আপনার মা কবিতা লেখেন নাকি? কী নাম তাঁর?

অনুভাদি বললেন : আমার মায়ের নাম আভা গুপ্তা। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ওঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। মা আমার কাছেই থাকেন। দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে অনুভাদি ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। যখন মাকে নিয়ে আবার ফিরে এলেন তখন এক নজর তাকিয়েই বুঝলাম অনুভা গুপ্তার মা হবার মতো চেহারাই বটে। লম্বায় চওড়ায় অতিরিক্ত রকমের হৃষ্টপুষ্ট। কথায় বার্তায় তেমনই তেজস্বিনী।

সেদিন অনেক চেষ্টা করেও অনুভাদিকে গান গাইতে রাজি করাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমাদের রূপাঞ্জলির উৎসবে উনি ওঁর মায়ের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। ওঁর উদাত্ত কণ্ঠের সেই আবৃত্তি সকলের প্রশংসাও পেয়েছিল।

এরপর থেকে অনুভাদির সঙ্গে বেশ একটা হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল। সেটা দীর্ঘকাল বজায়ও ছিল। পরে উনি যখন অভিনেতা রবি ঘোষকে বিয়ে করে দক্ষিণ কলকাতাবাসিনী হলেন তখন থেকেই যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। ১৯৭২ সালে ওঁর মৃত্যুর আগে বছর দুই-তিন তো একেবারেই দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

অনুভাদির বাবার নাম রমেশচন্দ্র গুপ্ত। ওঁরা কলকাতার মানুষ। কিন্তু অনুভাদির জন্ম ওঁর মামার বাড়িতে। দিনাজপুরে। অনুভাদির জন্ম ১৯৩০ সালে।

এই ১৯৩০ সালের কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম : যাঃ, আপনি বয়েস লুকোচ্ছেন?

আমার কথা শুনে অনুভাদি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন : কেন, বয়েস লুকাব কেন?

আমি বললাম : আমার জন্ম ১৯২৭ সালে। আর আপনার কখনো ১৯৩০ হতে পারে নাকি? আমার পাশে দাঁড়ালে আপনাকে কত বড় দেখায় বলুন তো? আপনি কখনোই আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট হতে পারেন না।

অনুভাদি বললেন : তা কী করব বলো ভাই। ভগবান যাকে যেমন করে গড়েছেন। তুমি যদি আমার চেয়ে তিন বছরের বড় হয়েও বেগুন গাছে আঁকশি দিতে থাকো তা আমি কী করব বলো। দরকার হলে আমি তোমাকে আমার প্যারীচরণ গার্লস স্কুলের এজ সার্টিফিকেটটা দেখাতে পারি।

আমি বললাম : না না, সার্টিফিকেট-টার্টিফিকেট দেখাতে হবে না। আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। তবে একবার যখন 'দিদি' বলে ডেকেছি, তখন সেটা তো আর পাল্টাতে পারব না। তবে এখন থেকে আর আপনি আজ্ঞে করতে পারব না সেটা বলে দিচ্ছি।

অনুভাদি গালে টোল ফেলে একটু হাসলেন। তারপর বললেন : কে বলছে আপনি-আজ্ঞে করতে। তুমি করেই বোলো। তাতে তো আরও কাছের মানুষ বলে মনে হবে। মন খুলে দুটো হাসি-ঠাট্টা করতে পারব।

তা অনুভাদি সত্যিই খুব মজার মানুষ ছিলেন। সর্বক্ষণ হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। মনে হয় ওঁর শরীরে রাগের ব্যাপারটা একটু কম ছিল।

অনুভাদির লেখাপড়ার শুরু প্যারীচরণ গার্লস স্কুলে, তারপরে বাণীপীঠ বিদ্যালয়ে। কিছুকাল শান্তিনিকেতনেও কাটিয়েছেন। কিন্তু পড়াশোনার চেয়েও বেশি মনোযোগ ছিল গান শেখায়, ব্যায়াম শিক্ষায় আর নাচে এবং অভিনয়ে। গান শিখতেন বিখ্যাত ভবানীচরণ দাসের কাছে। নাচ শিখতেন বঙ্গীয় কলালয়ে। ব্যায়াম আর ড্রাম বাজানো শিখেছেন গুরুদাস মল্লিকের কাছে। আর অভিনয় শিখেছেন যখন যাকে পেয়েছেন তার কাছে। পনেরো ষোল বছর বয়সে অ্যামেচারে অনেক অভিনয় করেছেন। অবশ্যই পাড়ার অ্যামেচার ক্লাবে। গানের গলা ভালো ছিল বলে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে আলেয়ার

ভূমিকাটি অনুভাদির বাঁধা ছিল। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকেও অভিনয় করেছেন।

অনুভাদির সিনেমায় নামার ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক ব্যাপার। সে ঘটনা শুনেছি বিখ্যাত সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ অনুভাদির প্রথম সিনেমায় নামার ব্যাপারে রবিদারও একটা ভূমিকা ছিল

সত্তরের দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত বাংলা ছবির এক ডজন বিখ্যাত সুরকারের যদি নাম করতে হয় তবে তার মধ্যে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নাম আসবেই। ওই বারোজন হলেন রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, হিমাংশু দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, হীরেন বসু, শচীনদেব বর্মন, অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনিল বাগচি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ এবং সুধীন দাশগুপ্ত। কালিপদ সেনকেও ওঁদের তালিকায় রাখা যায়। আমি রাহুলদেব বর্মন, অজয় দাস, বাপী লাহিড়ীদের পরবর্তীকালের সুরকার হিসেবেই ধরছি।

রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর একটা সময়ে বাংলা সিনেমার গানকে ভয়ানকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এম পি প্রোডাকসন্সের 'স্বপ্ন ও সাধনা', 'বিদ্যাসাগর', 'সাত নম্বর বাড়ি' ইত্যাদি থেকে শুরু করে 'সমাপিকা', 'কমললতা' ইত্যাদি অজস্র ছবিতে অপূর্ব সুরারোপ করেছেন রবিদা। রবীন মজুমদারের গাওয়া বিখ্যাত 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' গানখানি ওঁরই সুর করা। রবীন মজুমদার আর রবীন চ্যাটার্জি দুজনে ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। উভয়ে উভয়কে 'মিতে' বলে ডাকতেন।

এই রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় একটা রাগী ঘটনার মধ্যে দিয়ে। আমি ওঁর 'চন্দ্রনাথ' ছবির সুরের ব্যাপারে একটা কঠোর মন্তব্য করেছিলাম। ওঁর সহকারী শশাঙ্ক সোম সে ব্যাপাবে আমাকে একটা ক্রুদ্ধ চিঠি লেখেন। আমি সে চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। পরে চাটুজ্যেমশাই নিজেই একদিন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উল্টোরথ পত্রিকার অফিসে হানা দিলেন।

রাগ শব্দটির সঙ্গে অনুরাগ শব্দের নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অতঃপর রবি বসু এবং রবীন চ্যাটার্জি উভয়ে উভয়ের এত অনুরাগী হয়ে পড়লাম যে রবিদার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল। বয়সে দুজনের অনেক পার্থক্য। তা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্বে আটকায় নি। পার্ক স্ট্রিটেব এক রেস্তোরাঁর নিরিবিলি কোণে আমরা প্রায়শই বসতাম উভয়ের সুখ-দুঃখ উজাড় করে দিতে। না না, পান-টানের কোন ব্যাপার নয়। কেবলই ভোজন। রবিদা পান করতেন কিনা আমি জানি না। আমার সামনে তো কখনও করেন নি।

সেই রবিদার মুখে শুনেছিলাম অনুভাদির প্রথম সিনেমায় নামার ইতিহাস। পরে অনুভাদিও সে ঘটনা সমর্থন করেছেন। মোহনবাগান মাঠের গ্যালারিতে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটি বড়ই বিচিত্র।

অনুভাদির প্রথম ছবিতে নামার ব্যাপারে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের যেমন একটা ভূমিকা ছিল, তেমনি তার থেকেও বড় ভূমিকা ছিল আরও দুই ব্যক্তির। এঁরা হলেন শিশির মল্লিক এবং খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ওরফে হারুদা। হারুদা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত প্রযোজক, রীতেন অ্যান্ড কোং, এম পি প্রোডাকসন্স, ডি-ল্যুক্স পিকচার্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার। হারুদা নিজেও অনেক ছবি প্রযোজনা করেছেন। এঁরা সবাই এখন পরলোকে। হারুদার ছেলে শেলুবাবু এখনও ফিল্ম ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কিন্তু যে পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকলে ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় সেটা বোধহয় শেলুবাবুর নেই। মেজাজটা পেয়েছেন তাঁর বাবা-জ্যাঠার মতোই। তাই ফিল্ম লাইনে থেকেও তেমন সুবিধে করতে পারছেন বলে মনে হয় না। মুরলীবাবু ছিলেন একটু গম্ভীর ধরনের মানুষ। কিন্তু ওঁর ভাই হারুদা একেবারে বিপরীত প্রকৃতির। সব সময় হাস্য-পরিহাসে মশগুল। হারুদার মতো এমন রসময় পুরুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

আর শিশির মল্লিক মশাই ছিলেন মুরলীবাবুদের ওইসব প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। তাঁর ছিল জহুরির চোখ। অনুভাদির মধ্যে যে একটা সুপ্ত প্রতিভা আছে সেটা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অনেক নাটক তিনি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন। স্টার থিয়েটারের যে শ্যামলী নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সেই নাটকটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছিলেন শিশির মল্লিক এবং যামিনী মিত্র মশাই।

পাঠকরা হয়তো ধৈর্যচ্যুত হবেন, কিন্তু এই শিশির মল্লিক মহাশয় সম্পর্কে আমি আরও কিছু কথা নিবেদন করতে চাই। তবে আমার ভাষায় নয়, শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

ভাষায়। শিশির মল্লিক মহাশয় সম্পর্কে আজকের প্রজন্মের মানুষদের এই সমস্ত কথা জেনে রাখা দরকার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আমার সাহিত্যে জীবন' গ্রন্থে শিশির মল্লিক সম্পর্কে লিখছেন : "কালো সুশ্রী মানুষ, প্রথমেই সব থেকে চোখে পড়ে মানুষটির আকৃতির ও প্রকৃতির কোমলতা এবং প্রসন্নতা। দেখেই বুঝতে ভুল হয় না যে, এ মানুষ রূঢ় হতে জানেন না, এঁর মধ্যে রূঢ়তা নেই। এঁর কাছ থেকে আঘাত কেউ পাবেন না। এবং নিজের অপ্রসন্নতা দিয়ে এ মানুষের স্বভাবগত প্রসন্নতাকে বড় জোর ম্লান করে দেওয়া যায়, কিন্তু এঁর কাছ থেকে অপ্রসন্ন কিছু কাউকে কখনও ক্ষুব্ধ করবে না। স্বল্পভাষী, মৃদুভাষী, তেমনই বিনীত ভদ্রভাষী। জীবনে মানুষ অনেক দেখলাম, কিন্তু এমন একটি অকপট অন্তরে-বাহিরে বিনীত মধুর ভদ্র ব্যক্তি আমি দেখিনি। শিশির মল্লিক নিজের জীবনে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাবান মানুষ নন। তাঁর পিতৃগৌরব, তাঁর জীবনের সুযোগ সুবিধা বিচার করে, তাঁর কর্মজীবন বিশ্লেষণ করে সত্য বলতে হলে বলতে হবে—কর্মজীবনে তিনি সার্থক হতে পারেন নি। কিন্তু এ কথা বলব যে, অন্তরের শুভ্রতায় স্বচ্ছতায় কোমলতায় বিনয়ে অর্থাৎ তাঁর নিজের অর্জিত শীলতায় তিনি তাঁর কুলগৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাঁর পিতৃমহিমাকে অম্লান রেখেছেন। তাঁর পিতা অনারেবল জাস্টিস এস সি মল্লিক মশায়কে আমি দেখেছি। অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশের সন্তান। প্রাচীন বঙ্গের ভাগীরথীতটে নবদ্বীপের ভগবান শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ও মহিমার প্রসাদ-পুণ্য ক্ষেত্রে তাঁদের বাস। তাঁদের বংশেও এ প্রসাদ ছিল। জাস্টিস মল্লিকই প্রথম ইংলন্ডে গিয়ে আই সি এস হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেদেরও তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন। শিশির মল্লিক বিলেতে কি পড়াশুনা করে এসেছিলেন—এ কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি। বিলেত থেকে ফিরে মল্লিক সাহেব থিয়েটার ও ফিল্ম ব্যবসায় নিয়ে আছেন। তাতে তিনি নিজে ব্যবসায়ের দিক থেকে সাফল্য লাভ করেন নি। কিন্তু থিয়েটারের দিক থেকে তিনি অনেক মঙ্গল করেছেন। সে কথাও আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, তিনি কি শিখেছেন, কিসে তিনি পারদর্শী বিশেষজ্ঞ, কি তিনি করেছেন, কতটা তিনি করেছেন—এর মূল্য আমি কোনদিন যাচাই করতে চেষ্টা করিনি। কারণ তাঁর নিজের চরিত্র-মহিমার এমন একটি মহৎ মূল্য আছে যা এ সংসারে পরম দুর্লভ। এ সংসারে শান্তি যদি পরম কাম্য হয়, তবে যে মানুষ শান্ত, সে মানুষই বা দুর্লভ নয় কেন?

মল্লিক সাহেব—শিশির মল্লিক তাঁর কর্মজগতে অর্থাৎ থিয়েটার ও ফিল্ম ব্যবসায়ের জগতে ওই নামেই পরিচিত। পোশাকে পরিচ্ছদে খাঁটি সাহেব। কখনও তাঁকে বাঙালী পোশাকে দেখিনি। বাড়িতেও না। সময়ানুবর্তিতায় খাঁটি সাহেব। কথায় তিনি খাঁটি সাহেব। কিন্তু বাংলাভাষা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সামাজিকতায় বাঙালীয়ানা, কথাবার্তায় আলাপে বাঙালী স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে, তাঁর বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত। সেখানে তিনি খাঁটি বাঙালী।"

ওপরের লেখাটুকু পড়ে মনে হতে পারে শ্রদ্ধেয় সাহিতিক তারাশঙ্করবাবু শিশির মল্লিক সম্বন্ধে একটু বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছেন। কিন্তু যাঁরা মল্লিক সাহেবকে দেখেছেন, তাঁকে খুঁটিয়ে জেনেছেন, তাঁরা সকলেই বলবেন তারাশঙ্করবাবুর ওই কথাগুলির মধ্যে এক বিন্দু অতিশয়োক্তি নেই।

আমি তার সঙ্গে যোগ করব মল্লিক সাহেবের অসাধারণ কর্মকুশলতার কথা। কী স্টেজে আর কী সিনেমায় তিনি যেসব প্রোডাকশন করেছেন তার জবাব নেই। স্টার থিয়েটারের 'শ্যামলী' নাটকটি তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

এই মানুষটির প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এসেছেন অনুভাদি। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন : জানো ভাই, আমি ছোটবেলা থেকে নাচ করেছি, গান গেয়েছি। ছুটকো-ছাটকা নাটকও যে করিনি তা নয়। তবে সিনেমায় অভিনয় করার কথা কোনদিনই ভাবিনি। আমাদের সেই সময় কত বড় বড় সব অভিনেত্রী ছিলেন। কাননদি, চন্দ্রাদি, মলিনাদি তো ছিলেনই। তাছাড়া হিরোইন হিসেবে তখন রেণুদি, পদ্মাদি, সন্ধ্যাদি পর্দা মাতিয়ে রেখেছেন। নিজেকে তাঁদের পাশে দাঁড় করাবার কথা ভাবতেই পারতাম না। তেমন একটা স্বপ্ন মনের কোণেও ঠাঁই পায়নি। কিন্তু শিশির মল্লিক মশাই সব কিছু ওলটপালট করে দিলেন। সেদিন খেলার মাঠে তিনি জোর গলায় বলেছিলেন : কে বলেছে তুমি পারবে না। আমি বলছি তুমি পারবে।

হ্যাঁ, অনুভাদিকে ময়দানের ক্যালকাটা ফুটবল গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়েই প্রথম প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন হারুদা আর মল্লিক সাহেব।

অনুভাদি সেই সময়ে ছিলেন কলকাতার ফুটবল মাঠের নিয়মিত দর্শক। বিশেষ করে মোহনবাগানের খেলা থাকলে তাঁকে তো আসতেই হবে।

আমার চোখের সামনে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের উজ্জ্বল বিকেলের সেই সব দৃশ্য আজও ছবির মতো ভাসছে। অনুভাদি তখন একটা হলুদরঙা শাড়ি পরে মাঠে যেতেন। মোহনবাগান সেন্টার করে খেলা শুরু করল। রাইট হাফ অনিল দে-র পায়ে যখন বল গেল তখন তিনি বলটি কিক্‌ও করলেন না আর পাসও করলেন না। বলের ওপর ডান পা-টি চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেম্বার্স গ্যালারির দিকে তাকালেন। সেখান থেকে যতক্ষণ না এক হলুদবরণা সুন্দরীর হাত ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হতে দেখা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত বল নিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। তারপর সুন্দরী যখন উঠে দাঁড়িয়ে হাত দেখালেন, সঙ্গে সঙ্গে গোলার মতো একখানা শট্ অনিলদার পা থেকে বেরিয়ে এল। সারা মাঠ এই দৃশ্য দেখে হইহই করে উঠল। এই অপূর্ব সুন্দর প্রেমময় দৃশ্যের সাক্ষী আমি নিজে।

সেসব সময়ে মাঠের আবহাওয়া অন্যরকম ছিল। খেলা দেখবার জন্যে ভদ্রভাবে মাঠে ঢোকা যেত। গ্যালারিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যেত। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হত খেলার মাঠে। লোকে তখন সুস্থ মনে খেলা দেখতেই যেত। খেলার মাঠগুলো তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়নি। খেলা শেষ হবার পর বিজয়ী এবং বিজিত দু দলের খেলোয়াড়রা গলাগলি করে বাড়ি ফিরতেন। মাঠের তিক্ততা যদি কিছু থাকতও তো সেটাকে কেউ বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতেন না।

আমাদের আলোচ্য তিন মূর্তি শিশির মল্লিক, হারুবাবু আর রবীন চ্যাটার্জি তিনজনেরই খেলার নেশা ছিল পাগলের মতো। মোহনবাগানের খেলা থাকলে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক আর বজ্রপাতই হোক, মাঠে হাজিরা দেওয়া চাইই চাই। ধর্মতলা স্ট্রিটে ওঁদের রীতেন কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে কখনও ট্রাম ধরে, কখনও বা হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা মোহনবাগান বা ক্যালকাটা মাঠে হাজির হতেন।

সেই সময়ে হারুদা আর মল্লিক সাহেব তাঁদের ডি-ল্যুক্স পিকচার্সের হয়ে একটি নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। ছবিটির নাম হবে 'সমর্পণ'। কিন্তু তাঁরা নায়িকা খুঁজে পাচ্ছেন না।

সেই ১৯৪৬ সালে কানন দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী আর মলিনা দেবীর তখন নায়িকা হিসেবে পড়ন্ত বেলা। রেণুকা আর সন্ধ্যারানির তখন জমজমাট বাজার। কিন্তু 'সমর্পণ'-এর নায়িকা হিসেবে ওদের দুজনের কারোকেই চলবে না। আরও কম বয়সের মেয়ে দরকার। নতুন মুখ হিসেবে ভারতী দেবী আর সুনন্দা ব্যানার্জি তখন বেশ নাম করেছেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই নিউ থিয়েটার্সের আর্টিস্ট। অতএব হারুদারা প্রাণপণে নতুন মুখের সন্ধান চালাচ্ছেন। দেখেছেন দু-চার জনকে, কিন্তু তাদের কাউকেই মনে ধরছে না।

এই সময়ে মোহনবাগানের খেলার দিন এক বিকেলে ওঁরা মৃদুলাকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। হলুদরঙা শাড়ি পরা একটি মেয়ে হরিণীর ছন্দে বার বার গ্যালারিতে ওঠানামা করছে। চলাফেরায় এতটুকু জড়তা নেই। ময়দানের সেই কনে দেখা আলোয় ঠিক কনে দেখার মতোই মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মল্লিক সাহেব। তারপর পাশে বসা হারুদাকে বললেন : হারু, ওই হলুদ শাড়ি পরা মেয়েটিকে ভালো করে দেখো দিকি। রবীন তুমিও দেখো।

হারুদা আর রবিদা দুজনেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মেয়েটি তখন কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। হাসিটিও বেশ মিষ্টি।

সেদিন ওঁদের খেলা দেখা মাথায় উঠল। খেলার সত্তর মিনিট আর হাফ টাইমের দশ মিনিট এই পুরো দেড় ঘণ্টা ক্যামেরা ফোকাস্ করার মতো নানা অ্যাঙ্গেল থেকে মেয়েটিকে দেখলেন। তারপর তিনজনেই একমত হলেন এই মেয়েটি 'সমর্পণ'-এর নায়িকা হিসেবে মানানসই হবেন। কিন্তু মেয়েটি অভিনয় করতে রাজি হবে তো? ওর অভিভাবকরা?

মৃদুলা নামের এই মেয়েটিকে হারুদারা চোখে চিনতেন। ওকে খেলার মাঠে প্রায়ই দেখেন। কিন্তু কোনদিন আলাপ হয়নি। নামটাও জানেন না। তবে মোহনবাগানের রাইট হাফ অনিল দে-র সঙ্গে ওর

যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে সেটা অনুমান করতে পারেন।

খেলা শেষ হবার পর ওঁরা তিনজনে একত্রে হাজির হলেন মৃদুলার সামনে। তিনজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা এ ভাবে ঘেরাও হতে দেখে মৃদুলা বিস্মিত হয়ে ওঁদের দিকে তাকালেন। মল্লিক সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : কী নাম তোমার?

অনুভাদি পরবর্তীকালে কথায় কথায় বলেছিলেন : ওইরকম একজন কোট-প্যান্ট পঁরা মানুষ হঠাৎ এসে নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম প্রথমটায়। ভেবেছিলাম পুলিশের লোক। তাই ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়েছিলাম : মৃদুলা।

ভদ্রলোক আরও গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন : মৃদুলা কী? একটা পদবী তো আছে তোমার, নাকি?

আমি তখন আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোনরকমে বলেছিলাম : গুপ্তা।

আমাকে ওইভাবে ভয় পেতে দেখে পাশে দাঁড়ানো খুব সুন্দর চেহারার ভদ্রলোকটি খুব মিষ্টি গলায় বলেছিলেন : ভয় পাচ্ছো কেন! আমরা আমাদের ছবির জন্যে একটি মেয়ে খুঁজছি। তাই তোমাকে এত জিজ্ঞাসাবাদ করছি।

ওই কথা শুনে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমি বললাম : ছবি মানে সিনেমা? আমি তো-এর আগে সিনেমায় কাজ করেছি।

কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন। বললেন : সে কী! কোন ছবিতে কাজ করেছো?

আমি বললাম : 'সন্ধি' ছবিতে। দেবকী বসুর ছবি।

ভদ্রলোক বললেন : 'সন্ধি' ছবিতে কী কাজ করেছো? ও ছবির হিরোইন তো সুমিত্রা দেবী।

আমি বললাম : না না, আমি অভিনয় করিনি। আমি ওই ছবিতে গান গেয়েছি।

আর এক ভদ্রলোক ওঁদের সঙ্গে ছিলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম উনি সংগীত পরিচালক রবীন চ্যাটার্জি। উনি বললেন : গান গেয়েছো? বাঃ, বেশ ভালো কথা। তুমি গান করতে পারো বুঝি?

আমি বললাম : আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ভবানীবাবুর কাছে গান শিখেছি। ভবানীচরণ দাস। তাছাড়া আমি তো নাচতেও পারি।

ফর্সাপানা ভদ্রলোক, পরে ওঁর নাম জেনেছিলাম, খগেন্দ্রলাল চ্যাটার্জি, সবাই ওঁকে হারুদা বলে ডাকতেন, তিনি বললেন . কিন্তু আমাদের ছবিতে তো তোমাকে অভিনয় করতে হবে।

কথাটা শোনামাত্র আমার বুক কাঁপতে লাগল। ভদ্রলোক বলছেন কী! আমি করব সিনেমায় অভিনয়। কানন দেবী, মলিনা দেবী পদ্মা দেবী, সন্ধ্যারানিদের সমগোত্রীয়। অ্যাকটিং করতে করতে ওইভাবে হাসতে হবে, কাঁদতে হবে। হাসতে আমি পারব নিশ্চয়, কিন্তু কান্না? কথায় কথা চোখে জল আনা? সে আমার দ্বারা সম্ভব না। ভদ্রলোককে বললাম : না বাবা, অভিনয়-টভিনয় আমার দ্বারা হবে না। এ তো আর পাড়ার থিয়েটার নয় যে যা করব পাড়ার লোক তাই মেনে নেবে। কত লোক রোজ সিনেমা দেখে বলুন তো! তারা পয়সা দিয়ে আমার অ্যাকটিং দেখতে আসবে কেন! ও আমি পারব না।

হঠাৎ মল্লিক সাহেব বেশ জোর গলায় বলে উঠলেন : কে বললে পারবে না! নিশ্চয় পারবে। এই যে তুমি এতক্ষণ এত কথা বললে, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমার মুখের নড়াচড়া দেখছিলাম, তোমার চোখের তারার নানা এক্সপ্রেশান লক্ষ করছিলাম। তোমার চোখে মুখে দারুণ কাজ আছে। আমি বলছি তুমি পারবে।

ভদ্রলোক এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যা শুনে আমার মনে হল আমি বোধহয় পারলেও পারতে পারি। কথাগুলো আমার মনে বেশ সাহস যোগাল। আমি মুখটা নিচু করে বললাম : আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি।

হারুবাবু বললেন : তাহলে আমাদের অফিসের ঠিকানাটা রাখো। দু-একদিনের মধ্যেই তোমার আর তোমার অভিভাবকদের মতামত জানিয়ে দিও। একটা কন্ট্রাক্ট করতে হবে তো। টাকা-পয়সার ব্যাপারে

কথা বলতে হবে।

শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ও বাবা, টাকা-পয়সাও পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা তো ভারি মজার। অভিনেত্রী হতে পারলে প্রাণ খুলে আইসক্রিম খাওয়া যাবে তাহলে। আমি রোজ তখন আটটা করে আইসক্রিম খাব।

তা সেসব কথা আর ওঁদের বললাম না। ওঁদের শুধু বললাম : অফিসের ঠিকানা দরকার নেই। পরশুদিন মোহনবাগানের খেলা আছে। আপনারা মাঠে আসবেন তো? সেইদিনই জানিয়ে দেব।

আর আমি শেষ পর্যন্ত ওঁদের কী জানিয়েছিলাম সেটা তো বুঝতেই পারছো।

অনুভাদির প্রথম চিত্রাবতরণের ব্যাপাবে অনুভাদি যা যা বললেন সেটা হুবহু মিলে গিয়েছিল রবীন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে। তবে ওই ঘটনার শেষটুকু অনুভাদি বলতে পারেন নি। বলবার কথাও নয়। সেটা রবিদার মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

অনুভাদি চলে যাবার পর সেদিন মাঠ থেকে বেরিয়ে মল্লিক সাহেব রবিদাকে প্রশ্ন করেছিলেন : কী হে রবি, মেয়েটিকে কী রকম দেখলে বলো? তুমি তো স্ক্রিপ্টটা শুনেছো। মেয়েটিকে হিরোইন হিসেবে মানাবে তো?

রবিদা উত্তরে বলেছিলেন : আমার তো বেশ ভালোই লাগল। মেয়েটি বেশ স্মার্ট। তাছাড়া গানও জানে বলছে।

হারুদা বলে উঠলেন : গান গান করেই তুমি গেলে! গান নিয়ে আমরা করব কী! আমাদের দরকার অ্যাকটিং।

রবিদা বললেন : সেটা তো ঠিকই। তবে আমি বলছি যে, ও গান জানে, নাচ জানে, এবার যদি অ্যাকটিংটা ঠিক ঠিক করতে পারে তাহলে ওর উন্নতি ঠ্যাকায় কে।

সেটা ঠিক কথা। রবিদা ঠিক কথাই বলেছিলেন। ওই মধ্য-চল্লিশে বাংলা ফিল্মে নাচ গান আর অভিনয় তিনটে জানা অ্যাকট্রেস আর একজনও ছিলেন না। কানন দেবী গান জানতেন, কিন্তু নাচ জানতেন না। সাধনা বসু নাচ জানতেন, কিন্তু গান জানতেন না। ওই তিনটে গুণের একত্রে সমাহার ঘটেছিল অনুভা গুপ্তার মধ্যে।

কিন্তু অনুভাদির নাম মৃদুলা থেকে অনুভা হল কী করে সে সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহল ছিল। তাই জিগ্যেস করেছিলাম : ছবি করতে এসে তুমি অনুভা নাম নিলে কেন?

অনুভাদি বললেন : নামটা হারুদারাই বদলাতে চাইছিলেন। মৃদুলা নামটা নাকি উচ্চারণের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে মফস্বলের দর্শকের কাছে? তাদের সহজ সরল জিভে মৃদুলা নাকি 'মিদুলা' হয়ে যাবার ভয় ছিল। তাই ওঁরা নতুন নাম খুঁজছিলেন। তো আমিই আমার মায়ের আভা নামটার সঙ্গে মিলিয়ে অনুভা করে নিলাম। সে নামটা ওঁদের পছন্দও হয়ে গেল।

আমি বললাম : কিন্তু অনুভাদি, তুমি বলছো তোমার প্রথম ছবি 'সমর্পণ'। কিন্তু আমরা তো তোমাকে 'বিশ বছর আগে' ছবিতে প্রথম দেখতে পেলাম ১৯৪৮ সালে। আর 'সমর্পণ' তো রিলিজ করেছে তার আরও অনেক পরে। ১৯৪৯ সালে। তার আগে তোমার সেই বিখ্যাত 'কবি' আর 'অনন্যা' ছবি তো রিলিজ করে গেছে। তাহলে তোমার প্রথম ছবি কোনটা?

অনুভাদি বললেন : আমি প্রথম কন্ট্রাক্ট করি 'সমর্পণ' ছবিতে। কিন্তু নানা কারণে ছবিটা তৈরি হতে অনেক দেরি হয়ে যায়। 'বিশ বছর আগে' আমার দ্বিতীয় ছবি। কিন্তু রিলিজ করে 'সমর্পণ'-এর আগে। এখন তুমি কোনটাকে আমার প্রথম ছবি ধরবে সেটা তুমিই ঠিক করে নাও।

আমি বললাম : যেটা আগে রিলিজ করে সেটাকেই আমরা প্রথম ছবি ধরি। সে হিসেবে 'বিশ বছর আগে' তোমার প্রথম ছবি।

অনুভাদি বললেন : ওই ছবিটার কথা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। তার কারণ দেবীদা। দেবী মুখার্জি। আমার প্রথম আর ওঁর শেষ।। দেবীদা কতবড় অ্যাক্টর ছিলেন তা তোমরা বিচার করবে। কিন্তু তিনি যে কতবড় স্নেহপ্রবণ একজন মানুষ ছিলেন তা তো আর তোমরা জানো না। শুটিং করতে করতে আমাকে নিজের বোনের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সেই দেবীদা যেদিন মারা

গেলেন সেদিন আমি খবরটা শুনে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলাম। একটা মানুষের মতো মানুষ চলে গেল। সিনেমায় আমার প্রবেশ আর দেবীদার প্রস্থান। ওই ছবিটার কথা তাই আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না।

বলতে বলতে অনুভাদির চোখ বেয়ে সত্যি সত্যিই দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অভিনয়টাকে যে কেরিয়ার করবেন এমন একটা ভাবনা অনুভাদির কোনকালেই ছিল না। 'সমর্পণ' ছবিতে সই করেছিলেন কিংবা 'বিশ বছর আগে' ছবিতে যে শুটিং করেছিলেন, সেটা খানিকটা খেয়ালের বশে। বাচ্চাদের নতুন খেলনা পাওয়ার মতো একটা ব্যাপার। সিনেমার পর্দায় নিজের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে, পাড়ার পাঁচজনে তার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে, এইরকম একটা মজার খেলা আর কি!

বরং অনুভাদি যেটাকে কেরিয়ার করবার কথা ভাবতেন সেটা হল গান। রেকর্ডে-রেডিওতে গান গাইবেন, কাননবালা, যূথিকা রায়দের মতো তাঁর গানের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, তেমন একটা স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাই যেদিন প্রথম মেগাফোনে রেকর্ড করলেন অথবা ফিল্মের জন্যে প্লে-ব্যাক করলেন, সেদিন তাঁর উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। খুব মন দিয়ে গান শিখতেন, ও ব্যাপারে একদম ফাঁকি দিতেন না।

কিন্তু অনুভাদির সব হিসেব ওলটপালট করে দিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁর নাম দেবকীকুমার বসু। হ্যাঁ, চলচ্চিত্র-পরিচালক দেবকী বসু। সবাক চলচ্চিত্রের আদিযুগে সাধারণ দর্শকরা ছবির পরিচালক কে তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা শুধু দেখতেন ছবিতে কারা কারা অভিনয় করছেন। তখনকার ছবিগুলি অভিহিত হত 'কাননবালার ছবি', 'দুর্গাদাসের ছবি' এই সব অভিধায়। পরবর্তীকালে যেমন হয়েছিল 'উত্তম-সুচিত্রার ছবি'। বরং প্রোডাকশনের কিছু পরিচিত ছিল। যেমন 'নিউ থিয়েটার্সের ছবি', 'বম্বে টকিজের ছবি' ইত্যাদি।

সেই শিল্পীভাবনার যুগেও যে দু-চারজন পরিচালকের নাম সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হত, তাঁরা হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া আর দেবকী বসু। 'বড়ুয়ার ছবি' কিংবা 'দেবকী বোসের ছবি' তখনকার দিনে আলাদা একটা গুরুত্ব পেত। আর ওইসব বিশেষণগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে জনসাধারণের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। 'সত্যজিৎ রায়ের ছবি' বা 'মৃণাল সেনের ছবি' ইত্যাদির মতো পোস্টার ছেপে, ব্যানারে লিখে কিংবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করার দরকার হত না মোটেই।

সেই দেবকীবাবু যখন অনুভাদিকে ডেকে পাঠালেন তখন অনুভাদির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। একদিন কথায় কথায় অনুভাদি বললেন : দেবকীবাবু ডেকেছেন শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলাম একেবারে। তার আগে ওঁর ছবি 'চন্দ্রশেখর' দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেছি। তারও আগে ওঁর পুরনো ছবি 'চণ্ডীদাস' দেখেছি, 'মীরাবাঈ' দেখেছি। চিত্রা সিনেমায় তখন মাঝে মাঝেই নিউ থিয়েটার্সের পুরনো ছবিগুলো রিলিজ করত। এছাড়া দেবকীবাবুর 'সোনার সংসার' দেখেছি উত্তরা না শ্রী-তে ঠিক মনে পড়ছে না। ওটাও ছিল সেকেন্ড রিলিজ। এই, তুমি 'সোনার সংসার' দেখেছো?

আমি বললাম : দেখিনি আবার। আমাদের দেশ তমলুকে তাঁবু খাটানো ট্যুরিং সিনেমায় কত দেখেছি। দারুণ ছবি। অহীনবাবু, ছায়াদি, ধীরাজদা, জীবন গাঙ্গুলি, মেনকাদেবী ওঁরা সব ছিলেন।

অনুভাদি বললেন : আর নবদ্বীপ হালদার, সত্য মুখার্জি ওঁদের কথা বললে না? আমি তো ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে কুটিবাটি। তা যে কথা বলছিলাম, দেবকীবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে আমি তো ভয়ে মরি। শুনেছি উনি খুব রাগি মানুষ। অ্যাক্টিং না পারলে আর্টিস্টদের মারধরও করেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : তুমি কি মারধর খাবার ভয়ে কেঁপে উঠেছিলে নাকি? আমি তো শুনেছি তুমি ছোটবেলায় মারপিটে খুব ওস্তাদ ছিলে?

অনুভাদি হাসতে হাসতে বললেন : তা ছিলাম একটু।

আমি বললাম : দেবকীবাবু তোমায় ডেকে পাঠিয়ে কী বললেন? ছবিতে অভিনয় করতে হবে?

অনুভাদি বললেন : উনি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাহিত্য-টাহিত্য পড়ি কিনা? তা সাহিত্য বলতে আমি তখন শরৎবাবুর কিছু বই পড়েছি। সিনেমা দেখার আগে বঙ্কিমবাবুর 'চন্দ্রশেখর' পড়েছি। আর ছোটবেলা থেকে নীহাররঞ্জন গুপ্তের বই খুব পড়তাম। 'কালো ভ্রমর' আমার দারুণ

লেগেছিল। সেই কথাই ওঁকে বললাম।

আমি বললাম : এত কথা যে বললে, তখন তোমার বুকের কাঁপুনিটা থেমে গিয়েছিল বুঝি?

অনুভাদি বললেন : ও বাবা, তা আবার থামে নাকি! ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সর্বক্ষণ কুল কুল করে ঘামছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায় বসে কথা হচ্ছিল? ওঁর বাড়িতে?

অনুভাদি বললেন : না না, উনি আমাকে স্টুডিওতে দেখা করতে বলেছিলেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

তা সেদিন ওইভাবে অনুভাদিকে ঘামতে দেখে দেবকীবাবু এক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন : বিজলী, এই মেয়েটিকে একটা ঠাণ্ডা লেমোনেড দিতে বলো তো! ওর বোধহয় গরম লাগছে।

বিজলী অর্থে বিজলীবরণ সেন। দেবকীবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওঁর আত্মীয়ও বটে।

লেমোনেড আসবার আগে দেবকীবাবু টেবিল থেকে একখানা বই অনুভাদির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এই বইটা এখনকার একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা। তাঁর নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর এই 'কবি' উপন্যাসটা এক অসাধারণ সৃষ্টি। আমি এটার ফিল্ম করব। বইটা তোমাকে পড়তে দিচ্ছি। সাতদিন পরে ফেরত চাই।

ওঁর কথার মাঝখানেই লেমোনেড এসে গেল। অনুভাদি সেটা পান করে একটু ধাতস্থ হলেন।

দেবকীবাবু বললেন : এই উপন্যাসে দুটি নারী চরিত্র আছে। একটি 'ঠাকুরঝি', অপরটি 'বসন'। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টা তোমার ভালো লাগল সেটা আমাকে বলবে। পুরো উপন্যাসটা মন দিয়ে পড়বে। দু'বার তিনবার চারবার। শুধু সংলাপগুলো নয়, বর্ণনা-টর্ণনা সমেত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। সাতদিন পরে তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচন করব। তার আগে তুমি ধরে নিও না যে তুমি আমার ছবিতে অভিনয় করছো। সেটা ঠিক করব সাতদিন পরে তোমার সঙ্গে আলোচনার পর। এখন তুমি যেতে পারো।

অনুভাদি বললেন : উনি বইটা তিন-চারবার পড়তে বলেছিলেন, কিন্তু আমার এত ভালো লাগল যে পাঁচ-ছ'বার পড়ে ফেললাম। কী অসম্ভব ভালো বই। সাহিত্যের মধ্যে যে এত রস আছে তা আগে কোনদিন বুঝিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তাম, তার এক-একটা শব্দের মানে বুঝতেই হিমশিম খেয়ে যেতাম। শরৎচন্দ্রের লেখা পড়তাম বুঁদ হয়ে। ঘটনার পর ঘটনা টেনে নিয়ে যেত। আর নীহাররঞ্জন পড়তাম তর তর করে। ঝড়ের মতো। তার চরিত্রগুলো তো এমন করে আলোড়িত করত না। আর এ কী! ঘটনার ঘনঘটা নেই তেমন। কিন্তু চরিত্রগুলো কী জীবন্ত। যেন চোখের সামনে তাদের দেখতে পাচ্ছি। ওদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না যেন বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। যতবার পড়ছি ততবারই চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

আমি বললাম : পড়তে পড়তেই বুঝি নিজেকে ঠাকুরঝি ভেবে নিয়েছিলে তুমি?

অনুভাদি বললেন : মোটেই না। আমি নিজেকে বসনের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমি তো নাচ জানি। ঝুমুর দলের ওই ছটফটে হতভাগ্য চরিত্রটি আমাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল। মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম ওই চরিত্রটি যদি পাই তবে আমি একেবারে ফাটিয়ে ছাড়ব।

আমি বললাম : সাতদিন পরে দেবকীবাবুকে ওই কথাটা বলেছিলে নাকি?

অনুবাদি বললেন : বলেছিলাম তো! উনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি তোমার ভালো লেগেছে অনুভা? তখন এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'বসন'।

অনুভাদির কথা শুনে দেবকীবাবু খানিকক্ষণ ওঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকেছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন : কেন?

অনুভাদি খুব মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন : আমি নাচ জানি তো, তাই।

দেবকীবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি ঝুমুর-নাচ জানো?

অনুভাদি মাথা নিচু করে বলেছিলেন : ওটা শিখে নিতে পারব। আমি ঝুমুর নাচ দেখেছি। কথকের চেয়ে শক্ত নয়।

দেবকীবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন : কিন্তু আমি যে তোমাকে ঠাকুরঝির চরিত্রে ভেবে রেখেছি।

শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন অনুভাদি। বলেছিলেন : ঠাকুরঝি! ওটা তো ভয়ানক ইন্‌ট্রোভার্ট ক্যারেকটার। ওটা কি আমি পারব?

দেবকীবাবু বলেছিলেন : তুমি তো তোমার নিজের ভেতরটা দেখতে পাও না। কিন্তু আমি পাই। আমি সেখানে সর্বক্ষণ তারাশঙ্করবাবুর ঠাকুরঝিকে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাচ্ছি।

কথাটা শুনে অনুভাদি চমকে উঠেছিলেন। ভদ্রলোক এ কী বলছেন! ওঁর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছেন উনি। সেখানে সর্বদা নিতাই কবিয়ালের প্রেয়সী ঠাকুরঝি ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে! কী সাংঘাতিক!

দেবকীবাবু বলেছিলেন : ভয় পেয়ো না অনুভা। আমি যে তোমাকে ঠাকুরঝি করে গড়ে তুলতে পারব সে বিশ্বাস আমার আছে। সেই সঙ্গে তুমি যদি আমার কথামতো চলো, মনপ্রাণ এক করে চেষ্টা করে যেতে পারো, তবে এই ঠাকুরঝি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে থাকবে। আর কোন ছবিতে অভিনয় না করলেও তুমি এই একটা চরিত্রের জন্যেই বাংলা সিনেমার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।

দেবকীবাবুর এই কথাগুলো শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল অনুভাদির। একটা দুরন্ত আবেগ সারা বুকটাকে মথিত করে তুলেছিল। নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। দেবকীবাবুর সামনে বসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

দেবকীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে অনুভাদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : এই তো আমি আমার ঠাকুরঝিকে পেয়ে গেছি।

তা অনুভাদি প্রাণপণে খেটেছিলেন 'কবি' ছবিতে। দেবকীবাবু তাঁকে যেমন যেমন বলেছেন, যেভাবে চালনা করেছেন, সেইভাবেই চলেছেন অনুভাদি। দেবকীবাবু চাইতেন ঠাকুরঝির ওই অসাধারণ প্রেমের ফিলিংটা অনুভাদির একেবারে ভেতর থেকে উঠে আসুক। তাই তাঁকে বৈষ্ণব সাহিত্য পড়তে দিতেন। শ্রীরাধার নানা ভাব ব্যাখ্যা করে করে বোঝাতেন। ফলে এই ছবিতে অভিনয় করার পর অনুভাদি নানা দিক থেকে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন।

শুটিং-এর সময়ও প্রাণপণ খাটতেন অনুভাদি। দেবকীবাবুর ছবিতে কারও ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। উনি সবাইকে নিংড়ে নিতেন। অনুভাদি যেহেতু নতুন তাই ওঁর মধ্যে কাজের নিষ্ঠা জাগাবার জন্যে অনেক বেশি পরিশ্রম করাতেন। প্রায় প্রতিদিনই শুটিং-এর আগে এবং পরে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে রিহার্সাল দেওয়াতেন।

এ ব্যাপারটা শুধু অনুভার নয়, আরও অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটত। রবীন মজুমদার নিতাই কবিয়ালের চরিত্র করেছেন, নীতিশ মুখার্জি করেছেন পয়েন্টসম্যান রাজেন আর নীলিমা দাস করেছিলেন বসন। সবাইকে নিয়ে রিহার্সালে বসতেন তিনি। প্রথমে শিল্পীদের মনের ভেতরে চরিত্রের আসল রূপটি গেঁথে দেওয়া, তারপর তার বহিরঙ্গের পরিমার্জনা। এই ছিল পরিচালক দেবকীকুমার বসুর কাজের ধারা।

একবার ওই 'কবি' ছবির আউটডোর শুটিং-এ ভারি মজা হয়েছিল। দৃশ্যটি ছিল ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে ঠাকুরঝি দুধের কলসি মাথায় হেঁটে চলেছে। ক্যামেরা তাকে পেছন থেকে ফলো করবে। পেছনদিক থেকে ঠাকুরঝির চলার ভঙ্গিতে ফুটে উঠবে এক আশ্চর্য ছন্দ। তার শরীর দুলবে, কোমর দুলবে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে।

পর পর তিন চারবার দৃশ্যটি নেওয়া হল, কিন্তু দেবকীবাবু কিছুতেই তাঁর প্রার্থিত বস্তুটি পেলেন না অনুভাদির চলার ছন্দে। শেষে রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন : কী হল অনুভা, আমি তোমার চলার মধ্যে ছন্দটা পাচ্ছি না কেন?

অনুভাদি বললেন : আমি কি নাচের স্টেপিং-এ পা ফেলব স্যার?

দেবকীবাবু বললেন : না না, একদম না। তুমি একজন গরিব গ্রাম্যবধূ। দুধ বিক্রি করে তোমাদের সংসার চলে। একেবারে অশিক্ষিত মানুষ। তোমার চলার মধ্যে শিক্ষিত নৃত্যের ছন্দ আসবে কেমন করে?

তুমি আবার চেষ্টা করো ছন্দটা আনতে।

আরও বার দুই চেষ্টা করলেন অনুভাদি। দেবকীবাবু বললেন : হচ্ছে না, হচ্ছে না, একদম হচ্ছে না। কী হল কী আজ তোমার?

অনুভাদি ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে মাথার কলসিটি রেল লাইনের ওপর নামিয়ে রেখে নিজেও বসে পড়লেন। আর কলসিটি নামানোর সঙ্গে সঙ্গে ঠং করে একটা আওয়াজ হল।

দেবকীবাবু ছুটে এসে কলসীটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। : এ কী! কলসি খালি কেন? এতে জল ভরে দাওনি তোমরা?

প্রোডাকসন ম্যানেজার বললেন : না স্যার, পাছে কলসি থেকে জল-টল পড়ে কস্টিউম ভিজে যায় তাই ওটা খালিই রেখেছি।

দেবকীবাবু রেগে গিয়ে বলে উঠলেন . তোমার মুণ্ডু করেছো। তাড়াতাড়ি ওটাতে জল ভরে দাও। তাই তো বলি ছন্দটা ঠিকমতো আসছে না কেন! কী অনুভা, পারবে না জলভরা কলসি মাথায় নিয়ে হাঁটতে?

অনুভাদি বললেন : খুব পারব স্যার। আমি স্পোর্টসের সময় মাথায় হাঁড়ি নিয়ে ব্যালান্সের দৌড়ে ফার্স্ট হয়েছি।

তাই হল। এবং সেই দৃশ্যটি তখন এক টেকেই ও-কে। যাঁরা পুরনো আমলের 'কবি' ছবিটি দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে ওই দৃশ্যটির কথা। অনুভাদির চলার তালে তালে কী অপূর্ব ছন্দ। সেই সঙ্গে মিউজিক। ওটা একটা স্বর্গীয় সুষমাময় দৃশ্য।

'কবি' ছবিতে ঠাকুরঝির রোল্ করে অনুভাদি দারুণ প্রশংসা পেয়েছিলেন। শুরুতে যে ইন্ট্রোভার্ট ক্যারেকটার করতে তিনি এত ভয় পাচ্ছিলেন, সেই ইন্ট্রোভার্ট ক্যারেকটার করেই এত সুনাম হল যে তারপর 'রত্নদীপ' ছবি করার সময় অনুভাদি ছাড়া আর কাউকে ভাবতেই পারলেন না দেবকীবাবু। 'রত্নদীপ'-এর বউরানির চরিত্রটা ঠাকুরঝির থেকেও অনেক বেশি ইনট্রোভার্ট। সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে অনুভাদি যে চরিত্রটা করেছিলেন সেটাও ইনট্রোভার্ট। এবং সেখানেও তিনি দারুণ ভাবে সাকসেসফুল।

তার মানে এই নয় যে অনুভাদি ইন্ট্রোভার্ট চরিত্রগুলি ছাড়া অন্যত্র সাফল্য পাননি। তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অভিনয়জীবনে অনুভাদি প্রচুর এক্সট্রোভার্ট চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। দজ্জাল গৃহবধূ, রসময়ী বউদি, স্বেচ্ছাচারী ধনীর দুলালি থেকে কূটকচালে ভিলেন চরিত্রেও মনে দাগ কাটার মতো অভিনয় করেছেন তিনি। 'জয়দেব' ছবিতে বাইরে কঠোর এবং অন্তরে কোমল স্নেহময়ী চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় আমরা দেখতে পেয়েছি।

অনুভাদির জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাননদেবীর সাহচর্যে আসা। যে কাননদেবীকে অনুভাদি তাঁর সংগীতজীবনের আদর্শ বলে মনে করতেন, সেই কাননদেবী যখন তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান শ্রীমতী পিকচার্স প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রথম ছবি 'অনন্যা'-তে অভিনয় করবার জন্য অনুভাদিকে ডাকলেন সেদিন অনুভাদির আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। কাননদেবীকে অত কাছে পাওয়া, তাঁর স্নেহের পরশে দিনের পর দিন ভেসে যাওয়া অনুভাদির জীবনে স্বর্গ পাওয়ার মতোই একটা ব্যাপার। শ্রীমতী পিকচার্সের কেবল ওই ছবিটাতেই নয়, এরপর 'বামুনের মেয়ে' ছবিতেও অভিনয় করেছেন অনুভাদি।

সারা জীবনে একশোরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন অনুভাদি। কত আর নাম করব। অমর মল্লিক পরিচালিত 'স্বামীজি' ছবিতে তাঁকে অভিনয়ের সঙ্গে নাচতেও হয়েছে। তপন সিংহের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ছবিতে তাঁর অভিনয়ে আর এক বৈচিত্র্য দেখা গেছে।

১৯৫৮ সালে অনুভাদি একটি মহৎ চরিত্রে রূপদান করেন। পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ যখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী সারদাদেবীর পুণ্য জীবনকথা অবলম্বনে 'শ্রীশ্রীমা' ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে অনুভাদিকে ডাকলেন, তখন তিনি এক কথায় রাজি হতে পারেন নি।

সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনুভাদি বললেন : কী করে রাজি হই বলো। আমার জীবনে ধর্মের ব্যাপারটাকে কোনওদিন বড় করে দেখিনি। ধর্মের কিছু কিছু ব্যাপার তো আমার কাছে কুসংস্কার

বলেই মনে হত। তাই কালীপ্রসাদবাবু যখন সারদামণির চরিত্র আমায় করতে বললেন, তখন ছবিটা করতে ইতস্তত করেছিলাম। এ তো আর হেঁজিপেজি কোন মাইথোলজিকাল ছবি নয় যে চোখ-কান বুজিয়ে অভিনয় করে চলে আসব। এটা হল এক ধার্মিক মহিলার জীবন চিত্র। তাই আমি সরাসরি 'না' বলে দিয়েছিলাম।

আমি বললাম : তাহলে শেষ পর্যন্ত রাজি হলে কেন?

অনুভাদি বললেন : সেটা ওই কালীপ্রসাদবাবুর জন্যে। উনি বললেন এটা তো নিছক ধর্মমূলক ছবি নয়। এটা হল এক মহৎ মহিলার আত্মনিবেদনের কাহিনী। তিনি ধর্ম বুঝতেন না, ঈশ্বর বুঝতেন না, তাঁর স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন তাঁর কাছে ঈশ্বর। আমি তোমাকে একটা বই দিচ্ছি, এটা পড়ে দেখো, তারপর তোমার মতামত আমাকে জানিও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কী বই?

অনুভাদি বললেন : 'শ্রীশ্রীমা'। তমোনোশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোকের লেখা। বইটা পড়তে পড়তে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। এ কী জীবন! ভাবো দেখি, যেখানে রামকৃষ্ণদেব সারদামণিকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে পুজো করছেন সেখানে এক অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলার কী মানসিক অবস্থা হতে পারে! তিনি সেই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কী মহৎ আত্মনিবেদন! বইটা পড়ার পর আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম এই চরিত্রটি আমায় করতেই হবে। পরের দিন আমি নিজেই ওঁদের অফিসে গিয়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

মাত্র বেয়াল্লিশ বছর অনুভাদি বেঁচে ছিলেন। ১৯৩০ সালে জন্ম আর ১৯৭২ সালে মৃত্যু। আজও যখন দূরদর্শনের পর্দায় পুরনো আমলের ছবিগুলিতে অনুভাদির অভিনয় দেখি তখন বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে। ঈশ্বর কেন যে তাঁকে আরও অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখলেন না! তাহলে বাংলা সিনেমা অনেক ঐশ্বর্যবান হত। ঈশ্বরের যে মাঝে মাঝে কেন এমন মর্মান্তিক অভিলাষ হয় কে জানে!

গঙ্গাদা

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি অমায়িক, ভদ্র এবং ঠাণ্ডা মাথার মানুষকে 'মাটির মানুষ' বলা হয়। কিন্তু জীবনের পঁচিশটি বছর কেটে যাবার পরও কোনও 'মাটির মানুষের' দেখা আমি পাইনি। পেলাম পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে গঙ্গাপদ বসুর সঙ্গে পরিচয় হবার পর। এরকম সহজ সরল অমায়িক ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

সেটা ছিল শীতকাল। একটা ছবির আউটডোর শুটিং উপলক্ষে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ওভারনাইট জার্নি। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন ছাড়বে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব সকাল ছ'টার মধ্যে।

শীতকাল হলে অভিনেতা ছবি বিশ্বাস একটু অসুস্থ বোধ করতেন। তাঁর একটা ক্রনিক হাঁপানি ছিল। তাই উনি শীতকালে ঠাণ্ডাটাকে অ্যাভয়েড করতেন। ওই সময়টা বাইরে কোথাও শুটিং করতে যেতে চাইতেন না।

তা সেবার ওই ছবির প্রডিউসার হাতে-পায়ে ধরে ছবিদাকে আউটডোরে যেতে রাজি করিয়েছেন। ছবির রিলিজের ডেট ঠিক হয়ে গেছে। ছাব্বিশে জানুয়ারি রিলিজ। সামান্য কাজ যা বাকি আছে এর মধ্যে সেরে নিতে না পারলে রিলিজ আটকে যাবে।

ছবিদা এসব ক্ষেত্রে খুব বিবেচক মানুষ। জানেন তাঁর কষ্ট হবে। তবু প্রডিউসারের বিপদের কথা মাথায় রেখে ডেট দিয়েছেন।

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ স্টেশনে এসে দেখলাম আমার স্থান নির্ধারিত হয়েছে ছবিদার সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে। চার শয্যার একটি ফার্স্ট ক্লাস কুপে। তার একদিকে ওপরের বার্থে ছবিদা। তার নীচে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলেকে দেওয়া হয়েছে ছবিদার দেখভাল করার জন্যে। উল্টোদিকে নিচের বার্থটি আমি অধিকার করলাম। আমার ওপরে কে আছেন জানি না।

ট্রেন ছাড়বার মিনিট কুড়ি আগে ছবিদা এলেন। প্রোডাকশনের ছেলেটি ঝটপট ওপরের বার্থে ছবিদার বিছানা বিছিয়ে ফেলল। ছবিদা কামরায় ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : তোকে এই কামরায় দিয়েছে নাকি?

আমি বললাম : প্রোডাকশন ম্যানেজার তো তাই বলল।

ছবিদা বললেন : কিন্তু তোর যে অসুবিধে হবে। তুই তো জানিস আমি অসুস্থ মানুষ। শুয়ে থাকলে হাঁপানির টানটা বাড়ে। সারা রাত জেগেই থাকি। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে নিই। তা আমি সারা রাত জেগে থাকলে তোর অসুবিধে হবে না তো?

আমি বললাম : একদম না। খবরের কাগজে কাজ করি। রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে। তাছাড়া একটা রাত আপনার কাছাকাছি থাকতে পারব, সেটা তো আমার সৌভাগ্য।

ছবিদা একটা চোখ একটু ছোট করে আমার দিকে তাকালেন। একটু হেসে বললেন : খুব যে তেলিয়ে কথা বলতে শিখেছিস দেখছি। কাশির দাপটে সারা রাত যখন দু'চোখের পাতা এক করতে পারবি না তখন বুঝবি মজাটা!

আমি বললাম : ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। তিনখানা ফ্ল্যাটবেড মেসিন চলার আওয়াজ কানে নিয়েও যখন সারা রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পেরেছি, তখন আপনার কাশির আওয়াজ তো তার কাছে কিছুই নয়।

ছবিদা বললেন : ঠিক আছে। দেখা যাক কত হিম্মৎওয়ালা পুরুষ তুই। কিন্তু তোর ওপরের বার্থে কে আছে বল দিকি?

আমি বললাম : তা তো জানি না। এলেই দেখতে পাব।

গাড়ি ছাড়ার মিনিট পাঁচেক আগে হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছলেন গঙ্গাদা। কুলির মাথা থেকে বেডিং-

টেডিং নিজেই হাতাহাতি করে নামালেন। তারপর আমার সিটের ওপর ধপ করে বসে পড়ে এক বুক নিঃশ্বাস ছেড়ে ছবিদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি ভালো আছেন ছবিদা?

ছবিদা একটু হেসে বললেন : এতক্ষণ তো ছিলাম। কিন্তু তুমি আসার পর থেকে শরীরটা যেন খারাপ মনে হচ্ছে।

গঙ্গাদা সহজ সরল মানুষ। ছবিদার ওইসব প্যাঁচালো কথার মানে বুঝতে পারলেন না। একবার আমার দিকে আর একবার ছবিদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন।

ছবিদাও বোধহয় মজা পেয়ে গেছেন তখন। গঙ্গাদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আসতে এত দেরি হল কেন? আর একটু হলেই তো ট্রেন ছেড়ে বেরিয়ে যেত।

গঙ্গাদা বললেন : আজকে বহুরূপীর শো ছিল তো! সেখানে একটু দেরি হয়ে গেছে। তার ওপর ট্যাক্সি পাই না। অনেক কষ্টে যদিও পেলাম, হাওড়া ব্রিজের মুখে আবার জ্যাম। আমি তো ভেবেছিলাম ট্রেনটা বোধহয় মিস্‌ই করব!

ছবিদা বললেন : সেটা করলেই বোধহয় ভালো করতে।

গঙ্গাদা বললেন : কী যে বলেন ছবিদা আপনার কথার মানে খুঁজে বাব করতে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়।

ছবিদা বললেন : মানেটা তো এখন বুঝতে পারবে না। রাত আর একটু গভীর হোক, তখন বুঝতে পারবে।

গঙ্গাদা তো নয়ই, আমিও ছবিদার এই কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না। দুজনে দুজনের দিকে বোকার মতো তাকাতে লাগলাম।

ছবিদা গঙ্গাদার দিকে তাকিয়ে বললেন : আর বোকার মতো বসে থেকে কী করবে। এবারে ধড়াচুড়ো যদি ছাড়তে হয় তাহলে ছেড়ে নিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করো। খেয়ে-দেয়ে এসেছো তো?

গঙ্গাদা বললেন : হ্যাঁ দাদা, খেয়ে এসেছি।

কথাটা বলে গঙ্গাদা নিজেই কম্পার্টমেন্টের মেঝে থেকে বেডিং তুলে পাততে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ছবিদা বললেন : তুমি কেন? ও ছোঁড়া কী করতে আছে এখানে?

এই বলে প্রোডাকশনের ছেলেটিকে ধমকে উঠলেন : অ্যাই ছোকরা, গঙ্গাবাবুর বিছানাটা পেতে দিতে পারছিস না। আমার কাজ করতে এসেছিস বলে অন্য কারও কাজ করবি না নাকি! ওটাও তো প্রোডাকশনের কাজ, না কী? এই জন্যে তোদের কিস্যু হয় না জীবনে। চিরকাল প্রোডাকশন বয় হিসেবেই জীবন কেটে যায় তোদের।

প্রোডাকশনের ছেলেটি খুব নিরীহ। সে অত সাত-পাঁচ ভাবেনি এ নিয়ে। তাড়াতাড়ি এক হাত জিভ কেটে গঙ্গাদার বিছানা পাততে শুরু করে দিল আমার ওপরকার বার্থে।

ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে দিয়েছে। তখন সে পূর্ণ গতিবেগে ধাবমান। গঙ্গাদা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে। গায়ে একখানা ফুলহাতা সোয়েটার। সোজা গিয়ে উঠলেন আপার বার্থে তাঁর বিছানায়।

ছবিদা তখন প্রোডাকশনের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন : কই রে, ওটা বার করে দে। আহ্নিকে বসি এবার।

তারপর গঙ্গাদার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি একটু পানে বসব। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

গঙ্গাদা বললেন : না না, একদম না।

ছবিদা বললেন : তুমি তো আবার ও রসে বঞ্চিত। আর রবে ছোঁড়াটাও তাই। এতদিন আমার সঙ্গে মিশছে, এখনও সাবালক হল না। তা একদিক্ থেকে ভালোই হল। নইলে তো আবার ভাগ দিতে হত। আমার আবার স্টক শর্ট আছে আজ।

গঙ্গাদা ছবিদাকে আহ্নিকে বসতে দেখে মোটা কম্বলে মুখ পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়লেন। ছবিদা আরও দু-একটা চুমুক দেবার পর জিজ্ঞাসা করলেন : গঙ্গা, এই গঙ্গা, ঘুমোলি নাকি?

ছবিদা এতক্ষণ গঙ্গাদাকে তুমি করে সম্বোধন করছিলেন। একটু পানীয় পেটে যাবার পরই তুমি থেকে তুই-তে পৌঁছে গেলেন। শুনেছি তরল পানীয় পেটে পড়ার পর মানুষের মন নাকি উদার হয়ে যায়। আত্মীয়বৎ নৈকট্য অনুভব করে সকলের সঙ্গে। ছবিদার ক্ষেত্রেও বোধহয় সেটাই ঘটেছে। নইলে হঠাৎ তুমি থেকে তুই-তে এসে যাবেন কেন।

ছবিদার কথা শুনে গঙ্গাদা মুখে থেকে কম্বল সরিয়ে মাথাটা একটু তুলে বললেন : না দাদা, ঘুমোইনি। এই একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল।

ছবিদা সস্নেহে বললেন : তাহলে তো তোকে ডেকে অন্যায় করেছি। তুই ঘুমো, ঘুমো।

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদা মুখে কম্বল চাপা দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। ছবিদা যথারীতি গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন।

মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে গঙ্গাদার ভারি ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল। ছবিদা সেদিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে এক চোখ বুজে কেমন একটা ইঙ্গিত করলেন। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন : গঙ্গা! গঙ্গা! গঙ্গা আমাদের মা। গঙ্গার পুণ্য সলিলে সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। গঙ্গা, এই গঙ্গা, ঘুমোলি নাকি?

শেষের গঙ্গা ডাকটি ছবিদা বেশ জোর গলাতেই করেছিলেন। সে আওয়াজে গঙ্গাদার কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। গঙ্গাদা বললেন : না না, ঘুমোইনি দাদা। এই একটু চোখটা জড়িয়ে এসেছিল আর কি! তা কী বলছেন বলুন ছবিদা?

ছবিদা বললেন : না না, কিছু বলিনি। তুই ঘুমোচ্ছিলি কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। তা ঘুমো, তুই ঘুমো।

গঙ্গাদা গায়ের এলোমেলো কম্বলটা ঠিক করে নিয়ে আবার মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন।

মিনিট পনেরো পরেই আবার ছবিদার কিঞ্চিৎ নাটকীয় সংলাপ শোনা গেল : গঙ্গা! গঙ্গা! গঙ্গা আমাদের মা। আহা, মায়ের আমার কত রূপ। আদি গঙ্গা, মাদি গঙ্গা! গঙ্গা, এই গঙ্গা, ঘুমোলি নাকি?

গঙ্গাদা বোধহয় অনেক কষ্টে ঘুমটি এনেছিলেন। ছবিদার ডাকে তা ভেঙে গেল। মাথাটা একটু তুলে কিঞ্চিৎ বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন : কী বলছেন দাদা?

ছবিদা গঙ্গাদার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি? কই কিছু বলিনি তো? আমি শুধু জিগ্যেস করছিলাম তুই ঘুমোলি নাকি? তা মনে হয় তুই ঘুমোচ্ছিলি। তাহলে ঘুমো, ঘুমো।

ছবিদার কথা শোনবার পর গঙ্গাদা বার্থ থেকে নেমে একবার বাথরুমে গেলেন। ফিরে এসে আবার আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে প্রোডাকশনের ছেলেটি তার সিটের ওপর বসে বসেই ঢুলতে শুরু করেছিল। ছবিদা মাথাটা একটু নিচু করে তাকে দেখলেন। তারপর বললেন : ওহে বৎস, বসে বসে ঢোলবার দরকার কী! আমাকে এক বোতল জল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকাল থেকে তো আবার গাধার খাটুনি খাটতে হবে। আমাদের মতো তো আর নয়! কতক্ষণে দয়া করে দুটো শট দিয়ে প্রোডিউসারকে ধন্য করব। নে নে, জলটা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

এই উদারতা, প্রোডাকশনের একটি ছেলের জন্যে এই মমতা যেন ছবিদাকেই মানায়। গ্রেট হতে গেলে মানুষের অনেক গুণ থাকা দরকার। ছবিদার সেটা পুরোমাত্রায় আছে।

প্রোডাকশনের ছেলেটি এক বোতল জল ছবিদাকে দিয়ে শোবার তোড়জোড় করছিল। ছবিদা তাকে বললেন : ওহে বাপু, বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নাইট-ল্যাম্পটা জ্বেলে দাও। না হলে তো তোমাদের কারও চোখে ঘুমই আসবে না।

ছবিদার নির্দেশমতো নাইট-ল্যাম্প জ্বলে উঠল। তার নীলচে আভায় একটা মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হল। আপার বার্থে শাল জড়ানো আসনপিঁড়ি করে বসা ছবিদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল সেই আলোয়। নাইট-ল্যাম্পের মৃদু আলোয় নিচের বার্থে আমাদের প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।

আরও মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ছবিদা মনযোগ দিয়ে মদ্যপান করলেন। আমার হাতের ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় দেড়টা বাজে। হঠাৎ পুনরায় ছবিদার কণ্ঠে নাটকীয় সংলাপ শোনা গেল : গঙ্গা! গঙ্গা!

গঙ্গা আমাদের মা। আহা, মায়ের আমার কত রূপ। বুড়িগঙ্গা-ছুঁড়িগঙ্গা। গঙ্গা, এই গঙ্গা, ঘুমোলি নাকি?

হঠাৎ গঙ্গাদার নাক ডাকা শুরু হল। বেশ বোঝা যায় এটা কৃত্রিম নাসিকা গর্জন। গঙ্গাদা এত বড় অভিনেতা। কিন্তু সেদিনকার সেই নাক ডাকাটা খুব ব্যাড অ্যাকটিং হয়ে গেল।

ছবিদা গঙ্গাদার ওই নাক ডাকার প্রতি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করে একটু গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন : গঙ্গা, ও গঙ্গা রে, ঘুমোলি নাকি রে?

গঙ্গাদার পক্ষে আর মটকা মেরে পড়ে থাকা সম্ভব হল না। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানার ওপর। তারপর বললেন : না দাদা, ঘুমোইনি। সারা রাত আর ঘুমোবই না। বলুন, কী বলছেন?

ছবিদা সস্নেহে বললেন : না রে না, তুই ঘুমো। আমি একটু তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। পেছনে লাগছিলাম। আর লাগব না। এবারে তুই নিশ্চিন্তে ঘুমো।

গঙ্গাদা বললেন : না দাদা, আজ আর ঘুম আসবে না। ঘুমের প্রথম চটকাটা ভেঙে গেলে আর ঘুম আসে না আমার। তার চেয়ে বরং বাকি রাতটা আপনার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিই।

ছবিদা গঙ্গাদার দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালেন। বললেন : গল্প করতে চাইছিস? তা কর। কোন্ গল্পটা করবি বল দিকি? সেই গল্পটা কর। এক যে ছিল রাজা, তার—

এই পর্যন্ত শোনার পর আমি ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙল চা-গরম ডাক শুনে। ট্রেনটা বোধহয় কোন স্টেশনে থেমেছিল। হাতের ঘড়িতে দেখলাম পাঁচটা বাজে। ওপরের বার্থের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ছবিদাও ঘুমোচ্ছেন, গঙ্গাদাও ঘুমোচ্ছেন।

আস্তে আস্তে কুপে থেকে বেরিয়ে গেলাম। প্যাসেজের একটা জানলার শাটার তুলে এক কাপ চা খেলাম। খবর নিয়ে জানলাম ট্রেন ঠিক সময়েই রান করছে। ছ'টার মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

যাত্রাশেষে প্ল্যাটফর্মে নামার পর দেখলাম, গঙ্গাদার সারা মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ, চোখ দুটো টকটকে লাল। একটু আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম : ছবিদার ওপরে খুব রাগ হচ্ছে, না গঙ্গাদা?

গঙ্গাদা এক গাল হেসে বললেন : পাগল হয়েছো। ছবিদার ওপরে কখনও রাগ করা যায়! কত বড় মাপের অভিনেতা ছবিদা! তাছাড়া ছবিদার এই রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নিমতিতায় 'জলসাঘর' ছবির আউটডোরে ওঁর সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছে তো। তা একজন দুর্দান্ত প্রতিভার কিছু ভাইসেস্ তো থাকবেই।

আমি বললাম : কিন্তু আপনারা যে ধরনের অ্যাকটিং-এ বিশ্বাস করেন, ছবিদার স্কুলিং তো তা থেকে অন্যরকম। তবু ছবিদাকে আপনার গ্রেট অ্যাক্টর বলে মনে হয় কেন?

গঙ্গাদা বললেন : আরে সেটা তো স্টেজ অ্যাকটিং-এর ক্ষেত্রে। স্টেজ-অ্যাকটর ছবিদা সম্পর্কে আমার রিজার্ভেশান আছে। কিন্তু ফিল্ম অ্যাকটিং-এ? সেখানে ছবিদা অসাধারণ। 'জলসাঘর'-এ কাজ করবার সময় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। একটা পারফেক্ট এক্সপ্রেশান দিতে যেখানে আমাকে দারুণ মেহনত করতে হচ্ছে, ছবিদা সেখানে অনায়াসে সামান্য একটু ভুরুর ভঙ্গি করে অনেক বড় কিছু তৈরি করে ফেললেন। বাপরে বাপ! কী টেরিফিক অ্যাক্টর। হি ইজ রিয়েলি এ গ্রেট অ্যাক্টর অফ আওয়ার টাইম।

এই হলেন গঙ্গাদা। মনে যা বিশ্বাস করেন মুখে তা স্বীকার করতে কোন সঙ্কোচ নেই। কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। অনেক ফুকো ইন্টেলেকচুয়ালের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে, ঢোক গিলে মত প্রকাশ করেন না। অথচ গঙ্গাদা নিজে একজন সত্যিকারের ইন্টেলেকচুয়াল। কী অসাধারণ তাঁর ট্যালেন্ট। একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ, বড় মাপের সাংবাদিক, নাট্যকার, নাট্য-আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ, এবং দুর্দান্ত অভিনেতা। এতগুলি গুণের সমাহার আমি আমার জীবনে আর কারও মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আমি তো এমন বহু মানুষকে দেখেছি যাঁদের গঙ্গাদার যা ট্যালেন্ট তার সিকির সিকি না থাকা সত্ত্বেও দম্ভে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু গঙ্গাদা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সদালাপী, মিষ্টভাষী, চলায় ফেরায় সাধারণ, কী পণ্ডিত আর কী মূর্খ সকলের সঙ্গে তাঁর সমান ব্যবহার।

এই নিবন্ধের শুরুতে গঙ্গাদাকে 'মাটির মানুষ' বলে উল্লেখ করেছি। সেটা সর্ব অর্থেই। কেবল ভালো

মানুষ বলেই নয়, মাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগও ছিল। শ্রমিক, কৃষক আর সাধারণ মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে তিনি কাজ করেছেন আদর্শবাদের তাগিদে। তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাদার যোগাযোগ কত নিবিড় ছিল তা সেই চল্লিশের দশকে 'জবানবন্দী' কিংবা 'নবান্ন' নাটকে তাঁর অভিনয়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গঙ্গাদার জীবনের সে এক বর্ণময় অধ্যায়। সে কথায় পরে আসছি।

গঙ্গাপদ বসু যে যশোর জেলার মানুষ, এটা আমি জানতে পারি অনেক পরে। আমার ধারণা ছিল তিনি বীরভূম অথবা বাঁকুড়া অঞ্চলের লোক। এ ধারণাটা হয়েছিল দেবকী বসু পরিচালিত 'পথিক' ছবিতে ওঁকে নির্ভুল বাঁকুড়ার ডায়লেক্‌টে কথা বলতে দেখে। বস্তুত যে কোনও আঞ্চলিক ভাষাকেই গঙ্গাদা অনায়াসে নিজের মাতৃভাষা করে নিতে পারতেন। সে দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল।

১৯১০ সালে যশোরের খাসিয়াল গ্রামে গঙ্গাদার জন্ম। বাবার নাম নকুলচন্দ্র বসু। যশোরে বেশ বর্ধিষ্ণু পরিবার ওঁদের। গঙ্গাদার প্রাথমিক পড়াশোনা স্বগ্রামে। মাধ্যমিক পড়াশোনা নড়াইলে। এর সবই এখন বাংলাদেশ। ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতায় এসে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। ওখান থেকে বি. এ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংলিশ লিটারেচারে এম. এ পাস করেন ১৯৩৪ সালে। সেই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন পড়ার কাজও চলতে থাকে।

গঙ্গাদার সারা জীবনটাই রীতিমতো বর্ণাঢ্য। স্কুলের ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তখনকার বিপ্লবী দলের সদস্যরা পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ছাত্রদের দলে টানতেন। তাদের হাত দিয়ে গোপনে চিঠি পাচার করতেন। গঙ্গাদাও সেই কাজে যুক্ত ছিলেন। শুধু চিঠি নয়, কখনও কখনও ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্রও পৌঁছে দিতে হয়েছে তাঁকে। গঙ্গাদার মতো একজন মেরিটোরিয়াস এবং ভদ্র ছাত্র যে এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত, পুলিশের লোকেরা তা কল্পনাই করতে পারত না।

সেইসব রোমাঞ্চক ঘটনার কথা গঙ্গাদার মুখ থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম। এমনিতে তো কিছু বলতে চাইতেন না, পীড়াপীড়ি করলে বলতেন। কেমন করে সারা রাত পায়ে হেঁটে দূরের এক গ্রামে বিপ্লবী দাদার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে সুশীল সুবোধ বালকের মতো পড়াশোনায় মন দিয়েছেন। সেই সব গল্প।

এইসব ঘটনা বলবার সময় গঙ্গাদার মুখচোখের চেহারা কেমন যেন পাল্টে যেত। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

তিরিশের দশকের গোড়াতেই গঙ্গাদা সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গান্ধীজির আহ্বানে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। নারকেল পাতা জ্বেলে নুন তৈরি করা থেকে চরকায় সুতো কাটা পর্যন্ত সবকিছুই করেছেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। স্কুল-কলেজ-আদালতে পিকেটিং করেছেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে একবারের জন্যেও ধরতে পারেনি।

যশোরে যেবার জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হল, সেই সময়ে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে আসেন। সুভাষচন্দ্র তখনও নেতাজি হননি, তখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। সেই সময়ে তিনটি রাত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকোয় কাটিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়েছিল গঙ্গাদার ওপর।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলেও গঙ্গাদা কখনও লেখাপড়ার ব্যাপারে অমনযোগী হননি। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষাতেই ভালোভাবে পাস করেছেন তিনি।

চল্লিশের দশকের গোড়াতে গঙ্গাদা আর এক ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়ে বাংলাদেশে বিরাট মন্বন্তর হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়। সেই সময়ে গঙ্গাদা বামপন্থী মতবাদসম্পন্ন ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের সংস্পর্শে আসেন। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে এক নতুন ধরনের নাটক। সেখান থেকেই বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের শুরু। গঙ্গাদা তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই আন্দোলনের শরিক ছিলেন। বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

গঙ্গাদা কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসেবে। প্রথমে কর্মক্ষেত্র 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায়। তারপর আসেন 'আনন্দবাজারে'। সেখান থেকে 'কৃষক', তারপর 'স্বরাজ', এবং সর্বশেষে 'সত্যযুগ'

পত্রিকায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সত্যযুগ পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল, গঙ্গাদার সত্যযুগ কিন্তু সেই সত্যযুগ নয়। বম্বের টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া পত্রিকাগোষ্ঠী কলকাতা থেকে 'সত্যযুগ' নামে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এন্টালির সি আই টি রোডে ছিল ওই পত্রিকার অফিস। গঙ্গাদা ওই পত্রিকার নিউজ এডিটার ছিলেন। কিছুদিন চলার পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় পঞ্চাশের দশকে।

গঙ্গাদা মাঝে মাঝেই আমাদের কাছে তাঁর নবনাট্য আন্দোলনের জীবনপর্যায়ের স্মৃতিচারণ করতেন। কিন্তু তা খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে। পরবর্তীকালে তিনি লিখিত ভাবে সেইসব স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁর সেই রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করতে চাইছি। বর্তমান প্রজন্মের পাঠকের, বিশেষ করে যাঁরা নাট্যরসিক এবং সমাজ-সচেতন, তাঁদের কাছে গঙ্গাদার এই স্মৃতিচারণের বিশেষ মূল্য আছে। সেই কাল, সেই সময়, সেই মুহূর্তটিকে জেনে রাখা আজ বড়ই দরকার। গঙ্গাদা 'নবান্নের স্মৃতি' নামে যে রচনাটি লিখেছিলেন, তা থেকেই কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

গঙ্গাদা লিখছেন : 'পেছনে তাকালে ছবিগুলো আজ অস্পষ্ট দেখায়। কিছুটা এলোমেলো। পরিপ্রেক্ষিতটা বোঝাবার জন্যে দেশের ১৯৪২-৪৩ সালের অবস্থাটা স্মরণ করি। রেঙ্গুনে বোমা পড়লো : কলকাতা প্রায় খালি। জাপানিদের বোমারু বিমানের পাল্লার মধ্যে এসে গেছে কলকাতা। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে শহরের লোক পালাচ্ছে। কিন্তু বোমা পড়লো না। রেডিও ধরে লোকেরা নেতাজির কণ্ঠ শুনলো : 'চলো দিল্লি।' লোকে ভরসা পেল। তাহলে বোধহয় কলকাতার কিছু হবে না। ফিরলো কিছু লোক। কিন্তু একদিন বোমা পড়লো কলকাতায়। ঝাঁকে ঝাঁকে জাপানি বোমারু বিমান এসে দিনে রাতে বোমো ফেললো এখানে। আবার কলকাতা খালি হলো।

সুরাবর্দী-ইস্পাহানির দল তখন বাংলার গদীতে। তারা দেশে ধান চালের একটা ভয়াবহ অভাব সৃষ্টি করল। তাদের ইঙ্গিতে মুনাফাখোর মজুতদারেরা মারণযজ্ঞে মেতে উঠল। হাহাকার উঠল সারা বাংলায়। ধান নেই, চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই, তেল নেই, কাপড় নেই। মানুষের সৃষ্ট এক মহামন্বন্তরে সারা বাংলা ডুকরে কেঁদে উঠল। জোয়ান চাষীর কঙ্কালসার কাঠামোটা হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল কলকাতার ফুটপাথে। পথে পথে মৃতদেহের স্তূপ, দোরে দোরে 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' চিৎকার।

দেশের গভর্নমেন্ট নীরব। সংবাদপত্রে এক লাইন খবর বেরোলো না এই মহামন্বন্তরের। যুদ্ধ চলছে, খবর মিলিটারিরা সেন্সর করে। কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে বস্তিতে বোমা পড়ে জনা দশবারো মানুষ ও কয়েকটা গরু গেল। আহতদের টেনে বার করলাম, স্টিরাপ পাম্প চালিয়ে আগুন নেবালাম, কিন্তু নিজে যে সংবাদপত্রে কাজ করি সেখানে এক লাইনও লিখতে পারলাম না। পরদিন দিল্লি থেকে 'পাস' করা খবর এলো : 'ক্যালকাটা এরিয়া ওয়াজ বম্বড্ লাস্ট নাইট। নো ক্যাজুয়ালটি।' তাই ছাপালাম কাগজে। কিন্তু যারা সেই রাত্রে মৃতদেহগুলো ভ্যানে ভর্তি করে অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে চালান দিলো তারা তো পরদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল যে যার গাঁয়ের দিকে। গাড়ি নেই—পায়ে হেঁটেই যাবে। যারা দেখল সেই দৃশ্য তারাও কলকাতা ছাড়ল। এদের মুখে কলকাতার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত খবর ছড়াতে লাগল। খবরের কাগজের খবর লোকে পড়তো, বিশ্বাস করত না।

বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের খবরটা চেপে রেখে কাগজওয়ালারা মারাত্মক ভুল করল। যেখানে রাস্তায় একটা গাড়ি চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে তার ছবি ছাপা হয়, সেখানে এত মানুষ খেতে না পেয়ে মরছে অথচ কাগজে কোনও খবর নেই, একটা ছবি নেই। এ যেন কোন এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বলে লোকের মনে হতে লাগল। সাহস দেখালো 'স্টেটসম্যান'। একদিন সকালে উঠে লোকে দেখলো : 'বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা' এই শিরোনামায় স্টেটসম্যানের পিছনের পাতা ভর্তি কলকাতার রাজপথে মৃতদেহের ছবি। কী ভয়ঙ্কর! সারা দুনিয়া সচকিত হলো। পরদিন থেকে বাঙালিপাড়ার কাগজগুলোও নির্ভয়ে ছবি ছাপল, খবর ছাপল। সাহেবদের কাগজ ছেপেছে যখন তখন আইন তো ওরাই আগে ভেঙেছে। সুতরাং আর ভয় কি?

দেশে এক কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য সব দল তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে জনমত গঠনের জন্যে কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও লেখকদের নিয়ে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হয়েছে। কিন্তু রিলিফ অর্গানাইজ করার টাকা নেই। জনমত সংগঠনের জন্যে এবং প্রচারের জন্যেও

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী ফ্রন্ট দরকার। রাজনীতির ক্ষেত্রে আগস্ট আন্দোলনের পরেকার বিপর্যয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে থিয়েটারপ্রেমী মানুষের প্রচলিত পেশাদারী নাট্যের প্রতি একটা প্রচণ্ড অনীহা দেখা দিয়েছিল। এই নাট্যের নাট্যাচার্য তখন প্রায় বিগতপ্রভ। কয়েকটি থিয়েটার টিম টিম করে বাতি জ্বালিয়ে লোক আকর্ষণের চেষ্টা করে হালকা নাচগান রসিকতা আর বীরদর্পের এক্সট্রোভার্ট অভিনয় দিয়ে। কিন্তু লোকে আর প্রতারিত হতে যায় না। এতদিন দেশের আন্দোলন দেখে সেই মতো নাটক লিখিয়ে সস্তা দেশপ্রেমের একটা বাহাদুরী নেবার চেষ্টা ওখানে হয়েছে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতাবর্জন বা হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ পর্যন্ত দেশের কোনও আন্দোলনের সুযোগ নিতেই এঁরা ছাড়েননি।

কিন্তু ইতিহাস একটা ভয়ঙ্কর মোড় নেবার জন্যে থিতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মানুষ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ নাট্যের মঞ্চে নতুন সমাজের প্রতিফলন দেখবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা মনে করলেন নাট্য হচ্ছে সেই সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার যা দেশকে তার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বদলাতে সাহায্য করবে। এই পটভূমিকায় কিছু কম্যুনিস্ট পার্টি কর্মী এবং কিছু দরদী বন্ধুরা মিলে গড়ে তুললেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নামে একটি দল।

এইবার আবার গোড়ার কথায় ফিরে যাই। একেবারে ব্যক্তিগত কথা হলেও এর সঙ্গে সারা দেশব্যাপী আন্দোলনের একটা যোগসূত্র রয়েছে। কবিবন্ধু অরুণ মিত্র, অভিনেতা ও নাট্যকার বন্ধু বিজন ভট্টাচার্য এবং আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে কলম পিষি, অর্থাৎ গুরুগম্ভীর ভাষায় যাকে বলে সাংবাদিকতা, তাই করি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতি ও দেশের দুর্দশায় আমাদের অসহায় অকর্মণ্যতার কথাও আলোচনা করি। কিছু একটা করা দরকার, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত হয় না। কিন্তু কী,—কী করা হবে? কিছু টাকা তুলে পিপল্‌স্‌ রিলিফ কমিটিতে দিতে পারলেও একটা কাজ হয়। কিন্তু কেমন করে টাকা তোলা হবে?

মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘে যাই। নানারকমের আলোচনা শুনি। কিছু নতুন ধরনের নাটক নাকি পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে হচ্ছে, শুনতে পাই। ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। তা তো আর সম্ভব হয় না। কাজেই কিছু নাটক বা নাটক সম্বন্ধে লেখাপত্তর পেলে গোগ্রাসে গিলি। এই সময় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ থেকে একটা অনুষ্ঠান হল। কিছু নাচগান, দুটি একাংকিকা। আমি কিছু করিনি, শুধু দর্শক হয়ে বসে দেখলাম, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নতুন ধরনের নাচগান ও অভিনয় করল।

এরপর বিজন লিখল 'জবানবন্দী' নামে একখানা নাটিকা, যাতে পরাণ মণ্ডল নামে এক বৃদ্ধ চাষীর ভূমিকায় আমি অভিনয় করলাম। বলা যায়, প্রধান ভূমিকা। বোম্বাইয়ে কিছু পূর্বে জন্মলাভ করবার পর বলা যায় এই নাটিকা থেকেই বাংলা দেশে গণনাট্য সংঘ সৃষ্টি হল। এই নাটকটিকে 'নবান্ন'-র পূর্বসূরী বলতে হয় প্রায় সবদিক থেকেই। এখানেই বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষীরা প্রথম মঞ্চে স্থান পেল। 'নবান্ন'-ও তাদের নিয়েই লেখা। মনে পড়ে, মিনার্ভায়, ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটে, শ্রীরঙ্গমে এবং অন্য বহু জায়গায় 'জবানবন্দী'-র অভিনয়ে দর্শকরা কিরকম যেন হয়ে যেত। বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী-শিল্পী ও রাজনীতিক নেতা মঞ্চে এসে যখন আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরতেন তখন শরীর রোমাঞ্চিত হতো।

এরপর লেখা হল 'নবান্ন'। তখনও বিজন আর আমি পাশাপাশি বসে কাজ করি। কাজ করি আর নাটক নিয়েই আলোচনা করি। কাজেই নাটকটির লেখা থেকেই আমি এর সঙ্গে যুক্ত। মনে আছে, দেশে গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্যে। ফিরে এলে বিজন জিজ্ঞাসা করল : 'চাষীদের অবস্থা কি দেখে এলি, বল।'

আমি বললাম : 'ধান হয়েছে প্রচুর। পেকেছেও। কিন্তু কাটবার, কেটে ঘরে তোলবার ক্ষমতা নেই চাষীদের। সবাই রোগা ভোগা অনশনক্লিষ্ট। তবে ওরা একটা ভালো পন্থা বার করেছে।'

'কি বল দিকি—?' বিজনের সাগ্রহ প্রশ্ন।

'সবাই মিলে এক একদিন জোট বেঁধে এক একজনের জমির ধান কেটে ঘরে তুলে দেবে।—এই পুরনো গাতায়-খাটা ব্যবস্থাটা ওরা আবার চালু করেছে। এই নিয়ে উৎসবের আয়োজনও হচ্ছে।'

ব্যস। বিজন পেয়ে গেল বোধহয় নাটকের শেষটার হদিস। লেখা হল 'নবান্ন' নাটকের বিখ্যাত গাতায় খাটার মিটিং-এর দৃশ্য এবং তার পরেই শেষ দৃশ্য নবান্ন উৎসবের।

নাটক রিহার্সালে পড়ল। প্রধান ভূমিকাটি বুড়ো মোড়ল চাষী প্রধান সমাদ্দারের। 'জবানবন্দী'-তে বুড়ো চাষীর পার্ট ভালো করেছিলাম বলে ও ভূমিকাটির জন্যে প্রথমে হয়তো আমার নামই যেত। কিন্তু একটি কুচক্রী লোক ছিল নাটকে, বলা যায় নাটকের খল নায়ক, নাম হারু দত্ত। গোল বাধলো সেটা নিয়ে। কে করবে সেটা? অনেককে দিয়ে চেষ্টা হলো। তার মধ্যে একজন হলেন রবীন্দ্রসংগীতের বিখ্যাত গায়ক জর্জ অর্থাৎ দেবব্রত বিশ্বাস। রোলটায় তাঁকে হয়তো মানাতো ঠিক। কিন্তু দু-একদিন রিহার্সাল দিয়ে তিনি নিজেই বললেন : 'ধুর, অ্যাকটিং ম্যাকটিং আমার দ্বারা হইব না।' শম্ভু মিত্র করতে চাইছিলেন না, ভাষা বলতে তাঁর প্রথম দিকে একটু অসুবিধেই হচ্ছিল। নিজে নিলেন এক সিনের এক টাউটের পার্ট। হারু দত্ত কি তাহলে বিজন নিজেই করবে? কিন্তু এই ধরনের পার্টে দরদী দর্শকরা তাকে নেবে না, এই ধরনের একটা কথা কানে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পার্টটিও আমার কাঁধে চাপলো। বিজন করল বুড়ো মোড়ল প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকা।

কাস্টিং ফাইনাল। পুরোদমে চলল রিহার্সাল। যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেকটি পার্টের প্রত্যেকটি বাক্যের শব্দ, মায় গাঁইয়া উচ্চারণ সমেত রপ্ত হয়েছিল, ততদিন আমরা স্টেজ রিহার্সালের কথাও ভাবিনি। বলতে কি, গোটা নাটকটাই আমাদের সকলের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই একদিন কালিকা থিয়েটারে শো আরম্ভ হবার মিনিট পনেরো আগে যখন খবর এল বিজনের বাবা মরণাপন্ন অসুস্থ, তাকে বাড়ি যেতে হবে, তখন অতি সহজেই আমি বিনা নোটিশে, বিনা প্রস্তুতিতে বিজনের অতবড় পার্টটা অনায়াসে করে দিতে পেরেছিলাম, বা শম্ভু মিত্র তাঁর দুটো পার্ট করেও আমার পার্টটা করে দিতে পেরেছিলেন। পরে অবশ্য এরকম অদলবদল আমরা ইচ্ছে করেও করেছি।

যাই হোক, প্রস্তুতিপর্বে শম্ভু মিত্র ভাবছিলেন, কিভাবে নাটকটা মঞ্চস্থ করা যায়, আর বিজনের ওপর নাট্য গঠনের ভারটা ছিল। মহর্ষি (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) ছিলেন সবার ওপরে—মন্ত্রদাতা গুরু। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও রাজনীতিক নেতারা রিহার্সাল দেখতে উপস্থিত থাকতেন। চটের আইডিয়াটা মহর্ষিই একদিন কথায় কথায় দিলেন। সেইটেই গৃহীত হল। মঞ্চটাকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন পিস্ বড় চটের পর্দায় পশ্চাদ্‌পট তৈরি হলো। দৃশ্য হিসেবে তাতে কিছু জিনিসপত্র থাকতো। প্রথম দৃশ্যে উঁচু প্ল্যাটফর্ম এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত মশাল ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা, আগুন লেগে গোটা দিগন্ত লাল হয়ে ওঠা, এবং গুলি খেয়ে লোক মরছে, লোকেরাই তাকে কাঁধে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে আরম্ভতে যে পরিপ্রেক্ষিত বোঝানোর চমক, এর জনক শম্ভু মিত্র। এই নাটকে পরিচালক বা নির্দেশক হিসেবে কারও নাম থাকত না। কেউ জানতও না কে কতটুকু করছে, কী করছে! অভিনয় শেখানো? হ্যাঁ, তা হতো। বেশির ভাগ বিজনই ওটা দেখাত। কেউ এসে হয়তো শম্ভু মিত্রকে জিজ্ঞাসা করত, এ জায়গাটা কীরকম করে বলব বলুন তো মেজদা? কেউ বা আমাকে বলতে বলত কোনও বিশেষ লাইন,—শুনে শিখবে। এমনি করেই হতো। কোন মান-অভিমান বা মনে করা-করির ব্যাপার ছিল না। যার যেটা মনে হতো সে সেটা খোলাখুলি বলে দিত। কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা যেন এক বিরাট 'নবান্ন পরিবারের' ছেলেমেয়ে হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গমে (অধুনা বিশ্বরূপা) হবে বলে স্থির হল। মঞ্চমহলার দিন অনেকেই দেখতে এলেন। দলের নেতারাও কেউ কেউ এলেন। পর পর সাত দিন অভিনয় হবে—প্রত্যেক দিন সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু মঞ্চ-মহলা দেখে কারো মুখ দিয়ে বিশেষ কোন প্রশংসাবাক্য বেরোলো না। সকলেই আশঙ্কা করলেন, নাটক লোকের ভালো লাগবে না। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই একটু ভয় পেয়ে গেল প্রতিক্রিয়া দেখে। আমরা কয়েকজন শুধু বলাবলি করলাম, এই জন্যেই মঞ্চ-মহলা নাট্যদলের বাইরের লোকদের দেখাতে নেই।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—'পেছনের প্ল্যাটফর্মটা কেন?' বলা বাহুল্য আমাদের উত্তর তাঁর মনঃপুত হল না। তারপর বললেন : 'এসব নাটক তোমরা দু-একদিন করলে, লোকে দেখলো—কিন্তু আমরা করলে লোক আসবে

না। বলবে, ওটা ভিখিরিদের থিয়েটার। স্টেট ব্যাকিং না থাকলে এসব—' বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন। অবশ্য 'ভিখিরিদের থিয়েটার' তিনি পরে করেছেন (যদিও নিজে নামেননি) 'দুঃখীর ইমান'।

যাই হোক, মঞ্চ-মহলার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কিন্তু প্রথম রাত্রির অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ার কোনও মিল ঘটেনি। প্রথম অভিনয়-রাত্রি থেকেই লোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলো। অভিনয় চলাকালেই ভেতরে লোক এসে বলে যেতে লাগলো, ভীষণ ভাল হচ্ছে। প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে বেরোলো 'নবান্ন'-প্রশস্তি। যাঁরা এই দলটিকে আদৌ পছন্দ করতেন না, তাঁরাও মন খুলে প্রশংসা করলেন। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদককে লোকে চোখ মুছতে মুছতে হল থেকে বেরোতে দেখেছে। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, একমাত্র এই পত্রিকাই এক লাইনে 'নবান্ন'-র সমালোচনা শেষ করেছিলেন—'নবান্ন'-তে পুরাতন অন্নই পরিবেশিত হইয়াছে।' আর সকলে পঞ্চমুখে প্রশস্তি গেয়েছেন। সাতদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের পর লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো নামটা—'নবান্ন' অসাধারণ, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নাট্য প্রযোজনা! কিন্তু মুশকিল হলো, কেউ আর হল্ ভাড়া দিতে চায় না আমাদের। পেশাদারী থিয়েটার হলের মালিকরা একজোট হলেন—এ নাটক করতে দেওয়া মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা।

দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো, গ্রামে গঞ্জে জেলা শহরে। সর্বত্র বিপুল সংবর্ধনা পেল নাটক এবং দল। অনেক পরে কালিকায় এবং শ্রী সিনেমা হলে একটু জায়গা পাওয়া গেল কয়েক দিনের জন্যে। কলকাতার লোক যেন ভেঙে পড়তে লাগলো। বলা বাহুল্য যথেষ্ট অর্থ পিপ্‌লস রিলিফ কমিটিতে তুলে দেওয়া সম্ভব হলো।...'

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে গঙ্গাদাদের ওই 'নবান্ন' নাটক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার তখন মাত্র সতেরো বছর বয়েস। হাতিবাগানের থিয়েটারপাড়ার নাটকগুলি তখন আমার কাছে স্বপ্নের পৃথিবী। অনেক কষ্ট করে পয়সা যোগাড় করে সেইসব নাটক দেখে অপার তৃপ্তি পাই। এমন সময় ওই পাড়ায় 'নবান্ন' নাটকের বিজ্ঞাপন আমার কাছে একটু বেমানান মনে হয়েছিল। এরা সব কারা? যাই হোক একটা টিকিট যোগাড় করে একদিন ঢুকে পড়লাম নাটক দেখতে।

নাটকে একজনও চেনামুখ নেই। আর তাঁদের মধ্যে থিয়েটারপাড়ার কোন চাকচিক্যও নেই। চাষিদের জীবন এবং সমস্যা নিয়ে নাটক ঠিক কথা, তা বলে এরকম সব চাষি-চাষি মেক-আপ হবে? এর আগেও থিয়েটারে চাষি-জমিদার সব দেখেছি, কিন্তু সেখানকার চাষিগুলিও কেমন ভদ্রলোকের মতো। মনে মনে ভাবলাম অত কষ্টের একটা টাকা জলে গেল।

কিন্তু যখন নাটক দেখে শ্রীরঙ্গম থেকে বেরোলাম তখন অন্য অনুভূতি। আমি মহকুমা-শহরের ছেলে। কৃষকরা আমার অচেনা নয়। কিন্তু তাদের কোন সমস্যা নিয়ে তো কোনওদিন মাথা ঘামাইনি। তাদের জন্যে এমন করে তো চোখে জল আসেনি!

পরে পঞ্চাশের দশকে গঙ্গাদার সঙ্গে আলাপ হবার পর গঙ্গাদাকে আমার সেই অনুভূতির কথা বলেছিলাম। শুনে গঙ্গাদা বলে উঠেছিলেন : ঠিক ওইটিই তো আমরা চেয়েছিলাম ভাই। আর্থিক লাভের আশায় নয়, মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্যেই আমরা নাটক করতে এগিয়ে এসেছিলাম। এরকম একটা আদর্শ আমাদের নাটক করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রিলিফ কমিটিতে টাকা তোলার ব্যাপারটা গৌণ ছিল। সেরকম হলে তো দেশের দুর্ভিক্ষ মিটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নাটক করা ছেড়ে দিতাম। তা তো হয়নি। বরং ওই 'নবান্ন'র পর নাটকটাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরলাম।

গঙ্গাদার কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আজ যে গ্রুপ থিয়েটারগুলির এত রমরমা, সে সবের প্রেরণা ওই 'নবান্ন' থেকেই। 'নবান্ন' ওইভাবে সাড়া ফেলেছিল বলেই পরবর্তীকালে বহুরূপী, লিটল্ থিয়েটার অথবা নান্দীকারের মতো গ্রুপ তৈরি হতে পেরেছিল এবং শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী ইত্যাদি গর্ব করার মতো শিল্পী আমরা পেয়েছিলাম। বিজনদা কিংবা গঙ্গাদা ছাড়াও ওই 'নবান্ন' নাটকের সঙ্গে যুক্ত সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সজল রায়চৌধুরী প্রমুখ শক্তিমান শিল্পীদের আমরা মঞ্চে অথবা ছায়াছবিতে দেখতে পেয়েছি পরবর্তীকালে। অন্যে পরে কা কথা, ঋত্বিক ঘটকের মতো একটি প্রতিভার আবির্ভাব ওই 'নবান্ন' নাটকেরই পরোক্ষ অবদান।

ও সব তত্ত্বকথা এখন থাক। আবার গঙ্গাদার কথায় ফিরে আসি।

'সত্যযুগ' পত্রিকা উঠে যাবার পর গঙ্গাদা আর কোন খবরের কাগজে চাকরির চেষ্টা করেননি। অভিনয়টাকেই পেশা করে নিলেন। কারণ ততদিনে তাঁর কাছে সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ এসে গেছে। এবং সেই সঙ্গে এসে গেল আর এক ট্রাজেডি। যেহেতু গঙ্গাদা 'নবান্ন' নাটকে হারু দত্তের খল চরিত্রে অভিনয় করে দারুণ সুনাম পেয়েছিলাম, সেই হেতু তাঁর কাছে যে সব কাজের অফার আসতে লাগল তার অধিকাংশই ভিলেন জাতীয় চরিত্রের। প্রায় সারাটা জীবন তাঁকে ওই 'খল চরিত্র' নামক শবটিকে কাঁধে বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

গঙ্গাদা একদিন ঠাট্টা করে বলছিলেন : ভাই, বদমাইসি করলে দুর্নাম হয় জানি, কিন্তু বদমাইসিতে আমার এত সুনাম হয়ে গেছে যে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। লোকে কোথায় রাগ করবে, ঘেন্নায় গায়ে থুতু দেবে, তা না করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে আসে হে!

বলতে বলতে প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন গঙ্গাদা।

গঙ্গাদার সেই হাসির মানেটা আমি আজও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। উনি কি হাসির মধ্যে দিয়ে কাঁদছিলেন অথবা আমাদের চলচ্চিত্রের প্রযোজক এবং পরিচালকদের ব্যঙ্গ করছিলেন, সেটা বোধগম্য হয়নি।

এই ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করার ব্যাপারটা নিয়ে একটা ভারি ইন্টারেস্টিং ঘটনা শুনেছিলাম গঙ্গাদার মুখ থেকে।

নাট্য বিষয়ে তো বটেই, আরও নানাবিধ বিষয়ে গঙ্গাপদ বসুর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব বিষয়েই গঙ্গাদান জ্ঞান ছিল প্রচুর। এতগুলি গুণ ছিল বলেই তিনি তাঁর সময়ে সাংবাদিক হিসেবে এত নাম করতে পেরেছিলেন। এইসব জ্ঞান না থাকলে তো একটি বিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকার নিউজ এডিটার হওয়া যায় না। আর কে না জানে, নিউজ এডিটারই হলেন সংবাদপত্রের মূল স্তম্ভ।

১৯৫১ সালে তাই সত্যযুগ পত্রিকার অফিসে যেদিন গঙ্গাদার মুখোমুখি হলাম সেদিন রীতিমতো নার্ভাস বোধ করেছিলাম। আমি তখন সুধাংশু বক্‌সি সম্পাদিত রূপাঞ্জলি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করি। তার কিছুদিন পরেই আমাদের বাৎসরিক উৎসব। সেই উৎসবের যাতে একটা ভালো কভারেজ হয় সেই অনুরোধ সহ আমন্ত্রণপত্র নিয়ে গঙ্গাদার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

ততদিনে গঙ্গাদার আরও কিছু নাটক আমার দেখা হয়ে গেছে। উনি তখন 'বহুরূপী' গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয়দের একজন। বহুরূপীর 'রক্তকরবী' দেখেছিলাম নিউ এম্পায়ারে। সে নাটক দেখে পুলকে পাগল হবার যোগাড়।

গঙ্গাদার মতো বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তাই পা দুটো কাঁপছিল। একে বড় অভিনেতা, তার ওপর নিউজ এডিটার। পা দুটোর আর দোষ কী বলুন।

গঙ্গাদা তখন একটা লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে একতাড়া প্রুফশিটের ওপর কী সব লিখছিলেন। প্রুফশিট বস্তুটি আমার কাছে অচেনা নয়। রূপাঞ্জলি পত্রিকায় আমার মূল কাজই হল প্রুফ কারেকশান করা।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গঙ্গাদা মুল তুলে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন : কী চাই ভাই?

কথাটা শোনামাত্র আমার পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল। যিনি অচেনা ব্যক্তিকে 'ভাই' সম্বোধন করতে পারেন তিনি কখনও দুর্বাসা মুনির মতো রাগি মানুষ হতেই পারেন না। আমি সবিনয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে আমন্ত্রণপত্রটি বাড়িয়ে দিলাম।

গঙ্গাদা হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণপত্রটি নিলেন। ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বললেন। আমি একটু জড়সড় হয়ে তাঁর সামনে রাখা চেয়ারগুলির একটিতে বসলাম।

গঙ্গাদা প্রথমে ছাপানো কার্ডটি পড়লেন। অনুষ্ঠানের তারিখটির নিচে লাল পেন্সিলের দাগ দিলেন। তারপর সুধাংশুবাবু ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে যে পাঁচ-ছ লাইনের একটি চিঠি দিয়েছিলেন, সেটি পড়লেন।

পাঠ সাঙ্গ করে গঙ্গাদা আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন : রূপাঞ্জলি পত্রিকায় তুমি কী কর?

আমি বললাম : প্রুফ দেখি।

গঙ্গাদা বললেন : ও, তাহলে তো তুমি সাংবাদিক হে!

প্রুফরিডার যে সাংবাদিক হয় সেটা সেই প্রথম শুনলাম। শুনে মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে গেল। আমাদের পত্রিকায় যে সব সাংবাদিকরা কাজ করতেন তাঁরা আমাদের মতো প্রুফরিডারদের করুণার চোখে দেখতেন। কথায় কথায় হতচ্ছেদ্দা করতেন।

গঙ্গাদা জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কিছু লেখো-টেখো নাকি পত্রিকায়?

আমি করুণ মুখে জবাব দিলাম : আজ্ঞে না।

গঙ্গাদা বললেন : দেখো ভাই, আমার হাতে এখন লোক শর্ট। তোমাদের অনুষ্ঠানে রিপোর্টার পাঠাতে পারব না। তুমি একটা রিপোর্ট লিখে আমার কাছে দিয়ে যেও। ছেপে দেব।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার লেখা রিপোর্ট আপনি ছাপবেন? আমি তো এর আগে কখনও রিপোর্টিং করিনি। আমি তো প্রুফ দেখি।

গঙ্গাদা বললেন : তাতে কী হয়েছে। আমিও সাংবাদিকতা শুরু করেছিলাম প্রুফ রিডিং দিয়ে। ও কাজটাকে ছোট মনে করছ কেন?

আমি বললাম : না, ছোট মনে করছি না। কিন্তু আমি কি পারব?

গঙ্গাদা বললেন : খুব পারবে। লিখে তো নিয়ে এসো। তারপর দরকার পড়লে আমি কারেক্‌শান করে দেব।

আমি বললাম : লেখাটা কখন চাই আপনার?

গঙ্গাদা বললেন : তোমাদের অনুষ্ঠান তো সকালবেলায়?

আমি বললাম : আজ্ঞে হ্যাঁ। সকাল ন'টায় শুরু। শেষ হতে হতে বেলা একটা-দেড়টা হবে।

গঙ্গাদা বললেন : তুমি সন্ধের আগে লেখাটা দিয়ে যেও। তাহলে পরের দিন বেরিয়ে যাবে। লেখাটা বেশি বড় কোরো না কিন্তু।

অফিসে ফিরে এসে আমার দৌত্যের কথা সম্পাদক মশাইকে জানালাম। সব শুনে তিনি মৃদু হেসে বললেন : বেশ তো, তুমি এতদিন আক্ষেপ করতে রিপোর্টিং-এর চান্স পাচ্ছ না বলে, এই তো পেয়ে গেলে! দেখি তোমার রিপোর্টিং-এর দৌড়। ক'লাইন ছাপাতে পার দেখি।

আমি 'সত্যযুগ'-এ রিপোর্ট করব শুনে অন্যান্য রিপোর্টাররা হাসাহাসি শুরু করে দিলেন প্রকাশ্যে। সে সব দেখে আমি আরও নার্ভাস হয়ে গেলাম।

অনুষ্ঠানের দিন তো আমি সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে ছিলাম। কেমন করে রিপোর্ট করতে হয় জানি না তো! ক'দিন ধরে 'সত্যযুগ'-এর স্টাফ রিপোর্টারদের লেখা পড়ে পড়ে দেখছিলাম, কিন্তু তাতে আরও সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। তার ওপর চলছিল আমাদের কাগজের রিপোর্টারদের নানাবিধ ঠাট্টা-টিটকিরি।

অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিলাম। সে কী ভয়ানক অবস্থা। দু লাইন লিখি আর কাটি। শেষ পর্যন্ত ফুলস্কেপ কাগজের দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে একটা লেখা কোনও রকম করে খাড়া করে ফেললাম।

সন্ধেবেলা দুরু দুরু বুকে লেখাটা নিয়ে সত্যযুগ অফিসে গেলাম। গঙ্গাদা তখন ভারি ব্যস্ত। আমাকে দেখে একটু রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : কী চাই?

আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। কোনও রকমে বললাম : আজ্ঞে আপনি বলেছিলেন রূপাঞ্জলির ফাংশনের একটা রিপোর্ট লিখে আনতে।

গঙ্গাদার মনে পড়ে গেল। বললেন : এনেছ লেখাটা?

আমি কাঁপা কাঁপা হাতে লেখাটা এগিয়ে দিলাম গঙ্গাদার দিকে।

গঙ্গাদা লেখাটা হাতে নিয়েই বললেন : এঃ, এত বড় করে ফেলেছ।

তারপর মন দিয়ে লেখাটা পড়ে ফেললেন অত ব্যস্ততার মধ্যেও। তারপর বললেন : বাঃ, বেশ হয়েছে। তবে যে সেদিন বললে তুমি লিখতে পার না। এই তো পেরেছ! চা খাবে?

আমি বললাম : আজ্ঞে না। আপনি ব্যস্ত আছেন, কাজ করুন। লেখাটা কালকে ছাপা হবে তো?

গঙ্গাদা বললেন : খবরের কাগজে কোনও লেখা কবে ছাপা হবে সেটা কেউ আগাম বলতে পারে না। নিউজ এডিটারও না। তোমার লেখাটা যাবে বলে ঠিক করা হল, কিন্তু তার পরই এমন একটা জরুরি সংবাদ এসে পৌঁছল যে তোমার ঘাড়েই কোপটা পড়ল। কাল সকালে কাগজটা দেখে নিও। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে তোমার রিপোর্টটা বেরোবে।

পরের দিন সত্যিই লেখাটা বেরিয়েছিল। হুবহু। গঙ্গাদা একটা লাইনও বাদ দেননি। দু-একটা বানান সংশোধন করে দিয়েছিলেন মাত্র।

পরের দিন আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসা উচিত ছিল গঙ্গাদাকে। কিন্তু সঙ্কোচবশত যেতে পারিনি। পরে গঙ্গাদার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তখন একদিন কথায় কথায় সত্যযুগ-এর ওই ঘটনাটার কথা গঙ্গাদাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলাম : আপনি সেদিন লেখার ব্যাপারে ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন বলেই দু-পয়সা রোজগার করে খাচ্ছি গঙ্গাদা। নইলে সারা জীবন হয়তো প্রুফ দেখেই জীবন কাটাতে হত। এই ব্যাপারে আমি আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে আছি।

গঙ্গাদা একটু হেসে বলেছিলেন : কী জানি ভাই, অতদিনকার কথা তো! আমার কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু তুমি তো নয়, আরও কতজনকে যে লেখার ব্যাপারে ইন্‌স্পায়ার করেছি তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তুমি তো তবু স্বীকার করলে, অনেকেই তো সেটুকুও করে না।

এই হলেন গঙ্গাদা। চিরকাল নেপথ্যে থেকে নিজের করনীয় কাজটুকু করে গেছেন। কোনরকম হাততালির আশা না রেখেই। তিনি যে তাঁর জীবনে কোন বড়সড় রাষ্ট্রীয় সম্মান পাননি, তার জন্যে একদিনের জন্যেও এতটুকু অনুযোগ করতে শুনিনি তাঁকে। একেই বলে সত্যিকারের মানুষ।

গঙ্গাদার অভিনয়ের হাতেখড়ি মাত্র ন' বছর বয়েসে। নিজেদের গ্রামে 'দধীচির তনুত্যাগ' নাটকে তিনি অভিনয় করেন। কিন্তু সেটা নিছকই শখের ব্যাপার। তার ফলে যে অভিনয় সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে কোনও তৃষ্ণা জেগে ওঠা, সে সব কিছু হয়নি তাঁর। শৈশবের ওই অভিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে গঙ্গাদা বলতেন : ওটা ছিল একটা হুজুগের ব্যাপার। নাটক করব, অভিনেতা হব, এ সব লাইনে ভাবিইনি কখনও। ওই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতাই আমার মধ্যে একটা প্রতিবাদের স্পৃহা জাগিয়ে দিলে। সেই প্রতিবাদের তাগিদেই নাটক করতে আসা। এবং তখন থেকেই নাটক আমাকে গ্রাস করে ফেললে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : পেশাদারি নাটকে অভিনয় করার ইচ্ছে হয়নি কখনও? সেখানে তো অনেক টাকা, অনেক গ্ল্যামার?

গঙ্গাদা বলেছিলেন : একদম না। নাটক আমার কাছে একটা পবিত্র ব্যাপার। এটাকে বেচে খাবার ইচ্ছে আমার একদম নেই।

অনেকদিন পরে গঙ্গাদা একবার পেশাদারি নাটক করেছিলেন। বিশ্বরূপা মঞ্চে। বোধহয় 'রাধা' না কোনও একটা নাটকে গঙ্গাদা অভিনয় করেছিলেন। অন্য কোন নাটকও হতে পারে ওটা। এই মুহূর্তে সঠিক নামটা মনে পড়ছে না। অথচ ওই নাটকের স্টেজ রিহার্সালে আমি উপস্থিত ছিলাম। রিহার্সালের পর গঙ্গাদাকে বলেছিলাম : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন তাহলে?

গঙ্গাদা অসহায় ভাবে বললেন : তাই তো হল দেখছি। গ্রুপ থিয়েটারের অনেকেই তো এখন পেশাদার নাটক করছে। তৃপ্তি করছে বিজন করছে। আমিও সেই দলে নাম লিখিয়ে ফেললাম। এখন দেখছি ভুল করেছি। মনের ভেতর কোন উত্তেজনা বোধ করছি না। যে উত্তেজনা বহুরূপীর গ্রুপ নাটক করে পাই তার কিছুই তো এখানে পাচ্ছি না। এই একটা করেই ছেড়ে দেব।

তারপর একটু ম্লান হেসে বললেন : বলছি তো ছেড়ে দেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না। পেশাদার নাটক শুনেছি কোকেনের নেশার মতো। একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে ছাড়া নাকি মুশকিল।

গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করে গঙ্গাদা কখনও পারিশ্রমিক নেন নি। তবে ফিল্মে অভিনয় করে তিনি পারিশ্রমিক নিতেন। বেশ ভালো টাকাই নিতেন।

গঙ্গাদা অবশ্য প্রথমে ছবিতে অভিনয় করতে এসেছিলেন অপেশাদারি মানসিকতা নিয়ে। ১৯৫০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'তথাপি' ছবিতে গঙ্গাদার প্রথম আত্মপ্রকাশ। মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত এই ছবির

নেপথ্যে ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বিমল রায়। বিমল রায় মনেপ্রাণে অত্যন্ত প্রোগ্রেসিভ ছিলেন। বস্তুত 'তথাপি' ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রোগ্রেসিভ ঘরানার। কাহিনীকার স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্য ইত্যাদি সকলেই। ওঁদের সঙ্গে গঙ্গাদা হাত মিলিয়েছিলেন অপেশাদারি মানসিকতা নিয়ে। পরের ছবি নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল' ১৯৫১ সালে। উদ্বাস্তুদের নিয়ে বাংলায় সেই প্রথম চিত্রপ্রয়াস। ছবিটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও লাভ করেছিল।

এর পরে ১৯৫৩ সালে দেবকী বসুর 'পথিক' ছবি থেকে গঙ্গাদা টাকা-পয়সা হাতে নিতে শুরু করলেন। ওঁদের বহুরূপী গোষ্ঠী তুলসী-লাহিড়ী রচিত এই নাটকটি সসম্মানে অভিনয় করতেন। ছবিতেও শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, সবিতাব্রত দত্ত ইত্যাদি বহুরূপীর আরও সব কুশীলবই ছিলেন।

এই ছবিতে অভিনয় করে গঙ্গাদার খুব নামধাম হয়। তারপর তাঁর কাছে প্রচুর ছবিতে অভিনয়ের অফার আসতে থাকে। গঙ্গাদা পুরোপুরি পেশাদার চিত্রাভিনেতা হয়ে যান।

গঙ্গাদার চলচ্চিত্র জীবনের মেয়াদ মাত্র কুড়ি বছর। এই কুড়ি বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় শ'খানেক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এবং ছবিতে তাঁর সুনাম দিনের পর দিন বেড়েই গেছে। গঙ্গাদার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকায় আছে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' এবং 'পরশ পাথর'। এ ছাড়া সত্যেন বসুর 'ভোর হয়ে এল', হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত শ্রীমতী পিকচার্সের 'নববিধান', 'দেবত্র', 'আশা', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত', সুধীর মুখার্জির 'আজ সন্ধ্যায়', 'শশীবাবুর সংসার', 'দাদাঠাকুর', শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের 'একদিন রাত্রে', 'শুভবিবাহ', বিজলীবরণ সেনের 'মাণিক', অমর গাঙ্গুলির 'কাঞ্চনরঙ্গ', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছুক্ষণ', 'বর্ণচোরা', 'কষ্টিপাথর', তরুণ মজুমদারের 'কুহক', অজয় করের 'পরেশ', অগ্রগামীর 'নিশীথে', শৈলজানন্দের 'আমি বড় হব', অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোন একদিন', সলিল দত্তর 'সূর্যশিখা', অগ্রদূতের 'উত্তরায়ণ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব ছবিতে গঙ্গাদা বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কখনও কমেডি, কখনও ট্র্যাজেডি। তবে বেশিরভাগ ছবিতেই ভিলেন। গঙ্গাদার মতো অমন নিপাট ভালোমানুষ যে অমন অমানুষিক ভিলেন করতে পারতেন, এটা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। আর ভিলেনের অভিনয় করতে গিয়ে গঙ্গাদার চোখ-মুখ সব কেমন বীভৎস ভাবে পালটে যেত। চেনা মানুষটাকেও অচেনা মনে হত।

এই ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করার কারণে গঙ্গাদাকে প্রচুর দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। সেরকম একটি ঘটনা গঙ্গাদার মুখ থেকে শুনেছিলাম।

'নবান্ন' নাটকে গঙ্গাদা কুচক্রী হারু দত্তের চরিত্রে অভিনয় করে খুব সুনাম পেয়েছিলেন। এতে মানুষের মনে যে বিশ্রী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত তাতে গঙ্গাদা খুব খুশিই হতেন। হঠাৎ একদিন ওঁদের দলের একটি মেয়ে এসে বললে : আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি যেতে হবে দাদা, নইলে আমার আর অভিনয় করতে আসা হবে না।

গঙ্গাদা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কেন? বাড়ি থেকে আপত্তি উঠেছে নাকি?

মেয়েটি বললে : হ্যাঁ। আর আপত্তিটা আপনার জন্যেই। মা বলেছে, যে দলে ওইরকম লোক আছে সেখানে তোমার যাওয়া হবে না বাপু।

কথাটা শুনে গঙ্গাদা ভেতরে ভেতরে চুপসে গেলেন। কোনওমতে বললেন : আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণা হল কেন? তাঁর সঙ্গে আমার কোথাও দেখা হয়েছে বলে তো মনে করতে পারছি না।

গঙ্গাদার অবস্থা দেখে মেয়েটি হেসে ফেলল। বললে : আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনার অভিনয় দেখে মায়ের মনে ভীষণ রি-অ্যাকশন হয়েছে। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে, আপনি ভালো লোক।

গঙ্গাদা বলে উঠলেন : সর্বনাশ! তা কী বলছেন তিনি?

মেয়েটি বললেন : মা বলছে, ও লোকটা এমনিতেও নিশ্চয়ই খারাপ। নইলে অমন করে কেউ হাসতে পারে? তাছাড়া মানুষের চাউনি দেখলেই তার ভেতরটাও চেনা যায়। কাজেই ওইসব লোক নিয়ে যেখানে দল সেখানে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের যাওয়া উচিত নয়।

সর্বনাশ! এ যে একেবারে চরিত্র ধরে টান। এ তো ভালো কথা নয়! ভদ্রমহিলার ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার।

তা একদিন গঙ্গাদারা কয়েকজন মিলে মেয়েটির বাড়িতে গেলেন। মেয়েটি গঙ্গাদার সঙ্গে তার মায়ের আলাপ করিয়ে দিলে। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে গঙ্গাদাই 'নবান্ন' নাটকে হারু দত্ত করেছিলেন। মেয়েকে বললেন : তোরা যে কী বলিস বাপু। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এখনও মুখ দেখলে লোক চিনতে পারব না? তোরা কী ভাবিস আমাকে? এ সে মুখও নয়, চোখও নয়, আর সে হাসিও নয়—।

অবশেষে ভদ্রমহিলার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে গঙ্গাদাকে হারু দত্তর মতো করে কথা বলতে হল, কুটিল চোখে তাকাতে হল, আর সেইরকম করে হাসতে হল। ভদ্রমহিলা তখন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। খুশি হয়ে বললেন : জানো বাবা, আমাদের গাঁয়েও ঠিক এইরকম একটা লোক ছিল। অনেক বয়েস পর্যন্তও তার কথা মনে হলে আমার গায়ে কাঁটা দিত। ওইসব বদমাইস লোকগুলোর মুখোশ খুলে দেখাও তো সকলকে। তোমরা পারবে। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমাদের আদর্শ জয়যুক্ত হবেই।

এইভাবেই ভিলেনের অভিনয় করলেও গঙ্গাদা যে আসলে একজন ভালো মানুষ, এ অগ্নিপরীক্ষা তাঁকে বার বার দিতে হয়েছে।

ছায়াছবিতে যতই অভিনয় করুন, গঙ্গাদার আসল জায়গা ছিল রঙ্গমঞ্চ। বহুরূপীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন। ওঁর জীবদ্দশায় দু-চারটি বাদ দিয়ে বহুরূপীর বাকি সব প্রযোজনাতেই অভিনয় করেছেন তিনি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'পথিক', 'রাজা ওয়াদিপাউস' ইত্যাদি।

এই বহুরূপী সম্প্রদায়ের একটি ত্রৈমাসিক নাট্য-পত্রিকা ছিল 'বহুরূপী নামে। জীবদ্দশায় গঙ্গাদা এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। এবং সেই সম্পাদনা এত উচ্চাঙ্গের ছিল যে সুধীসমাজ পত্রিকাটিকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন।

প্রবন্ধ রচনায় গঙ্গাদা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেমন গভীর, ভাষাও ছিল তেমনি প্রাঞ্জল। আমার মতো অনেকেই তাঁর লেখার ভক্ত ছিলেন। আমি যখন 'দেশ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতাম, সেই সময়ে আমাদের সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বিনোদন সংখ্যার জন্য গঙ্গাদার একটি লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। গঙ্গাদা এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন লেখা দিতে। আমি ভেবেছিলাম আরও অনেক লেখকের মতো গঙ্গাদাকেও লেখা শেষ করার জন্যে তাগাদা দিতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছিলাম, গঙ্গাদা প্রতিশ্রুত দিনেই লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লেখাটা ছিল নবান্ন সম্পর্কেই। ১৯৭১ সালের ওই লেখাটিই সম্ভবত গঙ্গাদার জীবনের শেষ রচনা।

ওই ১৯৭১ সালের ১লা মে গঙ্গাদার কাছ থেকে বহুরূপীর প্রতিষ্ঠা দিবসের চিঠি পেয়েছিলাম। তার কয়েকদিন পরেই ওঁরা সদলবলে বম্বে চলে গেলেন অভিনয় করতে। সেখানে রবীন্দ্র ভবনে 'রাজা ওয়াদিপাউস' নাটকে গঙ্গাদার জীবনের শেষ অভিনয়।

এর দুদিন পরেই কলকাতা ফিরে করোনারি অ্যাটাক হল তাঁর। সেই অসুখই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমাদের মাঝখান থেকে।

আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে মাটির মানুষ গঙ্গাদা শেষ পর্যন্ত মাটিতেই মিশে গেছেন।

রঙ্গলাল অজিত চাটুজ্যে

চুক্তিভঙ্গ করে রঙ্গলাল অজিত চাটুজ্যে চলে গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে। আমার বুকের ভেতর অনেকখানি খালি করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। ওঁর জন্যে চোখে জল আসছে। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড রাগও হচ্ছে। আমি ওঁকে ভদ্রলোক বলে জানতাম। কিন্তু কোনও ভদ্রলোক যে এমন কথার খেলাপ করতে পারে, সেটা জানা ছিল না। বিশেষ করে ওঁর মতো একজন সদানন্দময় পুরুষ।

এই তো বছরখানেকও হয়নি ওঁর সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছিল। তার আগের দিন ওঁর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড মন-কষাকষি হয়ে গেছে। তারই পরিণতিতে আমরা দুজনেই ঘোষণা করেছিলাম, জীবনে কেউ আর কারও মুখদর্শন করব না।

সেটা ছিল নিছকই কয়েকটা মুহূর্তের উত্তেজনার ব্যাপার। তার ক'দিন আগেই বীরেনদা, অর্থাৎ আমাদের শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বাগবাজারের গিরীশ মঞ্চে। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বীরেনদার পুত্র, আমাদের বন্ধু প্রদ্যোৎকুমার ভদ্র। সেই উপলক্ষে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন ওয়াটারলু স্ট্রিটের বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বারীন রায়, পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ, 'সুররসিক' নামধেয় সংগীত সমালোচক আশিস চ্যাটার্জি, অতীতের খ্যাতনামা ফুটবলার অশোক চ্যাটার্জি, চলচ্চিত্র সমালোচক কল্যাণ সর্বাধিকারী এবং আমি। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারক হিসেবে অনেকেই ছিলেন। তাঁর মধ্যে আমার নির্দেশিত ছিলেন চারজন। অভিনেতা কমল মিত্র, নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী, পঁচাশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল অজিত চট্টোপাধ্যায়।

অজিতবাবুকে এই রঙ্গলাল উপাধিটি আমারই দেওয়া। উনি সর্বক্ষণ এমনই রঙ্গেব্যঙ্গে মশগুল থাকতেন যে ওই বিশেষণ ছাড়া যেন ওঁকে মানাতই না। তা উনিও ঠাট্টা করে লালে লাল মিশিয়ে আমাকে রবিলাল বলে ডাকতেন। তবে সেটা যখন বেশ রসেবশে থাকতেন, তখন। নতুবা বয়সের বেশ কিছুটা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উনি আমাকে রবিদা বলেই সম্বোধন করতেন। বারবার অনুরোধ করেও ওই ডাকটা পরিত্যাগ করাতে পারিনি।

স্মরণসভা যেদিন অনুষ্ঠিত হবার কথা, তার আগের দিন সন্ধ্যায় ডাঃ বারীন রায়ের চেম্বারে বসে বৃহৎ সাইজের তেলেভাজা সহযোগে চা পান করতে করতে আমরা যে যার কাজ ভাগাভাগি করে নিলাম। আমার ওপরে দায়িত্ব পড়ল ভবানীপুর থেকে কমল মিত্র আর সরযূবালা দেবীকে আনবার। কমলদা আগেই বলে দিয়েছিলেন আমি না আনতে গেলে তিনি আসবেন না। সরযূদিও তাই। অজিতবাবুকে যেদিন আমন্ত্রণ জানাতে যাই সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপনার জন্যে গাড়ি পাঠাতে হবে নাকি?

অজিতবাবু একহাত জিভ কেটে বলেছিলেন : ছি ছি! বীরেনদার স্মৃতিবাসরে আমার কি গাড়ি করে যাওয়া উচিত? আমি যাব পায়ে হেঁটে। এই চোরবাগান থেকে বাগবাজার এমন কিছু দূর তো নয়। অনায়াসেই হেঁটে যাওয়া যাবে। বীরেনদা আমার জন্যে সারা জীবনে যা করেছেন তার জন্যে তাঁর স্মৃতিবাসরে আমার তো পায়ে হেঁটেই যাওয়া উচিত।

অজিতবাবুর এই আবেগের কারণও ছিল। ওঁর বেতার-জীবন আর নাট্য-জীবনে বীরেনদার অবদান অনেকখানি। যেমন ছিল আমার সম্পাদক-জীবন আর যাত্রা-জীবনে। আর তাছাড়া অজিতবাবুর বাড়ি থেকে গিরীশ মঞ্চ সত্যিই এমন কিছু দূর নয়। ওঁর বাড়ি থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে গেলে বড় জোর মিনিট কুড়ির রাস্তা।

অনুষ্ঠানের দিন ভবানীপুর থেকে আমাদের গাড়িটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরেই এসেছিল। রামমন্দিরের সামনে দিয়ে যখন আসছিলাম তখন একবার মনে হয়েছিল পাশেই রাজেন সেন লেনে

অজিতবাবুর বাড়িটা একবার ঘুরে যাই। যদি উনি থাকেন তাহলে তুলে নিয়ে যাব। তারপরেই ভাবলাম, না থাক। এমনিতেই আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া কাল যেভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন তাতে আজ গাড়িতে তুলতে গেলে হয়তো ক্ষেপেই যাবেন।

গিরীশ মঞ্চে গিয়ে দেখলাম অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার মঞ্চের ওপর বীরেনদার মাল্যশোভিত ছবির ওপর আলো। নেপথ্য থেকে বীরেনদার রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। পরিবেশ শোকমগ্ন।

খবর নিয়ে জানলাম অজিতবাবু তখনও আসেননি। মিনিট পনেরো পরেই তিনি এলেন। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। আর এসেই আমার ওপর ঝাল ঝাড়তে লাগলেন। বললেন : আমাকে আনতে গেলেন না কেন?

আমি বললাম : আপনাকে তো আনতে যাবার কথা ছিল না স্যার। আপনি বলেছিলেন, আপনি পায়ে হেঁটে আসবেন।

অজিতবাবু বললেন : তা বলেছিলাম ঠিকই। তবে আপনারও তো মনুষ্যত্ব বলে একটা জিনিস আছে। এই এত রোদে এতটা পথ হেঁটে আসা যায়? তার ওপর পাতাল রেলের কাজ হচ্ছে। শোভাবাজারে লাল মন্দিরের সামনে একটা লোহার ডাণ্ডায় এমন হোঁচট খেলাম যে পায়ে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

আমি বললাম : চোখ চেয়ে রাস্তা না হাঁটলে এরকমই হয়। এখন চেঁচামেচি না করে যে কাজ করতে এসেছেন সেটাই মন দিয়ে করুন।

আমাদের কথাবার্তা একটু উচ্চ কণ্ঠেই হচ্ছিল। পাশে বসা ডাঃ বারীন রায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করলেন তার জন্যে। সেটা শুনে অজিতবাবু আরও ক্ষেপে গেলেন। রাগ করে চার-পাঁচটা সিট দূরে গিয়ে মুখ গোঁজ করে বসে রইলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর অজিতবাবুর রাগ ভাঙাতে গেলাম। কিন্তু আমাকে দেখেই অজিতবাবু আবার যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন : যান যান! আপনাকে আমি চিনে নিয়েছি। আমার দিন চলে গেছে। এখন সবাই আমাকে হেনস্থা করে। আপনিও সেই তাদেরই দলে।

আমি বললাম : কী আজেবাজে বকছেন। আমি আবার কখন আপনাকে হেনস্থা করলাম?

অজিতবাবু বললেন : করেননি? আমাকে নিয়ে আনন্দলোকে একটা লেখবার কথা ছিল আপনার। লিখেছেন সেটা?

আমি বললাম : বলেছি তো লিখব। তবে তার এখনও দেরি আছে। এবার পুজোয় জহরদাকে নিয়ে লিখব। তার পরের পুজোয় ভানুদাকে নিয়ে। তারপর আপনার টার্ন।

অজিতবাবু বললেন : কেন? অত পরে কেন? আমি তো ওদের থেকে সিনিয়ার।

আমি বললাম : পাঠকরা কিন্তু আপনার আগে ওদের কথাই শুনতে চায়। ওদের গ্ল্যামার যে আপনার চেয়ে বেশি।

কথাটা শুনে অজিতবাবু আরও ক্ষেপে গেলেন। বললেন : তাহলে ওই গ্ল্যামার মারানগে যান। সবাই জানে আমি ভানু-জহরের গুরু। আপনিও সেটা ভালো করেই জানেন। আর এখন আপনি আমাকে ওদের গ্ল্যামার দেখাচ্ছেন! আপনাকে আমার চেনা হয়ে গেছে মশাই। আজ থেকে আপনার সঙ্গে সব সম্পর্ক কাট্। জীবনে আপনার মুখদর্শন করব না।

আমিও রেগে গিয়ে বললাম : কাট্ তো কাট্! আমিও চাই না আপনার মুখদর্শন করতে।

আমাদের ওই উত্তেজিত কথাবার্তার মাঝখানে প্রদ্যোৎ ভদ্র এসে পড়লেন। তিনি জানতেন না আমাদের কী নিয়ে ঝগড়া চলছে। তিনি ভাবলেন, গাড়ি নিয়ে অনুষ্ঠানে আসা-যাওয়া নিয়েই বোধহয় এত উত্তেজনা। উনি অনুনয়-বিনয় করে অজিতবাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ওখান থেকে। একটা গাড়ি করে, কিংবা সরযূদির সঙ্গে একসঙ্গেই কি না সেটা মনে নেই, অজিতবাবুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

উত্তেজনা একটু থিতিয়ে আসতেই মনটা খারাপ হতে শুরু করল। অজিতবাবুর সঙ্গে আজ চল্লিশ বছরের সম্পর্ক, সুখে-দুঃখে দু'জনে এতদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, আর তিনি কি না বলে গেলেন আমার মুখদর্শন করবেন না। অভিমানে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সকলের অলক্ষে সেটা মুছে নিলাম।

দুপুরে রামধন মিত্র লেনে বীরেনদার পৈতৃক আবাসে লাঞ্চের নেমন্তন্ন ছিল আমার। প্রদ্যোৎবাবুর

স্ত্রী অনেক কিছু সুখাদ্য রান্না করেছিলেন। সেসব ভালো করে খেতেই পারলাম না। মনটা এতই খারাপ হয়ে ছিল। সন্ধ্যায় ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিটে সেনমহাশয়ের গলিতে এক মেজাজি ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রচুর পান-ভোজনের আয়োজন ছিল। সেখানেও ভালো করে মনোনিবেশ করতে পারলাম না। রাত্রে ঘুমটাও হল না ভালো করে। অজিতবাবুর অভিমানী মুখখানা বারবার ভেসে উঠছিল মনের মধ্যে।

পরদিন সকাল থেকেই মনটা ছটফট করছিল অজিত চাটুজ্যের বাড়িতে যাবার জন্যে। কিন্তু সাহস পেলাম না। কী জানি, এখনও যদি তাঁর রাগ না পড়ে থাকে! উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করলে আমিও হয়তো মাথার ঠিক রাখতে পারব না। সত্যি সত্যিই হয়তো চিরকালের জন্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে।

বিকেলের দিকে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। পাঁচটা নাগাদ হাজির হলাম প্রয়াত সংগীতসাধক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ওটাই অজিত চাটুজ্যের বাড়ি। অজিতবাবু ভীষ্মদেবের কাজিন।

আমাকে দেখে অজিতবাবু একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলে উঠলেন · আমি জানতাম আপনি আসবেন। জানেন, কাল সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সকাল থেকে মনটা ছটফট করছিল। আপনি আসছেন না দেখে কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। আর একটু দেরি করলে আমাকেই ছুটতে হত আপনার বাড়িতে।

আমি তখন আবেগে ভাসছি। কান্নাভেজা গলায় বললাম : আমারও তো ওই একই অবস্থা। কাল থেকে খাওয়া গেছে, ঘুম গেছে। কাল অমন কড়া কথাগুলো বললেন কী করে বলুন দেখি।

অজিতবাবু বললেন : ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। কাল আমার মাথায় ভূত চেপেছিল। একে অত রোদের মধ্যে অতখানি রাস্তা হাঁটা, তার ওপর ওই শালা পাতাল রেলের লোহার খোঁচা, রক্তারক্তি কাণ্ড, মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল। কালকের ব্যাপারটার জন্যে মাফ চাইছি। আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন রবিদা। কী, করেছেন তো?

আমি বললাম : আমারও তো ক্ষমা চাইবার আছে। আমিও তো আপনাকে কম কটু কথা বলিনি গতকাল।

অজিতবাবু বললেন : ব্যস্ ব্যস্। এই তো শোধবোধ হয়ে গেল।

তারপর একটু তরল কণ্ঠে বললেন : আসলে আমরা হলাম গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর (এরই একটা ইতর প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিলেন তিনি) মতো। মাঝে মাঝে একটু ঝগড়াঝাটি না হলে পিরিত জমবে কেন!

কথাটা শেষ করে উনিও যেমন উচ্চকণ্ঠে হেসেছিলেন, আমিও তেমনি। উভয়ের মনের সব মেঘ কেটে গিয়েছিল।

ততক্ষণে ওপর থেকে চা এসে গিয়েছিল। অকৃতদার অজিতবাবুর ভাইপোদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি। আমাদের ওই নাটকীয় সাক্ষাৎকারের সংবাদ বোধহয় পাশের বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছিল। সে বাড়ি থেকে ছুটে এলেন অজিতবাবুর আত্মীয় নিতাই গোস্বামী। নিতাইবাবু আমাদের পুরনো বন্ধু। এতদিন নবকল্লোল পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। আকাশ মেঘমুক্ত দেখে দু-চারটে কথা বলে নিতাইবাবু ফিরে গেলেন।

চা খেতে খেতে অজিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি যে আমার বাড়িতে যাবেন ভাবছিলেন, তা আপনি আমার রথতলার বাড়ি চেনেন নাকি? আপনি তো কখনও সেখানে যাননি!

আজিতবাবু বললেন : তাতে কী হয়েছে! আমি আপনার বিডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে ঠিকানা আর ডিরেকশান নিতে নিতাম। আমি তো আপনাদের ও বাড়িতে কতবার গেছি! কত আমোদ-ফূর্তি করেছি! আপনার সেসব কথা এখন আর মনে নেই বুঝি?

আমি বললাম : মনে থাকবে না আবার! সে সব কথা কি ভোলবার?

একটা সময়ে আমি সপরিবারে দীর্ঘকাল থেকেছি বিডন স্ট্রিটে হেদুয়ার উত্তর দিকে তিন নম্বর রায়বাগান স্ট্রিটে। এখন আমি থাকি আড়িয়াদহের রথতলায় আর আমার শ্বশ্রুমাতা থাকেন পুরনো বাড়িতে। ও-বাড়িতে আমার নিজস্ব একটি ছোট্ট ঘর ছিল। সেখানে প্রায়ই সন্ধেবেলা আমরা আড্ডা

জমাতাম। অজিতবাবুর বাড়ি থেকে আমার ওই বাড়ি দশ মিনিটের রাস্তা। মধ্যরাত্রে আড্ডা ভাঙবার পর অজিতবাবু কখনও রিকশা নিয়ে, আবার কখনও পদব্রজে বাড়ি ফিরে যেতেন। ওই আড্ডায় অজিতবাবু ছাড়াও থাকতেন আমার বন্ধু গোপাল পাল। গোপাল তখন বি এফ জে এ-র ট্রেজারার ছিলেন। থাকতেন চলচ্চিত্র পরিচালক অসীম ব্যানার্জি। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যেতেন গায়ক ও সুরকার সুকুমার মিত্র এবং আরও কেউ কেউ। আমাদের ওই আড্ডায় পান-ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা থাকত। ভরপুর মেজাজের ওই আড্ডাটির নাম অজিতবাবু দিয়েছিলেন 'সদানন্দের মেলা'। কারণ ওখানে কারও কোনও দুঃখের কথাবার্তা বলার অধিকার ছিল না। যা কিছু হবে সব আনন্দের কথা। সদানন্দের মেলা নামটি অবশ্য ধার করা। সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত উত্তম-সুচিত্রার 'সদানন্দের মেলা' ছবিটি সেই সময় মুক্তি পেয়েছিল। তারই অনুকরণে অজিতবাবু আমাদের এই আনন্দমেলার নামকরণ করেছিলেন 'সদানন্দের মেলা'।

অজিতবাবু বলতেন : আপনার এই ছোট্ট ঘরটায় বসলে মনটা হঠাৎ বিরাট হয়ে যায় রবিদা। আপনাদের পরিবারের সবাইকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাই যে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা একদম ভুলে যাই। বারে বসে মদ্যপান করলে এই মেজাজটা একদম পাই না।

সেটা ঠিক কথা। যদিও আমরা মাসের অধিকাংশ দিন বসতাম হয় চাংওয়ায়, অথবা এলফিন বারে, কিংবা অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জির স্বামী মামাজিদের অ্যাভেন্টাইনের দোতলায়। কিন্তু আমার ওই ছোট্ট ঘরটায় বসে অজিতবাবু যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, তেমনটি আর কোথাও দেখিনি। একেবারে শিশুর মতো আচার-আচরণ করতেন। যদিও ওঁকে আমার চিরকালই মনে হয়েছে শিশুর মতো। ওঁর মনে কোনওদিন কোনওরকম মালিন্য দেখিনি। এটা যাঁরা ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁরা সকলেই জানেন।

তা ওইদিন চা খাবার পর বললাম : যান, লুঙ্গিটা ছেড়ে আসুন দেখি। বেরিয়ে পড়ি এবার।

অজিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায়?

আমি বললাম : আমাদের পুরনো কোনও আড্ডায় গিয়ে বসি খানিকক্ষণ। কাল থেকে মনের মধ্যে যা ঝড় চলছে, খানিকটা ম্যাকডোয়েলের প্রলেপ না পড়লে সে ঝড়ের দাপট সামলানো যাবে না।

অজিতবাবু বললেন : কিন্তু আমার যে ডাক্তারের নিষেধ।

তারপর নিজেই বললেন : গুলি মারুন ডাক্তারের কথায়। আর ক'দিনই বা বাঁচব। এই বয়সে আর এত ধরাকাটে থাকতে ইচ্ছে করে না। আপনি একটু বসুন। আমি জামা-কাপড়টা বদলে আসি।

সেই সন্ধ্যায় আমরা গিয়ে বসেছিলাম অ্যাভেন্টাইন বারের দোতালায়। কেবল আমরা দু'জন। আর কাউকে সঙ্গে নিইনি।

আমাদের আড্ডা যখন মধ্যপথে, তখন অজিতবাবুকে বললাম : আপনি তখন মৃত্যুর কথাটা বললেন কেন?

অজিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কখন বললাম।

আমি বললাম : আপনার বাড়ি থেকে বেরোবার আগে বললেন না, ক'দিনই বা বাঁচব?

অজিতবাবু বললেন : সেটা তো ঠিক কথাই রবিদা। বয়েসটা থ্রি-কোয়ার্টার সেঞ্চুরি পার করে দিল সেটা ভুলি কী করে বলুন?

আমি বললাম : অত অঙ্কের হিসেব করবেন না। আমাদের এখনও অনেক বছর বাঁচতে হবে। অনেক কাজ বাকি থেকে গেছে।

তা সেই সন্ধ্যায় আমরা ঠিক করেছিলাম, এই বিংশ শতাব্দীর পুরোটা আমাদের যেমন করে হোক বেঁচে থাকতেই হবে। মৃত্যুদূত এসে হাজির হলে তাকে বলতে হবে, অন্তত আটটা বছর পরে তুমি এসো বাপু। তখন ভালো ছেলের মতো তোমার সঙ্গে সুড়সুড় করে চলে যাব।

ওইখানে বসেই আমরা ১৯৯৯ সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের জন্যে একটা প্রোগ্রাম সেট করে ফেলেছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি থেকে রীতিমত সাজগোজ করে বেরোব। পুরনো সব আড্ডাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে রাত বারোটায় হাজির হব আউটরাম ঘাটে। জাহাজগুলির ভোঁ শুনতে শুনতে

মা গঙ্গাকে এক বোতল হুইস্কি নিবেদন করে নতুন শতাব্দীকে স্বাগত জানাব। তারপর ওই গভীর রাত্রে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে খিদিরপুরের তক্তাঘাটে, আবার সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজারের কাশীমিত্রের ঘাটে। কলকাতা তো সেদিন রাত্রে আর ঘুমোবে না। আলো, বাজি আর উচ্ছলতার মাঝখানে সবাই জেগে থাকবে নতুন শতাব্দীর প্রথম সূর্যোদয় দেখতে। আমরাও সেই আনন্দে গা ভাসিয়ে দেব।

তা অজিতবাবু তাঁর কথা রাখলেন না। নতুন শতাব্দীর আগমনের সাত বছর আগেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এটা কি ঠিক হল? ইংরেজি না হোক বাংলা নতুন শতাব্দী পর্যন্ত, যেটা আসতে আর মাত্র দেড় মাস বাকি, সেটা পর্যন্ত থাকতে পারলেন না? আমরা না হয় আমাদের পরিকল্পনাটা ইংরাজি না হোক, বাংলা শতাব্দীতেই কার্যকরী করতে পারতাম।

অজিত চাটুজ্যেকে নিয়ে লেখার আছে অনেক। তাঁর সারা জীবনটা নানা মজার মজার ঘটনা আর ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। সুতরাং আমার লেখার পরিধিটাও একটু বড় হয়ে যাবে। তার জন্যে স্মৃতির সরণির পাঠক-পাঠিকাদের অগ্রিম অনুমতি নিয়ে রাখছি।

কিন্তু কোথা থেকে শুরু করি! একদম ছোটবেলা থেকে কি? না না, সেটা বড় গতানুগতিক হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং এখান-ওখান থেকে তাঁর জীবনের মজার কাহিনীগুলির ওপর আলোকপাত করি। তাঁর মানবতার নানা দিক নিয়ে টুকরো টুকরো ছবি আঁকি। তার মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারা যাবে কী অসাধারণ হৃদয়বান মানুষ ছিলেন রঙ্গলাল অজিত চাটুজ্যে।

এই রঙ্গ করতে গিয়েই একদিন জীবন সংশয় হয়েছিল অজিতবাবুর। পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে না পারতেন তাহলে হয়তো সেদিন একটি গুলিতে বুকখানা ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারত তাঁর।

সেটা সেই ১৯৪৬ সালের কথা। তারিখটা অজিতবাবুর স্পষ্ট মনে আছে। তেইশে আগস্ট। তার মাত্র সাত দিন আগে ষোলোই আগস্ট থেকে কলকাতায় শুরু হয়েছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রক্তে ভেসে গেছে কলকাতার রাজপথ থেকে গলিপথ। তদানীন্তন মুসলিম লিগ সরকার বাধ্য হয়ে কলকাতা শহরটাকে তুলে দিয়েছেন মিলিটারির হাতে।

যেদিনকার কথা বলছি সেই সময়ে দাঙ্গার প্রকোপ খানিকটা কমেছে। ক'দিন আগেও কারফিউর মেয়াদ ছিল চব্বিশ ঘণ্টা। এখন সেটা ধাপে ধাপে কমানো হচ্ছে।

বেশ ক'দিন ঘরবন্দি থাকার পর অজিতবাবু সেদিন দুপুরে এক বন্ধুর বাড়ি গেছেন তাঁদের খবরাখবর নিতে। তাঁরা থাকতেন গোলদীঘির কাছে মির্জাপুর স্ট্রিটে। গিয়ে দেখলেন তাঁরা সব ভালো আছেন। সেখানে গল্পগাছা করতে করতে বেশ খানিকটা সময় চলে গেল। অজিতবাবু তো দারুণ আড্ডাবাজ ছিলেন। গল্প করতে বসলে সময়ের হিসেব থাকত না তাঁর।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শুনে গিয়েছিলেন বিকেল ছ'টা থেকে কারফিউ লাগু হবে। গল্প করতে করতে যখন খেয়াল হল তখন হাতের ঘড়িতে ছ'টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। তাড়াতাড়ি গল্প অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে পড়লেন বন্ধুর বাড়ি থেকে।

ইউনিভার্সিটির সামনে এসে দেখলেন মুষ্টিমেয় যে ক'টি ট্রাম-বাস চলছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। হন হন করে হাঁটা শুরু করলেন। যেতে হবে ব্রাহ্ম সমাজ হল পেরিয়ে শ্রীমানী বাজার পর্যন্ত। ওইটুকু কোনওরকমে যেতে পারলেই সরকার লেন নামক সরু গলিটাতে ঢুকে পড়ার অপেক্ষা। ওখান থেকে তাঁর বাড়ি দু-মিনিট। কারফিউ যদি পড়েও যায় তাহলেও ওই অত সরু গলিতে পুলিশ কিংবা মিলিটারি ঢুকবে না নিশ্চয়। তাদের যা কিছু দাপট সব কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের (বর্তমানে বিধান সরণি) ওপর।

অত হন হন করে হেঁটেও ঠনঠনে কালিবাড়ির সামনে এসে দেখলেন হাতের ঘড়িতে ছ'টা বেজে পাঁচ। তবু সাহস করে কোনওরকমে বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেল পর্যন্ত এলেন। ওখান থেকেই দেখলেন শ্রীমানী বাজারের মোড়টাতে চেয়ার পেতে বন্দুক আর সঙ্গীন উঁচিয়ে বসে আছে জনা ছয়েক মিলিটারি। সর্বনাশ! এখন কী হবে?

অজিতবাবুকে ওই জনহীন রাস্তার ওপর দেখতে পেয়ে হস্টেলের ওপরের জানালা থেকে কয়েকটা ছেলে চাপা গলায় বলে উঠল : অজিতদা, আর এগোবেন না। শিগগির হস্টেলের মধ্যে ঢুকে পড়ুন।

হস্টেলের ছেলেরা অজিতবাবুকে ভালো করেই চেনে। প্রতি বছর ওদের কলেজের ফাংশান করেন।

আর্টিস্ট জোগাড় করে দেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ছেলেদের কাছে অজিতবাবু দারুণ পপুলার।

পড়ি কি মরি করে হস্টেলের দিকে ছুটলেন অজিতবাবু। হস্টেলের দরজা বন্ধ। ওপর থেকে ক'টা ছেলে দৌড়ে এসে দরজা খুলে অজিতবাবুকে প্রায় টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল।

ছেলেরা ধমকে উঠল : আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে অজিতদা! এই কারফিউর মধ্যে বেরিয়েছেন!

তখনকার কারফিউ আজকালকার কারফিউর মতো এমন ছেলেখেলার ব্যাপার ছিল না। মাথার ওপরে দু'হাত তুলে গেলেও পার পাওয়া যেত না। দেখামাত্র গুলি।

অজিতবাবু বললেন : না রে ভাই, কারফিউর মধ্যে বেরোইনি। বেরিয়েছিলাম দুপুরে। যেখানে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আসতে দেরি হয়ে গেল।

ছেলেরা বললে : খুব বেঁচে গেছেন। শ্রীমানি বাজারের সামনে যেসব মিলিটারি পোস্টিং হয়েছে তাদের মুখচোখ সব ভয়ঙ্কর। নিজের বাপকেও রেয়াত করবে বলে মনে হয় না। আজ রাত্রে আমাদের এখানে থাকুন। কাল সকালে কারফিউ উঠলে বাড়ি ফিরবেন।

অজিতবাবু বললেন : না রে ভাই, যেমন করে হোক বাড়ি ফিরতেই হবে। নাহলে বাড়ির লোক ধরে নেবে আমি কোতল হয়ে গেছি। মড়াকান্না পড়ে যাবে।

ওখানে খানিকক্ষণ রেস্ট নিলেন অজিতবাবু। দু-গ্লাস জল খেলেন। ভাবতে লাগলেন কী করে বাড়ি ফেরা যায়।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ওই ব্যাপারটা অ্যাপ্লাই করলে কেমন হয়? ছোটবেলা থেকে এতবার প্র্যাকটিশ করেছেন আব এখন দরকারের সময় কাজে লাগাতে পারবেন না?

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল বিদ্যাসাগর হস্টেলের সামনে থেকে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে কী যেন একটা ট্রাম লাইন পার হচ্ছে। রাস্তায় তখন এত আলো ছিল না। মিটমিটে বাল্ব। হঠাৎ একঝলক তীব্র টর্চের আলো সেই বস্তুটার ওপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল : হল্ট! হু কাম্‌স্ দেয়ার?

যে কোনও মানুষের কথা-বার্তা, চাল-চলন দারুণভাবে অনুকরণ করতে পারতেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। এটা সেই ছোটবেলা থেকেই। শৈশবে বাবার সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখতে যেতেন। ওঁর বাবা সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটু উদার মানুষ ছিলেন। ইংরিজি ছবি দেখলে ছেলেপুলেরা বখে যাবে, এ ভাবনায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চ্যাপলিন কিংবা টারজানের ছবি দেখতে যেতেন।

সতীশবাবু কাজ করতেন রেমিংটন কোম্পানিতে। বেশ উঁচু পদেই ছিলেন। পরবর্তীকালে বড় ছেলে রঞ্জিতকে তিনি ওই কোম্পানিতেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অজিতবাবুর জন্যে তেমন কোনও চেষ্টা করেননি। কারণ তিনি জানতেন চাকরি-বাকরি এ ছেলের ধাতে সইবে না। ও যেমন নাটক-ফাটক ফাংশান-টাংশান নিয়ে আছে তেমনই থাকুক। সতীশবাবু নিজেও একটু-আধটু অভিনয় করতেন। সানরাইজ থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবে নিয়মিত যেতেন। ওদের হয়ে দু'চারবার ফিমেল চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন।

অজিতবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এই যে আপনি নাটক করতে এলেন সে নেশাটা কি আপনার বাবার কাছ থেকে পাওয়া?

অজিতবাবু উত্তরে বলেছিলেন : দুর দুর। ও সব নেশা-ফেশা কিছু নয়। যখন যা ভালো লেগেছে করেছি। বাড়িতে ভীষ্মদা গান গাইতেন, তাঁকে কপি করে গান শিখেছি। বাবা চ্যাপলিনের ছবি দেখতে নিয়ে যেতেন, সেই চ্যাপলিনকে কপি করে অভিনয় শিখেছি। আমার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। আমি হলাম গিয়ে কপিং মাস্টার।

তা সত্যিই অজিতবাবু দারুণ কপি করতে পারতেন। চ্যাপলিনের ছবি দেখে এসে বাড়িতে হুবহু কপি করে দেখাতেন। যেজন্যে ওঁর বাবা বলতেন : আমাদের সবাইকে আর পয়সা খরচ করে বায়স্কোপ দেখতে যেতে হবে না। অজিত একা গেলেই চলবে। ও বাড়িতে এসে আমাদের কপি করে দেখিয়ে

দেবে পুরো ছবিটা।

এই কপি করার ব্যাপার নিয়ে ছোটবেলায় একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছিল।

অজিতবাবু তখন খুবই ছোট। বারো-তেরো বছর বয়েস। ওই সময়ে একটা বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন এল। বিয়ের দিন সকালে বাবা বলে গেলেন : তোমরা সব সাজ-গোজ করে রেডি থেকো। আমি অফিসথেকে ফেরার সময় কলেজ স্ট্রিটে জহরলাল-পান্নালালের দোকান থেকে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে আসব। আমি আসামাত্রই বেরিয়ে পড়তে হবে।

অজিতবাবু বললেন : এই বলে তো বাবা চলে গেলেন আপিসে। বিকেল থেকে আমাদের সব সাজো-সাজো রব। বাবার অফিস ছুটি পাঁচটায়। কলেজ স্ট্রিট থেকে কাপড় কিনে ফিরতে ফিরতে ছ'টা-সাড়ে ছ'টা হবে। কাজেই আমরা সব বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সাজগোজ করে রেডি। আমাদের সাজিয়ে দিয়ে মা যখন নিজের সাজগোজ শেষ করলেন তখন ঘড়িতে ছ'টা বেজে পাঁচ।

তারপর এক সময় ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজল, সাতটা বাজল, এমনকি ঢং করে সাড়ে সাতটার ঘণ্টাও পড়ে গেল। কিন্তু বাবা আর আসেন না। মা খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বাবার কোনও বিপদ-আপদ হল না তো?

মায়ের ওই দুর্ভাবনা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ঘরের বড় আলোটার বদলে নাইট ল্যাম্প জ্বেলে বাবার বিছানায় গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে মা ঘরে ঢুকে চাদর মুড়ি দেওয়া আমাকে দেখে ভাবলেন, বাবা বোধহয় বাড়ি ফিরে এসে একটু আরাম করছেন। মা বললেন : কী গো, তুমি কখন এলে?

আমি হুবহু বাবার মতো গলা করে বললাম : এই তো একটু আগে।

মা বললেন : তা এসেই শুয়ে পড়লে যে? শরীর-টরির ঠিক আছে তো?

বাবার কণ্ঠস্বরে আমি বললাম : সে সব ঠিক আছে। তোমাদের সাজ-গোজ হয়ে গেছে?

মা বললেন : কখন! তা কী শাড়ি কিনে আনলে দেখি?

আমি বাবা সেজে বললাম : শাড়ি কেনা হয়নি। সোজা অফিস থেকে চলে এসেছি। একটু বাদে কিনে আনছি গিয়ে।

মা বললেন : দ্যাখো কাণ্ড! বিয়েটা যদিও পাড়ার মধ্যে, তা হলেও কত দেরি হয়ে যাবে বলো দিকি!

বাবারূপী আমি বললাম : কিচ্ছু দেরি হবে না। এই তো যাব আর আসব। তুমি তার আগে আমাকে এক কাপ চা করে দাও দেখি!

মা চা করবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে পা দিয়েই দেখলেন একখানা শাড়ির প্যাকেট হাতে বাবা আসছেন। মাকে দেখে বাবা বলে উঠলেন : অফিস থেকে বেরোতে আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল গো! তা তোমরা সব সাজগোজ করে নিয়েছ তো? চটপট এক কাপ চা করে দাও দেখি। চা-টা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

বাবাকে দেখে মা হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এইমাত্র বাড়ি ফিরছ?

বাবা বললেন : তাই তো ফিরছি। কেন, এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

মা বললেন : তাহলে তোমার বিছানায় কে শুয়ে? কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললাম? হুবহু তোমার মতো গলার স্বর।

বাবা ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। বললেন : কে আবার! তোমার গুণধর মধ্যমপুত্র। কোথায় গেল সে হতভাগা! চল তো দেখি একবার।

বাবার গলার আওয়াজ পেয়েই আমি তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে খাটের নিচে ঢুকে পড়েছি। মা খালি বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন : গেল কোথায়? এই তো এতক্ষণ এখানে শুয়ে শুয়েই কথা বলছিল।

বাবা বললেন : যাবে কোথায়! খাটের নিচে টিচে কোথায় লুকিয়েছে।

বলতে বলতে বাবা খাটের নিচে উঁকি দিয়ে বললেন : বেরিয়ে আয় হতভাগা, বেরিয়ে আয়!

আমি সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসতেই বাবা আমার কানটা ধরে বললেন : বায়স্কোপের লোকদের

নকল করতে করতে এখন নিজের বাপ-মাকে নকল করতে শিখেছ! তোর কোনদিন কিচ্ছু হবে না। চিরকাল ওই ভাঁড়ামি করেই খেতে হবে।

তা বাবার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। সারা জীবন অজিতবাবুকে ভাঁড়ামি করেই উপার্জন করতে হয়েছে। তবে ওঁদের ছোটবেলায় ভাঁড়ামোটা যেমন স্থূল পর্যায়ের ছিল, অজিত-ভানু-জহরের আমলে সেই ভাঁড়ামো অনেক সূক্ষ্মতায় পৌঁছেছিল। আর তারপরে উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, ভোলা দত্ত, মনোজ মিত্রদের আমলে ভাঁড়ামোটা তো আর্টের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

ছোটবেলায় অজিতবাবু যে অন্যের কণ্ঠস্বরই কেবল অনুকরণ করতে পারতেন তাই নয়, অন্যের চলা-ফেরা সবই হুবহু নকল করতে পারতেন। পাখির ডাক, পশুর ডাক, পারিপার্শ্বিক সবরকম শব্দ দারুণভাবে তুলে নিতে পারতেন নিজের কণ্ঠে। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত এম পি প্রোডাকসন্সের 'শেষ উত্তর' ছবিতে কানন দেবীর কণ্ঠে একটি গান ছিল। 'তুফান মেল যায়...।' গানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। ওই গানের সঙ্গে ট্রেন চলার শব্দ ছিল, ট্রেনের হুইসল্ ছিল। তার সব কিছুই ছিল অজিত চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠনিঃসৃত। বলে না দিলে কারুর ধরার উপায় ছিল না যে ওইসব শব্দ মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছে। কী অপূর্ব সেই শব্দের ব্যঞ্জনা। ট্রেনের গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দপ্রক্ষেপণের হেরফের ঘটেছে। প্লাটফর্মে যখন ট্রেন ঢুকছে তখন থমকে থমকে বাষ্প ছাড়ার শব্দ দারুণভাবে পরিবেশন করেছিলেন অজিতবাবু। শুধু তাই নয়। পাখির ডাক, কুকুরের ডাক, বেড়ালের ডাক সব কিছু নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারতেন তিনি। অনেক ছবিতে সেই সব ডাক লাগানো হয়েছে এফেক্ট হিসেবে।

একবার ওই শব্দের সাহায্যে আমাদের একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলেন অজিতবাবু। সেবার আমাদের তরুণ রায় মশাইয়ের থিয়েটার সেন্টারে একটা নাটক দেখতে যাবার কথা। ছ'টায় শো। বিবেকানন্দ রোডের উল্টোরথ অফিস থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের। কলেজ স্ট্রিটে পুজোর সময় সেই আমলে জ্যাম হতো ভয়ানক। আমরা তাই সার্কুলার রোড ধরেছিলাম থিয়েটার সেন্টারে যাবার জন্যে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন প্রসাদ সিংহ। অজিতবাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

তা গাড়ি যখন শেয়ালদায় এসে পৌঁছল, দেখা গেল সেখানেও প্রচণ্ড জ্যাম। গাড়ি আর এগোতেই চায় না। হাতের ঘড়িতে দেখা গেল ছ'টা বাজতে আর মিনিট সাতেক বাকি আছে। যেভাবে এক পা করে গাড়ি এগোচ্ছে তাতে সাতটাতেও পৌঁছনো যাবে কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ অজিতবাবু বলে উঠলেন : প্রসাদদা, আমি একটু কারিকুরি করছি। আপনি একটু ফাঁক পেলেই রং সাইড দিয়ে গাড়িটা ফুল স্পিডে বার করে নিয়ে চলে যান। একদম থমকাবেন না। ট্রাফিক পুলিশের দিকে একদম ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

এই বলে অজিতবাবু দুটো হাত মুঠো করে মুখের সামনে ধরে হুবহু সাইরেনের আওয়াজ বার করতে লাগলেন। সাইরেনের শব্দ পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ হকচকিয়ে গেল। তারা ভাবল কোনও মিনিস্টার যাচ্ছে বোধহয়। তারা হন্তদন্ত হয়ে সব গাড়িকে দাঁড় করিয়ে আমাদের গাড়ির যাবার পথ করে দিলে। মৌলালি, পার্ক স্ট্রিট, বেকবাগান, মিন্টোপার্ক ইত্যাদি সবগুলি মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের স্যালুট নিতে নিতে আমাদের গাড়ি যখন থিয়েটার সেন্টারে গিয়ে পৌঁছল তখন হাতের ঘড়িতে ছ'টা বেজে তিন মিনিট।

প্রসাদদা গাড়ি থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমি পারও বটে!

অজিতবাবু অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে বললেন : এটি জানবেন।

পরে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর ট্রাফিক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার একদিন অজিতবাবুকে বলেছিলেন : তুমি আর এসব কোরো না ভাই। তোমার জন্যে একদিন আমার চাকরিটা যাবে দেখছি!

অজিতবাবু উত্তরে বলেছিলেন : পাগল! আর করি কখনও। সেদিন নেহাত একটা এমার্জেন্সি রুগিকে শিশুমঙ্গল হস্‌পিটালে পৌঁছে দিতে হল, তাই করেছিলাম।

ডি সি ট্রাফিক হাসতে হাসতে বলেছিলেন : গাড়িতে কেমন রোগী ছিল সেটা আমি জানি। শিশমঙ্গলে যাবার রাস্তাটা আজকাল পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে নাকি মিস্টার চাটুজ্যে?

অজিতবাবুও হাসতে হাসতে বলেছিলেন : এই যা, ধরা পড়ে গেছি তাহলে!

তা পুলিশের ওপর মহল আর মাঝারি মহলে অজিতবাবুর খুব খাতির ছিল। পুলিশের যে কোনও অনুষ্ঠান হলেই কমিক্ করবার জন্যে ওঁর ডাক পড়ত। সেই সূত্রে অজিতবাবু কতবার যে কত লোকের উপকার করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। ছোটখাটো কোনও অপরাধ হলে অজিতবাবুর কল্যাণে সেসব কেস্ কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছত না। আর ট্রাফিক রুল ভায়োলেশনের কেস হলে তো কথাই নেই। পরের দিন সকালেই লালবাজারে গিয়ে মকুব করিয়ে নিয়ে আসতেন। এমনই ছিল তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তি।

তা এই পরোপকার প্রবৃত্তির আরও একটি ঘটনা জানা আছে। সেই ঘটনাটার সঙ্গে আমি নিজেই যুক্ত ছিলাম।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে কমেডিয়ান হিসেবে অজিত চট্টোপাধ্যায়ের দারুণ নামডাক ছিল। কোথাও কোনও ফাংশান হচ্ছে অথচ অজিত চাটুজ্যে নেই, এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। আমি সেই সময়ে কিছু কিছু ফাংশান করতাম। তা একবার একটি মোটামুটি বড় ফাংশানে কমিক করবার প্রস্তাব নিয়ে অজিতবাবুর কাছে গেলাম। কোথায় ফাংশান, কিরকম কী টাকাকড়ি পাওয়া যাবে সমস্ত জেনে নিয়ে অজিতবাবু বললেন : আমি একটা কথা বলব?

আমি ভাবলাম বোধহয় টাকার অঙ্কটা অজিতবাবুর পছন্দ হচ্ছে না। একটু বাড়াতে চাইছেন। তাই বললাম : বলুন না, কত টাকা চাইছেন? আমাদের ফান্ড যদি পারমিট করে তাহলে নিশ্চয় দেব।

অজিতবাবু বললেন : আরে না না, টাকার কথা নয়। এটা অন্য কথা।

আমি বললাম : কী কথা?

অজিতবাবু বললেন : আমাকে যে টাকাটা দিতে চাইছেন সেই টাকায় আমার বদলে দু'জন কমেডিয়ানকে দিচ্ছি। ওদের একটা চান্স দিন। দেখবেন ওরা একেবারে ফাটিয়ে ছাড়বে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কী নাম তাঁদের?

অজিতবাবু বললেন : একজনের নাম ভানু। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজনের নাম জহর রায়।

আমি বললাম : হ্যাঁ, এই দু'জনের নাম শুনেছি বটে। নতুন কমিক্ করছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কি ওদের তুলনা চলে? আপনি হলেন এখনকার পাবলিকের হট্ ফেভারিট। আপনাকে না পেলে আমাদের জলসা যে একদম পানসে হয়ে যাবে অজিতবাবু।

অজিতবাবু বললেন : ঠিক আছে। আপনাদের ফাংশানে আমি উপস্থিত থাকব। কিন্তু কমিক করবে ওরা। পাবলিকের যদি ওদের কমিক ভালো না লাগে তবে আমি নিজে ডায়াসে উঠব কমিক করতে। তার জন্যে আপনাদের এক পয়সাও দিতে হবে না।

আমি বললাম : এতে আপনার কী লাভ? নিজের বাড়া ভাতে কেউ এভাবে ভাগ বসাতে দেয়?

অজিতবাবু বললেন : বা রে! সত্যিকারের ট্যালেন্টকে তুলে ধরতে হবে না? ওদের একজন এসেছে বাংলাদেশ থেকে, আর একজন এসেছে বিহার থেকে। ওদের যদি আমরা না দেখি তাহলে দেখবে কে? এটা যদি না করি তাহলে মানুষ হিসেবে পরিচয় দেব কেমন করে!

হ্যাঁ, এইভাবে নিজের তৈরি মার্কেট আস্তে আস্তে অজিতবাবু তুলে দিয়েছিলেন ভানুদা আর জহরদার হাতে। তাঁদের গাইড করতেন। যে কারণে ভানুদা আর জহরদা তাঁকে সারা জীবন সম্মান করে এসেছেন 'গুরু' বলে। একেবারে শেষের দিকে জহরদার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মতান্তর ঘটেছিল অজিতবাবুর। জহরদা তখন রঙমহল মঞ্চের সর্বেসর্বা আর অজিতবাবু একজন নামমাত্র শিল্পী। ব্যবহারের তারতম্য কিছুটা তো ঘটবেই। অজিতবাবু তখন অভিমানভরে আমার কাছে তাঁর দুঃখের কথা কিছু কিছু বলেছিলেন। কিন্তু ভানুদার সঙ্গে ব্যবহারের তারতম্য কোনদিন ঘটেনি। ভানুদা তো আরও অনেক ওপরে উঠেছিলেন। কিন্তু অজিতবাবুকে সেই প্রথম দিনের মতোই সম্মান করতেন। ভানুদা যখন রঙমহলে 'জয় মা কালী বোর্ডিং' নাটক করতে এসেছিলেন, তখন অজিতবাবুকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে এনে অভিনয় করিয়েছিলেন প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে।

অজিতবাবুর এই পরোপকার প্রবৃত্তির আর একটা ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নব্য বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জড়িত। এই ঘটনাটা আমি

শুনেছিলাম ডক্টর রায়ের পরম স্নেহভাজন বীরেন বসুর মুখ থেকে। বীরেনবাবু ছিলেন আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার কর্ণধার প্রসাদ সিংহের ছোড়দির স্বামী। প্রসাদদার সুবাদে আমরাও ওঁকে ছোড়জামাইবাবু বলে ডাকতাম।

ডক্টর রায় অজিতবাবুকে বিশেষ স্নেহ করতেন। অজিতবাবু ওঁকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতেন। ডক্টর রায়ের বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখেছি। কিন্তু অজিতবাবু তাঁর সঙ্গে একেবারে ঘরোয়াভাবে মিশতেন। কখনও কখনও ঠাট্টা-তামাশাও করতেন। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। ডক্টর রায়ের মতো রাশভারি মানুষও সেই ঠাট্টা-তামাশা উপভোগ করতেন।

কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। অজিতবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন ডক্টর রায়ের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে। কোনও মেধাবী ছাত্র লেখাপড়া করতে পারছে না, অজিতবাবু তাকে নিয়ে হাজির হলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে। তার একটা হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলেন না। এইরকম হাজারো মানুষের অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে অজিতবাবুকে প্রায়শই হাজির হতে হত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দরবারে।

তা এই নিয়ে ডক্টর রায়ের যাঁরা বিশেষ স্নেহভাজন তাঁদের কারও কারও মনে একটু ক্ষোভ ছিল। একজন মামুলি কৌতুক-অভিনেতা, তার সঙ্গে ডাঃ রায়ের এত দহরম মহরম কেন? অজিতবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁরা তাঁদের ক্ষোভের কথা ডাঃ রায়ের সামনে প্রকাশ করেও ফেলতেন।

তাঁদের কথা শুনে ডাঃ রায় হাসতেন। বলতেন : ওই ছেলেটাকে এত স্নেহ করি কেন জানো? ও নিজের জন্যে কোনদিন প্রার্থী হয়ে আসেনি। যতবারই এসেছে, অন্যের জন্যে উমেদারি করে গেছে। ওকে ভালোবাসব না তো কাকে ভালোবাসব বলো? আমার আশেপাশে যারা দিনরাত ঘুর ঘুর করে তাদের সকলকেই তো আমি চিনি! অজিত তাদের থেকে অনেক উঁচু দরের মানুষ।

এবারে কারফিউ কবলিত ১৯৪৬ সালের কলকাতার সেই রোমহর্ষক রাতটির কথা বলি।

অজিতবাবু যে যে-কোনও মানুষের চলা-বলা হুবহু নকল করতে পারতেন সে কথা আগেই বলেছি। এর শুরু সেই কিশোর বয়েস থেকেই। অজিতবাবু তখন সিমলা স্ট্রিটের ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ক্লাস এইটে পড়েন। সেই সময় ওঁদের স্কুলে একবার অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী।

চিত্তরঞ্জন সেই সময়ে ছিলেন খ্যাতির তুঙ্গে। তিনি যে শুধু কৌতুক-অভিনেতা ছিলেন তাই নয়। কাহিনীকার এবং চিত্র-পরিচালক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর প্রথম ছবি 'বরের বাজার' ছিল হাসির একখানি অ্যাটম বোমা। যে সময়ে কলকাতা শহরে ক'জন গ্র্যাজুয়েট আছে তা আঙুলে গুনে বলা যেত, সেই সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাস করেছিলেন। কোনওরকম মেক-আপ ছাড়াই তিনি বাহান্ন রকমের অভিব্যক্তি দেখাতে পারতেন। তখনকার পত্র-পত্রিকায় তাঁর সেই সব অভিব্যক্তি ছাপা হতো। তার মধ্যে বিখ্যাত ছিল 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা', 'ন'কড়ির নাট্য-বিকার', 'বলবান জামাতা' ইত্যাদি। ভদ্রলোক একটু স্থূলকায় ছিলেন। এমনিতে হাসি পাবার মতো চেহারা নয়, কিন্তু যখন হাস্য রস পরিবেশন করতেন তখন নিজেকে মুহূর্তে বিদ্ভুত-কিমাকার করে তুলতে পারতেন।

তা সেই চিত্তরঞ্জনবাবু সেবার ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে এসেছিলেন কমিক করতে। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি ছাত্রদের বললেন : এবারে তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে চালাক বলে নিজেকে মনে কর, সে একবার আমার সামনে এসো দেখি!

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস এইটের ছাত্র অজিত চাটুজ্যে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আর যে ভঙ্গিমায় এতক্ষণ চিত্তরঞ্জনবাবু হাঁটছিলেন ফিরছিলেন, হুবহু সেই ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হল।

অজিতবাবুর নকল করা ওই ভঙ্গি দেখে চিত্তরঞ্জনবাবু কয়েকটা মুহূর্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তারপরে হো হো করে হাসতে হাসতে অজিতবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : এতদিনে আমি আমার চ্যালা পেয়ে গেছি। আমি যখন এই পৃথিবীতে আর থাকব না তখন এই ছেলেটি আমার মতোই

আসর মাতাবে।

তা অজিতবাবু তারপর থেকে ইন্টারেস্টিং কোনও মানুষ দেখলে তার চলাফেরা ভাবভঙ্গি নিখুঁতভাবে নকল করতেন। ওঁদের পাড়ায় এক অদ্ভুতদর্শন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সারা শরীরটি ছিল অষ্টাবক্র মুনির মতো। হাত দুটো ল্যাললেলে, পা দুখানি ধনুকের মতো বাঁকা, তোবড়ানো মুখখানা বাংলার পাঁচের মতো, সব সময়ে ঠোটের কষ বেয়ে লাল ঝরে পড়ত। চার মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে তাঁর দশ মিনিট লাগত।

অজিতবাবু এই মানুষটির চলাফেরা হুবহু নকল করতে পারতেন। তা দেখে পাড়ার লোক হেসে কুটিবাটি হত। বাবা কিন্তু খুব রাগ করতেন। বলতেন : কোনও অক্ষম মানুষকে নিয়ে এইভাবে ক্যারিকেচার করা উচিত নয়। ওর কী দোষ বল! ঈশ্বর ওকে ওইরকম তৈরি করেছেন, সেটা ওর দুর্ভাগ্য।

সেই থেকে অজিতবাবু আর ওঁকে নিয়ে ক্যারিকেচার করতেন না। কিন্তু সেদিন রাত্রে বিদ্যাসাগর হস্টেল থেকে কারফিউর মধ্যে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে মিলিটারির চোখে ধুলো দেবার জন্যে ওই পন্থাটিই উৎকৃষ্ট বলে মনে হল অজিতবাবুর। সেইভাবেই ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে আসতে গিয়ে টর্চের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল তাঁর শরীরের ওপর। শোনা গেল মিলিটারির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার: হল্ট। হু কাম্‌স্ দেয়ার।

চিৎকারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ বুজে ফেললেন অজিতবাবু। মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন আর অপেক্ষা করতে লাগলেন একটি গুলির আওয়াজের জন্য।

ওই জড় প্রাণীটিকে দেখে মিলিটারির লোকেরা একটু হকচকিয়ে গেল। নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো তারা হিন্দি ভাষায়। তাদের সব কথা কানে আসছিল অজিতবাবুর, কিন্তু তিনি তার একটারও উত্তর দিচ্ছিলেন না। উল্টে মুখ দিয়ে অ্যা-অ্যা করে একটা বোবা কান্না প্রকাশ করছিলেন।

মিলিটারির লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে অজিতবাবুর সর্বাঙ্গ টেপাটেপি করে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হল যে এটা নেহাতই একটা জড় পদার্থ। এর দ্বারা ক্ষতির কোনরকম আশঙ্কা নেই।

তখন তারা বুটসমেত অজিতবাবুর শরীরে একটা লাথি মেরে বললে : যাও! ভাগো হিঁয়াসে!

কথাটা শুনে অজিতবাবু কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। একটু দম নিলেন। তারপর আবার তাঁর ন্যালবেলে শরীর নিয়ে সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটতে হাঁটতে সরকার লেনের দিকে এগোতে লাগলেন।

মিলিটারির টর্চের আলো কিন্তু তখনও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। সত্তর-আশী গজ ওইভাবে যাবার পর যখন আলোটা নিভে গেল তখন অজিতবাবু মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করলেন, তারপর যখন বুঝলেন তিনি সত্যিই বিপদমুক্ত, তখন একছুটে বাড়ির দরজায়।

এই নকলবিশির কল্যাণে অজিতবাবু সেদিন প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছিলেন।

এই ধরনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য অজিতবাবু যেমন নিজে বেঁচেছেন, তেমনি অনেককে বাঁচিয়েও দিয়েছেন। বোম্বাইয়ের বিবাহবিশারদ অভিনেত্রী রেখা এবং প্রয়াত চিত্রনায়ক বিনোদ মেহরা সেবার যখন অসহায় অবস্থায় গোপনে কলকাতায় পালিয়ে এলেন বিয়ে করার জন্যে, তখন অজিতবাবুর বুদ্ধির জোরেই তাঁরা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন।

সে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা।

অজিত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে লেখার শেষ কিস্তিটা শুরু করেই প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেলাম। আজ চল্লিশ বছর ধরে যে সম্পর্কটা সত্যি বলে জানতাম, এক মুহূর্তে সেটা মিথ্যে হয়ে গেল। আজকের আনন্দবাজার পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে স্বর্গত সংগীতসাধক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অজিতবাবুর সঙ্গে ভীষ্মদেবের নাকি কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। উনি তাঁর মাসতুত ভাই নন।

অথচ সারা জীবন অজিতবাবুর মুখ থেকে শুনে আসছি ভীষ্মদেব তাঁর কাজিন। শুধু ওঁর মুখ থেকেই বা কেন, ওঁর সঙ্গে যখন আলাপ হয়নি, সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রূপমঞ্চ' পত্রিকায় কালীদাশরই লেখা একটি আর্টিকেলে পড়েছিলাম অজিত চট্টোপাধ্যায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মাসতুত ভাই। অজিতবাবুর মৃত্যুর পর সব পত্র-পত্রিকায় ওই সম্পর্কের কথাটিই ছাপা

হয়েছে। অথচ সেই পঞ্চাশের দশকে রূপমঞ্চ, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ ইত্যাদি পত্রিকায় ওই সম্পর্কের কথা যখন লেখা হয়েছে তখনও ভীষ্মদেব জীবিত আছেন। তিনি সেদিন কোনও প্রতিবাদ যে কেন করেননি তা বুঝতে পারছি না।

অজিতবাবুর মুখে এই সম্পর্কের কথাটা এতবার শুনেছি যে কখনও মনে হয়নি, উনি গুল দিচ্ছেন। চল্লিশের দশকে ভীষ্মদেব যখন গান-বাজনা ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরি আশ্রমে চলে গেলেন তখন অজিতবাবুর সে কী আক্ষেপ! কাঁদো কাঁদো মুখে প্রায়ই বলতেন : ভীষ্মদা এটা যে কেন করলেন!

কয়েক বছর পরে ভীষ্মদেব ফিরে এলেন পণ্ডিচেরি থেকে। অজিতবাবুর তখন সে কী উল্লাস! ওই সময়ে ভীষ্মদেবের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন অজিতবাবুই। সেই সময় ভীষ্মদেব পুনরায় সংগীতজীবনে ফিরে আসবেন কি না, সে ব্যাপারে ইতস্তত করছিলেন। তবে তাঁকে পুনরায় সংগীত জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার কমল ঘোষ মশাইয়ের। ভীষ্মদেব ওঁদেরই কোম্পানির শিল্পী ছিলেন। কমলবাবু যদি নাছোড়বান্দার মতো ভীষ্মদেবের পেছনে লেগে না থাকতেন তবে পুনরায় সংগীত জীবনে ফেরা বোধহয় ভীষ্মদেবের পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ আমি যখন ভীষ্মদেবের সঙ্গে কথা বলি, তখন বুঝতে পেরেছিলাম ভীষ্মদেব শুধু সংগীত সম্পর্কেই নয়, জীবন সম্পর্কেও সব ইন্টারেস্ট হারিয়ে বসে আছেন।

কমল ঘোষের প্রচেষ্টায় ভীষ্মদেব আবার যখন সংগীত জীবনে ফিরে এলেন তখন অজিতবাবুর সে কী উল্লাস! ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিতে দিতে বলেই ফেললেন : কমল একটা কাজের মতো কাজ করল বটে! ওর পায়ের ধুলো নিতে হয়।

আজ তাই মনে হচ্ছে, ভীষ্মদেবের সঙ্গে অজিতবাবুর এমন কোনও সম্পর্ক ছিল যা রক্তের মূল্যে বিচার করা উচিত নয়। সে সম্পর্ক বোধহয় রক্তের চেয়েও অনেক বড়।

যাই হোক, পুনরায় অজিত-কাহিনীর মূল স্রোতে ফিরে আসা যাক।

অজিত চট্টোপাধ্যায়কে যে রঙ্গলাল বলে ডাকতাম তার বহুবিধ কারণ আছে। যে কোনও জায়গা, যে কোন পরিবেশে অজিতবাবু সবাইকে রঙ্গতামাশায় মাতিয়ে রাখতেন। ছেলে-বুড়ো সবাইকে একত্রে অনাবিল আনন্দ দিতে পারতেন। একবারের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের কথা বলি।

উল্টোরথের কর্ণধার প্রসাদ সিংহের শ্বশুরমশাই তুলসীরাম মিত্র থাকতেন কৈলাস বসু স্ট্রিটে মহাকালী পাঠশালার পাশের বাড়িতে। ওই বাড়ির সঙ্গে সিনেমা শিল্পের একটা যোগাযোগও ছিল। তুলসীবাবুর দাদা ভক্তরাম মিত্র 'মিচকে পটাশ' নামে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটা কার্টুন ছবি তৈরি করেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের হয়ে। ১৯৫১ সালে ওই ছবিটি নিউ থিয়েটার্সের 'পরিত্রাণ' ছবির সঙ্গে চিত্রা সিনেমায় (বর্তমান মিত্রা) মুক্তি পেয়েছিল।

তুলসীবাবু নিজে সিনেমা করতেন না, কিন্তু বাংলা সিনেমার একজন অত্যন্ত মনযোগী দর্শক ছিলেন। ভদ্রলোক একেবারে মাটির মানুষ। পৃথিবীর সব কিছুই তিনি ভালো চোখে দেখেন। যে বাংলা ছবি এক সপ্তাহও চলেনি, কেউ দেখতে যাচ্ছে না, তাও উনি দেখতে যেতেন। আর দেখার পর সব ছবিকেই ভালো বলতেন। হিন্দি ছবি একদম দেখতেন না। যত কুৎসিত বাংলা ছবিই হোক, উনি দেখতে যেতেন। আর দেখে ভালো বলতেন।

একবার তুলসীবাবুকে বলেছিলাম : বলেন কী মেসোমশাই! ওই ছবিটা দেখে তো সবাই গালাগালি দিচ্ছে, আর আপনি বলছেন কি না ভালো হয়েছে?

উত্তরে একটু হেসে তুলসীবাবু বললেন : আহা, তোমরা ওইভাবে বিচার করো কেন! ভাবো তো, কত কষ্ট করে ওরা ছবিটা করেছে! এখন যদি খারাপ বলি ওরা মনে কষ্ট পাবে না?

এমনই একজন নির্বিরোধী মাটির মানুষ ছিলেন প্রসাদবাবুর শ্বশুর তুলসীরাম মিত্র।

তা ওই তুলসীবাবুর কৈলাস বসু স্ট্রিটের বাড়িতে আমাদের বছরে দু-তিনবার করে গেট টুগেদার হতো। কোনওবারে কেবল সাহিত্যিকদের নিয়ে, আবার কোনবারে সিনেমা-থিয়েটারের লোকজনদের নিয়ে। কিন্তু যাঁদের নিয়ে গেট টুগেদার হোক না কেন, একজন সব আসরেই স্থায়ী নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁর নাম অজিত চট্টোপাধ্যায়। আর অজিতবাবু সব আসরেই নিজেকে দারুণভাবে মানিয়ে নিতেন।

আর নেবেন নাই বা কেন! সেই ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যিকদের সঙ্গ করেছেন অজিতবাবু। একটা ঘটনার কথা বলি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অজিতবাবুকে খুব স্নেহ করতেন। একেবারে ঘরের ছেলের মতো। একবার শরৎচন্দ্র বললেন : অজিত, বড্ড তামাক খেতে ইচ্ছে করছে রে। তুই একটু তামাক সেজে দিবি?

অজিতবাবু বললেন : কেন দোব না শরৎদা।

এই বলে অজিতবাবু কল্‌কেতে তামাক সেজে আগুন দিয়ে গড়গড়ার নলটা শরৎবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। শরৎবাবু চোখ বুজে নলটা মুখে দিয়ে টানতে লাগলেন। দু-চারবার টানবার পর অজিতবাবু টক করে গড়গড়ার মাথা থেকে কল্‌কেটা নামিয়ে রাখলেন। শরৎবাবু আয়েসে চোখ বুজে নলে মুখ দিয়ে টেনেই যাচ্ছেন। কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে না দেখে বলে উঠলেন : কেমন তামাক সেজেছিস রে অজিত! এ যে ধোঁয়াই আসছে না।

অজিতবাবু ততক্ষণে কল্‌কেটা আবার গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিয়েছেন। বললেন : জোরে জোরে টানুন, না হলে ধোঁয়া আসবে কী করে।

শরৎবাবু তখন জোরে জোরে টানতে লাগলেন। ইতিমধ্যে অজিতবাবু কল্‌কেটা আবার তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে গড়গড়ার মাথার ফুটোটা চেপে ধরেছেন। ফলে শরৎবাবুর টানের দাপটে ধোঁয়ার বদলে গড়গড়ার জলে তাঁর মুখ ভরে গেল।

শরৎবাবু আচমকা মুখ ফিরিয়ে দেখেন কল্‌কের বদলে আঙুল চেপে রেখেছেন অজিত। শরৎবাবু থু থু করে তামাকমিশ্রিত জল মুখ থেকে ফেলতে ফেলতে বলে উঠলেন : দেখেছ হতভাগার কাণ্ড। আমার গোটা মুখটা তামাকের জলে ভরিয়ে দিলে গা! হ্যাঁ রে অজিত, বুড়োমানুষের সঙ্গে এরকম রসিকতা করতে আছে!

অজিতবাবু একহাত জিভ কেটে বললেন : বালাই ষাট, শরৎদা! আপনাকে যে বুড়ো বলে সে যেন জন্ম জন্ম বুড়ো হয়ে জন্মায়।

শরৎবাবু হাসতে হাসতে বললেন : ফাজিল ছেলে কোথাকার!

এমনি করে রবীন্দ্রনাথকেও একবার হাসিয়েছিলেন অজিতবাবু। সেটা ১৯৩৩ সাল। অজিতবাবুর বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। ওই সময়ে একদিন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাইয়ের কাছে শুনলেন দমদমে 'উদয়ন' পত্রিকার অফিসে ওই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিল দে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। সংবর্ধনা জানাবেন শরৎচন্দ্র।

অজিতবাবু চারুবাবুর কাছে বায়না ধরলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। চারুবাবু বললেন : ওখানে কি ঢুকতে পারবি? বড্ড ভিড় হবে যে রে!

অজিতবাবু বললেন : সে আমি যেমন করে হোক ঢুকে পড়ব।

তা সেদিন সত্যিই খুব ভিড় হয়েছিল। আগে ঠিক হয়েছিল বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিতে সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেদিন এমন চড়া রোদ যে বাইরে বসা গেল না। ঘরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বসানো হল। অজিতবাবু যখন গিয়ে পৌঁছলেন তখন ঘরের মধ্যে তিল ধারণের জায়গা নেই। কী করা যায় এখন?

আগেই বলেছি অজিতবাবু ছোটবেলা থেকেই পশুপাখির ডাক হুবহু নকল করতে পারতেন। সেদিন সভায় ঢোকার জন্য সেই শক্তিটুকু কাজে লাগালেন। ভিড়ের পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে খেঁকি কুকুরের ডাক ডাকতে লাগলেন। পাগলা কুকুরের ভয়ে ভিড় সরে গেল। অজিতবাবু সেই ফাঁক দিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ে হাজির হলেন একেবারে রবীন্দ্রনাথের সামনে। তখনও তাঁর মুখে খেঁকি কুকুরের ডাক।

আচমকা ওইভাবে কুকুরের ডাক শুনে রবীন্দ্রনাথও চমকে উঠলেন। তারপর আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। চারুবাবুও ছিলেন সেখানে। অজিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন : ছেলেটি ভালো কমিক্ করতে পারে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে ও কিছু কৌতুক করে দেখাবে।

রবীন্দ্রনাথের সামনে সেই একবারই কৌতুক পরিবেশনের সুযোগ পেয়েছিলেন অজিতবাবু। তাঁর

কমিক স্কেচগুলি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। চারুবাবুকে বলেছিলেন : ওকে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে যেও। আমাদের ওখানকার ছেলেদের ওর কৌতুক ভালো লাগবে।

তা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আর সে সুযোগ হয়নি অজিতবাবুর। ওঁর প্রয়াণের পর বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে গেছেন। কৌতুক পরিবেশন করে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন।

তা সেবারে তুলসীবাবুর কৈলাস বসু স্ট্রিটের বাড়িতে আমন্ত্রিতের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। আমাদের উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ পত্রিকার কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে বাইরের মাত্র তিনজন। তাঁরা হলেন উত্তমকুমার, তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবী এবং অজিত চট্টোপাধ্যায়। প্রসাদদা ক'দিন আগে উত্তমবাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্রের মারফত। উত্তমবাবু আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। আমরা সবাই ঠিক করে রেখেছিলাম ওইদিন উত্তমবাবুর কাছে গান শুনতে চাইব।

অনুষ্ঠানের দিন সকালে প্রসাদদা উত্তমবাবুর ভবানীপুরের বাড়িতে টেলিফোন করে ওঁর আসার ব্যাপারটা কর্নফার্ম করে নিলেন। বললেন : আমি কি সন্ধেবেলা হেমেনকে পাঠিয়ে দেব তোমাকে আনতে?

উত্তমবাবু বলেছিলেন : তার দরকার কী! আমি তো আপনার শ্বশুরবাড়ি চিনি। নিজেই চলে যাব।

উত্তমবাবুর আসার কথা ছিল রাত আটটায়। কিন্তু রাত ন'টা পর্যন্ত তিনি না আসাতে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বিশেষ করে হেমেন। উত্তমবাবুব সঙ্গে যোগাযোগটা ওই করেছিল কি না।

পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠছে দেখে অজিতবাবু রঙ্গলাল রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রথমে লাগলেন হেমেনের পিছনে। সেই সময় আমরা ফটোগ্রাফারদের ফটো তোলার ক্যাপশন দিতাম 'ক্যামেরা ক্লিক করা' বলে। সেই ক্যাপশান সূত্রে অজিতবাবু বলতে লাগলেন : হেমেন মিত্র চিরকাল ক্যামেরা ক্লিক করিয়ে আজ নিজেই ক্লিকে পড়ে গেছে।

তাই শুনে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলাম। গুমোট ভাবটা কিছুটা কেটে গেল। তারপর শুরু হল ওঁর পুতুল নাচ। অবিকল পুতুলের মতো চোখ-মুখ হাত-পা স্টিফ করে রেখে উনি নাচ দেখাতে লাগলেন। তারই মধ্যে হঠাৎ সুতো ছিঁড়ে গেলে পুতুলের একটা হাত যে ভাবে মুখে এসে আঘাত করে সেটাও দেখালেন। তা দেখে বাচ্চার দল তো বটেই, আমরাও হেসে কুটিপাটি হতে লাগলাম।

রাত দশটার পর আমরা ধরেই নিলাম উত্তমবাবু আজ আর আসছেন না। ওঁর বাড়ির ফোনের লাইনটাও পাওয়া যাচ্ছে না। দারুণ খিদেও পেয়ে গেছে সবাইকার। ঠিক করলাম এবারে সবাই খেতে বসে যাব। এমন সময় উত্তমবাবুর গাড়িটা এসে দাঁড়াল রাস্তায়।

কী ব্যাপার? দেরি কেন? না, এখানে বেরোবার আগে উত্তমবাবুর বাথরুমে পা স্লিপ করে গেছে। ডাক্তার দেখিয়ে তবে আসছেন। মারাত্মক কিছু নয়। পা-টা সামান্য মচকে গেছে। ডাক্তার অবশ্য নিষেধ করেছিলেন আজ রাতে চলাফেরা করতে। উত্তমবাবু বলেছেন : প্রসাদদাকে কথা দেওয়া আছে। ওখানে আমাকে যেতেই হবে।

আমরা সবাই তাড়াতাড়ি উত্তমবাবু আর গৌরী দেবীর খাবার ব্যবস্থা করছি দেখে অজিতবাবু বলে উঠলেন : কী ব্যাপার! একটা আইটেম বাদ চলে গেল যে?

উত্তমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কী আইটেম?

প্রসাদদা আমাদের দেখিয়ে বললেন : এরা ভেবে রেখেছিল তোমার গান শুনবে। তা এত রাত হয়ে গেল যে—

উত্তমবাবু বললেন : তাতে কী হয়েছে। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং। নিয়ে আসুন হারমোনিয়াম। হয়ে যাক গান।

হারমোনিয়াম এল। উত্তমবাবু কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন গান শোনাতে। তাই দেখে গৌরী দেবী হাঁ হাঁ করে উঠলেন। আদুরে আদুরে গলায় বলে উঠলেন : ও কী! তুমি হাঁটু মুড়ে বসছ কেন? তোমার যে পায়ে ব্যথা!

তাই দেখে অজিতবাবু নাকি নাকি সুরে বলে উঠলেন : কেন দ্যায়লা করছ ভাই। হাঁটু মুড়ে গান গাইলে হাঁটুর ব্যথা য়ে সেরে যায় তা কি তুমি জানো না।

উত্তমবাবু গৌরী দেবীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে একখানা রবীন্দ্রসংগীত ধরলেন। শেষ করলেন, 'এই মোম জোছনায় অঙ্গ ডুবিয়ে' গানখানা দিয়ে। তাঁর গানের সঙ্গে অজিতবাবু সঙ্গত করতে লাগলেন একটি দেশলাইয়ের ওপর তাল দিতে দিতে। সেইসঙ্গে মুখে গুবগুবাগুব শব্দ করে একতারা বাজিয়ে। শেষ গানটার সঙ্গে আবার কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ। রঙ্গলাল অজিত চট্টোপাধ্যায়ের রঙ্গ-রসিকতার দৌলতে সেই সন্ধেটা দারুণ জমে গিয়েছিল।

অজিতবাবুর প্রথম অনুষ্ঠান রেডিওতে। গল্পদাদুর আসরে। তখন ওই আসর পরিচালনা করতেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। রেডিওর ইংরেজি অনুষ্ঠান চিলড্রেনস্ কর্নারেও অংশ নিতেন। পরে বাণীকুমার এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজিত রেডিওর অজস্র নাটকে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে। 'বিজয়া' নাটকে। এই যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরে রঙমহল মঞ্চে প্রচুর নাটকে অভিনয় করেছেন। ওঁর শেষ অভিনয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'জয় মা কালী বোর্ডিং' নাটকে।

সিনেমায় অজিতবাবুর প্রথম অভিনয় চারু রায় পরিচালিত 'রাজনটী বসন্তসেনা' ছবিতে। ১৯৩৪ সালে। তারপর থেকে অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার সংখ্যা প্রায় শ'চারেক তো হবেই। সব ছবিতেই কৌতুক চরিত্রে। কৌতুকের ব্যাপারে নিজের সহজাত মেধা তো ছিলই। পরে ভালো করে ট্রেনিং নিয়েছিলেন বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী ননী দাশগুপ্তের কাছে। বাংলা ছবি ছাড়াও হিন্দি ও তামিল ভাষার ছবিতেও অভিনয় করেছেন অজিতবাবু। ওঁর শেষ চিত্রাভিনয় উত্তমকুমার পরিচালিত 'দুই পৃথিবী' ছবিতে।

এবারে রেখা ও বিনোদ মেহ্রার গোপন বিবাহের ব্যাপারে অজিত চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথায় আসি।

একদিন সকালে অজিতবাবু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটি জরুরি চিঠি পেলেন বম্বে থেকে। হেমন্তদার সঙ্গে অজিতবাবুর পরিচয় সেই ১৯৩৫ সাল থেকে। তখনও হেমন্ত হেমন্ত হননি। জীবনযুদ্ধে লড়াই করা এক তরুণ গায়ক মাত্র। অজিতবাবু সেই সময়ে হেমন্তদাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। সেইসব দিনের কথা হেমন্তদা তাঁর সুদিনে ভুলে যাননি। ওঁদের বন্ধুত্ব যেমন আমৃত্যু অটুট ছিল, তেমনি অজিতবাবুর শেষ জীবনে যখন অজিতবাবু দারিদ্রপীড়িত, তখন তাঁকে নিয়মিত অর্থ যোগান দিয়ে গেছেন। এটা সাহায্য নয়, বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব কর্তব্য। বিনিময়ে হেমন্তদার যা কিছু ঝক্কি-ঝামেলা সব অজিতবাবু সামলেছেন।

আরও একজন অজিতবাবুকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। তবে তা অত্যন্ত গোপনে। তিনি হলেন বাংলা থিয়েটারের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাহায্যের কথা আমরা অর্থাৎ অজিতবাবুর ঘনিষ্ঠ দু-চারজন ছাড়া আর কেউ জানত না। সত্যবাবুর নিষেধ ছিল। সত্যবাবুর এই নিঃস্বার্থ বদান্যতা আমার চোখে তাঁকে মহান করে রেখেছে।

তা হেমন্তদা তাঁর চিঠিতে অজিতবাবুকে অনুরোধ করলেন যে, রেখা আর বিনোদ গোপনে কলকাতায় যাচ্ছে। দুদিন থাকবে। এর মধ্যে যেমন করে হোক ওদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ব্যাপারটা যেন একদম জানাজানি না হয়। তাহলে ওদের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

তা অজিতবাবুর অসাধ্য কাজ তো কিছুই নেই। কী কৌশলে যে উনি ওদের বিয়ে দিয়েছিলেন তাও আমাকে জানাননি। ওটা নাকি টপ সিক্রেট। তবে ঠিক দু'দিনের মধ্যে রেখা আর বিনোদ যে শুভকাজটি সেরে নির্বিঘ্নে বম্বে ফিরে গিয়েছিলেন সেটা জানি। রেখা আর বিনোদ দুজনেই এর জন্যে কৃতজ্ঞ ছিলেন অজিতবাবুর কাছে। পরে অবশ্য এ বিয়ে ভেঙে যায়। সে এক স্বতন্ত্র কাহিনী।

এরকম নিঃস্বার্থ উপকার অজিতবাবু সারা জীবনে অনেকের জন্যে করেছেন। তাদের কেউ মনে রেখেছে, কেউ মনে রাখেনি। তাঁর জন্যে অজিতবাবুকে কারও ওপর কোনদিন রাগ করতে দেখিনি। এমনই মালিন্যহীন ছিল তাঁর মন।

এতক্ষণ তো মানুষ অজিত চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বললাম। এবারে কৌতুকশিল্পী হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন তার একটি নমুনা পেশ করি।

তখনকার দিনে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান সেখানে হত। তেমনই এক অনুষ্ঠানে অজিতবাবু কৌতুক পরিবেশনের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তার আগে বেশ কয়েক মাস যাবৎ অজিতবাবু নতুন কোনও স্কচ তৈরি করতে পারেননি। পুরনো স্কেচগুলিতেই রঙচঙ চড়িয়ে পেশ করছিলেন। তার জন্যে তাঁর মনে বিশেষ খেদ ছিল।

সেদিনকার অনুষ্ঠানে আরও দুজন বড় শিল্পী গান গাইতে এসেছেন। তাঁদের একজন হলেন শচীনদেব বর্মন, অন্যজন পঙ্কজকুমার মল্লিক। সামনের সারিতে ওঁরা দুজন পাশাপাশি বসে আছেন। ওঁদের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে অজিতবাবুর মাথায় একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে গেল। উনি সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কেচ তৈরি করে সেই অনুষ্ঠানে পরিবেশন করলেন, যা আমার মনে হয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মূল স্কেচটি অনেক বড়। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো। আমি খুব ছোট করে সেটা বলছি।

তখনকার দিনে 'বেতার জগৎ' নামে অল ইন্ডিয়া রেডিওর একটি প্রোগ্রামসূচি প্রকাশিত হত। সেখানে পরবর্তী এক পক্ষে কে কী প্রোগ্রাম করবেন তা ছাপা হত। তা সেদিন সকালে শচীনদেব বর্মন 'বেতার জগৎ' হাতে পেয়ে দেখলেন যে তাঁকে দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম, যা তিনি কোনদিনও করেননি। আর তাঁর নামের পরেই আছে পঙ্কজ মল্লিকের নাম। তাঁকে দেওয়া হয়েছে পল্লীগীতি, যা তিনিও কোনদিন গাননি।

তা বেতার জগৎ-এ যখন ছাপা হয়েছে তখন সেটাকে সরকারি হুকুম বলে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ তা গাইতেই হবে। তড়িঘড়ি করে সেই সকালবেলা বেতার জগৎটি হাতে নিয়ে শচীনদেব ছুটলেন পঙ্কজ মল্লিকের সেবক বৈদ্য স্ট্রিটের বাড়িতে। বাড়ির বাইরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন : পঙ্কজ, পঙ্কজ আছ নি!

শচীনদেবের বাঙাল ভাষার ডাক শুনে ওপর থেকে পঙ্কজ মল্লিকের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল : কে?

শচীনদেব বললেন : আরে ভাই পঙ্কজ, আহ আহ, নিচে আহ। দেখ কী কাণ্ড হইছে।

হন্তদন্ত হয়ে পঙ্কজবাবু নিচে নেমে এলেন। শচীনদেব তাঁকে হাতের বেতার জগৎটি দেখিয়ে বললেন: দ্যাখ দ্যাখ এরা কী কাণ্ড করছে। তোমায় দিছে পল্লীগীতি আর আমারে রবীন্দ্রসংগীত।

পঙ্কজবাবু পত্রিকাটি ভালো করে দেখে বললেন : তাই তো, এ তো বড় ভাবনার কথা শচীন। এখন কী করা যাবে?

শচীনদেব বললেন : ব্যাতার জগৎ-এ যখন লিখছে তখন তো গাইতেই অইব। তা তুমি ভাই আমারে একহান রবীন্দ্রসংগীত তুলায়ে দাও! আমি তোমারে একহান পল্লীগীতি তুলায়ে দিতেছি।

এরপর শুরু হল উভয়ে উভয়কে গান শেখানোর পালা। পঙ্কজবাবু হারমোনিয়ামের রিড টিপে ধরে বললেন : নাও শচীন ধরো। 'ডাকবো না ডাকবো না—'

শচীনদের কানে হাত দিয়ে ধরলেন : আরে ডাকবো নাহা ডাকবো নাহা—

এইভাবে ঘণ্টা দুই ধরে কসরৎ করার পর শোনা গেল পল্লীসুরে রবীন্দ্রগীতি আর রবীন্দ্রসুরে পল্লীগীতি।

দর্শকরা অনুষ্ঠান শুনে হেসে আকুল। সব থেকে বেশি আকুল পাশাপাশি বসে থাকা শচীনদেব আর পঙ্কজকুমার। হাসতে হাসতে দুজনে দুজনের গায়ে ঢলে পড়তে লাগলেন।

অজিতবাবু এই অনুষ্ঠানে কেবল সুরের কারিকুরিই দেখাননি, সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন শচীনদেবের সেই দুলে দুলে হাঁটা চলা, আর পঙ্কজ মল্লিকের নানা ম্যানারিজম্। এই স্কেচটির কোনও রেকর্ড বেরিয়েছিল কি না আমি জানি না। না থাকলে বুঝতে হবে আমরা কৌতুক শিল্পের এক অমূল্য জিনিস হারিয়েছি।

অজিতবাবুর এই স্কেচটি আমি বহু অনুষ্ঠানে শুনেছি। শেষ শুনেছি মেট্রো সিনেমায় আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে। সেবারে শচীনদেব ছিলেন না, কিন্তু দর্শকাসনে পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন। স্কেচের মাঝখানে হাসতে হাসতে প্রথম সারি থেকে উঠে একেবারে পেছনের সারির পেছন দিকে এসে দাঁড়ালেন। তাই দেখে জহর গাঙ্গুলি এসে তাঁকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন: তুমি না থাকলে অজিত কমিক করার জোর পাবে না। হয়তো নতুন কিছু যোগ করতেও পারে।

সেই অনুষ্ঠানে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ও উপস্থিত ছিলেন প্রধান পুরোহিত হিসেবে। 'উল্টোরথ পুরস্কার' তাঁর হাত দিয়েই বিতরিত হয়েছিল। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে অজিতবাবুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

ওই অনুষ্ঠানে অজিতবাবু যে কেবল ওই স্কেচটিই পরিবেশন করেছিলেন তা নয়, বিভিন্ন পশুপাখির ডাকের মধ্যেও যে শাস্ত্রীয় সংগীত লুকিয়ে থাকে তা দেখিয়েছিলেন। বেড়ালের ল্যাজে পা পড়লে অথবা কুকুরকে ঢিল মারলে যে আওয়াজ বেরোয় তার সবগুলিই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক-একটা টুকরো।

এই প্রতিভার কারণে কোনও সরকারি অথবা বেসরকারি পুরস্কার অজিতবাবু পেয়েছেন কি না তা আমার জানা নেই। এ নিয়ে আমার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। বছর চারেক আগে বিখ্যাত রসসাহিত্যিক পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসুর জন্মশতবর্ষে আমার স্নেহভাজন দেবাশিস চাকী যখন তাঁদের ঐকতান গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিজন থিয়েটারে 'বিরিঞ্চিবাবা' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করলেন তখন আমার পরামর্শে তাঁরা রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ আর রসশিল্পী অজিত চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অজিতবাবু সেই অনুষ্ঠানে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

আর এখন বন্ধুবিচ্ছেদে আমার কাঁদবার পালা। যদিও ধরে নিচ্ছি রঙ্গলাল অজিত চট্টোপাধ্যায় এখন হয়তো সুরলোকের ইন্দ্রসভায় দেবশিশুদের সামনে পরিবেশন করছেন তাঁর সেইসব দমফাটা হাসির স্কেচগুলি, যা শুনে এই নরলোকের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এতকাল অনাবিল আনন্দ পেয়ে এসেছেন। এখন এই ভাবনা ছাড়া আর কীভাবেই বা তাঁর আত্মাকে শান্তি দিতে পারি।

অরুন্ধতী দেবী

রূপাঞ্জলি পত্রিকার বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যেই আমি প্রথম অরুন্ধতী দেবীর বাড়িতে যাই। সেটা ১৯৫২ সালের কথা। নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিটা নিয়ে তখন বাজারে ভীষণ হইচই। তার চেয়েও বেশি হইচই ওই ছবির নতুন নায়িকা অরুন্ধতী মুখার্জিকে নিয়ে। ওরকম রূপসী মহিলা তার আগে ফিল্মে কেউ আসেননি।

তা অরুন্ধতী দেবীর বাড়িটা কোন রাস্তায় ছিল সেটা এখন আর মনে করতে পারছি না। আমি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। দক্ষিণ কলকাতার রাস্তাঘাট তখন আমার কাছে গোলকধাঁধার মতো। এখন যেমন সল্টলেকের রাস্তাঘাট। আমাদের রূপাঞ্জলির একজন ফটোগ্রাফার আমাকে অরুন্ধতী দেবীর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি চিনতেন। আমাদের গাড়িটা এঁকেবেঁকে নানা রাস্তা ধরে অবশেষে অরুন্ধতী দেবীর দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল।

তবে রাস্তাটা না চিনলেও বাড়িটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। সুন্দর ছিমছাম একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। মান্ডেভিলা গার্ডেনসে যে ধরনের বাড়ি দেখা যায়, সেইরকম। সর্বত্র রুচির ছাপ। শুনেছি ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রসংগীত গান। অত্যন্ত কালচার্ড। তা এইরকম একটি রুচিশীল বাড়িতেই তো ওইরকম ভদ্রমহিলাকে মানায়।

কিন্তু অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে দেখা হল না। ফিল্মস্টারদের দেখা পাওয়া এত সহজ নাকি! দেখা করতে চাইলেই দেখা করতে হবে? রূপাঞ্জলি পত্রিকা থেকে এসেছি শুনে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ওঁর স্বামী প্রভাত মুখার্জি।

সেই প্রথম প্রভাতদাকে আমি দেখলাম। দীর্ঘদেহী মানুষ। পরনে প্যান্ট আর বুশশার্ট। মুখে পাইপ। একেবারে সাহেবি মেজাজ। পাইপটাকে দাঁতে কামড়ে মনযোগ দিয়ে আমাদের আমন্ত্রণপত্রটা পড়তে লাগলেন। আমার তখন বয়স অল্প। অরুন্ধতী মুখার্জিকে চাক্ষুষ করার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। ভেতরে যাবার দরজার পর্দাটা মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ছে। তারই ফাঁক দিয়ে চোরাগোপ্তা নজর চালিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম অরুন্ধতী দেবীর শাড়ির আভাস পাওয়া যায় কিনা!

আচ্ছা, উনি কি বাড়িতে শাড়ি পরেন, না হাউসকোট পরে থাকেন? সর্বক্ষণ রবীন্দ্রসংগীত মগ্ন থাকেন, না আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো সংসারের দেখাশোনা করেন? এইসব নানা বালখিল্য প্রশ্ন যখন মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, তখন প্রভাতদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উনি বললেন : ঠিক আছে। আপনাদের ইনভিটেশন আমি ওঁর কাছে পৌঁছে দেব। সম্ভব হলে উনি যাবেন। নমস্কার।

এই বলে প্রভাতদা আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। অরুন্ধতী দেবী বাড়িতে আছেন কি নেই সেটা বোঝা গেল না। জানা গেল না, উনি বাড়িতে থেকেও দেখা করলেন না, কিংবা প্রভাতদাই দেখা করতে দিলেন না কিনা।

প্রভাতদার এই অতি-শীতল ব্যবহার আমাকে মর্মাহত করেছিল। ওঁর সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনে। পরে যখন ওঁর সঙ্গে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তখন বুঝতে পেরেছি সেদিন আমি ওঁর চরিত্র একেবারেই অনুধাবন করতে পারিনি। ওঁর যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ সেটা একেবারেই বুঝতে পারিনি। ওই সাহেবি মেজাজ আর পোশাকের আড়ালে উনি যে একজন কট্টর বাঙালি সে পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রভাত মুখার্জি নামের মানুষগুলিকে ঈশ্বর বোধহয় অতিরিক্ত প্রতিভা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। রবীন্দ্র সমসাময়িক গল্পকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে আমরা আজও উল্লসিত হই। সিনেমাতেও তাঁর অনেক গল্প হয়েছে। দেবকী বসু তাঁর গল্প নিয়ে 'রত্নদীপ' ছবি করেছেন। সত্যজিৎ রায় করেছেন 'দেবী'।

আর এক প্রভাত মুখোপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার। ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতোই দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত

এক ঋষিতুল্য পুরুষ। বাইরে গম্ভীর, কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর রসের ফল্গুধারা। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতনেই থাকতেন। প্রয়োজন না পড়লে কলকাতায় আসতেন না। তাঁর অফুরন্ত রসবোধের একটি ঘটনা বলি।

আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার কর্ণধার প্রসাদ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা নিবেদিতা একবার মহাজাতি সদনের একটি অনুষ্ঠানে প্রভাতকুমারের সামনে তার অটোগ্রাফের খাতাটি মেলে ধরল স্বাক্ষরের আশায়। নিবেদিতা তখন খুবই ছোট। বছর দশেক বয়েস। প্রভাতকুমার তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি যে আমার সই নিতে এসেছ সেটা আমি অরুন্ধতী মুখার্জির স্বামী বলে তো?

নিবেদিতা কালচার্ড ফ্যামিলির মেয়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে : তা কেন হবে! আপনি তো রবীন্দ্র জীবনীকার।

প্রভাতকুমার এবারে নিবেদিতার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন : যাক তুমি অন্তত জেনেশুনেই অটোগ্রাফ নিতে এসেছ। জানো, অনেকেই আমার কাছে সই নিতে আসে অরুন্ধতী মুখার্জির স্বামী ভেবে।

এই রসময় পুরুষটির সামনাসামনি হবার সৌভাগ্য আমার কয়েকবার হয়েছিল। নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প' ছবির শুটিং হয়েছিল বোলপুরে। সেই উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল সেখানে। আমরা ছিলাম ট্যুরিস্ট লজে। প্রভাতকুমার এর কাছাকাছিই একটি বাড়িতে থাকতেন। সকালে মর্নিং ওয়াক করবার সময় দেখতে পেতাম তিনি তাঁর বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন। দূর থেকে তাকে দেখে মনে হত দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ।

একদিন সাহস করে তাঁর সামনাসামনি হয়েছিলাম। পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। উনি বসতে বলেছিলেন। কিছুক্ষণ কথাও বলেছিলেন। দূর থেকে যে মানুষটিকে গম্ভীর মনে হত, কাছাকাছি হয়ে বুঝেছিলাম তিনি তা নন। অত্যন্ত সদালাপী, মিষ্টভাষী।

রবীন্দ্রনাথের সামনাসামনি বসবার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি। ছাত্রজীবনে দূর থেকে তাঁকে একবার দেখেছিলাম। তিনি মেদিনীপুর গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করতে। প্রভাতকুমারের সামনাসামনি বসতে পেরে আমি রবীন্দ্রনাথের সামনে না বসার দুঃখটা কিছুটা ভুলতে পেরেছিলাম।

আমাদের প্রভাতদা, অর্থাৎ অরুন্ধতী দেবীর স্বামীও একজন কৃতী পুরুষ। এককালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর জাঁদরেল কর্মকর্তা ছিলেন। উনি যখন ঢাকা স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর ছিলেন তখন নাকি সাহেবেদের খুশি করবার জন্যে বন্দেমাতরম গানের একখানা রেকর্ড পা দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে রটনা করে দেওয়া হয়েছিল। পার্টিশনের পর কলকাতা স্টেশনে বদলি হয়ে আসার পর তা নিয়ে প্রভাতদাকে কিছুটা অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। পরে তদন্ত করে দেখা গেছে কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ঈর্ষাবশত ওই গুজবটি রটিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনায় প্রভাতদা মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। অনেককাল পরে আমাকে বলেছিলেন : সাহেবদের আন্ডারে চাকরি করতাম বলে কি আমি একটা পশু বনে গিয়েছিলাম নাকি? বন্দেমাতরম্ গানের মর্যাদা কী তা আমি বুঝি না যে এই গানের রেকর্ড দু'পা দিয়ে ভাঙব! উল্টে বরং বলতে পারি আমার পিরিয়ডে ঢাকা স্টেশন থেকে রবীন্দ্রনাথ কি ডি এল রায়ের দেশাত্মবোধক গান যত বেজেছে, কলকাতা স্টেশন থেকেও তত বেজেছে কিনা সন্দেহ। কতকগুলো ব্রুট মিথ্যে মিথ্যে একটা বদনাম রটিয়ে দিলেই হল। চাকরির পরোয়া আমি করি না, কিন্তু মিথ্যে বদনাম নিয়ে চাকরি ছাড়তে যাব কেন?

প্রভাতদা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র পরিচালনায় হাত দিয়েছিলেন এবং সেখানেও তিনি দারুণভাবে সাকসেসফুল। ১৯৫৬ সালে 'মা', ১৯৫৭ সালে 'মমতা', ১৯৫৯ সালে 'বিচারক' এবং ১৯৬০ সালে 'আকাশ পাতাল' নামে চারখানা বাংলা ছবি করেছিলেন। চিত্র-পরিচালনায় যে তিনি কত সিদ্ধহস্ত তা ওই চারটি ছবিতেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। 'মা' ছবির একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। অরুন্ধতী দেবী

নায়িকা আর অসিতবরণ নায়ক। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। ওঁদের অন্তরঙ্গ দৃশ্যের একটু আভাস দিয়েই দৃশ্যান্তরে চলে গেলেন পরিচালক। ক্যামেরা তখন একটু আগে চালিয়ে দেওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের ওপর। গান শেষ হয়ে গেছে কিন্তু রেকর্ড ঘুরেই যাচ্ছে, তোলবার কেউ নেই। এই অতি অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখানোর জন্যে পরিচালককে বেডরুম পর্যন্ত যেতে হয়নি। এমনই ছিল তাঁর রুচিবোধ এবং রসবোধ। এই চারটের মধ্যে কোন্‌টা মনে নেই, একটা ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল। বোধহয় 'বিচারক'।

কেবল নিজের মাতৃভাষা বাংলায় কেন, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি, ভোজপুরি, অসমিয়া ইত্যাদি যে ভাষাতেই তিনি ছবি করেছেন তা রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে। এই রেকর্ড সম্ভবত আর কোনও চিত্র পরিচালকের নেই।

না, আলোচনাটা বড় একমুখি হয়ে যাচ্ছে। কেবলই প্রভাতদার পেছনে দৌড়োচ্ছি। যাঁকে নিয়ে লিখতে বসা সেই অরুন্ধতী দেবীর কথাতে সনিষ্ঠ হওয়া যাক। আর অরুন্ধতী দেবীর কথা বলতে গেলে তো প্রভাতদার কথা বারে বারেই আসবে। এত তাড়াহুড়োর কী আছে।

অরুন্ধতী দেবীকে পুরোপুরি ভাবে জানতে গেলে তাঁকে একেবারে শৈশব থেকে জানতে হবে। কারণ তাঁর চরিত্রের সাংস্কৃতিক গঠনটা একেবারে শিশুকাল থেকেই তৈরি হয়েছিল। আর সেটা জানতে গেলে আমাদের অন্য একটি রাষ্ট্রে যেতে হবে। সেই রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ।

হ্যাঁ, অরুন্ধতী দেবীর বাপের বাড়ি অবিভক্ত বাংলার বরিশালে। কিন্তু উনি জন্মেছিলেন ঢাকায়। বরিশালের গুহঠাকুরতা বংশ নানা কারণেই বিখ্যাত। অরুন্ধতী দেবার বাবা বিভূচরণ গুহঠাকুরতা ছিলেন একজন দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ। সেই সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবক। তিনি হিন্দুধর্মে ঘোরতর বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুদের সকল শাস্ত্র মন দিয়ে পড়েছিলেন। আর সেটা পড়েছিলেন বলেই সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি যতখানি নিবিষ্ট হয়ে আরতি দেখতেন, ঠিক ততখানি নিবিষ্ট হয়েই শুনতেন ব্রাহ্মসমাজে তৎকালীন মনীষীদের বক্তৃতা। শুধু তাই নয়, গির্জাতেও যেতেন, মসজিদেও যেতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মের উদার ব্যাপ্তিতে। বাবার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হয়েছিল অরুন্ধতী দেবীদের সকল ভাইবোনের মধ্যে। এই কারণে সেকালে অনেকেই তাঁদের ব্রাহ্ম ভাবতেন। পরবর্তীকালে কলকাতাতেও এই ভুল অনেকেই করতেন।

কেবল ধর্ম সম্পর্কেই নয়, সংগীত সম্পর্কেও অরুন্ধতী দেবীর বাবার ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত থেকে শুরু করে সব ধরনের গান যেমন বাড়িতে গাওয়া হত, তেমনি বাউল, কীর্তন শ্যামাসংগীত ইত্যাদিও গীত হত। বাড়ির সবাইকার মুখে মুখে সেই গান ফিরত। যে কারণে খুব ছোটবেলা থেকেই অরুন্ধতী দেবীর ভেতরে গানের একটা বনিয়াদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম জীবনে ঢাকায় যখন পড়াশোনা করতেন তখন মাত্র ছ'বছর বয়সে অরুন্ধতী দেবী একটি অনুষ্ঠানে 'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথের 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' গানখানা গেয়ে শোনান। ওই গানের জন্যে তিনি প্রচুর প্রশংসার সঙ্গে একটা মেডেলও পেয়েছিলেন।

অরুন্ধতী দেবীর মুখ থেকে এই ঘটনাগুলো শুনছিলাম নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর স্টুডিওতে একটা গাছের ছায়ায় দু'খানা চেয়ার পেতে মুখোমুখি বসে। একটু দূরেই দোতলার একটি ঘরে তপন সিংহ তাঁর ছবির এডিটিং-এর কাজে ব্যস্ত। অরুন্ধতী দেবী তখন তপনবাবুর ঘরণী। আমি গিয়েছিলাম তপনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। উনি ব্যস্ত আছেন দেখে অরুন্ধতী দেবীর কাছে তখন তাঁর ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম।

অরুন্ধতী দেবীকে তখন আমি বৌদি বলে ডাকি। তার আগে উনি যখন প্রভাত মুখার্জির ঘরণী ছিলেন তখন ওঁকে মিসেস মুখার্জি বলে ডাকতাম। তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা তখন ওঁর সঙ্গে ছিল না। মৌখিক পরিচয় ছিল মাত্র। দেখা হলে একটু হেসে 'ভালো?' বলে চলে যেতেন। কী ভালো, কার ভালো, সেটা বুঝতে পারতাম না। উনি কি আমি ভালো আছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, অথবা মেক-আপ নেবার পর ওঁকে ভালো দেখাচ্ছে কিনা-সেটা জানতে চাইলেন—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াতাম নিজের মনে।

অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে পরিচয়টা গাঢ় হল 'পুষ্পধনু' ছবির আউটডোরে গিয়ে। ওই ছবির পরিচালক

ছিলেন সুশীল মজুমদার আর প্রযোজক ছিলেন আমাদেরই এক ডিস্ট্রিবিউটার বন্ধু পাঁচু বসাক। উত্তমবাবু ছিলেন ওই ছবির নায়ক। পুষ্পধনুর ওই আউটডোরে তে-রাত্তির কাটাবার পর দেখলাম অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। উনি মাঝে মাঝে গল্পগুজব করেন আমার সঙ্গে। নিজের জীবনের দু-একটা ছোট ছোট ঘটনার কথাও বলেন। কিন্তু সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখেন। শুধু আমার সঙ্গে কেন, কোন সাংবাদিকের সঙ্গেই অরুন্ধতী দেবীর হলায় গলায় ভাব আমি কোনদিন দেখিনি? ওঁর নাম তো অরুন্ধতী। উনি তাই দূর আকাশের তারার মতোই থেকেছেন চিরকাল।

আর এটা সেই প্রথম দিন থেকেই। কোন নতুন মহিলা ফিল্মে এলে সাংবাদিকদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেন পাবলিসিটি পাবার আশায়। কিন্তু অরুন্ধতী দেবী কোনওদিন তা করেননি। ফিল্ম সংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানে ওঁকে কদাচিৎ দেখা যেত। আমি রূপাঞ্জলি পত্রিকার অনুষ্ঠানে ওঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম, সেখানেও উনি আসেননি। বরং কখনও কখনও উনি ফটোগ্রাফারদের রিফিউজ করেছেন ফটো তোলার ব্যাপারে। তেমন একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকায়। আমাদের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলিতে কখনও বা অন্য নায়কের সঙ্গে জোটবদ্ধ অবস্থায়, আবার কখনও বা বিভিন্ন মেক-আপ এবং অভিব্যক্তিতে নায়িকাদের নানা ভঙ্গিমায় ছবি ছাপা হত। ফটোগ্রাফাররা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সেসব ছবি তুলে আনতেন। ছাপার পর পাঠকদের সেগুলি যে খুব ভালো লাগত তা তাঁদের পাঠানো চিঠিপত্রের বহর দেখে বুঝতে পারতাম।

সেবারে কোন ফটোগ্রাফার মনে নেই, বোধহয় হেমেন মিত্রই হবে, অরুন্ধতী দেবীকে রাজি করিয়ে এল আউটডোরে গিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি তুলবে বলে। একেবারে ডেট-টেট ঠিক করে এসেছে। মেক-আপম্যানকেও খবর দেওয়া হয়ে গেছে।

ঠিক তার পরের দিনই প্রসাদ সিংহের নামে বাহক মারফত একটি চিঠি এল প্রভাত মুখার্জির কাছ থেকে। প্রভাতদা চিঠিতে সবিনয়ে জানিয়েছেন, অরুন্ধতী দেবী একজন সম্ভ্রান্ত এবং সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলা। যে ধরনের ছবি আমাদের ফটোগ্রাফার তুলতে চাইছেন তাতে তাঁর আপত্তি আছে। ফটোগ্রাফার নাছোড়বান্দার মতো বার বার অনুরোধ করাতে তিনি রাজি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছেন এতে তাঁর সুনামের হানি ঘটবে। তাই তিনি রাজি নন। এর জন্যে যেন তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

চিঠিটা পড়ার পর আমরা প্রায় সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ছবি তোলার আগেই অরুন্ধতী দেবী কী করে ধরে নিলেন যে তাঁর অসংস্কৃতিমূলক ছবি তোলা হবে। এ নিশ্চয় প্রভাতদার প্ররোচনা।

প্রসাদদা ধীর স্থির শান্তভাবে বললেন : তোরা এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন আমি বুঝতে পারছি না। অরুন্ধতীর ইচ্ছে, সে যদি ছবি তুলতে দিতে না চায় তবে তোরা তো তার ওপর জোর খাটাতে পারিস না। ব্যাপারটা ভুলে যা।

হ্যাঁ, আমরা ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রসাদদা যে ভোলেননি, তার প্রমাণ পেলাম বছর তিনেক পরে।

প্রেস থেকে মেশিনে যে ছবির ফর্মাটা ছাপা হচ্ছে তার একটা ফাইল হাতে নিয়ে প্রসাদদা অফিস ঘরে ঢুকে বললেন : ছবিগুলো কেমন হয়েছে বল দিকি।

দেখলাম পুরো আট পাতা জুড়ে উত্তমকুমার আর অরুন্ধতী দেবীর রোম্যান্টিক মুডের ছবি। না, কোনও ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি নয়। এই তিন বছর ধরে প্রসাদদা উত্তম-অরুন্ধতী অভিনীত বিভিন্ন ছবির যত রোম্যান্টিক সিকোয়েন্স ছিল তার স্টিল ফটোগুলি সযত্নে জমিয়ে রেখেছিলেন। কোন ফটোগ্রাফারের সাজিয়ে-গুজিয়ে তোলা ছবিও এতখানি ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারত না। হ্যাট্স্ অফ টু প্রসাদদা।

আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে প্রসাদদার দিকে তাকালাম। প্রসাদদা একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন : মাথা গরম না করে এইভাবে কাজ করতে শেখ।

এই ছবির ফিচার ছাপা সম্পর্কে অরুন্ধতী দেবী আর প্রভাতদার কী রি-অ্যাকশন হয়েছিল সেটা নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে আপনাদের। সেটাও এক চমৎকারি ঘটনা। পত্রিকাটা বাজারে বেরোবার

তিন দিনের মধ্যে প্রভাতদা এসে হাজির হলেন আমাদের উল্টোরথ অফিসে। প্রসাদদার এহেন পরিকল্পনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। আর তারপর থেকে ওঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। এর আগে প্রভাত মুখার্জি পরিচালিত ছবিগুলির, যার সবগুলিরই নায়িকা অরুন্ধতী মুখার্জি, সেইসব ছবির স্টিল পাবলিসিটি অফিসার মারফত পাঠাতেন প্রভাতদা। এখন থেকে তিনি নিজে হাতে করে সেগুলি নিয়ে আসতে লাগলেন। অরুন্ধতী দেবী আগের থেকে অনেক বেশি কভারেজ পেতে লাগলেন উল্টোরথের পৃষ্ঠায়।

কথায় কথায় অনেকটা পিছিয়ে গেছি। চলুন আবার ফিরে যাই নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর স্টুডিওতে, যেখানে গাছের ছায়ায় বসে অরুন্ধতী বৌদি তাঁর ছোটবেলার গল্প আমাকে শোনাচ্ছিলেন।

'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' গান গেয়ে মেডেল পাবার প্রসঙ্গ তুলে অরুন্ধতী বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম : ওই ছ'বছর বয়সে একটা গান গেয়ে মেডেল পেয়ে আপনার খুব আনন্দ হয়েছিল নিশ্চয়?

বৌদি বললেন : আনন্দ তো হয়েইছিল, কিন্তু তার থেকেও বড় একটা জিনিস পেয়ে গিয়েছিলাম ভাই।

আমি বললাম : সেটা কী?

বৌদি বললেন : সেটা এক বিচিত্র অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম বা গভীরতা বোঝার বয়স তো তখনও হয়নি। কিন্তু ওই 'গ্রামছাড়া' আর 'রাঙামাটি' শব্দ দুটো আমাকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে গেল। ভাবতে লাগলাম গ্রামের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে ওই রাঙামাটির পথটা কোথায় গিয়ে মিশেছে? সেখানে কি পাহাড় আছে? না আকাশ নেমে এসেছে মাটির বুকে? অথবা একটা গভীর বনের মধ্যে পথটা কোথায় হারিয়ে গেছে? এইরকম সব বিচিত্র ভাবনায় হারিয়ে যেতাম। ভাবতে ভাবতে সারা শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠত।

আমি বললাম : তাহলে ওই ছ'বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ আপনার কাঁধে ভর করেছিলেন বলুন!

বৌদি একটু হাসলেন। তারপর একটু লজ্জা পেয়ে বললেন : তাই হবে হয়তো! তবে আমার মনে হয় এটা আমার এক ধরনের অসুখ। গান তো এখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তবু এখনও যেদিন গান গাইতে বসি, আমার ভেতর থেকে যেন একটা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সারা শরীরটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বৌদির কথা শুনে বুঝলাম, ওঁর সারা সত্তায় রবীন্দ্রময়তা। তাই এরকম হয়।

অরুন্ধতী বৌদি সম্পর্কে ঠিক এই একই ধরনের অনুভূতি ছিল সন্তোষদার। সন্তোষদা অর্থাৎ সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ। আমাদের কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। সন্তোষদা তখন থাকতেন নিউ আলিপুরে তপন সিংহের পাড়ায়। তপনবাবুর কাছেই শুনেছিলাম, সন্তোষদা অনেক রাত পর্যন্ত ওঁদের বাড়িতে বসে রবীন্দ্রসাহিত্য আর রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আলোচনা করেন অরুন্ধতী দেবী আর তপনবাবুর সঙ্গে। মাঝে মাঝে অরুন্ধতী বৌদি গান গেয়ে শোনান। সে গানের অন্তর্নিহিত ভাববস্তু নিয়ে আলোচনা হয়। আবার তপনবাবু, অরুন্ধতী বৌদিও প্রায় সন্ধ্যাতেই সন্তোষদার বাড়ি আসতেন।

একদিন সকালে সন্তোষদার নিউ আলিপুরের বাড়িতে গেছি। সন্তোষদা কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ; আচ্ছা রবি, অরুন্ধতী সম্পর্ক তোমার অ্যাসেসমেন্ট কি?

একটু ভেবে নিয়ে আমি বললাম : অরুন্ধতী বৌদি অসাধারণ সুন্দরী, দুর্দান্ত অভিনেত্রী, এককালে ভালো গান গাইতেন, একজন ভালো চিত্র-পরিচালক।

সন্তোষদা বললেন : তুমি একটা ইডিয়ট! অরুন্ধতীকে তুমি একদম চিনতে পারনি। জানো, ওর ভিতরে রবীন্দ্রনাথ বাস করেন। কাল সারা সন্ধে ওদের বাড়িতে ওর গান শুনেছি। রাত্রে বাড়ি ফিরে ভালো করে ঘুমতে পারিনি। অনেক রাত পর্যন্ত কেঁদেছি।

কথাটা শুনে আমি শিউরে উঠলাম।

অরুন্ধতী দেবীকে যখন স্টুডিওর ফ্লোরে দেখতাম তখন মনে হত উনি যেন কোনও স্বতন্ত্রলোকের বাসিন্দা। স্টুডিওপাড়ার এই চাকচিক্য এবং উচ্ছলতার সঙ্গে যেন ওঁর কোনও সংযোগই নেই। হাসির কথা উঠলে অবশ্যই হাসতেন, কিন্তু সেই হাসির আওয়াজ কারও কানের পর্দায় তীব্রভাবে আঘাত করত

না। দুঃখের কথা শুনলে বিচলিত হতেন, তবে সেটা বোঝা যেত তাঁর দুই চোখের অভিব্যক্তিতে এবং কপালের মৃদু কুঞ্চনরেখায়। অথচ সকলের সঙ্গেই তিনি কথা বলতেন, গল্প করতেন, কিন্তু তাঁর পরিশীলিত ভঙ্গিটি ছিল দেখবার মতো। অযথা ঠাট্টা, ইয়ার্কি আর চপলতা প্রকাশ করতে তাঁকে আমি কোনওদিন দেখিনি। আমার অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য কারও অন্য কোনও ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা তার খবর আমি রাখি না।

অরুন্ধতী দেবীর এই যে পরিশীলিত ভঙ্গি, এই যে সংযত আত্মপ্রকাশ, এই গুণটি তাঁর শান্তিনিকেতন থেকে পাওয়া। আমার এই অনুমান যে যথার্থ তা অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বুঝতে পেরেছিলাম।

সেদিন বিকেলে নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওতে গাছের ছায়ায় চেয়ার পেতে বসে থাকা অরুন্ধতী দেবীকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে শেষ দুপুরের নিস্তেজ সূর্যের আলো ওঁর মুখের ওপর এসে পড়েছিল। দু-একটি গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ছিল ওঁর শাড়ির ওপর, দুরন্ত হাওয়া খেলা করছিল ওঁর একগুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল নিয়ে। ওঁকে যেন ঠিক মহারানির মতো দেখাচ্ছিল। সেই অপরূপ মুখখানার দিতে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা বৌদি, আপনার শিক্ষা-দীক্ষা সবই তো শান্তিনিকেতনে। তাই না?

চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি দিয়ে মুখের ওপর থেকে একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিতে দিতে অরুন্ধতী দেবী বলেছিলেন : আমার শৈশবের শিক্ষা যে ঢাকা শহরে, সে কথা তো আগেই বলেছি। আমার গান শেখার শুরুও ঢাকাতেই। গানের প্রথম পাঠ নিত্যগোপাল বর্মনের কাছে। তারপর কলকাতায় এসে শিখেছি সুরসাগর হিমাংশু দত্তর কাছে। তাঁর কাছে শিখেছি কাজি নজরুলের গান, অতুলপ্রসাদের গান এবং অন্যান্য বাংলা গান। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার শুরু শান্তিনিকেতনে যাবার পর। তখন আমার বারো বছর বয়স।

জিজ্ঞাসা করলাম : শুধু গান শেখবার জন্যেই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন নাকি?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : গিয়েছিলাম লেখাপড়া করতে। আমার ছোট পিসেমশাই অজিত চক্রবর্তী আর ছোট পিসিমা লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী শান্তিনিকেতনে ছিলেন শুরু থেকেই। গুরুপল্লীর প্রথম বাড়িটি ছিল ওঁদেরই। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ভালোবেসেই ওঁরা শান্তিনিকেতনে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন। তখন তো বেশি টাকা মাইনে দেবার ক্ষমতা শান্তিনিকেতনের ছিল না। ওই সামান্য টাকায় ওঁরা হাসিমুখে দিন কাটাতেন কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। ছোট পিসেমশাই আমাকে জোর করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান পড়াশোনা করার জন্যে। জানেন ভাই, পিসিমা আর পিসেমশাইয়ের সেই সময়কার কৃচ্ছ্রসাধনার কথা ভাবলে আজও চোখে জল আসে। শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনিই নিচু হয়ে আসে। এমনই ছিল ওঁদের রবীন্দ্র-অনুরাগ।

আমি বললাম : তা ওঁদের সেই রবীন্দ্র-অনুরাগ যে আপনার মনেও পুরোপুরি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন ওঁরা, সেটা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

আমার কথা শুনে অরুন্ধতী দেবী অল্প করে হাসলেন। 'হাসলে মুক্তো ঝরে' কথাটা এতদিন শোনাই ছিল। আজ স্পষ্ট অনুভব করলাম। অরুন্ধতী দেবীর ওই স্বল্প হাসির অবকাশে একরাশ অদৃশ্য মুক্তো যেন আমার চোখের সামনে ঝরে পড়ল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম : বৌদি, আপনার রবীন্দ্রসংগীত শেখার শুরু কি কলকাতাতেই?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : না না, কলকাতায় তখন তো রবীন্দ্রসংগীত আলাদা করে শেখানোর জন্যে কোনও স্কুলই তৈরি হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রসংগীত বলে আলাদা কোনও ঘরানাই তখনও তৈরি হয়নি। ওই গানকে তখন সবাই বলতেন 'রবিবাবুর গান'। আমি দু-একটা শিখেছিলাম শুনে শুনে। পরে পরীক্ষা দিতে গিয়ে বুঝেছিলাম কী ভুলভাল সেসব শেখা।

আমি বললাম : পরীক্ষা দেওয়া মানে?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনের যে সব ছাত্রছাত্রী গান শিখতে চাইতেন তাঁদের টোনাল কোয়ালিটির পরীক্ষা নেওয়া হত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের গান শুনতেন। উপযুক্ত মনে

করলে শেখানোর ছাড়পত্র দিতেন।

আমি বললাম : তাই নাকি? আপনিও তাহলে রবীন্দ্রনাথের সামনে পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : হ্যাঁ ভাই। সেই বারো বছর বয়েসে সে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমি বললাম : পাস করেছিলেন নিশ্চয়?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : পাস করতে কি আর পারতাম, যদি না শৈলজাদার দয়া হত!

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : আমার ছোট পিসেমশাই অজিত চক্রবর্তীর কথা তো আগেই বলেছি। তাঁরই আগ্রহে আমার শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করতে যাওয়া। তিনি চেয়েছিলেন আমি রবীন্দ্রসংগীত শিখি। সেইজন্যেই শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। শৈলজাদা অসম্ভব গুণী মানুষ। ওঁর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু আর হবে না।

তা সেদিন শৈলজাদা আমায় বললেন : তুমি গুরুদেবের কী গান জানো গাও দেখি। ওঁর সামনে গিয়ে গাইবার আগে যদি কোনও ভুলচুক থাকে ঠিক করে দিতে হবে তো!

আমি তখন একটাই রবীন্দ্রসংগীত জানতাম। ছোটবেলায় 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' গেয়ে মেডেল পেয়েছি বটে, তবে পরে আর সে গানটা গাইনি। একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। শুনে শুনে নতুন যে গানটা শিখেছিলাম, সেটা হল 'উজাড় করে লও হে আমার যা কিছু সম্বল'। গানখানা দেশ রাগের ওপর। সেটাই গাইলাম শৈলজাদার সামনে।

গান শুনে শৈলজাদা একটু হাসলেন বলে মনে হল। মুখে বললেন : তোমার গলা ভালো, গান তোমার হবে। তবে তোমার গাওয়া গানটার সুরে একটু ভুল আছে। সেটা ঠিক করে দিই এসো!

এই বলে শৈলজাদা আমায় ওই গানটাই শেখাতে বসলেন। শেখানো মানে একবারে নতুন ছাঁদে ঢেলে সাজিয়ে দিলেন। তখন বুঝতে পারলাম, কী ভুলভাল শিখেছিলাম! মাত্র একটা দুপুর সময়। সেদিন বিকেলেই গুরুদেবের সামনে গান গাইতে হবে। এইটুকু সময়ের মধ্যে অন্য ঢঙে গাওয়াটা সোজা নয়। কিন্তু সেদিন তাও সম্ভব হয়েছিল। কারণ মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা ছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমার গান শুনবেন। শুধু ওই গানটাই নয়। শৈলজাদা আরও একটা গান শিখিয়ে দিলেন। যদি গুরুদেব আর একখানা গান শুনতে চান। সে গানটা হল 'আমার কী বেদনা সে কি জানো।' বিকেল হবার আগেই দুখানা গোটা গান শিখে নিতে পেরে আমার সারা মনে কী আনন্দ! মনে মনে ভাবছি, কখন বিকেল আসবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ অরুন্ধতী দেবী থেমে গেলেন। তাঁর চোখ দুটি বোজা। মনে হল এই মুহূর্তে তিনি আর এখানে নেই। ফিরে গেছেন শান্তিনিকেতনে তাঁর সেই কৈশোরজীবনের মহা মুহূর্তটিতে।

একটু পরে চোখ মেলে চাইলেন অরুন্ধতী দেবী। একটু যেন লজ্জা পেলেন এই অকস্মাৎ নীরবতার জন্যে। সেই মুক্তো ঝরানো হাসি হেসে বললেন : অবশেষে এল সেই পরম লগ্ন। নাট্যঘরে গুরুদেবের সামনে 'উজাড় করে লও হে আমার' গানটি শুরু করবার কয়েক মুহূর্ত বাদেই তিনিও আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন। সে কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন তো বুঝিনি কী বিরাট মানুষ আমার সুরে সুর মিলিয়ে গাইছেন! ভাগ্যিস বুঝিনি! বুঝলে বোধহয় গলা দিয়ে এতটুকু স্বরও বেরোত না।

গান শেষ হল। গুরুদেব চুপ করে রইলেন। আমি একটু দমে গেলাম। কই, আর তো শুনতে চাইলেন না। তাহলে কি আমার গান ওঁর ভালো লাগেনি?

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় অন্তর্যামী ছিলেন। না হলে আমার মনের কথাটা বুঝে নিলেন কী করে। বললেন : আমার আর কোন গান জানো? জানা থাকলে শোনাও দেখি!

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে গাইলাম : 'আমার কী বেদনা সে কি জানো, ওগো মিতা সুদূরের মিতা'।

এই গানটা শেষ হবার পর গুরুদেব ফরমাশ করলেন : আরও একখানা গাও।

আমি বললাম : আর তো জানি না! এই গানটি আজই দুপুরে শৈলজাদা শিখিয়ে দিলেন, তাই গাইতে পারলাম।

গুরুদেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন : বলো কী! আজই শিখেছ? ভারি আশ্চর্য তো!

তারপর বললেন : তোমার গান হবে। কিন্তু আমাদের আশ্রমে থাকবে তো? কত মেয়ে আসে, গান শেখে, কী সুন্দর গায়, তারপর একদিন পাখির মতো ফুরুত করে উড়ে চলে যায়। তুমি যেন সেরকম কোর না। তুমি যেও না।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুন্ধতী দেবী বললেন : দুঃখের কথা কী জানেন ভাই, গুরুদেবের সেই আদেশ রাখতে পারি নি। একটা সময়ে মেয়েদের তো স্বামীর বাড়িতে চলে যেতেই হয়। আমাকেও চলে আসতে হয়েছিল শান্তিনিকেতন ছেড়ে।

স্বামীর বাড়ি মানে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে প্রভাতদার বিয়েটা 'লাভ ম্যারেজ' কি 'নেগোসিয়েশন ম্যারেজ' তা আমি জানি না। প্রভাতদার আদি নিবাস কোথায় তাও আমি জানি না। তবে প্রভাতদা যে দীর্ঘকাল অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর চাকরি নিয়ে ঢাকায় ছিলেন সেটা জানি। আর অরুন্ধতী দেবীরও যে শৈশবকাল ঢাকায় কেটেছে, সেটাও জানি। এই নিয়ে হয়তো দুইয়ে দুইয়ে চার করা যেতে পারত। কিন্তু সে চেষ্টা করব না। করাটা উচিতও হবে না।

পঞ্চাশের দশকে অরুন্ধতী দেবীর চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ১৯৫২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবির নায়িকা হিসেবে আমরা প্রথম অরুন্ধতী দেবীকে ছবির পর্দায় দেখতে পাই। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং নায়কের চরিত্রে ছিলেন বসন্ত চৌধুরি। এই দুই নবাগত শিল্পীকে নিয়ে তোলা 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিটির বাংলা এবং হিন্দি উভয় সংস্করণই সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই প্রথম ছবিতে অভিনয় করেই অরুন্ধতী দেবী বিশিষ্ট অভিনেত্রীর মর্যাদা পেয়ে গিয়েছিলেন।

অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের যোগাযোগ কীভাবে হয়েছিল তা বলতে পারব না। শুনেছি নিউ থিয়েটার্সের তৎকালীন চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় অরুন্ধতী দেবীর এই ছবিতে অভিনয় করতে আসার মূলে ছিলেন।

কিন্তু বিনয়বাবুর সঙ্গেই বা অরুন্ধতী দেবীর যোগাযোগ হল কী ভাবে? বিনয়বাবু সাহেবি ধাতের মানুষ। সর্বক্ষণ স্যুটেড-বুটেড। প্রভাত মুখার্জিও মেজাজের দিকে থেকে সাহেবি। মনে হয় এঁদের উভয়ের মধ্যে আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে নিউ থিয়েটার্সের যোগাযোগ।

সেটাই সম্ভব। নইলে অরুন্ধতী দেবীর পিতৃকূলের পক্ষ থেকে তাঁর পেশাদারি অভিনয় জীবনে বাধা দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এর আগে ১৯৪০ সাল নাগাদ অল ইন্ডিয়া রেডিওর পক্ষ থেকে অরুন্ধতী দেবীকে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন তাঁর মা বাধা দিয়েছিলেন। কারণ রেডিওতে গান গাইলে যত কম টাকাই হোক, কিছু সম্মানদক্ষিণা গ্রহণ আবশ্যিক ছিল। অরুন্ধতী দেবীর মা সেটাকেই পেশাদারবৃত্তি মনে করে বাধা দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের দিক থেকে ছবিতে অভিনয়ের জন্য যোগাযোগ একরকম অসম্ভব।

রেডিওতে প্রথম গান গাওয়ার প্রসঙ্গে অরুন্ধতী দেবী সেদিন বলেছিলেন : মা তো প্রচণ্ড আপত্তি তুললেন রেডিওতে গান গাওয়ার ব্যাপারে। তো শৈলজাদা পাল্টা যুক্তি দিলেন : আমরা তো সব সময়ে নেপথ্যেই থেকে গেলাম। গুরুদেবের গানের বিরাট ঐশ্বর্যলোকের খবর ক'জনই বা জানতে পারছে। তোমরা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা যদি মাঝে মাঝে রেডিওতে গাও, তাহলে তাঁর গানের সঙ্গে সকলের পরিচয় হবে। আমাদের তরফ থেকে এটার খুবই প্রয়োজন আছে।

শৈলজাদার এই কথা শোনার পর মা আর আপত্তি করেননি। সুরেশ চক্রবর্তীমশাই তখন রেডিওর কর্ণধার। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি আর সুবিনয়বাবু একটা ফিচার প্রোগ্রামে রবীন্দ্রসংগীত গাইলাম। এভাবে ফিচার প্রোগ্রামে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া সেই প্রথম। সকাল সাতটা থেকে সাতটা পনেরো এবং সন্ধেবেলা সাতটা থেকে আটটা অবধি রবীন্দ্রসংগীত প্রচারিত হত। মাসে দু'বার করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম করতাম আমি, সুচিত্রা, কণিকা, নীলিমা ও হেমন্তবাবু।

তা অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে যতবারই গল্প করতে বসেছি তার প্রত্যেকবারেই তিনি শান্তিনিকেতন আর রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেই কথাবার্তা বেশি বলতেন। আর সেইসব আলোচনায় এতই মগ্ন হয়ে থাকতেন যে তার মাঝখানে তাঁর অভিনয় জীবন প্রসঙ্গে জানবার কোন অবকাশই পাইনি। তপনবাবুর সঙ্গে বিবাহের সূত্রে তাঁকে বৌদি বলে ডাকতাম বটে, কিন্তু বাঙালিবাড়ির প্রচলিত অর্থের বৌদি তিনি কোনওদিনই ছিলেন না। ওই সূত্রে ঠাট্টা রসিকতার কোনও সুযোগ তিনি দিতেন না। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা করতেন কি না আমার তা জানা নেই। তবে আমি কোনওদিন করিনি।

এই প্রসঙ্গে প্রভাতদার সঙ্গেও কোনওদিন কথা হয়নি আমার। প্রথম প্রথম প্রভাতদার সঙ্গে কেবলমাত্র মৌখিক পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা হলের মালিকদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রভাতদার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল। প্রভাতদার মতো আমিও ছিলাম সেই আন্দোলনের শরিক। সেই সময়ে প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা আমরা একত্রে কাটাতাম। তাই নিয়ে অনেক মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। সে সব কথায় পরে আসছি।

ওই সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের বেশ কয়েক বছর আগেই প্রভাতদার সঙ্গে অরুন্ধতী দেবীর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। অরুন্ধতী দেবী তখন তপন সিংহের ঘরণী। কাজেই খুব ইচ্ছে থাকলেও শোভনতার খাতিরে প্রভাতদার কাছে অরুন্ধতী দেবী সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করত পারিনি। নইলে প্রভাতদার কাছ থেকে অরুন্ধতী দেবীর ছবিতে নামার প্রথম পর্বের অনেক কথাই যে জানা যেত, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

অরুন্ধতী দেবী যখন তপন সিংহের ঘরণী হয়ে এলেন তখন সেটা আমার কাছে হরিষে বিষাদ হয়ে দাঁড়াল। প্রভাতদাকে আমি ভালোবাসি, অতএব অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ আমার বিষাদের কারণ। আবার তপনবাবুর সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের পরিচয়। তা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হবে। সেই 'কাবুলিওয়ালা' ছবির সময় থেকে। তপনবাবু তখন টালায় ওলাইচণ্ডী রোডে থাকতেন। ওঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে।

তপন-অরুন্ধতীর এই বৈবাহিক সম্পর্ক আমার কাছে বিভিন্ন দিক থেকেই আনন্দের কারণ। অরুন্ধতী দেবী যে আদ্যন্ত রবীন্দ্র-সংস্কৃতিতে লালিত, সেটা তো সকলেই জানেন। তপনবাবুও ঠিক তাই। উনিও ঘোরতরভাবে রবীন্দ্র-কালচারের অনুবর্তী। কাজেই ওঁদের দাম্পত্যজীবন যে সুখের হবে এটা আমি জানতাম। তার চেয়েও বড় কথা, অভিনেত্রী হিসেবে অরুন্ধতী দেবীকে প্রভাতদা যতটা বিকশিত করতে পেরেছেন, তপনবাবু তার থেকে অনেক বেশি পারবেন। বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শকদের কাছে এটা একটা মস্তবড় প্রাপ্তি।

পরবর্তীকালে অরুন্ধতী দেবী যে চলচ্চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হলেন তার পিছনে তপনবাবুর উৎসাহ এবং সহযোগিতা অফুরন্ত। তপনবাবুর আশ্বাস পেয়েই যে প্রয়োজকরা অরুন্ধতী দেবীকে দিয়ে ছবি করাতে রাজি হয়েছিলেন এটাও সত্যি কথা। অরুন্ধতী দেবী প্রথম ছবি করেন বিমল করের 'খড়কুটো' উপন্যাসটা নিয়ে। ছবির নামকরণ করা হয়েছিল 'ছুটি'। নন্দিনী মালিয়া আর মৃণাল মুখার্জির মতো প্রায়-নতুন একজোড়া শিল্পী নিয়ে তোলা এই ছবি হিট্ করেছিল মুখ্যত তপন সিংহ-কৃত চিত্রনাট্যের কল্যাণে। অরুন্ধতী দেবী তখন পরিচালনায় নবাগত। ঘরে-বাইরে তাঁকে সর্বক্ষণ সাহস যুগিয়ে গেছেন তপনবাবু। একজন সংস্কৃতিমান স্বামীর উপযুক্ত কাজই বটে।

অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি' ছবির প্রযোজক কে ছিলেন মনে নেই। তবে ওঁর দ্বিতীয় ছবি 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমাদের এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথ মালেহোত্রা, যাঁকে আমরা মামাজি বলে ডাকি। মামাজি ছিলেন কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের হর্তা কর্তা বিধাতা। কলকাতা শহরে কাপুরদের দুটি চালু হোটেল আছে। একটি গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে মিনার্ভা হোটেল এবং তার সংলগ্ন অ্যাভেনটাইন বার। আর অন্য হোটেলটি বৌবাজার এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর জংশনে নিউ সেন্ট্রাল হোটেল। এই মিনার্ভা হোটেলে মামাজির অফিসঘরে আমার প্রায় নিয়মিত সান্ধ্য আড্ডা ছিল। পরবর্তীকালে প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের পর মামাজি যখন অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জিকে পুনরায় বিবাহ করেন তখন আমাদের সান্ধ্য আড্ডাটি আস্তে আস্তে ভেঙে যায়। আমাদের আড্ডার চেয়েও সুমিত্রাকে সঙ্গ দেওয়া যে মামাজির পক্ষে

অনেক বেশি জরুরি এটা আমরা তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলাম।

মামাজিদের কে এল কাপুর প্রোডাকসন্স তাঁদের প্রথম ছবি করান তপন সিংহকে দিয়ে। ছবির নাম 'আপনজন'। ফ্যানটাসটিক হিট্। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একটা ল্যান্ডমার্কও বলা যায় এই ছবিকে।

কিন্তু হোটেল-বাবসায়ী মামাজিরা হঠাৎ ছবি করতে এলেন কেন? তারও একটা ইতিহাস আছে। আর সে ঘটনাটি বড় মজার।

কাপুররা পঞ্চনদের দেশের লোক হলেও কলকাতা ওঁদের রক্তে মিশে গেছে। বাংলার সংস্কৃতিই এখন ওঁদের সংস্কৃতি। কে এল কাপুর হঠাৎ মারা যাবার পর রাজা, বিনোদ প্রমুখ নাবালকদের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ল তাঁদের মামা রবীন্দ্রনাথ মালহোত্রা, অর্থাৎ মামাজির ওপর। মামাজি নিজের ভবিষ্যৎ না ভেবে ভাগ্নেদের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে মেতে উঠলেন। সেই থেকে মামাজিই ওঁদের সব।

ভাগ্নেরা সাবালক হবার পর মামাজিদের জীবন কাটছিল হোটেল আর কাস্টিং-এর ব্যবসা নিয়ে। হঠাৎ ওঁদের কী খেয়াল হল, বাংলা ছবি করবেন। তা নিয়ে অনেক পরিচালকের সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু কাউকেই ওঁদের মনঃপূত হল না।

অবনী মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক মামাজিদের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তদ্বির-তদারক করতেন। এই অবনীবাবু এককালে অভিনয় করতেন। প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর চেহারার খুব মিল ছিল। ওই কারণে বড়ুয়া সাহেবের শেষ ছবি 'মায়াকানন' চিত্রে অবনীবাবুকে ডামি করে ছবি শেষ করতে হয়েছিল।

অবনীবাবু ছিলেন তপন সিংহের ভগ্নিপতি। তা মামাজিরা ওঁকে প্রায় প্রত্যহই বলতেন : কী মশাই, আপনি তো এক সময়ে অভিনয় করতেন, একজন ভালো ডিরেকটারের সন্ধান দিতে পারছেন না?

সেই অবনীবাবু একদিন বললেন : আমার শ্যালক ছবির ডিরেকশান দেন। আপনারা যদি চান তাহলে তাকে বলে দেখতে পারি।

মামাজি জিজ্ঞাসা করলেন : কী নাম তাঁর?

অবনীবাবু বললেন : তপন সিংহ।

শুনে মামাজি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন : ওরে বাবা! তিনি তো বিরাট বড় ডিরেকটার। তিনি কি রাজি হবেন আমাদের ছবি করতে?

অবনীবাবু বললেন : আমি বলে দেখতে পারি।

ক'দিন পরে অবনীবাবু প্রায় জোর করে তপনবাবুকে ধরে নিয়ে এলেন মিনার্ভা হোটেল। আলাপ করিয়ে দিলেন মামাজিদের সঙ্গে।

প্রথম আলাপেই মামাজি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন তপনবাবুকে। বললেন : আপনি যদি আমাদের জন্যে দয়া করে একটা ছবি করেন, তাহলে কত টাকা লস্ হতে পারে?

প্রশ্নটা শুনে তপনবাবু অবাক। বললেন : লস্ যে হবেই সে কথাটা আগে থেকে ধরে নিচ্ছেন কেন?

মামাজি বললেন : আপনি ছবি করলে নিশ্চয় লস্ হবে না। তবু আমরা ডার্ক সাইডটা জেনে রাখতে চাই।

তপনবাবু অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন : লাক্ যদি একেবারেই বিট্রে করে তাহলে বড় জোর লাখখানেক টাকা লস্ হতে পারে। তার বেশি কিছুতেই নয়।

মামাজি একটু নিরিবিলিতে ভাগ্নেদের সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে তপনবাবু, আমরা আপনাকে দিয়ে ছবি করাব, তবে আমাদের এক বছর সময় দিতে হবে। এক বছর পরে ছবির কাজ শুরু করবেন। কিন্তু আজই আপনার সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে চুক্তিটা সেরে ফেলতে চাই।

অনেকদিন পরে একটা সান্ধ্য আড্ডায় মামাজিকে প্রশ্ন করেছিলাম : ছবি শুরু করার জন্যে এক বছর সময় আপনারা নিলেন কেন? জ্যোতিষির মতে সময়টা কি খারাপ যাচ্ছিল নাকি আপনাদের?

মামাজি বললেন : তা নয়। আমরা ছবি শুরু করার আগে লস মেক-আপ করে নিতে চাইছিলাম।

আমি বললাম : সেটা আবার কী?

মামাজি বললেন : ওই এক বছর আমরা আমাদের দুটো হোটেলের হোয়াইট ওয়াশ আর ওয়াল পেন্টিংয়ের কাজ করাইনি। তাতে হাজার চল্লিশেক টাকা সেভ হয়েছিল। আমাদের পুরো ফ্যামিলির

রিক্রিয়েশন বাবদ বছরে হাজার পঞ্চাশেক টাকা বরাদ্দ ছিল। সেটা বাদ দিয়েছিলাম। এইভাবে আমরা লস্ মেক-আপ করে তারপর ছবি করতে নেমেছিলাম।

তপন সিংহের 'আপনজন' মামাজিদের প্রচুর পয়সা দিয়েছিল। ওঁরা খুব খুশি। তা সেই সতর্ক ব্যবসাদার মামাজি একদিন আমাকে বললেন : জানেন রবিবাবু, আমরা রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের ছবি করছি।

শুনে আমি আঁতকে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : ডিরেকটার কে?

মামাজি বললেন : অরুন্ধতী দেবী।

অরুন্ধতী দেবীকে নিয়ে তৃতীয় কিস্তির লেখা শুরু করার আগে একটু বেসুরো গান গাইতে হচ্ছে। ক'দিন আগে একটি নামবিহীন এবং ঠিকানাবিহীন চিঠি আমার কাছে এসেছে। সেই চিঠিতে কিছু অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে। পত্র যিনি লিখেছেন তিনি নিজেকে একজন পাঠক বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখার গঠন এবং প্রকাশের ভঙ্গি দেখে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে তিনি একজন পাঠিকা। তবে তিনি পাঠকই হোন আর পাঠিকাই হোন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মূল বক্তব্য হল তাঁর অভিযোগ সম্পর্কে।

অরুন্ধতী দেবী সম্পর্কে প্রথম কিস্তির রচনাটি পড়েই এই পত্রাঘাত। উনি লিখেছেন : আপনি মাঝে মাঝে আবেগের বশে আপনার লেখার মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করছেন। যেমন এবারে করেছেন প্রভাত মুখার্জি মশাইকে! আপনি লিখেছেন—'ওঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ'। উনি এখনও বেঁচে আছেন কি না জানি না। যদি থাকেন তবে আপনার লেখা পড়ে আপনাকে নিশ্চয়ই বাহবা দেবেন।

আমিও কিন্তু ওঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। অবশ্য তখন তিনি অরুন্ধতী-হারা। আপনার মতো আমারও ওঁকে দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল উনি খুব রুচিশীল ও সংস্কৃতিমনা। কিন্তু পরে বুঝেছি ওটা ছিল ওঁর খোলসমাত্র।"

এরপরে পত্রলেখক (অথবা লেখিকা) প্রভাত মুখার্জির নানা কুকীর্তির দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। সেইসব কুকীর্তি কেবল কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'মাহুত বন্ধু রে' ছবি করতে গিয়ে আসামে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বার্লিনে, 'মানিকজোড়ি' ছবি করতে গিয়ে ওড়িশায়, 'হব্বা খাতুন' ছবি করতে গিয়ে কাশ্মীরে যাঁদের নিয়ে প্রভাতদা কুকীর্তি করেছিলেন তাঁদের নাম-ধাম সহ বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। কলকাতার স্টুডিওপাড়া এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি।

চিঠির শেষ ছত্রে তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশও দিয়েছেন। বলেছেন, 'আপনার লেখা পড়ে মনে হয়, আপনি খুব সহজ, সরল। কিন্তু পৃথিবীটা তো তা নয়। আপনি হয়তো ভাবছেন, লেখার মধ্যে একজনের সামাজিক অবদানটাই বিচার্য। তাছাড়া আপনি যাঁকে যেভাবে দেখেছেন, সেই ভাবেই লিখছেন। আপনার মনের মণিকোঠায় যে যেমন ছাপ ফেলেছেন, তাই লিখছেন। তবে রক্তমাংসের মানুষকে দেবতা না করাই ভালো।

পত্রলেখিকার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। মানুষকে আমিও দেবতা বানাতে চাই না। ভালো-মন্দ সব কিছু মিশিয়েই আমি মানুষকে গ্রহণ করি। তবে আমি মানুষের মধ্যেই দেবত্বের অনুসন্ধান করি। দেবতাদের মধ্যে যে মহৎ গুণাবলী আছে, মানুষের মধ্যেই তার প্রতিফলন দেখতে চাই।

প্রভাতদার কিছু কিছু কুকীর্তির কথা আমি শুনেছি। তবে তার সত্যি মিথ্যে কখনও যাচাই করতে যাইনি। শুনেছি অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে প্রভাতদার বিচ্ছেদের পেছনেও নাকি এইরকম কোন ঘটনা আছে। তবে সেটাই আমার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। তা করতে গেলে ষোড়শ গোপিনীর সঙ্গে লীলাখেলার কারণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও তো দেবতার আসন থেকে সরিয়ে দিতে হয়। ওই একই অপরাধে শ্রীরাধাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়। মহাভারতের অনেক মহাপুরুষ মহানায়িকাকেও তো ঘৃণা করতে হয়। যা যখন পারিনি, তখন প্রভাত মুখার্জি নামক একজন ব্যক্তির প্রতি খড়্গাঘাত করার অধিকার আমার আছে কি?

তাছাড়া নর্দমার পাঁক ঘাঁটতে আমার রুচিতে বাধে। পৃথিবীর বাতাস এমনিতেই যথেষ্ট বিষাক্ত।

পাঁক ঘাঁটতে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তাকে বিষাক্ততর করার প্রয়োজন কী?

বরং আসুন না, সেই পাঁকের মধ্যে যে পদ্মফুলটি ফুটে আছে তার শোভা নিরীক্ষণ করি। তার গুণাবলী বিশ্লেষণ করি। সেটিকে তুলে নিয়ে দেবতার চরণে নিবেদন করি।

প্রভাতদার প্রসঙ্গে আমি সেই গুণাবলীরই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। তাঁর তোলা ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আনন্দ বোধ করেছি। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের সময় তাঁর সংগ্রামী ভূমিকার তারিফ করেছি। তাঁকে কোনওদিনই দেবতার আসনে বসাতে চাইনি। আমার কাছে প্রভাতদা তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তুচ্ছতা-মহত্ব, এমন কি জৈবিক ব্যাপার-ট্যাপার নিয়েই রক্তমাংসের একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ।

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের কথা যখন এসেই গেল তখন এই প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমার 'স্মৃতির সরণিতে' তো একজন শিল্পীর কর্মজীবনের প্রতি আলোকপাত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সেইসঙ্গে আমি তাঁর সময়, তাঁর পরিবেশ, তাঁর পারিপার্শ্বিকতাকেও ধরবার চেষ্টা করি। এক-একজন মানুষ তাঁর সমকালীন ইতিহাসের এক-একজন প্রতিনিধি। সেই সময় এবং পরিবেশের মধ্যে লড়াই করতে করতে যে শিল্পীটি এগিয়ে চলেছিলেন, সেই মানুষটিকে নিয়েই আলোচনা। তাঁদের কেউ জীবনযুদ্ধে জিতেছেন, কেউ বা হেরে গেছেন। হার-জিতের প্রশ্নটা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। বড় কথা হল তাঁর সংগ্রাম। শিল্পের জন্য সংগ্রাম।

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলন তেমনই এক সংগ্রাম। বেশি দিনের কথা নয়। আজ থেকে মাত্র পঁচিশ বছর আগে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্র শিল্পের আত্মরক্ষার সেই সংগ্রাম। দীর্ঘ এক মাস ধরে চলেছিল কলকাতার বাংলা সিনেমা হাউসের সামনে পিকেটিং আর ধরনা।

কিন্তু কেন এই সংগ্রাম? সেটা জানতে হলে বাংলার চলচ্চিত্র ব্যবসার চেহারাটা একটু জানতে হবে। সারা বছরে বাংলা ছবি যে পরিমাণে তৈরি হয়, সেগুলি দেখানোর জন্যে সিনেমা হলের সংখ্যা কম। তার ওপর প্রচলিত বাংলা সিনেমা হলগুলিতে হিন্দি ছবি দেখানো শুরু হবার পর থেকে অবস্থা আরও কাহিল হয়েছিল। ফলে প্রচুর ছবি শেষ হবার পরও দেড় বছর-দু'বছর লেগে যাচ্ছিল মুক্তি পেতে। একে তো ধার-দেনা করে বাংলা ছবি করতে হয়, তার ওপর দীর্ঘকাল বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে থাকার ফলে ধার-করা টাকার ওপর এত বেশি সুদ গুনতে হত যে ছবি হিট্ করলেও লাভের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ফলে গরিব প্রযোজকদের পক্ষ থেকে সিনেমা হলের মালিকদের কাছে আবেদন-নিবেদন করা হতে থাকে পুরনো বাক্সবন্দি ছবিগুলিকে মুক্তি দেবার জন্য। হলের মালিকরা তাতে কর্ণপাত করেন না। ফলে নতুন করে দাবি ওঠে সেনসার তারিখ অনুযায়ী পর পর ছবি মুক্তি দেওয়ার। যে ছবি আগে সেনসার হয়েছে, সেই ছবিকে আগে মুক্তি দিতে হবে।

হলের মালিকরা এ দাবি মানতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন, ব্যবসাটা তাঁদের। তাঁরা কোন ছবি দেখানোর জন্যে নির্বাচন করবেন সে অধিকার তাঁরা ছাড়তে রাজি নন। যদিও কোন ছবির মুক্তির ক্ষেত্রেই অনেক বিধিনিষেধ তাঁদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। ছবি খারাপ ব্যবসা করলেও তাঁদের লোকসানের কারণ নেই। তা সত্ত্বেও তাঁরা অনমনীয় মনোভাব দেখাতে থাকলেন। ফলে বাংলা ছবির প্রযোজক এবং পরিবেশকরা জোট বেঁধে আন্দোলনে নামলেন সেনসার তারিখ অনুযায়ী পর পর ছবি দেখানোর দাবিতে।

তা এ আন্দোলন তো কেবল প্রযোজক ও পরিবেশকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই স্বার্থ এতে জড়িত। ফলে উত্তমকুমারের নেতৃত্বে শিল্পীদের সংগঠন শিল্পী সংসদের সদস্যরাও এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন নামকরা পরিচালকের দল। দাঁড়ালেন স্টুডিওর কর্মী ও কলাকুশলীরা।

কিন্তু শিল্পীদের আর একটি সংগঠন, যার নাম অভিনেতৃ সংঘ, তাঁরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলেন। তাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দিলেন না বটে, তবে এর বিরোধিতাও করলেন না। বিরোধিতায় গেলেন পরিচালকদের একটি অংশ যার মধ্যে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতো উন্মুক্ত মানসিকতার মানুষ কেন

এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন তা আজও আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। পক্ষান্তরে ঋত্বিক ঘটক, অজয় কর, সরোজ দে (অগ্রগামী), প্রভাত মুখার্জি প্রমুখ বিখ্যাত পরিচালকরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। ঋত্বিক ঘটকের সেই সময়কার গরম গরম বক্তৃতা আমার আজও মনে আছে। অগ্রগামীর সরোজবাবু তো তাঁর সেই সময়কার অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রতিদিন বিকেল তিনটে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পিকেটিং-এ যোগ দিয়েছেন। আর প্রভাত মুখার্জি তো আরও একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিন শেষের কিছুদিন তো উত্তর কলকাতার রাধা সিনেমার সামনে খবরের কাগজ পেতে অনশন শুরু করে দিয়েছিলেন।

ওই মাসখানেক বাংলা সিনেমা হলগুলিতে একজন দর্শককেও ছবি দেখতে যেতে দেখিনি। যে দু-চারজন ছবি দেখতে এসেছিলেন তাঁরা পিকেটিং যাঁরা করছেন তাঁদের কথা শুনে ফিরে গেছেন। কেউ কেউ আবার এঁদের সঙ্গে সমস্বরে স্লোগানও দিয়েছেন। সিনেমা হলের দরজা খোলা আছে অথচ ভিতরে একজন দর্শকও যাচ্ছেন না, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

তবে হলের বাইরে ভিড় হত প্রচুর। শিল্পীরা আন্দোলন করছেন, তাঁরা গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন, এসব দেখতে তো ভিড় হওয়াই স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে থেকে দাবি উঠত উত্তমকুমারকে দেখতে চাওয়ার জন্যে। কিন্তু উত্তমবাবুকে একদিনও আনা সম্ভব হয়নি। ওই ভিড়ের মধ্যে উত্তমকুমার এলে ভালোবাসার চাপে তাঁকে আর আস্ত ফিরে যেতে হত না।

ওই সময় প্রভাত মুখার্জির যে সংগ্রামী রূপটি দেখেছি তা কোনদিনই ভুলতে পারব না। অনশনরত প্রভাতদার কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে বসতাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতাম। এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়তাম।

শুনেছি প্রভাতদা এখন দিল্লিতে থাকেন। কী করছেন তা জানি না। কিছুদিন আগে বিখ্যাত প্রচার সচিব শ্রীপঞ্চাননের কাছে প্রভাতদার একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখলাম। উনি পঞ্চাননের কাছে পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়েছেন কোনও সাময়িক পত্রে যাতে প্রকাশ করা যায়, তার উদ্দেশ্যে। পঞ্চাননের সঙ্গে প্রভাতদার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। প্রভাতটা যে এখনও ক্রিয়েটিভ কাজের মধ্যে রয়েছেন সেটা জেনে ভালো লাগল।

অরুন্ধতী দেবী সম্পর্কে লিখতে বসে দেখছি প্রভাতদাই অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিলেন। প্রভাতদার কথা অবশ্যই আসত, তবে এতটা নয়। গোলমাল করে দিল ওই বেনামী চিঠিখানা। অধিকাংশ ক্রিয়েটিভ মানুষের কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে। তাই বলে তাঁর ক্রিয়েটিভিটির চেয়েও দুর্বলতাকেই বড় করে দেখতে হবে? এটা অন্যায়।

ঠিক সেই কারণেই আমি অরুন্ধতী দেবীর জীবনে কোনও দুর্বলতা আছে কি না সে অনুসন্ধান কোনওদিনই করতে যাইনি। ওঁর সঙ্গে দেখা হবার পর আমি বার বার খোঁজার চেষ্টা করেছি ওঁর শিল্পমানস গঠনের উৎসটিকে। ফলে বার বার ঘুরেফিরে এসেছে শান্তিনিকেতনের কথা।

অরুন্ধতী দেবীর সংগীত জীবনে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের অবদান যতখানি ঠিক ততখানিই অবদান ছিল বিবিদির। বিবিদি হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' একটা সময়ে বাংলার সাময়িক পত্রিকার জগতে আলোড়ন তুলেছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 'বিবিদি' নামেই বিখ্যাত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এবং শান্তিনিকেতনের বাইরেও সবাই ওঁকে বিবিদি নামেই ডাকতেন।

অরুন্ধতী দেবী বললেন : ১৯৪২ সালে যখন কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ল সেই সময় থেকে বিবিদি আর প্রমথবাবু শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন। আর আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম। সেই সময়ে সুযোগ হয়েছিল বিবিদির কাছে 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'মায়ার খেলা' এবং আরও অনেক নাটকের গান শেখার। সত্যি কথা বলতে কি, আমার সংগীত শিক্ষার মধ্যে একটা সুবিন্যস্ত ধারার শুরু সেই তখন থেকেই।

আমি আর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বিবিদির কাছে গান শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কণিকা শিখত ইন্ হার ওন্ রাইট। কিন্তু, আমাকেও সে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এটা আমার সৌভাগ্য।

কলেজের অফ পিরিয়ডে আমি দৌড়ে উত্তরায়ণে চলে যেতাম। অনেকটা রাস্তা। মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু গানের নেশা এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে ওসব অসুবিধে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না।

গিয়ে দেখলাম বিবিদি হয়তো রান্না করছেন, কিংবা খেতে বসেছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে আসতেন। বলতেন : এই টিপয়ের ওপর খাতা পেন্সিল আছে। নোটেশান করে নাও।

উনি সুর তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি নোটেশান করে নিতাম।

ওদিকে শৈলজাদা অধীর আগ্রহে বসে থাকতেন। বিবিদির কাছে তোলা গানগুলি পেয়ে তাঁর সারা মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠত। শৈলজাদা আমাদের কেবলই উসকে দিতেন। বলতেন : উনি হলেন গানের খনি। ওঁর কাছ থেকে যত পারো আদায় করে নাও।

এই আদায় করার ব্যাপারে আমাদের যতখানি উৎসাহ ছিল, বোধহয় তার চেয়েও বেশি তাগিদ ছিল বিবিদির নিজের। এরকম উদার, অমায়িক, মহীয়সী মহিলার সংস্পর্শে আসাটাও ভাগ্যের কথা। তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অন্ত ছিল না। বিবিদি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অতি কাছের মানুষ। কিন্তু কোনদিন তাঁর ব্যাপারে এতটুকু দাম্ভিকতা দেখিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গানে যে স্বাধীনতা নিতেন, বিবিদিও ঠিক ততখানিই স্বাধীনতা নিতেন।

বিবিদির কাছে আমি, সুবিনয় রায়, ইন্দুলেখা দেবী, নীলিমা সেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র (তখন মুখার্জি) সবাই একসঙ্গে শিখতাম। সেসব যে কী দিন ছিল কী বলব।

অরুন্ধতী দেবীর এই তন্ময় স্মৃতিচারণার মধ্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা বৌদি, আপনি তো নাচও শিখেছিলেন। সেটা কি এই শান্তিনিকেতনেই।

বাধা পেয়ে অরুন্ধতী দেবী প্রথমে থমকে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর যেন প্রশ্নটা তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকলো। বললেন : নাচ? হ্যাঁ, আমার নাচ শেখাটাও শান্তিনিকেতনেই। প্রথম যুগে ব্রহ্মচর্য আশ্রম পর্বে নাট্যঘরেই নাচ-গান শেখানো হত। আমি আর কণিকা বেশিরভাগ নাচ-গান শিখেছিলাম ওইখানেই।

আমি বললাম : শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথাও নাচের অনুষ্ঠান করেছিলেন নাকি?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : হ্যাঁ, এই কলকাতাতেই তো করেছি? শুভদা যখন গীতবিতানের প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই সময়ে আমাদের প্রথম নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হল। 'মায়ার খেলা'। আমি হয়েছিলাম শান্তা, কণিকা করেছিল প্রমদা, আর নীলিমা সেজেছিল অমর। তারও আগে 'মায়ার খেলা' হয়েছিল জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়িতে। রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমে গানগুলি গেয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন বিবিদি। বিবিদির গলায় মায়ার অত রকম গান শুনে আমি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার আগ্রহের আতিশয্য দেখেই কলকাতায় শুভদাদের গীতবিতানের প্রতিষ্ঠার সময় যখন আমরা 'মায়ার খেলা' করতে এলাম, তার অনেক আগেই বিবিদি সব গানগুলি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

অরুন্ধতী দেবীর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : শুভদা কে?

অরুন্ধতী দেবী কপালে চোখ তুলে বললেন : সে কী! শুভ গুহঠাকুরতাকে চেনেন না?

আমি বললাম : হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকে তো চিনি। ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার আশিস মুখোপাধ্যায় ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা একসঙ্গে বসে আশিসবাবুর সুভাষচন্দ্রের ওপর ডকুমেন্টারি ছবিটা দেখেছিলাম। শিশির বসুও ছিলেন সেখানে। তারপর গ্রেট ইস্টার্নে খেতে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছি। এতক্ষণে মনে পড়েছে। উনিই তো গীতবিতানের প্রতিষ্ঠাতা।

অরুন্ধতী দেবী বললেন : শুভদা এক আশ্চর্য মানুষ। তখন তো শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। শুভদাই প্রথম এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। সাধারণ মানুষ যাতে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে পারে তার জন্যে গীতবিতানের প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম প্রথম উনি ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ পাননি। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল রবিবাবুর গান বিশেষ একটি শ্রেণীর জন্য। তাই ছাত্র-ছাত্রীর অপ্রতুলতা। শুভদা কিন্তু আদৌ নিরুৎসাহিত হননি। আজ যে চারদিকে রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর

জন্যে এত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার পথিকৃৎ হলেন শুভদা।

আমি বললাম : কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত প্রসারের পেছনে আর একটি মানুষের যে বিশেষ অবদান আছে তাঁর কথা তো বললেন না বৌদি।

অরুন্ধতী দেবী জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন : কার কথা বলছেন বলুন তো?

আমি বললাম : পঙ্কজ মল্লিক।

অরুন্ধতী দেবী তাঁর সারা শরীরে তরঙ্গ তুলে বললেন : ওরে বাবা! ওঁর কথা না উল্লেখ করলে যে মহাপাপ হবে। জানেন ভাই, একটা সময় কিছু মানুষ রবীন্দ্রসংগীতকে 'মেয়েদের গান' বলে উপহাস করতেন। পঙ্কজ মল্লিকের পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠের জন্যেই সে অপবাদ ঘুচেছিল। ওঁর পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠ আর আশ্চর্য সুন্দর উচ্চারণ মানুষের মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ওঁর গাওয়া 'বাজল তূর্য আকাশ পথে সূর্য নামেন অগ্নিরথে' গানখানা শুনেছেন কখনও?

আমি বললাম : তা আবার শুনিনি। সারা শরীরের রোম খাড়া হয়ে উঠত পঙ্কজদার ওই গান শুনে। এরকম আরও অনেক গান আছে পঙ্কজদার।

অরুন্ধতী দেবী বললেন : তবেই বুঝুন। ওই গানের ওই যে বীরোচিত আবেগ আর গাম্ভীর্য, তা পঙ্কজবাবু ছাড়া আর কারও পক্ষে প্রকাশ করা সে যুগে সম্ভব ছিল কি? তাই তো গীতবিতানের একটা উৎসবে আমি বলেছিলাম যে, সিনেমার মাধ্যম ছাড়া রবীন্দ্রসংগীত এত তাড়াতাড়ি মানুষের মনের কাছে পৌঁছতে পারত না। এদিক দিয়ে আমাদের ঋণ সবচেয়ে বেশি নিউ থিয়েটার্স আর তার দুই সংগীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক এবং রাইচাঁদ বড়ালের কাছে। শিল্পী হিসাবে আমি ঋণী পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল আর কানন দেবীর কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার অধ্যায় শুরু করেছেন এঁরাই। পরবর্তীকালে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন জর্জ (দেবব্রত) বিশ্বাস আর হেমন্ত মুখার্জি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অবদানের কথাও ভোলবার নয়।

আমি বললাম : আপনার এই মন্তব্যের কোন বিরূপ সমালোচনা হয়নি?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : হয়তো হয়েছিল, কিন্তু আমার কানে এসে পৌঁছয়নি। যদি হয়েও থাকে তবে তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি ভাই স্পষ্ট কথার মানুষ। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলাই আমি পছন্দ করি।

এবারে জিজ্ঞাসা করলাম : পঙ্কজদার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ কী ভাবে হয়েছিল?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : ওঁকে প্রথম দেখি রেডিও স্টেশনে। সামান্য দু-চারটি কথা হয়েছিল। তার আগে আমার রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বেরিয়ে গেছে। উনি যে রেকর্ডের গানগুলি শুনেছিলেন তা ওই সামান্য আলাপচারিতায় জানতে পেরেছিলাম।

আমি বললাম : আপনার রেকর্ড কারা বার করেছিলেন? এইচ এম ভি?

অরুন্ধতী দেবী একটু ম্লান হেসে বললেন : না। ওটা করেছিল ভারত রেকর্ড কোম্পানি। রেকর্ডের একপিঠে ছিল 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' আর অন্যপিঠে ছিল 'পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে'—এই দুখানা গান।

আমি বললাম : পঙ্কজদা নিশ্চয় আপনার গানের প্রশংসা করেছিলেন।

অরুন্ধতী দেবী বললেন : সেদিন করেননি। ওঁর অন্য কাজের তাড়া ছিল। বেশি কথা হয়নি। ওঁর প্রশংসা পেয়েছিলাম আরও পরে, যখন নিউ থিয়েটার্সে 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে অভিনয় করতে এলাম। পঙ্কজবাবু ছিলেন সেই ছবির সংগীত পরিচালক। ওঁর সঙ্গে পরিচয়টা সেই সময়ে গাঢ় হয়েছিল। উনি আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন, আর আক্ষেপ করতে নিষেধ করেছিলেন 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারছেন না বলে।

বলতে বলতে ঝর ঝর করে একরাশ মুক্তোঝরা হাসি হেসে উঠলেন অরুন্ধতী দেবী।

পরবর্তীকালে ওঁর ওই মুক্তোঝরা হাসি এই নিউ থিয়েটার্সের দু'নম্বর স্টুডিওতেই একদিন ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আর তার উপলক্ষ ছিলাম আমি।

অরুন্ধতী দেবীর প্রথম ছবি যে 'মহাপ্রস্থানের পথে' সে কথা তো আগেই বলেছি। নিউ থিয়েটার্সের

ওই ছবিতে অভিনয় করে তিনি সারা ভারতের দর্শকের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন এবং প্রশংসা পেয়েছিলেন। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫২ সালে।

এর দু'বছর পরে ১৯৫৪ সালে অরুন্ধতী দেবীর দ্বিতীয় ছবি 'নদ ও নদী' মুক্তি পায়। ওটাও নিউ থিয়েটার্সের ছবি। পরিচালনা করেছিলেন চিত্ত বসু। একজন নতুন শিল্পীর, যিনি প্রথম ছবিতে অজস্র প্রশংসা পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে দীর্ঘ দু'বছর দর্শকের চোখের আড়ালে থাকা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু অরুন্ধতী দেবীর ডিমান্ডের ক্ষেত্রে সে বিপদ আদৌ ঘটেনি। এই দীর্ঘ দুটি বছর দর্শক উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে। হবে নাই বা কেন। ওরকম সুন্দরী নায়িকা তখনকার দিনে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর দুর্দান্ত অভিনয়-প্রতিভা। সব মিলিয়ে দর্শকের কাছে অরুন্ধতী দেবীর আকর্ষণ ছিল ভয়ানক।

ওই বছরেরই শেষের দিকে অরুন্ধতী দেবীর তৃতীয় ছবি 'বকুল' মুক্তি পেল। এটিও নিউ থিয়েটার্সের ছবি। পরিচালনা করেছিলেন ভোলানাথ মিত্র। এই ছবিতে একজন নতুন সংগীত পরিচালককে দেখা গেল যা নিউ থিয়েটার্সের ইতিহাসে অকল্পনীয়। সাধারণত নিউ থিয়েটার্সের ছবি হলেই হয় রাইচাঁদ বড়াল নতুবা পঙ্কজ মল্লিককে সংগীত পরিচালনা করতে দেখা যায়। কিন্তু এই ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল একজন তরুণকে, যাঁর নাম প্রণব দে। প্রণববাবু হলেন বিখ্যাত সংগীতকার অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ভ্রাতুষ্পুত্র। অর্থাৎ মান্না দে-র দাদা।

প্রণববাবুকে আমরা তাঁর ডাকনামে নীলুবাবু বলে ডাকতাম। উনি ভালো গান গাইতে পারতেন, ভালো সুর করতে পারতেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার দারুণ পসিবিলিটি ছিল। কিন্তু কী কারণে জানি না, উনি নিজেকে সংগীত জগৎ থেকে একেবারেই সরিয়ে নিলেন। এর ফলে বাংলার সংগীত জগৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা আমি মনে করি।

এই 'বকুল' ছবিতেই অরুন্ধতী দেবীর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। উত্তমবাবুর তখনও ছবির জগতে ভালো করে পা রাখার জায়গা তৈরি হয়নি। একের পর এক ছবি ফ্লপ করছে। নাম বদলে অরূপকুমার নাম নিয়ে একটা ছবিতে অভিনয়ও করলেন। তাতেও ভাগ্যের প্রসন্ন মুখ দেখতে পেলেন না। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যে বাধ্য হয়ে নিউ থিয়েটার্সে অল্প টাকায় চুক্তি করলেন মাসে দশদিন করে ডেট দেবার কড়ারে। 'বকুল', 'রাইকমল' ইত্যাদি নিউ থিয়েটার্সের কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। অভিনয় যে তিনি খুব খারাপ করেছিলেন তা নয়, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যশোলক্ষ্মীর আঁচলটি ছুঁতে পারেননি। আসলে, আমার মনে হয়, তখন উত্তমবাবুর ঠিকুজি-কোষ্ঠীতে গ্রহনক্ষত্র তাঁর প্রতি অনুকূল ছিল না। নইলে, পরবর্তীকালে তো দেখেছি, ওর চেয়ে অনেক খারাপ অভিনয় করেও তিনি দর্শকদের দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। মানুষের জীবনে সময় এমনই একটা জিনিস বটে!

যাক ওসব কথা। উত্তমকুমার আর অরুন্ধতী অভিনীত 'বকুল' ছবিতে উত্তমকুমারকে ছাপিয়ে অরুন্ধতী দেবীই দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন বেশি। পরবর্তীকালে ওদের অভিনীত ছবিগুলিতে দু'জনের মধ্যে টক্কর চলেছিল সমানে সমানে। তপন সিংহর 'জতুগৃহ' ছবিতে, কিংবা প্রভাত মুখার্জির 'বিচারক' ছবিতে তো এ বলে আমায় দ্যাখ আর ও বলে আমায় দ্যাখ।

'বকুল' ছবিতে অরুন্ধতী দেবীর অভিনয় নিয়ে কিন্তু তেমন হইচই পড়েনি, যেমন পড়েছিল 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে। এমনকি 'নদ ও নদী' ছবিতে তিনি যতটা প্রশংসা পেয়েছিলেন, 'বকুল' ছবির বেলায় তাও পেলেন না।

অরুন্ধতী দেবী অভিনীত পরবর্তী ছবি গোধূলি নিয়ে সেই যুগে বেশ হইচই হয়েছিল। তবে সেটা অরুন্ধতী দেবীর অভিনয় নিয়ে নয়, ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা এই কাহিনীতে নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে অন্য ধরনের বিশ্লেষণ ছিল। তখনকার সমাজ সেটা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। যদিও তখন যুদ্ধোত্তর পর্বে এবং উদ্বাস্তু সমস্যায় পর্যুদস্ত বাংলার সমাজে প্রাচীন মূল্যবোধ একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু ছবির পর্দায় সেটা দেখে আঁতকে উঠেছিলেন অনেকে। কিছু কাগজে-পত্রে এবং মানুষের মুখে মুখে 'গোধূলি' ছবি সম্পর্কে ছি-ছিক্কারও শোনা গিয়েছিল।

এই বিরূপ সমালোচনা আর কাকে কতটা আঘাত করেছিল জানি না, তবে ওই কাহিনীর লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে দারুণ আহত করেছিল। ওই সময়ে তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন : বুঝলে রবীন্দ্র, আমি আমার কাহিনীতে কাল্‌চারাল ফ্রেন্ডশিপের কথাই বলেছি। কিন্তু লোকে এটার কদর্থ করে আমাকেই আক্রমণ করে বসল। কেউ ব্যাপারটা একটু গভীর ভাবে ভাবলই না।

নরেনদা কেন জানি না, আমাকে বরাবরই রবি না বলে রবীন্দ্র বলে ডাকতেন। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ সেই ১৯৫১ সাল থেকে। ১৯৫৩ সালে আমি 'কল্পনা' বলে একটা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করতাম। নরেনদা সেই পত্রিকায় কোন রকম সম্মান দক্ষিণা না নিয়েই লেখা দিয়েছেন। এর জন্যে ওঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না।

নরেনদা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সাহিত্য সাধক? নর-নারীর জীবনের জটিলতা নিয়ে তিনি অজস্র গল্প আর উপন্যাস লিখেছেন। সেইসব গল্পের উপাদান নরেনদা তাঁর পরিচিত পরিধির মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করতেন। একবার তাঁর এক বন্ধুর বিবাহিতা ভগ্নীর যন্ত্রণাময় জীবন অবলম্বন করে তিনি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তার জন্যে তাঁর ভাগ্যে প্রচণ্ড লাঞ্ছনা জুটেছিল। কিন্তু নরেনদা তাতেও পেছপা হননি। তিনি তাঁর পরিচিত মানুষদের বার বার গল্প-উপন্যাসের সাবজেক্ট করেছেন।

'গোধূলি'ও হয়তো সেই জাতীয় একটি কাহিনী। কিন্তু ওই কাহিনীর চিত্ররূপের জন্যেই তাঁকে কিছু মানুষের নিন্দামন্দ শুনতে হল। সেদিন পর্দার বুকে কালচারাল ফ্রেন্ডশিপটুকু দেখেই মানুষ শিউরে উঠেছিল, আর আজকের সমাজ তো লিভ টুগেদারটাকেও মেনে নিয়েছে। সময় কত কিছু বদলে দেয়।

'গোধূলি' ছবি করার আগেই নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে অরুন্ধতী দেবীর চুক্তির মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উনি কৃতজ্ঞতাবশত 'গোধূলি' ছবিতেও কাজ করে দিয়েছিলেন। ওই ছবি অবশ্য নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে হয়নি, হয়েছিল সরকার প্রোডাকসন্সের ব্যানারে। কিন্তু পুরো সেট-আপটাই নিউ থিয়েটার্সের। পরিচালক ছিলেন কার্তিক চ্যাটার্জি। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানের তখন খুব টলটলায়মান অবস্থা। তাই শিল্পীদের সঙ্গে তাঁরা নতুন করে চুক্তি করলেন না। এর ফল কিন্তু অরুন্ধতী দেবীর পক্ষে খুবই ভালো হয়েছিল। আমরা এর পরে তাঁকে এমন কয়েকটি ছবিতে দেখতে পেলাম যাতে তাঁর অভিনয় শক্তির প্রকাশ বিশেষভাবে ঘটেছিল।

যেমন একটি ছবি হল চলাচল। কী অসাধারণ অভিনয় যে এই ছবিতে করলেন অরুন্ধতী দেবী যে ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। কী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। অথচ এই ছবি সম্পর্কে পূর্বাহ্নে দর্শকদের বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। তার কারণ ছবির পরিচালক অসিত সেন একেবারেই নতুন। ভদ্রলোক একজন ভালো ফটোগ্রাফার হিসেবে পরিচিত ছিলেন কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্র প্রতিভার কোনও পরিচয় তো তার আগে পাওয়া যায়নি। তার ওপর কাহিনীকারও নতুন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ওঁর লেখা কিছু কিছু গল্প উপন্যাস তার আগে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ কোনও জনপ্রিয়তা তৈরি হয়নি। অতএব 'চলাচল' ছবি সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ না জাগাই স্বাভাবিক।

অথচ অরুন্ধতী দেবীর তার আগের ছবি 'দুজনায়' সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ ছিল প্রবল। কারণ সে ছবির পরিচালক ছিলেন নির্মল দে আর এই নির্মলবাবুই হলেন উত্তম-সুচিত্রার মেকার। 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে তিনিই এই জুটিকে সার্থকভাবে উপহার দিয়েছিলেন দর্শকদের। উত্তমকুমারের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে তার সন্ধান নির্মলবাবুই দিয়েছিলেন 'বসু পরিবার' ছবিতে। তার ওপর 'দুজনায়' ছবিতে রয়েছে 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবির জনপ্রিয় জুটি বসন্ত চৌধুরি এবং অরুন্ধতী দেবী। কিন্তু 'দুজনায়' দর্শকদের তেমন খুশি করতে পারেনি।

এই যে এতগুলি ছবিতে অরুন্ধতী দেবী অভিনয় করলেন, তার একটি ছবিতেও অরুন্ধতী দেবীর গানের প্রতিভাকে কাজে লাগানো হল না। তা নিয়ে আমার মনে বেশ কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা ছবিতে বরাবরই সিংগিং স্টারের একটা চাহিদা ছিল। তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ কানন দেবী, কে এল সায়গল, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ ইত্যাদি। যদিও প্লে-ব্যাক সিস্টেম চালু হবার পর থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নামকরা গাইয়েদের দিয়ে গান গাওয়ানো হত, এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঠোঁট নেড়ে তাঁদের কর্তব্য সমাপন করতেন। তা হলেও যিনি অভিনয় করেছেন তাঁর স্বকণ্ঠে গান থাকলে

ছবির মাধুর্য যে বাড়ে তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। উত্তমকুমার ভালো গান জানতেন, কিন্তু তাঁকে ছবির জন্যে গান গাইতে রাজি করানো যায়নি। বাসবী নন্দী এবং বিশ্বজিৎও তো মোটামুটি ভালোই গান গাইতে পারতেন। বাজারে তাঁদের রেকর্ডও আছে। কিন্তু ছবিতে তাঁদের গান গাইতে দেখা যায়নি। পরবর্তীকালে সমিত ভঞ্জের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু অরুন্ধতী দেবীর কণ্ঠে একটাও রবীন্দ্রসংগীত ছবির জন্যে কেন ব্যবহৃত হল না, এটা আমায় অবাক করেছিল।

এ নিয়ে অরুন্ধতী দেবীকে একবার প্রশ্নও করেছিলাম। বলেছিলাম : বৌদি, আপনি এত ভালো গান জানেন, অথচ একটা ছবিতেও আপনাকে গান গাওয়াবার কথা কেউ ভাবলেন না কেন বলুন দেখি?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : ভাবেননি আবার! কতজন কতবার রিকোয়েস্ট করেছেন ছবিতে গান গাইতে। দেবকীবাবুর 'নবজন্ম' ছবির সময় নচিবাবু (নচিকেতা ঘোষ) তো কত অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হইনি গান গাইতে।

আমি বললাম : কেন? আপনার কি নিজের কণ্ঠের ওপরে বিশ্বাস ছিল না?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : তা ছিল। কিন্তু ছবিতে গান গাইনি অন্য কারণে।

আমি বললাম : কী কারণ?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : ও কথা থাক না ভাই। অন্য কথা বলুন।

আমি বললাম : ছবিতে গান না গাওয়ার কারণটা কি খুবই গোপনীয়? তাহলে আর জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করব না।

অরুন্ধতী দেবী বললেন : ঠিক গোপনীয় নয়। তবে কারণটা এতই ব্যক্তিগত যে বলতে ভয়ানক সঙ্কোচ হচ্ছে।

আমি বললাম : গোপনীয় যখন নয় তখন আর বলতে ক্ষতি কী?

অরুন্ধতী দেবী একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : গানটা আমার কাছে অত্যন্ত সেক্রেড জিনিস। সেই গানকে আমি পণ্য করতে চাইনি বলেই ছবিতে গান গাইনি! শান্তিনিকেতনে যে পবিত্র পরিবেশের মধ্যে আমি গান শিখেছি, তাতে গানকে পণ্য করার কথা আমি ভাবতেই পারি না।

আমি বললাম : মহাজাতি সদনে এবং অন্য কোথাও কোথাও রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আমি আপনাকে গান গাইতে দেখেছি। সেখান থেকে কি আপনি সম্মান-দক্ষিণা হিসেবে কিছু নেননি?

অরুন্ধতী দেবী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন : এক পয়সাও না। এমনকি কোন উপহার পর্যন্ত না।

আমি বললাম : তাহলে ছবি করতে এসে আপনি গানের দিকটি একেবারেই বর্জন করলেন?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : আমি গান ছেড়েছি ছবি করার অনেক আগেই। ১৯৪৬ সালে। তার পেছনে পারিবারিক একটা কারণ ছিল। সেটা আমি বলতে চাইছি না। তবে ওই সময় কিছু রবীন্দ্রসংগীত আমি অনুবাদ করেছি। দিল্লি আর বোম্বাইয়ের শিক্ষিত সমাজের কাছে ওইসব অনুবাদ সংগীত দারুণভাবে গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া ওই সময়ে মহাত্মাজি একবার অনশন করেছিলেন। সেখানে আমার ডাক পড়েছিল তাঁকে গান শোনানোর জন্যে। আমি তাঁর প্রিয় 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম' এবং 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গান দু'খানি গেয়ে শুনিয়েছিলাম। এদিক থেকে আমি কত ভাগ্যবতী দেখুন। আমাদের কালের দুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ আর মহাত্মা গান্ধীকে আমার গান শোনাতে পেরেছি। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়! গান শেখার এত বড় সার্থকতা আর কিছু আছে কি?

আমি বললাম : মহাত্মাজিকে আপনি খুব শ্রদ্ধা করেন, তাই না বৌদি?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : হ্যাঁ ভাই, অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। তিনি ছিলেন মহাপুরুষ। আইনস্টাইন যে বলেছেন, আগামী প্রজন্ম হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না, এমন একটি মানুষ এই পৃথিবীতে একদিন ছিলেন—সে কথাটা খুব খাঁটি। ১৯৪৮ সালের তিরিশে জানুয়ারি সন্ধেবেলা যখন খবর পেলাম মহাত্মাজি আর নেই, সেদিন সারা রাত কেঁদেছি। পরের দিন সারাদিন ধরে রেডিওতে তাঁরই উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অনেকক্ষণ ধরে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে গান গাইতে গাইতে আমি আমার আবেগ চেপে রাখতে পারিনি। বার বার চোখ দুটো জলে ভরে আসছিল।

আমি বললাম : আচ্ছা বৌদি, আপনি তো বিদেশেও গেছেন। সে দেশের মানুষকে রবীন্দ্রসংগীত

শোনাননি?

অরুন্ধতী দেবী বললেন : শুনিয়েছি বৈকি। বাংলা ইংরিজি দুই ভাষাতেই শুনিয়েছি। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন ভাই, ওদেশের মানুষও সেই সব গানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের আবেদন বিশ্বজনীন।

অভিনয় জীবনের একেবারে শেষ পর্বে অরুন্ধতী দেবীকে দু'খানি ছবিতে গান গাইতে দেখা গেছে। একটি বলাই সেন পরিচালিত 'সুরের আগুন' ছবিতে। অপরটি তপন সিংহ পরিচালিত 'হারমোনিয়াম' ছবিতে। 'সুরের আগুন' ছবির গানটি ছিল সমরেশ বসুর লেখা। 'আমি অন্ধকারে থাকি, তুমি আঁধার রাতে এসো।' আর 'হারমোনিয়াম' ছবির গানটি অতুলপ্রসাদের। 'কেন বঞ্চিত হব চরণে/আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে।' আহা, কী অপূর্ব গেয়েছিলেন অরুন্ধতী বৌদি! কী অসাধারণ তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গি।

ছায়াছবিতে অরুন্ধতী দেবীর এই গান দু'খানির জন্যে আমাদের তপন সিংহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। তিনিই শেষ পর্যন্ত বরফ গলাতে পেরেছিলেন।

এছাড়া আর কোন ছবিতে অরুন্ধতী দেবী গান গেয়েছিলেন কিনা তা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

তবে গান না গাইলেও অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অরুন্ধতী দেবী আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। ওঁর অভিনয়ের মধ্যে এমন একটা ইনটেলেকচুয়াল ব্যাপার ছিল যা তৎকালীন অনেক অভিনেত্রীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেত না। উত্তমকুমার আমাকে একবার বলেছিলেন : জানেন রবিবাবু, ওঁর সঙ্গে যখন অভিনয় করতাম তখন আমি খুবই সতর্ক থাকতাম। আমার নিজের অভিনয়ের মধ্যে ইনটেলেকচুয়াল ফ্লেভার মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। নাহলে মার খেয়ে যাবার ভয় ছিল।

অরুন্ধতী দেবীর অভিনয় আমার কোনদিনই খারাপ লাগেনি। চলাচল, বিচারক, জতুগৃহ ছবির কথা আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে যোগ করে নিন পঞ্চতপা, মা, মমতা, টাকা আনা পাই, কালামাটি, জন্মান্তর, কিছুক্ষণ, ক্ষুধিত পাষাণ এবং ভগিনী নিবেদিতা ইত্যাদি ছবির নাম। শেষোক্ত ছবিতে তাঁর অভিনয় তো কোনদিনই ভোলবার নয়। মনে হয় যেন কোনও বিদেশি অভিনেত্রীর অভিনয় দেখছি। মূলত তাঁর অভিনয়ের জন্যেই ছবিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের মর্যাদা পেয়েছিল।

অরুন্ধতী দেবী সব ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করতে পারতেন। এমনকি কমেডি ছবিতেও। সেখানে আবার তাঁর অন্য মূর্তি। ছেলে কার, মানময়ী গার্লস স্কুল আর শশীবাবুর সংসার ইত্যাদি ছবিগুলি দেখলে আর এক অরুন্ধতী দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়।

পরিচালক হিসেব অরুন্ধতী দেবী প্রথম ছবিতেই সাকসেসফুল। যেদিন শুনলাম বিমল করের লেখা 'খড়কুটো'-র স্বত্ব উনি কিনেছেন ছবি করবেন বলে, সেদিন মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল। হতে পারেন উনি একজন বড় অভিনেত্রী, তা বলে এতবড় দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন কোন ভরসায়। পরে ভাবলাম, না পারার তো কিছু নেই। প্রভাত মুখার্জি পরিচালিত ছবিগুলির সঙ্গে তো উনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। আর এখন আছেন তপন সিংহ পরিচালিত ছবিগুলির সঙ্গে। খুব কাছে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁদের কাজকর্ম দেখেছেন এবং দেখছেন। কাজেই ছবি পরিচালনার আগ্রহ জাগাই স্বাভাবিক।

তবে প্রথম ছবির ক্ষেত্রেই যে এরকম দুর্দান্ত সাকসেস পাবেন, সেটা ভাবিনি। আহা, কী অপূর্ব ছবি ওই ছুটি। ছবি দেখতে দেখতে কান্না যেন আর চেপে রাখা যায় না। নন্দিনী মালিয়া, মৃণাল মুখার্জি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, দীপালি চক্রবর্তী ইত্যাদি সকলের কাছ থেকেই অসম্ভব ভাল অভিনয় আদায় করে নিয়েছিলেন অরুন্ধতী দেবী।

তাই যেদিন কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের মামাজির মুখে শুনলাম যে অরুন্ধতী দেবী তাঁদের ব্যানারে রবীন্দ্রনাথের মেঘ ও রৌদ্র ছবি করছেন, সেদিন মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল। যাঁর মধ্যে আদ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সাবজেক্ট তো তাঁকেই মানায়।

কিন্তু অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রৌদ্র' আমাকে খুশি করতে পারেনি। বোধহয় দর্শকদেরও পারেনি। মামাজিদের এই ছবি আর্থিক দিক থেকে অসফল। তবে 'মেঘ ও রৌদ্র' মামাজিদের সম্মান এনে

দিয়েছিল। ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়। এবং সেখান থেকেও প্রশংসা নিয়ে আসে। এতে মামাজিরা যে খুব খুশি হয়েছিলেন তা তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম।

যে অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে আমার এত মিষ্টি সম্পর্ক ছিল সেই অরুন্ধতী দেবী একদিন অকারণে আমার ওপর রেগে গেলেন। সেই যে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা ঘটে গেল সেটা আর কোনওদিনই ভাঙল না।

অথচ ব্যাপারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর।

একদিন সকালে তপনবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। একটা দরকারে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন।

তপনবাবু বললেন : বেশ তো। আপনি আজ দুপুরে এন-টি দু'নম্বরে চলে আসুন। আমার এডিটিং আছে। ওখানেই কথা হবে।

সেই অনুযায়ী সেদিন দুপুরে আমি স্টুডিওতে এলাম। অরুন্ধতী দেবীকে দেখলাম তপনবাবুর ঘরের সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার?

আমি বললাম : বৌদি, একবার তপনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

বৌদি বললেন : উনি তো এখন ব্যস্ত।

আমি বললাম : তা হোক, ওঁর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আপনি একটু ওঁকে খবর দিন।

বৌদি বললেন : অসম্ভব! এখন ওঁকে একদম ডিস্টার্ব করা যাবে না।

আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ বোধহয় দোতলার এডিটিং রুমে তপনবাবুর কানে গিয়েছিল। উনি বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমার উদ্দেশে বললেন : রবিবাবু, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। আপনি একটু নিচের ঘরে বসুন।

তারপর অরুন্ধতী দেবীর উদ্দেশে বললেন : নুকু, তুমি একটু রবিবাবুকে নিচের ঘরে বসাও।

এই বলে তপনবাবু আবার এডিটিং রুমে ঢুকে গেলেন।

বৌদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ মুখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে গেছে। কোনও কথা না বলে তিনি দুম দুম করে আমার সামনে থেকে চলে গেলেন।

নিচের ঘরটা খোলাই ছিল। আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। একটু পরে দেখলাম একটি ছেলে এসে আমার সামনে এক কাপ চা রেখে গেল। বৌদি কিন্তু আর আমার সামনে এলেন না।

সেদিন তপনবাবুর সঙ্গে আমার নিজের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বোম্বাইয়ের অভিনেতা বিজয় অরোরা আমাকে ধরেছিল তপনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। ওর ইচ্ছে তপনবাবুর ছবিতে অভিনয় করে। আমি যেন সেই ব্যাপারে ওঁকে অনুরোধ করি। সেই সম্পর্কেই কথা বলতে এসেছিলাম সেদিন।

তা তপনবাবু আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। বিজয়কে উনি ওঁর 'সফেদ হাতি' ছবিতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু অরুন্ধতী বৌদি যে সেদিন আমার ওপর কেন রেগে গেলেন, তার কারণ আমি আজও খুঁজে পাইনি। এরপরে যতবার ওঁর মুখোমুখি হয়েছি উনি আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন।

ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ওঁদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। দোতলায় বসবার ঘরে তপনবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখলাম বৌদি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে হাতে কলম নিয়ে স্ক্রিপ্টের খাতায় চোখ বোলাচ্ছেন।

আমি বসবার ঘর থেকে বেরোনো মাত্র উনি একবার আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। আমি জুতোজোড়ায় পা গলাতে গলাতে জিজ্ঞাসা করলাম : ভালো আছেন বৌদি?

উনি মুখ না তুলেই অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন : হুঁ।

ওঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ বাক্যালাপ। তার কিছুদিন পরেই উনি চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। আমাদের ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা ইহজীবনে আর হল না।

গীতাদি

অভিনেত্রী গীতা দে-র নাম করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দুর্বিনীত দজ্জাল মহিলার মুখ। বোধহয় এর একটাই কারণ। সিনেমায় কিংবা থিয়েটারে গীতাদি আজ পর্যন্ত যতগুলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তার এইট্টি পার্সেন্টই হল কুচক্রী মহিলার।

অথচ ব্যক্তিগত জীবনে গীতা দে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। আমাকে যদি সিনেমা কিংবা থিয়েটারপাড়ার অত্যন্ত হৃদয়বতী মহিলাদের একটা লিস্ট করতে বলা হয়, তাহলে সেই লিস্টের প্রথম দিকে গীতাদির নাম আমাকে রাখতেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ওরকম স্নেহশীলা এবং হৃদয়বতী মহিলা আমি খুব কমই দেখেছি। আমাদের দেশে অভিনেত্রীদের তো নানারকম হিসেব কষে চলতে হয়। কতটা হাসবেন আর কতটা গম্ভীর হবেন, কার সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ হবেন আর কার প্রতি কতটা কপট রাগ দেখবেন, সেসব অঙ্ক কষে এগোতে হয়। কিন্তু গীতাদির সেসব কিছু নেই। তিনি ভেতরে যা, বাইরেও তাই। একেবারেই অকপট। যেজন্যে জীবনে তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অনেক ঠকতে হয়েছে। অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এততেও ভদ্রমহিলার শিক্ষা হয়নি। এই ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ আজও তাঁকে ঠকিয়ে চলেছে তো ঠকিয়েই চলেছে। মাঝে মাঝে এমনও সন্দেহ হয় যে গীতাদি বোধহয় জীবনে জেতার চেয়ে ঠকাতেই আনন্দ পান বেশি।

সেরকম একটা ঘটনা তো আমার চোখের সামনে ঘটেছিল একদিন। এক প্রযোজক গীতাদির সঙ্গে একটা ছবিতে কাজ করবার জন্য মৌখিক চুক্তি করেছিলেন। কথা ছিল তিনি তিনশো টাকা পার-ডে দেবেন। দিন দশেকের কাজ ছিল ছবিতে। কাজ চলবার সময় প্রযোজক গীতাদিকে অন-অ্যাকাউন্ট কিছু পেমেন্ট করেছিলেন। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর উনি যখন ফাইনাল ভাউচার করতে এলেন, তখন দেখা গেল উনি দুশো টাকা করে পার-ডে ধরেছেন।

গীতাদি সাধারণত রাগ-টাগ বিশেষ করেন না। সব অবস্থাতেই নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করেন। সেদিন কিন্তু তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বললেন : সে কী। আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেল পার-ডে তিনশো টাকা দেবেন। এমনিতে আমি পাঁচশো টাকা করে নিই। কিন্তু যেহেতু আপনি অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, আর রোলটা বেশ ভাল, তাই আমি অত কম টাকায় রাজি হয়েছিলাম। আর এখন কিনা টাকাটা আরও কম নিতে হবে! এ কী রকম ব্যবহার আপনার?

ভদ্রলোক বললেন : তুমি ভুলে গেছ গীতা। তোমার সঙ্গে আমার পার-ডে দুশো টাকাই কথা হয়েছিল। এখন চটপট বাকি টাকাটা নিয়ে ভাউচার সই করে দাও দিকি!

গীতাদি বললেন : হতেই পারে না। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আমি কখনও দুশো টাকা পার ডে-তে রাজি হতে পারি না। অনেক গরিব প্রোডিউসারের কাজ আমি বিনে পয়সায় করে দিয়েছি। সেরকম মন আমার আছে। কিন্তু দুশো টাকা কথা হলে আমি তিনশো টাকা চাইব, তেমন ছোটলোক আমি নয়। আপনিই বরং মিথ্যে কথা বলছেন!

গীতাদির কথা শুনে প্রযোজক ভদ্রলোক খুব চটে গেলেন। বিশেষ করে একজন সাংবাদিক যখন সেখানে উপস্থিত আছেন। তাই তিনি বললেন : কী! আমি মিথ্যেবাদী। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ঠিক আছে, আমি আর এক পয়সাও দেব না। যা পার তুমি করে নিও।

এই বলে ভদ্রলোক হাতের ভাউচার ব্যাগে পুরে উল্টোপথে হাঁটা দিলেন। তাঁর প্রস্থানের ভঙ্গি দেখে মনে হল, তিনি যেন এইরকমই একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

আমি বললাম : এটা কী করলেন গীতাদি! জোচ্চোরের বাড়ির ফলার কখনও ছেড়ে দিতে আছে! যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই লাভ। ওই হাজার খানেক কি হাজার দেড়েক টাকার জন্যে আপনি কি কেস করতে যাবেন? সেখানে তো আবার উকিল মোক্তারের ফ্যাকড়া। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে।

এক, ই আই এম পি এ-তে কমপ্লেন করতে পারেন। কিন্তু আপনি একা মেয়েমানুষ। ওসব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সামলাতে পারবেন কী করে?

গীতাদি কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে বললেন : যাক গে, মরুক গে! আমার না হয় ক'টা টাকা মেরে দেবে, তা বলে তো আমার কপালটাকে কেড়ে নিতে পারবে না। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদ থাকলে ওরকম অনেক টাকা রোজগার করতে পারব। আর এটা তো নতুন কিছু নয় ভাই! সারা জীবনে এরকম অনেক টাকা আক্কেল সেলামি গেছে আমার।

গীতাদিকে যে আমি 'দয়াবতী মহিলা' বলে উল্লেখ করেছি, তার একাধিক কারণ আছে। মানুষের দুঃখে তাঁকে বহুবার চোখের জল ফেলতে দেখেছি। বিশেষ করে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন তাঁরা কোনও বিপদে পড়লে গীতাদি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতেন। তাঁদের দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসাতেন।

এরকম অনেকগুলি ঘটনার কথা আমি জানি। তারই একটা ঘটনা উল্লেখ করছি।

গীতাদির সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয় ১৯৫৮-৫৯ সালে। তবে তারও দশ বছর আগে থেকে গীতাদিকে আমি চিনতাম। গীতাদি তখন বিভিন্ন অ্যামেচার ক্লাবে, অফিস ক্লাবে অভিনয় করতেন। উনি প্রেমাংশু বসুদের 'শ্রীমঞ্চ' নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের নাটকে তো বটেই, তার বাইরেও অজস্র অ্যামেচার নাটকে গীতাদির অভিনয় আমি দেখেছি। গীতাদিকে তখন আদর করে 'অ্যামেচার সম্রাজ্ঞী' বলে ডাকতেন অনেকে। সেই সময়টায় গীতাদি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুবই দাপট ছিল অ্যামেচার মহলে।

বাংলা নাট্যজগতের ওই সময়টিকে অ্যামেচার নাটকের সুবর্ণযুগ বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। গ্রুপ থিয়েটারগুলি তখনও তেমন ভাবে সুগঠিত এবং সুসংহত হয়নি। একমাত্র বহুরূপী গোষ্ঠীরই রমরমা ছিল। অপরদিকে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো বেশ কিছু অ্যামেচার গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। সেই দলের কয়েকজন শিল্পী তো পরবর্তীকালে বাংলা পেশাদারি থিয়েটার ও সিনেমায় বহুদিন সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল প্রেমাংশু বসু, ঠাকুরদাস মিত্র, সাধন সরকার, সুধীর মুস্তফি, গীতা দে, মমতা ব্যানার্জি, দীপালি চক্রবর্তী ইত্যাদি। দীপালি দেবী হলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীর মা। উনি পরে নান্দীকার গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ওই নান্দীকার গোষ্ঠী থেকেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলি, চিন্ময় রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ইত্যাদি শিল্পীরা সিনেমার পর্দায় এসেছিলেন। অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি' ছবিতে দীপালি চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয়ের কথা আমার আজও মনে আছে।

ওদিকে ঠাকুরদাস মিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে আমি এর আগেও দু-একবার উল্লেখ করেছি। অহীন্দ্র চৌধুরিদের পরবর্তী যুগে ঠাকুরদাস মিত্রের মতো এত ভালো 'সাজাহান' কেউ করতে পারতেন না। 'কেরানীর জীবন' নাটকে প্রেমাংশু বসুর পটলা চরিত্রের অভিনয় তো অনেকের কাছে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আছে। সাধন সরকার তো পরবর্তীকালে সিনেমায় খুব নাম করেছিলেন। অর্ধেন্দু মুখার্জি পরিচালিত তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা' ছবির নায়ক ছিলেন উনি। তিন-চারখানা ছবি পরিচালনাও করেছেন সাধনবাবু।

ওই সময়ে অ্যামেচার নাটকে অনিল মিত্র নামক এক ভদ্রলোকের অভিনয় আমার খুব ভালো লাগত। তবে তাঁকে পরবর্তীকালে পেশাদার মঞ্চে অথবা সিনেমার পর্দায় আমি দেখিনি। বেশ পাওয়ারফুল অ্যাক্টর ছিলেন তিনি। ওই যুগেও নর্মাল অ্যাকটিং করতেন।

আর ছিলেন সুধীর মুস্তফি নামে একজন অভিনেতা। তিনিও খুব শক্তিমান অভিনেতা এবং একটি গোষ্ঠীর পরিচালক।

গীতাদি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই যে তৎকালীন অ্যামেচার থিয়েটার সম্পর্কে এত কথা বললাম, এরও একটা বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণটি হল, গীতাদি হলেন অ্যামেচার থিয়েটারেরই প্রোডাক্ট। জ্ঞান হবার পর তাঁর অভিনয়ের হাতেখড়ি যদিও শিশিরকুমার ভাদুড়ির হাতে, তা হলেও অভিনয়ের যা কিছু পরিপুষ্টি, সেটা ওই অ্যামেচার থিয়েটারের গ্রুপ থেকেই হয়েছে। শ্রীমঞ্চের প্রেমাংশু বসু ওঁকে

হাত ধরে ধরে অভিনয় শিখিয়েছেন। সেই কারণে আজও গীতাদি কথায় কথায় প্রেমাংশু বসুকে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু হিসেবে উল্লেখ করেন। শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে যাঁরা কিছুদিনও কাটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র গীতাদিকেই দেখলাম শিশির ভাদুড়ি ছাড়া অন্য কাউকে গুরু বলে উল্লেখ করতে। এমন সততার উদাহরণ খুব বেশি নেই। মানুষ হিসেবে গীতাদি যে কতবড় মাপের তার প্রমাণ এই সব ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়।

জীবনের একটা পর্বে যখন গীতাদি সর্বহারা, দিশাহারা, তখন এই অ্যামেচার থিয়েটার আর অফিস ক্লাবই তাঁকে আর তাঁর সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখেছে। যে কারণে দীর্ঘকাল পেশাদার মঞ্চে এবং সিনেমার পর্দায় অভিনয় করেও অ্যামেচার জগতের প্রতি গীতাদির কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। গীতাদি এখনও যখন অতীতের স্মৃতিচারণ করতে বসেন তখন বলেন : ভাই রে, সেইসব অন্ধকার দিনগুলির কথা যখন মনে পড়ে, তখন আজও আমি শিউরে উঠি। প্রেমাংশুদা আর মমতাদি (ব্যানার্জি) না থাকলে আজ আমি কোথায় যে ভেসে যেতাম। সেই কারণে অ্যামেচার জগতের শিল্পী বিপদে পড়লে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। সবার আগে ছুটে যেতেন সেখানে। কেমন করে তাকে বিপদমুক্ত করবেন সেটা ভেবে হাঁকুপাকু করতেন। এখন যে ঘটনার কথা বলছি, সেটা সেই জাতীয় একটা ঘটনা।

ভদ্রমহিলার নামটা এখন আমার মনে পড়ছে না। সীতা হতে পারে, শান্তা হতে পারে, মিতা হতে পারে, আবার রীতাও হতে পারে। মোট কথা দু অক্ষরের একটা নাম। তা সে ভদ্রমহিলার একটা কঠিন অসুখ করল। খবর পেয়ে গীতাদি ছুটলেন তাঁর বাড়িতে। গীতাদি তখন স্টার থিয়েটারের নামকরা শিল্পী। সিনেমার প্রচুর কাজ তাঁর হাতে। ইচ্ছে করলেই দুটো মৌখিক হা-হুতাশ করে কর্তব্য সমাধা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে গীতাদি ছুটলেন তাঁর বাড়িতে। ব্যাগ থেকে টাকা বার করে ভালো ডাক্তার ডাকিয়ে আনালেন। ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করলেন ডাক্তারের নির্দেশ মতো।

সেদিন সন্ধেবেলা গীতাদির সঙ্গে আমার স্টার থিয়েটারে দেখা। আমার কাছে সেই অসুস্থ মেয়েটির কথা বলতে বলতে গীতাদি হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। বললেন : রবিদা, মেয়েটার কী হবে বলুন তো? ওর যে কেউ কোথাও নেই। আপনারা পাঁচজন আশীর্বাদ করুন যেন ও বেঁচে ওঠে।

কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারা গেল মেয়েটির ব্যাধি দুরারোগ্য। দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন। এ খবর পেয়ে গীতাদি আর চোখের জল ফেললেন না। কোমরের কষিটাকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

সেই সময়ে যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে গীতাদি তার কাছেই হাত পেতেছেন মেয়েটির চিকিৎসার জন্যে। বিভিন্ন অফিস ক্লাবে ছুটে গেছেন ডোনেশান আদায় করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত ধার করতে শুরু করেছেন চিকিৎসার খরচ মেটাতে।

এত করেও শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে বাঁচানো গেল না। একটিমাত্র শিশু সন্তানকে অনাথ করে রেখে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। মারা যাবার আগে একটা সান্ত্বনা নিয়ে চোখ বুজেছিল সে, যে গীতাদি যখন আছে তখন তার সন্তানের কোনও ভাবনা নেই।

সেদিনও গীতাদির চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে গীতাদি প্রশ্ন করেছিলেন : ছেলেটার কী হবে রবিদা?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই কোন উত্তরও দিতে পারিনি। কিন্তু গীতাদি নিজেই সে উত্তর খুঁজে নিয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে, একে ধরে তাকে ধরে ছেলেটিকে একটি সৎ অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দিতে পেরেছিলেন।

এই হলেন গীতাদি। এঁকে 'হৃদয়বতী মহিলা' বলব না তো কাকে বলব।

আর এই গীতাদিকে একদিন অন্যের জন্যে নয়, নিজের জন্যেই হু হু করে কাঁদতে দেখেছিলাম। রাত একটার সময় গীতাদির সেই কান্না থামাতে গিয়ে আমার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। একটা মর্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতি গীতাদির মনে পড়ে গিয়েছিল তালতলার সেই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে। সেদিন অনেক কষ্টে গীতাদির কান্না প্রশমিত করতে পেরেছিলাম। সে ঘটনায় পরে আসছি।

গীতাদিরা থাকতেন দর্জিপাড়া অঞ্চলে। অভাবের সংসারে তাঁকে বড় স্কুলে পড়াবার ক্ষমতা ছিল

না। তাই জয় মিত্র স্ট্রিটের কর্পোরেশন স্কুলে গীতাদিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল লেখাপড়া শিখতে। কিন্তু সে পড়াশোনাও খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি।

গীতাদিরা যে বাড়িতে থাকতেন তার পাশের ঘরেই থাকতেন বিশিষ্ট গায়িকা রাধারানী দেবী। যদিও কীর্তন গায়িকা হিসেবেই রাধাদির খ্যাতি ছিল বেশি, তা সত্ত্বেও তিনি সব ধরনের গানই গাইতেন। রাধাদি অভিনয়জগতেও বেশ নাম করেছিলেন। সিনেমা আর থিয়েটার দুটোতেই। বেশ কয়েকটি নাটকে তিনি নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

রাধারানী দেবী মানুষটি যে খুব ভালো এটা আগেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে কত ভালো তার সম্যক পরিচয় পেয়েছিলাম তাঁর জিয়াগঞ্জের বাড়িতে দুটো রাত কাটিয়ে। 'দেশ' পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় রাধাদিকে নিয়ে একটা বড় লেখা লিখতে হয়েছিল। সেইজন্যেই তাঁর দেশের বাড়িতে দুটো রাত কাটানো। সেই সময়ে রাধাদি যে পরিমাণ যত্ন-আত্তি করেছিলেন তা কোনওদিনই ভুলতে পারব না।

সেই রাধাদি গীতাদিকে গান শিখিয়েছিলেন। গীতাদির একটা ঈশ্বরদত্ত গানের গলা ছিল নিশ্চয়। তা না হলে ওই শৈশবকালেই তিনি সায়গল সাহেবের গাওয়া গানগুলি নিখুঁতভাবে গাইতেন কী ভাবে? আর সেই গান শুনেই রাধাদি খুশি হয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসিয়ে গীতাদিকে দিনের পর দিন গানের তালিম দিয়েছেন।

গীতাদিদের সংসারে দারিদ্র্যের কামড়টা এতই প্রবল ছিল যে মাত্র ছ' বছর বয়সেই গীতাদিকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে। রাধাদিই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন থিয়েটারে অভিনয় করতে। মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে গীতাদি প্রবোধ গুহর নাট্যনিকেতন মঞ্চের শিল্পী হয়ে যান। ওই নাট্যনিকেতন থিয়েটারের পরে নাম হয় শ্রীরঙ্গম। এবং তারও পরে বিশ্বরূপা।

নাট্যনিকেতনে তখন অভিনীত হত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কালিন্দী' নাটক। ভূমেন রায়, নীহারবালা, শম্ভু মিত্র প্রমুখ কত বড় বড় শিল্পী তখন সেখানে অভিনয় করতেন। সেইসব দিনের স্মৃতি এখনও গীতাদির কাছে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তবে গীতাদির মাইনে পাঁচ টাকা ছিল বলে নাক সিঁটকাবার কোনও কারণ নেই। সেই ১৯৩৭ সালে পাঁচ টাকার অনেক দাম। তখনকার দিনে আড়াই টাকায় এক মণ অর্থাৎ চল্লিশ কেজি চাল পাওয়া যেত। অতএব গীতাদিদের দারিদ্র্যের সংসারে পাঁচটা টাকা অনেক উপকারে লেগেছিল।

'কালিন্দী' নাটকে গীতাদিকে গান গাইতে হত। রাধাদির তালিম পেয়ে গীতাদি তখন বেশ ভালোই গান গাইতে পারতেন। পরবর্তীকালে যখন অভিনয়ের ব্যাপারে বেশি মনঃসংযোগ করলেন তখন গান নিয়ে আর একদম চিন্তাভাবনা করতেন না। রেওয়াজ-টেওয়াজ সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে রেওয়াজ রাখলেও যে সেটা পরবর্তীকালে কোনও কাজে আসত না এটা বোঝা যায়। কারণ তখন প্রায় প্রতিটি নাটকেই গীতাদির ঝগড়ুটে চরিত্র। আর সেইসব চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে এত চেঁচামেচি করতে হত যে গান আপনি-আপনিই গলা ছেড়ে পালাত।

নাট্যনিকেতনে কিছুদিন কাজ করবার পর গীতাদি চলে গেলেন নাট্যভারতীতে। এখন যেটা গ্রেস সিনেমা তখন সেটাই ঠিল নাট্যভারতী থিয়েটার। এখানেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'দুই পুরুষ'। ওই নাটকে ছোট মমতার চরিত্রে অভিনয় করলেন তিনি। এখানেও সব বাঘা বাঘা শিল্পী। ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলি, প্রভা দেবী ইত্যাদি। ওখানেই 'ধাত্রীপান্না' নাটকে ছেলে সেজে অভিনয় করেছেন কিছুদিন।

এর কিছুদিন পরেই গীতাদির মা মারা গেলেন। সেটা ১৯৪৫ সাল। গীতাদির তখন মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গীতাদি দু'চোখে অন্ধকার দেখলেন। কী করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না।

ঠিক তার দু'বছর আগেই গীতাদি একটা সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির নাম 'দম্পতি'। পরিচালনা করেছিলেন বেণুদা অর্থাৎ নীরেন লাহিড়ি। ওই ছবির নায়িকা ছিলেন সুনন্দা দেবী। সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতাদিকে করতে হয়েছিল নায়িকার ছোটবেলার অংশটুকু। ওই ছবিতে কাজ করে

গীতাদি একশো টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

সেই বারো বছর বয়সে সিনেমার অভিনয়ের বিশেষ কোনও স্মৃতি নেই গীতাদির একমাত্র ওই একশো টাকার ব্যাপারটা ছাড়া। বারো বছরের মেয়ের কাছে একশো টাকা মানে একটা পুরো পৃথিবী কেনার রসদ। এছাড়া আর যা স্মৃতি আছে তা হল একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে শুটিং, চারপাশে অনেক আলো, অনেক মানুষ। ওই কিশোরী বয়সে সিনেমার ব্যাপারটা গীতাদির কাছে একদম ভালো লাগেনি। এ কীরকম অভিনয় রে বাবা! দুটো কথা বলতে না বলতেই থামিয়ে দিচ্ছে। ঘটনার আগামুড়ো কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এর থেকে থিয়েটার অনেক ভালো।

এখন সে-সব কথা ভাবলে গীতাদির হাসি পায়। এখন সিনেমায় একটা রোল পেলে কত পুলকিত হন। তা নিয়ে কত ভাবনা-চিন্তা করেন। থিয়েটার করাটা তো এখন তাঁর কাছে জলভাতের মতো।

বিশেষ করে মনে পড়ে 'ডাইনি' ছবিতে অভিনয়ের সময়কার কথা। সে ছবিতে তিনিই ছিলেন নায়িকা। রাতের পর রাত তাঁর চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ওই চরিত্রটি। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। ওটা যথাসময়ে বলা যাবে। তার চেয়ে বরং চলুন দেখা যাক, ওই যে চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে তার মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে, শেষ পর্যন্ত তার কী হল? এই নির্বান্ধব সংসারে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্যে কেউ কি এগিয়ে আসবে না?

অভিনেত্রী গীতা দে-র সারা জীবনটাই দুঃখের আস্তরণে মোড়া। দুঃখের পর দুঃখ পেতে পেতে বুকের ভেতরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সেই দুঃখের কালভোগ আজও চলেছে তাঁর জীবনে। কিন্তু নিজের জন্যে চোখের জল ফেলতে দেখেনি তাঁকে কেউ। একেবারে ঘনিষ্ঠজন যাঁরা, তাঁদের কাছে অশ্রুমোচন কবেছেন ঠিকই, তবে বাইরের কাউকে সেটা বুঝতে দেননি। বাইরে থেকে তাঁকে সবাই দেখেছে অন্যের জন্যে কাঁদতে। কিন্তু যাঁদের জন্যে কেঁদেছেন, তাঁরা অথবা অন্য কেউ বুঝতে পারেননি যে গীতাদির ওই কান্নার সঙ্গে কখন তাঁর নিজের জীবনের কান্নাও মিশে গেছে। কারণ তাঁর নিজের জীবনেও তো ঠিক ওদেরই মতো দুঃখের আঘাত নেমে এসেছে একের পর এক।

চোদ্দ বছর বয়সে মাকে হারাবার পর গীতাদি সেই যে আকুল হয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর বাইরের পৃথিবীতে প্রথম এবং শেষ কান্না। তারপর থেকে যত কান্না কেঁদেছেন এবং আজও কেঁদে চলেছেন তার হদিশ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি, ওই ঘনিষ্ঠ দু-চারজন ছাড়া। বাইরের সবাই তাঁর হাসিখুশি রূপটি দেখেছে, মমতাময়ী রূপটি দেখেছে, দু-একজন তাঁর লাস্যময়ী রূপটিও হয়তো দেখেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কান্নার এক বিরাট মহাসাগর বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন, সে খোঁজ ক'জন রাখে।

অথচ এমন একটা কান্নাভরা জীবন বয়ে বেড়াবার কথা তো তাঁর নয়। বিলিতি ডিগ্রিওয়ালা বিখ্যাত ডাক্তার অনাথবন্ধু মিত্রের কন্যা তিনি। উত্তর কলকাতার বনেদি বড়লোক কীর্তি মিত্রের বংশের রক্ত বইছে তাঁর শরীরে। মা রেণুবালা ছিলেন ডাকসাইটে সুন্দরী। বাবাও ছিলেন অপরূপ রূপবান এক পুরুষ। বাবার সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে আজও আবেশে দুটি চোখ বুজে আসে গীতাদির। উদ্ভাসিত মুখে বলেন : বাবার চেহারাটা ছিল ছিল গল্পে পড়া রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো। চোখের তারা দুটো ছিল গভীর নীল রঙের। বাবার ওই রূপের পাশে মানানসই বলেই মা মিত্তিরদের বাড়ির বৌ হতে পেরেছিলেন। না হলে দাদামশাইয়ের সাধ্য কী অতবড় বনেদি বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেন।

বলতে গেলে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়েছিল গীতাদির। কিন্তু সেই সুখের জীবন তছনছ হয়ে গেল একটি ঘটনায়। বাবা আর মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেল। মুখের কথায় নয়, আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল। মা আর বাবা আলাদা হয়ে গেলেন।

সেদিন গীতাদির সামনে আদালতের তরফ থেকে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল : মা আর বাবা এই দুজনের মধ্যে অভিভাবক হিসেবে কাকে বেছে নেবেন তিনি?

পাঁচ বছরের একটি মেয়ে জীবনের নানা জটিল অঙ্কের হিসেব-নিকেশ করতে শেখেনি তখনও। কোনদিকে গেলে প্রাচুর্যের আস্বাদ পাবে তারও হিসেব করেনি। অবলীলাক্রমে সে মায়ের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল : আমি মায়ের কাছেই থাকব।

শুনে মায়ের মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মা যখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন : তুই এমন বোকামি কেন করতে গেলি রে মা! বাবার কাছে থাকলে কত সুখে থাকতে পারতিস। আমি যে তোকে ভাল করে মানুষ করতেও পারব না।

মায়ের কান্নার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে গীতাদি সেদিন কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে মাকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরেছিলেন আর বলেছিলেন : আমি কোথাও যাব না মা, শুধু তোমার কাছেই থাকব।

মায়ের কান্না তাতে আরও বেড়ে গিয়েছিল। এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই কান্নাই ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী।

গীতাদির জন্ম ১৯৩১ সালে। গীতাদির জন্মদাতা পিতা ডাঃ অনাথবন্ধু মিত্র। পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে অজিতকুমার ঘোষ নামক এক ভদ্রলোককে পিতা হিসেবে মেনে নিতে হয়েছিল গীতাদিকে। কিন্তু এই ব্যাপারটি খুব সুখের হয়নি তাঁদের জীবনে। ওই ভদ্রলোক গীতাদির মাকে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা উপহার দেওয়া ছাড়া আর কোন বড় কাজ করতে পারেননি। যথোপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করতে পারেননি। যার জন্য গীতাদির মা রেণুদেবীকে বাধ্য হতে হয়েছিল অভিনেত্রী হতে। এবং মাত্র দু'বছর বয়সে গীতাদিও বাধ্য হয়েছিলেন অভিনয় করতে। না, শখের তাগিদে নয়, দৈনিক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। অল্প বয়সেই পড়াশোনায় ইতি ঘটাতে হয়েছিল। ক্লাস এইটের পর তাঁর বিদ্যালয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ। এই দুঃখ গীতাদির আজও যায়নি। আজও তিনি চোখের জল ফেলেন তার জন্যে।

জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বটি গীতাদির কাছে ভয়ানক তিক্ত। সেই তিক্ততা আজও তাঁর মন থেকে মিলিয়ে যায়নি। দিনের পর দিন তিনি দেখেছেন, তাঁর মা তাঁকে আর তাঁর দুটি ভাই-বোনকে নিয়ে জীবনযুদ্ধে কী পরিমাণ নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। শুধুমাত্র দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার পড়ে গেছে তাঁদের সংসারে।

না, গীতাদির মা রেণুদেবীর অভিনেত্রী হবার আকাঙ্ক্ষা কোনদিনই ছিল না। রাতের পর রাত রঙ মেখে সং সাজতে হয়েছে কেবল পেটের তাগিদেই। কিন্তু এত করেও তাঁদের দুঃখ মোচন হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত শিশু গীতাকেও মুখে রঙ মাখতে হয়েছিল।

আগেই বলেছি, গীতাদির প্রথম অভিনয় নাট্যনিকেতন মঞ্চে। অর্থাৎ প্রবোধ গুহর থিয়েটারে। এখন যেটি বিশ্বরূপা থিয়েটার, তিরিশের দশকে সেটিরই নাম ছিল নাট্যনিকেতন। পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ি যখন ওই থিয়েটার অধিগ্রহণ করেন তখন নাম পাল্টে রাখেন শ্রীরঙ্গম। তারও পরে এক সময়ে শিশিরবাবুর বিতাড়ন এবং রাসবিহারী সরকার ও দক্ষিণেশ্বর সরকারের হাতে পড়ে ওই থিয়েটারের নাম হল বিশ্বরূপা।

নাট্যনিকেতনের পাঁচ টাকা মাইনের শিল্পী গীতা তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' নাটকে এমন কোন বিশেষ ভূমিকায় সুযোগ পাননি যে তা নিয়ে আলোচনা করা চলে। তবে নাটকে উনি একখানা না দুখানা, ঠিক মনে নেই এখন, গান গাইতেন। সে গান শুনে দর্শকরা খুশি হয়ে যে তারিফ করতেন সেটা গীতাদির এখনও মনে আছে।

আর মনে আছে নীহারবালার কথা। তিনি ওই 'কালিন্দী' নাটকের মুখ্য অভিনেত্রী। কী সুন্দর রাজেন্দ্রাণীর মতো চেহারা। কী মেক-আপের আগে আর কী মেক-আপের পরে, তাঁর রূপ যেন সব সময়েই ফেটে ফেটে পড়ত। আর কারও নয়, শুধু নীহারবালা যে দৃশ্যে থাকতেন, সেই দৃশ্যগুলি শিশু গীতা উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন।

গীতাদির স্মৃতিচারণায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা গীতাদি, আপনার কি নীহারবালাকে দেখেই অভিনেত্রী হবার ইচ্ছে মনের মধ্যে জেগেছিল?

প্রশ্নটা শুনে গীতাদি একটু হাসলেন। তারপর বললেন : বানিয়ে বানিয়ে বলব, না সত্যি কথা বলব?

আমি বললাম : বা রে! বানিয়ে বলতে যাবেন কেন?

গীতাদি বললেন : সত্যি কথা যদি বলি তাহলে তো আপনি হাসবেন।

আমি বললাম : না না, একদম হাসব না। আপনি সত্যি কথাই বলুন।

গীতাদি বললেন : অভিনয় যে কী জিনিস তাই তো ভালো করে জানি না, কাজেই অভিনেত্রী হবার মতো বড় কোনও ভাবনা সেদিন মাথাতেই আসেনি। তবে আমার খুব ইচ্ছে করত নীহারবালার মতো ওইরকম সাজতে। ওই ভাবে মুখের ওপর আলো ফেলে স্টেজের ওপর দাঁড়াতে।

কথা দিয়েও রাখতে পারলাম না। গীতাদির কথা শুনে হেসেই ফেললাম। বললাম : বাঃ, শুধু এইটুকুই? শুধুই সাজের কথা মাথায় আসত?

গীতাদি বললেন : হ্যাঁ রবিদা, ছোটবেলা থেকেই আমার সাজবার বড় শখ। কিন্তু আমাদের বাড়িতে সাজবার কোনও উপকরণই ছিল না। ভালো পোশাকও ছিল না। আশেপাশে আমার সমবয়সীরা যখন প্রতিদিন বিকেলে সাজগোজ করে বেড়াতে কিংবা খেলতে বেরোত, তখন আমার কষ্টে বুকটা ফেটে যেত। মায়ের কাছে বায়না ধরলে মা আমাকে প্রথমে ধমক দিতেন, তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলতেন : হতচ্ছাড়া মেয়ে! কে বলেছিল তোকে আমার কাছে থাকতে আসতে? আজ তোর বাবার কাছে থাকলে তোর সাজগোজের অভাব।

বলতে বলতে মা কান্না চাপবার জন্যে আমার সামনে থেকে সরে যেতেন।

গীতাদির কথায় পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠল। আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

গীতাদি আবার বললেন : তবে আমার ছোটবেলায় সাজগোজের যে সুযোগটা আমি পাইনি, নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর, অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছায় দুটো পয়সার মুখ দেখবার পর, সেই সাধটা মিটিয়ে নিয়েছি আমার বোনের ওপর। আমার নিজের সাজবার স্পৃহাটা ততদিনে চলে গেছে। তাই বোনকে সাজাতাম মনের মতো করে। আমার ছোটবেলার যা কিছু আকাঙক্ষা তা এইভাবে মিটিয়ে নিয়েছি।

পরিবেশটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা গীতাদি, নাট্যনিকেতনে নীহারবালার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কেমন ছিল? আমি তো শুনেছি নীহারবালা নাকি ভয়ানক দাম্ভিক ছিলেন!

গীতাদি বললেন : দাম্ভিক বলতে যা বোঝায় নীহারমাকে দেখে তো আমার সে কথা মনে হয়নি কখনও। তবে কাজে যদি কেউ গাফিলতি করত তখন উনি তাঁকে ধমক-ধামক দিতেন। নীহারবালার সঙ্গে থিয়েটারের মালিক প্রবোধবাবুর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে থিয়েটারের সবাই নীহারবালাকে মালিকের মতোই দেখতেন। সেইভাবেই মান্য করতে দেখেছি সবাইকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি ধমক খাননি কখনও?

গীতাদি বললেন : থিয়েটারে আমার আর কী কাজ, আর কতটুকু সময়ই বা থাকতাম যে ধমক খাব। বরং উল্টে উনি মাঝে মাঝে আমাকে আদর করতেন। বাড়ি থেকে যেসব খাবার করে আনতেন, তা থেকে আমাকে খেতে দিতেন। প্রবোধবাবু তো খুব খাদ্যরসিক মানুষ ছিলেন। নিজে যেমন খেতে ভালোবাসতেন, তেমনি অন্যকে খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে ওঁর বাড়িতে ভোজের আসর বসত। বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে এনে নানা ভুরিভোজে আপ্যায়িত করতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার মা রেণুদেবী নাট্যনিকেতনে অভিনয় করেছিলেন নাকি?

গীতাদি বললেন : না না। মা অভিনয় করতেন নাট্যভারতীতে। এখন যেটা গ্রেস সিনেমা, তখন ওটাই ছিল নাট্যভারতী। ওখানে আমিও মায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম : কী নাটকে?

গীতাদি বললেন : 'দুই পুরুষ'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে। ছবিদা, সুলালদা (জহর গাঙ্গুলি), নরেশবাবু (মিত্র), যোগেশবাবু (চৌধুরি), প্রভামা—এঁরা সব অভিনয় করতেন ওই নাটকে। কঙ্কণার জমিদারের রোল করতেন যোগেশবাবু। আর আমার মা করতেন জমিদারগিন্নির রোল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কোন রোল করতেন ওই নাটকে?

গীতাদি বললেন : মমতা বলে একটা চরিত্র ছিল। পূর্ণিমাদেবী ওই রোলটা করতেন। আমি তার ছোটবেলার অংশটা করেছিলাম।

আমি বললাম : তখনও কি ওই পাঁচ টাকা মাইনেতেই কাজ করতেন?

গীতাদি বললেন : তা বলতে পারব না। নাট্যভারতীর টাকাটা তো আমি নিজের হাতে নিতাম না। মা নিতেন। তবে কিছু বেড়েছিল নিশ্চয়। তা না হলে আর নাট্যনিকেতন থেকে মা আমাকে ওখানে নিয়ে যাবেনই বা কেন।

জিজ্ঞাসা করলাম : আর কোন কোন নাটকে অভিনয় করেছেন ওখানে?

গীতাদি বললেন : সব নাটকের কথা মনে নেই। অনেক দিনের কথা তো। সেই ১৯৪২ সালের। তবে 'ধাত্রীপান্না' নাটকটায় যে অভিনয় করেছিলাম, সে কথাটা মনে আছে অন্য কারণে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কী কারণ?

গীতাদি বললেন : ওই নাটকটায় আমাকে ছেলে সাজানো হয়েছিল। মনে মনে ভারি মজা পেয়েছিলাম ছেলে সেজে।

বললাম : তখন আপনার বয়েস কত?

গীতাদি বললেন : কত হবে হিসেব করুন না। আমার তো ১৯৩১ সালে জন্ম, আর ধাত্রীপান্না যখন হচ্ছে তখন বোধহয় ১৯৪৩ সাল। তার মানে বারো বছর বয়েস।

আমি বললাম : ওরে বাবা, তাহলে তো বেশ বয়েস হয়ে গেছে তখন! অতবড় মেয়েকে ছেলে সাজাতে অসুবিধে হয়নি? তখন বোধ হয় আপনি খুব রোগাপটকা ছিলেন?

গীতাদি বললেন : না রবিদা। বয়েসের অনুপাতে আমার গ্রোথটা বরং একটু বেশিই ছিল। মেক-আপে ছেলে সাজতে গিয়ে রীতিমত কসরত করতে হত।

আমি বললাম : তাহলে আপনি ছোটবেলাটা এত দুঃখে কেটেছে বলে বলেন কেন গীতাদি! আপনারা মা আর মেয়ে দুজনে মিলে যখন রোজগার করতেন তখন তো আপনাদের বেশ ভালো ভাবেই চলে যাবার কথা!

গীতাদি বললেন : রবিদা, আপনার দেখছি সংসার সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। মা তো আর থিয়েটারের নায়িকা ছিলেন না যে ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা রোজগার করবেন। আর আমার তো শুনলেন পাঁচ টাকা কী দশ টাকা মাস মাইনে। ওদিকে আমরা দু'বোন, এক ভাই আর মা মিলিয়ে চারটি পেট খেতে। ওই টাকায় পেট চলাই মুশকিল তায় আবার বিলাসিতা। তবু যে খেয়ে-পরে বেঁচে ছিলাম, এর জন্যে আমরা শিশির মল্লিকমশাইয়ের কাছে ঋণী। উনি যদি আমাদের সেই সময়ে সাহায্য না করতেন তাহলে আমরা কোথায় যে ভেসে যেতাম।

আমি বললাম : মল্লিকমশাইয়ের কাছে কী ভাবে ঋণী আপনারা?

গীতাদি বললেন : উনিই তো মাকে চাকরিটা করে দিয়েছিলেন নাট্যভারতীতে। ওই স্টেজের উনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। আমাকেও উনি ওখানে সুযোগ করে দিয়েছিলেন স্নেহবশত। উনি আমাদের খুব স্নেহ করতেন।

আমি বললাম : তাই যদি হবে তাহলে উনি যখন মহেন্দ্র গুপ্তর পর সলিল মিত্রের স্টার থিয়েটারের দায়িত্ব নিয়ে 'শ্যামলী' নাটক করলেন তখন আপনাকে ডাকলেন না কেন? আপনি তো তখন রীতিমত নাম করে গেছেন অ্যামেচার স্টেজে। অথচ আমি যতদূর শুনেছি উনি খুব ভাল মানুষ, স্নেহশীল মানুষ। কারও মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাও যদি থাকে, তেমন শিল্পীদের উনি খুঁজে খুঁজে ডেকে এনে সুযোগ দিয়েছেন বড় হবার।

গীতাদি বললেন : আপনি ঠিকই শুনেছেন। শিশির মল্লিক সত্যিই বড় মাপের মানুষ। কিন্তু 'শ্যামলী' নাটকের সময় আমাকে ডাকলেন না কেন, সে কথাটা আমিও ভেবেছি। তখন একটু অভিমানও হয়েছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম উনি ঠিক কাজই করেছেন।

আমি বললাম : কেন?

গীতাদি বললেন : ডেকে এনে শ্যামলীতে আমাকে কী রোল দিতেন? সাবিত্রী নায়িকা করছে। নাটকে তো ওই একটিই নায়িকা। মাদার রোলে করছেন সরযূমা আর অপর্ণাদেবী। আমাকে রোল দিতে গেলে তো ওই বিয়ে বাড়িতে শাঁখ বাজানোর দৃশ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে হত। সেটা কি উনি দিতে পারেন, না আমিই করতে পারতাম অফিস ক্লাবের ডাকের পর ডাক ছেড়ে দিয়ে।

আমি বললাম : সেটা তো ঠিক কথা।

যাই হোক, ওই ছোটবেলাতেই অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন গীতাদি। নীরেন লাহিড়ির 'দম্পতি' ছবি দিয়ে যে শুরু, সে কথাটা তো আগেই বলেছি। তারপর পেয়ে গেলেন নন্দিনী, মনে ছিল আশা, বিশ বছর আগে, নন্দরানীর সংসার ইত্যাদি আরও অনেকগুলি ছবি। অবশ্যই শিশুশিল্পী হিসেবে এবং খুবই অকিঞ্চিৎকর সেই সব ভূমিকা। একের পর এক ছবিতে চান্স পাওয়ার একটাই কারণ। ঠিক সেই সময়ে পুরুষ শিশুশিল্পী অনেক ছিল বাংলা ছবির জগতে, কিন্তু মহিলা শিশুশিল্পী খুব বেশি ছিল না। এক দীপালি গোস্বামী, যিনি 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে কাননদেবীর শৈশবের চরিত্রটি করেছিলেন। তারও অনেক পরে এসেছিলেন শিখারানী বাগ।

১৯৪৫ সালে গীতাদির মা রেণুদেবী মারা গেলেন বেশ কিছুদিন রোগভোগ করে। সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা বলতে গিয়ে গীতাদি আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন : পরবর্তীকালে কত নিঃসহায় মানুষের চিকিৎসা করিয়েছি নিজের পয়সা দিয়ে, অন্যের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চেয়ে। কিন্তু মায়ের বেলা সে সুযোগটুকুও পাইনি। চোদ্দ বছরের একটা মেয়েকে কেই বা ভিক্ষে দেবে সেদিন। ভিক্ষে চাইতেও তো ভয় ছিল। নিজের পরিপুষ্ট চেহারাটার কথা ভেবে ভয়টা আরও বেশি করে পেতাম। যে হাত পেতে ভিক্ষে চাইব, সেই হাতটা যদি কেউ অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ধরতে চায় তখন কী করব? তাই ভিক্ষে চাওয়াও হল না, আর মায়ের চিকিৎসাও হল না। মা আমার প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেলেন।

একটু থেমে চোখের জল মুছে গীতাদি বললেন : তাই তো আজও যখন খবর পাই কোনও অসহায় মহিলার চিকিৎসা হচ্ছে না পয়সার অভাবে, তখন সেখানে ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াই। আমার যতটুকু সামর্থ্য তাই দিয়ে যথাসাধ্য চিকিৎসা করবার চেষ্টা করি। একদিন যে মেয়ে হয়েও মায়ের চিকিৎসা করাতে পারিনি, সেই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করি।

মা মারা যাবার পর ভাই-বোনের হাত ধরে মামাবাড়িতে গিয়ে উঠতে হল গীতাদিকে। সে জীবনটাও সুখের হয়নি। ভাই-বোনের মুখ চেয়ে মামা-মামির সংসারে দাসীবৃত্তি করতে আপত্তি ছিল না গীতাদির, কিন্তু সেই সঙ্গে যে অমানুষিক লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, সেটা যে সহ্য করা যাচ্ছিল না কিছুতেই।

ঠিক সেই সময়ে নিজের মায়ের মতোই পাশে এসে দাঁড়ালেন বন্দনাদেবী। অভিনেত্রী বন্দনাদেবীকে আজ আর হয়তো কারও মনে নেই, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বাংলা রঙ্গালয়ের দর্শকরা বন্দনাদেবীকে একডাকে চিনতেন। সেই প্রসঙ্গে গীতাদি বললেন : জানেন রবিদা, কর্মক্ষেত্রে আমরা বয়স্কা অভিনেত্রীদের মা বলে ডাকতাম। আজও ডাকি। যেমন প্রভা-মা, সরযূ-মা। কিন্তু বন্দনা-মা আমার কাছে শুধু মা-ই ছিলেন। ওঁর কাছে যা পেয়েছি তার অনেকটা আমি নিজের মায়ের কাছ থেকেও পাইনি।

এইভাবে বন্দনা মা-র সেবা করেই হয়তো গীতাদির বাকি জীবনটা কেটে যেত। কিন্তু সেই সময় অকস্মাৎ এক রূপবান পুরুষের আবির্ভাব ঘটল গীতাদির জীবনে।

আমার এক বন্ধু সেদিন ঠাট্টা করে আমায় বলে বসলেন : গীতা দে-কে নিয়ে এত বড় করে লেখবার কী আছে! উনি কি তত বড় মাপের শিল্পী যাঁর জন্য এতটা স্পেস্ খরচ করছেন?

আমার ওই বন্ধুটি নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণীভুক্ত বলে দাবি করেন। তাঁর ঠোঁটে গোদার, কাফকা ইত্যাদি মহা মহা রথীরা সব সময় ঝুলছেন। গীতা দে-র মতো পশ্চিমবঙ্গের একজন নগণ্য শিল্পী হঠাৎ তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়াতে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তবে এটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছে আমি সেই মুহূর্তে সংবরণ করেছিলাম। বুঝে নিয়েছিলাম, উনি গ্ল্যামারের ভক্ত। সংবাদপত্রের শিরোনামে যাঁদের নাম আসে না, গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনায় যাঁদের নাম উল্লিখিত হয় না, তাঁদের উনি শিল্পী বলেই গণ্য করেন না। কাজেই গীতা দে সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে সময়ের অপচয় করার প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

সুতরাং আমি ওঁর প্রশ্নটি না শোনার ভান করে সেই মুহূর্তে হরষদ মেহতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। দেখলাম বন্ধুটি সেই আলোচনায় মেতে গেলেন। আমিও বেনাবনে মুক্তো ছড়ানোর দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তবু প্রশ্নটা যখন উঠেইছে তখন আমার তরফ থেকে যৎকিঞ্চিৎ কৈফিয়ত দেওয়ার একটা দায় তো থেকেই যায়। আমি এর আগেও বলেছি, আবারও বলছি, 'স্মৃতির সরণি' পর্যায়ে আমি শিল্পীদের নিয়ে আলোচনা করছি বটে, কিন্তু আমার কাছে তাঁদের শিল্পীসত্তার থেকে মানুষী সত্তাটাই বড়। শিল্পকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবনের সংগ্রামটাকেই আমি বড় করে দেখি।

এই গীতা দে-র কথাই ধরুন না কেন! জীবন সম্পর্কে যখন কোন বোধোদয়ই হয়নি, সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে তাঁর সংগ্রাম। চোদ্দ বছর বয়সে যখন তাঁর কিঞ্চিৎ বোধোদয় হয়েছে তখন তাঁকে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর আজ এই বাষট্টি বছর বয়সে যখন তিনি উপলব্ধির চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছেন তখনও চলেছে তাঁর সংগ্রাম। শিল্পের জন্যে সংগ্রাম আর জীবনে বাঁচার জন্যে সংগ্রাম, দুটোই তাঁর কাছে আজ একাকার হয়ে গেছে।

আমি একজন নগণ্য মানুষ। গত বেয়াল্লিশ বছর ধরে সাংবাদিকতা করেছি কেবল পেশার খাতিরে। শিল্প নামক বৃহৎ বস্তুটিকে উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা আমার আছে বলে মনে করি না। শিল্পবোদ্ধা হিসেবে নিজেকে জাহির করার মতো ধৃষ্টতাও আমার নেই। বলা যায়, বৃহৎ একটি মহাসাগরের তীরে আমি এতদিন কয়েকটি নুড়ি কুড়িয়ে বেড়িয়েছি মাত্র।

সেই স্বল্প সঞ্চয়ের জোরে শিল্প অথবা শিল্পীর সমালোচনা করব এতবড় মূর্খ আমি নই। তাই তো আমি খুঁজে বেড়াই শিল্পীদের ভেতরকার সেই মানুষটিকে। আমার পরম সৌভাগ্য, সেইরকম কিছু মানুষের জীবনের নানা হাসিকান্নার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। স্মৃতির সরণিতে তাই তো তাঁদের সেই হাসিকান্নায় ভরা জীবন যুদ্ধের কথা বার বার ঘুরে ফিরে আসে। শিল্পীদের সেই ভেতরের মানুষটির কথাই কলমের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে। প্রসঙ্গত তাঁদের শিল্পসাধনার কথাও আসে বৈকি। তবে সেটা বহিরঙ্গ মাত্র। আসলে যা বলতে চাই সেটা হল মানুষের কথা। তাঁদের সংগ্রামের কথা। তাঁদের হাসি-কান্নার নানা চিত্র। তাতে কে কত জায়গা নিলেন সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হল সেই মানুষটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারছি কি না!

কৈফিয়তের পরিসর বিস্তৃত হয়ে গেল। আর নয়। এবারে আবার ফিরে যাই গীতাদির কথায়। অভিনেত্রী বন্দনাদেবীর বাড়িতে।

মামা-মামির সংসারে গীতাদিকে যা করতে হত, বন্দনাদেবীর বাড়িতেও সংসারের সেই যাবতীয় কাজ করতে হয়। তবে সেখানে অধিকন্তু হিসেবে ছিল লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। এখানে সেটা নেই। এখানে আছে বেশ কিছুটা স্নেহ আর মমতা। যে কারণে গীতাদি আর তাঁর ভাই-বোনের কাছে বন্দনাদেবী বন্দনা-মা নন, শুধুই মা।

কিন্তু এইভাবেই কি সারাটা জীবন কাটাতে হবে? কাজকর্মের অবসরে গীতাদিকে এই ভাবনাটাই পেয়ে বসে। ছোট ছোট ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। এই পরগাছার জীবন নিয়ে ওদের কি মানুষ করে তোলা সম্ভব?

ঠিক কথা, এখানে অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। কিছুটা স্নেহও পাওয়া যায়। কিন্তু সেটাই তো সব নয়। ভবিষ্যতে কী হবে? নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে যৌবনের পদধ্বনি শুনতে পান গীতাদি। সেই দাবিটাও ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাকেই বা ঠ্যাকাবেন কী করে?

ছোট্ট একটা সুরাহা হয়ে গেল কয়েকদিন পরেই। একদিন রাত্রে বন্দনা দেবীর পদসেবা করার ফাঁকে হঠাৎ বলে বসলেন : এইভাবে আর কতদিন তোমার ঘাড়ে বসে বসে খাব মা? বাড়তি তিনটে লোকের মুখে অন্ন জোগাতে তোমাকে যে কত পরিশ্রম করতে হয় তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাই।

বন্দনা দেবী বিছানায় শুয়ে শুয়ে গীতাদির সেবা গ্রহণ করছিলেন। কথাটা শুনে উঠে বসলেন। ভালো করে গীতাদির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন : তোদের কি এখানে অসুবিধে হচ্ছে?

গীতাদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : না না, কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তবে এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না। ভবিষ্যতের কথাটাও তো ভাবতে হবে।

বন্দনা দেবী প্রশ্ন করলেন : কী করতে চাস তুই?

গীতাদি বললেন : আমি তো সেই ছোটবেলা থেকে থিয়েটার করেছি। তোমাদের থিয়েটারে একটা

কাজ-টাজ হয় না? যে কোনও ধরনের কাজ?

গীতাদির কথাটা বন্দনা দেবীর মনে ধরল। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। দেখি চেষ্টা করে। তোকে এখন আর পা টিপতে হবে না। যা, শুগে যা।

দিন পাঁচ-ছয় পরে বন্দনা দেবী গীতাদিকে বললেন : গীতা, তুই আজ বিকেলে আমার সঙ্গে যাবি। বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। বড়বাবু তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

গীতাদি বললেন : বড়বাবু কে মা?

বন্দনা দেবী বললেন : আ মোলো ছুঁড়ি! বড়বাবুকে চিনিস না? শিশিরবাবু রে! শিশির ভাদুড়ি।

নামটা শুনে গীতাদি চমকে উঠলেন। শিশির ভাদুড়ি। ইদানীং থিয়েটারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না থাকলেও শিশিরবাবুকে চিনবেন না! থিয়েটারের আকাশে তিনি হলেন উজ্জ্বল এক ধ্রুবতারা। একটা যুগের প্রবর্তক।

পরক্ষণেই মনটা দমে গেল। শিশিরবাবুর কাছে অভিনয় করাটা সবাই ভাগ্য বলে মানে। অভিনেত্রী হিসেবে তার এমন কী যোগ্যতা আছে যে শিশিরবাবুর স্টেজে ঠাঁই পাবেন। নিশ্চয় অভিনয় নয়, অন্য কোন কাজের জন্যে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। থিয়েটারে তো অভিনয় ছাড়াও মেয়েদের আরও অনেক কাজ থাকে। বড় বড় অভিনেত্রীদের খিদমত খাটা। তাদের বেশ পরিবর্তনের সময় সাহায্য করা। হাতের কাছে এটা-ওটা-সেটা যুগিয়ে যাওয়া।

পরক্ষণে ভাবলেন, সে যে কাজই হোক, দুটো পয়সা তো পাওয়া যাবে। তার এখন অনেক পয়সার দরকার। ভাই-বোনকে মানুষ করতে হবে তো! বন্দনা-মা'র ওপর কত আর চাপ দেওয়া যায়।

সেদিন বিকেলে বন্দনা-মা'র হাত ধরে বড়বাবুর কাছে গেলেন শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে। বড়বাবু তখনও নিচে নামেননি। ওপরে নিজের ঘরেই ছিলেন। একটা মোটা চুরুট হাতে নিয়ে একখানা বই পড়ছিলেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ভয়ানক গম্ভীর চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় খুব রাশভারি মানুষ।

বন্দনা দেবী ঘরে ঢুকে বেশ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন : বড়বাবু, সেই মেয়েটিকে এনেছি।

শিশিরবাবু বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী সেই দৃষ্টি। গম্ভীর গলায় বললেন : কোন মেয়েটি?

বন্দনা দেবী বললেন : সেই যে যার কথা বলেছিলাম আপনাকে। আপনি আনতে বলেছিলেন।

কথাগুলো বলতে বলতেই বন্দনা দেবী গীতাদির পিঠে একটা খোঁচা দিলেন। খোঁচা খেয়েই গীতাদি জড়িত পায়ে শিশিরকুমারের পায়ের ধুলো নিতে এগিয়ে গেলেন।

শিশিরবাবু হাত তুলে নিরস্ত করলেন গীতাদিকে। মেঘমন্দ্র কণ্ঠে বললেন : থাক। ওসবের দরকার নেই।

আরপর তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন গীতাদির। জিজ্ঞাসা করলেন : কী নাম তোমার?

বন্দনা দেবী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। শিশিরবাবু ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : নামটা ওকেই বলতে দাও।

গীতাদি কোনরকমে জড়িত কণ্ঠে বললেন : গীতা। গীতা ঘোষ।

শিশিরবাবু আরও একবার দেখে নিলেন গীতাদির আদ্যোপান্ত। তারপর বন্দনা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন : ঠিক আছে। তবে এখন তো ওকে কোন পার্ট দেওয়া যাচ্ছে না। এখন রোজ এসে অভিনয় দেখুক। মেয়েদের রোলের পার্টগুলো মুখস্ত করুক। কেউ কামাই করলে তার জায়গায় যেন নামতে পারে। পয়সাকড়ি এখন কিছু পাবে না। পরে পার্ট-টার্ট পেলে ভেবে দেখা যাবে। যদি রাজি থাকো তবে নিয়ে গিয়ে হৃষীর কাছে ওর নাম ঠিকানা লিখিয়ে দিও।

বন্দনা দেবী বললেন : আমার ঠিকানাই ওর ঠিকানা বড়বাবু। ও আমার কছেই থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গীতাদি চুপি চুপি বললেন : পয়সা-কড়ি যে কিছু দেবে না বলছে মা?

বন্দনা দেবী চাপা গলায় বললেন : পয়সাকড়ির কথা ভুলে যা ছুঁড়ি! তোর অনেক ভাগ্যি বড়বাবুর থিয়েটারে ঠাঁই পেয়েছিস। এমন ভাগ্য সকলের হয় না। আমার এ কথার অর্থ আজ বুঝতে পারবি না।

পরে বুঝবি।

বন্দনা দেবীর এই উক্তির যাথার্থ্য গীতাদি সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারেননি। পেরেছিলেন আরও কিছুকাল পরে। সেদিন কেবল তাঁর মনে হয়েছিল, দুর, কী হবে ভূতের ব্যাগার খেটে! পয়সাই যখন পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন কোন অপরূপতনের সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন।

প্রথম কয়েকটা দিন মনমরা অবস্থায় গীতাদি শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত থিয়েটারগুলি দেখতেন। মহিলা চরিত্রের সংলাপগুলি মনে মনে আওড়াতেন আর মুখস্থ করতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন ভেতরে ভেতরে তাঁর একটা পরিবর্তন এসে গেছে। কোনও চরিত্রে অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হত তিনি যদি অভিনয় করতেন তাহলে অমুক জায়গাটা এইভাবে অভিনয় করতেন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে কিছুদিনের মধ্যেই গীতাদি হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন। শ্রীরঙ্গমে তখন অভিনীত হচ্ছে 'তখ্‌ৎ-এ-তাউস' নাটকটি। এতে জাহান্দার শা করতেন শিশিরকুমার স্বয়ং। আর ইমতিয়াজমহলের পার্ট করতেন ঝর্না দেবী।

এই ঝর্না দেবী ছিলেন তখনকার বিশিষ্ট অভিনেত্রী শেফালিকার (পুতুল) মেয়ে। সেই সময়ে অনেক নামকরা অভিনেত্রীর কন্যাই থিয়েটার করতেন : যেমন সুহাসিনী দেবীর কন্যা নীলিমা দাস, প্রভা দেবীর কন্যা কেতকী দত্ত ইত্যাদি। পথটা বিপদসঙ্কুল জেনেও ওইসব মায়েরা মেয়েদের উৎসাহিত করতেন অভিনয়ের ব্যাপারে। কারণ অভিনয়কলাকে তাঁরা অনেক বেশি মর্যাদা দিতেন।

শ্রীরঙ্গমে কয়েকদিন যাওয়া-আসার পরই ঝর্না দেবীর সঙ্গে গীতাদির সখ্যতা হয়েছিল। গীতাদির জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে ঝর্নার চোখেও জল এসে যেত।

সেই ঝর্না একদিন হঠাৎ গীতাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি যেটা করি সেই ইমতিয়াজমহলের ডায়লগ তোর মুখস্ত হয়ে গেছে?

গীতাদি বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ঝর্না বললেন : শোন, আমি একটা ভালো টাকার অফার পাচ্ছি রঙমহলে। ওখানে শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' নাটকটা হবে। পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত আমাকে ছোট বৌ-এর চরিত্র করতে বলছেন। একবার ভেবেছিলাম ওঁদের না বলে দিই। বড়বাবুর কাছেই থাকব। তারপর ভাবলাম, আমি যতদিন থাকব ততদিন তুই বড়বাবুর কাছে কোনও চান্সই পাবি না। তাই আমি ঠিক করেছি রঙমহলেই চলে যাব। তোকে তো বড়বাবু বলেছিল কেউ কামাই করলে তোকে চান্স দেবেন। তা এবারে দেখ চান্স পাস কি না! বড়বাবুর কাছে একবার চান্স পেলেই তোর বরাত খুলে যাবে। আমি জানি তোর মধ্যে মাল আছে। তা ছাড়া বড়বাবুর কাছে থাকলে বোবার মুখেও বুলি ফুটে যায়। তুই তো তার থেকে অনেক এগিয়ে আছিস। এখন দেখ ভাগ্যে কী আছে!

তা ঝর্নার কথাই শেষ পর্যন্ত ফলেছিল। শিশিরকুমার তাঁর নাটকে ইমতিয়াজমহলের চরিত্রে ঝর্নার জায়গায় গীতাদিকেই চান্স দিয়েছিলেন। আর গীতাদিও সেই নির্বাচনের মর্যাদা রেখেছিলেন।

ঠিক এই সময়েই গীতাদির জীবনে এসে গেলেন একজন পুরুষ। তালতলার এক বিখ্যাত ধনী বংশের সন্তান। সঙ্গত কারণেই তাঁর নামটা গোপন রাখতে হচ্ছে। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাণিপ্রার্থনা করলেন গীতাদির। একদিন এক শুভ মুহূর্তে চার হাত এক হয়ে গেল। গীতা ঘোষ থেকে গীতাদি হয়ে গেলেন গীতা দে।

গীতাদির কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আমি শুনেছিলাম আপনাদের ওটা লাভ ম্যারেজ। তাই কি?

গীতাদি বললেন : লাভ টাভ কিছু নয়। আমার তখন মাথার ওপর বিরাট বোঝা। প্রেম করার ফুরসত কোথায়? উনি প্রপোজাল দিয়েছিলেন আর আমি রাজি হয়েছিলাম একটা শর্তে।

আমি বললাম : কী শর্ত?

গীতাদি বললেন : আমার শর্ত ছিল আমার ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে চাকরি করে দিতে হবে। আর বোনের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেই শর্ত পালিত হয়েছিল?

গীতাদি কপালে করাঘাত করে বললেন : আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। আমার জীবনে তো কোনও ব্যাপারটাই সহজে আসেনি। বিয়ের পাঁচ বছর পর আমি দেখতে পেলাম, আমার স্থান রাস্তায়।

আমি বললাম : তার মানে? আপনাদের কি ডাইভোর্স হয়ে গেল?

গীতাদি বললেন : না রবিদা, ডাইভোর্স আমাদের হয়নি। আমি আজও স্বামীর পদবী বহন করছি। সিঁথিতে সিঁদুর পরছি। কিন্তু স্বামীর সংসারে ঢোকবার অধিকার আমার নেই। আমার জায়গায় আর একজন এসে গেছেন তাঁর জীবনে।

আমি বললাম : যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন?

গীতাদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : সব কথা বলা যাবে না রবিদা। ওপর দিকে থুতু ফেললে তো নিজের গায়েই পড়ে। তবে বিয়ের পর একটা বছর আমার খুব সুখে কেটেছে। আমার শ্বশুর খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। হাত-পা নাড়বার সামর্থ্য ছিল না। কথাবার্তা ঠিক ঠিক বলতে পারতেন না। আমার সঙ্গে যখন কথা বলতেন তখন সেই কথার মধ্যে দিয়ে স্নেহ ঝরে ঝরে পড়ত।

আমি বললাম : তাহলে অসুবিধেটা কোথায় ছিল গীতাদি?

গীতাদি বললেন : আমার শাশুড়ি আমাকে ভালো চোখে দেখেননি। তিনি ছিলেন আমার সৎ-শাশুড়ি। বিয়ের বছর দুই পরে আমাকে দু'মাসের জন্যে হাওয়াবদল করতে শিমুলতলায় পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনটে বছর অনেক ভাবে অ্যাডজাস্ট করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। দুই ছেলে আর দুই মেয়ের হাত ধরে ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

এরপর থেকে শুরু হল গীতাদির জীবন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়। এবারের সংগ্রাম একক সংগ্রাম। তখন আর তাঁর পাশে কেউ নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আবার শিশিরবাবুর কাছে ফিরে গেলেন না কেন?

গীতাদি বললেন : বড়বাবুর অবস্থা তখন বড়ই করুণ। তাঁর শ্রীরঙ্গম তখন ভাঙা হাট। তবে এর আগে বড়বাবুর কাছে 'এক অধ্যায়' বলে একটা নাটক পুরো এক বছর রিহার্সাল দিয়েছিলাম। বড়বাবু পোস্টার দিয়েও সে নাটক নামাতে পারেননি। তবে ওই রিহার্সালে বড়বাবুর কাছে যা শিখেছিলাম তা আমার চিরকালের পাথেয় হয়ে থেকেছে।

আমি বললাম : 'এক অধ্যায়' নাটকটা কি জিতেন মুখোপাধ্যায়ের লেখা যিনি বিহারের ছাপরায় ওকালতি করতেন।

গীতাদি বললেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন আপনি। চিনতেন নাকি ওঁকে?

আমি বললাম : খুব ভালো করেই চিনতাম। অসম্ভব গুণী মানুষ। ওঁর লেখা 'পরিচয়' নাটকটা তো শিশিরবাবু স্টেজ করেছেন। জিতেনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার বিডন স্ট্রিটের বাড়িতেও উনি এসেছেন বেশ কয়েকবার।

জীবন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে গীতাদিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল অ্যামেচার ক্লাব আর অফিস ক্লাবগুলি। অভিনয়ের নাড়া বেঁধেছেন শিশিরকুমারের কাছে, কিন্তু গীতাদির অভিনয়ের পরিপুষ্টি ঘটেছে শ্রীমঞ্চ ক্লাবে প্রেমাংশু বসুর কাছে। প্রেমাংশুবাবু তাঁকে কীভাবে চরিত্র বুঝতে হয়, চরিত্রের গভীরে যেতে হয়, সংলাপের স্ক্যানিং, কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়া হাতে ধরে ধরে শিখিয়েছেন। যে কারণে শিশির ভাদুড়ি যদি গীতাদির প্রথম গুরু হন তাহলে প্রেমাংশু বসু হলেন দ্বিতীয় গুরু।

গীতাদিকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম : প্রফেশ্যনাল স্টেজ আর অ্যামেচার স্টেজের মধ্যে কোনটা আপনার বেশি ভালো লাগত?

গীতাদি এক মুহূর্তও সময় না দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন : অ্যামেচার। প্রফেশ্যনাল স্টেজে একই নাটকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অভিনয় করতে করতে ক্লান্তি বোধ করি। কিন্তু অ্যামেচারে নিত্য

নতুন নাটক। পুরনো নাটক হলেও ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশকের কাছ থেকে নতুন নতুন ব্যঞ্জনা পাই। আমার অভিনয় শেখা তো সেখান থেকেই হয়েছে। আমি নিজেকে অ্যামেচার স্টেজের প্রোডাক্ট বলেই মনে করি।

তারপর একটু হেসে গীতাদি বললেন : একটা কথা বলব রবিদা, সেটা অন্যভাবে নেবেন না তো?

আমি বললাম : কী বলুন না!

গীতাদি বললেন : আমার তো মনে হয় শিশিরকুমার ভাদুড়িও অ্যামেচার থিয়েটারের প্রোডাক্ট।

আমি বললাম : এটা আপনার মনে হল কেন?

গীতাদি বললেন : তা না হলে অমন করে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেন না। অত ফ্রেশনেশ আসত না। প্রফেশ্যনাল স্টেজে হাতেখড়ি হলে তিনি একটা বাঁধাধরা ফর্মুলায় আবদ্ধ থেকে যেতেন।

আমি বললাম : কথাটা ভেবে দেখার মতো। পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছি না।

এইভাবে গীতাদি দিনের পর দিন অনুশীলনের পর একজন পরিপূর্ণ অভিনেত্রীতে রূপান্তরিত হলেন। এবং একদিন ডাক পেলেন স্টার থিয়েটার থেকে। প্রথমে ছিলেন 'অভয়া ও শ্রীকান্ত' নাটকে সাবস্টিটিউট। পরে সাবিত্রী চ্যাটার্জি স্টার ছেড়ে দেবার পর গীতাদি অভয়ার রোলে অভিনয় করতে লাগলেন। তারপর দীর্ঘ ষোলো বছর ওই স্টার থিয়েটারেই কাটিয়েছেন। স্টার থিয়েটারের আমলটাই গীতাদির অভিনয় জীবনের স্বর্ণযুগ। এরপর কাশী-বিশ্বনাথ মঞ্চে 'অঘটন' নাটকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন। পরবর্তীকালে রঙ্গনা থিয়েটারের বিভিন্ন নাটকে সুনাম কুড়িয়েছেন।

স্টার থিয়েটারে থাকাকালীন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গীতাদিব কমেডি অ্যাকটিং-এর একটা জুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই জুটি এমনই সুনাম অর্জন করে যে বিভিন্ন জলসাতেও এই জুটির কমেডি করার ডাক পড়তে থাকে। বেশ কয়েকটি রেকর্ডও বেরোয় ওঁদের। কমিক করতে গিয়ে তালতলায় আমার এক অনুষ্ঠানে গীতাদি যখন দেখলেন ওটা ওঁর শ্বশুরবাড়ির পাড়া, তখন তিনি সামলাতে পারেননি। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। ভানুদার মৃত্যুর পরও গীতাদির কমেডি স্কেচ প্রদর্শন অব্যাহত থেকেছে। এখন তাঁর জুটি কমেডিয়ান সুশীল চক্রবর্তী। এই জুটিও বেশ জনপ্রিয়।

থিয়েটারে নাম করার পর গীতাদির আবার ডাক পড়তে থাকে সিনেমা থেকে। অগ্রগামী গোষ্ঠীর 'শিল্পী' ছবিতে ওঁকে আমরা আবার দেখতে পাই। ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যেন ঘোষাল। এর আগে গীতাদি তাঁর ছোটবেলায় অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন শিশুশিল্পী হিসেবে। তবে বিস্ময়কর অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখলেন ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে।

কথায় কথায় একদিন গীতাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা গীতাদি, ঋত্বিক ঘটক তো একজন ইনটেলেকচুয়াল ডিরেকটার। ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হল কী ভাবে?

গীতাদি বললেন : ঋত্বিকবাবু তখন 'কত অজানারে' বলে একটা ছবি করছিলেন। ছবিটা শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট হয়নি। ওই ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে কালীদা, মানে অভিনেতা কালী ব্যানার্জি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা ঋত্বিকবাবু আমাকে পাত্তাই দিলেন না। নেহাত কালীদা নিয়ে গিয়েছিলেন বলে দয়া করে ছোট্ট একটা রোল দিলেন। প্রথম দিনের শুটিং-এ আমার কোন ডায়লগ ছিল না। কেবল একটা এক্সপ্রেশান দেবার ছিল। তা শট নেবার আগে ঋত্বিকবাবু বললেন : এই যে ভদ্রমহিলা, কী যেন আপনার নাম? হ্যাঁ, গীতা দেবী। তা এটা আপনার থিয়েটার নয়, সিনেমা। সেইভাবে এক্সপ্রেশানটা দেবেন। বুঝলেন?

ওঁর কথাবার্তা শুনে আমি কেমন নার্ভাস হয়ে গেলাম। সেই অবস্থাতেই চরিত্র অনুযায়ী এক্সপ্রেশান দিলাম। তারপরই একটা অঘটন ঘটে গেল। কাট বলার সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিকবাবু দৌড়ে এলেন আমার কাছে। বললেন : অসাধারণ! অসাধারণ! কী দুর্দান্ত সিনেমাটিক এক্সপ্রেশান দিলি রে তুই! তুই তো আমাকে পাগল করে দিবি রে!

ভেবে দেখুন রবিদা! প্রথমে পাত্তাই দিচ্ছিলেন না। তারপর একেবারে আপনি থেকে তুই! পারলে একেবারে মাথায় করে নাচেন আমাকে নিয়ে।

আমি বললাম : ঋত্বিকদা ওইরকমই। একজন রিয়্যাল আর্টিস্ট। ওঁর মতো ডায়নামিক পাগল আমি

খুব কমই দেখেছি। তারপর কি হল বলুন।

গীতাদি বললেন : 'কত অজানারে' তো বন্ধ হয়ে গেল। তারপর 'মেঘে ঢাকা তারা'-র স্ক্রিপ্ট করার পর আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, এ ছবির হিরোইন নীতার রোলটা তোকে করতে হবে। আমি তো আনন্দে ডগমগ। কিন্তু বাদ সাধলেন ওই ছবির পরিবেশক জনতা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের মহেন্দ্র গুপ্তা। তাঁর পছন্দ সুপ্রিয়া চৌধুরি। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয়াই নীতার রোল পেল।

ঋত্বিকবাবু আমাকে বললেন : এই ছবিতে তোকে নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ। তুই রাজি আছিস!

আমি বললাম : কী করতে হবে বলুন?

ঋত্বিকবাবু বললেন : আমি তোকে দিয়ে নীতার মায়ের রোল করাব। এটাই আমার চ্যালেঞ্জ। তুই কত বড় আর্টিস্ট সেটা সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই।

আমি বললাম : আপনি তো দারুণ করেছিলেন ও রোলটাতে। আপনার কম বয়েসটা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তবে আমার মতে 'ডাইনি' ছবিতেই আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। আপনি কী বলেন?

গীতাদি হাসতে হাসতে বললেন : এ সম্বন্ধে আমি আর কী বলব। আপনারা, সাংবাদিকরাই তো আমার শ্রেষ্ঠ বিচারক। তবে ওই ছবির কাজটা আমি পেয়েছিলাম ছবিদা অর্থাৎ ছবি বিশ্বাসের দৌলতে।

আমি বললাম : একটু ডিটেলে বলুন।

গীতাদি বললেন : 'ডাইনি'-র ওই রোলটা করার কথা ছিল তৃপ্তি মিত্রের। কিন্তু তৃপ্তিদি করলেন না। তারপর ওঁরা রুমা গুহঠাকুরতার কাছে গেলেন। তিনিও করলেন না। তখন ছবিদা বললেন, আমি একটি মেয়ের নাম সাজেস্ট করতে পারি। দারুণ অভিনয় করছে। তখন ওঁরা আমার কাছে এলেন। ছবিটা রিলিজের পর সব পত্র-পত্রিকায় আমার অনেক প্রশংসা বেরিয়েছিল। সেটাই আমার জীবনের বড় পুরস্কার।

গীতাদি সারা জীবনে অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার সঠিক হিসেব আমার কাছেও নেই। গীতাদির কাছেও নেই। এখনও ছবিতে আর নাটকে অভিনয় করে চলেছেন নিয়মিত। এর আগে সত্যজিৎ রায় ওঁকে ডেকে কাজ দিয়েছেন 'সমাপ্তি' ছবিতে। অপর্ণার মায়ের রোল। তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার সকলের ছবিতেই করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের ইনটেলেকচুয়াল ডিরেক্টারদের ছবিতে তেমন ভাবে কাজ করার সুযোগ পাননি বলে মনে একটা দুঃখ আছে গীতাদির।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব গীতাদির সেই অভিলাষও যেন পূর্ণ হয়।

কালীদা

সেদিনটা ছিল হাটবার। এমনিতে তেরপেখিয়া বাজারটা সকাল-দুপুর-সন্ধে লোকজনের ভিড়ে জমজমাট হয়ে থাকে। তার ওপর রবিবার আর বুধবার হাটের দিনগুলিতে তেরপেখিয়া বাজারের দীর্ঘ এলাকা জুড়ে মানুষের বন্যা বয়ে যায়। সাধারণভাবে চলতে-ফিরতে গেলেও রীতিমত কসরত করতে হয়।

এটা পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের কথা। সেবার আমার দেশ তমলুকে গিয়ে শুনলাম তেরপেখিয়া অঞ্চলে নাকি কী একটা ছবির শুটিং হচ্ছে। কার ছবি, কারা কারা অভিনয় করছেন, সেসব ডিটেইলস্ কেউ বলতে পারল না। বলা সম্ভবও নয়। তমলুক শহর থেকে তেরপেখিয়ার দূরত্ব অনেকখানি। ঘণ্টা দেড়েক বাসে যেতে হয়। তারপর হাঁটু সমান কাদা ভেঙে খেয়া নৌকোয় একটা নদী পার হতে হয়। বাসের সংখ্যাও কম। দু'খানা না তিনখানা বাস সারা দিনে যাওয়া-আসা করে।

কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার অবস্থাটাও হল সেইরকম। ক'দিন ছুটি কাটাতে দেশে এসেছি। কিন্তু শুটিং-এর কথা শুনেই পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল। কার শুটিং, কী শুটিং বিশদভাবে না জেনেই বেরিয়ে পড়লাম কাঁধে একখানা ব্যাগ ঝুলিয়ে।

তেরপেখিয়াতে আমার চেনাশোনা কেউ নেই। তবে শুনতে পেলাম আমাদের পাড়ার একটি ছেলে, তার নাম কমল বিকাশ সাহু, সে ওখানে কোন্ এক সরকারি দপ্তরে কাজ করে, শনিবার শনিবার বাড়ি আসে। সে থাকে একটা মেসে। কমল আমার বয়ঃকনিষ্ঠ। পরম স্নেহভাজন। আমরা ওকে ঝন্টু বলে ডাকি। তা ওর বাড়িতে খবর নিয়ে জানলাম, ও এই শনিবার বাড়ি আসেনি। ভালোই হল। শুটিং পার্টি যদি আমার পরিচিত না হয়, এবং ওদের ক্যাম্পে যদি স্থান না পাই, তাহলে ঝন্টুর মেসে আশ্রয় নেওয়া যাবে।

তেরপেখিয়ায় যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। নদী পার হয়ে বাঁধের গায়ে ছোট্ট একটা পুকুর। ওই পুকুরে হাত-পা ধুয়ে জুতো পরে চুল-টুল আঁচড়ে খানিকটা ভদ্রলোক হয়ে নিলাম। তেরপেখিয়া বাজার তখন লোকে লোকারণ্য। সেই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগলাম। সবার আগে ঝন্টুর মেসটা খুঁজে বার করা দরকার। কিন্তু সে এখন মেসে আছে কি? যদি না থাকে তাহলে কী হবে? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ভিড় কাটিয়ে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ ওই ভিড়ের মধ্যে কালী ব্যানার্জিকে দেখতে পেলাম। মাথা নিচু করে নিজের মনে হেঁটে চলেছেন। কালী ব্যানার্জি ঠিক সেই সময়ে বাংলা ছবির টপ্ গ্ল্যামারদের অন্যতম। তাঁকে নায়ক করে ছবি তৈরি হচ্ছে। তাঁর কথা ভেবে ছবির গল্প নির্বাচন করা হচ্ছে। সেই কালী ব্যানার্জি হেঁটে বেড়াচ্ছেন অথচ তাঁর দিকে কেউ তাকিয়ে দেখছে না, সামান্যতম কৌতূহলও প্রকাশ করছে না দেখে একটু অবাকই হলাম। কলকাতা শহরে তো এমন দৃশ্য ভাবাই যায় না! এমন কি তমলুকের মতো মফঃস্বল শহরেও।

পরে ভাবলাম এটাই স্বাভাবিক। তেরপেখিয়া তমলুক মহকুমার অন্তর্গত হলেও সংস্কৃতির ব্যাপারে এই অঞ্চলটা খুবই পশ্চাৎপদ। আশেপাশে দু-দশ মাইলের মধ্যে কোন সিনেমা হল নেই। এখন হয়তো হয়েছে, কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলছি তখন এই অবস্থাই ছিল। সুতরাং সেখানকার গ্রাম্য মানুষরা যে কালী ব্যানার্জিকে চিনতে পারবে না, তাতে আর আশ্চর্যের কী!

আর শুটিং? সেটা যে কী বস্তু তা ওই অঞ্চলের মানুষ দেখেওনি, শোনেওনি। বস্তুত তখন পর্যন্ত তমলুক মহকুমার কোথাও কোন শুটিং হয়নি। পরে পরিচালক তপন সিংহ গেঁওখালিতে এবং মহিষাদল রাজবাড়িতে অনেক শুটিং করছেন। তাঁর 'অতিথি' ছবির একটা বিরাট অংশ তো ওইখানেই তোলা হয়েছে। পরে তপনবাবুর তত্ত্বাবধানে বলাই সেনের 'কেদার রাজা' ছবির শুটিং হয়েছে তমলুক

রাজবাড়িতে। তারপর থেকে আরও কত ছবির শুটিং ওইসব অঞ্চলে হয়েছে এবং হচ্ছে।

যাই হোক, কালী ব্যানার্জিকে ভিড়ের মধ্যে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াতে দেখে আমি তাঁর কাছাকাছি হবার চেষ্টা করলাম। দু-তিন হাত দূরত্বে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন পিছন থেকেই ডাকলাম : কালীদা!

কালীদা যেমন মাথা হেঁট করে হাঁটছিলেন সেইভাবেই পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে উত্তর দিলেন : উঁ?

আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। একটা মানুষ পেছন ফিরে না তাকালে তাঁর সঙ্গে কথা বলি কী করে? তাই আবারও ডাকলাম : কালীদা!

কালীদা ঠিক একইভাবে চলার গতি না কমিয়েই উত্তর দিলেন : বলো না কী বলবে।

এবারে আমার একটু রাগ হয়ে গেল। বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম : পেছন ফিরে না তাকালে কথাটা বলি কী করে?

কালীদা বললেন : পেছন ফিরে তাকাবার দরকার কী। চোখ দিয়ে তো আর কথা শুনতে হয় না, কথা শুনতে হয় কান দিয়ে। আমার কান দুটো তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে। কী বলবে বলে ফেলো না ভাই।

এবারে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কালীদা নিশ্চয় আমাকে তেরপেখিয়া বাজারের কোনও হাটুরে ভেবেছেন। সুতরাং নিজের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। বললাম : আমি কলকাতা থেকে আসছি। উল্টোরথ পত্রিকা থেকে।

উল্টোরথ শব্দটি এক মুহূর্তের মধ্যে ম্যাজিকের মতো কাজ করল। কালীদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। বোধহয় জরিপ করবার চেষ্টা করলেন আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি।

কয়েকটা মুহূর্ত সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আমার মুখটা যেন চেনা চেনা বোধ হল তাঁর। সামনাসামনি আলাপ হয়নি কখনও, কিন্তু স্টুডিওপাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে তো দেখেছেন। তাই পরিচিতের ভঙ্গিতে বললেন : আরে! কী ব্যাপার? কখন এলে?

আমি বললাম : এই তো আসছি। আপনাদের আজ শুটিং নেই?

কালীদা বললেন : না। হাটের দিন লোকজনের ভিড় বেশি হয় বলে আজ শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। কাল সকাল থেকে আবার শুটিং।

আমি বললাম : কী ছবি?

কালীদা বললেন : তেরো নদীর পারে।

আমি বললাম : ডিরেক্টারের নাম কী?

কালীদা বললেন : বারীন সাহা।

আমি বললাম : এ নাম তো আগে শুনিনি কখনও!

কালীদা বললেন : শুনবে কী করে! ইনি তো এই প্রথম ছবি করছেন। এর আগে ফ্রান্সে ছিলেন, জার্মানিতে ছিলেন, ইটালিতে ছিলেন। ফিল্ম সংক্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা সব সেখানেই।

আমি বললাম : আপনি এখানে আছেন কোথায়?

কালীদা আঙুল দিয়ে খানিকটা দূরে একটা হলদে রঙের মাঠকোটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন : আমি ওই বাড়িটার দোতলায় থাকি।

আমি বললাম : ওখানে গেলে সবাইকে পাব?

কালীদা বললেন : না না, ওখানে শুধু আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। বাকি সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কাল শুটিং আছে তো, স্পটে গেলে সবাইকার দেখা পেয়ে যাবে।

আমি বললাম : আপনি কি এখন বাড়ি ফিরবেন?

কালীদা বললেন : সারাদিন তো বাড়িতেই ছিলাম। এখন একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। খানিকটা পরে ফিরব। কেন বলো তো?

আমি বললাম : একটু কথা-টথা বলতাম আর কি!

কালীদা বললেন : বেশ তো! সন্ধেবেলা চলে এসো আমার ঘরে। আমার ওখানেই চা-টা খাবে। তা তোমার নামটি কী ভাই?

আমি বললাম : রবি। রবি বসু।

কালীদা বললেন : আরে আরে, তোমার লেখা তো আমি পড়েছি। উল্টোরথে তোমার ছবিও দেখেছি। তা তুমি উঠেছ কোথায়?

আমি বললাম : আমার পরিচিত একটি ছেলে এখানকার একটা মেসে থাকে। তার ওখানেই থাকব।

কালীদা বললেন : তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

আমি বললাম : না। তার মেসটা কোথায় সেটা খুঁজে বার করতে হবে।

কালীদা বললেন : তাহলে আগে তাকে খুঁজে বার করো। নইলে খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। এখানে থাকবার মতো কোন হোটেল-টোটেল নেই। ওকে যদি খুঁজে না পাও তাহলে আমার ওখানে চলে আসবে। বারীনকে বলে তোমার একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে তো!

প্রথম আলাপেই আমার জন্যে কালীদার এই উদ্বেগ আমাকে যেমন মুগ্ধ করল, তেমনি বিস্মিতও করল। বুঝলাম, এই মানুষটির মধ্যে হিউম্যান কোয়ালিটিজ প্রচুর। তখনও কিন্তু কালীদার মধ্যেকার মানুষটির সম্যক পরিচয় আমি পাইনি। শুনেছি উনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন। প্রগতিশীল নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য অনেক অভিনেতা যেভাবে জনসাধারণের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বপ্নের মিনারে বসবাস করেন, কালীদা সেই গোষ্ঠীভুক্ত নন।

কালীদা চলে যাবার পর আমি ঝণ্টুর আস্তানার খোঁজে লেগে পড়লাম। নানান জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘণ্টাখানেক পরে ঝণ্টুর মেসের সন্ধান পেলাম। ঝণ্টু তখন মেসে একাই ছিল। ওর সঙ্গে আর যে দু'টি ছেলে থাকে তারা উইক-এন্ডে বাড়ি গেছে।

আমাকে দেখে ঝণ্টু আনন্দে আর আবেগে কী করবে ভেবে উঠতে পারল না। আমার ওর ওখানে আসাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে সেটা ওর হাবেভাবেই প্রকাশ পেতে লাগল। ও কেবলই বলতে লাগল : রবিদা, আমার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হবে আপনার। আমরা তিনটে ব্যাচেলার কোনমতে মাথা গুঁজে থাকি। আপনি কি এখানে থাকতে পারবেন?

আমি বললাম : খুব পারব। নদীর ধারে খোলা মাঠের ওপর রাত কাটানোর থেকে তো এটা ভালো। তোমার এখানে মাথার ওপর একটা ছাদ তো আছে। আমার কোনও কষ্ট হবে না।

আমাকে মুখ-হাত ধোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে ঝণ্টু কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। মিনিট পনেরো পরে ও আমার সামনে একখানা কাঁসার বাটিতে গরম গরম মটরসেদ্ধ মাখানো এক বাটি মুড়ি ধরে দিলে। তার ওপর বিরাট বড় বড় সাইজের দু'খানা আলুর চপ। হাত দিয়ে বুঝলাম সদ্য ভাজিয়ে এনেছে। মুখে দিয়ে দেখলাম অতি উপাদেয়। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বেশ খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। বেশ তৃপ্তি সহকারে মুড়ি-তেলেভাজা খেতে লাগলাম।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে একটা প্লেট এনে আমার সামনে ধরে দিলে। তার ওপর মার্বেলের সাইজের গোল গোল চারখানা সাদা রঙের মিষ্টি।

আমি বললাম : এটা আবার কী?

ঝণ্টু বললে : এখানকার ভাষায় ওগুলো হল সন্দেশ। এছাড়া এখানে অন্য কোনও ভাল মিষ্টি পাওয়া যায় না। জিলিপি আর বোঁদে অবশ্য পাওয়া যায়। তবে তেলে ভাজা। সেগুলো আপনি মুখে দিতে পারতেন না।

আমি বললাম : মিছিমিছি এগুলো আনতে গেলে কেন? এর কোনও দরকার ছিল না।

ঝণ্টু বললে : বা রে! আমার এখানে প্রথম এলেন আর আপনাকে একটু মিষ্টিমুখ করাব না, তা কি হয়!

ঝণ্টুর অনুরোধে একটা মিষ্টিতে কামড় দিয়েই লাফিয়ে উঠলাম। খেতে খারাপ নয়, কিন্তু এত শক্ত যে দাঁত ভেঙে যাবার যোগাড়। কালীদা কিংবা শুটিং-এর অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই সন্দেশ খান নাকি রোজ? কে জানে।

ঝণ্টু চা বলে এসেছিল। একটা গেঞ্জি গায়ে বছর বারোর ছেলে গ্লাসে করে দুটো চা নিয়ে এল। চা খেতে খেতে ঝণ্টু বলল : আপনি একটু বসুন রবিদা। আমি বাজার থেকে ডিম-টিম কিছু কিনে নিয়ে আসি। রাত্রে ডিমের ঝোল আর ভাত করে ফেলব।

আমি বললাম : ওসব ঝামেলা করার দরকার কী! এখানে হোটেল-টোটেল আছে তো? সেখানে গিয়েই দু'জনে খেয়ে আসব।

ঝণ্টু বললে : এখানে গোটা দুই-তিন পাইস হোটেল আছে। মেসে কেউ না থাকলে আমি সেখানেই খাই। কিন্তু আপনি খেতে পারবেন না। যাচ্ছেতাই রান্না। হাটুরে লোকজন খায় বলেই হোটেলগুলো চলে।

আমি বললাম : তবে তাই করো।

কথায় কথায় সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম : আমি একটু বেরোচ্ছি। কালীদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

ঝণ্টু বললো : কে কালীদা?

আমি বললাম : বলো কী! তুমি কালী ব্যানার্জিকে চেনো না! তোমাদের এখানে একটা ছবির শুটিং হচ্ছে জানো? কালী ব্যানার্জি সেই ছবিতে অভিনয় করছেন। আমার সঙ্গে হাটে দেখা হয়েছিল।

ঝণ্টু বললে : হ্যাঁ হ্যাঁ। দিন তিনেক ধরে শুটিং হচ্ছে জানি। আমরা তো সকাল থেকেই অফিসে বেরিয়ে যাই, তাই শুটিং দেখা আর হয় না। ভেবেছিলাম আজ দেখব। কিন্তু রবিবার বলে শুটিং বন্ধ রেখেছেন ওঁরা। তা আপনি কি ওই শুটিং কভার করতে এসেছেন নাকি?

আমি বললাম : ঠিক তা নয়। ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম, শুনলাম শুটিং হচ্ছে, তাই একবার ঘুরেফিরে দেখতে এলাম। তা তুমি রান্না চড়াও। আমি একবার কালীদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, ঝণ্টু বললে : আপনার সঙ্গে টর্চ আছে রবিদা?

আমি বললাম : না তো।

ঝণ্টু বললে : তাহলে আমার টর্চটা নিয়ে যান। ফেরবার সময় বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তা অন্ধকার থাকবে। টর্চ না থাকলে চলাফেরার অসুবিধে হবে।

তখনও এই অঞ্চলে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। শুধু ওখানে কেন, মহকুমা শহর তমলুকেই ইলেকট্রিসিটি ছিল না তখন।

কালীদার ঘরে গিয়ে দেখলাম তাঁর টেবিলের ওপর একটা বড়সড় টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। তারই অপ্রতুল আলোয় কালীদা একটা বই পড়ছেন। সাধারণ মানুষের ধারণা ফিল্মের আর্টিস্টরা দারুণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকেন। তাঁরা তো আর জানেন না, গ্রামাঞ্চলে কোন ছবির আউটডোর পড়লে তাঁদের কী কষ্টের মধ্যে থাকতে হয়। শুধু গ্রামেই বা কেন। শহরে হয় না? সারাদিন একটা বন্ধ ফ্লোরের মধ্যে কাজ করাও তো কম কষ্টের নয়। যে কোন সুস্থ মানুষ ওই পরিবেশে ঘণ্টা দুই-তিন থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখুন। ওই বন্ধ ফ্লোরের মধ্যে সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যাচ্ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, তারই মধ্যে তাঁরা প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় করছেন, রোম্যান্টিক সব কথাবার্তা বলছেন। ছবির পর্দায় সেসব দৃশ্য দেখে দর্শক আনন্দে আকুল হচ্ছে। কিন্তু এর পেছনে যে তাঁদের কত কষ্ট সে খবর ক'জন রাখে। লোকে শুধু জানে আর্টিস্টরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে। কিন্তু তার পেছনে কত কষ্ট, দিনের পর দিন ওইভাবে কাজ করতে করতে জীবনীশক্তির কতটা ক্ষয় হয়, সে কথাটা ক'জনই বা ভাবেন।

কালীদা একমনে বই পড়ছিলেন। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম : কালীদা, আসব?

কালীদা বই থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বইটা বন্ধ করে বলে উঠলেন : আরে এসো এসো। তোমার ওই মন্টু না কে তার দেখা পেয়েছো?

আমি বললাম : মন্টু নয়, ঝণ্টু। হ্যাঁ। দেখা পেয়েছি। ওর ওখানে থাকার ঠিক হয়ে গেছে।

কালীদা বললেন : ভালোই হয়েছে। ইউনিটের সঙ্গে তুমি থাকতে পারতে না। অসুবিধে হত। ওদেরই থাকার নানা প্রবলেম্।

হঠাৎ কালীদা ঘরের ভেতরের দরজার দিকে মুখ করে ডাক দিলেন : প্রীতি, একবার শোনো!

দু-এক মিনিট পরেই ওই দরজা দিয়ে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। কালীদা তাঁকে দেখিয়ে বললেন : আমার স্ত্রী প্রীতি।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। কালীদা আমাকে দেখিয়ে বৌদিকে বললেন : আর এ হল উল্টোরথ পত্রিকার রিপোর্টার। তারপর মাথাটা একবার চুলকে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক মুখে বললেন : হ্যাঁ, কী যেন নামটা তোমার?

কালীদার অবস্থা দেখে আমি হেসে ফেললাম। বৌদির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললাম : বৌদি, আমার নাম রবি। রবি বসু। কালীদার যা ভোলা মন, তাই নামটা আপনাকেই জানিয়ে রাখলাম।

বৌদিও হাসতে লাগলেন আমার কথা শুনে। বৌদিকে হাসলে ভারি মিষ্টি দেখায়। চেহারাটাও বেশ মিষ্টি। শুনেছি ওঁদের নাকি ভালোবাসার বিয়ে। পার্টির কাজ করতে করতেই আলাপ পরিচয়। তারপর পরিণয়।

প্রীতি বৌদির চেহারার মধ্যে একটা আপাত কাঠিন্য আছে। সেটা মনে হয় মাঠে-ময়দানে ঘুরে ঘুরে রাজনীতি করার জন্যেই হয়েছে। কিন্তু ভেতরের মিষ্টত্ব তাঁর চেহারার মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয়। কথায়-বার্তায় খুব অ্যাকমপ্লিসড্। বৌদির সঙ্গে ওই তেরপেখিয়ার পর আর বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আমি কোনদিন কালীদার বাড়িতে যাইনি তো। বৌদির সঙ্গে আর একবার যে দেখা হয়েছিল সেটা রূপবাণী সিনেমায় উল্টোরথের ফাংশানে। সেদিন বৌদিই আমাকে দেখতে পেয়ে ডেকে কথা বলেছিলেন। তিনিই বরং কালীদাকে ডেকে বলেছিলেন : ও কী। হন হন করে চলে যাচ্ছ যে! রবির সঙ্গে কথা বলো।

কালীদা লজ্জা পেয়ে থেমে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন : স্যরি রবি, আমি খেয়াল করিনি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। আমাকে নিয়ে তোমার লেখাটা পড়েছি। খুব ভালো হয়েছে। মেনি মেনি থ্যাংকস্।

যে লেখাটার কথা কালীদা বললেন সেটা ওই তেরপেখিয়ার আউটডোর থেকে ফেরার পব আমার একমাত্র ফসল। 'একমাত্র' কথাটা কেন বললাম, সেটা পরে বুঝিয়ে বলছি।

তা সেদিন তেরপেখিয়ার ওই ঘরে আমার কথা শুনে বৌদির সঙ্গে কালীদাও হাসিতে যোগ দিলেন। বললেন : প্রীতির কাছে এটা মোটেই নতুন কিছু নয়। আমি মাঝে মাঝে ওর নামটাই ভুলে যাই। সেটাও ওর কাছ থেকেই জেনে নিতে হয়। কী যে ভোলা মন আমার।

বুঝলাম কালীদা সত্যিই একজন আত্মগত মানুষ। রাজনীতির সূত্রে যতই জনতার সঙ্গে থাকুন না কেন, উনি ওঁর নিজের মধ্যেই বসবাস করেন। যাঁরা সত্যিকারের আর্টিস্ট তাঁদের তাই করতে হয়। বাইরের পৃথিবীকে ভুলতে না পারলে স্রষ্টার নিজস্ব পৃথিবী তৈরি হয় না।

ওইদিন ওই হাসিঠাট্টার মধ্যেই কালীদা বললেন : এই রবি, তুমি চা খাবে তো?

আমি বললাম : কী দরকার! এই তো ঝণ্টুর ওখান থেকে চা খেয়ে এলাম।

কালীদা বললেন : ইচ্ছে করলে খেতে পারো। নীচে চায়ের দোকান আছে। বলে পাঠালেই দিয়ে যাবে। আমাদের ঘরে উনোন জ্বালার ব্যবস্থা নেই। রাত্রের খাবার ইউনিটের কিচেন থেকে দিয়ে যায়। তুমি কিন্তু আজ আমাদের সঙ্গে খাবে।

আমি বললাম : তা হয় না কালীদা। ঝণ্টু আমার জন্যে ডিমের ঝোল আর ভাত করছে। না খেলে ও মনে কষ্ট পাবে।

কালীদা বললেন : ঠিক আছে। কাল দুপুরের খাবার কিন্তু শুটিং স্পটে আমরা একসঙ্গে খাব। তুমি কাল সকাল আটটায় স্পটে চলে এসো। তোমার সঙ্গে এ ছবির পরিচালক বারীন সাহার আলাপ করিয়ে দেব। ভারি ইন্টারেস্টিং মানুষ। তোমার ভালো লাগবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : শুটিং স্পটটা কোথায় কালীদা?

কালীদা বললেন : এই তো নদীর ধার বরাবর একটু এগোলেই দেখতে পাবে একটা সার্কাসের তাঁবু। ওটাই আমাদের শুটিং স্পট।

আমি বললাম : আমি ঠিক সকাল আটটাতেই পৌঁছে যাব ওখানে। কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে

খানিকক্ষণ কথা বলতে চাই। আপনার সময় হবে?

কালীদা বললেন : কী ব্যাপার বলো তো?

আমি বললাম : আমাদের পত্রিকায় আপনার একটা ইন্টারভিউ ছাপতে চাই। .

কালীদা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন : না না। ওসব জীবনী-টিবনী আমি পছন্দ করি না।

আমি বললাম : জীবনী নয় কালীদা। আপনাব জীবন, আপনার সংগ্রাম, আপনার স্বপ্নের মুখোমুখি হতে চাই।

কালীদা বললেন : বাঃ, বড় ভালো কথা বলেছ তো! তোমার সঙ্গে আমার জমবে দেখছি।

কিন্তু পরবর্তীকালে সেই কালীদার সঙ্গে আমার একদিন প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হয়ে গেল।

একটা কথা বললে হয়তো আজ অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে, অভিনেতা কালী ব্যানার্জি একটা সময়ে প্রায় উত্তমকুমারের মতোই জনপ্রিয় ছিলেন। রাস্তায়-ঘাটে কিংবা কোন অনুষ্ঠানে কালী ব্যানার্জিকে একটিবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে মানুষজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দেখতে পেলে 'গুরু, গুরু' রব তুলে চতুর্দিক প্রকম্পিত করতেন।

এ ব্যাপারটা এতটুকু অতিশয়োক্তি নয়। এসব ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। এরকম একটা ঘটনার কথা বলি।

সেবার উল্টোরথ পত্রিকার পুরস্কার বিতরণ উৎসব হচ্ছে রূপবাণী সিনেমায়। সেই সময়ে উল্টোরথ পুরস্কারের খুব সম্মান ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, তখন বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ বি এফ জে এ পুরস্কারের পরই উল্টোরথ পুরস্কারের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তখন তো আর আজকালকার মতো অলিতে-গলিতে অমুক স্মৃতি পুরস্কার আর তমুক স্মৃতি পুরস্কারের ছড়াছড়ি ছিল না। ভারত সরকারের জাতীয় পুরস্কারের প্রবর্তন তখনও হয়নি। বি এফ জে এ পুরস্কার নির্ধারিত হত সাংবাদিকদের ভোটে। আর উল্টোরথ পুরস্কার পাঠক-পাঠিকাদের ভোটে। তবে পাঠকদের দেওয়া ভোটের পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করে রূপাঞ্জলি পত্রিকা। কিন্তু উল্টোরথ পুরস্কারের মতো গ্ল্যামাব রূপাঞ্জলি পুরস্কারের ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, নব্য বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যিনি সিনেমা সংক্রান্ত কোন জমায়েতে কদাচ যেতেন, তিনিও একবার উল্টোরথ পুরস্কার বিতরণ উৎসবে পৌরোহিত্য করতে এসেছেন। আর বি এফ জে এ পুরস্কারের তো ছিল সীমাহীন গ্ল্যামার। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সব ক'জন তথ্যমন্ত্রীই বি এফ জে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, কেবল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া। তিনি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন অনিবার্য কারণবশত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠিও দিয়েছিলেন। বস্তুত সেই সময় বি এফ জে এ পুরস্কারকে সারা ভারতের সিনেমা জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হত।

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি এই তিনটি বিখ্যাত পুরস্কারের সঙ্গেই বিভিন্ন সময়ে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছি। বি এফ জে এ পুরস্কার নিয়ে বিশেষ ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হত না। পঞ্চাশ-ষাটজন মেম্বারের ব্যালট পেপার কাউন্ট করার ব্যাপারে একদিন ঘণ্টা চারেক বসলেই হয়ে যেত। রূপাঞ্জলি পুরস্কারের ব্যলট পেপারও খুব বেশি হত না। হাজার দশ-পনেরোর মতো হবে। কিন্তু মুশকিলে পড়তাম উল্টোরথ পত্রিকার ব্যালট পেপার নিয়ে। তার সংখ্যা হত প্রায় লাখ খানেকের মতো। সেই ব্যালট পেপার কাউন্ট করতে গিয়ে সাত-সাতটা দিন আমাদের কয়েক জনকে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলতে হত। ওই ভোটগণনার ফলাফল জানবার জন্যে শিল্পী আর কলাকুশলীরা উন্মুখ হয়ে বসে থাকতেন। এমন কি জনপ্রিয়তার নিরিখে যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল প্রায় অবিসংবাদিত, সেই উত্তমকুমার পর্যন্ত একে-ওকে-তাকে দিয়ে টেলিফোন করে ফলাফল জানতে চাইতেন। একবার উত্তমকুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারটি পেলেন না। কে পেয়েছিলেন তা মনে নেই। সৌমিত্র চ্যাটার্জিও হতে পারেন, বিকাশ রায়ও হতে পারেন, অথবা কালী ব্যানার্জিও হতে পারেন। তা কয়েকদিন পরে দেখা হতে উত্তমকুমার জিজ্ঞাসা করলেন: কী রবিবাবু, ব্যালট পেপারগুলো ঠিক ঠিক গুনেছিলেন তো? না গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়েছিলেন?

কথাটা উত্তমবাবু ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর ওই কথার মধ্যে দিয়ে বোঝা যেত তিনি উল্টোরথ পুরস্কারকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন।

বি এফ জে এ পুরস্কার সম্পর্কেও উত্তমবাবুর ঠিক এই একই মনোভাব ছিল। কোনবার পুরস্কার না পেলে বাইরে না প্রকাশ করলেও ভেতরে ভেতরে যে চঞ্চল হয়ে উঠতেন সেটা বুঝতে পারা যেত। একবার তো, কোন সাল ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় নাইনটিন সিক্সটি এইট কী সিক্সটি নাইন হবে, সৌমিত্রবাবু বি এফ জে এ থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে গেলেন। অপরদিকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন সুপ্রিয়া দেবী। তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত গৃহবিবাদ ঘটার উপক্রম হল। রাত দুপুরে উত্তমবাবুর ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে একটা অপ্রিয় ঘটনাও ঘটে গেল। এটা শোনা কথা নয়। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। 'স্মৃতির সরণি'-তে যখন উত্তমকুমার সম্পর্কে লিখব, তখন সেই ঘটনা সবিস্তারে বলা যাবে। এখন যাঁকে নিয়ে লিখছি সেই কালী ব্যানার্জী সম্পর্কেই বলি।

সেবারের নির্বাচনে কালীদা উল্টোরথ পুরস্কার পেলেন পাঠকদের ভোটে। এই নির্বাচনকে জনপ্রিয়তার পুরস্কারও বলা যায়। কালীদা কী হয়েছিলেন, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কিংবা শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা, সেটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

সেবার অনুষ্ঠান হয়েছিল উত্তর কলকাতার রূপবাণী সিনেমায়। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন সেই অনুষ্ঠানের ছবি তুলছিল সেটা মনে আছে। বোধহয় পরিচালক বিজয় বসু সেই ছবি তোলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা সকাল ন'টায়, কিন্তু সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই দেখলাম রূপবাণী সিনেমার উল্টোদিকের ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য। রূপবাণীর দিককার ফুটপাথটা পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে। সেদিক দিয়ে পুলিশ কাউকে আসা-যাওয়া করতে দিচ্ছে না। তাই যত ভিড় সব উল্টোদিকের ফুটপাথে। মানুষজন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন তাঁদের প্রিয় শিল্পীদের চোখের দেখা দেখবেন বলে। তাঁদের জয়ধ্বনি দেবেন বলে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একের পর এক আসছেন। উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে চটপট হাততালির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। এমন সময় সস্ত্রীক কালী ব্যানার্জি এসে ট্যাক্সি থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে গগনবিদারী চিৎকার। সেইসঙ্গে 'গুরু গুরু' আওয়াজ। উল্টোদিকের ফুটপাথেও লাঠি হাতে পুলিশ কর্ডন করে রেখেছিল। লোকজন ধাক্কাধাক্কি শুরু করল সেই কর্ডন ভেঙে ফেলবে বলে। অনেক কষ্টে তাদের আটকানো গিয়েছিল সেদিন।

আমি অবাক হয়ে উল্টো ফুটপাথের আনন্দোচ্ছল মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। এই জাতীয় অসামান্য অভিনন্দন তো উত্তমকুমার কিংবা সুচিত্রা সেনের ক্ষেত্রেই ঘটে। অভিনেতা কালী ব্যানার্জির ক্ষেত্রে যে ঘটবে সেটা অভাবনীয়। বুঝলাম কালীদা মানুষের মনের ভেতরে অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছেন।

হঠাৎ একটু দূরে রাধা সিনেমার মাথায় 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে কালীদার বিরাট কাট-আউটটা নজরে পড়ে গেল। চিনাম্যানের মেক-আপে কালী ব্যানার্জি হাসছেন। বুঝলাম, গ্ল্যামারের প্রতি নয়, সত্যিকারের অভিনয় প্রতিভার প্রতি জনসাধারণের এই স্বীকৃতি। ওই 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে কালীদা অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

এই 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে কালীদার চিনেম্যানের মেক-আপ নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। 'নীল আকাশের নীচে' হেমন্তদার প্রযোজনায় প্রথম ছবি। হেমন্তদা মানে বিখ্যাত গায়ক ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন মৃণাল সেন। প্রোগ্রেসিভ ডাইরেকটার হিসেবে মৃণালবাবুর তখনও এতটা নাম-ধাম হয়নি। তবে তাঁর ডাইরেকটোরিয়াল কাজের প্রশংসা তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। 'নীল আকাশের নীচে' সেটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

এই ছবিতে কালীদার মেক-আপ নিয়ে হেমন্তদা আর মৃণালবাবু খুবই মুশকিলে পড়ে গেলেন।

কলকাতা শহরে নানাভাবে মেক-আপ টেস্ট করে ওঁরা খুশি হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আমার মামার শরণাপন্ন হলেন। আমার মামার নাম হরিপদ চন্দ্র। থাকেন ম্যাড্রাসে। মেক-আপ আর্টিস্ট হিসেবে ওঁর তখন ভারতজোড়া নাম। ম্যাড্রাসে উনি 'হরিবাবু' নামে পরিচিত এবং বিখ্যাত।

হরিমামার একটা বিশেষত্ব ছিল, উনি কোন স্টুডিওতে গিয়ে মেক-আপ দিতেন না। ওঁর কাছে মেক-আপ নিতে গেলে ওঁর টি-নগরের বাড়িতে আসতে হত। তামিল ছবির প্রিন্সিপাল আর্টিস্টরা, যেমন শিবাজী গণেশন, অঞ্জলি দেবী ইত্যাদি সকলে মামার কাছে মেক-আপ নিতে তাঁর বাড়িতে আসতেন। এমন কি অঞ্জলি দেবী যখন শ্রীলংকার কোন ছবিতে অভিনয় করতেন তখন মামার কাছে মেক-আপ নিয়ে প্লেনে করে কলম্বো যেতেন শুটিং করতে। সেইভাবেই তিনি প্রযোজকদের সঙ্গে চুক্তি করতেন। তখন অবশ্য ওই দেশের নাম শ্রীলংকা হয়নি। নাম ছিল সিলোন।

হরিমামা তাঁর ম্যাড্রাসের নিজস্ব স্টুডিওতে বসে কালীদার মুখটাকে চিনম্যানের মুখে রূপান্তরিত করবার জন্যে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যে আউটলাইনটা করে দিলেন তা মোটামুটিভাবে সকলের পছন্দ হল। 'নীল আকাশের নীচে' ছবির মেক-আপম্যান ছিলেন শক্তি সেন। শক্তিবাবু অসম্ভব গুণী মানুষ। তিনি হরিমামার ওই আউটলাইনের ওপর প্রচুর ইম্‌প্রোভাইজ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রায় সত্যিকারের একজন চীনাম্যানকে পাওয়া গেল কালীদার মুখে। হরিমামা এবং শক্তিবাবুর এই কম্বিনেশন তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকার একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।

হরিমামা কিংবা শক্তিবাবু কালীদার মুখটাকেই কেবল চীনাদের মতো করে দিয়েছিলেন কিন্তু কালীদার পুরো দেহটাই যে চীনাম্যান হয়ে উঠেছিল তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণত কালীদার। অবিকল চীনাদের মতো হাঁটা-চলা, কতটুকু ঝুঁকে বাও করলে সঠিক চীনাম্যান দেখাবে এ সবই কালীদার অধ্যবসায়ের ফসল। সেইসঙ্গে ছিল পরিচালক মৃণাল সেনের তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক দৃষ্টি। কালীদা যখনই একটু স্লিপ করে গেছেন, মৃণালবাবু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করেছেন এবং শুধরে দিয়েছেন।

এই সতর্কতার নির্দেশ দেবার জন্যে মৃণালবাবুকে কতটা চীনাম্যানদের সঙ্গে মিশতে হয়েছিল কিংবা কতটা অবজার্ভেশনের প্রয়োজন হয়েছিল তা আমি জানি না। সেসব কথা জানার কোনও সুযোগও হয়নি। কিন্তু কালীদার অবজারভেশনের ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম কালীদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

'নীল আকাশের নীচে' তখন রম রম করে চলছে। দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে ছবিটা দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছবি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সেই সময় একদিন কালীদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা কালীদা, এমন নিখুঁত চীনে ব্যাপারটা কেমন করে করলেন বলুন তো? এর জন্যে নিশ্চয় আপনাকে অনেকদিন চাং-ওয়া রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ কিংবা ডিনার করতে যেতে হয়েছে?

কালীদা হো হো করে হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন : দূর দূর। চাং-ওয়ার ওইসব চিনেগুলো আর চিনে আছে নাকি। ওরা জীবনে কোনওদিন চিন তো দেখেইনি, কলকাতার বাইরে গেছে কি না সন্দেহ। ওরা সব হল ক্যালচিনশিয়ানের দল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম কালীদার কথা শুনে। বললাম : ক্যালচিনশিয়ানের দল? তারা আবার কারা? আমি তো জানি চিনেদের মধ্যে দুটো দল আছে। একটা মাও-সে-তুং-এর দল, আর একটা চিয়াং কাইশেকের দল। ক্যালচিনশিয়ানের দলের নাম কখনও শুনিনি।

কালীদা বললেন : শুনবে কী করে। ওরকম কোনও দল থাকলে তো শুনবে। ও নামটা আমার তৈরি করা।

আমি বললাম : তা না হয় মেনে নিলাম আপনার তৈরি করা। কিন্তু নামের একটা মানে থাকবে তো।

কালীদা বললেন : চাইনিজ আর ক্যালকেশিয়ান এই দুটো মিলিয়ে ক্যালচিনশিয়ান শব্দটা তৈরি করেছি। আসল মানে হল ওরা যতটা না চিনে, তার থেকে অনেক বেশি ক্যালকেশিয়ান, অর্থাৎ কলকাত্তাইয়া। ওদের দেখে চিনেম্যানের হাবভাব শিখতে গেলে শেষ পর্যন্ত বাঙালি হাবভাবও ভুলে

যেতে হবে।

আমি বললাম : তাহলে কী আপনি চাইনিজ ছবি দেখে চিনাদের অ্যাটিচুড শিখেছেন?

কালীদা বললেন : না ভাই রবি, মিথ্যে কথা বলব না, আমি চাইনিজ ছবি খুব বেশি দেখিনি। অনেকদিন আগে দু-একটা দেখেছিলাম। খুব বাজে ছবি। একটার আধখানা, আর একটার সিকিখানা দেখে উঠে চলে এসেছি। সেসব ছবিতে মূল চাইনিজ কালচারের কিছুই নেই। হলিউড প্যাটার্নের ছবি। কলকাতায় বসে চিনে ছবি তৈরি করলে যেমনটা হয়ে সেই রকম ছবি আর কি!

আমি বললাম : তাহলে কি সব ব্যাপারটা আপনার নিজের ইমাজিনেশান থেকে?

কালীদা বললেন : তাও নয়। আমি চাইনিজ অ্যাটিচুড শিখেছি চায়না টাউন থেকে।

শুনে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। বললাম : বলেন কী কালীদা। চাইনিজ অ্যাটিচুড শিখতে আপনাকে খোদ চায়নায় যেতে হয়েছিল। সে তো অনেক খরচের ব্যাপার! হেমন্তদা অত টাকা খরচ করে আপনাকে চায়নায় পাঠালেন! কই, তা নিয়ে কোন নিউজ হয়নি তো! গেলেন কবে, আর এলেনই বা কবে?

কালীদা বললেন : দূর বোকা। আমি কি পাসপোর্ট ভিসা করে চায়নায় গেছি নাকি। কোন ডেলিগেশনের সঙ্গেও যাইনি। আমি গেছি ট্যাকসি করে। তাও এক-আধদিন নয়, দিন দশেক তো হবেই।

কালীদার কথা শুনে আমি আরও গভীর গাড্ডায় পড়ে গেলাম। ট্যাকসি করে চায়নার কোনও টাউনে যাওয়া যায় কি না সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল।

কালীদা আমার এই অবস্থা দেখে মিটি মিটি হাসছিলেন। শেষ পর্যন্ত কেমন যেন করুণা হল তাঁর। বললেন : তুমি একটি এক নম্বরের গবেট। কলকাতা শহরে থাকো, আর সেই কলকাতা শহরে যে চায়না টাউন বলে একটা জায়গা আছে তার কোন খবরই রাখো না দেখছি।

আমি বললাম : সেটা কোথায়?

কালীদা বললেন : ইস্ট ক্যালকাটায় ট্যাংরার ওদিকে। সেখানে গিজ গিজ করছে চাইনিজ। ঘর-বাড়ি দোকানদানি সব চিনেম্যানদের। একবার ঢুকলে মনে হবে এটা কলকাতার কোনও অংশ নয়, ভারতবর্ষেও নয়। যেন সত্যি সত্যি চিন দেশে এসে পড়েছি। ওখানকার রেস্টুরেন্টের চিনে খাবার আর কলকাতার চাইনিজ রেস্টুরেন্টের চিনে খাবারের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। ওখানকার নুড্‌লস্ খেলে বুঝতে পারবে সত্যিকারের চিনে রান্না কাকে বলে।

আমি হাঁ করে কালীদার কথা শুনতে লাগলাম। যেন কোন রূপকথার গল্প শুনছি।

কালীদা বললেন : যেদিন শুটিং থাকত না, সেদিন আমি সকালবেলা একটা ট্যাকসি ধরে চায়না টাউনে চলে যেতাম। তাদের চলা-ফেরা হাব-ভাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতাম। তবে ইয়াং ছেলেদের নয়, তারা সব সাহেব হয়ে গেছে, আমি লক্ষ করতাম বুড়ো-বুড়িদের হাব-ভাব। চিনের প্রাচীর ব্যাপারটা এখনও তাদের মধ্যে থেকে গেছে।

আমি বললাম : আপনি যে ওদের এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন তাই নিয়ে ওরা আপনাকে কিছু বলেনি?

কালীদা বললেন : বলেনি আবার। একবার তো চার-পাঁচটা বেঁটে বেঁটে ষণ্ডাগণ্ডা ছেলে, ওদের অবিশ্যি সবাই বেঁটে, আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। ওরা আমাকে পুলিশের স্পাই বলে সন্দেহ করেছে। ওখানে আবার একটু-আধটু কোকেন-টোকেনের স্মাগলিং-এর ব্যবসা চলে তো! তা সে রকম বিপদ আসতে পারে ভেবে আগে থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম।

কালীদার কথা শুনে আমি একটু কেঁপে উঠলাম। বললাম : আপনি কি রিভলবার-টিভলবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নাকি?

কালীদা বললেন : আরে না না। আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার পুরনো সব ছবির কয়েকটা স্টিল। সেইগুলো দেখিয়ে ওদের বোঝালাম আমি স্পাই-ফাই কিছু নয়। সিনেমায় অ্যাকটিং করি। একটা ছবিতে চিনেম্যানের রোল করব। তাই ওদের কাছে আদব-কায়দা শিখতে এসেছি।

আমি বললাম : ওরা আপনার কথা বিশ্বাস করল তো? না কি—

কালীদা বললেন : বিশ্বাস করতে চায়নি প্রথমটায়। তবে শেষ পর্যন্ত কবল। একজন বুড়ো চিনেম্যান, হ্যারিসন রোডে তার ডেন্টিস্টের দোকান আছে, সে পূরবী সিনেমায় আমার 'ডাকহরকরা' ছবিটা দেখেছিল, সে আমায় চিনতে পারল। তার কথাতেই ওরা আমাকে স্পাই সন্দেহ থেকে অব্যাহতি দিল।

আমি বললাম : তারপর?

কালীদা বললেন : তারপর আর কী। ওরা ফিল্মের অ্যাকটর জেনে আমাকে খুব খাতির করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে এত খাতির জমে গেল যে ওরা আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড হয়ে গেল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছু দেখাল। এমন কি ওদের অন্দরমহলে পর্যন্ত আমায় ঘুরিয়ে নিয়ে এল। ওই দশ দিনে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ওদেব একটা ব্যাপার দেখে আমার খুব শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে ওদের সম্পর্কে।

আমি বললাম · কী ব্যাপার?

কালীদা বললেন : সেটা ওদের স্বাতন্ত্র্যবোধ। ওই চায়না টাউনে কী নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে ওরা দিন কাটায় তা তুমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না রবি। কিন্তু এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও ওদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দেয়নি। কলকাতার অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ওরা চায়না টাউনে ঢুকতে দেয়নি। দিলে ওদের আর্থিক সুরাহা অনেকটাই হত, কিন্তু গোটা সম্প্রদায়টা পলিউটেড হয়ে যেত। ওরা ওদের স্বাতন্ত্র্য সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেদিক থেকে ওবা নমস্য।

আমি বললাম : এই যে কযেক বছর ধরে চায়নায় এত রাজনৈতিক ওলটপালট ঘটে গেছে, তার কোন প্রতিফলন ওদের ওপর পড়েনি।

কালীদা বললেন : একদম না। তুমি তো জানো আমি কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী। মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাইয়ের কথা তুলে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম ওদের। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রায় মুখের ওপর থাবা বসিয়ে আমার সব প্রশ্ন থামিয়ে দিলে।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

কালীদা বললেন · আমি প্রশ্ন করা মাত্র ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল : নো পলিতিক্স্, নো পলিতিক্স্। সেই কথা শোনার পর আমি আর দ্বিতীয়বার ওই জাতীয় কোনও কথাই উত্থাপন করিনি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : চায়না টাউনে আপনার কমিউনিজম প্রচারের চেষ্টা তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল বলুন কালীদা?

কালীদা বললেন : তা গেল। আর সেইসঙ্গে আমার একটা অন্য ধরনের উপলব্ধিও ঘটে গেল।

আমি বললাম : সেটা কী?

কালীদা বললেন : সমস্ত ইজমের বাইরে আর একটা ইজ্‌ম আছে। সেটা হল হিউম্যানিজম্। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। এতকাল চিন দেশটাকে ভালোবেসে এসেছি তারা কমিউনিস্ট বলে। কিন্তু চায়না টাউনের ওই নন-পোলিটিক্যাল মানুষগুলোকে আমি ভালোবেসে ফেললাম তাদের সরলতা আর স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার জন্যে। এই বোধটা 'নীল আকাশের নিচে' ছবিতে অভিনয়ের সময় আমার খুব কাজে লেগেছে। আমার আভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আমি মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে উজাড় করে দেবার চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি না পেরেছি সেটা আমি জানি না। সেটা তোমরা, যারা ছবিটা মন দিয়ে দেখেছ তারা বলতে পারবে।

ক'দিন আগে দূরদর্শনে যখন 'নীল আকাশের নিচে' ছবিটা দেখছিলাম তখন সদ্যপ্রয়াত কালীদার ওইসব কথাগুলো বড় বেশি করে মনে আসছিল, আর দু' চোখ ভরে জল উপচে পড়তে চাইছিল।

ছবির পর্দায় কিংবা নাটকের মঞ্চে যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যায়, তাঁকে দেখে আসল মানুষটিকে চেনা যাবে না কোনওভাবেই। তাঁর সঠিক রূপটি জানতে গেলে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হবে, তাঁর কাছাকাছি থাকতে হবে বেশ কিছুদিন। তার পরেও তাঁকে পুরোপুরি জানা যাবে কিনা সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে।

আসলে কালীদা ছিলেন খুব চাপা স্বভাবের মানুষ। কখনও দেখা যাবে কালীদা হা হা করে আকাশফাটানো হাসি হাসছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে হয়তো তিনি বুকের মধ্যে একটা বিরাট বেদনার পাহাড় বয়ে বেড়াচ্ছেন। আবার হয়তো দেখা গেল কালীদা একটা বিরাট কোনও সুসংবাদ পেয়েছেন, সবাই তাঁকে জলি মুডে দেখার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেল উল্টো। তুচ্ছ একটা কারণে কালীদা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। আর কালীদার রাগ ছিল দুর্বাসার মতো। কাক-কাঁকুড় জ্ঞান করতেন না। যা মুখে আসে তাই বলে দিতেন।

এই পরস্পরবিরোধী মেজাজের জন্যে কালীদাকে জীবনে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। অন্যায়ের সঙ্গে একটু আপস করে নিতে পারলেই তিনি জীবনে অনেক কিছু পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে ধাতের মানুষই নন। চালাকির ব্যাপারটা তাঁর চরিত্রের মধ্যেই ছিল না। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলে এসেছেন চিরকাল। এর জন্যে আর্থিক দিক থেকে তাঁর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি কোনদিন। উল্টে শত্রুর সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর কে কী ভাবে হয়েছেন জানি না, আমি কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছি কালীদার এই গুণটার জন্যেই। বার বার ওঁর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছে। গেছিও তাই। তার মধ্যে বেশ দু-চারবার ফিরেও আসতে হয়েছে ওঁর ওই দুর্বাসাসদৃশ ক্রোধের মুখোমুখি হয়ে। তবু কিন্তু মানুষটির ওপর রাগ করতে পারিনি কোনদিন।

আমি ওঁর প্রথম ইন্টারভিউ ছেপেছিলাম বলে কালীদার বোধহয় আমার প্রতি একটু দুর্বলতা ছিল। ইন্টারভিউটা নিয়েছিলাম তেরপেখিয়ায় 'তেরো নদীর পারে' ছবির আউটডোরে গিয়ে। যেদিন সন্ধ্যায় কালীদার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম তার পরদিন সকালে কালীদার শুটিং দেখতে গেলাম নদীর ধারে তৈরি করা সার্কাসের টেন্টে।

কালীদার কথামতো ঠিক সকাল আটটাতেই গিয়ে পৌঁছেছিলাম লোকেশানে। কালীদা তখন মেক-আপ টেকআপ নিয়ে রেডি। উনি সার্কাসের একজন খেলোয়াড়। ওঁর বিপরীতে নায়িকা করছেন প্রিয়ম হাজারিকা।

কালীদা আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন। তারপর এক ভদ্রলোককে বললেন: বারীন, এই ছেলেটির নাম রবি। ও কলকাতার 'উল্টোরথ' পত্রিকা থেকে এসেছে তোমাদের আউটডোর শুটিং কভার করতে।

কালীদা তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : রবি, ইনি হচ্ছেন এই ছবির পরিচালক বারীন সাহা। এঁর কথা তোমাকে তো কাল রাত্রেই বলেছি। খুব গুণী মানুষ।

বারীনবাবুকে দেখে মনে হল খুব গম্ভীর স্বভাবের মানুষ। কিংবা আমি সাংবাদিক শুনেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন কি না জানি না! আমার তখনকার অল্প বয়েস হয়তো তাঁর এই অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের আরও একটা কারণ হতে পারে।

ওই গাম্ভীর্যের সঙ্গে খানিকটা মাপা হাসি মিশিয়ে বারীনবাবু আমাকে স্বাগত জানালেন। বললেন: আমরা এখনি কাজ শুরু করব। ঘুরে ঘুরে শুটিং দেখুন। দুপুরে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন। কোনও অসুবিধে হলে আমাকে জানাবেন। তবে কাজের মধ্যে ডিসটার্ব করবেন না যেন। আমি একটু অন্য ধরনের ছবি করছি তো। এটা আপনাদের চিরাচরিত টালিগঞ্জমার্কা ছবি নয়।

বারীনবাবুর কথাবার্তাগুলো খট করে কানে লাগল। তাঁর কথার মধ্যে ভদ্রতার অভাব ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতার কেমন যেন অভাব। কী জানি, বিদেশ-ফেরত ইন্টেলেকচুয়াল মানুষরা হয়তো এই ভাষাতেই কথা বলেন। তেমন মানুষদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই বলেই হয়তো বারীনবাবুর কথাগুলো কানে লাগল।

তবে একটা জিনিস খুব ভালো লাগল। সেটা বারীনবাবুর কাজের ধারা। একেবারে সাহেবি প্যাটার্নের কাজ। নিজে একটা চেয়ারে বসলেন। ইউনিটের লোকজন তাঁর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। বারীনবাবু একটা ফুলস্কেপ কাগজের ওপর পেন্সিল-কম্পাস দিয়ে গোল করে একটা বৃত্ত আঁকলেন। এটা শুটিং জোন। তার ওপর গোল গোল ডট বসিয়ে নির্দেশ করে দিলেন কোথায় লাইট বসানো হবে, কোথায়

ক্যামেরা বসবে, শিল্পীরা কোনখান থেকে কী ভাবে আসবেন, কোথায় দাঁড়াবেন ইত্যাদি। সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ছবির মতো করে বুঝিয়ে দিলেন ইউনিটের সবাইকে।

বুঝলাম বিদেশের ছবিতে এই ধারাতেই কাজ হয়। আমাদের দেশে কিন্তু হয় না। সত্যজিৎ রায় তাঁর স্ক্রিপ্টের ওপর এই ধরনের নির্দেশনামা এঁকে রাখেন। কিন্তু স্পটে দাঁড়িয়ে এরকম পেন্সিল-কম্পাস নিয়ে কিছু করতে দেখিনি তাঁকে। অন্তত আমি যে ক'দিন তাঁর সেটে গেছি।

বারীনবাবুদের ইউনিটে আমার চেনাশোনা এমন কাউকে দেখতে পেলাম না যাঁর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। অনেক পরে একজনকে পেলাম। তাঁর নাম মিঠু সিনহা। ক্যামেরা অ্যাসিস্ট্যান্ট। এঁর সঙ্গে কিছুটা পূর্ব পরিচয় ছিল। কিন্তু মিঠুও আমাকে তেমন কোনও তথ্য সরবরাহ করতে পারল না। বলল: রবিদা, ইনফর্মেশন হিসেবে আপনি বারীনদার কাছ থেকে বিশেষ কিছু পাবেন না। উনি ছবির মধ্যে এমনভাবে ইনভলভড হয়ে থাকেন যে ওঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে না আপনার। তবে রাজেনদা থাকলে তাঁর কাছ থেকে সব খবরই পেয়ে যেতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : রাজেনদা কে?

মিঠু বললেন : বারীনদার দাদা। তিনিই তো প্রোডাকনের সব কিছু দেখাশোনা কবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তিনি কোথায়?

মিঠু বললেন : রাজেনদা গতকাল সকালে কলকাতা গেছেন। দু-তিন দিন পরে ফিরবেন।

ওই লোকেশানেই আচমকা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তাঁর নাম নির্মল ঘোষ। হ্যাঁ, ইনিই আজকের বিখ্যাত অভিনেতা নির্মল ঘোষ। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে উত্তমকুমারের বন্ধু কাম সেক্রেটারি। নির্মলবাবু তখনও প্রফেশ্যনাল অভিনেতা হননি। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করেন। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত। উনি এই 'তেরো নদীর পারে' ছবিতে অভিনয় করছেন।

নির্মলবাবু মানুষটি বড় ভালো। সদাশয় এবং বন্ধুবৎসল। মানুষকে মুহূর্তে আপন করে নিতে পারেন। উনি এই ছবির অভিনেতা তো বটেই, সেই সঙ্গে বারীনবাবুর বন্ধুও। ওঁর কাছ থেকে গল্পের আইডিয়াটা শুনলাম। সেই সঙ্গে জানতে পারলাম তেরপেখিয়ার এই লোকেশনটির সংবাদ উনিই বারীনবাবুকে দিয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই জায়গাটার সন্ধান আপনি পেলেন কেমন করে? আপনার বসবাস কি এই অঞ্চলে নাকি?

নির্মলবাবু বললেন : কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কৃষক আন্দোলনের সূত্রে এই অঞ্চলে বহুদিন কাটিয়েছি। এখানকার মানুষজন, নদী নালা, গাছপালা সবই আমার ভীষণভাবে চেনা।

আমি বললাম : সেটা কবে? সেই তেভাগা আন্দোলনের সময়?

নির্মলবাবু বললেন : ঠিক ধরেছেন আপনি। তেভাগা আন্দোলনের আগে পরে বছর দেড়েক এখানে কাটিয়েছি।

আমি বললাম : সেই সূত্রে এখানকার মানুষজনকে না হয় চিনলেন। কিন্তু নদী নালা আর গাছপালাকে চিনলেন কী করে? ওইসব বস্তুও কি আপনার আন্দোলনের শরিক হয়েছিল নাকি?

আমার কথা শুনে নির্মলবাবু হেসে ফেললেন। বললেন : তা খানিকটা হয়েছিল বৈকি! ওরা আশ্রয় না দিলে আমার বুকটা তো সেই সময়ে পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেত!

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

নির্মলবাবু বললেন : আমাদের আন্দোলনের মাঝপথে পুলিশের অত্যাচার তখন চরমে। খ্যাপা কুকুরের মতো পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেইসময় কতদিন রাতের অন্ধকারে সাঁতরে নদী পার হতে হয়েছে। নালার মধ্যে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতে হয়েছে। সারা রাত ঝোপের মধ্যে প্রচণ্ড মশার কামড় সহ্য করে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। ঘন পাতায় ভরা গাছের মগডালে, যেখানে পুলিশের টর্চের আলো পৌঁছবে না, সেখানে একটা গামছা দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখে সারা রাত কাটাতে হয়েছে।

শুনতে শুনতে মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সেদিন থেকেই নির্মল ঘোষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে সে বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়েছে। ওঁকে দিয়ে আমি কয়েক

নাইট যাত্রাও করিয়েছি। তারাশঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা' যাত্রাপালায় উনি গোরাবাবুর চরিত্র করতেন। ভালোই হয়েছিল ওঁর অভিনয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' নাটকে উনি একটি সিরিও-কমিক ক্যারেকটারে দারুণ অভিনয় করেছিলেন। সব থেকে ভালো লেগেছিল আসিফ করিমভয়ের একটা নাটকে ওঁর ডিরেকশান এবং অভিনয়। মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটির কয়েকটা মাত্র শো হয়েছিল। নাটকটির নাম আমি ভুলে গেছি। কিন্তু ওঁর অভিনয় এবং ডিরেকশানের টুকরো টুকরো ছবি আমার চোখের সামনে আজও ভাসছে। দীর্ঘ কুড়ি বাইশ বছর পরেও। আমি ওই নাটকটার উচ্ছ্বসিত সমালোচনা করেছিলাম 'দেশ' পত্রিকায়।

সেই নির্মলবাবু আজও অভিনয়ের জগতেই আছেন। স্টার থিয়েটারে যখন সৌমিত্রবাবুর 'ঘটক বিদায়' নাটকে অভিনয় করতেন তখন মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতাম। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের চেহারা-চরিত্র বদলে গেছে। কিন্তু নির্মলবাবু সেই একইরকম আছেন। তেমনই নির্লোভ, সদাশয়, বন্ধুবৎসল। এক কথায় নিপাট ভালোমানুষ। রাজনীতির জগতে ওঁর থেকে অনেক কম দিন কাটিয়ে, অনেক কম ত্যাগ স্বীকার করেও কত লোক তো কত রকম রাজনৈতিক ফয়দা লুটে নিয়েছে। ফুলে ফেঁপে লাল হয়ে গেছে। কিন্তু নির্মলবাবুর কোনও পরিবর্তন হয়নি। আজও সেই সার্কুলার রোডের বাড়িতেই থাকেন। সহজ সরল সাধারণ জীবনযাপন। ছবিতে নাটকে ছোট ছোট রোল করেন। কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কোন অভিমান নেই। এরকম একটি মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়?

যাক নির্মলবাবুর কথা। এখন আবার কালীদার কথায় ফিরে আসি। 'তেরো নদীর পারে'র ওই লোকেশানে দাঁড়িয়ে নির্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনাদের এই ছবিতে কালীদা কেমন অভিনয় করছেন?

নির্মলবাবু বললেন : দারুণ। টেরিফিক। এই রোলটা কালীদার পক্ষে বি-ফিটিং।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আর আপনাদের নায়িকা? প্রিয়ম হাজারিকা?

আমার প্রশ্ন শুনে নির্মলবাবু একটু যেন থমকে গেলেন। তারপর বললেন : ভালোই তো!

আমি বললাম : আচ্ছা, এই প্রিয়ম হাজারিকা কি ভূপেন হাজারিকার কেউ হন?

নির্মলবাবু আমার প্রশ্নটা যেন শুনেও শুনলেন না। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের উল্টোরথের সার্কুলেশন কেমন?

আমি বললাম : প্রচুর। বাজারে পড়তে পায় না। বেরোনো মাত্র অল সোল্ড।

নির্মলবাবু বললেন : তাই হবে। ঘরে ঘরেই তো দেখি উল্টোরথের চাহিদা। ইয়াং ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব পপুলার আপনাদের কাগজটা।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : শুধু ইয়াং বলছেন কেন! বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও খুব পপুলার। তাঁদের লেখা চিঠিপত্র থেকেই ব্যাপরটা বুঝতে পারি।

কিন্তু সেদিন প্রিয়ম হাজারিকা সম্পর্কে আমার প্রশ্নটা নির্মলবাবু কেন যে ওভাবে এড়িয়ে গেলেন, সেটা আমি আজও বুঝতে পারি না। অথচ বাজারে প্রিয়ম হাজারিকা সম্পর্কে নানা কথা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তখন। নানা কথা কানে আসে। তবে ওসব শোনা কথা কানের মধ্যে থাকাই ভালো। বলা কিংবা লেখা উচিত নয়। সেদিন নির্মলবাবুও প্রিয়ম হাজারিকার ব্যাপারে আমার এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন কিনা কে জানে!

কিন্তু অ্যাকটিং সম্পর্কে নির্মলবাবুর ওইরকম স্বতঃস্ফূর্ত সার্টিফিকেট পাবার পরও দর্শকরা 'তেরো নদীর পারে' ছবির নায়ক চরিত্রে কালীদাকে দেখতে পেলেন না। তার পেছনে একটি দুঃখজনক কারণ আছে।

তেরপেখিয়াতে দশ-বারো দিন অনেক কষ্ট স্বীকার করে দুর্দান্ত কাজ করে কলকাতায় ফিরে ল্যাবরেটরির রিপোর্ট পাবার পর দেখা গেল কোন এক টেকনিক্যাল কারণে ছবি একদম ওঠেনি।

অথচ এমন তো হবার কথা নয়। ওই ছবির যিনি অপারেটিং ক্যামেরাম্যান, তাঁর নামটা এই মুহূর্তে মনে আসছে না, নামের আদ্যক্ষর 'ম' দিয়ে, মোহিনী হতে পারেন আবার মহিমও হতে পারেন, তাঁর

কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছিল তিনি একজন এফিশিয়েন্ট ক্যামেরাম্যান। তাঁর হাত থেকে তো এমন অঘটন ঘটা উচিত নয়। মনে হয় ক্যামেরাতেই ডিফেক্ট ছিল।

এই মোহিনীবাবু ছিলেন ভারি মজাদার মানুষ। সবসময় বিদেশিদের স্টাইলে একটা শর্ট প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে থাকতেন। উনি ছিলেন বারীনবাবুর বন্ধু। ইটালিতে দুজনে একসঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছেন। ওখানেই তাঁর ক্যামেরার কাজ দেখে বারীনবাবু তাঁকে 'তেরো নদীর পারে'র চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

মোহিনীবাবু কেমন মজাদার মানুষ ছিলেন তার একটুখানি উদাহরণ দিই। আমি যে ক'দিন ওই লোকেশনে ছিলাম তার প্রতিদিনই শুটিং প্যাক আপ হবার পর পড়ন্ত বিকেলে নদীর ধারে আমাদের আড্ডা বসত। মোহিনীবাবু সেখানে বসে তাঁর নিজের অনাবৃত উরুতে চাপড় মারতে মারতে ইটালিবাসের সময়কার নানা মজার মজার ঘটনা শোনাতেন। তবে তার অধিকাংশই ছিল আদিরস ঘেঁষা।

একদিন হঠাৎ আমার শরীরের একটা অংশে হাত বুলাতে বুলাতে মোহিনীবাবু বলে উঠলেন : জানেন রবিবাবু, আপনার স্কিনের যা টেক্সচার তাতে ইটালির মেয়েরা আপনাকে পেলে লুফে নিত। এই ধরনের স্কিন ওদের দারুণ পছন্দ।

কথাটা শুনে আমি যেমন পুলকিত হয়েছিলাম তেমনি ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কামরূপ-কামাক্ষ্যার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ওখানে নাকি মেয়েরা সব পুরুষদের ভেড়া করে রাখে। ইটালিতেও কি ওইরকম কামরূপ-কামাক্ষ্যার মতো ব্যাপার আছে নাকি? সেই থেকে আমি কল্পনায় পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করলেও সোফিয়া লোরেনের দেশ ইটালিতে যেতে সাহস পাইনি। এখন যখন মাথায় টাক পড়েছে, চুল পেকেছে, তখন নির্ভয়ে ইটালিতে যাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর আমায় ইটালিতে নিয়ে যাচ্ছে কে!

বারীনবাবুর দাদা রাজেনবাবু ওই অঘটনের পর কালীদার কাছে পুনরায় ডেট চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কালীদা ডেট দিতে পারেননি। কালীদার হাতে তখন অনেক ছবি। সুতরাং 'তেরো নদীর পারে' তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওই চরিত্রে পরে জ্ঞানেশ মুখার্জি অভিনয় করেন।

অতএব আমারও আর 'তেরো নদীর পারে' ছবির আউটডোরের বিবরণ লেখা হয়নি উল্টোরথে। ছবির হিরোই যখন বদলে গেল তখন আমি আর লিখব কী! শুধু কালীদার ইন্টারভিউটাই ছাপা হয়েছিল।

'তেরো নদীর পারে' ছবিটা আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। শুনেছি ছবিটা নাকি খুবই ভালো। রীতিমত উঁচু মানের। জ্ঞানেশবাবুর অভিনয়েরও খুব প্রশংসা হয়েছিল। এমন একটা ছবির সঙ্গে কালীদার নাম যুক্ত থাকল না, এটা ভেবে আমার খুব খারাপ লেগেছে।

কালীদা কিন্তু রাতারাতি অভিনেতা বনে যাননি। অনেক ভাগ্যবান অভিনেতার মতো প্রথম ছবিতেই নায়ক হয়ে চিত্রাবতরণের সুযোগ তাঁর জীবনে ঘটেনি। অভিনেতা হবার জন্যে অনেক খাল-বিল-নদী-নালা তাঁকে পেরোতে হয়েছে। অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে। একটা সময়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যার কথাও ভাবতে হয়েছে। তবে সেসব কথা বলার আগে তাঁর প্রথম জীবনটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

কালীদারা খাস কলকাতার বাসিন্দা। ১৯২১ সালে কালীঘাট অঞ্চলে তাঁর জন্ম। কালীদার বাবা মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন নামকরা অ্যাডভোকেট। কালীদার লেখাপড়ার শুরু সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে। ১৯৩৮ সালে ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হলেন শেয়ালদা অঞ্চলের রিপন কলেজে। এখন ওই কলেজটির নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

ছোটবেলা থেকেই নাট্যাভিনয়ে কালীদার আগ্রহ ছিল। পাড়ার ক্লাবে তিনি অভিনয় করতেন। একটু বড় হয়ে একবার 'কেদার রায়' নাটকে কার্ভালোর চরিত্রে অভিনয় করে খুব প্রশংসা পান। কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখন ভূমেন রায় মশাই কার্ভালো চরিত্রে অভিনয় করে খুব হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। কালীদা ওই নাটকটা বার তিনেক দেখেছিলেন কার্ভালো করার আগে। কালীদা নিজেই বলতেন, তিনি ভূমেন রায়কে হুবহু কপি করেছিলেন। হাঁটা চলা, ওঠা বসা, মায় কাঁধ ঝাঁকানো পর্যন্ত। আর এই কার্ভালো করে খুব হাততালি-টাততালি পেয়ে কালীদা মনে মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, ভবিষ্যৎ জীবনে

তিনি অভিনেতা হবেন।

কালীদা যখন রিপন কলেজে পড়ছেন তখনই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খবরের কাগজে নিয়মিত লড়াইয়ের খবর পড়েন আর শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। বয়েসটা তো তখন রোমান্টিসিজমের। বীরত্বব্যঞ্জক কোনও কাজ করবার জন্যে মনটা ছটফট করতে থাকে।

ওই সময় কালীদা একদিন যুদ্ধের ওপর তোলা একটা সিনেমা দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তাঁকেও ওইরকম ইউনিফর্ম পরে লড়াই করতে হবে। কী দুঃসাহসী ওই ছবির নায়ক। এরকম একটা কিছু না করতে পারলে মনুষ্যজন্মটাই বৃথা।

খবরের কাগজে তখন প্রতিদিনই মিলিটারিতে রিক্রুটমেন্টের জন্যে বিজ্ঞাপন বেরত। গোখেল রোডের একটা ঠিকানা দেওয়া থাকত তাতে। কালীদা একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে গোখেল রোডে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে দরখাস্ত জমা দিয়ে দিলেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা যা ছিল সেটা এয়ারফোর্সে যোগদানের পক্ষে অনুকূল। এবং ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরিটা হয়েও গেল। একেবারে বন্ডে সই করে এসে তারপর বাড়িতে জানালেন।

বাড়ির সবাই তো শুনে হতভম্ব। কান্নাকাটি পড়ে গেল। সবচেয়ে বেশি কান্নাকাটি করতে লাগলেন কালীদার ঠাকুরমা। উনি কালীদাকে ভয়ানক ভালোবাসতেন।

কালীদার বাবা বললেন : কান্নাকাটি করে আর কী হবে। ও যখন বন্ডে সই করে এসেছে তখন ওকে যেতেই হবে।

সকলের কান্নাকাটি দেখে কালীদার মনটাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো আর কোনও উপায় নেই। অতএব সকলকে কাঁদিয়ে তাঁকে যুদ্ধে যেতেই হল।

কালীদার বক্তব্য থামিয়ে আমি বলে উঠলাম : ওরে বাবা, আপনি একেবারে এয়ারফোর্সের পাইলট হয়ে গেলেন! সে তো দারুণ ব্যাপার।

কালীদা বললেন : পাগল হয়েছ নাকি! পাইলট হওয়া অত সহজ নয়। তার জন্যে অনেক এলেমের দরকার হয়। আমরা ছিলাম গ্রাউন্ড স্টাফ। ওটাকে কুলি কাবারির কাজও বলতে পার।

তা মনীন্দ্রবাবু শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, মিলিটারির ওপর মহলে অনেক ধরাকরার পর কালীদাকে বন্ডমুক্ত করে মিলিটারি থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বছর খানেকের মধ্যে। কালীদাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে কালীদার রোমান্টিকতার বেলুনটি ততদিনে ফুটো হয়ে চুপসে গেছে।

কালীদা যুদ্ধ থেকে ফিরলেন বটে, কিন্তু কলেজে আর ফিরে গেলেন না। যুদ্ধের বাজারে তখন চাকরির অবস্থা ভালো। তারই এক একটা করে ধরতে লাগলেন আর ছাড়তে লাগলেন। পাশাপাশি চলতে লাগল অ্যামেচার থিয়েটারের অভিনয়।

১৯৪৫ সাল নাগাদ কালীদা মনে মনে স্থির করে ফেললেন, তিনি পেশাদার অভিনেতা হবার চেষ্টাই করবেন। আর সব অ্যামেচার অভিনেতা প্রথম জীবনে যা করেন, তিনিও তাই করলেন। অভিনয় শেখবার জন্যে শিশির ভাদুড়ি মশাইয়ের কাছে ছুটলেন।

কিন্তু শিশিরবাবু তখন অসুস্থ। শ্রীরঙ্গম মঞ্চের দায়িত্ব তাঁর ছোট ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ির হাতে। তাঁর তত্ত্বাবধানে শ্রীরঙ্গমে তখন অভিনীত হচ্ছে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'। এই নাটকে বিপ্রদাসের চরিত্রে অভিনয় করতেন বিশ্বনাথবাবু আর বন্দনার চরিত্রে করতেন মলিনা দেবী। নাটকটি তখন বেশ জমে গেছে ওখানে।

কালীদার সঙ্গে কথা বলে আর তাঁর আগ্রহ দেখে বিশ্বনাথ ভাদুড়ি তাকে শ্রীরঙ্গমে সুযোগ দিতে রাজি হলেন। বললেন : এ নাটকে তো তোমাকে কোনও কাজ দিতে পারছি না। তবে তুমি থাক। সব কিছু দেখো, শেখো। পরের নাটকে কাজ দেবার চেষ্টা করব।

সে সুযোগ এল বছর খানেক পরে। এই এক বছর কালীদার কাজ ছিল মনযোগ সহকারে বিশ্বনাথবাবুর নানা ধরনের ফাই ফরমাশ খাটা।

শ্রীরঙ্গমের পরের নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'তাইতো'। এতে কালীদা যে ভূমিকাটি পেলেন তাকে ভূমিকা বললে ভূমিকার অসম্মান করা হয়।

দীর্ঘ এক বছরের প্রত্যাশা আর হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই পুরস্কার! মাত্র এক রাত্রের জন্যে অভিনয়

করে ঘেন্নায় আর রাগে কালীদা শ্রীরঙ্গম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

সেদিন কে জানত ঠিক এই মঞ্চেই কালী ব্যানার্জী একদিন বাংলার নাট্য দর্শকদের প্রশংসা আর অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে যাবেন!

অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকটিং কেরিয়ারটা ঠিক নদীর মতো। কখনও তাতে জোয়ারের উদ্দাম ঢেউ, আবার কখনও প্রচুর বালি পড়া ভাঁটার মতো। যখন কাজ থাকল তখন একেবারে হই হই ব্যাপার। একটা দিনও রেস্ট নেই। আবার যখন খরার সময় তখন শুয়ে বসে গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা।

তবে ওই ঢেউয়ের আস্বাদ পেতে কালীদাকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে। যেদিন শ্রীরঙ্গমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন সেদিন সারা মনে চরম হতাশা। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ। রাগে মাথার তালুটা পর্যন্ত জ্বলছে।

বড়তলা থানার সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রূপবাণী সিনেমার সামনে এসে দাঁড়ালেন ট্রাম কিংবা বাস ধরবার জন্যে। কালীঘাটে ফিরতে হবে তো।

কিন্তু বাড়িতে গিয়ে মুখ দেখাবেন কেমন করে? সবাই জানে পেশাদার মঞ্চে আজ কালীদার জীবনের প্রথম অভিনয়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ঠাকুমা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তারপর থুতনিটা ধরে নাড়া দিয়ে রসিকতা করে বলেছেন : দেখো ভাই, থিয়েটারের সব রঙচঙে জোয়ান জোয়ান হুরীপরীদের পাল্লায় পড়ে এই বুড়িটাকে ভুলে যেও না যেন।

কালীদার ঠাকুরমা ছিলেন দুর্দান্ত রসিক মহিলা। পরবর্তীকালে কমেডি অভিনয়ে কালীদা যে ফাটাফাটি কাণ্ড করেছেন, সেই রসের উৎসটুকু ঠাকুরমার কাছে থেকে পাওয়া। বিশ্বরূপায় 'ক্ষুধা' নাটকে কালীদা যে কমেডির বন্যা বইয়ে দিতে পেরেছিলেন তার মূলেও ছিল ঠাকুরমার দারুণ প্রভাব। ওইভাবে হাঁটা চলা, আধো আধো কথা বলা, তার সবটাই ঠাকুরমার অনুকরণে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ট্রাম লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কালীদা। অত লোকজনের ভিড়ের মধ্যেই অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল রূপবাণী সিনেমার অনতিদূরে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত স্টার থিয়েটারের বাড়িটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসনা মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

কেবল মাথার মধ্যে ঝিলিকই নয়, মনের মধ্যে একটা দৃঢ়তাও এসে গেল। না না, এভাবে হেরে গেলে তো চলবে না। যত অল্পদিনই হোক না কেন, মিলিটারিতে ছিলেন তো কিছুদিন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন একজন সৈনিকের কর্তব্য নয়।

ট্রামে ওঠার চিন্তা ত্যাগ করে সোজা হাঁটা দিলেন স্টার থিয়েটারের দিকে। মহেন্দ্র গুপ্ত তখন স্টার থিয়েটারের সর্বাধ্যক্ষ। তিনি একাধারে নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা। মহেন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি রচনা লেখার ইচ্ছে আছে। তাই এখানে মহেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে বিশদ কিছু লিখলাম না। ওটা পরে হবে।

যত বড় সৈনিকই হোন না কেন, লক্ষ্যের দিকে এগোবার সময় তার বুকে কাঁপুনি আসবেই। কালীদারও তাই এসেছিল। যতটা দৃঢ়তা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসেছিলেন, স্টার থিয়েটার বিল্ডিংয়ে ঢোকবার সময় ততটা দৃঢ়তা আর ছিল না। পায়ের গতি শ্লথ হয়ে এসেছিল।

কিন্তু মহেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা বলবার পর কালীদার মনের মধ্যে জমা ক্লেদ পুরোটাই কেটে গিয়েছিল। মহেন্দ্রবাবু কালীদার ভেতরের স্পিরিটটাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। ওঁকে আশা দিয়েছিলেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন। যার পরিণতিতে 'শতবর্ষ আগে' নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন কালীদা। ছোট রোল, কিন্তু কাজ দেখানোর মতো। এর পরের নাটক 'টিপু সুলতান'। সেখানেও কালীদার সুযোগ এবং যথারীতি সুযোগের সদ্ব্যবহার।

রেকর্ডের খাতায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কালীদার প্রথম নাটক শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 'তাইতো' নাটকটি হয়তো উল্লিখিত হবে, যেখানে তিনি মাত্র এক রাত্তিরের জন্য অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু আমার খাতায় প্রফেশ্যনাল বোর্ডে কালীদার প্রথম নাটক হিসেবে আমি 'শতবর্ষ আগে'র নামটি লিখে রেখেছি।

এরপর দীর্ঘকাল কালীদা পেশাদার থিয়েটার করেননি। বলা যায় করতে চাননি। তাঁর মাথায় তখন

সিনেমার পোকাটি ঢুকে গেছে এবং ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। থিয়েটার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে চলচ্চিত্র পরিচালকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন সিনেমায় চান্স পাবার জন্যে।

অনেক বছর পরে কালীদা আবার থিয়েটার করতে এসেছিলেন ওই শ্রীরঙ্গম মঞ্চেই, যে মঞ্চটি সম্পর্কে তাঁর মনে অনেক বিতৃষ্ণা জমা হয়েছিল। ততদিনে শ্রীরঙ্গম নাম পালটে, কর্তৃত্ব পালটে, হয়ে গেছে বিশ্বরূপা। ওখানে কালীদার প্রথম নাটক তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন'। পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তারাশঙ্করের উপন্যাস 'সঞ্জীবন ফার্মেসী' নাম পালটে হয়েছিল 'আরোগ্য নিকেতন'। সে নাটকে কালীদা দারুণভাবে সাকসেসফুল। আর ওঁদের পরের নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'ক্ষুধা'তে তো কালীদা সারা বাংলাদেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। ওই নাটকে সদা, গজা আর রমা এই তিনটি নামধেয় ছন্নছাড়ার চরিত্রে বসন্ত চৌধুরি, কালী ব্যানার্জি আর তরুণকুমার অভিনয় করেছিলেন। তার মধ্যে কালী ব্যানার্জি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বরূপার এক নম্বরের তুরুপের তাস। শুধুমাত্র কালীদার অভিনয় দেখবার জন্যেই যে বিশ্বরূপার 'হাউসফুল' হয়ে যেত, সে কথা আমি ওই মঞ্চের ম্যানেজার সাতকড়ি পালের মুখেই শুনেছি। শুধু শোনা নয়, নিজের চোখেও দেখেছি। কাউন্টারে টিকিট কাটবার সময় মফঃস্বলের দর্শকরা ভালো করে জেনে নিতেন কালী ব্যানার্জি অভিনয় করছেন কিনা? ইতিবাচক উত্তর পেলে তবেই ট্যাক থেকে টাকা বার করতেন। পরে 'ক্ষুধা' যখন সিনেমায় হয় তখন কালীদা তাতেও ওই একই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

বিশ্বরূপা পর্বের পর কালীদা কিছুদিন মঞ্চজগৎ থেকে দূরে ছিলেন। তখন তাঁর হাতে রাশি রাশি ছবি। দিনরাত শুটিং করছেন। বৃহস্পতি, শনি, রবি আর ছুটির দিনে মঞ্চমায়ায় আটকে থাকার সময় কোথায়?

তারপর আবার যখন ছবির কাজে ভাঁটা পড়ল তখন আবার মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয়। মিনার্ভায় 'প্রজাপতি' তারই মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাটক কালীদার জীবনের। এই নাটকে আবার সেই 'ক্ষুধা'র আমলের জমজমাট উজ্জ্বল কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দর্শকদের মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওই সময়ে আরও কী কী নাটকে কালীদা যেন কাজ করেছিলেন। সেসব নাটকের কথা এই মুহূর্তে মনে আসছে না।

কালীদার নাটকের কথা থেকে ছবির কথায় আসি। তবে সেখানে আসবার আগে আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলে নিই। ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবেন কালীদার বয়সটা দিনে দিনে বাড়লেও মনটা ছিল শিশুর মতো। যা-তা শিশু নয়, একেবারে একখানি দুর্বাসা-শিশু।

আগেই বলেছি কালীদা তাঁর 'ক্ষুধা' নাটকে যে চরিত্র রূপায়ণ করেছিলেন, সেখানে তাঁর ঠাকুরমাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেছিলেন। একটু দমক দিয়ে দিয়ে হাঁটা, আধো-আধো কথা বলা। প্রচুর হাততালি পেতেন ওই ধরনের অভিনয়ে। আর ওই হাততালিই কালীদার সর্বনাশ করে দিয়েছিল। ওই আধো-আধো কথা বলাটা কালীদার একটা ম্যানারিজমে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন কালীদা ওই ম্যানারিজম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। অধিকাংশ ছবিতেই উনি ওইভাবে কথা বলে গেছেন। ছবির কমেডি-সিচুয়েশনে ওটা মানিয়ে যেত, কিন্তু সিরিয়াস জায়গায় ভয়ানক বেখাপ্পাভাবে কানে বাজত।

এই নিয়ে কালীদার কাছে একদিন অনুযোগ করেছিলাম। শুনে কালীদা তো মহা খাপ্পা। বললেন: কক্ষনো না। ওটা তোমার শোনার ভুল। কোনও ভালো ডাক্তারকে দিয়ে কান দুটো দেখিয়ে নাও।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : আপনারই উচিত ডাক্তার দেখানো। হলে বসে না হলেও অন্যত্র তো প্রোজেকশান দেখেন। তখন আপনার কানে ধরা পড়ে না?

তখন কালীদা আরও রেগে গেলেন। চিৎকার করে বললেন : বেশ করি, বলি তো বলি! তোমার সমালোচনায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না।

আমি বললাম : আপনি মাঠে ময়দানে রাজনীতি করা মানুষ কালীদা। আপনার সঙ্গে তো গলার জোরে পারব না। সুতরাং ওই আলোচনার এখানেই ইতি। তবে আমার অভিযোগটা আমি উইথড্র করছি না।

কালীদা আমার মুখের সামনে তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি দেখিয়ে বলে উঠলেন : উইথড্র না করলে তো ভারি বয়েই গেল আমার।

একজন বুড়ো খোকাকে ওইরকম করতে দেখে আমি হেসে ফেললাম। আমার হাসি দেখে কালীদা আরও রেগে গেলেন। নিজের মনে গজ গজ করতে করতে অন্যদিকে চলে গেলেন।

এইরকম শিশুসুলভ ব্যবহার কালীদা আরও অনেকবার করেছেন। শুধু আমার সঙ্গেই নয়, বিভিন্ন জনের সঙ্গে। সে সব গপ্পো করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সুতরাং সেসব কথা তাকে তুলে রেখে কালীদার প্রথম সিনেমায় আসার কথাই বলি।

কালীদার প্রথম ছবি 'বর্মার পথে'। এটা ১৯৪৭ সালের ছবি। পরিচালক ছিলেন হিরন্ময় সেন। কালীদাকে হিরন্ময় সেনের কাছে নিয়ে যান পাঁচুবাবু বলে এক ভদ্রলোক। পাঁচুবাবুর পুরো নাম কী তা আমি জানি না। কালীদাও বলেননি। উনি শুধু বলেছিলেন : পাঁচুদাই আমাকে সিনেমা জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

না, কালীদা 'বর্মার পথে' ছবির নায়ক ছিলেন না। নায়ক করেছিলেন সমর রায়। কালীদা ছোট্ট একটি ভূমিকায় চান্স পেয়েছিলেন। তাতেই খুশি। সিনেমায় নিজের মুখটা তো দেখানো গেল। তবে কালীদা ১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'ধাত্রীদেবতা' ছবিতে একটা ভালো রোল পেয়েছিলেন। এক বিপ্লবীর চরিত্র। তারাশঙ্করের এই উপন্যাসটি চিত্রায়িত করেছিলেন বিখ্যাত পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ। এঁর তোলা 'বিদ্যাসাগর', 'রানী রাসমণি' ইত্যাদি ছবির কথা দর্শক আজও মনে রেখেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। কালীদার মৃত্যুর পর অনেক পত্র পত্রিকায় কালীদা-অভিনীত ছবির তালিকা দিতে গিয়ে 'ধাত্রী পান্না' বলে একটি ছবির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, কালীদা ওই নামের কোন ছবিতে অভিনয় করেননি। মনে হয় 'ধাত্রীদেবতা' ছবিকেই ভুল করে ওই নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর জন্যে খবরের কাগজের প্রতিবেদকদের আমি দোষ দিই না। একটি গায়ে গতরে হৃষ্টপুষ্ট তথ্যপঞ্জিতে ওই ভুল তথ্যটি আছে। সাংবাদিকরা সেই ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছেন। ওই তথ্যপঞ্জিতে আরও অনেক ভুল তথ্য আছে। ভবিষ্যতে যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁরা একটু সতর্কভাবে যাচাই করে নেবেন।

কালীদা তাঁর অভিনয়ের প্রথম ব্রেক পেলেন ১৯৫১ সালে 'বরযাত্রী' ছবিতে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ওই কাহিনী নিয়ে ছবি করেছিলেন সত্যেন বসু। ওই ছবিতে তোতলা গণেশের চরিত্রে কালীদা অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। ওই 'বরযাত্রী' ছবি করেই কালীদা দর্শকদের নজরে এসে গেলেন।

সত্যেনদা ওই ছবিটা করেওছিলেন দারুণ। যাঁরা 'বরযাত্রী' ছবিটি দেখেননি তাঁরা সত্যিই একটা ভালো জিনিস মিস করেছেন। এই ক'মাস আগে সত্যেনদা মারা গেলেন। তাঁর তোলা 'পরিবর্তন' একটা অসম্ভব ভালো ছবি। ওই একই কাহিনী তিনি হিন্দিতেও করেছেন। হিন্দিতে আরও প্রচুর ছবি তিনিও করেছেন। তাঁর ছবিগুলিতে একটা সুস্থ বক্তব্য থাকত। সত্যেনদার মৃত্যুতে ছবির জগতে একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেল। সত্যেনদা পরিণত বয়সেই মারা গেছেন, সুতরাং তার জন্যে দুঃখ করার কিছু নেই। তবে তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নের কোনও প্রয়াস নেই, এটাই বড় দুঃখের। এই নিয়ে সেদিন কথা হচ্ছিল শোভা সেনের সঙ্গে। শোভাদিকে সত্যেনদাই সম্ভবত প্রথম ছবিতে নিয়ে আসেন।

'বরযাত্রী' ছবিতে এত বড় একটা ব্রেক পাবার পরও কিন্তু কালীদার কোনও চাহিদা তৈরি হল না। ১৯৫৫ সালে ওই সত্যেন বসুই আবার তাঁকে 'রিকশাওয়ালা' ছবির নায়ক করলেন। 'বরযাত্রী'-র একেবারে বিপরীত চরিত্র। অসম্ভব ভালো অভিনয় করলেন কালীদা। কিন্তু চাহিদা যথাপূর্বং।

১৯৫৬ সালে কালীদার আবার কমেডি ছবিতে অভিনয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'টনসিল'। বরযাত্রীরই কন্টিনিউয়েশন। তবে এবারের পরিচালক তপন সিংহ। ছবির নায়িকা ছিলেন মাধবী মুখার্জি। এ ছবিটি 'বরযাত্রীর মতো জনপ্রিয় হল না বটে, তবে পরিচালক তপন সিংহ এবং অভিনেতা কালী ব্যানার্জির কাজ প্রশংসা পেল।

এতদ্‌সত্ত্বেও কালীদার হাতে কোনও কাজ নেই। সংসার চলা ভার। বলা যায় দারিদ্র্যের একদম চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা। মাঝে মধ্যে দু'এক দিনের কাজ। কিন্তু তাতে কি অভাব মেটে। অভিনয় ছেড়ে যে অন্য কোনওকাজ করবেন সে মানসিকতাও তখন হারিয়ে ফেলেছেন কালীদা।

ঠিক এই সময়ে কালীদার মনে আত্মহত্যার চিন্তাটা ভয়ানকভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কথায় কথায় সেটা প্রকাশও করে ফেলেছিলেন কালুবাবুর কাছে। কালুবাবু হলেন চিত্রপরিচালক সরোজ দে। ওঁরা 'অগ্রগামী' ছদ্মনামে ছবি পরিচালনা করেন। সরোজবাবুর ডাকনাম কালুবাবু। ওঁরা আগে অগ্রদূত গোষ্ঠী, অর্থাৎ বিভূতি লাহাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। পরে অগ্রগামী নাম দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ছবি পরিচালনা করেন। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'সাগরিকা', 'শিল্পী' ইত্যাদি ওঁদেরই ছবি।

এই 'শিল্পী' ছবিতে কালীদা ক'দিনের ছোট্ট একটা কাজ করেছিলেন। সেই সময় থেকে কালী আর কালু দুজনে দুজনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। কালীদা কালুবাবুর কাছে নিজের সব সমস্যার কথা খুলে বলতেন। একদিন কথায় কথায় নিজের আত্মহত্যার ভাবনাটাও বলে ফেলেছিলেন।

শুনে কালুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন। বলেছিলেন : ও কী কথা। আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন! যারা দুর্বল চরিত্রের মানুষ তারা ওসব ভাবে। আপনি তো সে জাতেব মানুষ নন। আপনি না এক সময় মিলিটারিতে ছিলেন।

কালীদা বললেন : এখন দেখছি মিলিটারিতে থাকলেই ভালো করতাম। সেখানে মারা গেলে সেটা একটা গৌরবের ব্যাপার হত। আর এই যে না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মারা যাওয়া, এ যে বড় লজ্জার!

কালুবাবু বললেন : অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আমরা তো আপনার পাশে আছি।

কালীদা বললেন : তা যদি থাকেন তাহলে খোকাদাকে বলে ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজে ঢুকিয়ে দিন না আমাকে।

খোকাদা হল পরিচালক বিভূতি লাহার ডাকনাম। ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই ওঁকে ডাকনামেই ডাকে।

কালুবাবু বললেন : অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনাকে হতে হবে না। আপনি অভিনেতা। একজন বড় মাপের অভিনেতা। আপনি আপনার জায়গাতেই থাকবেন।

এটা যে কালুবাবুর নিছক স্তোকবাক্য নয়, সেটা বোঝা গেল কয়েক মাসের মধ্যেই। কালুবাবু তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাক হরকরা' গল্পটি চিত্রায়িত করার কথা ভাবছিলেন। তার নাম ভূমিকায় কালীদার কথাই ভেবে রেখেছিলেন কালুবাবু। ওঁর বিশ্বাস ছিল ওই ধরনের গ্রাম্য রাস্টিক চরিত্রতেই কালীদাকে ভালো মানাবে। কোট প্যান্টুল পরা চরিত্র ওঁর পক্ষে বেমানান।

'ডাক হরকরা' ছবির প্রযোজক ছিলেন দীপচাঁদ কাংকারিয়া। আর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন শিশির মল্লিক। ছবির প্রধান চরিত্রে কালীদাকে কাস্টিং করার আগে তাঁকে ডেকে পাঠানো হল ডি-ল্যুক্স বিল্ডিং-এ। তাঁর সামনে কয়েকটি শর্ত রাখা হল। তাঁকে দিনের পর দিন আউটডোরে থাকতে হবে। কোনওরকম ওজর আপত্তি চলবে না। বীরভূমের ভাষা রপ্ত করবার জন্যে বেশ কিছুদিন রিহার্সাল দিতে হবে। একটানা ডেট দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই ডেট ক্যানসেল করা চলবে না।

কালীদা সব শর্তই মেনে নিলেন। সইসাবুদ হয়ে যাবার পরমুহূর্ত থেকে ভেতরে ভেতরে চলতে লাগল নিজেকে ডাক হরকরা করে তোলার কাজ। কালীদা এই চরিত্রে অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছিলেন। নিজেকে একেবারে পুরোপুরি মিশিয়ে দিয়েছিলেন চরিত্রটির সঙ্গে। দর্শক সমালোচক সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন কালীদার অভিনয় আর অগ্রগামী গোষ্ঠীর পরিচালনার।

'ডাক হরকরা' ছবিটি ওই বছরের জাতীয় পুরস্কার পায়। ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এই ছবিটি সরকারিভাবে পাঠানো হয় এবং মূল উৎসবের কম্পিটিটিউভ সেকশনে দেখানো হয়। এই 'ডাক হরকরা'ই এশিয়ার প্রথম ফিচার ছবি যা মস্কো টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। এই ছবি দিয়েই ১৯৫৯-৬০ সালে স্টকহোম পিস কনফারেন্সের উদ্বোধন হয়, যার ভূমিকা লেখেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রযোজকরা পরে এটি ছবির টাইটেলের আগে জুড়ে দেন। দুঃখের বিষয়, কালীদা মারা যাবার পর সংবাদপত্রে কালীদা অভিনীত যে ছবিগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে 'ডাক-হরকরা' ছবির নামই নেই। অথচ এই 'ডাক হরকরা' ছবিই ছিল কালীদার অভিনয় জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

আর অপূর্ব হয়েছিল এই ছবির গান। যেমন অপূর্ব তারাশঙ্করের গীত রচনা, তেমনি অনবদ্য সুর করেছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। 'ওগো আমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি' এবং 'লাল পাগুড়ি

দিয়ে মাথে রাজা হলে মথুরাতে' এই গান দুটি আমি সুধীনবাবুর মুখে শুনেছিলাম ছবি রিলিজের অনেক আগেই। তারাশঙ্করবাবুর জন্মদিনে তাঁর টালাপার্কের বাড়িতে সুধীনবাবু গান দুটি গেয়েছিলেন। ছবিতে ওই গানের শিল্পী ছিলেন মান্না দে। এই গানগুলি মান্নাবাবুর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান বলে মান্নাবাবু নিজেই আমাকে বলেছেন।

'ডাক হরকরা' ছবির এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পর একদিন কালীদার বাড়িতে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিন কালীদার খুশি দেখে কে! কালীদা সেদিন শিশুর থেকেও শিশু হয়ে গিয়েছিলেন। অগ্রগামী গোষ্ঠীর তিনজন পরিচালক ছাড়াও সেদিনকার ভোজে যোগ দিয়েছিলেন শিশির মল্লিক এবং ওই ছবির প্রচার অধিকর্তা সুধীরেন্দ্র সান্যাল। এই সুধীরবাবু হলেন এককালের বিখ্যাত রঙ্গ -ব্যঙ্গের পত্রিকা 'অচলপত্র'র সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের বাবা। সুধীরবাবু নিজেও একজন প্রচণ্ড গুণী মানুষ। পিতা আর পুত্র দুজনেই এমন গুণী যে আমরা দীপ্তেনবাবু সম্পর্কে বলতাম 'বাপ কা বেটা', আর সুধীরবাবু সম্পর্কে বলতাম 'বেটা কা বাপ'।

তা সেই রাতের প্রীতিভোজের আসরে কালীদা একেবারে শিশুর থেকেও শিশু হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুদের পরানো ফুলের মালা গলায় দিয়ে কী খুশি! আগ্রহ সহকারে ছবি তোলার জন্যে পোজ দিতে লাগলেন। একটি ছবি তোলা হল প্রীতিবৌদি আর ওঁর মেয়েকে নিয়ে। ওটা কালীদার বাস্তবের পরিবার। ঠিক ওই একই কম্পোজিশনে শোভা সেন, অজিত গাঙ্গুলি আর কালীদাকে নিয়ে আর একটি ছবি তোলা হল। ওটা সিনেমার পরিবার। 'ডাক হরকরা' ছবিতে শোভাদি কালীদার স্ত্রী হয়েছিলেন, আর ছেলের রোল করেছিলেন অজিত গাঙ্গুলি। অজিতবাবু তখন কালুবাবুদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। এখন নিজেই একজন দক্ষ পরিচালক।

'ডাকহরকরা' ১৯৫৮ সালের ছবি। আর এই ১৯৫৮ সালটাই কালীদার অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর। সেই বছরেই কালীদার ছবি ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর', তপন সিংহের 'লৌহকপাট', সলিল সেনের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক'। এই 'অযান্ত্রিক' ছবিটি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। তেমনই যুগান্তকারী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়।

সত্যি কথা বলতে কী এই ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী আট দশ বছর কালীদা বাংলা ফিল্মে উত্তমকুমারের পাশাপাশি রাজত্ব করে গেছেন। ওই সময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল সত্যজিৎ রায়ের 'মণিহারা', মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নিচে', তপন সিংহের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', অগ্রদূতের 'বাদশা', পঞ্চমিত্রের 'ক্ষুধা', মঙ্গল চক্রবর্তীর 'দিনান্তের আলো', বলাই সেনের 'সুরের আগুন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সময়কার আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ছবির নাম নিশ্চয় বাদ পড়ে গেল। সেইসব নামগুলি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

এই বলাই সেনের 'সুরের আগুন' ছবির প্রযোজক ছিলেন কালীদা স্বয়ং। তপন সিংহ তাঁর সহকারী বলাইবাবুকে এই ছবিটা ডাইরেক্ট করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ছবিটি প্রশংসিত হলেও পয়সা পায়নি তেমন। ফলে কালীদা আর দ্বিতীয়বার প্রযোজনা করবার সুযোগ পাননি।

পর পর ছবির সাফল্যে ওই সময় কালীদার কিছুটা মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ে তিনি ছবি পিছু তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক চাইতে লাগলেন। উত্তমকুমারও তখন অত টাকা পেতেন কিনা সন্দেহ। ফলটা হল মারাত্মক। প্রযোজকরা আস্তে আস্তে কালীদার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে লাগলেন। সত্তর দশকের শেষের দিকে কালীদার আবার সেই পূর্বেকার অবস্থা। জমানো টাকাও তখন নিঃশেষিত। কালীদা আবার আতান্তরে পড়ে গেলেন।

সেই অবস্থা থেকে কালীদাকে বাঁচালেন অঞ্জন চৌধুরি। কালীদার মতো একজন শক্তিমান অভিনেতা এইভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাবেন, সেটা অঞ্জনবাবু চাননি। এতদিন অঞ্জন চৌধুরির তুরুপের তাস ছিলেন রঞ্জিত মল্লিক, এখন থেকে তার সঙ্গে কালী ব্যানার্জির নামও যুক্ত হল। 'গুরুদক্ষিণা', 'ছোট বউ' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে কালীদা আবার আগেকার ফর্মে ফিরে এলেন। অঞ্জন চৌধুরির ছবির গুণগত মান কতটা সে প্রশ্নে আমি যেতে চাই না। আমি উল্লেখ করতে চাই অঞ্জনবাবুর মানবিক দিকটির কথা। সেদিক থেকে অঞ্জন চৌধুরি অতুলনীয়।

এই অঞ্জন চৌধুরির সেটেই একদিন কালীদার সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বেধে গেল রাজনীতি নিয়ে। তার দুদিন আগেই চিনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে ছাত্রদের ওপর গুলি চালনার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গেছে। কালীদাকে সে সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেই কালীদা বললেন : বেশ করেছে গুলি চালিয়েছে। ওরা সব দেশদ্রোহী।

আমি বললাম : এ আপনি কী বলছেন কালীদা। একদিন আপনারা যাঁরা মেশিন গানের সামনে জুঁইফুলের গান গাইবার শপথ নিয়েছিলেন, সেই তাঁরাই এখন মেশিনগানের স্বপক্ষে সাফাই গাইছেন?

কালীদা বললেন : তুমি ভেতরের ব্যাপারটা জানো না বলেই এ কথা বলছ। ওরা সব সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার হয়ে দালালি করছিল। চিনের সরকার ওদের ওপরে গুলি চালিয়ে উপযুক্ত কাজই করেছে।

আমি বললাম : তা বলে মানুষ মানুষকে গুলি করে মারবে আর সেটা আপনি সমর্থন করবেন?

কালীদা বললেন : হ্যাঁ করব। আলবত করব। আমি কমিউনিস্ট। সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে যারা দালালি করে তাদের আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। তুমি যদি করো তাহলে তোমাকেও করব। তা তুমি আমার যতই স্নেহভাজন হও না কেন!

এই হলেন কালীদা। তাঁর আদর্শ সম্পর্কে তিনি কট্টর। একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট।

কালীদার সব মতের সঙ্গে আমি সব সময়ে সহমত হতে পারিনি। তবে কালীদার অটল বিশ্বাসের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। কোনও অবস্থাতেই তিনি আপস করতে শেখেননি। তাই তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

সেই কালীদা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। একেবারে অকস্মাৎ। বাবলু সমাদ্দারের 'তান্ত্রিক' ছবির শুটিং সেরে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর হসপিটাল। তাবপরই সব শেষ।

কালীদা জীবনে অনেক দুঃখের পাহাড় বুকের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছেন। এখন সেই পাহাড় বুকে বয়ে বেড়ানোর পালা আমাদের, যাঁরা একদা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

সত্যবাবু

স্টেজের ওপর ভদ্রলোককে দেখে ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম। সেই মুখ, সেই চোখ। কেবল কথা বলবার ভঙ্গিটা আলাদা। যদিও ঐতিহাসিক নাটকের জন্যে প্রয়োজনীয় উগ্র মেক-আপ নিয়েছেন, পরনে উঠেছে মহাভারতের আমলের পোশাক, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও লুকানো যায়নি তাঁর চেনা-চেনা মুখখানি।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ইনি তিনি নন। তাঁর সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য আছে তেমন অন্য কেউ। সেটাই সম্ভব। সিনেমার পর্দায় যিনি সকলের কাছে এত জনপ্রিয়, যাঁর কথা ভাবলেই হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে, তিনি এই রকম একটি অকিঞ্চিৎকর অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করতে আসবেন কেন? বিশেষ করে একটি অফিস ক্লাবের নাটকে! অ্যামেচার গ্রুপ হলেও না হয় কথা ছিল।

এ ঘটনাটা ১৯৫২ সালের। আমি তখন রূপাঞ্জলি পত্রিকার একজন কনিষ্ঠ সাংবাদিক। সিনেমা-থিয়েটারের পাস পেলেই খুশিতে নাচতে নাচতে সেখানে গিয়ে হাজির হই। আমাদের অফিসে প্রচুর অ্যামেচার থিয়েটারের আমন্ত্রণ আসত। তা এই টিটাগড় পেপার মিল রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'কর্ণার্জুন' নাটকের আমন্ত্রণপত্রটা হাতে নিয়ে আমাদের সম্পাদক সুধাংশু বক্‌সি মশাই সেদিন বিকেলে বলে উঠলেন : কী হে রবি, থিয়েটার দেখতে যাবে নাকি?

থিয়েটারের নাম শুনেই নেচে উঠেছিলাম। স্টার, রঙমহল কিংবা মিনার্ভায় যে সব পেশাদার নাটক হত, তার প্রেস শো-র কার্ড কদাচিৎ আমার ভাগ্যে জুটত। ওগুলো প্রাপ্য ছিল আমাদের সিনিয়র সাংবাদিকদের। সুধাংশুবাবুর কথা শুনে মনে হল আজ বোধহয় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। তাই জিজ্ঞাসা করলাম : কবে?

সুধাংশুবাবু বললেন : কবে আবার কী? আজকেই। স্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' হচ্ছে একটা অফিস ক্লাবের। যাও, গিয়ে দেখে এসো।

অফিস ক্লাব শুনে মনটা আবার মুষড়ে পড়ল। অফিস ক্লাব মানে ভয়ানক রকমের অ্যামেচার। স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে যথেচ্ছভাবে হাত-পা নেড়ে অফিসের বড়সাহেব কিংবা বড়বাবুদের মনোরঞ্জনের প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মনে শিল্পীর ইমেজ তৈরির চেষ্টা। এইসব নাটকের কোন সময়জ্ঞান থাকে না। কখন যে পর্দা ওঠে আব পর্দা পড়ে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আর অভিনয়ের তো মা-বাপ নেই। বাড়ির চাকরও যে ভঙ্গিতে চলাফেলা করে আর কথাবার্তা বলে, তাতে মনে হয় সে যেন আর একজন ছবি বিশ্বাস। সব মিলিয়ে একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

তবে এইসব নাটক দেখতে গেলে খাতির পাওয়া যায় খুব। পত্রিকা থেকে আসছি শুনলে চা কিংবা কোল্ড ড্রিংক এগিয়ে আসে সামনে। কুশীলবদের জন্যে যে খাবারের প্যাকেট থাকে তার থেকে একটা এনে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে আগামী সংখ্যায় যাতে ভালো করে দু-চার লাইন লেখা হয় তার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ-উপরোধ। ওই সন্ধ্যাটা নিজেকে কেমন ভি আই পি মনে হয়। কিন্তু নাটক দেখে একদম মন ভরে না।

একে অফিস ক্লাব তায় আবার 'কর্ণার্জুন' নাটক। এই দুটো ব্যাপারই আমাকে হতাশ করে দিল। সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে কর্ণার্জুন' নাটক দেখে আসছি। এর আগে বিভিন্ন উপলক্ষে অন্তত বার দশেক দেখা হয়ে গেছে এই নাটক। তার মধ্যে অফিস ক্লাবের পক্ষ থেকেই বার আষ্টেক। এই নাটক এত বেশি মঞ্চস্থ হবার একটা কারণও আছে। এই নাটকে অনেক চরিত্র। আর অফিস ক্লাব মানে তো সবাই অভিনেতা। অনেককে সুযোগ দেওয়া যায় এই নাটকে।

'কর্ণার্জুন' নাটকটি প্রথম দেখি আমার দেশ তমলুকে। কোর্ট ময়দানে স্টেজ বেঁধে এই নাটকটি করেছিলেন নব রঙমহল গোষ্ঠী। কলকাতার রঙমহল মঞ্চের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীকে নিয়ে তৈরি

হয়েছিল নব রঙমহল সম্প্রদায়। ওঁরা কলকাতায় নিয়মিত অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে মফস্বলে গিয়ে জনপ্রিয় নাটকগুলি অভিনয় করতেন।

তমলুকে যখন 'কর্ণার্জুন' দেখি তখন আমার হাফ-প্যান্ট পরার বয়স। শিল্পীদের কাউকে বিশেষ চিনতাম না। তবে কর্ণের ভূমিকা যিনি করেছিলেন তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম। ট্যুরিং সিনেমার পর্দায় অনেক ছবিতে তাঁকে দেখেছি। তাই তাঁর নাম এবং চেহারা দুটোর সঙ্গেই পরিচয় ছিল। তিনি হলেন রবি রায়। তিরিশ-চল্লিশ দশকের বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের একজন দুর্ধর্ষ অভিনেতা। তবে ওঁর ছোট ভাই ভূমেন রায় ওঁর থেকেও বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষ করে কার্ভালো, রডা, ক্রেভারিং ইত্যাদি সাহেবি চরিত্রে।

সেদিন ওই 'কর্ণার্জুন' নাটক দেখতে দেখতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। যিনি শকুনির ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি কে? কী দারুণ অভিনয় করছেন। দলের মধ্যে সব থেকে ভালো এঁর অভিনয়। এঁর সঙ্গে যাঁর চেহারার মিল খুঁজে পাচ্ছি, তিনি তো কমেডি অভিনয় করেন। তাঁর পক্ষে নিশ্চয় এত শ্রুড রোলে অভিনয় করা সম্ভব নয়।

ওই রিক্রিয়েশন ক্লাবের স্যুভেনিরটি আমার হাতে ধরা আছে। কিন্তু সেটাতে যে চোখ বুলিয়ে শকুনির ভূমিকাভিনেতার নামটি দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করে নেব, তার উপায় নেই। অতএব অপেক্ষা করে রইলাম দৃশ্যশেষে ড্রপসিন পড়ার জন্যে। তখন তো হলের সব আলো জ্বলে উঠবে।

অবশেষে সেই সুযোগ পাওয়া গেল। প্রথম অঙ্ক না দ্বিতীয় অঙ্ক মনে নেই। শেষ হতেই হলের আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্যুভেনির খুলে নামটা দেখেই দারুণ চমকে উঠলাম। এই তো স্পষ্ট করে শকুনির চরিত্রাভিনেতার নাম লেখা আছে। শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে তো আমার সন্দেহটাই ঠিক। রীতিমত উত্তেজিত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে এসে একজন ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম : আচ্ছা ভাই, এই যে শকুনির চরিত্রে অভিনয় করছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি কি 'পাশের বাড়ি' ছবিতে ক্যাবলার রোলে অভিনয় করেছেন।

ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ উনিই তো। কেমন লাগছে ওঁর অভিনয়?

আমি বললাম : দারুণ। আমি তো এখনও ভাবতেই পারছি না, 'পাশের বাড়ি' ছবিতে যিনি ক্যাবলার ভূমিকায় রামক্যাবলার মতো অভিনয় করেছেন, তিনি আপনাদের নাটকে শকুনির মতো একটা কূট চরিত্রে এত ভালো অভিনয় করছেন। ওঁর কাছ থেকে এত পাওয়ারফুল অভিনয় তো ভাবাই যায় না।

ভদ্রলোক বললেন : উনি সত্যিই একজন পাওয়ারফুল অ্যাকটর। রিহার্সাল দেখতে দেখতেই আমরা মোহিত হয়ে যেতাম। এখন তো দেখছি তার চেয়েও অনেক ভালো করছেন।

মনে মনে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এই ভদ্রলোকের নাট্যপ্রতিভাকে নমস্কার জানালাম।

সেদিন স্টার থিয়েটার থেকে 'কর্ণার্জুন' দেখে বেরিয়ে আর একটি বালখিল্য কাজ করে ফেলেছিলাম। হল থেকে বেরিয়েই শ্রী সিনেমার সামনে ছুটে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন কয়েক সপ্তাহ ধরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে 'পাশের বাড়ি' ছবিটি। হলের লবিতে পিন-আপ করা ছবিতে ক্যাবলারূপী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখটা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম। ভাবা যায়। এই ভদ্রলোকই এতক্ষণ স্টার থিয়েটারে শকুনি করলেন। মনে মনে আরও একবার নমস্কার জানালাম সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নামক অভিনেতাটিকে।

অনেক পরে যখন সত্যবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল তখন ওঁকে একদিন কথায় কথায় আমার সেই ১৯৫২ সালের বালখিল্য ব্যাপারটির কথা বলেছিলাম। শুনে সত্যবাবু হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন : সেসব অনেককাল আগেকার কথা। হ্যাঁ, আমাদের অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবে আমি নিয়মিত অভিনয় করতাম বটে। অনেক নাটকই তো ওখানে করেছি। কিন্তু আলাদা করে 'কর্ণার্জুন' নাটকে শকুনি করার কথা এখন আর আমার মনে নেই। তবে শুধু অফিস ক্লাবেই তো নয়। আমার অভিনয় জীবনের গোড়াপত্তনই তো অ্যামেচার ক্লাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন ক্লাবে?

সত্যবাবু বললেন : ক্লাবের কোনও ঠিক ঠিকানা আছে নাকি। এপাড়া-ওপাড়ার কত ক্লাবে থিয়েটার করেছি। সেই ইয়াং এজে কত যাত্রাও তো করেছি।

আমি বললাম : তাই নাকি?

সত্যবাবু বললেন : ঠিক তাই। আর তখন সব সিরিয়াস চরিত্রেই অভিনয় করতাম। সিনেমায় আমার প্রথম পরিচিতি কমেডি-অ্যাক্টর হিসেবে। সত্যেন বসু মশাইয়ের 'বরযাত্রী' ছবিতে কে. গুপ্তর রোল করেছি। তারপর সুধীর মুখার্জির 'পাশের বাড়ি' ছবিতে ক্যাবলাকান্ত হিরো। চরিত্রের নামটাও ক্যাবলা। কেন ওঁরা আমাকে কমেডি-রোলে সিলেক্ট করেছিলেন আমি জানি না। কথায় কথায় মানুষকে হাসানোর ক্ষমতা আমার নেই। সাধারণভাবে যখন কথাবার্তা বলি তখন তাতে হাসির ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাবেন না। অথচ সেই আমি জনপ্রিয়তা পেলাম কিনা কমেডি রোল করে। এটা বোধহয় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের থেকেও আশ্চর্য ব্যাপার!

আমি বললাম : সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। আপনি বলছেন তার আগে জীবনে কখনও কমেডি রোল করেননি অ্যামেচার থিয়েটারে? তাহলে কী ধরনের রোল করতেন মনে আছে কিছু?

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ আছে। 'দুই পুরুষ' নাটকে নুটুবিহারী করতাম। 'উত্তরা' নাটকে অর্জুনের রোল করেছি। 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকে মিস্টার মুখার্জি করেছি। আমার সঙ্গে ওই নাটকে আর কে কে অভিনয় করত জানেন?

আমি বললাম : কে?

সত্যবাবু বললেন : আমাদের গ্রেট হিরো উত্তমকুমার আর হিরোইন সাবিত্রী চ্যাটার্জি।

আমি বললাম : তাই নাকি? ওঁরা অ্যামেচারে অভিনয় করতেন!

সত্যবাবু বললেন : শুধু করতেন না, বেশ ভালোই করতেন। এছাড়া আরও একজনের সঙ্গে আমি অভিনয় করেছি, যাঁর নাম শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

আমি বললাম : কে বলুন তো?

সত্যবাবু বললেন : আমাদের এক্স-মেয়র গোবিন্দ চন্দ্র দে।

আমি বললাম . সে কী! আমি তো জানি গোবিন্দবাবু থিয়েটার হলের মালিক। স্টার থিয়েটারের। কিন্তু উনি যে অভিনয় করতেন তা তো জানতাম না।

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ, গোবিন্দ আমার কলেজের বন্ধু ছিল। আমরা একসঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তাম। তখনই অভিনয় করেছি। আসলে কী জানেন, জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি যুবকদের মধ্যে দুটি প্রবণতা দেখা যায়। এক, কবিতা লেখা। আর দ্বিতীয়টি হল যৎকিঞ্চিৎ অভিনয় করা। আমি কিন্তু মশাই কোনদিনই ভাবিনি যে আমি অভিনেতা হব। আমার স্বপ্ন ছিল অন্য।

আমি বললাম : সেটা কী?

সত্যবাবু বললেন : ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হব। ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব। খানিক দূর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু তারপর সব অন্যরকম হয়ে গেল। মাঠের খেলোয়াড় থেকে মঞ্চের খেলোয়াড় হয়ে গেলাম।

আমি বললাম : কোন্ পজিশনে ফুটবল খেলতেন আপনি?

সত্যবাবু বললেন : গোলে।

আমি বললাম : তার মানে লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স। তা এখনও তো তাইই করছেন। আপনাদের কল্পতরু গোষ্ঠীর লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স তো আপনিই। আপনাকেই তো সব ঝড়-ঝাপটা সামলে গ্রুপটাকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে।

সত্যবাবু হাসতে হাসতে বললেন : তা যা বলেছেন। তবে আমি আর এখন গোলে একা খেলছি না। আমরা দুজনে মিলে খেলছি।

আমি বললাম : আর একজন কে?

সত্যবাবু বললেন : বুড়ো।

আমি বললাম : বুড়ো মানে উত্তমকুমারের ভাই তরুণকুমার?

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ। আমাদের গ্রুপের ব্যাপারে বুড়ো আমারই মতো সিরিয়াস। অন্যান্য ছেলেমেয়ে যারা আছে তারাও তাই। আমার মশাই গর্ব হয় আমাদের গ্রুপের ছেলেমেয়েদের জন্যে।

আমি বললাম : তা আপনাদের গ্রুপের তেমন কোন অ্যাকটিভিটি তো আজকাল আর দেখতে পাই

না। আপনি সিনেমা করছেন, যাত্রা করছেন। তরুণকুমারও তাই। আমি তো ভেবেছিলাম আপনারা বোধহয় গ্রুপটা তুলেই দিয়েছেন।

সত্যবাবু বললেন : না না, ওটা আপনার ভুল ধারণা। আমরা ভয়ানকভাবে অ্যাকটিভ। আসলে একটা স্টেজ হাতে পাচ্ছিলাম না তো আমরা। উত্তম মঞ্চেব কাজ শেষ হয়ে এসেছে। সামনের মাসে ওটা ওপন্ করব। তারপর যাত্রার সিজনটা শেষ হয়ে গেলেই ওখানে আমরা নিয়মিত থিয়েটার করব। নাটকও ঠিক করে ফেলেছি।

আমি বললাম : আপনার পুরনো কোনও নাটক নাকি?

সত্যবাবু বললেন : না না, এটা একেবারে নতুন একটা নাটক। লেখার কাজ প্রায় শেষ।

আমি বললাম : আপনার লেখা নাটকগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আজ পর্যন্ত কতগুলো নাটক লিখেছেন আপনি?

সত্যবাবু বললেন : সঠিক হিসেব রাখিনি। মনে তো হয় খান কুড়ি হবে।

আমি বললাম : তা আপনার নাটকগুলো পত্র-পত্রিকায় ছাপান না কেন? অনেকেই তো ছাপান। এই তো গত কয়েক বছর ধরে পুজোর সময় মনোজ মিত্রের একটা করে নাটক বেরোচ্ছে।

সত্যবাবু বললেন : আমি নাটক ছাপতে দিইনি অভিমানে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কিসের অভিমান?

সত্যবাবু বললেন : প্রথম প্রথম যখন নাটক লিখতাম তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপতে পাঠাতাম। সেগুলি ফেরত আসত। সম্পাদকমশাইরা বোধহয় না পড়েই ফেরত পাঠাতেন। কিছু কিছু আবার ফেরতও আসত না। মাঝপথেই হারিয়ে যেত। সেই থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম জীবনে আর কখনও ছাপাবার জন্য নাটক পাঠাব না। সেই অভিমান ভেঙে গেল গত বছর।

আমি বললাম : কী করে?

সত্যবাবু বললেন : 'দেশ' পত্রিকা থেকে গত বছর আমার কাছে একটা একাঙ্ক নাটক চেয়ে পাঠালেন ওঁরা। অভিমানের রেশটা তখনও মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু তার জোর ছিল না। তাই পাঠাব না পাঠাব না করেও পাঠিয়ে দিলাম।

আমি বললাম : ইস, আমি ওটা মিস করেছি। পড়া হয়নি।

সত্যবাবু বললেন : নাটকটার খুব প্রশংসা পেয়েছিলাম। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে চিঠি এসেছিল। অন্য স্টেট থেকে দু-তিনটে ক্লাব নাটকটা অভিনয় করবার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিল। নিয়মকানুন জানতে চেয়েছিল। কত কী রয়্যালটি দিতে হবে তার খোঁজ করেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি সব জানিয়ে দিয়েছিলেন?

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ। আমি লিখে দিয়েছিলাম রয়্যালটি-ফয়ালটি কিছু লাগবে না। তবে নাটকটা মঞ্চস্থ হবার পর দর্শকদের কেমন লাগল সেটা জানাবেন।

আমি বললাম : আর অভিমানের কারণ হিসেবে আপনি যে বললেন সম্পাদকমশাইরা আপনার নাটক না পড়েই ফেরত পাঠাতেন, তেমন ধারণা আপনার হল কেন?

সত্যবাবু বললেন : ওইসব ফেরত আসা নাটকের অনেকগুলিই আমি আমার গ্রুপে অভিনয় করেছি পরবর্তীকালে। তখন নানা পত্র-পত্রিকায় সেইসব নাটকের ভূয়সী প্রশংসা বেরিয়েছে। তা একটা বাতিল করে দেওয়া নাটকের প্রশংসা একই কাগজে বেরোয় কী করে?

আমি বললাম : সেটা হয়তো টোটালিটির কারণে। ডিরেকশান, অভিনয়, সংগীত, সব মিলিয়ে হয়তো ভালো কিছু পেয়েছেন সমালোচকরা।

সত্যবাবু বললেন : আজ্ঞে না স্যার। নাটকের বিষয়বস্তু, সংলাপ, নাট্যগঠন এই সবকিছু নিয়ে আলাদা করে প্রশংসা। তবে এখন বুঝতে পারি আমার অভিমান করে থাকাটা ভুল হয়েছিল। নতুন লেখকদের ভাগ্যে বোধহয় এইরকম ব্যাপারই ঘটে।

আমি বললাম : সব ক্ষেত্রে সেটা সত্যি নয়। আমি এমন বেশ কিছু সম্পাদককে জানি, যিনি নতুন লেখকদের লেখা খুব মনযোগ সহকারে পড়েন। এমন সব নবাগতের লেখা ছেপেছেন, যা নিয়ে হইচই

পড়ে গেছে। সেইসব নতুন লেখকরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

সত্যবাবু বললেন : সে কথা তো আমি জানি। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময়বাবু। বিমল কর মশাইকেও ওই দলে ফেলা চলে। তাঁর হাত দিয়েও অনেক নতুন লেখক বেরিয়ে এসেছেন। তবে আমার নাটক ফেরত হওয়াতে ওই তরুণ বয়েসে মনে বড় আঘাত পেয়েছিলাম তো। তাই কথাটা বললাম।

আমি বললাম : যাক গে, এখন তো মনের সব অভিমান ঘুচে গেছে। এবারে আপনি নতুন যে নাটকটা লিখছেন তার কথা বলুন। সাবজেক্টটা কী?

সত্যবাবু বললেন : ওটা একটা কনটেমপোরারি সাবজেক্ট। এই যে এখন সব পুরনো বাড়ি ভেঙে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো স্কাই-স্ক্র্যাপার তৈরি হচ্ছে তারই ওপর বেস্ করে আমার নাটক। একটা ফ্যামিলিকে কেন্দ্র করে আমি নাটকটা ধরেছি। প্রবীণ আর নবীনের দ্বন্দ্ব। পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন যুগের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নের সংঘাত।

আমি বললাম : বাঃ, সাবজেক্টটা তো বেশ ভালো। এর মধ্যে পলিটিক্স আসছে নাকি?

সত্যবাবু বললেন : কিছুটা তো আসবেই। এখন তো আমাদের জীবন পলিটিক্সের দ্বারা বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত। তবে আমার নাটকে সেটা খুব সোচ্চার নয়। বিল্ডিং প্রমোটারদের প্রসঙ্গে কিছুটা পলিটিক্স এসেছে।

আমি বললাম : কী নাম দিয়েছেন নাটকের?

সত্যবাবু বললেন : নাম একটা ভেবেছি। তবে সেটা ফাইনাল নয়। তার চেয়েও ভাল একটা নাম খুঁজছি। সেইজন্যে নামটা এখন বলব না।

আমি বললাম : তা না বলুন। কিন্তু কেমন করে অ্যামেচার নাটক থেকে পেশাদার নাটকে এলেন সেটা তো বলবেন।

সত্যবাবু বললেন : আমাকে পেশাদার মঞ্চে নিয়ে আসেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি বললাম : অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়? কী আশ্চর্য! তিনিও তো আপনারই মতো একটি ক্যাবলাকান্ত চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম ফিল্মে এসেছিলেন। নরেশ মিত্রের ডিরেকশানে 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবিতে

সত্যবাবু বললেন : ঠিক তাই। ক্যাবলাকে ক্যাবলা না দেখিলে আর কে দেখিবে বলুন।

কথাটা শেষ হতেই দুজনে হেসে উঠলাম।

হপ্তাখানেক আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুটি এক স্কুলে মাস্টারি করতেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। তিনি বললেন : বর্তমান-এ অ্যানাউন্সমেন্টটা বেরিয়েছে, আগামী সপ্তাহে আপনি সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখবেন। তা সত্যবাবুকে নিয়ে লেখবার আগে আপনার কি উচিত ছিল না উৎপল দত্তকে নিয়ে লেখা? হাজার হোক উৎপলবাবু তো সত্যবাবুর গুরু বটে।

আমি বুঝলাম অন্য অনেকে যেমন একই নামের এই দু'জনকে নিয়ে নাম-বিভ্রাটে পড়েন, বন্ধুটিও তাই পড়েছেন। ওঁর ভুল ভাঙিয়ে দেবার জন্যে বললাম : আমি যাঁকে নিয়ে লিখছি তিনি ওই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নন। উনি হলেন পি এল টি-র সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিও অসম্ভব গুণী শিল্পী। ওঁকে নিয়েও লিখব বৈকি। তবে আর একটু পরে। এবং অবশ্যই তার আগে উৎপলবাবুকে নিয়ে লিখব।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বন্ধুটি বলে উঠলেন : ও, আপনি তাহলে আমাদের সত্যবাবুকে নিয়ে লিখছেন?

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

বন্ধু চলে গেলেন। কিন্তু ওঁর শেষ সংলাপের দুটি শব্দ আমায় বড় চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল। উনি বললেন, 'আমাদের সত্যবাবু'। কথাটা কি ঠিক? পি এল টি'র সত্যবাবু কি আমাদের সত্যবাবু নন?

ওই কথা দুটি বন্ধুটি যে খুব সচেতন ভাবে বলেছেন তা নয়। অবচেতনের গহ্বর থেকে আপনা-আপনিই শব্দ দুটি বেরিয়ে এসেছে।

পরে ভেবে দেখলাম কথাটা খানিকটা ঠিক তো বটেই। পি এল টি'র সত্যবাবু নিঃসন্দেহে বড় অভিনেতা। কিন্তু ওঁর পরিচিতি তো সর্বজনীন নয়। ওঁদের অভিনয় হয় একাদেমিতে, রবীন্দ্র সদনে, শিশির মঞ্চে। সেখানকার দর্শক আলাদা। তাঁদের অনেকেই উত্তর কলকাতার নিয়মিত রঙ্গালয়গুলিতে

নাটক দেখেন না, অথবা দেখা পছন্দ করেন না। কিন্তু 'আমাদের সত্যবাবু' বলে যাঁকে উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি থিয়েটারে তো বটেই, বেতারের নাটকে এবং যাত্রার আসরে ভয়ানক ভাবে জনপ্রিয়। কাজেই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করলে এঁর ছবিটাই আগে চোখের সামনে ভাসে।

কিন্তু এই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছতে সত্যবাবুকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। অনেকের কাছে উমেদারি করতে হয়েছে। অনেক ঘাম-রক্ত ঝরাতে হয়েছে।

যেমন যখন টিটাগড় পেপার মিলে কাজ করতেন তখন তো ওখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাবে এবং পাড়ার নাট্যদলে প্রচুর অভিনয় করতেন। কিন্তু অ্যামেচারের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে থাকতে কতদিন আর ভালো লাগে?

সেই জন্যেই একদিন মণিদাকে, অর্থাৎ প্রয়াত অভিনেতা মণি শ্রীমানীকে পাকড়াও করলেন। বললেন : দাদা, আপনাদের থিয়েটারে আমাকে একটু চান্স করে দিন না।

মণিদা টিটাগড় পেপার মিলের অফিসে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। মণিদা যেখানে কাজ করতেন বিবেকানন্দ রোডের সেই এ সি পাল অ্যান্ড কোম্পানি ছিল টিটাগড় পেপার মিলের ডিলার। সেই সূত্রে মণিদাকে প্রায়ই ওখানে আসতে হত।

মণিদা তখন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করতেন। শিশিরবাবুর শেষের দিককার সব নাটকেই উনি থাকতেন। ওখানেই মণিদার অভিনয় দেখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। পরে যখন সত্যজিৎবাবু ছবি করতে আসেন তখন 'অপরাজিত' এবং 'পরশ পাথর' ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন মণিদাকে। শিশিরবাবুর ওখানে অভিনয়ের স্মৃতির সূত্র ধরেই মণিদার ডাক পড়েছিল সত্যজিৎবাবুর তরফ থেকে।

সত্যবাবুর ইচ্ছে ছিল ভালো করে অভিনয় শেখবার। অ্যামেচার নাটকে প্রচুর হাততালি-টাততালি পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না পাবলিক স্টেজে বাঘা বাঘা শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করছেন ততক্ষণ তৃপ্তি কোথায়? এ তো চতুর্থ ডিভিশনে খোলা মাঠে ফুটবল খেলার মতো। তাঁকে প্রথম ডিভিশনে ঘেরা মাঠে খেলতে হবে।

সেই জন্যেই সত্যবাবু দিনের পর দিন ধবাকরা করতে লাগলেন মণি শ্রীমানীকে। মণিদাও হচ্ছে হবে হচ্ছে হবে করে প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। অনেক চেষ্টা করেও শিশিরবাবুর কাছে পৌঁছনো গেল না।

কাজেই সত্যবাবু একলব্য শিষ্যের মতো শিশিরবাবুর বিভিন্ন নাটক দেখে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন অভিনয় শেখার।

আমি বললাম : তাহলে আপনি নাট্যশিক্ষক হিসেবে কাউকে পাননি? আপনার নাটক শেখার গুরু আপনি নিজেই?

সত্যবাবু বললেন : না, তা নয়। আমি এমন একজন মানুষকে গুরু হিসেবে পেয়েছিলাম যিনি নাটকের অ আ ক খ থেকে শুরু করে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ শব্দটি পর্যন্ত আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে আমি জীবনে দাঁড়াতেই পারতাম না।

আমি বললাম : তিনি কে?

সত্যবাবু বললেন : তাঁর নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আমাদের সংস্কৃতিজগতের সেই বিখ্যাত অজাতশত্রু পুরুষ। বীরেনদা আমাকে হাতে ধরে ধরে পাখি পড়ানোর মতো করে নাটক শিখিয়েছেন।

আমি বললাম : বীরেনদার কাছে আপনাকে কে নিয়ে গিয়েছিলেন?

সত্যবাবু বললেন : কেউ নিয়ে যায়নি। বীরেনদা নিজেই আমার কাছে এসেছিলেন।

আমি বললাম : তাই নাকি!

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ। বীরেনদা আমাদের পাড়ার একটা নাটক করার সময় প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। বসে বসে আমাদের সেই ভুলভাল অ্যাকটিং-এ ভরা নাটকের পুরোটা দেখেছিলেন। শেষ হবার পর আমাকে ডেকে বলেছিলেন : তোমার কণ্ঠস্বরটি তো বেশ ভাল। তুমি রেডিওতে অডিশন দিচ্ছ না কেন?

সত্যবাবু বললেন : দিয়েছি তো। একবার নয়, দশবার। আর প্রতিবারই ফেল।

বীরেনদা বললেন : সে কী! দশবার অডিশন দিলে কী করে?

সত্যবাবু বললেন : নাম পালটে পালটে। কখনও নাম নিতাম হরিশ তো কখনও সুরেশ। পরের দিকে নামকরা অ্যাক্টদের নামও ব্যবহার করেছিলাম। যেমন নীতীশ, ভূমেন, রবি, যোগেশ—এইরকম সব নাম। কিন্তু তাতেও লাক্ ফিরল না।

বীরেনদা বললেন : যদি পাশ করে যেতে তাহলে তো সেই ছদ্মনামেই সারা জীবন অভিয় করতে হত?

সত্যবাবু বললেন : তা কেন! তখন একটা এফিডেভিট করে নিজের নামে ফিরে আসতাম আবার। যে কারণে পদবীটা ঠিক রেখেছিলাম। সব নামেরই সারনেম ব্যানার্জি।

বীরেনদা হাসতে হাসতে বললেন : বাঃ, তুমি তো বেশ ওস্তাদ ছেলে! তা যাক গে, কাল একবার রেডিও স্টেশনে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো তো!

আমি জিজ্ঞেস করলাম : পরের দিন গিয়েছিলেন?

সত্যবাবু বললেন : নিশ্চয়ই। তার আগের দিন সারা রাত তো ঘুমোতে পারিনি।

আমি বললাম : কেন?

সত্যবাবু বললেন : ভাবনায়। উৎকণ্ঠায়। আমার যা মন্দ বরাত তাতে বীরেনদা চেষ্টা করলেও কি কিছু হবে? বেড়ালের ভাগ্যে শিকে কি ছিঁড়বে? কিন্তু ছেঁড়া বলে ছেঁড়া! অতবড় একটা শিকে যে আমার বরাতে ছিড়বে—সেটা তো ভাবতেই পারিনি!

আমি বললাম : কী রকম?

সত্যবাবু বললেন : তখন রেডিও স্টেশন ছিল গার্স্টিন প্লেসে। পরের দিন সেখানে গিয়ে দেখা করতেই বীরেনদা একটা ফর্ম এগিয়ে দিয়ে বললেন : চট্ করে এটাতে একটা সই করে দাও দিকি। কালকেই তোমার অডিশন। হাতে করে চিঠিটা নিয়ে যেও।

আমি বললাম : এতটা সৌভাগ্য আপনি আশা করেননি নিশ্চয়?

সত্যবাবু বললেন : তা তো করিইনি। তবে আশ্চর্যের এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। পরের দিন অডিশন দেবার পর বীরনেদা আমাকে ডেকে বললেন : তুমি পাস করে গেছ। দু'একদিনের মধ্যেই চিঠি চলে যাবে। চিঠি পাওয়া মাত্রই আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে। এই মাসেই তোমাকে প্রোগ্রাম দেব।

আমি বললাম : আরেব্বাস! এ যে দেখছি একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতা?

আমার কথা শুনে সত্যবাবু হেসে ফেললেন। বললেন : অনেকটা সেইরকমই বটে। সেই যে বীরেনদার হাতে পড়লাম, তারপর থেকে বীরেনদা আমাকে ঘষে মেজে একেবারে অ্যাক্টর তৈরি করে ছেড়ে দিলেন।

আমি বললাম : রেডিওতে কত নাটক করেছেন আজ পর্যন্ত।

সত্যবাবু বললেন : ঠিক হিসেব রাখিনি। তবে পাঁচশোর ওপর তো হবে নিশ্চয়।

আমি বললাম : এত নাটক! তা রেডিওর নাটকে অভিনয় করতে আপনার খুব ভাল লাগে বুঝি?

সত্যবাবু বললেন : যে কোনও অভিনেতার কাছে রেডিও নাটক একটা চ্যালেঞ্জ। সেখানে আপনার শরীরী উপস্থিতি নেই। কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের সাহায্যে আপনাকে মানুষের মনের ভিতর নিজের শরীরটাকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে আমার খুব ভাল লাগে।

আমি বললাম : আপনি তো সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা আর রেডিও—এই চারটে মিডিয়ামেই কাজ করেছেন। কোনটাকে আপনার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়?

সত্যবাবু বললেন : আমি সিনেমা কিংবা যাত্রা করি জীবিকার জন্যে। ওখানে অনেক টাকা পাওয়া যায়। আর স্টেজ হল আমার প্রাণ। কিন্তু রেডিওর নাটক কী জানেন? ওটা হল আমার জীবন। ওটা না থাকলে আমি বাঁচব না।

আমি বললাম : কিন্তু এখন তো টিভি'র দাপটে রেডিও কোণঠাসা হয়ে গেছে। ওখানকার নাটক আর কে শোনে!

সত্যবাবু বললেন : সেটা শহরাঞ্চলে। কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে এখনও বেতার নাটক খুবই জনপ্রিয়। আমি তো গ্রামে গ্রামে যাই যাত্রা করবার জন্যে। সেখানে কত লোকের মুখে আমার রেডিওতে অভিনয়ের প্রশংসা শুনি। যাত্রার পালা শেষ হবার পর বহু লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। বুড়ো থেকে ছোকরা সব বয়সের মানুষ। আমি ভাবলাম তারা আমার যাত্রার অভিনয়ের কথা বলবে। কিন্তু তারা এসেই বলে রেডিও-নাটকের কথা। 'সাহেব' নাটকটার জন্যে যে কত প্রশংসা পেয়েছি কী বলব! এমনি আরও বহু নাটকের। তবে টিভি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে রেডিও-নাটকের এই জনপ্রিয়তা আর কতদিন থাকবে জানি না।

আমি বললাম : যাক, রেডিওর কথা রেখে এবারে স্টেজের কথা বলুন। প্রফেশ্যনাল স্টেজে আপনি তো বললেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে এনেছেন। তা গুরুদাসবাবুব সঙ্গে আলাপ হল কী ভাবে?

সত্যবাবু বললেন : গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ উত্তরপাড়ায় নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে। আমি ওখানে গিয়েছিলাম আবৃত্তি করতে।

আমি বললাম : আপনি আবৃত্তিও করেন নাকি?

সত্যবাবু বললেন : এক সময়ে করতাম। ছোটবেলা থেকেই আমার আবৃত্তির দিকে ঝোঁক। তা নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরের ওই অনুষ্ঠানে গুরুদাসবাবুও ছিলেন। আমার আবৃত্তি শুনে উনি বোধহয় খুশি হয়েছিলেন। তাই নিজেই ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন · তোমার কণ্ঠস্বরটি তো ভারি ভাল। তুমি আমাদের সঙ্গে থিয়েটার করবে?

সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায়?

গুরুদাসবাবু বললেন : মিনার্ভা থিয়েটারে। ওখানে আমরা রেগুলার থিয়েটার করছি। নাটকের নাম 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'। আমি ঠাকুরের পার্টটা করি আর মলিনা দেবী রানি রাসমণি করেন। মহেন্দ্র গুপ্ত করেন মথুরবাবু। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে তোমাকে হৃদের পার্টটা দিতে পারি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন, না কোনও শর্ত-টর্ত করে দিয়েছিলেন?

সত্যবাবু বললেন : শর্ত আবার কী। আমার কতদিনের স্বপ্ন পাবলিক স্টেজে অভিনয় করব। সেই সুযোগ যে পাচ্ছি তাই কত নয়। তার উপর আবার শর্ত। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

আমি বললাম : আপনার ইচ্ছে ছিল শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করবেন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। সে আশা আর পূর্ণ হল না বলুন।

সত্যবাবু বললেন : হয়েছিল তো। আমি এক বাত্তিরের জন্যে শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম ওই শ্রীরঙ্গম মঞ্চে।

আমি বললাম : তাই নাকি?

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ। আর সেটা ঘটেছিল আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের দৌলতে। আমার 'পাশের বাড়ি' ছবি তখন রিলিজ করে গেছে। রম রম করে চলছে। সেই সময় আমার ওই পরিচিত ভদ্রলোক একটা কম্বিনেশন নাইটের আয়োজন করলেন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে।

আমি বললাম : এটা তো ১৯৫২ সালের কথা বলছেন তাহলে। তখন তো শ্রীরঙ্গমের আলো প্রায় নিবু নিবু।

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ। শ্রীরঙ্গমে তখন রেগুলার শো আর হয় না। মাঝে মাঝে কম্বিনেশন নাইটের অভিনয় হয় কখনও শিশিরবাবুর উদ্যোগে, আবার কখনও অন্যদের দ্বারা। আমার ওই পরিচিত ভদ্রলোক সেইভাবেই শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকটা করিয়েছিলেন। তাতে শিশিরকুমার করেছিলেন রাসবিহারী। মিনার্ভা থেকে ছবি বিশ্বাসকে আনানো হয়েছিল। ছবিদা করেছিলেন নরেন। রঙমহলের শিপ্রা মিত্র করেছিলেন বিজয়া। আর আমি করেছিলাম বিলাসের চরিত্রে।

আমি বললাম : বিলাস তো একটা কুটিল চরিত্র। 'পাশের বাড়ি'র ক্যাবলা চরিত্রের অভিনেতাকে

ওঁরা ওই রোল্ দিতে সাহস করলেন?

সত্যবাবু বললেন : বললাম না ভদ্রলোক আমার পরিচিত। উনি আমার অ্যামেচারে অনেক অভিনয় দেখেছেন। সেখানে সব সিরিয়াস চরিত্রই করতাম যে।

আমি বললাম : শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে বুক কাঁপেনি আপনার?

সত্যবাবু বললেন : কাঁপেনি আবার! একটা সিনে তো একটা কেলেঙ্কারির কাণ্ডই করে ফেলেছিলাম।

আমি বললাম : কী রকম?

সত্যবাবু বললেন : এর আগে চিরকাল তো শিশিরবাবুর অভিনয় দেখে এসেছি দর্শকের আসনে বসে। আর সেদিন তাঁর সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছি। তাঁর স্পর্শ পাচ্ছি. শরীরের গন্ধ পাচ্ছি। আমার ভেতরে ভেতরে তখন প্রবল উত্তেজনা। আর সে কী অভিনয় নাট্যাচার্যের। একটা দৃশ্যের মাঝখানে রাসবিহারী যেখানে নিজের পুত্র বিলাসের ওপর চটে গিয়ে বলছেন . যাও, এবার মাঠে গিয়ে কুলকর্ম করগে যাও। সেই ডায়লগটা এমন অপূর্ব ভঙ্গিতে বললেন যে আমি নিজের পার্ট বলতে ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা বলা দেখছিলাম। ওদিকে উইংসের পাশ থেকে প্রম্পটার চাপা গলায় চিৎকার করছে : বলুন, বলুন, বাবা-বাবা! কিন্তু কে তখন বাবা বলবে। আমি তো আত্মবিস্মৃত। শিশিরবাবু বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। উনি মুখে 'হুঃ' বলে একটা শব্দ করে নাটকীয় ভাবে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে আমার বোধশক্তি ফিরে এসেছে। প্রম্পটারেব কথাগুলোও কানে এসে প্রবেশ করছে। আমিও কোনরকমে সিনটা ম্যানেজ করে 'বাবা-বাবা' বলে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর?

সত্যবাবু বললেন : স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে লজ্জায় মরি আর কি! ছি ছি, এ আমি কি করলাম। শিশিরবাবু কী ভাবলেন কে জানে। একেবারে অ্যামেচারিশ ব্যাপার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সাহস সঞ্চয় করে শিশিরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমি বললাম : তারপরে খুব বকুনি শুনতে হল তো?

সত্যবাবু বললেন : না, বকুনি শুনতে হয়নি। ওঁর সামনে গিয়ে উনি কিছু বলবার আগেই আমি নিজের অপরাধ কবুল করলাম। বললাম : এমন মুগ্ধ হয়ে আপনার অভিনয় দেখছিলাম যে পরের ডায়লগটা বলবার কথা মনেই ছিল না। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবার সৌভাগ্য যে কোনদিন হবে সেটা তো ভাবিনি কখনও। তাই আপনার ওই তোজোদৃপ্ত অভিনয় দেখতে দেখতে আমার সব গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

আমার ওই আবেগময় ভাষা শুনে শিশিরবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন : ও কিছু নয়। অভিনয় করবার সময় ওরকম একটু-আধটু ভুলভ্রান্তি ঘটতেই পারে। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। অভিনয়টা যদি ভাল করে শিখতে চাও তো কোনদিন কম্বিনেশন নাইটে অভিনয় কোরো না। সেখানে সবাই নিজের নিজের কেরামতি দেখাবার চেষ্টা করে। কো-আর্টিস্টের কথা চিন্তাই করে না। নতুন যারা, তারা নার্ভাস হয়ে পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফ্যালে। আমার কথাটা মনে রেখো।

আমি বললাম : কথাটা মনে রেখেছেন তো?

সত্যবাবু বললেন : নিশ্চয়ই। শুধু শিশিরবাবুর ওই কথাটাই নয়। সেদিনকার অভিনয়ের আরও একটি ঘটনা আমি মনে রেখেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কী?

সত্যবাবু বললেন : ছবিদার চোখের একটা এক্সপ্রেশন।

আমি বললাম : সেটা কীরকম?

সত্যবাবু বললেন : ওই নাটকের একটা দৃশ্যে আছে নরেন বিজয়ার ঘরে তার বিছানার ওপর বসে তার সঙ্গে কথা বলছে। বিলাস ঘরে ঢুকে নরেনকে বিজয়ার বিছানায় বসে থাকতে দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চাকরকে ডেকে বলছে : একঠো কুরসি লাও শুয়ার কা বাচ্চা। তা আমি ডায়লগটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছবিদা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে ভাবাই যায় না। ছবিদার ওই লুক্‌টাতে একই সঙ্গে রাগ, ঘৃণা আর উপেক্ষা যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল। ভাবলাম কত

বড় শিল্পী হলে এরকম একটা লুক্ দেওয়া সম্ভব। মনে মনে ছবিদার পায়ের কাছে মাথাটা নিচু করে দিয়েছিলাম সেদিন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেদিন ছবিদার কাছে যেটা শিখলেন সেরকম লুক্ আপনি পরে কোন নাটকে নিজে দিয়েছেন?

সত্যবাবু বললেন : অজস্রবার। এখনো তো দিয়ে চলেছি কত নাটকে।

আমি বললাম : অভিনয় শেখার কাজটা এখনও কী আপনি ওইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

সত্যবাবু বললেন : নিশ্চয়। অভিনয়ের তো কিছুই শিখিনি এখনও। তাই আমার শিক্ষানবিশির কাজ আজও চলেছে।

সত্যবাবু যে একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে অকপট স্বীকারোক্তি করলেন তার তুলনা হয় না। একজন অভিনেতা শুধু অভিনয়ের গুণে বড় হলেই তাঁকে বড় বলা যায় না। তাঁকে অনেক বড় মনের মানুষ হতে হবে।

সত্যবাবুর সেই গুণটি আছে দেখে বড় ভাল লাগল।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নামক অভিনেতাটি বোধহয় চিরকালই সময়ের থেকে একটু এগিয়ে আছেন। সবদিক থেকেই। এই সিনেমা-থিয়েটারের কথাই ধরুন না। যখন তাঁর বয়েস কম ছিল তখনও দেখেছি উনি প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সিনেমায় একেবারে প্রথম দিককার দু-তিনটি ছাড়া বাকি সব সময়েই উনি ওঁর থেকে বেশি বয়সের ভূমিকায় কাজ করেছেন। আর থিয়েটারে তো প্রায় গোড়া থেকেই। ওঁর প্রথম নাটক মিনার্ভায় 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'। ওখানে হৃদের রোল্টা একটু কম বয়সের। পরের নাটক বিশ্বরূপায় 'জাগো'। সে নাটকটা আমার দেখা হয়নি। কাজেই কোন বয়সের রোল করেছিলেন বলতে পারব না। তবে চমকে গিয়েছিলাম ওঁকে ওঁর তৃতীয় নাটকে দেখে।

সত্যবাবুর তৃতীয় নাটক 'শেষ লগ্ন'। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল রঙমহল মঞ্চে। মনোজ বসুর 'উলু' বলে একটি গল্প অবলম্বনে 'শেষ লগ্ন' নাটকটি তৈরি হয়েছিল। নাটকটি ছিল বিয়োগান্ত। নাটকের বক্তব্য ছিল পণপ্রথা-বিরোধী। চমৎকার অভিনয়ের গুণে নাটকটি দারুণ জমে গিয়েছিল। 'শেষ লগ্ন'-র নায়িকা ছিলেন প্রণতি ঘোষ। পরে অভি ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে উনি প্রণতি ভট্টাচার্য হয়েছিলেন।

ওই নাটকে যখন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করতে আসেন তখন ওঁর বয়স বড়জোর আটাশ কি উনত্রিশ। কিন্তু উনি যে রোলটা করেছিলেন তার বয়স পঁচাত্তর। নায়িকার দাদু।

রঙমহলে সত্যবাবুকে নিয়ে আসেন বিশিষ্ট অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়। হরিধনবাবু ছিলেন রঙমহলের তৎকালীন মালিক হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু। সেই সুবাদে অভিনয় করা ছাড়াও হরিধনদার ওপর আরও কিছু দায়িত্ব থাকত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে হরিধনদা সত্যবাবুকে ডেকে এনেছিলেন রঙমহলে।

মিনার্ভায় 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' খুব বেশিদিন চলেনি। কাজেই সত্যবাবু হয়ে গিয়েছিলেন পুনর্মুর্ষিকো ভবঃ। অর্থাৎ সেই গতানুগতিক অফিস আর অ্যামেচার ক্লাব।

রঙমহলে 'শেষ লগ্ন' নাটকের পরিচালক ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পার্ট বন্টনের সময় বীরেনদা একটি অসমসাহসিক কাজ করলেন। নায়িকার দাদু পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক শিবনাথের চরিত্রটি দিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সবাই চমকে উঠলেন কথাটা শুনে। দু-একজন মুখ ফুটে বলেও ফেললেন : এত কম বয়েসের ছেলে কি ওই অত বুড়োর রোল পারবে?

বীরেনদা বললেন : খুব পারবে। আমি ওকে রেডিওতে তো কত বুড়োর রোল করিয়েছি।

নীতীশ মুখোপাধ্যায় তখন অভিনয় করতেন বন্ধুমহলে। তিনি বললেন : রেডিও আর স্টেজ কি এক জিনিস হল বীরেনদা। এখানে তো দর্শকরা চোখের সামনে আর্টিস্টকে দেখতে পাবে।

বীরেনদা বললেন : তোমরা দেখো না সত্যকে দিয়ে আমি কী ভেল্কিটা দেখাই। কীরে সত্য, পারবি না বুড়োর রোল করতে?

সত্যবাবু বললেন : আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে নিশ্চয় পারব।

বললেন তো, কিন্তু মনে মনে কিছুটা নার্ভাসও হয়ে পড়লেন। বুড়োর রোলে যদি ফেইল্ করেন

তাহলে বীরেনদা খুব অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন। যাঁরা এখন আপত্তি করছেন তাঁরা সবাই হাসাহাসি করবেন। মিনার্ভায় হৃদে চরিত্রটাতে বিশেষ কিছু করার ছিল না। এই প্রথম বড় স্টেজে একটা বড় সুযোগ পাচ্ছেন। সাকসেসফুল না হলে হয়তো তাঁর ভবিষ্যতটা অন্ধকার হয়ে যাবে। যেমন করে হোক তাঁকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।

কিন্তু পরীক্ষায় পাস করা কী এতই সোজা। পাঁচ-ছ নাইট নাটক চলবার পর শিবনাথের চরিত্রে সত্যবাবুর মনোনয়ন যাঁদের পছন্দ হয়নি, তাঁরা আবার সোচ্চার হয়ে উঠলেন। প্রতিবাদটা উঠেছিল সঙ্গত কারণেই। যতই ভাল অভিনয় করুন আর যতই চুলে সাদা রঙ করুন, সত্যবাবুর মধ্যে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধটিকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ছ'নাইট অভিনয়ের পর বীরেনদা একদিন সত্যবাবুকে ডেকে বললেন · সত্য, এর পরের শো থেকে তুমি অন্য রোল করো। শিবনাথের চরিত্রটাকে ছেড়ে দাও।

সত্যবাবু বললেন : কেন বীরেনদা, আমার অভিনয় কী আপনার ভাল লাগছে না? আমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করছি চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে।

বীরেনদা বললেন : আমার যে খুব খারাপ লাগছে তোমার অভিনয়, তা নয়। কিছু ডিফেক্ট আছে, তবে সেটা আর কয়েক নাইট পরে কেটে যেত। কিন্তু বোঝ তো, থিয়েটারে নানা রকমের গ্রুপিং থাকে। মালিকরা তো কাউকে চটাতে পারেন না। তাঁদের সবাইকে নিয়ে চলতে হয়। তাই বলছি তুমি শিবনাথটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও চরিত্র করো।

সত্যবাবু বললেন : এ চরিত্রটা হাতছাড়া হলে আমি একদম মরে যাব বীরেনদা। আমার সব আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাবে। কোনদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। কোনও থিয়েটার থেকে আমার আর ডাক আসবে না কোনদিন।

বীরেনদা বললেন : সবই তো বুঝতে পারছি। তবে তুমি এটাকে স্পোর্টিংলি নিচ্ছ না কেন। কোনও স্টুডেন্ট একবার যদি কোন কারণে ফেইল্ করে তাহলে কি আর সে কোনদিন পাস করতে পারে না? না সে চিরকালের মতো পড়াশোনা ছেড়ে দেয়? আমি বলছি তুমি শিবনাথের চরিত্রটা ছেড়ে দাও। পরের নাটকে তুমি যাতে তোমার বয়েস অনুযায়ী একটা ভাল রোল পাও, সেটা আমি দেখব। এতে তোমার ভালই হবে।

বীরেনদার কথা শুনে সত্যবাবু খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কী করবেন কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। একবার ভাবলেন এই মুহূর্তে রঙমহল থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে গ্রুপিং করছেন তাঁদের মুখের মতো জবাব দেওয়া হবে তাহলে।

পরমুহূর্তে ভাবলেন, তাতেই বা কী লাভ? থিয়েটারের সেই লোকগুলি তো চতুর্দিকে বলে বেড়াবে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করতে পারল না বলে তাকে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সত্যবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে বীরেনদা ভাবলেন, সত্য বোধহয় তাঁর দেওয়া প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। তাই বললেন : ওই কথাই রইল তা হলে। পরের শো থেকে তোমার রোলটা নীতীশকে দিয়ে করাচ্ছি। তোমাকে কোন্ রোল দিই একটু ভেবে দেখি।

কথাকটি বলে বীরেনদা গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সত্যবাবু তাঁকে আটকালেন। বললেন : : দাঁড়ান বীরেনদা, আপনার সঙ্গে আমার আর একটা কথা আছে।

বীরেনদা বললেন : বলো না কী বলবে!

সত্যবাবু বললেন : আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে পূরণ করতে হবে।

বীরেনদা সত্যবাবুর কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন : প্রার্থনা?

সত্যবাবু বললেন : হ্যাঁ বীরেনদা। আপনি আমাকে আর দুটো নাইট শিবনাথের চরিত্রে অভিনয় করতে দিন।

বীরেনদা একটু ম্লান হাসলেন। বললেন : তাতে কী অবস্থার কিছু হেরফের হবে?

সত্যবাবু বললেন : হবে বীরেনদা। আপনি শুধু আমায় এই সুযোগটুকু দিন। যদি সাকসেসফুল হতে

না পারি তাহলে চিরদিনের মতো অভিনয় করা ছেড়ে দেব।

বীরেনদা সত্যবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন সত্যবাবুর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। একটা ভয়ানক কিছু করে ফেলবার জন্যে সে যেন বদ্ধপরিকর। দু'মিনিট ভাবতে সময় নিলেন বীরেনদা। তারপর বললেন : বেশ, তোমাকে আর দু'নাইট শিবনাথ করার সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, ঠিক দুটি নাইট। তার থেকে একদিনও বেশি নয়।

সত্যবাবু বললেন : তাহলে যে আর একটি কাজ আপনাকে করে দিতে হবে বীরেনদা। মালিকদের বলে আমার একসেট পাকা দাড়ি করে দিন।

বীরেনদা বললেন : বুঝেছি। তুমি মেক-আপটা চেঞ্জ করতে চাও। সেটা অবশ্য একদিক থেকে মন্দ হবে না। পাকা দাড়ির আড়ালে তোমার বয়েসটা লুকিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু পাকা দাড়ি পরবার পর তোমার যে অন্য একটা দায়িত্ব এসে যাবে সেটার কথা কি ভেবেছ?

সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : অন্য দায়িত্ব? সেটা কী বীরেনদা?

বীরেনদা বললেন : মেক-আপে বয়েস যে পরিমাণ বাড়বে, তোমার অভিনয়ে, চলা-ফেরায়, কণ্ঠস্বরে সেই পরিমাণ বার্ধক্য আনতে হবে। না হলে সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে যাবে। সে দিকটা ভেবে দেখেছ তো?

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাবু বীরেনদার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন : আপনার আশীর্বাদ থাকলে ঠিক পারব বীরেনদা। আপনি আমায় শুধু এই শেষ ভিক্ষাটা দিন।

সত্যবাবুর এই নাটকীয় কাণ্ডকারখানা দেখে বীবেনদা একটু হেসে ফেললেন। ওঁর পিঠে হাত দিয়ে বললেন : ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি দেখছি ড্রেসারের কাছে খোঁজ নিয়ে তোমার মুখের মাপের কোনও বুড়ো দাড়ি আমাদের স্টকে আছে কি না। না থাকলে আবদুল বারিকে খবর পাঠাতে হবে যাতে কাল-পরশুর মধ্যে তোমার মুখের মাপের একটা দাড়ি তৈরি করে দেয়।

সত্যবাবু বললেন : তাহলে আমার আর একটা আবদার রাখতে হবে বীরেনদা?

বীরেনদা বললেন . আবার আবদার। আগেরটা ছিল প্রার্থনা, আর একেবারেটা আবদার। তা তোমার আবদারটা কী তাই শুনি।

সত্যবাবু বললেন : দাড়িটা আমি দিন দুয়েকের জন্যে বাড়ি নিয়ে যাব।

বীরেনদা বললেন : দাড়ি নিয়ে বাড়ি যাবে? কিন্তু কেন?

সত্যবাবু বললেন : আমি দাড়িটা পরে দুটো দিন আয়নার সামনে রিহার্সাল দিতে চাই।

বীরেনদা বললেন : সেটা তো ভাল কথা। তা তোমার বাড়িতে কেন, তুমি তো আমার বাড়িতে চলে আসতে পারো। আমি তোমায় দেখিয়ে-টেখিয়ে দিতাম।

তারপর নিজেই বললেন : এই দ্যাখো। আমাকে আর বাড়িতে পাবে কোথায় তুমি। সকালবেলা উঠে রেডিও স্টেশনে ছুটতে হয়। কখন যে ফিরি তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তুমি বরং বেস্পতিবার ঘণ্টাখানেক আগে স্টেজে চলে এসো। আমিও আসব। তুমি নিজে নিজে রিহার্সাল দিয়ে কতটা কী করেছ সেটা দেখব। দরকার মতো একটু আধটু চেঞ্জ করব। পারবে তো?

বীরেনদার কথা শুনতে শুনতে সত্যবাবুর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললেন: নিশ্চয় পারব বীরেনদা।

বীরেনদা বললেন : পারতেই হবে তোমাকে। তোমার অভিনয়ের যারা সমালোচনা করছে, তাদের মুখের মতো জবাব দিতে হবে। আমি কারও কথায় কান না দিয়ে তোমাকে শিবনাথের রোল দিয়েছি। তোমার হেরে যাওয়া মানে তো আমারই হেরে যাওয়া। কিন্তু হারা চলবে না। তোমাকে জিততেই হবে।

এই ঘটনার দিন কুড়ি পঁচিশ পরে রঙমহলে 'শেষ লগ্ন' নাটিকটির প্রেস শো হয়েছিল। সেই শো-তে আমিও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলাম। পরের সপ্তাহে কলকাতার সমস্ত পত্র-পত্রিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আর প্রণতি ঘোষের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছিল। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা শুরুই করা হয়েছিল ওঁদের অসাধারণ অভিনয়ের কথা উল্লেখ করে।

সত্যবাবুর সেই অভিনয় আজও আমার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে রেখেছে। একটি দৃশ্যে শিবনাথ

যেখানে তাঁর নাতনির বিয়ে ভেঙে যাবার খবর পেলেন, সেখানে সত্যবাবুর অভিনয় ছিল দেখার মতো। সেই মুহূর্তে একটি সংলাপও তাঁর মুখে ছিল না। বৃদ্ধ সোমনাথের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সে ঘাম ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। কপাল বেয়ে সারা মুখে সঞ্চারিত হচ্ছে। তারপর বেয়ে বেয়ে টপ টপ করে নিচে পড়ছে। দর্শক বিহ্বল হয়ে তা দেখছেন। দৃশ্যের সমাপ্তিতে সে কী হাততালি।

সত্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : ওভাবে ওই ঘাম জমানোর জন্যে আপনি কি প্রাণায়াম জাতীয় কোন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন? বাংলা রঙ্গমঞ্চে আমি আর কোনও অভিনেতাকে ওইভাবে ঘাম ঝরাতে দেখিনি।

সত্যবাবু বললেন : প্রাণায়াম-টানায়াম কিছুরই আশ্রয় নিইনি আমি। সেই মুহূর্তে নাটকের যা সিচুয়েশন সেটার মধ্যে গভীরভাবে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারলেই ওটা এসে যায়। এই দেখুন না, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি নাটকের সেই মুহূর্তেটার কথা ভাবছি আর আমার সারা মুখে ঘাম জমে যাচ্ছে।

বলতে বলতে হাত দিয়ে নিজের কপালের জমা ঘামটুকু মুছে নিলেন সত্যবাবু।

আমি আর একটি প্রশ্ন করলাম সত্যবাবুকে। বললাম : আপনি যে ওই চরিত্রের জন্যে মেক-আপটা চেঞ্জ করে নিলেন, এটা কি খুব জরুরি ছিল?

সত্যবাবু বললেন : নিশ্চয়। সেটা আগে বুঝিনি। বীরেনদাও বোঝেননি বোধহয়। উনি তো রেডিওতে আমাকে মেক-আপ ছাড়াই অভিনয় করতে দেখেছেন। তাই মেক-আপের ব্যাপারটা খেয়ালে আসেনি। কিন্তু ওই দাড়িটা পরবার পর আমার ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু বদলে গেল। আমি শিবনাথ হয়ে গেলাম। ওই ঘটনার পর থেকে আমি মেক-আপের ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিই।

একটু থেমে সত্যবাবু আবার বললেন : ওটা তো শুধু থিয়েটারের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দেখুন না, দুদিন দাড়ি না কামালে নিজেকে কী রকম অসুস্থ মনে হয়। একেবারে সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার।

তা ওই 'শেষ লগ্ন' নাটকে প্রণতিদির অভিনয়েরও খুব প্রশংসা হয়েছিল। প্রণতিদি তখন প্রণতি ঘোষ ছিলেন। পরে অভীদাকে বিয়ে করে প্রণতি ভট্টাচার্য হয়েছিলেন। কী পাওয়ারফুল অ্যাকট্রেস ছিলেন প্রণতিদি। 'শেষ লগ্ন' নাটকের শেষ দৃশ্যে তো তিনি দর্শকদের পাগল করে ছেড়েছিলেন। বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গলার মালাটা ছিঁড়ে ফেলে পাগলের মতো টলতে টলতে যখন উলুধ্বনি দিতেন, তখন এমন কোনও দর্শক ছিলেন না যাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠেনি। ওই দৃশ্যে প্রণতিদি একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে অভিনয় করতেন। আমরা যেদিন শো দেখেছিলাম সেদিন নাটক শেষ হবার পর প্রণতিদির সঙ্গে গ্রিনরুমে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শো অন্তত দশ মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রণতিদি ভাল করে কথা বলতে পারছিলেন না। এমন অ্যাবজর্বড হয়ে গিয়েছিলেন চরিত্রটার মধ্যে।

প্রণতিদি এরপরে আর কলকাতায় খুব বেশি নাটকে অভিনয় করেননি। কিছুদিন পরে অভীদাকে বিয়ে করে বম্বে চলে গেলেন। প্রণতিদি যদি কলকাতায় থাকতেন তাহলে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হতে পারতেন। তারপর তো এক সময় পৃথিবী ছেড়েই চলে গেলেন। অভীদাও চলে গেলেন এই সেদিন।

বম্বে যাবার পরও প্রণতিদি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তখন দেখা-টেখা হত। প্রণতিদি আর অভীদা একটা না দুটো বাংলা ছবি প্রযোজনাও করেছিলেন। তার মধ্যে একটা হল 'পাড়ি'। জরাসন্ধ রচিত এই বিখ্যাত কাহিনীতে ধর্মেন্দ্র আর দিলীপকুমার প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। দিলীপকুমার পরে আরও একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সেটি হল তপন সিংহের 'সাগিনা মাহাতো'। ওই ছবিতে ওঁর স্ত্রী সায়রা বানুও ছিলেন।

তা সেদিন 'শেষ লগ্ন' নাটক অভিনয়ের শেষে রঙমহলের গ্রিনরুমে আরও একটি ছোট নাটক অভিনীত হয়েছিল। কলকাতার নাট্য-সমালোচকরা যখন পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে ওই নাটকের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন বীরেনদা সত্যবাবুকে দেখিয়ে বলেছিলেন : আপনারা আমাকে

অভিনন্দন না জানিয়ে এই ছেলেটিকে অভিনন্দন জানান। ও একটা অসাধ্য সাধন করেছে। আমি আশীর্বাদ করছি ও একদিন বাংলা থিয়েটারের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হবে। আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে।

বীরেনদার কথাটা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। সুখের কথা, বীরেনদা তাঁর জীবদ্দশাতেই সত্যবাবুর জীবনের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় দেখে যেতে পেরেছিলেন।

সেই যে বয়স্ক মানুষের রোলে কাজ করা শুরু হল সত্যবাবুর, তা আজও অব্যাহত আছে। রঙমহলের পরের নাটক 'সাহেব বিবি গোলাম'-এ বিখ্যাত দার্শনিক চরিত্র ঘড়িবাবুর রোল করলেন। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে করলেন হাজারী ঠাকুর। ওই রোলটা করবার সময় একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন সত্যবাবু। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ধীরাজ ভট্টাচার্য অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ওই চরিত্রটি করেছিলেন এই রঙমহলেই। সেই রোলটা করা উচিত হবে কি না সেটাই ভাবছিলেন সত্যবাবু। কিন্তু তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিলেন স্বনামখ্যাত কমেডিয়ান ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুদা সত্যবাবুকে খুব ভালবাসতেন। নানা ব্যাপারে গাইডও করতেন। তিনি বললেন : সত্য, দোনামোনা করনের কোনও প্রয়োজন নাই। সাহস কইরা ঝাঁপাইয়া পড়ো। আরে ধীরাজদা হাজারী ঠাকুর করছিল তার মতন, আর তুমি করবা তোমার মতন। এতে এত চিন্তার কী আছে কও?

হ্যাঁ, সত্যবাবু হাজারী ঠাকুর করেছিলেন তাঁর নিজের মতো। ধীরাজদার অভিনয়ের মধ্যে ছিল খানিকটা কমেডির মশলা। কিন্তু সত্যবাবু চরিত্রটাকে করে নিলেন অত্যন্ত সিরিয়াস। ধীরাজদা দর্শক-তোষণের কথাটা মাথায় রেখেছিলেন। সত্যবাবু দর্শকের কথা মাথায় না রেখে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাথায় রেখেছিলেন। দুজনের অভিনয়ই দর্শকদের খুশি করতে পেরেছিল।

এতে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় প্রতিটি শোতেই তিনি আসতেন স্টার থিয়েটারে অভিনয় সেরে। বলতেন : চিয়ার আপ সত্য, চালায়ে যা। চমৎকার হইতাছে তর অভিনয়।

সবচেয়ে মজার কথা, ধীরাজদা আর সত্যবাবু দুজনের আমলেই ওই নাটকের পদ্ম ঝি-র চরিত্রটি করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। আর এই সেদিন দূরদর্শনেও ওই চরিত্রটি সাবিত্রীকেই করতে হল। এটা একটা বিস্ময়ের কথা বটে। পদ্ম ঝি করবার জন্যে আর কোনও অভিনেত্রীই আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। সাবুকে নিয়ে যখন লিখব তখন বিস্তারিতভাবে এসব জানাব।

রঙমহল ছাড়ার পর সত্যবাবুকে মিনার্ভায় আর একটি নাটক করতে হয়েছিল। 'এরাও মানুষ'। সত্যবাবুরই লেখা নাটক। এক বিকলাঙ্গ যুবকের চরিত্র। এটা অবশ্যই কমবয়েসী চরিত্র। কিন্তু ওই চরিত্রের মধ্যে যৌবনোচিত কোন রকম রোম্যান্টিসিজমের ছিটেফোঁটাও ছিল না। অত্যন্ত অসহায়, দুঃখী, অবহেলিত একটি মানুষ। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই নাটকের কাহিনী নিয়ে তার আগে একটি ছবিও হয়ে গেছে। ছবিটির নাম 'এই সত্যি'। সেখানেও ওই বিকলাঙ্গ যুবকের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ই অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির পরিচালক ছিলেন সুরেশ দাস। ছবিটি কতজন দর্শক দেখেছিলেন আমি জানি না। রূপবাণী সিনেমায় মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু আমার মনে ওই ছবিটা একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। চমৎকার পরিচালনা। চমৎকার সত্যবাবুর অভিনয়। সবচেয়ে চমৎকার ছিল ওই ছবির শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা। সমাজ সংসার সকলের অবহেলিত ওই বিকলাঙ্গ মানুষটি নিচের তলায় একটি ঘরে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার পাশে আছে কেবলমাত্র তার প্রিয় কুকুরটি। ওই মৃত্যুদৃশ্যে নেপথ্যে করুণ সুরে কোনও বেহালা বাজতে শোনা যায়নি। তার বদলে শোনা গেছে কুকুরটির আর্ত চিৎকার। তার মনিব পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সেই মহাযাত্রার সংবাদ তারস্বরে ঊর্ধ্বমুখে ঘোষণা করে চলেছে কোন মানুষ নয়, একটি কুকুর। যে মানুষটি চলে যাচ্ছে তার সম্মান এই পৃথিবীতে ছিল ওই কুকুরেরই মতো। তার এতটুকু বেশি নয়।

এইরকম এক-একটি দৃশ্যের জন্যে ওই ছবি বার বার দেখতে প্রস্তুত আছি আমি। কিন্তু সে ছবিটি আর কোনদিন দেখতে পাইনি। এখন হয়তো ওই ছবির প্রিন্টটাও আর নেই। থাকলে সবাইকে ডেকে ডেকে দেখতে বলতাম ছবিটা।

মিনার্ভায় 'এরাও মানুষ' বন্ধ হয়ে যাবার পর সত্যবাবু বেশ কিছুদিন ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের নিজেদের

গ্রুপ কল্পতরুকে নিয়ে। এমন সময় হঠাৎ একদিন ওঁর গড়পারের বাড়িতে এসে হাজির হলেন রঙমহলের দুই মালিক হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আর নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যবাবু তো অবাক। ওঁর মতো একজন অভিনেতার বাড়িতে স্বয়ং মালিকরা ছুটে এসেছেন। যে স্টেজ থেকে একদিন তিনি প্রায় বিতাড়িত হচ্ছিলেন, সেই স্টেজের মালিকরা? এ যে ভাবাই যায় না।

কী ব্যাপার?

সত্যবাবুকে ঋণশোধের দায়িত্ব নিতে হবে।

কিসের ঋণশোধ?

বাজারে রঙমহলের এখন যা দেনা তার পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মতো। এমন একখানা নাটক করে দিতে হবে, যাতে সেই ঋণ শোধ করা যায়।

ব্যাপারটা শুনে সত্যবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এও কী সম্ভব?

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি দু-একটা জায়গায় সময়ের গণ্ডগোল করে ফেলেছি। অনেকদিনের কথা তো। তাই কিছু কিছু স্মৃতিবিভ্রম ঘটে যাচ্ছে। এই বিভ্রাটের কারণে রচনার অঙ্গহানি যে ঘটছে, সেটা স্বীকার করি। কিন্তু এতদ্দ্বারা রসহানি ঘটেছে বলে আমি মনে করি না।

যেমন এর আগে আমি লিখেছি, মিনার্ভায় 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকে হৃদয় চরিত্র সত্যবাবুর অভিনয় দেখে হরিধন মুখোপাধ্যায় ওঁকে ডেকে এনেছিলেন রঙমহলে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। হরিধনবাবু 'এরাও মানুষ' নাটকে ওঁর অভিনয় দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে ওই নাটকের আয়ু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রঙমহলের অফার দিয়েছিলেন।

ওই 'এরাও মানুষ' নাটকটি সত্যবাবুর জীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট। ওই নাটক করার সময় ওঁর জীবনে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। একটি প্রতিবন্ধী চরিত্রে ওঁর ওই নিখুঁত অভিনয় দেখে অনেকেই তো ভেবে নিয়েছিলেন যে উনি একজন সত্যিকারের প্রতিবন্ধী। চারজন ডাক্তারের একটি মেডিক্যাল বোর্ড বসেছিল ওঁকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। তাঁরা ভেবেছিলেন, ওঁর শরীরে এমন কোনও ত্রুটি আছে যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উনি প্রতিবন্ধী সেজে অভিনয় করতে পারেন। কিন্তু কোনও ত্রুটিই তাঁরা খুঁজে পাননি। উল্টে তাঁরা রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটি ঘটেছিল তার জন্য সত্যবাবু আজও অশ্রুসংবরণ করতে পারেন না। জীবনে কোনওদিন তিনি সেই করুণ মুহূর্তটির কথা ভুলতে পারবেন না।

এটা ঘটেছিল মিনার্ভা থিয়েটারে 'এরাও মানুষ' নাটকের পঞ্চাশতম রজনীর স্মারক উৎসবের রাত্রে। শো শেষ হবার পর অনেক গুণীজ্ঞানী মানুষ মিনার্ভার গ্রিনরুমে এসে সত্যবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। সত্যবাবু মেক-আপ তোলার তোড়জোড় করছেন। এমন সময় একজন সত্যিকারের প্রতিবন্ধী যুবক এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। তার দু চোখের দৃষ্টি থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে।

সত্যবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি চিৎকার করে উঠল : আপনি এই নাটক কেন করছেন। প্রতিবন্ধীদের অপমান করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে। আমাদের জন্যে মানুষের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে হবে না আপনকে। কে চায় আপনাদের করুণা! যদি সাহস থাকে তবে যাদের জন্যে আমরা প্রতিবন্ধী হয়েছি তাদের মুখোশ খুলে দিন। আমরা তো নিজেদের দোষে প্রতিবন্ধী হইনি। যে সব নিষ্ঠুর বাপ মায়ের দল তাদের শিশু সন্তানকে সময়মতো ওধুষ খাওয়ায়নি, তাদের ইঞ্জেকশন দেয়নি, তাদের কথা বলুন। গর্জে উঠুন তাদের বিরুদ্ধে। দুটো পয়সার জন্যে আমাদের ভাঙিয়ে এই সার্কাস আর করবেন না। দোহাই আপনাকে।

কথাগুলো বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেলল যুবকটি। তারপর তার প্রতিবন্ধী শরীরটাকে নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। আর চিত্রার্পিতের মতো বসে রইলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যবাবু বললেন : সেই থেকে, বুঝলেন রবিবাবু, রাস্তায়-ঘাটে, ট্রামে-বাসে কোনও প্রতিবন্ধী যুবককে দেখতে পেলে আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই তরুণটিকে খুঁজে বেড়াই। কিন্তু কোথাও দেখতে পাইনি। তবে সেই থেকে প্রতিবন্ধীদের সাহায্যের জন্যে কোনও অনুষ্ঠানে আমার যদি ডাক

পড়ে তবে সেখানে ছুটে যাই। সাধ্যমতো সহযোগিতা করি।

বলতে বলতে আমার অলক্ষে চোখ দুটো একটু মুছে নিলেন সত্যবাবু।

এই 'এরাও মানুষ' নাটকটি সত্যবাবুর আর একটি সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছিল। পরিচালক নরেশ মিত্র এই নাটকটি দেখেই তাঁর 'উল্কা' ছবির বিকলাঙ্গ নায়ক অরুণাংশুর চরিত্রে সত্যবাবুকে সিলেক্ট করেছিলেন। রঙমহল মঞ্চে যখন 'উল্কা' নাটকটি অভিনীত হত তখন ওই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন চিত্রাভিনেতা দীপক মুখার্জি। ঠিক মনে নেই, বোধহয় পাঁচশো রাত্রির ওপর চলেছিল ওই নাটক। দীপকবাবুর খুব আশা ছিল নরেশদা 'উল্কা' ছবিতে তাঁকেই নেবেন। কিন্তু নরেশদা মিনার্ভায় সত্যবাবুর অভিনয় দেখে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকেই নিয়েছিলেন। সত্যবাবুও এই নির্বাচনের মর্যাদা রেখেছিলেন। খবরের কাগজে তাঁর নামে খুব প্রশংসা বেরিয়েছিল ওই ছবির কাজ দেখে।

এবারে সেই পাঁচ লাখ টাকার ঘটনাটা বলি। ওই পরিমাণ দেনা ঘাড়ে নিয়ে রঙমহলের দুই মালিক হেমন্তবাবু আর নলিনবাবু যখন সত্যবাবুর কাছে নতুন নাটকের প্রোপোজাল দিলেন তখন সত্যবাবু খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন সত্যবাবু কোনও স্টেজে নেই। নিজেদের গ্রুপের জন্যে একটা নাটক লিখেছেন। সেটার নাম 'নহবত'। নাটকের নায়িকার চবিত্রটি খুব স্ট্রং। সেইজন্যে মনোমত একজন নায়িকা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। চার-পাঁচটি মেয়েকে ইন্টারভিউ করেছেন। তাদের অভিনয়ের ক্ষমতা আছে। কিন্তু পুরোপুরি স্যাটিসফায়েড হতে পারছেন না সত্যবাবু।

ঠিক এই সময়েই হেমন্তবাবু আর নলিনবাবু সত্যবাবুর কাছে এলেন নাটক করার প্রস্তাব নিয়ে। সত্যবাবু রাজি হলেন নাটক করতে। কিন্তু মাথার মধ্যে হিরোইনের প্রব্লেমটা থেকেই গেল।

হঠাৎ আরতি ভট্টাচার্য নামে একটি মেয়ে সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এল। আরতি বললেন : আপনি তো একদিন বলেছিলেন কলকাতায় এলে যোগাযোগ করতে। তা আমি এখন কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছি। সেইজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

আরতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে সত্যবাবুর এর আগে দেখা হয়েছিল জামশেদপুরে। সত্যবাবুরা সেবার জামশেদপুরে গিয়েছিলেন তাঁদের গ্রুপের নাটক করতে। অভিনয়ের শেষে একটি মেয়ে দেখা করতে এল সত্যবাবুর সঙ্গে। বললে : আমি কী আপনাদের নাটকে অভিনয় করতে পারি না?

মেয়েটির চলাফেরা স্মার্ট। কথাবার্তা আরও স্মার্ট। সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কী নাম তোমার?

মেয়েটি বলল : আরতি। আরতি ভট্টাচার্য।

সত্যবাবু বললেন : তুমি কী পড়াশোনা করো?

আরতি বললে : আমি জামশেদপুর গার্লস কলেজে ফার্স্টক্লাসে পড়ি।

সত্যবাবু বললেন : তা তুমি থাকবে জামশেদপুরে আর আমরা থাকব কলকাতায়। কী করে অভিনয় করবে?

আরতি বললে : আমি তো পাস করার পর আর এখানে থাকব না। কলকাতার কলেজে পড়ব। তখন কী আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব?

সত্যবাবু বললেন : তা করতে পারো। কিন্তু তুমি যে অভিনয় করতে চাও তাতে তোমাদের বাড়ির মত আছে তো?

আরতি বললে : নিশ্চয়ই। আমার গার্জেনরা এ ব্যাপারে খুব লিবারেল।

সত্যবাবু বললেন : তা বেশ। কলকাতা এলে দেখা কোরো। তোমাকে পরখ করে দেখব কতটা কী পারো-টারো।

এই বলে আরতিকে নিজের ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন সত্যবাবু। ভেবেছিলেন মফস্বল শহরে কত ছেলেমেয়েই তো এরকম ঠিকানা নিয়ে থাকে। এটাও সেইরকমই একটা কেস।

কিন্তু সেদিন আরতিকে এভাবে সত্যিই হাজির হতে দেখে চমকে গেলেন সত্যবাবু। হাসতে হাসতে বললেন : তুমি সত্যিই এলে তাহলে! থিয়েটারের ভূতটা এখনও মাথা থেকে নামেনি দেখছি।

সত্যবাবু 'নহবত' নাটকের নায়িকার চরিত্রটি খানিকটা পড়িয়ে দেখলেন আরতিকে। মন্দ লাগল না। একটু খাটতে পারলে এ মেয়েটার ভবিষ্যৎ আছে।

তা সত্যিই ভবিষ্যৎ ছিল। রঙমহলে ওই নহবত নাটক করার পরই পট পট করে বেশ কয়েকটা ছবির কাজ পেয়ে গেল আরতি ভট্টাচার্য।

'নহবত' নাটক আমি রঙমহলেও দেখেছি, আবার পরবর্তীকালে তপন থিয়েটারেও দেখেছি। তপন থিয়েটারে যখন হল তখন আমি 'দেশ' পত্রিকাতে ওই নাটকের সমালোচনাও করেছি। তবে তুলনামূলকভাবে রঙমহলে দেখার সময় যে চমকটা পেয়েছিলাম, তপন থিয়েটারে সেটা পাইনি। নাটকের টেকনিকেও কিছু অদলবদল করা হয়েছিল। রঙমহলের সময় ফিল্মের কিছু কিছু টেকনিক ওই নাটকে প্রযুক্ত হতে দেখেছিলাম। তপন থিয়েটারে সেটা ছিল না। সেখানে অভিনয় কুশলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। ওখানে নায়িকা করেছিল রত্না ঘোষাল। সত্যবাবুর সঙ্গে সে সমান তালে অভিনয় করে গিয়েছিল। এটাও সত্যবাবুর কৃতিত্ব। একজন মাঝারি মাপের অভিনেত্রীকে উনি বড় করে তুলেছিলেন। তাছাড়া তরুণকুমার ছিলেন, বিকাশ রায় ছিলেন। একটা ছোট ভূমিকায় সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' ছবির নায়ক প্রদীপ মুখার্জি ছিলেন। সব মিলিয়ে একটা জমজমাট টিমওয়ার্ক।

নহবত নাটকের নাম বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রঙমহলে তো অনেকদিন চলেইছিল। রঙমহলের পাঁচ লক্ষ টাকার দেনা শোধ হয়ে গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে তপন থিয়েটারে চলেছিল একটানা যোলোশো রাত্রি। কল শো ইত্যাদি ধরলে সংখ্যাটা তিন হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এটা একটা রেকর্ড।

আসলে 'নহবত' নাটক হিসেবে ছিল অসাধারণ। নাট্যশাস্ত্রের নয়টি রসের সব কটিই উপস্থিত ছিল এই নাটকে। একটা দারুণ এক্সপেরিমেন্টও করেছিলেন সত্যবাবু। বর্মার পিসেমশাই বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে তিনি আগাগোড়াই নেপথ্যে রেখে গেলেন। অথচ পুরো নাটকেই ওই চরিত্রটির ছায়া বিস্তৃত।

সত্যবাবু বললেন : 'নহবত' নাটকের কাহিনী নিয়ে একবার একটা হিন্দি ছবি করার কথা হয়েছিল বম্বে থেকে। তখন কিন্তু ওই বর্মার পিসেমশাইয়ের চরিত্রটাকে সামনে আনতেই হত। কারণ ওই চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং অশোককুমার।

আমি বললাম : তা হলে কিন্তু মজাটা মাটি হত।

সত্যবাবু বললেন : তা হত। তবে সে ক্ষেত্রেও আমি একটা নতুন মজার কথা ভেবে রেখেছিলাম। তা ছবিটাই তো আর হল না।

সত্যবাবুর আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক 'শেষ থেকে শুরু'। ওঁদের গ্রুপের নাম তখন ছিল 'ইংগিত'। এই নাটক ওঁরাই অভিনয় করতেন। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওঁদের এই নাটক দেখতে এসেছিলেন। নাটক দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ইংরেজিতে একটা চিঠি দিয়েছিলেন সত্যবাবুকে। 'শেষ থেকে শুরু' নাটকটি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন সত্যবাবু কৃতজ্ঞতা সহকারে সত্যজিৎবাবুর ওই প্রশংসাবাণীর বঙ্গানুবাদ করে বইটিতে সংযুক্ত করেছেন। 'শেষ থেকে শুরু' ছবিও হয়েছিল। প্রধান চরিত্রে ছিলেন সত্যবাবু। এতে কিশোরকুমারের সেই বিখ্যাত গানটি ছিল 'বল হরি হরিবোল'। সুর দিয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষ।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকের জীবন এতটাই বিস্তৃত যে এই স্মৃতিচারণার সিংহভাগ জুড়ে কেবল নাটকের কথাই থাকছে। সেখানে নাটকের পিছনে আবার অন্য নাটক। তুলনায় সত্যবাবুর চলচ্চিত্রের জীবন অনেকটা পিছনে। তবু নয় নয় করেও আজ পর্যন্ত আড়াইশোর ওপর ছবিতে অভিনয় করা হয়ে গেছে তাঁর। তারও বেশ কয়েকটিতে আবার প্রধান চরিত্রে।

কিন্তু সিনেমার কথা এখন থাক। আগে নাটকের পাটটাই চুকিয়ে নিই।

রঙমহলে প্রথম পর্বে যেসব নাটকে সত্যবাবু অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে শেষ লগ্ন, সাহেব বিবি গোলাম, আদর্শ হিন্দু হোটেল নাটকের কথা তো আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে সেমসাইড, স্বীকৃতি, নাম বিভ্রাট এবং কবি নাটকের নাম। এ ছাড়াও দু একটা নাটক থাকতে পারে। সেগুলির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে সব নাটকগুলিতেই সত্যবাবুর অভিনয় ছিল দেখার মতো। প্রত্যেকটাতেই আলাদা আলাদা ধরনের অ্যাকটিং।

এরপর সত্যবাবু চলে যান বিশ্বরূপায় 'জাগো' নাটকে অভিনয় করতে। এই নাটক প্রসঙ্গে এর আগে

আমি বোধহয় সময়ের হেরফের ঘটিয়েছিলাম। এখানে সেটা সংশোধন করে নিলাম।

'জাগো'র পর পুনরায় রঙমহলে। নাটকের নাম 'নহবত'। তার কথা বিস্তারিত ভাবেই বলেছি। রঙমহলে নহবত বাজানো শেষ করে সত্যবাবু আবার ফিরে গেলেন বিশ্বরূপায়।

বিশ্বরূপার মালিক ছিলেন দুই ভাই দক্ষিণেশ্বর সরকার এবং রাসবিহারী সরকার। এঁরা পর্যায়ক্রমে এক একটি নাটক এক একজন প্রযোজনা করতেন। নাটক এবং প্রযোজক বদলের সঙ্গে আর্টিস্টরাও বদলে যেত। কিন্তু সত্যবাবু দুই ভাইয়েরই কুশীলব তালিকায় থাকতেন।

বিশ্বরূপায় সত্যবাবুর এই পর্যায়ের প্রথম নাটক শংকরের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে 'চৌরঙ্গী'। পরিচালক এবং নাট্যরূপদাতা ছিলেন রাসবিহরী সরকার। এই নাটকে বিকাশ রায় ছিলেন, মঞ্জু দে ছিলেন। সত্যবাবু করেছিলেন ন্যাটাহরির চরিত্র।

বিশ্বরূপায় অভিনয় হত মাইক্রোফোনে। তার একটি রিসিভার থাকত রাসবিহারীবাবুর ঘরে। তিনি ওইখানে বসে প্রতিদিন আদ্যোপান্ত নাটক শুনতেন এবং শিল্পীদের দোষত্রুটি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতেন।

একদিন সত্যবাবুকে ডেকে রাসবিহারীবাবু বললেন : সত্য 'চৌরঙ্গী'র নাট্যরূপ আমার দেওয়া না তোমার দেওয়া?

সত্যবাবু বললেন : নিশ্চয় আপনার। পোস্টারে, আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে সে কথা বড় বড় করে লেখা থাকে।

রাসবিহারীবাবু বললেন : তাহলে তুমি অভিনয় করার সময় এক্সট্রা ডায়লগ যোগ করো কেন?

সত্যবাবু বললেন : তাই নাকি! সত্যি বলছি আমার কিছু খেয়াল নেই। আমি যখন স্টেজের ওপর থাকি তখন কী বলি আর কী করি তার কোন হুঁশ থাকে না। তা আপনি দয়া করে প্রম্পটারকে বলুন না, আমি কী কী এক্সট্রা ডায়লগ যোগ করি সেগুলো লিখে দিতে। তাহলে নিজের ভুলটা সংশোধন করে নিতে পারি।

রাসবিহারীবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পটারকে ডেকে সেই নির্দেশ দিলেন। প্রম্পটারও সঙ্গে সঙ্গে দু কানে হাত ঠেকিয়ে বললেন : আমাকে মাফ করবেন। ওটা আমি পারব না ছোটবাবু। সত্যবাবু কোনদিন যে কী বলেন তার হদিশ আমি নিজেই পাই না। তো কী করে নোট করব বলুন। তবে যেটা বলেন সেটা নাটকের ভেতরেই থাকে। তার বাইরের কিছু হলে যে বই এত লোকের পড়া তাতে দর্শকরা তো চ্যাঁচামেচি ফেলে দিত। সেটা কোনদিন হয়নি।

রাসবিহারীবাবু বললেন : ঠিক আছে। এর পরের দিনের শোতে এক্সট্রা ডায়লগগুলো আমিই নোট ডাউন করব। শো-এর পর তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে যেও সত্য।

পরের দিন শো শেষ হতে সত্যবাবু এলেন রাসবিহারীবাবুর ঘরে। বললেন : দেখুন ছোড়দা, আজ কিন্তু আমি একটাও এক্সট্রা ডায়লগ বলিনি। আপনার নাটকের ডায়লগই বলেছি।

রাসবিহারীবাবু বললেন : আজও প্রচুর এক্সট্রা ডায়লগ দিয়েছ। শংকর নয়, স্যাটা বোস নয়, চৌরঙ্গী নাটকের হিরো করে দিয়েছ ন্যাটাহরিকে। লোকে যে তোমার পার্ট দেখে হাততালি দিয়েছে সেটাও মাইকে ধরা পড়েছে।

সত্যবাবু লজ্জিত মুখে বললেন : কী করি বলুন তো ছোড়দা? আসলে আমি একটু আধটু নাটক লিখি তো। চৌরঙ্গী বইটাও আমার বার দশেক পড়া। কাজেই প্লে করতে করতে দুম করে মনে হয় এই সিচুয়েশনে এমন একটা ডায়লগ থাকলে ভাল হত। সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আমি কী নাটকের বিষয়বস্তুর বাইরে বেরিয়ে গেছি কখনও?

রাসবিহারীবাবু বললেন : তা অবশ্য যাওনি। ঠিক আছে, যেমন করছ করে যাও। তবে আমি যে নাট্যকার এবং পরিচালক সে কথাটা একটু মাথার মধ্যে রেখো।

এই রাসবিহারী সরকার হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন বিশিষ্ট এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। নাট্যশালার উন্নতিকল্পে উনি বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি সেখানে একত্র করেছেন। যাত্রা উৎসব করেছেন। তাঁর নাটকের প্রয়োজনে তৃপ্তি মিত্র, মঞ্জু দে, বিকাশ

রায়, সুপ্রিয়া দেবী প্রমুখকে যেমন এনেছেন, তেমনি নৃত্যপটিয়সী শেফালিকেও তিনি এনেছেন। লোকস্তুতি কিংবা লোকনিন্দা কোন কিছুরই তিনি তোয়াক্কা করেননি। এছাড়া তাঁর সব নাটকেই পাশে রেখেছেন বিখ্যাত আলোকশিল্পকার তাপস সেনকে।

একবার কথায় কথায় তাপসবাবুর কাছে রাসবিহারীবাবুকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। তাপসবাবু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলেছিলেন : না না রবিবাবু, রাসবিহারীবাবুকে ওভাবে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। ওঁর মধ্যে ফাইনার সেন্স এবং ক্রিয়েটিভিটি প্রচুর। আর অসম্ভব ডেয়ারিং।

এই সেদিন সত্যবাবুও রাসবিহারী সরকার সম্পর্কে তাপসবাবুর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করলেন।

তপন থিয়েটারে নিজেদের গ্রুপ নিয়ে কমার্শিয়াল থিয়েটার করবার জন্যে সত্যবাবু আর তরুণকুমার যেদিন রাসবিহারীবাবুর কাছে বিদায় চাইলেন, সেদিন রাসবিহারীবাবু ওঁদের হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি আপনাদের থিয়েটার দাঁড়িয়ে যাক। কিন্তু যদি কোনদিন কোনও অসুবিধায় পড়েন তাহলে বিশ্বরূপার দরজা আপনাদের জন্যে চিরকাল খোলা থাকবে।

এমন একটি মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যবাবুদের খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু উপায় তো নেই। ওঁরা তখন নতুন একটা থিয়েটার নিজেদের হাতে পেয়েছেন, যা যে কোনও গ্রুপের কাছেই অকল্পনীয় সৌভাগ্য।

তপন থিয়েটারে সত্যবাবুরা খুবই সাফল্যের সঙ্গে তিনটি নাটক করেছিলেন। নহবত, নাগপাশ এবং কাকের বাসা। কল্পতরু গ্রুপ নিয়ে সত্যবাবুরা আমেরিকাতেও গেছেন। দীর্ঘ তিন মাস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সবকটি বিখ্যাত শহরে নাটক করেছেন। ওখানে করতেন নহবত, এরাও মানুষ এবং শেষ থেকে শুরু। প্রথম দুটি নাটক তো ওদেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু এরাও মানুষ নাটকের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বজনীন। একটি বিকলাঙ্গ মানুষের করুণ কাহিনীর নাটক দেখে সাহেবরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়েই তো এখন প্রতিবন্ধী মানুষদের কল্যাণের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সেই কারণেই এই নাটকের জনপ্রিয়তা আমেরিকাতেও।

এরপর দীর্ঘ ছটি বছর সত্যবাবু যাত্রাজগতের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। শুরু হয়েছিল নট্ট কোম্পানি থেকে। ওখানে ওঁর প্রথম অভিনয় সত্যপ্রকাশ দত্তের লেখা বাঁচার ঠিকানা যাত্রাপালায়। তারপর থেকে নিজেই পালা লিখছেন। ডিরেকশান দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে অভিনয় করছেন। এ বছর উনি আছেন মোহনবাগান অপেরায়। এবারের পালার নাম মাকে প্রণাম বাবাকে সেলাম। নায়িকার রোল করছেন শ্রীলা মজুমদার। সঙ্গে আছেন চিরসঙ্গী তরুণকুমার। এবারের পালাটা আমি শুনেছি। বিষয়বস্তু জাতপাতের ওপর। কিংবা তারও উর্ধ্বে। শুনে তো মনে হয়েছে দারুণ জমে যাবে।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৫ সালে গড়পারের এই পৈতৃক বাড়িতেই। বাবার নাম স্বর্গত বনমালী বন্দোপাধ্যায়। বনমালীবাবু কাজ করতেন বিখ্যাত সদাগরী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জিতে। কলেজে যখন পড়ছেন তখনই সত্যবাবুর বাবা মারা যান। ঠিক ওই সময়েই চাকরি পেয়ে যান বার্ড কোম্পানিতে তাদের টিটাগড় পেপার মিলে। বাবার শ্রাদ্ধের পর ওই ন্যাড়া মাথা নিয়েই প্রথম চাকরিতে জয়েন করেছিলেন। তার পরের ইতিহাস তো আগেই বলেছি।

সত্যবাবুর বসার ঘরে থরে থরে পুরস্কার সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে সার্টিফিকেট ঝোলানো। তার মধ্যে দুটি পুরস্কার আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে। ১৯৮৭ সালে মাইকেল মধুসূদন অ্যাকাডেমির কাছ থেকে পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন অ্যাওয়ার্ড। আর ১৯৮৮ সালে বাংলা নাটকের গৌরবময় ধারাবাহিকতায় সত্যবাবুর অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তাঁকে সম্মানিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার দিয়ে। প্রশংসাপত্রে সই করেছেন সভাপতি হিসেবে প্রয়াত নাট্যকার মন্মথ রায় এবং তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এইসব সম্মান উপযুক্ত পাত্রেই ন্যস্ত হয়েছে।

এবারে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র জীবন প্রসঙ্গে আসি। আগেই বলেছি প্রায় আড়াইশর ওপর ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।

সত্যবাবুর প্রথম ছবি পরিচালক হেমেন গুপ্তর 'ভুলি নাই'। ছোট একটি ডাক্তারের ভূমিকা। মাত্র একদিনের কাজ। একদিনই বা বলি কেন, এক বেলার কাজ। হেমেনবাবুর সঙ্গে সত্যবাবুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সিনেমা, থিয়েটার আর রেডিওর বিখ্যাত অভিনেতা প্রয়াত বীরেশ্বর সেন। বীরুদার ছিল মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর। খুব দাপটে অভিনয় করতেন। 'মানদণ্ড' ছবিতে ওঁর অভিনয় দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। বিমল রায়ের 'অঞ্জনগড়' ছবিতে রাজার চরিত্রে ওঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতেও খুব ভাল কাজ করেছেন। সেই যিনি প্রবীণ অভিনেতা হিসেবে উত্তমকুমারকে দাবড়ে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন।

বীরুদা সত্যবাবুকে ভালবেসে ফেলেছিলেন ওঁর রেডিওর অভিনয় দেখে। উনিই জোর করে হেমেন গুপ্তর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। হেমেনবাবু সত্যবাবুকে বলেছিলেন, কাল একটা স্টেথোস্কোপ জোগাড় করে নিয়ে চলে এসো। একদিনের কাজ আছে তোমার।

সেদিন সারাদিন ঘোরাঘুরি করে এক জুনিয়র ডাক্তার বন্ধুর স্টেথো যোগাড় করেছিলেন সত্যবাবু। পরের দিন সকাল আটটার মধ্যেই হাজির হয়েছিলেন স্টুডিওতে। সকাল ন'টা থেকে ডাক্তারের পোশাক পরে মেক-আপ নিয়ে বসেছিলেন। শুটিং এর ডাক পড়েছিল বিকেল পাঁচটার সময়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। টাকা পয়সা কিছু পাননি।

প্রথমদিন শুটিং-এর দুটি ঘটনা সত্যবাবুর দারুণ ভাবে মনে আছে। এটি প্রথম ঘটনা। মনিটারের সময় ডাক্তার হিসেবে দেখলেন রোগীর বিছানার ওপর আলো পড়েছে। উনি মাথা নিচু করে নিজের মুখের ওপর আলোটা নিতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু ধমক দিয়ে হেমেনবাবু বলেছিলেন : এটা কী থিয়েটার যে তুমি মুখে আলো নিতে যাচ্ছ। তুমি যেভাবে বসে আছ সেভাবেই থাকবে। এটা সিনেমা। বুঝলে?

সত্যবাবু সেদিনই বুঝেছিলেন সিনেমার রাজ্যের সব আলোই কৃত্রিম আলো। এখানে সবাই অন্ধকারের পেছনেই দৌড়ায়। শেষ পর্যন্ত কেউ আলো পায়, আর কেউ অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

অন্য ঘটনাটি মানবিক কারণেই মনে আছে। সেদিন সকাল আটটায় স্টুডিও গিয়েছিলেন দু পিস পাউরুটি খেয়ে। সারাদিনে কেউ আর তাকে খেতে ডাকল না। বেলা তিনটে নাগাদ রাধামোহন ভট্টাচার্য সত্যবাবুর শুকনো মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি নতুন এসেছ?

সত্যবাবু এর আগে রাধামোহনবাবুর উদয়ের পথে ছবি দেখেছিলেন। সেই মুগ্ধতা তাঁর মধ্যে ছিল। ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন : আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাধামোহনবাবু বললেন : কী করো?

সত্যবাবু উত্তর দিলেন : কলেজে পড়ি।

রাধামোহনবাবু বললেন : তুমি লাঞ্চ খেয়েছ?

সত্যবাবু কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন।

রাধামোহনবাবু প্রোডাকশন ম্যানেজারকে ডেকে ধমকে উঠলেন : তোমরা কী ভেবেছ কী? ছোট আর্টিস্ট বলে কি তাদের মান সম্মান নেই? খিদে তেষ্টাও নেই? যাও এই ছেলেটিকে খাইয়ে নিয়ে এসো।

রাধামোহনবাবুর কথায় সেদিন সত্যবাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সত্যবাবুর পরবর্তী ছবি সত্যেন বসুর 'বরযাত্রী'। কে. গুপ্তর ভূমিকা। কমেডি রোল। বেশ সুনাম করলেন। সেই সুনাম চতুর্গুণ হল পরবর্তী ছবি সুধীর মুখার্জির 'পাশের বাড়ি'তে। এরপর যত অফার আসে সব হাসির ছবির। শ্বশুরবাড়ি, সাবধান, লেডিজ সিট ইত্যাদি ইত্যাদি। সিরিয়াস রোলে প্রথম ব্রেক পেলেন ওঁরই লেখা কাহিনী এরাও মানুষ নিয়ে সুরেশ দাসের এই সত্যি ছবিতে। এরপর থেকে সিরিয়াস রোল পেতে থাকেন। পরে যে কমেডি রোল একদম করেননি তা নয়। তপন সিংহের টনসিল, সাধন সরকারের ফুলু ঠাকুরমা, অজিত গাঙ্গুলির জননী ইত্যাদি। শেষোক্ত ছবিতে জয়া বচ্চন ছিলেন নায়িকা। সত্যবাবু ওঁর দাদুর রোল করেছিলেন।

সত্যবাবু সত্যজিৎ রায়ের কাপুরুষ ও মহাপুরুষ এবং নায়ক ছবিতে কাজ করেছেন। মৃণাল সেনের

অন্তরীণ ছবিতেও কাজ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ তরুণ মজুমদারের কাছে। তনুবাবুর প্রায় সব ছবিতেই উনি আছেন। কুহেলী ছবিতে ওঁর আবার প্রধান ভূমিকা। তনুবাবুকে উনি একজন কমপ্লিট ডিরেক্টর বলে মনে করেন।

সত্যবাবুর গোপন দানধ্যানও প্রচুর। এই অভ্যাসটা শুরু হয়েছিল ক্লাস নাইনে পড়বার সময় থেকে। একটি গরিব ছেলে শীতে কষ্ট পাচ্ছিল দেখে নিজের গায়ের জামাটাই তাকে দান করে দিয়েছিলেন। সব শুনে বাবা বলেছিলেন, এটা তো হবেই। এটা আমাদের বংশের ট্র্যাডিশন। তোমার ঠাকুরদা নিজের গায়ের শাল খুলে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরেছিলেন।

আমার বন্ধু কমেডিয়ান অজিত চট্টোপাধ্যায়কে সত্যবাবু প্রতি মাসে গোপনে টাকা দিতেন। আমার মুখে ব্যাপারটা শুনে উনি খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন . অজিতদার জন্যে এটুকুও করব না? জানেন, অজিতদা কী মানুষ ছিলেন। ওঁর কাছে কে উপকৃত নয় বলুন তো? অজিতদার হাতে একটা অ্যাটাচি থাকত। তাতে লেখা থাকত পি এস জে। তার অর্থ পরের সেবায় জীবন। সারা জীবন অজিতদা সেই কাজই করে গেছেন। এমন একটি মানুষের জন্যে আমি আর কতটুকু কী করতে পেরেছি বলুন।

সত্যবাবু নিঃসন্দেহে বড় অভিনেতা। কিন্তু মানুষ হিসেবে আরও অনেক বড়। সেই বড় মাপের মানুষটি মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটা স্থায়ী শূন্যতার সৃষ্টি করে।

বিমল দেব

একবুক অভিমান নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন বিমল দেব। যাবার আগে কারও বিরুদ্ধে তর্জনী উঁচিয়ে কোনও অভিযোগ জানিয়ে যাননি। কারও কাছে কোনও দিন কোনও সুযোগ ভিক্ষা করেননি। এক সদানন্দময় পুরুষ হাসতে হাসতে, সবাইকে হাসাতে হাসাতে, এবং অবশেষে কাঁদাতে কাঁদাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুকালেও এতটুকু যন্ত্রণা প্রকাশ করেননি। যা কিছু যন্ত্রণা সব নিজের বুকের মধ্যেই চেপে রেখেছেন চিরকাল।

না, বিমল দেব বাংলা চলচ্চিত্র কিংবা মঞ্চের দু-দশ হাজারি মনসবদার নন। উজির নাজির কোতয়াল জাতীয় কিছুই নন। নেহাতই একজন পদাতিক মাত্র। কিন্তু কী বিরাট ছিল তাঁর প্রতিভা যা ছোট্ট দু-একটি সুযোগেই প্রকাশ করে গেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বিমল দেবের প্রতিভার পরিমাপ করতে পারিনি। যেহেতু তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কোনও দিন কারও সামনে এসে দাঁড়াননি, তাই তিনি চিরকাল দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গেছেন। তাঁকে নিয়ে বড় মাপের কিছু করার চেষ্টা আমরা কোনও দিনই করিনি। এটা আমাদের ত্রুটি। আরও নিষ্ঠুরভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এটা আমাদের পাপ। স্মরণসভা করে, ভাল ভাল ভাষা দিয়ে তাঁর গুণপনার ব্যাখ্যান করে আমাদের এ পাপ মুছে যাবে না।

বিমল দেবের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আজ থেকে চার দশক আগে। সেটা বোধহয় ১৯৫২ কী ১৯৫৩ সাল হবে। আমি সে বছর তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য ও তাঁর দলবলকে আমার দেশ তমলুকে নিয়ে গিয়েছিলাম নাটক করাতে। পর পর দু'দিন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এবং 'চক্রান্ত' নামে দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। ওই দুটি নাটকের মধ্যে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিমল দেব।

বিমল দেবের সঙ্গে তখনও আমার মৌখিক পরিচয় হয়নি। তবে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। ধীরাজদার সঙ্গে আলাপ ছিল আগে থেকেই। ওই থিয়েটারের বাপার নিয়ে ঘন ঘন ধীরাজদার দক্ষিণ কলকাতার বলরাম বসু ঘাট রোডের বাড়িতে যাওয়া-আসা করতে হত। তখনই বিমল দেবকে প্রথম চাক্ষুষ করেছিলাম। ওই সময় সন্ধের দিকে ধীরাজদার বাড়িতে যেদিনই যেতাম, দেখতাম বিমলবাবু বসে আছেন। তা শিল্পীদের তো অনেক স্যাটেলাইট থাকে। তাঁরা দিনের পর দিন শিল্পীদের বাড়িতে বডি ফেলে রাখেন। ফাইফরমাস খাটেন। বিমল দেবকেও আমি তেমনি একজন স্যাটেলাইট ভেবেছিলাম ধীরাজদার।

ভুলটা ভাঙল ওই দুটো নাটকের রিহার্সাল দেখতে এসে। তমলুকে যাবার প্রস্তুতি হিসেবে ধীরাজদা ওই নাটক দুটোর রিহার্সাল ফেলেছিলেন উত্তর কলকাতার হেদুয়ার মোড়ে বসন্ত কেবিনের ওপরে একটি হলঘরে। সেখানে দেখলাম ধীরাজদা বিমল দেবকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। 'চক্রান্ত' নাটকের কিছু কিছু এডিট করছেন আর তার জন্যে বিমল দেবের মতামত নিচ্ছেন। ওই সব দেখে বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের এলেম আছে তো! এর আগে ওঁকে যে ধীরাজদার স্যাটেলাইট ভেবেছিলাম তার জন্যে মনে মনে লজ্জা পেলাম। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম বিমল দেব নামক ব্যক্তিটি ধীরাজদার দক্ষিণহস্ত।

সেই বিমল দেবের সঙ্গে আমার প্রথম বাক্য বিনিময় হল তমলুকে প্রথম দিন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটক শেষ হবার পর রাত প্রায় একটার সময়। সেদিন অভিনয় শেষ হয়েছে রাত দশটা নাগাদ। তারপর ওই বিরাট গ্রুপের খাওয়া-দাওয়া শোয়া ইত্যাদির তদারক শেষ করে যখন রাত একটা নাগাদ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরিয়েছি তখন হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : এতক্ষণ তো সকলের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করলেন, কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো কাকা?

অন্ধকারের মধ্যে কথাটা আমার কানে দৈববাণীর মতো শোনাল। কিন্তু ঠাহর করতে পারলাম না

আমার কোন ভাইপোটি কথাটা বললেন। এই 'কাকা' ডাকটির একটা পশ্চাৎপট আছে। আজকের এই থিয়েটারের যারা উদ্যোক্তা তাদের কাছে আমি 'রবিদা'। এর পরের গ্রুপ যারা ভলান্টিয়ারি করছে তাদের কাছে আমি 'কাকা'। আজ সকাল থেকে এই 'কাকা' ডাকটি অন্তত হাজারবার শুনেছি। 'কাকা, এটা কী হবে?' 'কাকা, ওটা কী হবে?' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার সেই প্রিয়তম ভাইপোর দল তো শো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মাত্র দু-তিন জন অনুচর নিয়ে পরবর্তী খাওয়া-দাওয়া আর শোয়ানোর পাট শেষ করতে হয়েছে আমাকে। সে সব শেষ করে সবে সিগারেটে সুখটানটি দিয়েছি, এমন সময় এই দৈববাণী।

কথাটা শুনে অবিশ্যি ভালই লাগল। আমি তো ভেবেছিলাম শো শেষ হবার পর আমার পাশে আর কেউ নেই। কিন্তু এমন একজন তো আছে যে আমার খাওয়া হয়েছে কিনা তার খবর নিচ্ছে। তবু একটু ঠাট্টা করেই বললাম : না কাকা, এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। সারাদিন যা ধকলটা গেল!

আমি বসেছিলাম রাস্তার ধারে সিমেন্ট বাঁধানো একটা হেলান দেওয়া বেঞ্চের ওপর। আমার কথা শেষ হবার পর অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটি ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ছায়ামূর্তিটি বললে: তা বললে চলবে কেন কাকা! দুটো কিছু তো মুখে দিতে হবে। নইলে কাল সকাল থেকে তো আবার নাকে দম নিয়ে খাটতে হবে পরের শোয়ের জন্যে। না খেলে যে অসুখে পড়ে যাবেন।

বলতে বলতে ছায়ামূর্তিটি একদম সামনে এসে গেল। তখন চিনতে পারলাম। বিমল দেব। কাঁধের ওপর একটা হ্যান্ডব্যাগ ঝোলানো। মনে হল যেন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন। একটু বিস্মিত হলাম ওঁকে এই মূর্তিতে দেখে। বললাম : কী ব্যাপার! আপনি এখনও শুতে যাননি?

বিমলবাবু বললেন : না কাকা, আমি আর শোব না। ভোরবেলায় ফার্স্ট ট্রেনটা ধরতে হবে। কাল আমার আপিস আছে।

আমি বললাম : সে কী! কালকেব 'চক্রান্ত' নাটকে আপনি অভিনয় করবেন না?

বিমলবাবু বললেন : না কাকা। বললাম না কাল আপিস আছে। তো চারটের সময় তো পাঁশকুড়ার বাস ধরতে হবে। তাই ভাবলাম এটুকু সময়ে আর ঘুমিয়ে কী করব। তেমন ঘুম জমে গেলে হয়তো উঠতেই পারব না। তাই পায়চারি করে দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি। তা আপনি কিছু খেয়ে নিন। রাত প্রায় একটা তো বাজে।

আমি বললাম : আমি কিছু খাইনি আপনি জানলেন কী করে? আপনি কী সর্বক্ষণ আমার ওপর নজর রাখছেন নাকি?

বিমলবাবু বললেন : তা একটু রাখতে হচ্ছে বৈকি কাকা! আমি তো দেখলাম আপনি সকলেব খাওয়াব তদারক করলেন, কিন্তু আপনার দিকে তাকাবার কেউ নেই।

ভদ্রলোকের কথায় আপ্লুত বোধ করলাম। বললাম : আমি ইচ্ছে করেই খাইনি। সারাদিন খাটুনির পর এখন গা-হাত গুলোচ্ছে। কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে। না হলে খাবারের ভাঁড়ারে তো ভাত-মাছ সবই মজুদ আছে।

বিমলবাবু বললেন : তা হলে একগ্লাস শরবত আর দু-একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে নিন। একবারে খালি পেটে থাকা তো ভাল নয় কাকা।

আমি বললাম : ওইটেরই একটু অসুবিধে। এত রাত্রে কাকে বলব শরবত করে দিতে। সবাই তো এখন বিছানায় পিঠ ঠ্যাকাবার জন্যে ব্যস্ত। তা আপনি আমাকে এরকম কাকা-কাকা করছেন কেন? আমার নাম রবি বসু।

ওই আধা-অন্ধকারের মধ্যেও বিমলবাবুর মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম। মুখের সেই ভাবটা বজায় রেখেই তিনি এগিয়ে এলেন আমার দিকে। বললেন : একটু সরে বসুন তো! আমাকে একটু বসতে দিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধরে গেল।

খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম বিমল দেবের কথা শুনে। ওঁকে আমার আগেই বসতে বলা উচিত ছিল। একটু সরে বসে ওঁকে বসবার জায়গা দিয়ে বলে উঠলাম : ছি ছি! কী লজ্জার ব্যাপার বলুন তো। অনেক আগেই আপনাকে বসতে বলা উচিত ছিল। আসলে থিয়েটারের সব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পোয়াতে গিয়ে

মাথার ঠিক নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না যেন!

বিমলবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন : না না, মনে করবার কী আছে। গরু হারালে সকলেরই এরকম হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম : গরু হারানোটা আবার কী? কার গরু হারাল।

বিমলবাবু বললেন : কারও হারায়নি। ওটা একটা গ্রাম্য প্রবাদ। বিপদে-আপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না তো! তখন ওই কথাটা ব্যবহার করা হয়।

আমি বললাম : আমার আবার বিপদ কোথায়?

বিমলবাবু বললেন : বিপদ নয়। কলকাতা থেকে থিয়েটাব পার্টি আনা কি চাট্টিখানি কথা! একটু এদিক-ওদিক হলে পাবলিক ঠেঙিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেবে। তা আপনি এ সব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে গেলেন কেন? আমি যতদূর জেনেছি আপনাব তো এক্ষেত্রে কোনও ফাইনান্সিয়াল ইন্টারেস্ট নেই।

আমি বললাম : সেটা ঠিকই শুনেছেন। তবে পাড়ার ছেলেরা ধবল তো। তাই গায়ে-গতরে খেটে ব্যাপারটা একটু অর্গানাইজ করে দিলাম।

বিমলবাবু পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন। দু' আঙুলের মাঝখানে ধরে শোঁ করে লম্বা একটা টান দিলেন। তারপর বললেন : আপনাকেও দেখছি আমার মতো ঘোড়া রোগে ধরেছে! কপালে দুঃখু আছে আপনার কাকা।

বিমলবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে আর কথাবার্তা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। বললাম : আপনারও কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর হ্যাবিট আছে নাকি?

বিমলবাবু পায়ের ওপর একটা চাপড় মেরে বললেন : আপনাদের এখানে বড্ড মশা কাকা। চলুন একটু হাঁটাচলা করতে করতে গল্প করি।

আমি বললাম : তার চেয়ে চলুন সামনে একটা বিরাট দিঘি আছে, রাজাদের দিঘি, নাম খাটপুকুর, তার পাড়ে গিয়ে বসি। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যাবে।

বিমল দেব বললেন : তাই চলুন কাকা।

আমি বললাম : আপনি আমাকে বার বার কাকা বলছেন কেন? বললাম না, আমার নাম রবি বসু।

বিমলবাবু বললেন : আহা সেটা তো জানি। তবে ওটা তো আপনার পোশাকি নাম। আপনার ডাকনাম যে কাকা সেটা এখানে এসে জানতে পারলাম। তাই আমিও কাকা ডাকছি।

আমি বললাম : মোটেই ওটা আমার ডাকনাম নয়।

বিমলবাবু বললেন : নাই হোক গে। আপনাকে আমার ওই নামে ডাকতে ভাল লাগছে।

আমি বললাম : তাহলে আমিও আপনাকে কাকা ডাকব। তখন কিছু মনে করতে পারবেন না কিন্তু।

বিমলবাবু বললেন : ফার্স্টক্লাস! আমরা দু'জনে দু'জনের সঙ্গে কাকা পাতিয়ে নিলাম তাহলে। তবে ওই সঙ্গে আর একটা জিনিস যে করতে হবে কাকা!

আমি বললাম : সেটা কি?

বিমলবাবু বললেন : এরপর থেকে আর আপনি আজ্ঞে করা চলবে না। তুমি করে ডাকতে হবে। কী রাজি তো?

আমি বললাম : তথাস্তু।

বিমলবাবু বললেন : বাঁচালেন—স্যরি, বাঁচালে কাকা। তখন থেকে আপনি আপনি করে কথা বলতে যা কষ্ট হচ্ছিল যে কী বলব। সারা শরীরে অস্বস্তি হচ্ছিল। পেটটা ফুলে জয়ঢাক হয়ে যাচ্ছিল।

বিমলবাবুর বলার ভঙ্গিতে আমি হেসে ফেললাম। তবে সেই থেকে আমরা উভয় উভয়ের কাকা।

তা সেদিন রাত্রে আমরা খাটপুকুরের পাড়ে গিয়ে বসেছিলাম। এতক্ষণ গাছগাছালির জন্যে বুঝতে পারিনি, পুকুরপাড়ে এসে দেখলাম আকাশে পাঁচশো গ্রামের কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ দেখা দিয়েছে। ওই অল্প চাঁদের আলোয় পুকুরটা খুব মনোরম দেখাচ্ছে।

বিমলবাবু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশের দৃশ্য দেখলেন। তারপর বললেন : এমন সুন্দর জায়গা থাকতে তুমি এতক্ষণ আমাকে মশার কামড় খাওয়াচ্ছিলে কাকা!

আমি বললাম : রাজাদের এই খাটপুকুরটাকে ঘিরে একটা কিংবদন্তী চালু আছে। এই পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা বড় পাথরের চাঁই আছে। সবাই বলে ওটা নাকি নেতা ধোপানির পাট। লখিন্দরের ডেডবডি নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ওখানেই নাকি নেতা ধোপানির সঙ্গে বেহুলার দেখা হয়েছিল। নেতা বেহুলাকে স্বর্গের দেবসভায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কাছেই একটা ধোবাপাড়া আছে, সেখানকার রজক সম্প্রদায় বছরে একদিন ধুমধাম করে নেতা ধোপানির সেই পাটটিকে পুজো করে।

বিমলবাবু বললেন : তা কেমন করে হবে। বেহুলা তো লখিন্দরকে নিয়ে ভেসেছিলেন সমুদ্রে। আর এটা তো একটা পুকুর।

আমি বললাম : তখন তো এখানে সমুদ্র ছিল। তমলুকের আসল নাম তাম্রলিপ্ত। এটা তখন বন্দর ছিল। চিনের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেছিলেন। পরে সমুদ্র সরতে সরতে দূরে চলে গেছে। সেই হলদিয়া বন্দরের কাছে।

বিমলবাবু বললেন : তাই নাকি?

আমি বললাম : সমুদ্র যে এককালে এখানে ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু নেতা ধোপানির ব্যাপারটা মনে হয় গল্প। তবে এই পুকুরের মাঝখানে একটা বিরাট মন্দির যে আছে সেটা আমার নিজের চোখে দেখা। গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল কমে গেলে মন্দিরের চূড়োটা দেখা যায়। ছোটবেলায় আমরা সাঁতরে গিয়ে ওই চুড়োটাকে ধরে বিশ্রাম নিতাম।

আমার কথা শুনে বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : তোমার এই কাহিনীটা আমার কাছে খুব সিম্বলিক্। আমারও বুকের মধ্যে ওই রকম একটা স্বপ্নের মন্দির আছে। কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করেও তার চূড়োটাকে ধরতে পারছি না। কেবলই পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

আমি বললাম : এ্যাই মরেছে। কাকা, তুমি কি কবিতা-টবিতা লেখো নাকি?

আমার কথা শুনে বিমল দেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন : কবিতা লিখি না, তবে একটু-আধটু লেখালিখি করি। দৈনিক বসুমতী পত্রিকায়। কখনও কোনও অনুষ্ঠানের রিপোর্ট। কখনো বা খেলার রিপোর্ট।

আমি বললাম : ভারি অদ্ভুত তো! করো থিয়েটার আর রিপোর্ট লেখো খেলার!

বিমলবাবু বললেন : আমি তো এককালে খেলাধুলো করতাম। তখন তারকেশ্বরে থাকতাম। পড়াশোনা আর খেলাধুলো দুটো একসঙ্গে চালাতাম। ফুটবলে গোলে খেলতাম। হুগলি ডিস্ট্রিক্টের হয়ে খেলেছি সেই সময়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কোন সালে?

বিমলবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন : ফর্টি ফাইভ ফর্টিসিক্স হবে। হ্যাঁ, তাই। ওই ফর্টিসিক্সেই আমি তারকেশ্বর থেকে ম্যাট্রিক পাস করি তো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এখন চাকরি-বাকরি করছ না শুধু থিয়েটার?

বিমলবাবু বললেন : শুধু থিয়েটারে কি পেট ভরে? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে একটা চাকরি তো করতেই হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায়?

বিমলবাবু বললেন : গাভমেন্ট অব ওয়েস্টবেঙ্গলের কনস্ট্রাকশন বোর্ডে।

আমি বললাম : সেই জন্যে তখন থেকে আপিস আছে আপিস আছে করছিলে?

বিমলবাবু বললেন : ওই আপিসটাও সিম্বলিক্। তোমার ওই নেতা ধোপানির পাটের মতো। আমার যা কিছু স্বপ্ন ওই আপিস নামক পাথরটিতে দিনের পর দিন আছাড় খাচ্ছে।

বিমলবাবুর কথায় পরিবেশটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল। এতক্ষণ দিঘির বুক থেকে যে ঠাণ্ডা হাওয়াটা উঠে আসছিল, সেটাও যেন বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ হাতের রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির কাঁটাটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। বললাম : এ কী! চারটে তো বাজে প্রায়। চলো, তোমাকে গ্যারাজে গিয়ে ফার্স্ট বাসটা ধরিয়ে দিই।

বিমলবাবুও নিজের হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর অনিচ্ছুক শরীরটাকে

কোনমতে টেনে তুলে বললেন : হ্যাঁ, চলো। যাওয়া যাক। যেতে তো হবেই।

আবাসবাড়ির নির্জন রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বিমলবাবুকে বললাম : স্বার্থপরের মতো একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

মাথা নিচু করে চলতে চলতে বিমলবাবু জবাব দিলেন : কী বলো!

আমি বললাম : আমাদের এই থিয়েটারের রিপোর্টটা একটু বসুমতীতে করে দেবে?

বিমলবাবু বললেন : নিশ্চয়! ওটা বলার দরকার ছিল না। ধীরাজদার সঙ্গে আমার আগেই কথা হয়ে গেছে। কাল আপিসে বসেই রিপোর্টটা লিখে ফেলব।

তা সেই রিপোর্টটা দৈনিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। বেশ বড় করেই বেরিয়েছিল। ধীরাজদাই আমাকে কাগজটা দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন : দ্যাখ দ্যাখ, বিমল কী সুন্দর রিপোর্ট করেছে। কত বড় করে বেরিয়েছে। বিমলটা একটা জেম্।

ধীরাজদা সেদিন যা বলেছিলেন আমি তার সঙ্গে আর একটি শব্দ যোগ করব। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আমি বিমল দেবকে নানা ভাবে নাড়াচাড়া করে দেখেছি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা কথা জোর গলায় বলব, বিমল দেব শুধু জেম্ই নয়, জেম্ অব দ্য জেম্স।

আর কী রোমাঞ্চকর তাঁর সারাটা জীবন। কত বিচিত্র রূপেই না তাঁকে দেখেছি। কখনও তিনি এক রসিক ভাঁড়, কখনও দার্শনিক, কখনও বা সন্ন্যাসী।

গান্ধীজির মৃত্যুর কয়েকটা দিন পরে একবার তো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। কোন অনির্দিষ্টের পথে। একটা চিরকুটে শুধু লিখে রেখে গেলেন : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!

এই অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটিকে সম্যকভাবে জানতে গেলে একবার অতীতের দিকে তাকাতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৩০ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে।

বিমল দেবকে নিয়ে মাঝে মাঝেই আমাকে একটু বিপদে পড়তে হত। সেরকম দু-একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি।

আমি তখন 'দেশ' পত্রিকায় কর্মরত। ওখানে মাঝে মাঝেই বিকেলের দিকে হানা দিতেন বিমলবাবু। উনি কাজ করতেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কনস্ট্রাকশান বোর্ডে। তাঁদের অফিস ছিল রাইটার্স বিল্ডিংসের রোটান্ডা হলে। ১৯৪৯ সালে ওখানে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের পদে যোগ দেন বিমলবাবু। যোগ দেন না বলে বলা উচিত ওঁকে যোগ দেওয়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন মুখ্য বাস্তুকার শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁকে একরকম জোর করেই খেলার মাঠ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কনস্ট্রাকশান বোর্ডের অফিসের চেয়ারে বসিয়ে দেন। সেই ১৯৪৯ সালে বিমলবাবু মাস গেলে মাইনে পেতেন একশো আট টাকা আট আনা।

বিমলবাবু যখন চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখন তিনি ম্যাট্রিক পাস। সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন আই-এ পড়বেন বলে। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার আগে পরীক্ষা-টরিক্ষা না দিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সবাই ভেবেছিলেন তিনি হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কিন্তু, এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর আবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এবং তখন তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ দাড়ি-গোঁফ কিছুই ছিল না। ওই সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন, কেনই বা বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন, অনেক পীড়াপীড়ি করেও সেটা ওঁর কাছ থেকে জানতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে হাসতে হাসতে বলতেন : এটা আমার মুখ থেকে বার করতে পারবে না কাকা। ব্যোমকেশ বক্সি কিংবা কিরীটি রায়কে লাগালেও তাঁরা আমার পেট থেকে একটি কথাও বার করতে পারবেন না। ওটা চিরকাল রহস্য হয়েই থাক।

কেবল একদিন মদের টেবিলে বসে কথায় কথায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, উনি ওই সময় এলাহাবাদে কোনও এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলেন। তিনি যে কে, কী সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, কেনই বা সেখান থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, তার কিছুই আর বিমল দেবের মুখ থেকে বার করা যায়নি। উদোম মাতাল করে দিয়েও না।

বিমল দেব অবশ্য পরে চাকরি করতে করতেই আবার লেখাপড়া শুরু করেন একরকম বুড়ো বয়সেই। ১৯৭৫ সালে বি-এ পাস করার পর চাকরিতে গ্রেড ওয়ানে প্রমোশন পেয়েছিলেন। ১৯৮৮

সালের তিরিশে নভেম্বর রিয়াটার করেন ওই পোস্টে থেকেই। তাঁর অবসরের সংবাদে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল খুশি হয়ে জানিয়েছিলেন, 'এটা তোমার লাইফলেস ফাইল থেকে ফাইললেস লাইফ-এ উত্তরণ'।

ওই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ছুটির পর মাঝে মাঝে বিমল দেব হানা দিতেন আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে। এটা সেই সত্তরের দশকের কথা। 'দেশ' পত্রিকার ঘরে ঢুকে বিমলবাবু সোজা এসে দাঁড়াতেন আমার টেবিলের সামনে। বলতেন : কাকা, মন দিয়ে কাজ-টাজ করো। কাজে ফাঁকি দিও না যেন।

আমি বলতাম : এটা কি তোমার রাইটার্স বিল্ডিং পেয়েছ যে ফাঁকি মেরে মাইনে নেবে। এটা খবরের কাগজের অফিস। এখানে প্রত্যেকের কাজের সঙ্গে প্রত্যেকের কাজের লিংক করা। এখানে ইচ্ছে থাকলেও ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বিমল দেব বলতেন : ফাঁকি দেওয়ার কথা আমাকে বোলো না কাকা। ফাঁকি দিলে অফিসে পরের পর এতগুলো প্রমোশন পেতাম না। আমি আড্ডাটাও যেমন মন দিয়ে দিই, তেমনি কাজটাও মন দিয়ে কবি। এমন কি কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং-মিছিলেও কোন ফাঁকি দিই না।

আমি বলতাম : থাক, আর কো-অর্ডিনেশন কমিটির দালালি করতে হবে না। যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ তার সঙ্গে দেখা করোগে যাও। আমার কাজে ডিসটার্ব কোরো না।

বিমলবাবু আমার কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলতেন। বলতেন : তাই তো যাব। তবে আমাদের সরকারি অফিসের নিয়ম হল যা কিছু করতে হবে, সেটা থ্রু প্রপার চ্যানেল হওয়া চাই। সেইজন্যে বিমলদার টেবিলে যাওয়ার আগে তোমার টেবিলে একবার বুড়ি ছুঁয়ে গেলাম। বিমলদার কাছে যাবার তুমি হলে গিয়ে আমার প্রপার চ্যানেল।

কথাটি শেষ করেই বিমলবাবু গিয়ে বসতেন বিমলদার টেবিলের সামনে। বিমলদা মানে সাহিত্যিক বিমল কর। বিমলদা তখন ছিলেন দেশ পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। আর আমি চিফ সাব-এডিটর। সেই অর্থে বিমলদা আমার বস্।

বিমলদার সামনে তখন কার্জন ক্লাবের সদস্যরা অনেকেই এসে গেছেন। বিমল দেবও তাঁদের মধ্যে মিশে যেতেন। ঘণ্টাখানেক পরে বিমলদা অফিস থেকে বেরোতেন তাঁর তরুণ বান্ধববাহিনী নিয়ে। বিমল দেবও তাঁদের সহযাত্রী হতেন। যাবার আগে সবার অলক্ষে আমাকে একপ্রস্থ চোখ মেরে যেতেন, যার অর্থ, তুমি ব্যাটা কলম পিষতে থাকো, আমরা চললাম।

দেশ পত্রিকায় আমাদের অফিস আওয়ার্স ছিল সকাল এগারোটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত। মাঝে এক ঘণ্টা টিফিন। তা আমরা টিফিনের ছুটিটা অ্যাডভান্স নিয়ে নিতাম। তার মানে অফিসে প্রবেশ করতাম বেলা বারোটায়। আমাদের সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাদের এই সুবিধেটুকু করে দিয়েছিলেন। সাগরদা নিজে কিন্তু সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যেই চলে আসতেন। বিমলদা অবশ্য মাঝে মাঝেই কাজের চাপ কম থাকলে ছ'টার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তেন। যাবার আগে ঠাট্টা করে আমায় বলতেন : কী রবি, আমাকে আর কত খাটাবে। এবার আমায় ছুটি দাও।

এর সবটাই ছিল মজার ব্যাপার। কী সুন্দর আনন্দময় পরিবেশ ছিল আমাদের দেশ পত্রিকার ঘরে। ওই যে কার্জন ক্লাবের কথাটা বললাম, ওটাই ছিল বিমলদার একটা আনন্দমেলা। অফিস ছুটির পর বিমলদা তরুণ লেখকদের নিয়ে আড্ডা জমাতেন কার্জন পার্কে। আমরা ঠাট্টা করে ওটাকে বলতাম কার্জন ক্লাব। বৃষ্টি-বাদলা হলে আড্ডা বসত কে সি দাশের মিষ্টির দোকানে। বিমল দেব লেখক না হয়েও ওই আড্ডার একজন রসময় সদস্য ছিলেন।

কোন কোনদিন আবার উল্টোটাও ঘটত। অফিসের সম্মেলন কার্জন পার্কে স্থানান্তরিত হবার সময় বিমল দেব বিমল করের দলছুট হয়ে আবার আমার টেবিলে এসে বসতেন। ওকে ওইভাবে দেখে আমি বলতাম : কী কাকা, তুমি আজ বিমলদার সঙ্গে গেলে না যে বড়?

বিমল দেব বলতেন : আজ তোমার সঙ্গে সংগত করবার বড় মানসিক ইচ্ছা হয়েছে।

আমি বলতাম : ওসব মতলব ছাড়ো দিকি। কেটে পড়ো। আমার পকেটে আজ একদম টাকা পয়সা

নেই।

বিমল দেব বলতেন : কবে থাকে! আর কবেই বা তুমি শুঁড়িখানায় পেমেন্ট করেছ শুনি!

আমি বলতাম : একদিনও করিনি। করবার মতো উদ্বৃত্ত পয়সা আমার পকেটে থাকে না বলে। ওটা আমার প্রিন্সিপ্‌ল্। নিজের রোজগারের পয়সা মদের পেছনে খরচ করার ব্যাপারে আমার গুরুর নিষেধ। তাছাড়া আমি সংসারী মানুষ। বউ-বাচ্চা আছে। তোমার মতো তো আর আইবুড়ো কার্তিক নয়।

বিমলবাবু একটু হেসে বললেন : একটু ভুল করলে কাকা। বিয়ে না করেও আমি তোমারই মতো ঘোরতর সংসারী। আমার ভাই, ভাইয়ের বউ, ভাইঝিরা আছে না। তাদের নিয়ে আমার জমজমাট সংসার।

সেটা সত্যি কথা। ভাইঝি গিগিকে তিনি যে কী পরিমাণ ভালবাসতেন তা বলে বোঝানো যাবে না। নিজের ঔরসজাত সন্তানকেও মানুষ বোধহয় ওভাবে ভালবাসতে পারে না। ১৯৮৪ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর সেই প্রাণাধিক প্রিয় গিগিকে চিরকালের মতো হারাবার পর বিমলবাবু একটা দোমড়ানো মোচড়ানো মানুষের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা তো ভেবেছিলাম বিমলবাবু বোধহয় এই শোক সামলে উঠতে পারবেন না। তাঁকেও আমরা হারাবো চিরকালের মতো। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি সেদিন ঘটে নি। আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন বিমলবাবু। কিন্তু কোনদিনই আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেননি। সেই সদানন্দময় মানুষটিকে আর পুরোপুরি পাইনি আমরা।

যাই হোক সেদিন দেশ পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে বিমলবাবুকে সঙ্গ দিতে হয়েছিল। উনি আমায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্রুকেড লেনের সার্জেন্টস্ ক্লাবে। প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত তিনি নিজে মদ্যপান করেছিলেন এবং আমাকে করিয়েছিলেন।

একটা জিনিস আমি চিরকালই লক্ষ করেছি। সুস্থ অবস্থায় যে বিমল দেব রসের ফুলঝুরি, মদ্যপানের পর তিনি একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ। সে সময় তাঁর মুখে একটিও হাসির কথা না, এতটুকু রঙ্গ রসিকতা নয়। তখন কেবল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, নাটক নিয়ে আলোচনা, অভিনয় নিয়ে আলোচনা। এবং রীতিমত সিরিয়াস ভঙ্গিতে। এই সময় তাঁর অনেক স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের হাহাকার শুনেছি। কী চেয়েছিলেন, কী পান নি, ভবিষ্যতে কী করতে চান তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতেন। এই কারণে বিমল দেবের মদ্যপানটাকে আমি খারাপ দৃষ্টিতে দেখতাম না। তবে শারীরিক ক্ষতি তো হতই। তাই তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতাম। পারতাম না। প্রিয়তম ভাইঝি গিগিও তার জীবৎকালে অনেক চেষ্টা করেও পারেনি।

গিগির মৃত্যুর পর বিমল দেব মদ্যপান একেবারেই ত্যাগ করলেন। এতটুকুও স্পর্শ করতেন না। তাই নিয়ে আমি এবং সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার দুজনেই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার মতোই সমরেশকেও মাঝে মাঝে বিমলবাবুর মদের আসরের সঙ্গী হতে হত।

এই মদ্যপান সংক্রান্ত ব্যাপারে একবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সেবার আনন্দবাজার অফিস থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ে বাস ধরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখলাম বিমল দেব কার্জন পার্কের ট্রাম টার্মিনাস পেরিয়ে আসছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বিমলবাবু বলে উঠলেন : এই যে কাকা, আমি তোমাকেই মনে মনে খুঁজছিলাম। দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হল। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কী ব্যাপার! হঠাৎ এত খোঁজাখুঁজি?

বিমলবাবু বললেন : আজ কিছু উটকো টাকা পেয়েছি। চলো, তোমাকে কোথাও বসিয়ে এন্টারটেইন করাই।

আমি বললাম : ছি ছি! তুমি ঘুষ নিয়েছ? তোমার তো এমন বদ্ অভ্যেস ছিল না!

বিমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে একহাত জিভ কেটে দু কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠলেন : এই তো তোমার দোষ! উটকো টাকা হলেই যে ঘুষের টাকা হতে হবে এটা তোমাকে কে বললে?

আমি হতভম্বের মতো জিজ্ঞাসা করলাম : তাহলে?

বিমলবাবু সরস কণ্ঠে বললেন : এটাকে বরং ঘুষির টাকা বলতে পারো।

আমি আরও হতভম্ব। বললাম : তার মানে?

বিমলবাবু বললেন : এক প্রোডিউসারের কাছে তিন দিনের শুটিং-এর টাকা পাওনা ছিল। বছর ঘুরতে চলল তো সে ব্যাটা টাকা দেবার নামই করে না। আজ তাকে মস্তানের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে এনেছি। মনটা তাই আজ খুব খুশি। চলো, তোমাকে নিয়ে কোথায়ও বসি।

আমি শুনেছিলাম বিমলবাবু মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। তাই জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায় বসবে? কে সি দাশে?

বিমলবাবু বললেন : ও ভারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও না। তুমি কেবল ফলো মি।

বিমলবাবু ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে নিয়ে ম্যাডান স্ট্রিটে ঢুকলেন। তারপর একদম সোজা ম্যাজেস্টিক হোটেলের দোতলায়।

আমার মনে তখনও কোন সন্দেহ হয়নি। কারণ জানি তো কাকা মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছে। তবু মনটা একটু খুঁত খুঁত করছিল।

কাকা আমাকে একেবারে ম্যাজেস্টিক হোটেলের দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলেন। সেখানে বারান্দার রেলিং ঘেঁষে ডবল সিটের চেয়ার টেবিল পাতা। কাকা একটা টেবিলে মুখোমুখি আমাকে বসালেন। তারপর ওয়েটারকে ডেকে বললেন : দো হুইস্কি। পানি সে।

আমি চমকে উঠে বললাম : সে কী কাকা! তুমি না গিগির মৃত্যুর পর মদ্যপান একদম ছেড়ে দিয়েছ। তাহলে এসব কী?

বিমল দেব আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ম্যাজেস্টিক হোটেলের সার্ভিস খুব প্রম্পট্। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেযারা দুটো গ্লাসে পানীয় আর এক বোতল ঠাণ্ডা জল রেখে গেল।

বিমলবাবু দুটো গ্লাসে জল ঢেলে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আর একটা নিজের হতে ধরে বলে উঠলেন : চিয়ার্স।

মনটা খুব তেতো হয়ে গিয়েছিল। একটা গ্লাস হাতে ধরে শুকনো মুখে বললাম : চিয়ার্স।

আমার শুকনো মুখের দিতে তাকিয়ে বিমলবাবু একটু হাসলেন। তারপর নিজের হাতের গ্লাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : নাও, এবার এটাতে একটা আর ওটাতে একটা করে চুমুক দাও।

আমি বললাম : সে কী! তুমি খাবে না?

বিমলবাবু জিভ কেটে বললেন : তাই কখনও পারি? গিগিকে কথা দিয়েছি না, আর কোনদিন মদ খাব না!

আমি বললাম : গিগি তো স্বর্গে। তাকে পেলে কোথায়?

বিমলবাবু বললেন : স্বপ্নে। আমি গিগিকে তো প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম।

আমি বললাম : ওসব স্বপ্ন-টপ্ন বাজে কথা। তোমার সাবকন্‌শাস মাইন্ডের রিফ্লেকশান।

বিমলবাবু টেবিলের ওপর বেশ জোরে একটা চাপড় দিয়ে বলে উঠলেন : আজ্ঞে না স্যার। গিগিকে আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম। আবছা আবছা স্বপ্ন নয়। একেবারে থ্রি ডাইমেনশন ছবির মতো স্পষ্ট। তার সঙ্গে হাসতাম, খেলতাম, কত কথা বলতাম। ঠিক আগেকার মতো।

আমি আর কোন উত্তর দিলাম না। স্নেহপ্রবণ মানুষটি যদি এই নিয়ে ভুলে থাকতে চায় তো থাকুক। তাতে তো কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না। আলোচনাটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে বললাম : কী জরুরি কথা আছে বলছিলে না?

আমার প্রশ্ন শুনে বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : আচ্ছা কাকা, তুমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?

আমি বললাম : বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাক। কিন্তু তুমি এ কথাটা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

বিমলবাবু বললেন : আজ তিন-চার মাস আমি গিগিকে স্বপ্নে দেখতে পাই না।'ও কি অন্য কোথাও জন্ম নিয়ে নিয়েছে?

আমি বললাম : সেটাও যেমন হতে পারে, আবার এটাও তো হতে পারে ও উচ্চতর কোন স্বর্গে

চলে গেছে।

বিমলবাবু বললেন : তাহলে আমাকেও সেখানে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমি বললাম : তার কোন উপায় নেই। যতদিন তোমার এ পৃথিবীতে ভোগ আছে ততদিন সেটা করতেই হবে।

বিমলবাবু আমার কথা শুনে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : তাহলে আমি এখন কী করব!

আমি বললাম : কাজ করবে। কাজের মতো কাজ। তুমি এতকাল যে সব স্বপ্ন দেখে এসেছ তা পূরণ করার চেষ্টা করবে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার দিনটি পর্যন্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকবে।

আমার কথায় বিমলবাবু যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। বললেন : তুমি ঠিক বলেছ কাকা। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি। সেগুলো চটপট করে সেরে ফেলতে হবে। কবে বলতে কবে ডাক আসবে তার তো ঠিক নেই।

আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত ফলে গিয়েছিল। বিমলবাবু কাজ করতে করতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৮৮ সালে রিটায়ার করার পর থেকে তিনি তাঁর স্বপ্নগুলি পূরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একটি ড্রামা ইনস্টিট্যুট করবার তাঁর বহুদিনের বাসনা ছিল। সেটার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নপূরণ সম্ভব হয়নি।

বিমল দেবের জন্ম ১৯৩০ সালে ফরিদপুরের মাদারিপুরে স্বর্ণঘোষ গ্রামে। বাবার নাম চন্দ্রবিনোদ দেব। বিমলের ছোটবেলাতেই বাবা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে চলে আসেন পুরো সংসার সমেত। কলকাতার নূতন আস্তানা গিরিশ পার্কের কাছে। শিক্ষা লাভ জোড়াসাঁকো এ ডি স্কুলে। তবে ১৯৩৯ সালে ওঁদের কলকাতা ছাড়তে হয় জাপানী বোমার ভয়ে। চলে যান তারকেশ্বরে। সেখানে বিমলের বড় জামাইবাবু সুধীর চন্দ্র রাহা থাকতেন। তিনি ছিলেন তারকেশ্বর হাই ইংলিশ স্কুলের হেড মাস্টার। বিমল সেখানেই ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন।

সুধীববাবু চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে গান্ধীবাদী হয়ে যান। যুদ্ধের সময় যখন কংগ্রেসের নেতাদের ধরা হয় তখন সুধীরবাবুকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি আর তারকেশ্বরে ফিরে যান নি, মাস্টারিও করেননি। যুগান্তর পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। থাকতেন গোয়াবাগানের ঈশ্বর মিল লেনে। ম্যাট্রিক পাস করে বিমলও এই বাড়িতে এসে ওঠেন। ভর্তি হন সিটি কলেজে। ১৯৪৮ সালে গান্ধীজি মারা গেলেন। জামাইবাবু বাড়ি ফিরলেন অশৌচ অবস্থায়। হবিষ্যি করলেন এক মাস। এই ব্যাপারটা বিমলের মনে বোধহয় বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়েই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। একটা চিরকুটে লিখে রেখে গেলেন : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

এক বছর পরে বিমল বাড়ি ফিরলেন। ১৯৪৮ সালে চাকরি পেলেন কনস্ট্রাকশান বোর্ডে। নাট্যজীবনের সূত্রপাত তখন থেকে। কনস্ট্রাকশান বোর্ডের রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অভিনয় করেন কারাগার, কালিন্দী, সিরাজুদ্দৌল্লা, দুই পুরুষ ইত্যাদি নাটকে। ওই সময়ে অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। অভিনয় করেন আদর্শ হিন্দু হোটেল নাটকে। ধীরাজদার সঙ্গেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বরিশালে গিয়েছিলেন অভিনয় করতে। জ্ঞান হবার পর সেই তাঁর পিতৃভূমি দর্শন।

এর পরে বিমল দেবের জীবন গ্রুপ থিয়েটারের জীবন। কুশীলব গোষ্ঠীর হয়ে রথের রশি এবং গৃহপ্রবেশ। বিচিত্রা গোষ্ঠীর হয়ে করেন অলীকবাবু এবং বিরহ। এই বিরহ নাটকের একটি দৃশ্য পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্ত্রীর পত্র' ছবিতে সংযোজিত হয়। সেই দৃশ্যে বিমল দেব ছিলেন। সেই অর্থে 'স্ত্রীর পত্র' ছবিতেই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। থিয়েটার ক্যাম্পের হয়ে করেন রংকরা মুখ। এই নাটকে ঘটোৎকচ বসুর ভূমিকার জন্য বিমলবাবু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হন। থিয়েটার গিল্ডের যদুবংশ নাটকেও তাঁর অভিনয় প্রশংসা পায়।

বিমল দেব প্রচুর ছবিতে ছোট ছোট রোলে অভিনয় করেছেন। এবং ওই ছোট রোলেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' এবং শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' ছবিতে।

খ্যাতির তুঙ্গে ওঠেন সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক হাজার দেশে' ছবিতে শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে। তাঁর মুখের সংলাপ 'লেখাপড়া করে যে/অনাহারে মরে সে' দীর্ঘকাল মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে।

কমার্শিয়াল স্টেজে তাঁর প্রথম অভিনয় রঙ্গনায় 'নটনটী' নাটকে। পরে যোগেশ মাইমে 'স্বর্ণভিলা', বাসুদেব মঞ্চে 'গ্রেট ইস্টার্ন স্টোর্স', সুজাতা সদনে 'আংটি চাটুজ্যের ভাই', সারকারিনায় 'জয়ন্তী', কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে 'হচ্ছেটা কী?' এবং বিজন থিয়েটারে 'ঘটে অঘটন' ইত্যাদি।

আকাশবাণীর সঙ্গে ছিল বিমল দেবের দীর্ঘকালের যোগাযোগ। প্রচুর নাটকে অভিনয় করেছেন ওখানে। দূরদর্শনেও প্রচুর সিরিয়াল করেছেন। তবে বিজ্ঞাপন চিত্রের ছোট্ট পরিসরে তিনি যে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তার তুলনা নেই। 'দিনরাত লোডশেডিং। ট্রামে বাসে বাদুড়ঝোলা। আরে বাবা শরীরটাকে তো রাখতে হবে।' অমন করে সংলাপ উচ্চারণ করতে পারেন একজনই। তাঁর নাম বিমল দেব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরীরটাকে বিমলবাবু রাখতে পারলেন না। ১৯৯৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে কাউকে এতটুকু বিব্রত না করে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারকে বলেছিলেন: 'দ্যাখ সমরেশ, আমি মরলে কাঁধ দেবার জন্যে দশ-পনেরো জনের বেশি লোক পাওয়া যাবে না।' কিন্তু ওই ৯ সেপ্টেম্বর ভারত বন্‌ধের দিনেও শ'তিনেক লোক জমেছিল তাঁব মৃতদেহের পাশে। আর পরদিন যখন তাঁর মরদেহ গিরিশ মঞ্চে শায়িত, তখন তো সেখানে জনঅরণ্য।

অনুপকুমার

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যায় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের গ্রিনরুমে জ্ঞানেশ মুখার্জির ঘরে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বনফুলের লেখা 'ভীমপলশ্রী' অবলম্বনে বীরু মুখার্জি রচিত 'অঘটন' নাটকটা তখন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে রম রম করে চলছে। ওই সময়ে ওখানে থিয়েটারের ডেটগুলোতে আমাদের একটা জমাট আড্ডার আসর বসত। সেই আসরের মধ্যমণি ছিলেন হরিদাস সান্যাল। হরিদাসবাবু ওই নাটকের প্রোডিউসার। রঙ্গনা, কাশী বিশ্বনাথ ইত্যাদি মঞ্চে ওঁর প্রযোজনায় অনেক নাটক হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই সাকসেসফুল। সেই কারণে হরিদাসবাবুর ভাগ্যকে অনেকে ঈর্ষা করতেন। বলতেন : থিয়েটার করে ঘরে টাকা তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেকেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। হরিদাসের কবজির জোর খুব। তাই ও পারছে। ওর মতো থিয়েটার-কপালে মানুষ আর দু'টি নেই।

যদিও আমরা জানতাম, এটা ঈর্ষার কথা। থিয়েটার থেকে টাকা তোলার কপাল নিয়ে অনেকেই জন্মেছেন। স্টার থিয়েটারের মালিক সলিল মিত্র তার উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশ্বরূপার সরকার ব্রাদার্স, অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর সরকার আর রাসবিহারী সরকারের ভাগ্যও এ ব্যাপারে কম প্রসন্ন ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত যা হয়, এঁরা সকলেই থিয়েটারপাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। হরিদাসবাবুও তাই। কিন্তু তার পেছনে থিয়েটার ব্যবসায়ে লস্ খাওয়াটা বড় কারণ নয়। অন্য কারণও আছে। তবে সে সব আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আবার সেই আড্ডার কথাতেই আসি, যেখানে হঠাৎ অনুপকুমার এসে একটি হাসির অ্যাটম বোম্ নিক্ষেপ করলেন।

আড্ডাবাজ হিসেবে হরিদাস সান্যাল ছিলেন তুলনাহীন। একেবারে দিলখোলা মানুষ। আড্ডায় যখন বসতেন তখন তাঁর কাছে কমদামি আর বেশিদামি শিল্পীর কোনও বাছবিচার ছিল না। আর মানুষটির বুকের খাঁচাখানা ছিল বিরাট। কেউ কোন বিপদে-আপদে পড়লে তার দিকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে ওঁর কাছ থেকে যে কতটা উপকৃত হয়েছি তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। সেদিনকার সেই সান্ধ্য আড্ডার আসরেই ফিরে আসি।

সেই সন্ধ্যায় আমি আর হরিদাসবাবু গ্রিনরুমে জ্ঞানেশবাবুর ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি। নাটকের মধ্যান্তরের বিরতি হয়েছে। নাটক শেষ হলেই আমরা তিনজনে হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালে যাব। সেখানে একখানা ঘর বুক্ করে রাখা আছে। থিয়েটারের পর আমরা একটা স্ক্রিপ্ট শুনতে যাব। অন্য এক ভদ্রলোক স্ক্রিপ্ট শোনাবেন। তাঁর ইচ্ছে হরিদাসবাবু ছবিটা প্রোডিউস করুন। হিসেব মতো আজকের স্ক্রিপ্ট পড়ার আসরের সব খরচ সেই ভদ্রলোকেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু হরিদাসবাবু তাতে রাজি নন। উনি বললেন : স্ক্রিপ্ট যদি আমাদের পছন্দ না হয় তাহলে তো ভদ্রলোকের অতগুলো টাকা জলে যাবে। সেটা আমার খারাপ লাগবে। সুতরাং আজকের রাত্রের সব খরচ আমার।

আমি অবশ্য হরিদাসবাবুকে অন্য যুক্তি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম : কী দরকার মিছিমিছি দেড়-দু' হাজার টাকা খরচ করে। স্ক্রিপ্টটা আপনার বাড়ি, অথবা আমার বাড়ি, কিংবা জ্ঞানেশবাবুর বাড়িতে বসে শুনলে তো টাকাটা বেঁচে যেত!

হরিদাসবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন : বাবা-মায়ের আশীর্বাদে আমার যা ব্যবসাপত্তর আছে তাতে মোটামুটিভাবে আমার সংসারটা চলে যায় রবিদা। থিয়েটার করতে এসেছি সখের খাতিরে। ফিল্ম যদি করি তাহলে সখের জন্যেই করব। তা সখ করতে গেলে দু-পাঁচ হাজার টাকা তো এক-এক সন্ধ্যায় খরচ হবেই। ওটাতে আর বাধা না দিও না রবিদা!

আমিও হাসতে হাসতে বললাম : তথাস্তু। টাকা যখন আপনার গায়ে কট কট করে কামড়াচ্ছে তখন সেটা খানাপিনাতেই খরচ হোক।

আমার কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় ঝড়ের মতো জ্ঞানেশ মুখার্জির সাজঘরে এসে

ঢুকলেন অনুপকুমার। আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন · তোমরা তিনজনেই আছ দেখছি। ভালই হল। তোমরা কিন্তু আমার সাক্ষী।

অনুপবাবুর কথায় জ্ঞানেশবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন . কী হয়েছে রে অনু? হঠাৎ আমাদের সাক্ষী মানার দরকার হয়ে পড়ল কেন? কোথাও চুরি-বাটপাড়ি করে এসে সাধু সাজতে চাইছিস নাকি?

অনুপবাবু বললেন : তোর দেখছি দিনের দিন বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে জ্ঞানেশ। চুরি-বাটপাড়ি কেউ সাক্ষী রেখে করে। তাছাড়া অনুপকুমার যদি চুরি করে তো কারও বাবার সাধ্য নেই সে চুরি ধরে। অত কাঁচা কাজ অনুপকুমার করে না।

জ্ঞানেশবাবু বললেন : তাহলে এতো সাক্ষী টাক্ষি খোঁজা কেন?

অনুপবাবু বললেন : আমি তোমাদের তিনজনকে সাক্ষী রেখে একটা কন্‌ফেশন মানে স্বীকারোক্তি করতে চাইছি। পরে যদি সেটা নিয়ে কখনও আইন-আদালত হয় তাহলে তোমরা আমার হয়ে সাক্ষী দেবে।

হরিদাসবাবু বললেন : ব্যাপারটা কী হয়েছে বলবে তো! তা নয় তখন থেকে কেবল সাক্ষী সাক্ষী করছ। ফিমেল গ্রিনরুমে কোন মেয়ে-টেয়ের গায়ে হাত-টাত দিয়েছ নাকি?

অনুপবাবু একহাত জিভ কেটে বললেন : ছি ছি ছি হরিদাস! অনুপকুমারের নামে জীবনে যে বদনাম কেউ দিতে পারেনি, সেই তুমি আমার চরিত্রে কালি ছিটিয়ে দিলে হে!

হরিদাসবাবু হাসতে হাসতে বললেন : তোমার গায়ে কালি ছেটাবার ক্ষমতা আমার আছে নাকি! ছেটানোর আগে সেই কালি লুফে নিয়ে তুমি আমার সারা মুখে মাখিয়ে দেবে না! মুখপোড়া বাঁদর সাজিয়ে ছাড়বে।

আমি বললাম : আমরা কিন্তু আসল ব্যাপারটা থেকে সরে গিয়ে কালি ছেটানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি অনুপবাবু!

অনুপবাবু বললেন : ব্যস্ত হব না। তুমি বলছ কী রবি! যে অনুপকুমার কচি কচি মেয়েদের পর্যন্ত ঠাকুমা-দিদিমা ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে দেখে না, তার চরিত্র নিয়ে এত বড় কটাক্ষ কখনও সহ্য করা যায়? তুমিই বলো?

অনুপবাবুর কথা শুনে জ্ঞানেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন : হয়েছে হয়েছে! এখন আসল ব্যাপারটা কী চটপট বলে ফেল দিকি। এক্ষুনি আবার বেল্ পড়ে যাবে।

অনুপবাবু বললেন : পড়ুক গে বেল। আমি কি ন্যাড়া যে বেল পড়াকে ভয় পাব। আমার মাথায় এখনও দস্তুরমতো একগোছা ঘন চুল আছে।

জ্ঞানেশবাবু বললেন : আরে সে বেল নয় রে বাবা! আমি বলছি থিয়েটারের ড্রপ ওঠার বেলের কথা।

অনুপবাবু বললেন : সেদিকে তুই নিশ্চিন্ত থাক জ্ঞানেশ। আমি বেল্-ম্যানকে বলে এসেছি আমি গিয়ে না বলা পর্যন্ত বেল্ দেবে না। দোকানে অমন গরম গরম চপ-কাটলেট ভাজা হচ্ছে। দর্শকদের একটু আরাম করে খেতে দাও। আমাদের কেবল তাড়াতাড়ি শো শেষ করে বাড়ি ফেরার ধান্ধা করলে চলবে কেন। দর্শকদের সুবিধে-অসুবিধের দিকটাও তো দেখতে হবে। কী বলো হরিদাস, ঠিক বলিনি? নইলে তো আবার তোমারই বদনাম হয়ে যাবে।

জ্ঞানেশবাবু বললেন : বদনাম হতে কিছু বাকি আছে নাকি! এক্সটেম্পো ডায়লগ দিয়ে দিয়ে আড়াই ঘণ্টার নাটককে এখনই তো তিন ঘণ্টায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিস। এইভাবে চলতে থাকলে এরপর তো আর দর্শকরা বাড়ি ফেরবার জন্যে লাস্ট কারটাও পাবে না। কোন্‌দিন না দল বেঁধে সবাই এসে আমাদের ছালচামড়া খুলে নিয়ে যায়!

অনুপবাবু বললেন : অ্যাই দেখো। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর! একেই বলে ঘোর কলিকাল। কোথায় দর্শকের ভালো লাগবে তাই ভেবে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে ডায়লগের জন্ম দিতে হচ্ছে।

দর্শকরা হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। মেয়ে-পুরুষের বাছবিচার থাকছে না। আর সেই সুবিধেটুকু পাবার জন্যে ইয়াং ছোঁড়াগুলো এই নাটক তিন-চার বার করে দেখতে আসবে। এতে তোমাদের উপকার হবে কি না বলো। আর জ্ঞানেশ, তুই কি না আমার ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে দিলি।

আমি বললাম : ওই দেখুন অনুপবাবু, আবার কথাটা অন্য দিকে ঘুরে গেল! যেটা বলতে এসেছিলেন সেটা তো বলাই হল না।

অনুপবাবু বললেন : হবে কী করে! স্বয়ং ডিরেকটারই যদি ডিসটার্ব করে তাহলে আমার আর কী দোষ বলো ভাই। আমি তো তখন থেকে কথাটা বলতেই চাইছি। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি কই।

হরিদাসবাবু বললেন : ঠিক আছে, এবারে বলে ফেলো। আর কেউ ডিসটার্ব করবে না।

অনুপবাবু বললেন : আসল কথাটা হচ্ছে কী জানো! আমি না, খেজুর খেয়েছি।

জ্ঞানেশবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন : বোঝ ব্যাপারটা। এই কথাটুকুর জন্যে এত ধানাই-পানাই। এর জন্যে আবার সাক্ষীর দরকার। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক।

হরিদাসবাবু বললেন : সত্যিই তো! বাজারে খেজুর কিনতে পাওয়া যায়, তুমি সেটা কিনে খেয়েছ। এর মধ্যে অপরাধটা কোথায়?

অনুপবাবু বললেন : অপরাধ নয়! অমি কি খেজুর কিনে খেয়েছি নাকি। অন্যের লাগানো গাছে থরে থরে খেজুর পেকে ছিল, আমি কাউকে কিছু না বলে সেই খেজুর পেড়ে খেয়েছি। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে সেটা যে চুরি করা হয়, এটা তো সেই ছোটবেলা থেকেই বিদ্যেসাগর মশাইয়ের লেখা বর্ণপরিচয় বইয়ে পড়েছি। তবে আমার চেয়েও বড় অপরাধ করেছে সৌমিত্তির। ও পরের গাছ থেকে ডাব পেড়ে খেয়েছে।

হরিদাসবাবু বললেন : সৌমিত্তিরটা আবার কে?

অনুপবাবু বললেন : সৌমিত্তিরকে চেনো না। তোমাদের স্টার হিরো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গো! সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার।

জ্ঞানেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন : এইসব পাগলের প্রলাপ কতক্ষণ ধরে চলবে অনু?

অনুপবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন : পাগলের প্রলাপ নয় জ্ঞানেশ। এর জন্যে আমাদের জীবন সংশয় হবার জোগাড় হয়েছে।

আমি বললাম : এত বড় ভূমিকা করার দরকার কী? আসল ঘটনাটা খুলে বলুন না।

অনুপবাবু এক পলক আমার মুখের দিকে দেখে নিলেন। তারপর রহস্যময় এক টুকরো হাসি হেসে বললেন : তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি শোনো।

এরপর একটা মোক্ষম গলাখাকারি দিয়ে অনুপবাবু নিজের কণ্ঠটাকে পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন : আমি, সৌমিত্র, সুমিত্রা এবং আরও অনেকে একটা বিরাট জাহাজে চেপে যাচ্ছিলাম—

অনুপবাবুর কথায় বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : জাহাজে চেপে! কোন আউটডোর শুটিং-এ নাকি? আন্দামানে?

অনুপবাবু বললেন : সে যেখানেই হোক। জায়গার নাম জানবার দরকার কী? জাহাজে চেপে যাচ্ছিলাম। ব্যস্।

জ্ঞানেশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন : এই শুরু আরব্যোপন্যাসের কাহিনী। ওদিকে যে ইন্টারভ্যালের টাইম পার হয়ে গেছে, সেদিকে খেয়াল আছে।

জ্ঞানেশবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই ওঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন আমার বন্ধু অমিত দে আর অভিনেত্রী গীতা দে। অমিত এই নাটকের আর একজন হিরো করছে। আর গীতা দে করছেন দজ্জাল শাশুড়ির চরিত্র, যিনি কথায় কথায় অনর্গল ভুল ইংরিজি বলেন। অমিতের চোখেমুখে কেমন একটা উৎকণ্ঠা। সে জিজ্ঞাসা করলে : কী ব্যাপার জ্ঞানেশদা, ইন্টারভ্যালের পর ড্রপ উঠছে না কেন?

জ্ঞানেশবাবু ব্যাজার মুখে বললেন : ড্রপ উঠবে কী করে! এখানে অনুপকুমারের নাটক শুরু হয়েছে। সেটা শেষ হোক, তবে তো উঠবে।

অমিত ব্যাপারটা বুঝে নিলে। বললে : কী নাটক? আমরা শুনতে পাই না?

অনুপকুমার বললেন : আজ্ঞে না। আমার নাটক পয়সা দিয়ে শুনতে হয়। পকেট থেকে মাল ছাড়ো, তারপর নাটক শুনতে বোস।

অমিত বললে : তোমাকে তো টাকা দিয়ে ছোট করতে পারব না। আমি বরং তোমাকে একদিন ভালো করে খাইয়ে দোব। যা খেতে চাইবে।

তা অমিত পারে। ফরেন পাসপোর্ট অফিসে মোটা মাইনের চাকরি করে। তাছাড়া লোককে খাওয়াবার মতো দিলটাও ওর আছে। আমার বাড়িতে জ্ঞানেশবাবু, রবীন মজুমদার আর অমিতকে নিয়ে খানা-পিনার আসর বসেছে একাধিকবার। কিন্তু অমিত আমাকে একটি পয়সাও খরচ করতে দেয়নি। এই দু'হাতে খরচ করাটা ওর দম্ভ নয়। এটা ওর হৃদয়ের ব্যাপার।

তা ওসব কথা এখন থাক। আসল ঘটনাটাই বলি। অমিতের কথা শুনে অনুপবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন : তোর খাওয়ানোর নিকুচি করেছে। যা, তোকে ফ্রি পাস দিয়ে দিলাম। আমার নাটক শুনতে বসে যা কিন্তু একটাই শর্ত। আমার কথার মধ্যে একদম ডিস্টার্ব করবি না। একটাও ফোড়ন কাটবি না।

এবারে হরিদাসবাবুকে খুব উৎকণ্ঠিত দেখা গেল। তিনি বললেন : সত্যিই বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে ইন্টারভ্যালের ড্রপ তুলতে। পাবলিক চ্যাঁচামেচি শুরু করবে এবার।

অনুপবাবু একবার মুখ বাড়িয়ে কাশী বিশ্বনাথ হলের সরু প্যাসেজে চপ-কাটলেটের দোকানটার দিকে দেখে নিয়ে বললেন : না, দোকানের সামনে আর ভিড় নেই। দর্শকদের খাওয়া-দাওয়া খতম্ হয়ে গেছে। অ্যাই অমিত, ছোট্ট করে একটা বেল্ দিয়ে দিতে বল্ তো!

আমি বললাম : ছোট্ট করে বেল্! সেটা আবার কী?

অনুপকুমার একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : আছে আছে! ছোট্ট করে বেল্ হলো এমন করে বেল্ বাজানো যাতে বাজবে অথচ বাজবে না। অনেকে শুনতে পাবে আবার অনেকে পাবে না। যারা শুনতে পাবে তারা গুটি গুটি পায়ে এসে সিটে বসবে, আবার বেশ কিছু বাইরেও থাকবে। তখন তাদের কথা ভেবে জোরালো আওয়াজে বেল্ বাজানো হবে। এতে সাপও মরবে, আবার লাঠিও ভাঙবে না।

আমি আবাক হয়ে বললাম : তার মানে?

অনুপবাবু বললেন : এই সহজ কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। যারা বেল্ শুনতে পেয়েছে তারা ভাববে আমরা ঠিক সময়েই শো শুরু করতে চাইছি, কিন্তু দর্শকরা সবাই আসন গ্রহণ না করাতে বাধ্য হয়ে আমাদের একটু দেরি করতে হল। সুতরাং কর্তৃপক্ষের কোন দোষ নেই।

জ্ঞানেশবাবু বললেন : তা এখন না হয় ছোট্ট করে বেল্ দেওয়া হল। কিন্তু বড় করে বেল্টা কখন বাজবে?

অনুপবাবু বললেন : ঠিক দু' মিনিট। আর মাত্র দু' মিনিট সময় নেব। এই কাশী বিশ্বনাথের দিব্যি বলছি। তাছাড়া আজকে একটাও এক্সটেম্পো ডায়লগ দেব না। অন্যদিনের চেয়ে আগেই শো শেষ হয়ে যাবে।

অনুপবাবুর কথা বলার ভঙ্গিতে জ্ঞানেশবাবুও আর হাসি চাপতে পারলেন না। বললেন : ঠিক আছে। দু' মিনিট সময় তোকে দিচ্ছি। তোর ওই আরব্য-উপন্যাস শেষ কর। ঘড়ি ধরে দু' মিনিট কিন্তু।

অনুপবাবু বললেন : যথেষ্ট যথেষ্ট! দু' মিনিটও লাগবে না। তার আগেই শেষ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কোন্খানটায় বলছিলাম যেন?

আমি বললাম : একটা বিরাট জাহাজে করে আপনি, সৌমিত্রবাবু ইত্যাদিরা যাচ্ছেন।

অনুপবাবু বললেন : হ্যাঁ। জাহাজ বিশাল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে তো চলেছে। সমুদ্রের কী বড় বড় ঢেউ। হাঙর আর কুমিরের দল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন যায়, রাত আসে। গভীর রাতে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। অত বড় জাহাজটা মোচার খোলার মতো দুলছে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। চারিদিকে চিৎকার, ছোটাছুটি। শুনলাম আমাদের জাহাজটা নাকি একটা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে।

অনুপবাবুর কথার মাঝখানেই জ্ঞানেশবাবু একবার আড়চোখে টেবিলের ওপর রাখা রিস্ট ওয়াচটার

দিকে দেখে নিলেন।

অনুপবাবু বললেন : অত আড়চোখে ঘড়ি দেখবার দরকার নেই জ্ঞানেশ। দু' মিনিট বলেছি, দু' মিনিট। জেন্টলম্যানস্ ওয়ার্ড।

হরিদাসবাবু বললেন : ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার গপ্লোটা শেষ কর।

অনুপবাবু আহত কণ্ঠে বললেন : এটা গপ্লো নয় হরিদাস। আমার কাছে এটা প্রাণান্তকর ব্যাপার।

জ্ঞানেশবাবু বললেন : আর দেড় মিনিটের মধ্যে গপ্লো শেষ না করলে তার চেয়েও প্রাণান্তকর ব্যাপার ঘটে যাবে কিন্তু।

অনুপবাবু বললেন : ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় জাহাজের তলাটা ফেঁসে গেছে। হুড়হুড় করে জল ঢুকছে। এই অবস্থাটা থেকে কী ভাবে পরিত্রাণ পাব সেটাই তখন মাথার মধ্যে ঘুরছে। আমাদের ইউনিটের সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাই নিয়েই আলোচনা করছি। এমন সময় আবার একটা জোর ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের একটা পাশ ভেঙে আমরা সবাই জলে পড়ে গেলাম।

জ্ঞানেশবাবু বলে উঠলেন . তারপর সকলের একসঙ্গে সলিল সমাধি। গপ্লো শেষ। এবারে বেল্ দিয়ে দিতে বলি।

অনুপবাবু বললেন · তুই জেন্টলম্যানস্ এগ্রিমেন্ট ভায়োলেট করছিস জ্ঞানেশ। এখনও এক মিনিট বাকি আছে।

জ্ঞানেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন : ভেরি স্যরি অনু। সবাই একসঙ্গে জলে তো পড়ে গেলি। তারপর কী হল বল।

অনুপবাবু বললেন : ক'দিন ক'রাত এইভাবে একখানা বড় কাঠের ওপর আমরা সবাই ভাসছিলাম তার আর হিসেব নেই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারপর সবাই একে একে জ্ঞান হারালাম।

অমিত হঠাৎ ফোড়ন কেটে উঠল : তারপর তোমাদের জ্ঞান ফিরেছিল তো?

অনুপবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন : এক নম্বরের ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে আসো! চুপ করে বসে থাকতে পারো না!

আমি অমিতের দিকে তাকিয়ে বললাম : কেন মিছিমিছি ঘাঁটাচ্ছো। হ্যাঁ, তারপরে কী হল অনুপবাবু?

অনুপবাবু বললেন : জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম আমরা সবাই একটা দ্বীপে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর পড়ে আছি। বেলাভূমির পাশে অজস্র ফলের গাছ। তাতে থোকায় থোকায় ফল ফলে আছে। তা দেখে আমাদের ক্ষিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কতদিন যে খাওয়া হয়নি আমাদের! আশ্চর্যের ব্যাপার, দ্বীপটাকে মনে হল জনমানবশূন্য।

তখন আমরা যে ক'জন পুরুষ ছিলাম, তারা প্রত্যেকে একে একে একটা গাছে উঠে ফল পাড়তে লাগলাম। আমরা খিদের জ্বালায় গাছে বসেই ফল খেতে শুরু করলাম, আর মেয়েদের দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলাম। খেতে পেয়ে আমাদের প্রাণের ফুর্তি দেখে কে!

খানিকটা পরেই মাথায় বজ্রাঘাত। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রতিটা গাছের নীচে দু-তিনজন করে জংলী দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় পাখির পালকের টুপি। পরনে গাছের বাকল। হাতে ঝকঝকে বর্শা। ঠিক সিনেমায় যেমন দেখায় আর কী!

জংলীগুলো ইশারায় আমাদের নেমে আসতে বলল। নামার পর তারা আমাদের ইউনিটের মেয়ে-পুরুষ সবাইকে ঘিরে ফেললো। তারা নিজেদের মধ্যে কী ভাষায় কথা বলছিল তার এক বিন্দুও বুঝতে পারলাম না। ওরা নিজেদের মধ্যে কী সব যুক্তি করে আমাদের সবাইকে বললো এগিয়ে যেতে। পাশে পাশে ওরা চললো খোলা বর্শা হাতে।

ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করল ওদের রাজার সামনে। রাজামশাইয়ের বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। তাঁর পরনে বাকলের বদলে রঙ-বেরঙের পোশাক। অনেকটা আমাদের বি ব্রাদার্সের ঐতিহাসিক নাটকের ড্রেসের মতো।

রাজামশাই দেখলাম ইংরিজি জানেন। বেশ শুদ্ধ ইংরিজি। তিনি আমাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা বললেন। মনে হল 'সবুজ দ্বীপের রাজা'-র মতো সভ্য সমাজের কেউ ছিটকে এসে এদের

রাজা হয়ে বসেছেন।

রাজামশাই আমাদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারলেন। আমরা যে কেউ দাগী চোর নয়, পেটের জ্বালায় ওদের দ্বীপের গাছ থেকে ফল চুরি করে খেয়েছি, সেটা তিনি বুঝতে পারলেন। তাই বললেন : আমাদের দ্বীপে ফল চুরির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তোমাদের গ্রুপের মেয়েরা কেউ নিজে হাতে ফল চুরি করেনি, তাই তাদের রেহাই দিলাম।

রাজার কথা শুনে তো আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। হায় হায়! পৈতৃক প্রাণটা এভাবে বেঘোরে চলে যাবে। কলকাতায় কত প্রোডিউসারকে ডেট্ দেওয়া আছে। অতগুলো ছবি আধা খ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে আছে। তারা কী করবে কে জানে!

হঠাৎ রাজামশাই বললেন : তবে তোমাদের অবস্থাও আমি বুঝতে পারছি। তোমরা খিদের জ্বালায় এই কাজ করে ফেলেছো। তাই তোমাদের আমি মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে একটা অত্যন্ত লঘু দণ্ড দিতে চাই।

সেই লঘু দণ্ডটা কী?

রাজামশাই বললেন : তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে যে-গাছের ফল খেয়েছ, তোমাদের পশ্চাদ্দেশ দিয়ে সেই সেই ফল আবার তোমাদের উদরে প্রবিষ্ট করানো হবে।

রাজার এই দণ্ডাজ্ঞা শুনে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। আমি খেজুর গাছে উঠে খেজুর খেয়েছি। আমার তেমন অসুবিধে হবে না। কিন্তু সৌমিত্রর কী হবে! ও যে ডাব গাছে উঠে ডাব খেয়েছে। আহা বেচারা!

অনুপবাবুর গপ্পোটা শেষ হতে হরিদাসবাবু বলে উঠলেন : গল্পের মানেটা কী হল?

অনুপবাবু বললেন : প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনয় করার পর বাংলা ছবিতে যে সাহস আর কেউ করেনি, সৌমিত্র সেটা করতে চলেছে। ও দিলীপ রায়ের 'দেবদাস' ছবিতে দেবদাস করছে।

অনুপবাবুর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আওয়াজ করে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের বেল্ বেজে উঠল।

এই হলেন অনুপকুমার। যখন যেখানে থাকবেন তার চারপাশটা হাসি আর আনন্দে উজ্জ্বল করে রাখবেন।

আবার এর বিপরীত চিত্রও আছে। সে কথায় পরে আসছি।

অনুপকুমারের সঙ্গে আমাদের আড্ডাটা স্টার থিয়েটারেই বেশি জমত। অমন প্রশস্ত আড্ডার জায়গা তো আর কোনও থিয়েটারেই ছিল না। কয়েকজন শিল্পীর কাছে স্টার থিয়েটার তো তাঁদের ঘরবাড়ির মতোই ছিল। নাটক বদলেছে, শিল্পী বদলেছে, কিন্তু কয়েকজন শিল্পীর ক্ষেত্রে কোনদিনই অদলবদল ঘটেনি। যেমন অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অপর্ণা দেবী, বয়স্কা শিল্পী আশা দেবী, প্রীতি মজুমদার ইত্যাদি ইত্যাদি। ওখানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা আত্মিক বন্ধন ছিল। সপ্তাহে যে চারটে দিন থিয়েটার থাকত না, সে ক'দিন সবাই যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটাতেন। থিয়েটার ডে-তে তাই সকলের মুখে দেখতে পেতাম গালভরা হাসি।

হবে নাই বা কেন! স্টার থিয়েটারের মালিক ছিলেন সলিল মিত্র। কিন্তু সলিলবাবলু কোনদিন শিল্পী কিংবা টেকনিসিয়ানদের কাছে তাঁর মালিকানা ফলাতে আসতেন না। গ্রিনরুমেই আসতেন না কোনদিন। দোতলায় তাঁর নিজের ঘরটিতে বসে ব্যবসায়িক কাজকর্ম সারতেন। সলিলবাবু শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না বটে, কিন্তু শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব ঘটেনি কোনদিনই। তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারতেন। সবাই জানতেন দোতলার কোণের ঘরে তাঁদের একজন গার্জেন আছেন, যাঁর কাছে দায়ে-দফায়, বিপদে-আপদে অনায়াসেই যাওয়া যায়। এবং তার প্রতিকার হবেই। এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে যে সবাই নিজের ঘরবাড়ি ভাববেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

স্টার থিয়েটারকে যে শিল্পী অথবা কর্মীরা নিজের ঘরবাড়ি ভাবতেন, তার আরও একটা কারণ ছিল। সে কারণটি হল দেবনারায়ণ গুপ্ত। আমার কাছে তিনি দেবুদা। সলিলবাবু স্টার থিয়েটারের মালিক, কিন্তু স্টার থিয়েটারের প্রাণ ছিলেন দেবুদা। অমন স্নেহপ্রবণ, সুমধুর ব্যক্তিত্ব আমি খুব বেশি মানুষের

মধ্যে দেখিনি। শিল্পীদের কাছে তিনি ছিলেন গুরুর মতো, পিতার মতো, বন্ধুর মতো।

দেবুদাকে আমি আমার নিজের দাদার মতো শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। স্টার থিয়েটারে একটা সময়ে আমি প্রচুর আড্ডা দিয়েছি। আমার কাছে সেই আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন দেবুদা। একটা সময়ে স্টার থিয়েটার আমার কাছেও ঠিক নিজের ঘর-বাড়ির মতোই ছিল। আমি তো বাইরের লোক। স্টার থিয়েটারের সঙ্গে আমার কোন আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক ছিল না। সাংবাদিক হিসেবে যেমন আর পাঁচটা থিয়েটারে যাই, ওখানেও সেইভাবেই যেতাম। কিন্তু দেবুদা এমন সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করলেন যে আমি ওই থিয়েটারবাড়ির প্রেমে পড়ে গেলাম। স্টারে গেলে প্রথমেই দেবুদার ঘরে যেতাম। বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা হত। থিয়েটারের পুরনো দিনের নানা গল্প শুনতাম দেবুদার মুখ থেকে। দেবুদার ওই আড্ডায় বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা আসতেন। প্রবীণ লেখক ও সাংবাদিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওখানেই আমার আলাপ কবিয়ে দিয়েছিলেন দেবুদা। তাঁর সঙ্গেও প্রচুর আড্ডা দিয়েছি। তিনি নিজে হাতে করে তাঁর লেখা 'চলমান জীবন' বইখানি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। ওই বইখানি বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ। বাড়ি বদলের সময় ওই বইটি যে কোথায় হারিয়ে গেল তার আর হদিস পেলাম না। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছোট বড় সকলের কাছেই ছিলেন পবিত্রদা। একদিন উনি ওঁর এক স্নেহভাজনের বাড়িতে গেছেন। সে ভদ্রলোকের নাতি পবিত্রদাকে দেখে বলে উঠল : ওই তো পবিত্রদা-জেঠু এসে গেছেন। এখন আমি ওঁর ছেলে পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা দিই। পৃথ্বীশ একজন উঁচু দরের কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। বাটা কোম্পানির উঁচু পদে অধিষ্ঠিত। পৃথ্বীশের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে আমার স্নেহভাজন কবি-বন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্ত। আমাদের এখন জমজমাট আড্ডা বসো এস ওয়াজেদ আলির ভাষায় বলতে হয় : সেই ট্র্যাডিশন সামনে চলিয়াছে।

দেবুদার ওই আড্ডায় আরও অনেক গুণী মানুষ আসতেন। তাঁদের মধ্যে ববীন্দ্রসংগীতের বিশেষজ্ঞ অনাদি দস্তিদার মশাইয়ের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে। স্টার থিয়েটারের কোনও নাটকে যদি রবীন্দ্রসংগীত থাকত তবে অনাদিদার ডাক পড়ত শিল্পীদের গান শেখানোর জন্য। ওঁর সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে আমার আর দেবুদার আলোচনা হত।

এঁদের মধ্যে একমাত্র দেবুদাই জীবিত আছেন। তবে শয্যাশায়ী অবস্থায়। শয্যাশায়ী থাকলেও দেবুদার স্মৃতি এখনও সতেজ আছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করেন নানা প্রয়োজনে।

এই দেবুদার ঘরেই একদিন অনুপকুমার একটি মজার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। অনুপবাবু দেবুদাকে দেবুকাকা বলে সম্বোধন করতেন। তার কারণও আছে। দেবুদা হলেন অনুপবাবুর বাবা, সেকালের বিখ্যাত গায়ক-অভিনেতা ধীরেন দাসের বন্ধু। বাংলা থিয়েটারের জগতে ধীরেন দাস একজন অবিস্মরণীয় মানুষ। অনুপবাবুর কথা বলতে গেলে ধীরেনবাবুর প্রসঙ্গ আসবেই। তবে এই মুহূর্তে সেটা বলতে চাইছি না। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে সেদিনের মজার ঘটনাটা বলি।

সেদিন সন্ধেবেলা যথারীতি দেবুদার ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছি। রোজ যেমন করেন, সেদিনও আশাবুড়ি তাঁর পানের ডিবেটা মেলে ধরেছেন আমার আর দেবুদার সামনে। আশাবুড়ি যাঁকে বলছি, তিনি হলেন বর্ষীয়ান শিল্পী আশা দেবী। প্রচুর ছবি আর নাটকে অভিনয় করেছেন। একটা ছবির নাম করি। তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে মিনিদের বাড়ির দাসী। যিনি মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালার ঘনিষ্ঠতা দেখে মিনির মা মঞ্জু দে-কে বার বার সাবধান করতেন। ভারি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন আশা দেবী ওই ছবিতে।

আশা দেবীকে দেবুদা আশাবুড়ি বলে ডাকতেন। আমরা বলতাম আশাদি। জুনিয়ার আর্টিস্টরা কেউ কেউ আশা-মা বলেও ডাকতেন। তা আমরা সেদিন সবে পানের ডিবে থেকে দুটি পান তুলে মুখে দিয়েছি, হঠাৎ অনুপকুমার একেবারে হুড়মুড় করে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

অনুপবাবুকে ওইভাবে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে দেবুদা বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন : কী ব্যাপার অনু?

অনুপবাবু চোখেমুখে কৃত্রিম উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলে বললেন : আপনাকে এর একটা বিহিত করতে

হবে দেবুকাকা। এবং সেটা আজই।

ওই কৃত্রিম উত্তেজনার ভঙ্গিটা দেবুদার নজর এড়াল না। উনি খুব রিলাক্সড ভঙ্গিতে পান চিবোতে চিবোতে উঠে বাইরে গিয়ে পিক ফেলে এলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন : কারও সঙ্গে মারামারি টারামারি হয়েছে নাকি?

অনুপবাবু বললেন : সেটা হলে আপনার কাছে বিহিত চাইতে ছুটে আসতাম নাকি। আমার হাতের ঘুষিতে যে হেভিওয়েট বক্সারের ওজন, সেটা সবাই জানে। তাই কেউ লড়তে আসে না।

দেবুদা বললেন : তাহলে প্রবলেমটা কী তোমার? কার বিরুদ্ধে নালিশ?

অনুপবাবু বললেন : নালিশটা আপনার বিরুদ্ধে দেবুকাকা।

দেবুদা এবার সতিই অবাক হয়ে গেলেন অনুপবাবুর কথা শুনে। বললেন : তার মানে?

অনুপবাবু বললেন : আমার মুখে যে সব ডায়লগ বসিয়েছেন, তার মধ্যে একটা ডায়লগ পাল্টাতে হবে।

দেবুদা বললেন : এ আর নতুন কথা কী! আমার লেখা ডায়লগ তো তুমি রোজই পাল্টে দিচ্ছ। আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় নাটকটা আমার লেখা না অন্য কারুর।

অনুপবাবু বললেন : সে তো মাঝে মাঝে এক-আধদিন দু-একটা কারেন্ট টপিক্ ঢুকে যায় পাবলিককে হাসাবার জন্যে। আপনার ডায়লগ সব ঠিকঠাক রেখেই সেটা করি। ওটা ওই যে কী বলে, সংযোজন, তাই আর কি!

দেবুদা বললেন : যাকগে মরুক গে! ওসব কথা থাক। আজ তোমাব আপত্তি কোন্ ডায়লগটা নিয়ে. সেটা বলো।

অনুপবাবু বললেন : ওই যে সিনে বেগুনি খেতে খেতে আমি বলছি, 'আঃ কী প্যালেটেবল খাবার' ওটা আপনাকে বদলে দিতে হবে। ওটাব সঙ্গে আমার এক্সপ্রেশনটা ঠিক মেলানো যাচ্ছে না।

দেবুদা বললেন : কেন, মেলানো যাচ্ছে না কেন? অসুবিধেটা কোথায়?

অনুপবাবু বললেন : বেগুনি কি একটা প্যালেটেবল্ খাবার হল দেবুকাকা? ওটা চিবোতে চিবোতে কি সেই এক্সপ্রেশন আসে?

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ওই সিনটা করে গ্রিনরুমে ফিরে এসে অনুপবাবু প্রায়ই গজ গজ করেন : আরে ছ্যা ছ্যা! এই ন্যাতানো বেগুনি খেতে খেতে কি প্যালেটেবল খাবারের এক্সপ্রেশন দেওয়া যায়!

সেটা শুনে আমি বলতাম : তা এখানে গজ গজ না করে দেবুদার কাছে গিয়ে বলতে পারেন না!

অনুপবাবু বলতেন : বলবই তো! আমি কি কাউকে ভয় পাই নাকি! এই বেগুনির বদলে আমি একটা করে ফিশফ্রাই আদায় কবে তবে ছাড়ব।

তা আজ সেই দিন। দেখা যাক অনুপবাবু ফিশফ্রাই আদায় করতে পারেন কি না!

দেবুদা বললেন : বেগুনির বদলে কী দিলে তোমার এক্সপ্রেশনটা ঠিক ঠিক আসবে?

অনুপবাবু বললেন : সে তো কত ভালো ভালো খাবার আছে। চিকেন তন্দুরি, মাটন কবিরাজি, নিদেন পক্ষে একখানা ফিশফ্রাই হলেও চলবে।

দেবুদা একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দেবুদার কথা শুনে অনুপবাবু প্রায় আহ্লাদে নেচে উঠলেন। বললেন : কোন্‌টা হবে দেবুকাকা? চিকেন তন্দুরি না মটন কবিরাজি?

দেবুদা বললেন : ও দুটোর কোনটাই নয়।

দেবুদার কথায় অনুপবাবু যেন একটু নিভে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : তাহলে কি ফিশফ্রাই? তা সেটা হলেও চলবে।

দেবুদা বললেন : ওটাও নয়। আমি অন্য জিনিসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অনুপবাবু অবাক হয়ে বললেন : ফিশফ্রাইও নয়! তাহলে অন্য জিনিসটা কী দেবুকাকা?

দেবুদা বললেন : মাইম অ্যাকটিং কাকে বলে জানো তো? ওই সিনটায় সেই মাইম অ্যাকটিং করতে

হবে তোমাকে। বেগুনি-টেগুনি কিচ্ছুর দরকার নেই। ইংগিতে খাবার ভঙ্গি করবে। তারপর পরিতৃপ্তির ভঙ্গিতে দুটো আঙুল চাটতে চাটতে বলবে : আঃ! কী দারুণ প্যালেটেবল্ খাবার।

অনুপবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন : অ্যাই মরেছে! এ যে আমও গেল, আবার ছালাও গেল। দরকার নেই বাবা! আমার ওই বেগুনিই ভালো। দারুণ প্যালেটেবল্। নর্থ ক্যালকাটার মতো বিখ্যাত তেলেভাজা ভূ-ভারতে আর কোথাও আছে নাকি! তবে কেষ্টটাকে একটু ধমকে দেবেন তো দেবুকাকা। কতবার বলেছি, ওরে বাবা, বেগুনিটা গরম-গরম ভাজিয়ে আনিস। বাজারে বেগুনির দাম এক আনা করে, তা স্টার থিয়েটার তো বড় সাইজের স্পেশ্যাল বেগুনির জন্যে দু-আনা করে দিচ্ছে। সেটা একবার বেরিয়ে গিয়ে গরম গরম ভাজিয়ে আনতে পারিস না। তা উনি সেটা না করে হলে আসবার সময় হাতে করে নিয়ে ঢোকেন। ঠোঙায় মোড়া সেই বেগুনি একঘণ্টা পরে সিনের সময় ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে নেতিয়ে যায়। ওকে একটু ধমক দেবেন তো।

দেবুদা হাসতে হাসতে বললেন : আচ্ছা আচ্ছা, কেষ্টকে বলে দোবখন। তুমি এখন নীচে যাও তো। তোমার সিনের সময় হয়ে গেছে।

অনুপবাবু চলে গেলেন। যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে কপালে করাঘাত করে বুড়ো আঙুলটি নাড়তে নাড়তে ইংগিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে তাঁর খুব ব্যাড লাক্ চলছে। এত চেষ্টা করেও একখানা ফিশফ্রাই আদায় করা গেল না।

সদানন্দ পুরুষ অনুপকুমারের এও একটা রূপ। ওই যে বলেছি না, উনি যখন যেখানে থাকেন, সেখানটা হাসি আর আনন্দে ভরিয়ে রাখেন। এটাও তাই। ফিশফ্রাই-টিশফ্রাই ওসব কিছু না। হাসতে হাসতে, হাসাতে হাসাতে, একটু মজা করতে করতে বেঁচে থাকা আর কি। এটাই অনুপকুমারের নিজস্ব জীবন-দর্শন।

এবারে অনুপবাবুর বাবা স্বর্গত ধীরেন দাসের কথা কিছু বলি। ওটা বলা খুবই দরকার। ওরকম একজন পিতা না পেলে অনুপকুমার দাস আজকের অনুপকুমার হয়ে উঠতে পারতেন কি না সন্দেহ। এটা অনুপবাবু নিজেই স্বীকার করেন। জনে জনে বলে বেড়ান।

ধীরেন দাস নামটির সঙ্গে আমার একটি বাল্যকালের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তমলুকে আমাদের পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক সপরিবারে বসবাস করতেন। তাঁর নাম বিপিনবিহারী নাগ। ভদ্রলোক খুব অভিজাত এবং রুচিশীল ছিলেন। ওঁদের পুরো পরিবারটাই তাই। বিপিনবাবুকে আমি জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। ঠিক নিজের জ্যাঠামশাইয়ের মতোই উনি আমাকে স্নেহ করতেন।

সেই আমলে আমাদের বাড়িতে কোনও গ্রামোফোন ছিল না। ওই মহার্ঘ্য বস্তুটি তখন খুব কম বাড়িতেই ছিল। তা প্রতি বছর আশ্বিন মাস পড়তেই ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যেত জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গানের আওয়াজে। কী অপূর্ব সেই গান। 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে'। ওটি শেষ হতে না হতেই আর একখানি গান বেজে উঠত 'আজ আগমনীর আবাহনে কী সুর উঠেছে বেজে'।

সেই বাল্যকালে ওই দুটি গানের মাদকতাময় সুর আমাকে টেনে নিয়ে যেত জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির দিকে। তখনও ভালো করে সূর্য ওঠেনি, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, চমৎকার শীতল বাতাস বইছে, সেই সঙ্গে অমন চমৎকার গান। পৃথিবীটাকে কী সুন্দর যে লাগত কী বলব।

আমি গিয়ে দেখতাম জ্যাঠামশাই তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে তামাক খাচ্ছেন। অম্বুরি তামাকের গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে। জ্যাঠামশাই চোখ বুজে গানের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দে তাঁর চোখ দুটি খুলে যেত। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসাতেন।

গান শেষ হয়ে যাবার পর জ্যাঠামশাই যখন রেকর্ডটা পালটে অন্য রেকর্ড চাপাতে যেতেন, তখন আমি বাধা দিতাম। বলতাম : আর একবার গান দুটো বাজান না জ্যাঠামশাই।

জ্যাঠামশাই একটু হেসে আমার আবদার পূরণ করতেন। গান শেষ হলে নতুন কোনও রেকর্ড আর চাপাতেন না। বলতেন : তুই ঠিকই বলেছিস। এই ভোরবেলা ওই গান শোনার পর আর কোনও গান

মানায় না। এই গান দুটো কে গেয়েছে জানিস?

আমি কোন কথা না বলে উত্তরটা শোনার জন্যে জ্যাঠামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

জ্যাঠামশাই গদগদ ভঙ্গিতে বলতেন : ওঁর নাম ধীরেন দাস। মস্ত বড় গাইয়ে। থিয়েটার করেন। তুই বড় হলে আমি তোকে ওর থিয়েটার দেখাবার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাব।

সে সুযোগ উনি পাননি। আমি বড় হবার আগেই উনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে ধীরেন দাস নামক এক সুধাময় কণ্ঠের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন।

এই ধীরেন দাসের কথা প্রচুর শুনেছি সন্তোষদার কাছে। সন্তোষদা মানে অভিনেতা সন্তোষ সিংহ, যাঁকে উত্তমকুমার তাঁর নাট্যজীবনের গুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন। সন্তোষদা বলতেন : ধীরেন আমার খুব বন্ধু ছিল। হলায় গলায় ভাব। মনমোহন থিয়েটারে আমরা একবার শিশিরবাবুর 'সীতা' নাটক দেখতে গিয়ে দেখলাম লব আর কুশের চরিত্রে অভিনয় করছে জীবন গাঙ্গুলি আর রবি রায়। তাই ওই দুজন বয়স্ক মানুষকে লব-কুশের চরিত্রে দেখে আমরা দুজনে ঠিক করলাম, শিশিরবাবুর কাছে গিয়ে বলব, ওই দুটো চরিত্রে আমাদের দিয়ে অভিনয় করান। আমরা দুজনেই তখন থাকতাম মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে ফকির চক্রবর্তী লেনে। শিশিরবাবুর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা দিন দুয়েক ধরে অনেক চিন্তাভাবনা করলাম। শিশিরবাবুর সঙ্গে ধীরেনের চেনা ছিল। ও যখন বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ত তখন শিশির ভাদুড়ি সেখানে প্রফেসরি করতেন। যাই হোক, দুদিন পরে আমরা শিশিরবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, আমরা লব আর কুশের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। শিশিরবাবু বললেন, থিয়েটারটা তো শখ মেটাবার জায়গা নয়। এখানে অভিনয় করতে গেলে প্রফেশ্যনাল হতে হবে। যদি রাজি থাকো তাহলে আমাকে জানিও। তা ধীরেন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আর আমি মায়ের মত পেলাম না বলে থিয়েটারে ঢোকা হল না। আমি অবশ্য ক'বছর পরেই প্রফেশ্যনাল বোর্ডে অভিনয় করতে আসি। কিন্তু ধীরেন অঙ্কের হিসেবে সিনিয়ারিটি পেয়ে গেল। অভিনয়টা ও মোটামুটি করত। কিন্তু গান যা গাইত। অপূর্ব, অপূর্ব! মা সরস্বতী যেন ওঁর কণ্ঠে সব সময়ে ভর করে থাকতেন। আর এটাই ওর কাল হল। ওকে বেছে বেছে সেই সব চরিত্র দেওয়া হত যার মুখে গান আছে। ওইসব চরিত্রে আবার অ্যাকটিংয়ের স্কোপ তেমন থাকত না। ফলে গায়ক হিসেবে ধীরেনের যতটা নাম হল, অভিনেতা হিসেবে তার সিকির সিকিও হল না। অথচ আমি জানি, আমরা তো একসঙ্গে অনেকবার অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করেছি, ধীরেন খুব ভালো অ্যাকটিং করতে পারত। দেখতেও তো ভারি সুন্দর ছিল। একেবারে রাজপুত্তুরের মতো। তেমন অ্যাকটিংয়ের স্কোপ পেলে ও বাংলা থিয়েটারের একজন ভালো নায়ক হয়ে যেতে পারত।

ধীরেন দাস সম্পর্কে সন্তোষদার মুখে এইসব কথা আমি শুনেছিলাম তাঁর রূপবাণী সিনেমার ফ্ল্যাটে বসে। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে অতীত দিনের স্মৃতিচারণা শুনতে যেতাম। ১৯৬১ সালে ধীরেনবাবুর মৃত্যুর পর সন্তোষদা যে কতটা আঘাত পেয়েছিলেন সেটা বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর কথা শুনতে শুনতে। মাঝে মাঝেই তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠছিল। কোঁচার খুঁট দিয়ে তিনি চোখ দুটো মুছে নিচ্ছিলেন। ওঁদের বন্ধুত্ব যে কতটা প্রগাঢ় ছিল তা ধীরেন দাসের মৃত্যুর বারো বছর পরেও সন্তোষদার সজল দুটো চোখ দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি।

ধীরেন দাসের কোন নাটকের অভিনয় আমি দেখিনি। হয়তো বাল্যকালে দেখেও থাকতে পারি, কিন্তু তার কোন স্মৃতি আমার ভাণ্ডারে জমা নেই। তবে তাঁর কথা এতজনের কাছে এতভাবে শুনেছি যে সেইগুলিই স্মৃতি হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর কথা শুনেছি দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে। শুনেছি আমার অগ্রজ সংগীত বিশেষজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্রের কাছে। রাজ্যেশ্বরবাবু যখন 'শার্ঙ্গদেব' নামে দেশ পত্রিকায় সংগীত সমালোচনা করতেন তখন কথা প্রসঙ্গে ধীরেন দাসের গানের কথা বার বার আলোচিত হয়েছে। আমি তাঁকে সাধারণ বাংলা গান এবং নজরুলগীতির শিল্পী হিসেবে জানতাম। কিন্তু তিনি যে এককালে রবীন্দ্রসংগীতেরও রেকর্ড করেছেন, সে কথা জেনে অবাক হয়েছি। তিনিই প্রথম কাজি নজরুলকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নজরুলের বিখ্যাত দুটি গান 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' এবং 'আর কোথায় লুকাবি মা কালী', তার সুরও করেছিলেন

ধীরেন দাস। রাজ্যেশ্বরবাবুর মুখে ওই তথ্য শুনে আমি বিশেষ পুলকিত হয়েছিলাম। কারণ ওই দুটি গান আজও আমার প্রিয়তম গানের তালিকার অন্তর্গত।

সিনেমায় ধীরেন দাসের অভিনয়ের কথা মনে আছে আমার। তবে তার সবগুলিই গায়কের চরিত্র। কোথাও তিনি নারদ, কোথাও ধার্মিক ভিক্ষুক, কোথাও বা বিবেক। ওইসব চরিত্র দেখে তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীকালে সেটা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছিল অনুপবাবুর কাছে তাঁর বাবার কথা শুনে। নিজে বড় অভিনেতা হতে পারেননি বলে হয়তো একটা বেদনা ছিল ধীরেনবাবুর মনে। তাই তাঁর মধ্যম পুত্র অনুপকুমার যখন শৈশবেই অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে গেল তখন তিনি তাতে সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি বাড়িতে বসে হাতে ধরে ধরে অনুপবাবুকে অভিনয় শিখিয়েছেন। চরিত্র বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছেন। কোন্ সংলাপের কী উচ্চারণ হবে, কী ভাবে স্ক্যানিং হবে, তার খুঁটিনাটি শিখিয়েছেন।

একবার এক জায়গায় অভিনয় করে অনুপবাবু প্রচুর হাততালি পেলেন। মনটা খুশি খুশি। ভাবলেন, বাড়িতে এসে শেষ হাততালিটা বাবার কাছেই পাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল উল্টো। একেবারে উল্টো। সে কথায় পরে আসছি।

এতদিন পরে অনুপকুমারের আসল বয়সটি জানা গেল। সেই ষাটের দশক থেকে বহুবার চেষ্টা করেছি অনুপকুমারের বয়স জানবার। কিন্তু উনি অদ্ভুত কায়দায় প্রতিবারই এড়িয়ে যেতেন আমার প্রশ্নটা। বুঝতে পারতাম মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু কতটা বেলা হয়েছে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। ঠারে-ঠোরে নানা ভাবে জানতে চেয়েছি, কিন্তু কোনবারই সফল হইনি। বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন করলেই অনুপবাবু বলতেন : শিল্পীর আবার বয়েস কী! শিল্পীদের কখনও বয়েস হয় না। তাঁরা হলেন দেবতাদের মতো। দেবতাদের কি বয়েস বাড়ে-কমে? শিবঠাকুর বা কেষ্টঠাকুরের বয়েস কত তুমি বলতে পারবে?

এ তো মহা বিপদে পড়া গেল। জানতে চাইলাম ওঁর বয়স, আর উনি কিনা আমাকে শিবঠাকুর আর কেষ্টঠাকুর দেখিয়ে দিলেন! জীবনে অনেক শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গত করেছি, কিন্তু অনুপকুমারের মতো এমন হাড়-বজ্জাত দ্বিতীয়টি দেখিনি। একটু সুযোগ পেলেই হেনস্থার চূড়ান্ত করে ছাড়বেন। আর সবটাই হাসতে হাসতে এবং হাসাতে হাসাতে।

আসলে অনুপবাবুর আসল বয়েসটা জানার কৌতূহল ছিল অন্য কারণে। পরিচয়ের শুরু থেকেই আমি অনুপবাবুকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করি। কিন্তু উনি নির্বিকারভাবে আমাকে 'তুমি তুমি' করে যান। আর এমন একটা গ্রাম্ভারি চালে কথাবার্তা বলেন, যেন মনে হবে উনি আমার ঠাকুর্দার বয়েসি। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে চিপটেন কেটে কেটে আমাকে ডাকতেন 'খোকাবাবু' বলে। ওঁর এই গ্রাম্ভারি ভাবটার জন্যেই ওঁর সত্যিকারের বয়েসটা আমার জানা দরকার ছিল।

সেটা এই এতদিন বাদে জানতে পারলাম। আর জানতে পারলাম এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। একটা ঘটনায় অনুপবাবুকে আমি কিছুটা রাগিয়ে দিতে পেরেছিলাম। আর তারই ফলশ্রুতিতে উনি ওঁর আসল বয়সটা গড় গড় করে আমার কাছে বলে ফেললেন।

সেই ঘটনাটা যে কী, সেটা বলবার আগে মুখবন্ধ হিসেবে বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রসিকচূড়ামণি গোপাল ভাঁড়ের জীবনের একটা টুকরো কাহিনী বলে নিতে চাই। সে কাহিনীটা এইরকম।

সবাই জানেন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাসদ ছিলেন গোপাল ভাঁড়। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির কারণে তিনি মহারাজার প্রিয়পাত্রের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকবার অনেক বিপদ থেকে গোপাল ভাঁড় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাঁচিয়েছেন।

সেবারে মহারাজার সভায় এক বিচিত্র ব্যক্তি এলেন। তিনি সর্বভাষায় পারঙ্গম। যে কোন ভাষাতেই অনর্গল কথা বলতে পারেন। তাঁকে মহারাজা একবার জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ মশায়, আপনার মাতৃভাষা কোনটি?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন : সেটা আমি আপনাকে বলব না। আপনার সভায় তো অনেক জ্ঞানী-গুণী

ব্যক্তি আছেন বলে শুনেছি। তাঁদেরই কাউকে বলুন না, আমার মাতৃভাষা কী সেটা খোঁজ করে বার করে দিতে।

এটা তো মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদদের প্রতি রীতিমত চ্যালেঞ্জ। মহারাজা সভাসদদের ডেকে বললেন : আপনারা যদি খোঁজ করে বার করতে না পারেন যে ওই ভদ্রলোকের মাতৃভাষা কী, তাহলে তো আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। নবদ্বীপের মান-সম্মান আর কিছুই থাকবে না। সবাই বলবে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অজস্র অর্থ ব্যয় করে এমন একপাল সভাসদ পুষছেন, যাদের কোন যোগ্যতা নেই। এটা কি আপনাদেরই শুনতে ভালো লাগবে! তার চেয়ে আপনারা খোঁজ করে বার করুন ওই ব্যক্তির মাতৃভাষা কী? যিনি পারবেন তাঁকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব।

সম্মানহানির ভয়ে না হলেও পুরস্কারের লোভে অনেকেই উঠেপড়ে লাগলেন সেই ভদ্রলোকের মাতৃভাষা খুঁজে বার করতে। কিন্তু ভদ্রলোক গভীর জলের মাছ। কিছুতেই তাঁকে ধরাছোঁয়া গেল না। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলুগু—সব ভাষাতে তাঁর সঙ্গে কথা বলেও বোঝা গেল না কোনটি তাঁর মাতৃভাষা। যে ভাষাতেই কথা বলা যায়, মনে হয় সেটাই তাঁর মাতৃভাষা। কিন্তু তা তো আর হতে পারে না।

একে একে সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। দিনে দিনে মহারাজার মাথা হেঁট হতে থাকে। ভদ্রলোক কোন কথা না বলে মহারাজার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকেন। মহারাজার হেঁট মাথা তাতে আরও হেঁট হয়ে যায়।

অবশেষে মহারাজা গোপাল ভাঁড়ের শরণাপন্ন হলেন। বললেন : গোপাল, তুমি তো অনেকবার আমাকে অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। এবারেও দেখো না চেষ্টা করে। না হলে তো মান-সম্মান আর থাকে না।

গোপাল বললেন : বলেন কী মহারাজ! আপনার এত বড় বড় পণ্ডিত সভাসদরা যেখানে হালে পানি পেলেন না, সেখানে আমার মতো একজন মুখ্যু মানুষ কী করবে বলুন দেখি!

মহারাজা বললেন : তুমি আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না গোপাল। দেখছ আমার মান-সম্মান যেতে বসেছে, অন্যান্য রাজারা ইতিমধ্যেই নবদ্বীপের নামে ছি-ছিক্কার করতে শুরু করেছে, তার ওপর তুমিও ঠাট্টা করতে শুরু করলে! তোমার মধ্যে কি দেশপ্রেম বলে কিছু নেই!

মহারাজার কথা শুনে গোপালের আঁতে ঘা লাগল। তিনি বললেন : ঠিক আছে মহারাজ! আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আপনি আমাকে তিনটে দিন সময় দিন। পারব কি না জানি না, তবে যদি পারি তাহলে আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে মঞ্জুর করতে হবে।

মহারাজ বললেন : কী প্রার্থনা বলো গোপাল। যদি ওই লোকটির মাতৃভাষা খুঁজে বার করতে পারো তবে তুমি যা চাইবে তাই দেব।

গোপাল বললেন : অমন কথা বলবেন না মহারাজ। আমি গরিব মানুষ, লোভে পড়ে হয়তো আপনার রাজসিংহাসনটাই চেয়ে বসতে পারি। তার চেয়ে আপনি প্রতিশ্রুতি দিন যে সফল হলে আমাকে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন!

গোপালের কথা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটু চমকে উঠলেন। বললেন : পুরস্কারের অঙ্কটা বেশি হয়ে গেল না গোপাল?

গোপাল বললেন : আপনি দিনে দিনে বড় কঞ্জুষ হয়ে যাচ্ছেন মহারাজ। রূপকথার যুগে রাজা-রাজড়ারা সামান্য একটা কাজের জন্যে অক্লেশে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দান করে দিতেন। আমি তো সে তুলনায় কিছুই চাইনি মহারাজ।

মহারাজা বললেন : তা নয়। তবে রাজকোষের অবস্থা তো বিশেষ ভাল নয়, তাই একটু চিন্তা করতে হচ্ছে। তবে তুমি যখন দাবি করছ তখন তা আমায় দিতেই হবে। ধন আগে না মান আগে। কিন্তু আমারও একটি শর্ত আছে গোপাল।

গোপাল বললেন : আজ্ঞা করুন মহারাজ। বলুন কী আপনার শর্ত?

মহারাজা বললেন : তুমি যদি ওই ব্যাপারে কৃতকার্য না হতে পারো তবে তোমাকে শাস্তি পেতে

হবে।

গোপাল বললেন : বলুন কী শাস্তি দিতে চান আপনি?

মহারাজা বললেন : প্রাণদণ্ড!

গোপাল বললেন : তাই হবে। শাস্ত্রে আছে, লোভে পাপে, পপে মৃত্যু। আমি লোভ করেছি, তার ফল তো আমায় ভোগ করতেই হবে।

এই বলে গোপাল চলে গেলেন। সেদিন থেকে তিনি লক্ষ্য রাখতে লাগলেন লোকটি কোথায় যায়, কী করে, কার কার সঙ্গে দেখা করে। দুটো দিন লোকটিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করলেন গোপাল। রহস্যজনক কিছুই খুঁজে পেলেন না। লোকটি নিয়ম করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যায়। তারপর বাড়িতে ফিরে খায় দায় ঘুমোয়। কেবল বিকেলের দিকে নদীর ধারে একবার বেড়াতে যায়। সন্ধে হবার পর ফেরে।

নবদ্বীপের রাস্তায় তখন বিশেষ আলো-টালো ছিল না। সন্ধের পর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যায়। গোপাল তৃতীয় দিন সন্ধের মুখে মুখে লোকটি যে পথ দিয়ে নদীর দিক থেকে ফেরে সেই পথে রাস্তার একটি বাঁকে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পরে লোকটি যখন ফিরছেন তখন গোপাল বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে সবেগে একটি ধাক্কা দিলেন তাঁকে। আচমকা ধাক্কা খেয়ে লোকটি রাগত স্বরে বলে উঠলেন : সঁড়া অন্ধা!

ব্যস ওই কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে গোপাল গা ঢাকা দিলেন। লোকটি অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারলেন না, কে-ই বা তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, আর কী-ই বা তার উদ্দেশ্য।

পরের দিন যথারীতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বসেছে। সেই লোকটিও সেখানে উপস্থিত আছেন। এমন সময় গোপাল সেখানে এসে হাজির। গোপালকে দেখে মহারাজা বললেন : গোপাল, তোমার প্রার্থিত তিন দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তুমি কি জানতে পেরেছো ওই ভদ্রলোকের মাতৃভাষা কী?

গোপাল বললেন : আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। ওই ভদ্রলোক উড়িষ্যার অধিবাসী। ওঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া।

মহারাজা তখন সেই ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই ভদ্রলোক নীরবে জানালেন, গোপালের কথাই যথার্থ।

এইভাবে সেদিন নবদ্বীপের সম্মান বেঁচেছিল। আর গোপাল ভাঁড় পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

গোপাল ভাঁড়ের এই কাহিনীটি যে এমন সবিস্তারে বললাম, তারও একটি কারণ আছে। গল্পে বর্ণিত ব্যক্তিটি যেমন রাগের মাথায় 'সঁড়া অন্ধা' বলে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনি রাগের মাথাতেই অনুপকুমার তাঁর নিজের বয়সটি কবুল করে ফেললেন, যা গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অনেক চেষ্টাতেও আমি করাতে পারিনি। আর অনুপবাবুর সেই রাগোদ্রেকের জন্য আমি কোন পরিকল্পনাপ্রসূত চেষ্টা করিনি। ওটা হঠাৎই ঘটে গেছে আমার পরিবেশিত একটি তথ্যগত ভুলের কারণে। অনুপবাবু সম্পর্কে লেখার প্রথম কিস্তিতে আমি সেই ভুলটি করে ফেলেছিলাম। সেটা জানলাম ক'দিন আগে অনুপবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর। যদিও সেই ভুলটি আমি সংশোধন ককবে নিয়েছি এই পুস্তকের ক্ষেত্রে।

সেদিন সকালে একবার অনুপবাবুর দক্ষিণ কলকাতার গ্রোভ লেনের আস্তানায় গিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম অনুপবাবু অসুস্থ। তাঁর গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। তিনি ভালো আছেন, তবে কাজকর্ম করছেন মেপে মেপে। খবরটা শুনে মনটা একটু উদ্বিগ্ন ছিল।

সেদিন সকালে গিয়ে দেখলাম অনুপবাবু আর ওঁর স্ত্রী অলকা গাঙ্গুলি চা পান করছেন স্টার টিভি-র প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে। অলকার সঙ্গে তার আগে আমার চাক্ষুস পরিচয় ছিল, কিন্তু তেমন কোন হার্দ্য পরিচয় ঘটেনি। তবে মনে মনে আমি ভদ্রমহিলাকে শ্রদ্ধা করতাম। সেটা উনি একজন কুশলী অভিনেত্রী বলেই কেবল নয়, অনুপকুমারের মতো একজন প্রায়-ছন্নছাড়া মানুষকে উনি গৃহী করতে পেরেছেন বলে। তাঁকে একটি সন্তান উপহার দিতে পেরেছেন বলে। ভেবে রেখেছিলাম, সুযোগ পেলে একদিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আন্তরিকভাবে আলাপ পরিচয় করব। সাংবাদিকদের পেশাদারি আলাপ-

পরিচয় না, তার চেয়েও বেশ খানিকটা এগিয়ে সহমর্মিতার পরিচয়।

তা সেদিন সেই সুযোগটা পেয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে আধ ঘণ্টা কী তিন কোয়ার্টার কথাবার্তা বলবার পর অনুপবাবু বেরিয়ে গেলেন ওঁদের যে শিল্পায়ন নামক গ্রুপটি আছে তারই জরুরি কাজে। সুতরাং অলকার সঙ্গে আমার একান্ত আলাপচারিতার একটা সুযোগ এসে গেল। এবং ভদ্রমহিলা এতই মনখোলা যে ওই স্বল্প অবকাশেই তাঁর হৃদয়ের অনেক গোপন ও গভীর কথা আমার কাছে প্রকাশ করে ফেললেন। সেসব কথায় পরে আসছি। অনুপবাবুর পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করতে গেলে অলকার কথা আসবেই। তবে সেটা যথা সময়ে। তার আগে সেদিনকার সকালের ঘটনাটা বলে নিই।

অনুপবাবুর বসার ঘরে আমি ঢুকতেই তিনি বলে উঠলেন : তোমার লেখায় একটা মারাত্মক ভুল আছে। জ্ঞানেশ মুখার্জিকে আমি কখনও জ্ঞানেশদা বলে ডাকি না। ডাকি জ্ঞানেশ বলে। আমি ওর থেকে সিনিয়র।

আমি বললাম : তাই নাকি! অনেকদিনের ব্যাপার তো! কী বলে ডাকতেন ঠিক স্মরণে নেই। তবে বয়সে ছোট কিংবা বড় প্রচুর মানুষ জ্ঞানেশ মুখার্জিকে জ্ঞানেশদা বলেই ডাকে। কেন তা জানি না। হয়তো ওঁর গাম্ভীর্য আর হৃষ্টপুষ্ট চেহারার জন্যে। তাই ভুলটা করে ফেলেছি। আমার তো সব সময়েই মনে হত আপনি জ্ঞানেশবাবুর চেয়ে বয়সে ছোট।

অনুপবাবু বললেন : আজ্ঞে না স্যার। আমি জ্ঞানেশের চেয়ে বড়।

আমি বললাম : তা হতে পারে। আমি তো আপনার জন্মের সাল-তারিখ জানি না। কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু আপনি কেবল পাশ কাটিয়ে গেছেন এটা-সেটা বলে।

অনুপবাবু বললেন : তাই নাকি? বলিনি বুঝি! তা আজ বলছি। লিখে নাও। আমার জন্ম ১৯৩০ সালের ১৭ই জুন।

দেখুন কাণ্ড! আমার জন্ম ১৯২৭ সালে। উনি আমাকে নাম ধরে ডাকেন। তুমি-তুমি করেন। জ্ঞানেশ মুখার্জির জন্ম ১৯২৬ সালে। উনি নাকি তাঁর থেকেও সিনিয়র! একে যদি ঘোর কলিকাল না বলা হয় তাহলে কাকে বলব?

তবে একদিক থেকে সত্যিই অনুপবাবু আমার আর জ্ঞানেশবাবুর থেকেও সিনিয়র। ১৯৩৪ সালে অনুপকুমার যখন ডি-জি অর্থাৎ ধীরেন গাঙ্গুলির 'হাল বাংলা' ছবিতে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করতে আসেন, তখন আমি কিংবা জ্ঞানেশবাবু পাততাড়ি বগলে পাঠশালায় যাচ্ছি। আমি একদা সাংবাদিকতা করতে আসব, কিংবা জ্ঞানেশবাবু অভিনয়টাকে যে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন সেটা বোধহয় স্বয়ং বিধাতাপুরুষও তখন ঠিক করে উঠতে পারেননি। সুতরাং অনুপবাবু যে আমাদের সকলের থেকে সিনিয়র এবং সেই সুবাদে জ্যাঠামশাই অথবা ঠাকুর্দার মতো ব্যবহার করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

তবে সেদিন নিজের আসল বয়সটি যে অনুপবাবু রাগের মাথায় কবুল করে ফেললেন আমার লেখাটা পড়ে, তাতে ওই ঘটনার সঙ্গে আমি গোপাল ভাঁড়ের 'সাঁড়া অন্ধ'-র ঘটনাটির মিল খুঁজে পেয়েছি। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর যা পারিনি, সেদিন যদি অনুপবাবু রেগে না যেতেন তাহলে তাও পারতাম না। সেই জন্যেই গোপাল ভাঁড়ের গল্পটি সবিস্তারে বলা।

কিন্তু এই যে কথায় কথায় রঙ্গ রসিকতা, এটা অনুপবাবুর বহিরঙ্গ। ভেতরে ভেতরে উনি ভয়ানক সিরিয়াস এবং রুচিশীল মানুষ। প্রথম যেদিন ওঁর মধ্যেকার সিরিয়াসনেসের পরিচয় পেয়েছিলাম, সেদিন আমি কম অবাক হইনি।

তখন অনুপবাবু স্টার থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করছেন। থিয়েটার ডে-তে ওঁর সঙ্গে রেগুলার দেখা হয়। যথারীতি আড্ডা-টাড্ডা হয়। একদিন উনি আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন : তোমার সন্ধানে ভালো স্যাটায়ার গল্প কিছু আছে? স্ল্যাপস্টিক কমেডি নয়। একটু সিরিয়াস ধরনের স্যাটায়ার স্টোরি। আছে কিছু?

তার কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ তাঁর লেখা একটা স্যাটায়ার স্টোরির আউটলাইন আমাকে শুনিয়েছিলেন। কুমারেশবাবু বাংলার রসসাহিত্যিকদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। ওঁর সম্পাদনায় 'যষ্টিমধু' পত্রিকাটি আমার খুব প্রিয়। একটা সময়ে এই 'যষ্টিমধু' পত্রিকার দারুণ

রমরমা ছিল। এমন ওয়েল-এডিটেড পত্রিকা আমি খুব কম দেখেছি। পত্রিকার প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পাঠ্য এবং উপভোগ্য। বিশেষ করে সিনেমার সমালোচনাগুলি। দু'লাইন কিংবা তিন লাইনের সমালোচনা। কিন্তু কী অসাধারণ তার ব্যঞ্জনা। ওই দু-তিন লাইনের মধ্যে ছবির ভালো-মন্দ সব বলে দেওয়া আছে। মনে হয় আর একটি অতিরিক্ত শব্দেরও দরকার নেই।

'যষ্টিমধু' পত্রিকার সেই রমরমা এখন আর নেই। পত্রিকাটি কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এই মাত্র। কুমারেশবাবুরও প্রচুর বয়স হয়েছে। তিনিও আর পত্রিকার পেছনে সেভাবে সময় দিতে পারেন না। এমন কোন সহকারীও ওঁর আশেপাশে নেই যাদের নিয়ে কুমারেশবাবু নতুন করে যুদ্ধযাত্রা শুরু করতে পারেন।

অনুপবাবুর কথা শুনে আমার কুমারেশবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। অনুপবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি ছবি করতে চান?

অনুপবাবু বললেন : আমি নয়, আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ফিনান্স করবেন। তিনি স্যাটায়ার ছবি করতে চান। অন্য ধরনের ছবি তাঁর পছন্দ নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি ডাইরেকশান দেবেন?

অনুপবাবু বললেন : তোমাদের সাংবাদিকদের ওই একটা বড় দোষ। বড্ড পুলিশের মতো জেরা করো। আমি ডিরেকশান দেব কী প্রোডাকশন দেখব সেসব তো অনেক পরের কথা। তার আগে তোমার সন্ধানে কোন গল্প আছে কি না তাই বলো।

আমি তখন অনুপবাবুকে কুমারেশ ঘোষের কথা বললাম। কুমারেশবাবুর নাম শুনে অনুপবাবু উৎসাহিত হলেন বলে মনে হল। জিজ্ঞাসা করলেন : কুমারেশবাবু থাকেন কোথায়?

আমি বললাম : গড়পারে।

অনুপবাবু বললেন : তাহলে তুমি ওঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো।

আমি বললাম : উইক-ডে'তে তো কুমারেশবাবুর একটু অসুবিধা আছে। রবিবার দিন হলে ওঁর পক্ষে সুবিধা হয়।

আমরা যেদিন এসব কথা বলছিলাম, সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। অনুপবাবু বললেন : তাহলে সামনের রবিবার দিনই যাতে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায়, সেটা চেষ্টা করে দেখো।

আমি বললাম : তা কেমন করে হবে। রবিবার তো আপনার ডবল্ শো আছে।

অনুপবাবু বললেন : তা থাকলেই বা! সকাল ন'টা কিংবা দশটার সময় আমরা বসতে পারি। বড় জোর ঘণ্টা তিনেক লাগবে। তারপর সোজা থিয়েটারে চলে আসব। সেদিন না হয় বাইরেই খেয়ে নেব।

আমি বললাম : এই রবিবার কুমারেশবাবু ফ্রি আছেন কি না তা তো জানি না। যদি সামনের রবিবার উনি সময় দেন?

অনুপবাবু বললেন : না না, এই রবিবারেই করো। এটা তো একটা ঝোঁকের ব্যাপার। যিনি টাকা দেবেন তাঁর ঝোঁক উঠেছে। দেরি করলে ঝোঁকটা চলে যেতে পারে। পয়সাওলা মানুষদের মতিগতি কখন কী থাকে তা কি বলা যায়!

তা আমি তৎক্ষণাৎ স্টার থিয়েটার থেকে গড়পারে গিয়ে কুমারেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। ব্যাপারটা শুনে উনি খুব খুশি হলেন। বললেন : ঠিক আছে। আমি রবিবার সকালে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

আমি আবার তক্ষুনি গিয়ে অনুপবাবুকে খবরটা দিলাম স্টার থিয়েটারে। কথা রইল রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ আমি বিবেকানন্দ রোড আর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ে অপেক্ষা করব। অনুপবাবু ওঁর পাইকপাড়ার বাড়ি থেকে ওখানে চলে আসবেন। তারপর দুজনে মিলে গড়পারে যাব।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে অনুপবাবু এলেন। ফিল্মস্টারদের কিছু কিছু মার্কামারা পোশাক থাকে। বেশ ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। গলায় আর বুকে কাজ করা। কিন্তু অনুপবাবুর সেসব কোন বালাই নেই। অতি সাধারণ পোশাক পরেই তিনি এলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন তিনি নীল রঙের টুইডের একটা ফুলশার্ট পরেছিলেন। হাত দুটো গোটানো। যদিও আমি মনে মনে চেয়েছিলাম অনুপবাবু আদ্দি-

টাঙ্গি পরে ফুলবাবু সেজে আসুন। একজন ফিল্মস্টারের সঙ্গে চলাফেরা করব, রাস্তার লোকজন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে, ওই অল্প বয়সে সেটাই আমার কাম্য ছিল। কিন্তু অনুপবাবুকে কোনদিনই সাজগোজ করতে দেখলাম না। আনুপবাবুর দীর্ঘদিন যে বিয়ে-থা হয়নি, তারও কারণ বোধহয় ওটাই। ওরকম সাদামাটা পোশাক পরা ফিল্মস্টারকে কে বিয়ে করবে!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে অনুপবাবুর সঙ্গে অলকা গাঙ্গুলির বিয়ে হল, তার পিছনেও ওই পোশাক। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। সে ঘটনায় পরে আসছি।

অনুপকুমারের অভিনয় জীবনের পঞ্চাশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমাদের এই বাংলাদেশে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। বাংলা ছায়াছবিতে একটানা অভিনয়ের এরকম একটা হাফ-সেঞ্চুরি আর কেউ করতে পেরেছেন কি না তা আমার জানা নেই। এখনও তিনি অভিনয় করে চলেছেন। এবং সসম্মানে। ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা চলে, স্টিল নট আউট।

অভিনয়ের এই পঞ্চাশ বর্ষপূর্তির সম্মাননা অনুপকুমারের বসার ঘরের সর্বত্র সাজানো। ছোট বড় মাঝারি কত প্লাক্ আর সার্টিফিকেট তাঁর বসার ঘরের চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছে। কত প্রতিষ্ঠান যে তাঁকে এই সম্মান জানিয়েছেন তার হিসেব রাখা মুশকিল। অনুপকুমারের ঘরে বসে ওইসব স্মারকগুলির দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা গর্বে আর গৌরবে ভরে উঠেছিল সেদিন।

সেই সঙ্গে একটি প্রশ্নও আমার মনে আলোড়ন তুলেছে। এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের বাংলা ছবির প্রযোজক আর পরিচালকরা ক'টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দিতে পেরেছেন অনুপকুমারকে? এতবড় একজন শিল্পী, যিনি কি কমেডি আর কি ট্রাজেডি দুই ধরনের চরিত্রেই সমান দক্ষ, সারা জীবন স্মরণে রাখার মতো কটি চরিত্র তিনি পেয়েছেন? অনেক হিসেব কষলেও দশ-পনেরোটির বেশি কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই বিশ্লেষণে পরে আসছি। তাব আগে সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের বাড়িতে সেই স্ক্রিপ্ট পড়ার ঘটনাটা বলে নিই।

কুমারেশবাবুর গড়পারের বাড়িতে সেদিন আমরা ঘণ্টা আড়াইয়ের মতো ছিলাম। কুমারেশবাবু বেশ দরদ দিয়ে স্ক্রিপ্টটা পড়েছিলেন। ঠিক স্ক্রিপ্ট বলব না, কাহিনীটাকে উনি নাটকের আকারে সাজিয়েছিলেন। ধর্মরাজ যমকে নিয়ে কাহিনী। সারা পৃথিবীর পাপ-পুণ্যের বিচার যিনি করেন সেই ধর্মরাজ যমের জীবনটা যে কত ট্র্যাজিক সেটাই কাহিনীতে দেখিয়েছিলেন কুমারেশবাবু। কিছুটা সিরিও-কমিক, তার সঙ্গে স্যাটায়ারের সংমিশ্রণ। শুনতে মন্দ লাগছিল না। একটা সিকোয়েন্স তো আমার খুবই ভালো লেগেছিল। ভাইফোঁটার দিন যমের বোন যমুনা দাদাকে ফোঁটা দিচ্ছে, আর ঠিক সেই সময়ে একরাশ কাঁটা এসে পড়ছে যমের সামনে রাখা মিষ্টির থালায়। হবেই তো। পৃথিবীর সব বোনেরা যে তখন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেবার প্রার্থনা করছে।

স্ক্রিপ্টটা শুনতে শুনতেই বুঝতে পেরেছিলাম, এই কাহিনী নিয়ে ছবি করার অসুবিধে আছে। কিন্তু অনুপবাবু তো অতিশয় ভদ্র। স্ক্রিপ্ট পড়া শেষ করে কুমারেশবাবু যখন জানতে চাইলেন কেমন লাগল, তখন অনুপবাবু বললেন : আমাকে দু-একটা দিন ভাবতে সময় দিন। পরে আপনাকে জানিয়ে দেব।

ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে অনুপবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এটা নিয়ে ছবি হবে? তুমি কী বল?

আমি বললাম : না হবে না। সেটা আমি কুমারেশবাবুকে জানিয়েও দিয়েছি।

অনুপবাবু বললেন : এত তাড়াতাড়ি না জানালেই হত। আমি তো দু-একদিন সময় চেয়ে নিয়েছিলাম।

আমি বললাম : কী দরকার দু-একদিন ঝুলিয়ে রেখে। তখন তো এই কথাটাই জানাতে হত। অতএব শুভস্য শীঘ্রম।

অনুপবাবু বললেন : আমরা এই কাহিনী নিয়ে ছবি করতে পারব না, এটা কি একটা শুভ ব্যাপার হল ওঁর কাছে?

আমি বললাম : কুমারেশবাবু অনেক উচ্চ মার্গের মানুষ। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিক্যাল। উনি ওসব শুভাশুভের অনেক ঊর্ধ্বে।

অনুপবাবু একটু হেসে বললেন : এইজন্যেই তো তোমাকে এত ভালো লাগে।

অনুপবাবু শিশুশিল্পী হিসেবে প্রথম যে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, ডি-জি পরিচালিত সেই 'হাল বাংলা' ছবিটি আমি দেখিনি। ওঁর যুবক বয়সের প্রথম ছবি অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'সংগ্রাম' আমি দেখেছি, কিন্তু অনুপবাবু কোন রোল করেছিলেন, সেটা আমার মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। অনুপকুমার দাসকে তখন শিল্পী হিসেবে কেই বা চেনে! তবে ওই ছবিতে বিপিন মুখোপাধ্যায় নামে একজন অভিনেতার কথা আমার বেশ মনে আছে। তিনি আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের মতো মেকআপ নিয়েছিলেন। ওই ছবিটা ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে দেখি। ভাগ্যিস তখন দেখে নিয়েছিলাম, নইলে আর দেখাই হত না। কারণ ১৬ আসস্ট থেকে সারা কলকাতা জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের বীভৎস দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল জিন্না সাহেবের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' জিগিরের জের হিসেবে। সেসব দিনের কথা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, আর পলিটিশিয়ানদের ওপর ঘেন্না হয়।

অনুপকুমারকে আমার প্রথমে নজরে পড়ে ১৯৪৭ সালে মুক্তি পাওয়া 'মুক্তির বন্ধন' ছবিতে। তবে সেটা অভিনয়ের জন্য নয়। অন্য কারণে। কারণটা হল উনি ওই ছবির একটি দৃশ্যে 'সব পেয়েছির আসর'-এর ফেস্টুন বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মণিমেলার সদস্য হিসেবে দৃশ্যটি আমার আদৌ চোখরোচক হয়নি। তখনকার দিনে শিশুদের নিয়ে দুটি সংস্থা খুব বিখ্যাত ছিল। একটি 'মণিমেলা', যার পৃষ্ঠপোষক ছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। অপরটি 'সব পেয়েছির আসর', যার পৃষ্ঠপোষক যুগান্তর পত্রিকা। প্রথমটির পরিচালক ছিলেন বিমল ঘোষ, যাঁর ছদ্মনাম মৌমাছি। আর দ্বিতীয়টির পরিচালক অখিল নিয়োগী, যাঁর ছদ্মনাম স্বপনবুড়ো। ওই দুটি মানুষের মধ্যে হৃদ্যতার অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দুটি শিশু সংস্থার সদস্যদের মধ্যে মানসিক রেষারেষি ছিল। দুটি দলের মধ্যে কর্মকুশলতা প্রদর্শনের তীব্র প্রতিযোগিতা চলত, তবে সেটা কোনও সময়েই অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নেমে আসেনি। পরবর্তীকালে আমার ছেলেমেয়েরা আমাদের হাউসিং-এ 'মুকুলিকা সব পেয়েছির আসর'-এর সঙ্গে ঘোরতর ভাবে যুক্ত থেকে কাজকর্ম করেছে। কিন্তু আমি চিরকালই মনেপ্রাণে মণিমেলা থেকে গেছি। অনেকটা সেই বৃদ্ধ পিতা মোহনবাগান আর তাঁর ছেলেরা ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টারের মতোই ব্যাপার আর কী!

যুবক বয়সে বিমল ঘোষ এবং অখিল নিয়োগী দু'জনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বিমলদা ভালো অভিনয় করতে পারতেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সাহিত্যিকদের অভিনয় করা 'ভাড়াটে চাই' নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আর অখিলদা অভিনয় করতেন কিনা আমি জানি না। তাঁর কোনও অভিনয় আমি দেখিনি। তবে তাঁর বহু লেখা ছেপেছি আমার সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে। তাঁর গড়পারের বাড়িতে বহুবার গেছি। মানুষটি বড় ভালো ছিলেন।

এই অখিল নিয়োগীই ছিলেন 'মুক্তির বন্ধন' ছবির পরিচালক। আর সেই ছবিতেই অভিনেতা অনুপকুমার আমার প্রথম নজরে পড়েন। অনুপকুমার তখন একজন সিরিয়াস চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন। ওই বছরেই তাঁর অভিনীত আর একটি ছবি দেখি। দেবকী বসু পরিচালিত 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে তিনি প্রতাপের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেন, যেটির বড়বেলার চরিত্রে অভিনয় করেন বোম্বাইয়ের খ্যাতিমান নট অশোককুমার। তাঁর বিপরীতে শৈবলিনী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কানন দেবী। আবার কানন দেবীর ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দীপালি গোস্বামী নামে একটি মেয়ে। দীপালির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ওঁদের শিকদারবাগানের বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি। ওঁর বাবা শচীন গোস্বামীকে আমরা শচীনদা বলে ডাকতাম। দীপালিকে ভারি সুন্দর দেখতে ছিল। মুখখানা রীতিমতো ঢলঢলে। সেই সময়ে অনেকগুলো ছবিতে ও অভিনয় করেছে। ভালো হিরোইন হবার সম্ভাবনা ছিল ওর মধ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। অল্প বয়সেই এমন মেদ জমে গেল শরীরে যে ও আর ভালো চান্সই পেল না। আমাদের বাংলা ছবির অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেরই এই দোষটা আছে। তাঁদের অধিকাংশই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন। ইদানীং এই ভাবনা একটু একটু করে বদলাচ্ছে।

১৯৪৮ সালে অনুপকুমারকে প্রথম নায়ক হিসেবে দেখা গেল কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' ছবিতে। আদ্যন্ত সিরিয়াস চরিত্র। ওই ছবিতে ওঁর নায়িকা ছিলেন ছন্দা দেবী। এক বিপ্লবীর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরের বছর অগ্রদূত

পরিচালিত এম পি প্রোডাকসন্সের 'সঙ্কল্প' ছবিতে অনুপকুমারের অভিনয় দেখতে দেখতে হাপুস নয়নে কেঁদেছিলাম, এ ব্যাপারটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওই বয়সটা তো আমাদের কান্নার নয়। তবু কান্না আটকে রাখতে পারিনি।

এরপরে ধীরে ধীরে অনুপকুমার কমেডির আবর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। ছোটখাট চেহারা, অসম্ভব ফ্রি অ্যাকটিং। কমেডি চরিত্রের পক্ষে একেবারে আইডিয়াল। ওই হাসির চরিত্রে দর্শক তাঁকে দারুণভাবে নিল। ফলে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের প্রশ্ন এসে গেল। অনুপকুমারও অবিচলিত চিত্তে হাসির জোগান দিয়ে যেতে লাগলেন ছবির পর ছবিতে। আর সেসব হাসি মোটা দাগের হাসি। একজন অত্যন্ত সিরিয়াস অভিনেতার মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শোনা যেতে লাগল দর্শকদের দমফাটা হাসির আওয়াজের মধ্যে।

অনুপবাবুকে এই হাসির আবর্তের মধ্যে থেকে যিনি উদ্ধার করলেন, তিনি হলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। আমরা ওঁকে তনুবাবু বলে ডাকি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সকলেই তাই ডাকেন। তনুবাবুরা তখন একটা গোষ্ঠী করে ছবি পরিচালনা করতেন। এই গোষ্ঠীর নাম যাত্রিক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন তরুণ মজুমদার ছাড়াও দিলীপ মুখার্জি এবং শচীন মুখার্জি। এর আগে ওঁরা তিনজনে কানন দেবীর শ্রীমতী পিকচার্সে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের সহকারী ছিলেন। যাত্রিক গোষ্ঠীর প্রথম ছবি উত্তম-সুচিত্রাকে নিয়ে 'চাওয়া-পাওয়া'। দ্বিতীয় ছবি সুচিত্রা এবং সুচিত্রাকে নিয়ে 'স্মৃতিটুকু থাক'। তার মানে সুচিত্রা সেনের দ্বৈত ভূমিকা। এঁরা রীতিমতো হইচই ফেলে দিলেন ওঁদের তৃতীয় ছবি 'কাচের স্বর্গ' করে। নায়ক আর নায়িকা দুজনেই নতুন। তার একজন হলেন যাত্রিক-এর অন্যতম সদস্য দিলীপ মুখার্জি আর নতুন একটি মেয়ে কাজল চ্যাটার্জি। কাজল দেবী পরবর্তীকালে ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্তকে বিয়ে করে কাজল গুপ্ত হয়েছেন। দীনেনবাবু নিজেও এখন পরিচালক।

যাত্রিক-এর আগের দুটি ছবি হিট করেছিল। কিন্তু 'কাচের স্বর্গ' নতুন শিল্পী নেওয়া সত্ত্বেও সুপারহিট। এটা করে তনুবাবুদের মনোবল খুব বেড়ে গেল। এরপর তাঁরা সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'আংটি চাটুজ্যের ভাই' গল্পটি অবলম্বন করে একটি ছবি করা মনস্থ করলেন। চিত্রনাট্যের কাজও সেরে ফেললেন। এই ছবির নায়ক অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের নায়ক তারাপদর চরিত্রের মতো। কবির ভাষায় 'ছিন্নবাঁধা পলাতক সম'। তনুবাবুরাও ছবির নাম দিলেন 'পলাতক'। আর নায়ক হিসেবে নির্বাচন করলেন অনুপকুমারকে।

'পলাতক' হাসির ছবি নয়। বরং ছবিটির পরতে পরতে কান্না জড়ানো। ছবি শেষও হয়েছে চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। এহেন ছবির নায়ক হিসেবে অনুপকুমারকে ভাবা রীতিমতো অস্বাভাবিক ব্যাপারই বটে।

ফলে তনুবাবুদের 'পলাতক' ছবির জন্যে আর প্রযোজক পাওয়া গেল না। স্ক্রিপ্ট যাঁরা শোনেন তাঁদের প্রত্যেকেরই পছন্দ হয়। স্ক্রিপ্ট শুনতে শুনতে চোখের জলে তাঁদের বুক ভেসে যায়। তনুবাবু তো অসম্ভব ভালো স্ক্রিপ্ট পড়তে পারতেন। এমন একটা নাটকীয় ভাব তাঁর পড়ার মধ্যে থাকে যাতে মরা মানুষও জীবন্ত হয়ে ওঠেন স্ক্রিপ্ট শুনতে শুনতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই একটা কথা : এ ছবির নায়ক হিসেবে অনুপকুমার চলবে না। ওঁকে বদলান। তাতে যত টাকা ছবির জন্য লগ্নী করতে হয় করব। অনুপকুমার একজন কমেডিয়ান। তাঁকে কি এই রোলে মানায়!

হ্যাঁ, অনুপকুমার তখন সত্যিই একজন কমেডিয়ান। একের পর এক ছবিতে দর্শককে হাসানোর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন নিষ্ঠাভরে। কিন্তু তনুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন এই মানুষটি তাঁর ভেতরকার সিরিয়াস শিল্পীসত্তাটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দর্শককে হাসিয়ে চলেছেন অভিমানে আর অসহায়তার কারণে। কমেডি রোলে এমনভাবে স্ট্যাম্পড হয়ে গেছেন যে কেউ আর তাঁকে সিরিয়াস রোলে ভাবতেই চান না। অনেকটা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। ভানুদাও সারা জীবন একটা সিরিয়াস চরিত্রের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি।

একের পর এক অনেককে তনুবাবু 'পলাতক'-এর চিত্রনাট্য শোনালেন। কিন্তু সব শেয়ালের এক রা : অনুপকুমার চলবে না।

এই একই কথা শুনতে শুনতে তনুবাবুরও জেদ চেপে গেল। তিনি বললেন : অনুপকুমারকে বাদ

দিয়ে তিনি এ ছবি করবেন না। তাতে যদি তাঁদের ছবির লাইন থেকে আউট হয়ে যেতে হয় তাতেও রাজি। যত দুঃখ, যত কষ্ট আসুক, সব সহ্য করবেন, কিন্তু নিজেদের ভাবনার বিকল্পের সঙ্গে কোনরকম কম্প্রোমাইজ করবেন না।

সেই ১৯৬২ সালের শেষের দিকে তনুবাবু যখন এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ারে তাঁর 'পলাতক' ছবির চিত্রনাট্য শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই মর্মান্তিক সময়ে আমি তনুবাবুর মুখ থেকে চিত্রনাট্যটি শুনেছিলাম। আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকায়। ওই উল্টোরথ অফিসে বসে তনুবাবু অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর চিত্রনাট্যটি শোনালেন। শোনাতে শোনাতে তনুবাবু কাঁদলেন। শুনতে শুনতে আমিও কাঁদলাম। বললাম : এত ইমোশন দিয়ে আপনি যে স্ক্রিপ্ট পড়েন, তাতে আপনার কষ্ট হয় না তনুবাবু?

তনুবাবু বললেন : তা তো হয়ই। কিন্তু কী করব বলুন। আমাদের দেশ তো! এখানে দরজায় দরজায় আর্টের পশরা নিয়ে ফিরি করে বেড়াতেই হবে।

তারপর একটু থেমে তনুবাবু বললেন : এই ছবির নায়ক চরিত্রে আমি যে অনুপবাবুকে ভেবেছি, এ ভাবনাটা কি আমার ভুল?

আমি বললাম : একদম না। আপনি ঠিকই ভেবেছেন। তবে অনুপবাবুকে দিয়ে ঠিক ঠিক করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার। ওঁর ওপর সবটা ছেড়ে দিলে যদি কমেডি করে ফেলেন?

তনুবাবু বললেন : সেটা আমি আটকাতে পারব। আর অনুপবাবুও সেটা করতে যাবেন না। ওই মানুষটা ভেতরে ভেতরে যে ছটফট করছে একটা আউটলেটের জন্যে সেটা আমি অনুপবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি।

শেষ পর্যন্ত তনুবাবু তাঁর শর্তে 'পলাতক' ছবির জন্য একজন প্রযোজক পেলেন। তবে তিনি কলকাতার কেউ নন। বোম্বাইয়ের। ভারতবিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতা ভি শান্তারাম হলেন সেই ব্যক্তি। তাঁর রাজকমল কলামন্দিরের হয়ে ছবিটি করবার অফার পেলেন তনুবাবু।

তবে এই যোগাযোগের নেপথ্যে আর একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ রয়েছেন। তিনি হলেন সুকুমার ঘোষ। সুকুমারদা একটা সময়ে ঘোরতরভাবে সাংবাদিকতা করতেন। আমি এখন যে সংস্থার সভাপতি, সেই বি এফ জে এ অর্থাৎ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুকুমারদা সেই সময়ে শান্তারামদের পরিচালনায় কলকাতায় যে চিত্রগৃহটি আছে, সেই সিনেমায় ম্যানেজারি করতেন। এখন তিনি রক্সি সিনেমার ম্যানেজার এবং ভারত সরকারের ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রেস রিলেশনের ব্যাপারটা দেখেন। আশি বছর অতিক্রান্ত সুকুমারদা এখনও যে কোনও তরুণের চেয়েও সতেজ এবং সচল। তাঁর কর্মক্ষমতা সত্যিই অবাক হয়ে দেখার মতো।

এই সুকুমারদার অনুরোধেই শান্তারামজি 'পলাতক'-এর স্ক্রিপ্ট শুনতে রাজি হলেন। শুনে মুগ্ধ। বললেন : এগিয়ে যাও। যা যা প্রয়োজন সব পাবে। সব রকমের স্বাধীনতাও।

না, কাস্টিং-এর ব্যাপারে শান্তারামজি একটি কথাও বলেননি। তাঁর কাছে অনুপকুমারও যা উত্তমকুমারও তা। তিনি নিজেও তো কোনদিন বিগস্টারকাস্ট নিয়ে ছবি করেননি।

সেই 'পলাতক' হল সুপারহিট। দর্শক উচ্ছ্বসিত। এমন কি যাঁরা একদা এই ছবিতে টাকা লগ্নী করতে রাজি হননি, সেই প্রযোজকরাও তনুবাবুদের পরিচালনা এবং ছবির গান সম্পর্কে পঞ্চমুখ। কিন্তু—

এই কিন্তুটি কী?

কিন্তুটি হল অনুপকুমার সম্পর্কে প্রশংসার ব্যাপারে তাঁরা কুণ্ঠিত। বললেন : চিত্রনাট্যের এরকম সাহায্য পেলে এ রোল তো যে কেউ করতে পারে। বরং অনুপকুমারের জায়গায় যদি তমুককুমার থাকত, তাহলে দেখতেন এ ছবি আরও কত বেশি টাকা ঘরে আনতে পারত।

তা তাঁদের এই মন্তব্যের জবাব অনুপবাবু তনুবাবুর পরের ছবিতেই দিয়ে দিলেন। ছবির নাম 'আলোর পিপাসা'। এটা তনুবাবুর একারই পরিচালনা। ওই 'পলাতক'-এর পরই বাংলার ঐতিহ্য অনুযায়ী ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেল। তনুবাবু, দিলীপবাবু আর শচীনবাবু তিনজনই আলাদা আলাদা ছবি করতে লাগলেন। তনুবাবু আর শচীনবাবু স্বনামে। 'যাত্রিক' নামটি দিলীপবাবু নিলেন।

তনুবাবুর 'আলোর পিপাসা' ছবিতে অনুপবাবু নায়ক নন। সহনায়কও নন। পেলেন একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা। যে চরিত্রের প্রতি চিত্রনাট্যের বদান্যতা নেই, সহানুভূতিও নেই। চরিত্রটি হল বেশ্যাপল্লীর এক মাস্তান দালাল। কিন্তু কী অপূর্ব দক্ষতায় যে এই চরিত্রটিতে রূপ দিলেন অনুপকুমার তা কী বলব! ছবিটি যদি কোনদিন দূরদর্শনের পর্দায় আসে তো আমার এই বক্তব্যটি মিলিয়ে নেবেন। অনুপকুমার যে কত বড় মাপের অভিনেতা তা ওই চরিত্রটি দেখলে বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। আমাদের দেশের সব পরিচালকই তো আর তরুণ মজুমদার নন যে অনুপকুমারকে দিয়ে চ্যালেঞ্জিং রোল করাবেন। সুতরাং পুনর্মুষিকো ভব। অনুপকুমারকে আবার সেই কমেডির আবর্তেই ফিরে যেতে হল পেটের দায়ে।

তবে হ্যাঁ, আর একবার একটা ব্রেক পেয়েছিলেন অনুপবাবু রাজেন তরফদারের 'জীবনকাহিনী' ছবিতে। এখানেও নায়ক। চরিত্রটিও সিরিয়াস। আর এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম রোম্যান্টিক ভূমিকাতেও অনুপকুমার কত স্বচ্ছন্দ। অসীম ব্যানার্জির 'বিবাহ বিভ্রাট' ছবিতেও উনি নায়ক ছিলেন বটে, কিন্তু সেখানেও তাঁকে কমেডির শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল। এবং সেই ট্র্যাডিশনের পুনরাবৃত্তি আজও দিনের পর দিন ঘটে চলেছে অনুপকুমারের ফিল্ম কিংবা নাটকের জীবনে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কমেডি কি খারাপ? তার উত্তরে বলা যায়, মোটেই নয়। তপন সিংহ তাঁর 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে রবি ঘোষকে দিয়ে কমেডিই করিয়েছেন, কিন্তু সে রোলটা কী অসাধারণ বলুন তো। কিংবা সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' অথবা 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে রবি ঘোষ আর তপেন চট্টোপাধ্যায়। হ্যাঁ, কমেডি হো তো অ্যায়সা। অনুপকুমার যে সব কমেডির সুযোগ পান সেগুলো তো কমেডি নয়, ভাঁড়ামো। পেটের দায়ে সেই ভাঁড়ামোই অনুপবাবুকে করে যেতে হচ্ছে দিনের পর দিন। আজও। এই মুহূর্তেও।

তবে তারই মধ্যে অনুপবাবুর যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা তাঁর গ্রুপ থিয়েটার আর যাত্রা। সেখানে তিনি নিজের মনের মতো কিছু কাজ করতে পারছেন।

এবারে অনুপবাবুর আইবুড়ো নাম কেমন করে খণ্ডন হল সেই ঘটনাটা ছোট্ট করে বলে নিয়ে আমার এই অনুপ-পুরাণ শেষ করি। অনুপকুমারকে নিয়ে ঠিকভাবে লিখতে গেলে একটা ছোটখাট মহাভারত হয়ে যাবে। তাঁর জীবনে এত ঘটনা আর দুর্ঘটনা। কিন্তু আমি তো আর ব্যাসদেব নই। সুতরাং আমাকে থামতেই হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি অনুপকুমারের অভিনয় জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিল্পায়ন-এর পক্ষ থেকে কয়েকজন তরুণ একটি সংকলন প্রকাশ করতে চলেছেন। বাংলাদেশের অনেক মনীষীই সেখানে অনুপকুমারকে নিয়ে কলম ধরবেন। এমন কি রোগশয্যায় শায়িত দেবনারায়ণ গুপ্তও। সেখানে নিশ্চয় অনুপকুমার সম্পর্কে আরও বিশদ জানা যাবে। তার কাছে আমার এই প্রয়াস বিদুরের খুদের মতো। পাঠককে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

অনুপকুমার সারা জীবনে অজস্র থিয়েটার করেছেন। তার মধ্যে স্টার থিয়েটার, রঙ্গনা এবং কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের পর্বগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাশী বিশ্বনাথেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল অলকা গাঙ্গুলির। ওখানে অলকা 'মল্লিকা' নাটকে অভিনয় করতে এসেছিলেন। তা যে অনুপকুমার কোনদিন নিজের পোশাক সম্পর্কে সচেতন নন, তিনি অলকার এই চরিত্রের পোশাক দেখে চমকে উঠলেন। বললেন : এ আপনি কী পরেছেন! এ শাড়ি আপনাকে কে পরতে বলেছে?

অনুপবাবুর কথায় অলকা বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন : আমাকে তো ড্রেসার এই শাড়িই দিলেন পরতে। আমি তাই পরেছি।

অনুপবাবু বললেন : ড্রেসার দিল আর আপনি পরে ফেললেন। একবার ভেবে দেখলেন না আপনার কী চরিত্র, তাতে এই শাড়ি পরা উচিত কি না?

অলকা বললেন : আমি কী করব বলুন। আমি তো নতুন শিল্পী। কাজেই আমাকে যা দেওয়া হবে তাই পরতে হবে। নিজস্ব মতামত তো চলবে না।

অনুপবাবু বললেন : ঠিক আছে। আমি জ্ঞানেশকে গিয়ে বলছি। ডিরেকটারের এসব দিকে নজর রাখা উচিত। আর ওই বা কী করবে। এত ঝামেলার মধ্যে সবদিকে চোখ রাখা যায়? যাক, তবু আমি

গিয়ে বলছি। তবে আপনাকেও বলে রাখি। সব সময় নিজের চরিত্রের কথা ভাববেন। সেটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন। তাহলেই বুঝতে পারবেন কী করা উচিত আর কী নয়। বড় শিল্পী হতে চাইলে চোখ কান আর মন তিনটেই খোলা রাখবেন।

একটু পরে জ্ঞানেশবাবুর ঘরে ডাক পড়ল অলকার। জ্ঞানেশবাবু বললেন : তোমাকে এ শাড়ি পরতে কে বললে?

অলকা বললেন : ড্রেসার।

জ্ঞানেশবাবু বললেন : ড্রেসারগুলোও হয়েছে তেমনি। কী বলি আর কী শোনে। তুমি এটা ছেড়ে সাদা খোলের যে সব শাড়ি আছে তারই একটা পরো।

সেই শুরু। সেইদিন থেকে অলকা অনুপকুমার নামক ব্যক্তিটির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন। দিনে দিনে সেই কৃতজ্ঞতার পরিমাণটা বাড়তেই থাকল।

অলকাকে এবার আমি প্রশ্ন করলাম : কিন্তু অনুপবাবুর সঙ্গে আপনার বিয়েটা হল কীভাবে? প্রস্তাবটা প্রথম কে দিলে?

আরক্ত মুখে অলকা বললেন : আমি।

সে আর এক ইতিহাস। ভদ্রকালীর গীতা সোমের সঙ্গে মৃণাল সেনের বিয়ে হবার আগে থেকেই গীতাদের পরিবারের সঙ্গে অনুপবাবুর পরিচয়। ভদ্রকালীতে যে নাটকের ক্লাব আছে সেখানে অনুপবাবু প্রায়শই যেতেন। গীতাকে তিনি নিজের বোনের মতোই দেখতেন। মৃণাল সেন তখনও পরিচালক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাননি। পরে ওঁদের বিয়ে হল। সেন পরিবারে অনুপকুমারের অবাধ যাতায়াত। ওদের একটি পুত্রসন্তান হবার পর অনুপবাবু এই পরিবারের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়লেন। এই ছেলেই হয়ে পড়ল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। কালক্রমে ছেলের বিয়ে হল। ওরা সস্ত্রীক আমেরিকা চলে গেল বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে। অনুপকুমার হয়ে গেলেন একা। একেবারেই একা। স্নেহপ্রবণ এই মানুষটির তখন বিধ্বস্ত অবস্থা।

অলকা বললেন : ঠিক তখনই আমার মনে হল এই মানুষটির পাশে দাঁড়ানো উচিত। বিয়ের প্রস্তাবটা আমিই দিলাম। এখন আমাদেরও একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। আমি অভিনয় আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে চাই। খুব ভালো রোল যদি পাই তো করব। নইলে ওই ঝাঁটা হাতে দজ্জাল ভূমিকায় নৈব নৈব চ। আমি আমাব ছেলেকে মনের মতো করে মানুষ করতে চাই। ছেলের বাবাকে সবদিক দিয়ে সুখী করতে চাই। একটি আদর্শ দম্পতি হিসেবে আমরা বেঁচে থাকতে চাই।

ঈশ্বর করুন অলকার মনস্কামনা যেন পরিপূর্ণ হয়। সিনেমা-থিয়েটার অনুপকুমারকে অর্থ দিয়েছে। সম্মানও হয়তো দিয়েছে। কিন্তু সুখ আর শান্তি দিতে পেরেছে কি? বোধহয় নয়। অলকা হয়তো সেটা দিতে পারবেন। তার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চাই আমার শুভ কামনা।

নবাদা

সেটা ১৯৪১ সাল। ব্রিটিশ আমল। সারা ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তুমুলভাবে চলছে। বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পিলপিল করে মানুষ পালাচ্ছে গ্রাম-গঞ্জের দিকে। ঠিক সেই সময়ে ওয়ার ফান্ডে টাকা তোলার জন্যে তমলুক শহরের রাজবাড়ির ময়দানে এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে। ওইখানেই আমি নবদ্বীপ হালদারকে প্রথম দেখি। তাঁর অনুষ্ঠান শুনি।

তখনকার দিনে বিচিত্রানুষ্ঠান বলে কোনও শব্দের তখনও আমদানি হয়নি। ওটাকে বলা হত জলসা। সারা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে সরকারের তরফে বড় বড় পোস্টার পড়েছিল 'বিরাট জলসা'র। গ্রামে গঞ্জেও পোস্টারের কামাই ছিল না। ঝুপড়ি ঘরের মাটির দেওয়ালে তো বটেই, তালগাছ কিংবা বটগাছের গায়েও পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয়েছিল।

তার আগে তমলুকের মানুষ কোনও জলসা চাক্ষুষ করেনি। এটা আমার বাবার মুখে শুনেছি। অনুষ্ঠানের প্রায় মাসখানেক আগে থেকে চৌকিদার আর দফাদারদের তত্ত্বাবধানে গ্রামের দিক থেকে গোরুরগাড়ির পর গোরুরগাড়ি বোঝাই বাঁশ এসে জমা হচ্ছিল রাজবাড়ির ময়দানে। লরি করে লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি আসছিল। সারা শহরে একটা হইচই পড়ে গিয়েছিল। রাজবাড়ির মাঠে প্যান্ডেল বাঁধা দেখবার জন্যে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমাত। তিনজন উর্দিপরা পুলিশ সেই ভিড় সামলাত।

ওই জলসার টিকেটের দাম ধার্য হয়েছিল এক টাকা এবং দু'টাকা। ওই দাম শুনে মানুষ চমকে উঠেছিল। তখন চালের দাম ছিল আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা মণ। এক মণ মানে প্রায় চল্লিশ কেজি। দুটো টাকায় একটা পরিবারের সারা মাসের দু'মুঠো ভাতের সংস্থান হয়ে যেত। এর বিরুদ্ধে তমলুকের কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় সোচ্চার হয়েছিলেন। তাই নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে তাঁর বিস্তর বাদানুবাদও হয়েছিল।

আমার তখন বয়স অল্প। গাল টিপলে দুধ বেরোয় না বটে, তবে গাল টিপলে সিগারেটের ধোঁয়াও বেরোয় না। অর্থাৎ কৈশোরের শেষ প্রান্তে। জলসা নিয়ে সারা শহরে অত যে হইচই সেটা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। স্কুল কামাই করে রাজবাড়ির মাঠে গিয়ে প্যান্ডেল বাঁধা দেখতাম। থানার সামনে একটা অস্থায়ী ছাউনী করে থানার মেজ, সেজ আর ছোট দারোগা ইউনিফর্ম পরে জলসার টিকিট বিক্রি করতেন। তার আগে পুলিশকে কখনও টিকিট বিক্রি করতে দেখিনি। পরেও খুব দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

জলসার পোস্টার থেকে জানতে পেরেছিলাম গাইতে আসছেন পঙ্কজ মল্লিক আর শচীনদেব বর্মন। নাচবেন অরুণা দাস আর শ্যামসুন্দর। আর কমিক করবেন নবদ্বীপ হালদার। এই শেষোক্ত নামটি আমাদের কিশোর মনে তো বটেই, বড়দের মনেও উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে মহিলামহলে। আর বাড়ির মেয়েদের তাগাদা এবং অভিমান সামলাতে বাড়ির কর্তাদের ছুটতে হচ্ছিল দারোগাবাবুদের কাছ থেকে টিকিট কেনবার জন্যে।

সেই সময়ে নবদ্বীপ হালদার একেবারে হট্ পপুলার। যাঁদের বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কাননবালা, পঙ্কজ মল্লিক, কানাকেষ্ট, সায়গল কিংবা যূথিকা রায়ের গানের রেকর্ডের সঙ্গে দু-চারখানি নবদ্বীপ হালদারের কমিকের রেকর্ড অবশ্যই থাকত। তখনকার দিনে আমাদের ওই মফস্বল শহরে বিত্তবানদের বাড়িতে গ্রামোফোন শোনার আসর বসত। একটা দিন ঠিক করে বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ জানানো হত গ্রামোফোন শোনার জন্য। দু-চারজন শিল্পীর গানের রেকর্ড চালানোর পর 'কর্নার্জুন' কিংবা 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের রেকর্ড বাজানো হত। কখনও বা 'আলিবাবা'।

আর সবার শেষে থাকত নবদ্বীপ হালদারের কমিক। তাঁর অন্তত চার-পাঁচখানা রেকর্ড শ্রোতাদের না শোনাতে পারলে গৃহস্থের বদনাম হত।

আর আমরা বাচ্চারা হাঁ করে বসে থাকতাম নবদ্বীপ হালদারের রেকর্ড কখন বাজবে সেই জন্যে। প্রতিটি রেকর্ডের স্কেচের আলাদা আলাদা নাম ছিল। সে সব নাম আজ আর মনে নেই। কিন্তু প্রতিটি স্কেচের বিষয়বস্তু স্পষ্ট মনে আছে। বহু সংলাপ আজও নির্ভুল বলে দিতে পারি। একটি স্কেচের নাম মনে আছে। সেটি হল 'বৌদিদি রেস্টুরেন্ট'। ওই স্কেচে নবদ্বীপ হালদারের সঙ্গে আরও দুটি কণ্ঠ ছিল। তার একজন নবদ্বীপ হালদারের বন্ধু। অপরজন বৌদিদি রেস্টুরেন্টের মালিক এক ভদ্রমহিলা। পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি এই রেকর্ডে নবদ্বীপের বন্ধুর চরিত্রটি করেছিলেন আর এক বিখ্যাত অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী। আর বৌদির চরিত্রে যিনি করেছেন তাঁর নাম আজও জানি না। বরং বলা যায় জানবার চেষ্টা করিনি। পাঠকদের মধ্যে কারও যদি জানা থাকে তবে জানিয়ে দিলে খুশি হব।

শুধু কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই নয়, নবদ্বীপ হালদারের চেহারাটাও তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট। অনেক ছবিতেই ওঁকে দেখা যায় অভিনয় করতে। কমিক স্কেচের জন্যে তো বটেই, অভিনয়ের জন্যেও উনি পপুলার। দেবকী বসুর 'সোনার সংসার' ছবিতে ওঁর অভিনয় আমাদের অনেক আগেই দেখা হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে নবদ্বীপ হালদারের সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছে তখন ওঁর মুখেই শুনেছিলাম ১৯৩৬ সালে দেবকী বসুর 'সোনার সংসার'ই নাকি ওঁর প্রথম ছবি। তার আগে নির্বাক যুগে একটি ছবি করেছিলেন 'পঞ্চশর' নামে। সেই ১৯৩০ সালে। সেটারও পরিচালক ছিলেন দেবকী বসু। দেবকীবাবু নিজেও সে ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই যে প্রায় ছ'বছরের ব্যবধানে দেবকীবাবুর পর পর দু'খানি ছবিতে নবদ্বীপ হালদার কাজ করলেন, তার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। সেটার সঙ্গে বর্ধমান জেলাও জড়িত। তবে সে কথা এখন না বলে একটু পরে বলাই ভালো। তার আগে তমলুকের জলসার ব্যাপারটা বলে নিই যেখানে নবদ্বীপবাবু আমাদের সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন।

তমলুকের জলসার সেই নির্দিষ্ট দিনটিতে সারা তমলুক শহরের মানুষ উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছিল। কখন শিল্পীরা এসে পৌঁছবেন তারই প্রতীক্ষা। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত তাঁদের দেখা নেই। তখন পর্যন্ত তমলুক শহরে আসবার জন্য সড়কপথে কোনও সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদের ওপর মানুষ ও গাড়ি চলাচলের জন্য সেতুটি তখনও তৈরি হয়নি। নদীর ওপারে হাওড়া জেলার প্রান্ত পর্যন্ত সড়কপথে গাড়ি করে আসা যেত। তারপর সেই গাড়ি চাকের ওপর তুলে নদী পার করতে হত। সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। নদীতে ঢেউ বেশি থাকলে চাক নামানো যেত না। জোয়ার-ভাঁটার মাঝামাঝি সময়ে যখন নদী শান্ত থাকত, সেই সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা করতে হত। সরকারপক্ষ ঠিক করেই নিয়েছিলেন যে, অত ঝামেলায় না গিয়ে শিল্পীদের ট্রেনে করেই মেচেদা স্টেশন পর্যন্ত আনবেন। তারপর গাড়ি করে তমলুকে।

কিন্তু বিকেল পর্যন্ত শিল্পীরা না এসে পৌঁছনোয় সকলের উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা দুটোই বাড়ছিল। সেই ১৯৪১ সালে হাওড়া-স্টেশন থেকে ট্রেনে আসাও ছিল মারাত্মক ব্যাপার। লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। মানুষের ভিড়ে স্টেশনে পা ফেলাই মুশকিল, তারপর ট্রেন ধরা তো আরও মারাত্মক ব্যাপার। একটা ট্রেনে যত লোক ধরে তার চারগুণ মানুষ ট্রেন আসা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার উপর। কামরার ভেতরে পা রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। ট্রেনের ছাদগুলি লোকে লোকারণ্য।

এইসব অভিজ্ঞতার কথা যাঁদেরকে প্রচণ্ড দরকারে কলকাতা যাওয়া-আসা করতে হয় তাঁদের মুখ থেকেই শোনা। সুতরাং অত ভিড়ের মধ্যে দিয়ে শিল্পীদের কেমন করে সরকারি কর্তারা নিয়ে আসবেন তা নিয়ে বড়দের মধ্যে আলোচনার আসর বসে গেল এখানে ওখানে। কেউ কেউ বললেন ট্রেনে আসার যা ঝঞ্ঝাট তাতে স্টিমারে করে আনলেই তো ভালো হত। তখন কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে স্টিমারে চেপে তমলুক আসা যেত। সকাল সাতটার সময় স্টিমারে চড়লে বিকেল চারটে নাগাদ তমলুকের স্টিমার ঘাটে পৌঁছানো যেত। কিন্তু সেখানেও তো একই সমস্যা। কলকাতাত্যাগী

ইভাক্যুয়িদের ভিড়ে স্টিমারেও তো পা রাখবার জায়গা থাকে না। তাব ওপর মালপত্র আর গরু-ছাগলের ভিড়। সবচেয়ে বড় সমস্যা স্টিমারঘাটে নামার পর। তমলুকে রূপনারায়ণের ওপর কোনও জেটি নেই। স্টিমার থেকে নৌকোয় চড়তে হয়। তারপর ভাঁটা থাকলে আধ মাইলের ওপর পথ হাঁটুভর কাদা ভেঙে তবে শুকনো ডাঙায় পা রাখা যায়। ওইভাবে কাদা ভাঙার কথা তো চিন্তাই করা যায় না পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, নবদ্বীপ হালদার, অরুণা দাস, শ্যামসুন্দর প্রমুখ নামকরা শিল্পীদের ক্ষেত্রে।

যাই হোক, সকলের সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সন্ধের মুখে মুখে শিল্পীরা এসে পৌঁছলেন। পুলিশ পাহারায় তাঁদের গাড়ি থেকে নামিয়ে স্টেজের পাশে ওঁদের জন্যে যে বিশ্রামাগার তৈরি হয়েছিল, সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। চতুর্দিকে কড়া পুলিশ পাহারা। শিল্পীদের বসার জায়গায় কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আমার খুব ভাগ্য ভালো, আমি সেখানে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম। আমাদের হ্যামিলটন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র অনিলদা ওই অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ার হয়েছিলেন। ওঁর কাছে বায়না ধরাতে অনিলদা আমাকে পাহারারত পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনরকমে শিল্পীদের বিশ্রামাগারে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এর আগে কোনও গাইয়ে অথবা সিনেমার আর্টিস্ট কাউকেই চাক্ষুষ করার সুযোগ আমার ঘটেনি। আমি যে ঘরে ঢুকলাম সে ঘরে নবদ্বীপ হালদার আর শচীনদেব বর্মন বসেছিলেন। অরুণা দাস আর শ্যামসুন্দর পাশের ঘরে চলে গেছেন নাচের মেক-আপ নিতে। নবদ্বীপ হালদারকে এক নজরেই চিনেছিলাম। ওই মুখ তো আমার সিনেমার পর্দায় দেখা। কী চমৎকার সুপুরুষ চেহারা। কিন্তু সিনেমায় ওঁকে অমন হতচ্ছাড়া দেখায় কেন? শচীনদেব বর্মনকে চিনলাম আন্দাজে আন্দাজে। বিশেষ করে ওঁর মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখচোখের জন্য। কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক কোথায়? তাঁকে তো দেখামাত্রই চিনতে পারব। নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবিতে তাঁর অসাধারণ অভিনয় তখনও আমাদের চোখে লেগে আছে। তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কাউকে যে সে কথা জিজ্ঞাসা করব তেমন সাহসও নেই।

অরুণা দাস আর শ্যামসুন্দর যে ঘরে ছিলেন সেদিকে যাবার উপায় নেই। কড়া পুলিশ পাহারা। উঁকি দেবারও সুযোগ পর্যন্ত নেই। অরুণা দাসকে দেখলেই চিনতে পারব। মাত্র মাসখানেক আগে তাঁকে 'অবতার' ছবিতে দেখেছি। এক নর্তকীর ভূমিকায় তিনি ছিলেন। রাজার অঙ্কশায়িনী হবার আকাঙ্ক্ষায় নিজের হাতে স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছেন। সেই অপরাধে রাজা অহীন্দ্র চৌধুরি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁর সেই পানপাতার মতো ঢলঢলে মুখখানি এত শীগগির ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্যামসুন্দর ভদ্রলোকটি কে? তিনি অরুণা দাসের সঙ্গে নাচবেন। নাচিয়ে হিসেবে উদয়শঙ্কর এবং সাধনা বসুর নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু শ্যামসুন্দর বলে কারও নাম তো কখনও শুনিনি।

পরে ১৯৬৭ সালে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার নারায়ণ পিকচার্সের অফিসে। ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক সত্যনারায়ণ সাধুখাঁ মশাই আমাকে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের আসল নাম সমর ঘোষ। নাচের জন্য শ্যামসুন্দর ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তমলুকের জলসায় শ্যামসুন্দর নামে যে লম্বা ছিপছিপে মেদহীন মানুষটিকে দেখেছিলাম, ১৯৬৭-তে তাঁকে দেখলাম ভাঙাচোরা এক বৃদ্ধের রূপে। ওঁর পরিচয় পেয়ে যেমন আনন্দ হয়েছিল, ওই ভাঙাচোরা চেহারাটা দেখে তেমনি কষ্টও পেয়েছিলাম।

সেদিনের আসরে পঙ্কজ মল্লিক যে কোথায় সেটা জানতে পেরেছিলাম অনুষ্ঠান শুরুর পর ঘোষকের মুখ থেকে। ঘোষক অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন, আজকের আসরে তাঁরা বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিককে উপস্থিত করতে পারছেন না। তিনি এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছেন, তাও বলতে পারছেন না। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা ছিল সকাল আটটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে মিলিত হবেন। কিন্তু সকাল ছ'টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েও কেউই বেলা বারোটার আগে বড় ঘড়ির নীচে পৌঁছতে পারেননি। কেবলমাত্র হাওড়ার ব্রিজটুকু পার হতেই তাঁদের তিন ঘণ্টার ওপর সময় লেগেছে। সেই বিপুল জনস্রোত পেরিয়ে পঙ্কজবাবু শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে পেরেছেন কি না তাও তাঁরা বলতে পারছেন না। হয়তো তিনি ওই বিপুল পরিমাণ ভিড় দেখে ফিরে গেছেন,

অথবা অন্য কোনও ঘটনা ঘটেছে। যাই হোক, পঙ্কজবাবু না থাকলেও আর যে সব শিল্পী উপস্থিত আছেন তাঁরা সকলেই বিখ্যাত। সুতরাং আজকের জলসা যে রঙে-রসে বর্ণময় হয়ে উঠবে সে বিশ্বাস তাঁদের আছে।

ঘোষকের ঘোষণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের বন্যা বয়ে গেল। সকলেরই মনে হতাশা। পঙ্কজ মল্লিক না থাকার মানে তো অর্ধেক আনন্দই মাটি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনা দুই বেতারশিল্পী গান গাইলেন। তবে তাঁরা তেমন নামকরা কেউ নন। অনুষ্ঠান জমে গেল পরের আইটেমে। অরুণা দাস ও শ্যামসুন্দরের নাচ। ওঁদের যুগল নৃত্যে এক মুহূর্তেই আসর চাঙ্গা হয়ে উঠল। আমার সেদিনের সেই কিশোর-মনে ওই নাচের কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলাম শিল্পীদের অঙ্গের ঝলমলে পোশাক আর রঙ-বেরঙের আলোর খেলা। এমন জিনিস কোনওদিন দেখতে পাব তা ভাবিনি।

এর পরই নবদ্বীপ হালদারের কমিক। ওই নামের ঘোষণা শুনেই দর্শকদের মধ্যে হাসির তুফান উঠল। আমরা অপেক্ষা করে রইলাম নবদ্বীপ হালদারের সেই বিখ্যাত কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

নবদ্বীপ এসে দাঁড়ালেন। তাঁর উর্ধ্বাঙ্গে একটি শ্বেতশুভ্র উড়ুনি জড়ানো। একটুক্ষণ দর্শকদের নিরীক্ষণ করে নিলেন। তারপর শুরু হল তাঁর কথা বলা। কিন্তু এ কী! এ তো নবদ্বীপ হালদারের কণ্ঠ নয়। এ তো এক ভদ্রলোকের পরিষ্কার পরিশীলিত কণ্ঠ। বাক্যচয়নে রীতিমতো শিক্ষিত মানুষের কুশলতা। তবে কি আমাদের ঠকানো হচ্ছে? ঠিক নবদ্বীপ হালদারের মতো দেখতে একটি মানুষকে মঞ্চে তুলে নবদ্বীপ হালদার বলে চালানো হচ্ছে?

না, তা নয়। এটিই তাঁর আসল কণ্ঠস্বর। কমিক করার সময় আর এক বিচিত্র কণ্ঠস্বর প্রকাশ করেন। নবদ্বীপবাবু আজ ট্রেনে আসতে আসতে একটি নতুন স্কেচ তৈরি করেছেন ট্রেনযাত্রীদের নিয়ে। তার মধ্যে কাশীবাসী বিধবা পিসি আছে, বাচ্চা কাচ্চা আছে, টিকিট চেকার আছে, একজন কাবুলিওয়ালা আছে এবং নবদ্বীপ হালদার নামক এক ব্যক্তি আছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সবকটি চরিত্রই নবদ্বীপ হালদার রূপায়িত করলেন তাঁর একার কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে। একেবারে নিখুঁত সেইসব বাচনভঙ্গি।

এই প্রথম স্কেচেই নবদ্বীপবাবু দর্শকদের মাতিয়ে দিলেন। তারপর একে একে করলেন তাঁর রেকর্ড করা সেই বিখ্যাত স্কেচগুলি। 'বৌদিদি রেস্টুরেন্ট', 'গানের মাস্টার', ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কিন্তু সব থেকে ভালো লেগেছিল চোরের স্কেচটা। এক চোর এক আঁধার রাতে গৃহস্থবাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছে। বড় অন্ধকার, তাই ঘুমন্ত গৃহস্থকে উদ্দেশ্য করে চোর বলছে : বাড়িতে কে আছ, হেরিকেনটা একটু দেক্কাবে! এক বৃদ্ধা ঘুম ভেঙে গিয়ে বলছেন : কে র‍্যা! চোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে : ভয় নেই গো, ভয় নেই। আমি চোর।

বর্ধমান জেলায় কথ্য ভাষায় এই চোরের কমিকস্কেচ আমার যে কী অপূর্ব লেগেছিল কী বলব। চোর গৃহস্থর কাছে আলো চাইছে চুরি করবে বলে! তাকে অভয় দিচ্ছে যে, সে ভয় পাবার মতো কেউ নয়, সে চোর! এমন মজার ভাবনা এর আগে আর কেউ ভেবেছেন কি না সন্দেহ। নবদ্বীপবাবু নিজে বর্ধমান জেলার মানুষ। সেই বর্ধমান জেলার কথ্য ভাষাকে তিনি তাঁর কমিকের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে রেখে গেছেন।

ওই বর্ধমান জেলার সোনপলাশী গ্রামে নবদ্বীপ হালদার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালে। সালটা নিয়ে একটু দ্বিমত থাকতে পারে। কেউ বলেন ১৯০৮, আবার কেউ বলেন ১৯১১। কোনটি সঠিক তা আমি বলতে পারব না। কারণ নবাদার, মানে নবদ্বীপ হালদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যখন হয় সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে, সেদিন আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, সাংবাদিকসুলভ প্রশ্নাবলী নিক্ষেপের কথা আমার মনেই হয়নি।

পরে ধীরাজদা, মানে ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমি নবাদার বাড়িতেও একাধিকবার গেছি। কিন্তু কৌতুকাভিনয় সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনায় এতই মশগুল হয়ে থাকতাম যে, বয়েস-টয়েস জিজ্ঞাসা

করবার কথা খেয়ালই হয়নি।

তবে নবদ্বীপ হালদার মানুষটি এতই রসিক এবং সদালাপী যে, প্রথম দিন থেকেই ওঁর সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করেছিলাম। তাই প্রেমেনদা কিংবা ধীরাজদা ওঁকে যে নামে সম্বোধন করতেন, সেই 'নবা' নামটির সঙ্গে আমি দাদা জুড়ে নেওয়াতে উনি কোনওরকম আপত্তি প্রকাশ করেননি। বরং বলা যায়, উনি আমাকে গ্রহণই করেছিলেন।

নবদ্বীপ হালদারের মন্ত্রশিষ্য কমেডিয়ান সুশীল চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি, নবাদা নাকি তাঁর রেকর্ডের বিখ্যাত স্কেচগুলি নিজেই রচনা করতেন। দু-একটা নাকি অন্যকে দিয়েও রচনা করিয়েছেন। সুশীলবাবুর কথামতো নবাদা যদি সত্যিই তাঁর ওইসব বিখ্যাত স্কেচগুলির রচনাকার হন তবে আমার অকুণ্ঠ প্রণাম তাঁর প্রাপ্য। স্কেচগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের ভণ্ডামি নেই, আছে সাধারণ মানুষের বোধগম্য অনাবিল হাস্যরস। আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকের মতো পাওয়া যায় ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ খোঁচা। আছে মধ্যবিত্ত মানুষের অসহায়তার কথা। আছে বেকার মানুষের দুঃসহ জীবনযাপনের গ্লানির কথা। নবাদার এইসব কমিকস্কেচের সবচেয়ে বড় গুণ, সব বয়সের মানুষকে সমানভাবে আনন্দ দিতে পারে। তাঁর স্কেচ শুনে পণ্ডিতও হাসেন, মূর্খও হাসেন। বুড়ি ঠাকুমাও হাসেন আবার অল্পবয়সী নাতনীও হাসে। বৃদ্ধও হাসে, যুবকও হাসে। এমন সর্বজনীন আবেদন আর কারও কমিকস্কেচের মধ্যে আমি খুঁজে পাইনি। আমার এই কথার যথার্থতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর জহর রায় দু'জনেই স্বীকার করতেন। ভানুদা আবার আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলতেন : রেকর্ডের কথা যদি কও, তবে নবাদার কমিকের কাছে আমরা হইলাম গিয়া সব পোলাপান। আমাদের দৌড় বড়জোর আসানসোল পর্যন্ত। আর নবাদার স্কেচ শুইন্যা খাসকেন্দা কোলিয়ারির কুলি-কামিনরাও হাসে।

কিন্তু নবাদার যা কিছু খ্যাতি, তা কী কেবল তাঁর ওই বিচিত্র কণ্ঠস্বরের জন্য? কেবল তাঁর রসালো কমিকস্কেচের জন্য?

ভুল কথা। ওই ব্যাপারে নবাদার খ্যাতি তো ছিলই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর এক ধরনের বিচিত্র অভিনয়ের ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাটা আবিষ্কার করেছিলেন দেবকীকুমার বসু। আর সেটাকে পুরোপুরি এক্সপ্লয়েট করেছিলেন আমাদের এই বাংলা ছবির দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ওঁদের ছবিতে নবদ্বীপ হালদার থাকবেনই। আর থাকবে নবাদার তৈরি করা নিজস্ব কয়েকটি মুহূর্ত যা পরিচালক তাঁর চিত্রনাট্যে কল্পনাও করেননি।

এই নবাদাকে নিয়ে শৈলজাদার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর টালার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়িতে আমার আলোচনা হত। শৈলজাদার মুখ থেকেই জানতে পেরেছিলাম, কেমন করে তিনি নবদ্বীপ হালদারের মুখভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চিত্রনাট্য বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে এক মজার ঘটনা।

কিন্তু সে ঘটনায় যাবার আগে তমলুকের ওই জলসার শেষ শিল্পীর কথাটা একটু বলে নিই। সেদিনকার শেষ শিল্পী ছিলেন কুমার শচীনদেব বর্মন। হ্যাঁ, শচীনদেব বর্মনের নামের আগে তখন কুমার শব্দটি ব্যবহার করা হত ত্রিপুরার রাজপরিবারের সন্তান হওয়ার সূত্রে। পরে ওই 'কুমার' শব্দটি আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। বোম্বাই যাওয়ার পর তো নামটা আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। শুধুই এস ডি বর্মন।

তা সেদিন শচীনদেব নাকি অসাধারণ গান গেয়েছিলেন। কথাটা বড়দের মুখ থেকেই শুনেছিলাম। আমার সেই কিশোর বয়সে তো গানের গ-ও বুঝতাম না। এখনও বুঝি না। তবে শচীনদেব যে গানগুলি গেয়েছিলেন সেগুলির কথা মনে আছে। প্রথমে গাইলেন 'পদ্মার ঢেউ রে, আমার শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা-যা-রে,' তারপরে গাইলেন 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে'। পরে জেনেছি দু'খানি কাজী নজরুলের লেখা গান। আর শেষ যে গানখানি শচীনকর্তা গাইলেন সেটি তাঁর এক অমর কীর্তি। 'প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল, তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল।' এই শেষ গানটির সময়ে দেখেছিলাম আমার আশেপাশে অনেকেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিলেন।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমার সেদিন শচীনদেব বর্মনের অনুষ্ঠানের চেয়ে নবদ্বীপ হালদারের অনুষ্ঠান

বেশি ভালো লেগেছিল। পরের দিন সারা তমলুক জুড়ে এখানে ওখানে থোকায় থোকায় আগের দিনের জলসা নিয়ে আলোচনা শোনা গিয়েছিল। কী শোনা গিয়েছিল তা আজ বলতেও লজ্জা পাই। কিন্তু সেই নির্মম সত্যটি হল, সাধারণ মানুষের কাছে নবদ্বীপ হালদারের কমিক স্থান পেয়েছিল শচীনদেবেরও ওপরে। এই যে সাধারণ মানুষের মনের ভিতর নবদ্বীপ হালদার পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন সেটা কোন মন্ত্রবলে? না, কোনও মন্ত্রবলে নয়। এটা সম্ভব হয়েছিল নবদ্বীপের নিজস্ব একটি ঘরানার কারণে। সে ঘরানা কেমন করে সৃষ্টি হল সেটাই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শুনতে পাব একটু পরে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে নবদ্বীপ হালদারকে নিয়ে একটা নির্মম রসিকতা চালু ছিল সিনেমা মহলে। কথাটা এক ভদ্রলোক রূপাঞ্জলি পত্রিকার অফিসে বসে রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছিলেন। তাঁর মতে নবদ্বীপ হালদার একজন মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। লেখাপড়ার ধার ধারেন না। বিদ্যের দৌড় ওই কোনমতে নাম সই করা পর্যন্ত। এই বলে ভদ্রলোক একটি ঘটনা শোনালেন আমাদের।

একবার নাকি নবদ্বীপ হালদারের এক বন্ধু তাঁকে বললেন : এই নবা, তোকে যে অমুকবাবু খুঁজছেন একবার।

এই বলে বন্ধুটি একজন নামী চিত্রপরিচালকের নাম করলেন। তাঁর ছবিতে নবদ্বীপ হালদার এর আগে কাজ করেননি।

নবদ্বীপ তখন তাঁর বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : কেন খুঁজছেন বল দিকি? আমি তো এর আগে কতবার ওঁর কাছে গেছি। একটাও কাজ দেননি।

বন্ধুটি বললেন : এবারে দেবেন। একেবারে মেইন পার্ট।

নবদ্বীপ খুব উৎসাহিত হলেন। বললেন : তাই নাকি! তা পার্টটা কীরকম কি—কিছু শুনেছ নাকি?

বন্ধুটি বললেন : সেটা জানি বৈকি। তোমাকে উনি শরৎবাবুর 'মহেশ' গল্পের মহেশ চরিত্রটা দেবেন বলে খুঁজছেন।

শুনে নবদ্বীপ হালদার আহ্লাদে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন : তাই নাকি? তাহলে তো আজই দেখা করতে হয় ওঁর সঙ্গে। তোকে ভাই কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! চল্, ওই রেস্টুরেন্টটায় বসে একটু চা-টোস্ট-মামলেট খাই চল্।

বন্ধুটি বললেন : না না, এর জন্যে আবার চা-টা খাওয়ানো কেন! উনি তোকে একটা ভালো রোল দেবেন শুনে খুব আনন্দ হল। তাই তোর সঙ্গে দেখা হতে কথাটা জানিয়ে দিলাম। বন্ধুর জন্যে এটুকু কি কেউ করে না? তার জন্যে চা খাওয়াতে হবে নাকি?

নবদ্বীপ বললেন : ঠিক আছে ভাই। ধর, তুই আমাকে কোনও খবরই দিস্ নি। তা হলেও কি আমি বন্ধু হিসেবে তোকে চা খাওয়াতে পারি না?

বন্ধুটি বললেন : তা পারবি না কেন! চল্, এত করে যখন বলছিস তখন রেস্টুরেন্টেই যাই চল। তোর তো এখন বরাত খুলে গেল রে নবা! অতবড় একজন ডিরেকটারের ছবিতে মেইন্ পার্ট পাচ্ছিস্। তোর পয়সা এখন খায় কে। টাকা পেলে একদিন চীনে দোকানে ফ্রায়েড রাইস্ খাইয়ে দিস কিন্তু।

নবদ্বীপ হাসতে হাসতে বললেন : সে কথা আর বলতে। সেদিন তুই কত খেতে পারিস তাই দেখব। শুধু ফ্রায়েড রাইস্ কেন, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু খাওয়াব।

এই বলে নবদ্বীপ চোখ টিপে একটা ইশারা করলেন। তারপর দুই বন্ধুতে সামনের রেস্টুরেন্টটায় গিয়ে বসলেন।

চায়ের দোকানে বসে টোস্টে কামড় দিয়ে বন্ধুটি বললেন : তাই তো, একটা মুশকিল হল যে!

নবদ্বীপ বললেন : আবার কী মুশকিল?

বন্ধুটি বললেন : তুই তো বলছিস আজই ওই ডিরেকটারের সঙ্গে দেখা করবি। কিন্তু ওঁকে তো এখন পাবি না।

নবদ্বীপ বললেন : কেন! উনি কোথায়?

বন্ধুটি বললেন : আউটডোরে। ফিরবেন সেই—আজ তো হল বিষ্যুৎবার, সেই সোমবারে। তুই বরং মঙ্গলবার ওঁর সঙ্গে দেখা করিস্।

নবদ্বীপ বললেন : তাহলে তো সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বন্ধুটি বললেন : কিসের গণ্ডগোল?

নবদ্বীপ বললেন : উনি যদি আমার জায়গায় আর কাউকে নিয়ে নেন?

বন্ধুটি বললেন : না না, তা হবে না। উনি তো আমায় সেদিন বললেন, নবদ্বীপকে আমার চাইই চাই। মহেশের চরিত্রে ওকে ছাড়া আর কাউকে মানাবেই না।

নবদ্বীপ বললেন : তবে তো নিশ্চিন্তি। তাহলে আমি মঙ্গলবারই ওঁর সঙ্গে দেখা করব। তোকে আর একটা মামলেট দিতে বলি।

এই বলে নবদ্বীপ হালদার একটু জোর গলাতেই বলে উঠলেন : ওহে ম্যানেজার, আমাদের টেবিলে বেশ কড়া করে একটা মামলেট দিতে বলো তো! কাঁচা লঙ্কাটা একটু কম দিও। আর হ্যাঁ, আমার জন্যে একটা ডবল-হাফ চা দিতে বলো।

বন্ধুটি চা আর ওমলেট খেয়ে বিদায় নিলেন। এবং নবদ্বীপ ছুটলেন তাঁর বন্ধু মহলে আজকের এই সদ্যপ্রাপ্ত সুসংবাদটা দিতে।

আর ধাক্কাটা খেলেন তখনই। বন্ধুরা তো নবদ্বীপের কথা শুনে হাসবেন কি কাঁদবেন তাই ঠিক করতে পারলেন না। কেউই কিন্তু মুখ ফুটে নবদ্বীপকে দুঃখ দিতে চাইলেন না। তাই প্রায় সকলেই গম্ভীর হয়ে রইলেন।

সব দেখেশুনে নবদ্বীপ অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর এমন একটা সুসংবাদে বন্ধুদের তো লাফিয়ে ওঠবার কথা। তা নয় তারা সবাই এমন ব্যাজার মুখ করে বসে রইল যে দেখলে যেন মনে হবে কোথাও কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে।

এসব দেখে নবদ্বীপ আর স্থির থাকতে পারলেন না। বলে ফেললেন : তোরা কি আমার এত বড় একটা খবরে খুশি হতে পারিসনি? তোদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ মারা-টারা গেছে?

নবদ্বীপের কথার উত্তরে এক বন্ধু শেষ পর্যন্ত গাম্ভীর্য রাখতে পারলেন না। বলে ফেললেন : সেরকম কিছু হলেও তো আমরা এতটা কষ্ট পেতাম না, যতটা কষ্ট হচ্ছে তোর কথা শুনে!

নবদ্বীপ বললেন : তার মানে?

আর এক বন্ধু বললেন : তুই শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটা পড়েছিস?

নবদ্বীপ বললেন : কী করে পড়ব। আমি কি তোদের মতো অত লেখাপড়া জানি নাকি যে নাটক-নভেল পড়ব!

আর এক বন্ধু বললেন : সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল। তোর মতো একটা সরল মনের মানুষের কাছে কথাটা যে ভেঙেও বলতে পারছি না। শুনলে তুই যে বড় দুঃখ পাবি রে নবা!

নবদ্বীপ হালদার এতক্ষণে বুঝলেন যে নিশ্চয় কোথাও একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল হয়েছে। এবং সেটা এমন একটা কিছু যে প্রাণের বন্ধুরা পর্যন্ত সেটা বলতে থতমত খাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো না জানলে চলবে না। তাই বললেন : কী হয়েছে খুলে বল্ দিকি! তোদের কথা দিচ্ছি আমি কোনও কষ্ট পাব না।

আর এক বন্ধু বললেন : পাবি রে নবা। এমন নির্মম রসিকতা তুই সহ্য করতে পারবি না।

নবদ্বীপ বললেন : রসিকতা! কী বলছিস রে তোরা?

আর এক বন্ধু বললেন : ঠিকই বলছি। তোর সেই বন্ধু তোর সঙ্গে রসিকতা করে গেছে। শরৎবাবুর 'মহেশ' গল্পের মহেশ কোনও মানুষের চরিত্র নয়।

নবদ্বীপ বললেন : এইবার হাসালি তোরা। মহেশ নাম কি মানুষ ছাড়া আর কিছুর হয় নাকি? তোরা যে কী বলিস্।

আর এক বন্ধু বললেন : হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে। শরৎবাবুর গল্পের মহেশ কোনও মানুষের নাম নয়। একটা গোরুর নাম।

এই বলে তিনি পুরো গল্পটা সংক্ষেপে বললেন নবদ্বীপবাবুর কাছে।

শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন নবদ্বীপ। তারপর হাসতে হাসতে বললেন : তা আমার সেই বন্ধুটি তো ঠিকই করেছে। সত্যিই তো আমি একটা গোরু। তা নইলে একটা গাধার কথায় এতটা বিশ্বাস করি। তাকে চা-মামলেট খাওয়াই।

গল্পটি শেষ করে ভদ্রলোক খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন। এবং বলতে লজ্জা পাই, আমরা যে ক'জন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তারাও হেসেছিলাম।

এই রটনাটিকে আমি সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে নবদ্বীপ হালদারের সঙ্গে যখন পরিচয় হল, তখন কিন্তু ওরকম কোনও ঘটনার নায়ক হিসেবে নবদ্বীপ হালদারকে মেলাতে পারছিলাম না। যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেন, তা তো আদৌ অশিক্ষিত মানুষের মতো নয়। তাছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সাহিত্যিক যাঁর বন্ধু, ধীরাজ ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যসেবী যাঁর বন্ধু, তিনি কি কখনও অশিক্ষিত হতে পারেন? অক্ষরজ্ঞান না থাকলে তিনি স্কেচ রচনা করেন কীভাবে। কিন্তু এই ব্যাপারের সত্যতা তো নবাদার কাছে থেকে জানা যাবে না। তাই একদিন একান্তে ধীরাজদার কাছ থেকে এই ঘটনার সত্যাসত্য জানতে চাইলাম।

শুনে ধীরাজদা তো হেসেই খুন। বললেন : হ্যাঁ, নবার সম্পর্কে এইরকম একটা কথা বাজারে চাউর আছে বটে। কিন্তু তুই সেটা বিশ্বাস করেছিস নাকি? তাহলে তুইও তো আর একটা শরৎবাবুর মহেশ রে!

আমি বললাম : বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি বলেই তো আপনাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম ধীরাজদা!

ধীরাজদা বললেন : এই রটনাটা ডাহা মিথ্যে কথা। নবা যদি লেখাপড়া না জানত তাহলে কখনও সাহেব কোম্পানিতে চাকরি করতে পারে। তারা কি একটা মুখ্যু লোককে চাকরি দিয়েছিল বলতে চাস।

আমি বললাম : তাই নাকি! নবাদা চাকরি করেন নাকি? কোন্ কোম্পানিতে?

ধীরাজদা বললেন : করত। তবে এখন আর করে না। নবা চাকরি করত ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে। সে সময়ে ওটা খাস সাহেবদের কোম্পানি ছিল।

যাক, ধীরাজদার কথা শুনে আমার মনের সব আবিলতা ঘুচে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হল। কিছু মানুষের রুচি এত বিকৃত হয় কেন? যে মানুষটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন তাঁকে এমন হাস্যাস্পদ করে কার কী লাভ! সব রাগটা গিয়ে পড়ল রূপাঞ্জলি পত্রিকার অফিসে বসে যিনি এই ঘটনাটি বলে হায়নার মতো খ্যা খ্যা করে হাসছিলেন, তাঁর ওপর। ভদ্রলোককে আমি তার আগে চিনতাম না। কী নাম তাও জানি না। কী সূত্রে তিনি রূপাঞ্জলি অফিসে এসেছিলেন তাও জানি না। এরপরে আর তাঁকে কোনওদিন দেখিনি। আজ, এই মুহূর্তে যদি তাঁকে সামনে পেতাম তবে সত্যি সত্যিই জুতোপেটা করে ছাড়তাম।

এবারে নবদ্বীপ হালদারের সিনেমায় যোগদানের কথা বলি। সেই সঙ্গে দেবকী বসু এবং বর্ধমান জেলার কথা। আগেই বলেছি নবাদার জন্ম বর্ধমান জেলার সোনপলাশী গ্রামে। খুব ছোটবেলা থেকেই নবদ্বীপ হালদারের অভিনয়ের শখ। গ্রামে নাটকের ক্লাব ছিল। সেখানেই নবাদার অভিনয়ের হাতেখড়ি।

নবাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : গ্রামের যে নাটকের ক্লাবের কথা বলছেন, সেটা কি থিয়েটার ক্লাব না যাত্রার দল?

নবাদা বললেন : ও দুটোর মাঝামাঝি ধরে নিতে পারো। কোনও বড়লোকের বাড়ি থেকে যদি বাঁশ বাঁধার খরচা আর কলকাতা থেকে সিন-সিনারি এবং ড্রেস ভাড়া করার পয়সা দেওয়া হত তবে আমরা থিয়েটারই করতাম। না হলে সনাতন যাত্রার পদ্ধতিতে। তবে ইলেকট্রিক-ফিলেকট্রিকের বালাই তো তখন ছিল না। বড় বড় ডে-লাইট জ্বেলেই অভিনয় হত। তখনকার দিনে পয়সাওলা যে কোনও

বাড়িতেই দু-চারখানা ডে-লাইট থাকত। স্টোভের মতো পাম্প করে সেসব ডে-লাইট জ্বালতে হত। একবার এক বাড়িতে স্টেজের সামনে কারবাইড দিয়ে গ্যাস-লাইট জ্বেলে ফুটলাইট তৈরি করা হয়েছিল। তা সেবারে সেই ফুটলাইটের আগুনে আমাদের ড্রপসিন পুড়ে গিয়েছিল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপনি আপনার যে পিকিউলিয়ার কণ্ঠস্বরের জন্যে বিখ্যাত, প্রথম থেকে সেই কণ্ঠস্বরেই অভিনয় করতেন, না নিজের ওরিজিন্যাল ভয়েসেই করতেন?

নবাদা বললেন : সেটা একটা মজার ব্যাপার। আমি প্রথম প্রথম নিজের যে ভয়েস তাতেই অভিনয় করতাম। একবার একটা নাটকে কমিক ক্যারেকটার ছিল, সেটা ওইরকম কৃত্রিম ভয়েসে অভিনয় করলাম এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে। দর্শকদের দারুণ ভালো লেগে গেল। তারপর থেকে কমিক-ক্যারেকটার পেলেই ওই ভয়েসটা প্রয়োগ করতাম। শেষ পর্যন্ত নিজের কণ্ঠস্বরটা হারিয়েই গেল। চিরকাল কৃত্রিম কণ্ঠস্বরেরই দাসত্ব করে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : গলার স্বর ওইভাবে বিকৃত করতে গিয়ে কণ্ঠনালিতে চাপ পড়ত না? কষ্ট হত না?

নবাদা বললেন : প্রথম প্রথম হত। মনে হত বেশিক্ষণ ওভাবে কথা বললে গলাটা চিরে যাবে। পরে আর কষ্ট হত না! তবে কী জানো, কমিক-ক্যারেকটার পেলেই ওই ভয়েসটা লাগাতাম। নইলে রাজা-গজা কি সেনাপতির পার্টে কি ওই গলা চলবে! সেরকম করলে দর্শকরা মেরে খাল খিঁচে দেবে না!

আমি বললাম : সিনেমায় তো প্রথম থেকেই ওই গলায় অভিনয় করে আসছেন।

নবাদা বললেন : আমার প্রথম ছবি 'পঞ্চশর' তো সাইলেন্ট পিকচার। তাতে কোনও ডায়লগই নেই তো কণ্ঠস্বর দিয়ে কী হবে। তবে দেবকীবাবু যখন তাঁর টকি ফিল্ম 'সোনার সংসার'-এ চান্স দিলেন তখন ওঁকে আমার ওই কৃত্রিম কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিলাম। উনি সেটা পছন্দ করেছিলেন। আর দর্শকরা যে পছন্দ করেছিলেন সেটা তো জানোই। আমার জীবনে সেটাই একটা পারমানেন্ট সেটলমেন্ট হয়ে গেল।

এই দেবকীবাবুকে নবদ্বীপ হালদার কুপোকাৎ করেছিলেন বর্ধমান জেলা দেখিয়ে। বলেছিলেন : আপনিও বর্ধমানের, আমিও বর্ধমানের, তাহলে আপনি সিনেমা করবেন অথচ আমি করতে পারব না কেন?

কথাটা শুনে দেবকীবাবু হেসে ফেলেছিলেন এবং চান্সও দিয়েছিলেন।

নবদ্বীপ হালদার এরপর প্রচুর ছবিতে অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন পরিচালকের ছবিতে। অত ছবির নাম এবং পরিচয় দিতে গেলে একটা ছোটখাটো মহাভারত হয়ে যাবে। কাজেই সে রাস্তায় আমি যাচ্ছি না। তবু কয়েকটি ছবির নাম জানিয়ে রাখি। সেগুলি হল পুরনো আমলের তোলা 'ইন্দিরা', 'গোঁজামিল', 'অভিসারিকা', 'কৃপণে কৃপণে', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', 'সীমান্তিক', 'ভক্ত রঘুনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'গ্রহের ফের', 'শেষ নিবেদন', 'জোয়ার ভাঁটা', 'মর্যাদা', 'বিষের ধোঁয়া', 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া', 'নতুন বউ', 'বন্দেমাতরম', 'পলাতক', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'সহসা,' 'পাত্রী চাই' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব ছবিতে নবদ্বীপ হালদার তেমন কোনও বিশিষ্টতা পাননি। ওই দু-একটা খণ্ডদৃশ্যে লোক হাসাবার জন্যে তাঁর পর্দায় আসা।

তবে আমি যতদূর জানি, দুজন পরিচালকের ছবিতে নবদ্বীপ হালদার বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন। তার একজন হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্যজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রেমেনদা নবাদার বন্ধু ছিলেন, তাই ওঁর প্রতিভা কিছুটা পরিমাপ করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হানাবাড়ি' কিংবা 'কালোছায়া' এবং অন্যান্য ছবিতে নবাদা বেশ ভালো চরিত্র পেয়েছিলেন। ভালো মানে, নায়ক কিংবা সহনায়ক নয়। তবে ওইসব চরিত্র ছবির প্রয়োজনে এসেছিল। নেহাৎ লোক হাসাবার জন্যে আমদানি করা হয়নি।

কিন্তু প্রেমেনদার চেয়ে শৈলজানন্দ তাঁর কয়েকটি ছবিতে নবাদাকে অনেক বেশি কাজে লাগিয়েছিলেন। শৈলজাদার 'বন্দী', 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা', 'শ্রীদুর্গা', 'অভিনয় নয়', ইত্যাদি

ছবিতে নবাদাকে দারুণ স্কোপ দিয়েছিলেন তিনি। আর নবাদাও সেসব ছবিতে চুটিয়ে অভিনয় করেছিলেন।

নবাদাকে নিয়ে শৈলজাদার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝেই আলোচনা হত। শৈলজাদা তখন ছবির জগৎ থেকে অবসর নিয়েছেন। টালা পার্কের বাড়িতে অবসর জীবনযাপন করছেন। পুরোদমে না হলেও মাঝে মাঝে লেখাজোখায় মন দিচ্ছেন। সেই সময়টায় আমি লেখার প্রার্থনা জানাতে এবং পরবর্তীকালে সেই লেখার তাগাদা দিতে তাঁর বাড়িতে যেতাম। রাস্তার ওপারে থাকতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর এপারে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আমার টার্গেট ছিলেন দুইজনেই। প্রথমে হয়তো তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে গেলাম। শুনলাম উনি শৈলদাজার বাড়িতে গেছেন খোসগল্প করতে। ছুটলাম সেখানে। দুজনকে এক সঙ্গে পেয়ে গেলাম। লেখার জন্যে সানুনয় তাগাদা দিলাম। তারপর বসে গেলাম দুই বুড়োর সঙ্গে গল্প করতে। শুনতে চাইতাম পুরনো দিনের কথা।

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে সিনেমা জগতের ঘনিষ্ঠ কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে কিছুটা ছিল। কিছুটা মানে বেশ কিছুটা। সেসব ঘটনা শুনতাম তাঁর কাছে। আর শৈলজাদার কাছে শুনতাম সিনেমাজগতের পুরনো দিনের কথা। সেই ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে ওঁর সঙ্গে ফিল্মের যোগাযোগ। নিউ থিয়েটার্স শৈলজাদার 'তিন পুরুষ' গল্পটি নিয়ে 'ডাক্তার' নামে একটি অসাধারণ ছবি করেছিল। পরবর্তীকালে ওই গল্প নিয়ে বোম্বাইয়ের পরিচালক শক্তি সামন্ত 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটি ছবি করেন। সেই 'ডাক্তার' ছবির পর থেকে শৈলজাদা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। উনি নিজেই একের পর এক হিট ছবি তৈরি করতে থাকেন।

কিন্তু মানুষের জীবনে তো সময় একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'। শৈলজাদার ক্ষেত্রেও তাই হল। কয়েকটা ছবি ফ্লপ করল। আর তারপর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল ছবি করা। পড়ে রইল কেবল স্মৃতি।

তা আমি শৈলজাদাকে দিয়ে বহুবার সিনেমা জগতের স্মৃতিকথা লেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনবারই তিনটে চ্যাপটারের বেশি চারটে চ্যাপটার লেখাতে পারিনি। অন্যান্যরাও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শৈলজাদা সেই বুদ্ধিমান শেয়ালের মতো ওই তিনটে চাপটারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে দেখাতেন। প্রেমেনদাকে দিয়েও তো কম চেষ্টা হয়নি সিনেমার স্মৃতিকথা লেখানোর। কিন্তু সেটাও সফল হয়নি। শৈলজাদা তো তবু তিনটে চ্যাপটার লিখেছিলেন, কিন্তু প্রেমেনদার সম্বল ছিল মাত্র একটি চ্যাপটার। সেটা দিয়েই তিনি অনেককে প্রাথমিক তুষ্ট করেছেন। তার পরে আর এক লাইনও এগোয়নি। কারণ কুঁড়েমির ক্ষেত্রে প্রেমেনদা আর শৈলজাদা একই ঘরানার। এ বলে আমায় দ্যাখ, আর ও বলে আমায় দ্যাখ। একবার তো আনন্দবাজার পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রেমেনদার উপন্যাস লেখার কথা ছিল। কিন্তু কুঁড়েমির জন্যে উপন্যাস আর লেখা হল না। শেষ পর্যন্ত কুঁড়েমির ওপর একটা আর্টিক্‌ল্ লিখে দিয়ে দায় খালাস হলেন।

যাক, যে কথা হচ্ছিল, সেই নবদ্বীপ হালদারের কথাতেই আবার ফিরে আসি। শৈলজাদার সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় আমি বার বার নবাদার কথাই জানতে চাইতাম। আর নবাদার কথা বলতে গিয়ে শৈলজাদাও কেমন এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতেন। মাঝে মাঝেই বলতেন : তোমরা কেউ জানো না, রবি, নবদ্বীপ কত বড় আর্টিস্ট ছিল। ওর কাজ দেখে আমাকে কতবার যে স্ক্রিপ্ট বদলাতে হয়েছে তা কী বলব।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

শৈলজাদা বললেন : এই 'শহর থেকে দূরে', কিংবা 'মানে না মানা' ছবির কথা ধরো না কেন। নবদ্বীপের ওই ছবিগুলোতে ছোট্ট দু-একদিনের কাজ ছিল। কিন্তু সেইসব দৃশ্যে এমন একটা মারাত্মক এক্সপ্রেশন দিল যে আমি স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ করে ওর রোলটা বাড়াতে লাগালাম। ঘন ঘন ক্লোজ-আপ রাখতে লাগলাম ওর। আর ওর মুখে যে কত বিচিত্র রকমের এক্সপ্রেশন আছে, চোখের মধ্যে কত বিচিত্র কাজ আছে, তা অকল্পনীয়। নবদ্বীপ তা উজাড় করে দিতে লাগল আমাকে। আমার সহকারী ন্যাংটেশ্বর

মুখোপাধ্যায় তো আমাকে মাঝে মাঝে সাবধান করে দিত। বলত, শৈলজা, তুই তো ছবিটাকে একেবারে কমেডি ছবি করে ফেলছিস রে!

তা আমি কী করব বলো রবি। অত ভালো এক্সপ্রেশন পেলে কোন্ ডিরেক্টার না চায় সেটাকে ইউটিলাইজ করতে। তার ওপর ওর ওই মার্কামারা কণ্ঠস্বর। লোভ সামলে থাকা যায়?

তবে দুঃখ কী জানো? নবদ্বীপের এই ট্যালেন্টকে একমাত্র দেবকীবাবু আর প্রেমেন ছাড়া অন্য কেউ বুঝতেই পারল না। তাদের কাছে নবদ্বীপ একটা হাসির যন্ত্র মাত্র। যে কারণে আমাদের দেশে ওর মতো শিল্পী কোনও মর্যাদাই পেল না।

শৈলজানন্দের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি একমত। আমারও ঠিক ওই একই কথা মনে হয়েছে। অধিকাংশ ছবিতে আর নাটকে নবদ্বীপ হালদার কোনও চরিত্র নয়, হাসির যন্ত্র মাত্র।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নবদ্বীপ হালদার মানুষের কাছে বেঁচে আছেন তাঁর ওই বিচিত্র কণ্ঠের জন্য। সেই কণ্ঠ কবেই স্তব্ধ। কিন্তু আজও সুশীল চক্রবর্তী ছাড়াও আরও অন্তত এক ডজন কমেডিয়ান ওই কণ্ঠস্বরের অনুকরণে মানুষকে আনন্দ দিয়ে চলেছেন। নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছেন।

আর এইভাবেই নবদ্বীপ হালদার দীর্ঘজীবী হয়ে আছেন। থাকবেনও।

অনিলবাবু

এটা বোধহয় ১৯৭২ কি '৭৩ সালের কথা। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সেই সময়ে কিছুকাল শুক্রবারের সিনেমা পাতার মেক-আপের দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হয়েছিল। কাজেই বৃহস্পতিবার মেক-আপ সেরে রাত ন'টা সাড়ে ন'টার আগে বেরোতে পারতাম না। কখনও কখনও আরও রাত হয়ে যেত। কাজেই বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ি দেওয়া হত অফিস থেকে।

তা সেই বৃহস্পতিবার মেক-আপের কাজ সেরে নীচে নেমে আমাদের সিকিউরিটি অফিসার শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তর সঙ্গে দু-একটা কথা বলেছি আর গাড়ির অপেক্ষা করছি, এমন সময় পাশেই টেলিফোন অপারেটরের ঘর থেকে রবিবাবু মুখ বাড়িয়ে বললেন : আপনার একটা ফোন আছে রবিবাবু। লাইনটা কাউন্টারে দিচ্ছি।

আমাদের আনন্দবাজারের যিনি টেলিফোন অপারেটর ছিলেন তাঁরও নাম রবিবাবু। আমাদের দুজনের একই নাম হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে কিছু ভ্রান্তিবিলাস ঘটে যেত। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার অরূপ সরকার মশাইয়ের বদান্যতায় আমার ভাই ভানু বসুর চাকরি হয়েছিল আনন্দবাজারে। তা ওই ভ্রান্তিবিলাসের কারণে সে চাকরিটা টেলিফোন অপারেটর রবিবাবুর ভাই পেয়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। ভাগ্যিস রবিবাবুর কোনও ভাই ছিল না, তাই বড় রকমের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। চাকরিটা আমার ভাই ভানুই পেয়েছিল। একই নাম হওয়ার কারণে আমাকে এইরকম অস্বস্তিতে বেশ কয়েকবার পড়তে হয়েছে। বেশ মজার মজার ঘটনাও ঘটেছে। তবে সেসব আলোচনার ক্ষেত্র তো এটা নয়। পরে সুযোগ পেলে সেসব শোনানো যাবে।

তা রবিবাবুর কথা শুনে আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। এত রাত্রে কে আমাকে অফিসে টেলিফোন করবে! রাত প্রায় দশটা বাজে এখন। বাড়িতে কোনও বিপদ-আপদ ঘটল না তো?

ওইসব চিন্তা করতে করতেই কাউন্টার থেকে রিসিভারটা কানে তুলে নিলাম। 'হ্যালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে প্রায় ধমকের সুর ভেসে এল : সারাদিন কোথায় থাকেন মশাই? বার চারেক টেলিফোন কারেও পাত্তা করতে পারিনি। অফিসটা তো কাজের জায়গা, না কি কেবল ফাঁকি মেরে সিনেমা দেখে বেড়ালেই চলবে?

ভদ্রলোকের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। বাড়িতে কোনও বিপদ-আপদ নয় তাহলে! কিন্তু ইনি এমন ধমকের সুরে কথা বলছেন কেন? অফিসের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কেউ নাকি? নাকি এটা অরূপবাবুরই কণ্ঠস্বর। টেলিফোনের মেটালিক আওয়াজের কারণে ঠিক ধরতে পারছি না।

তা যিনিই হোন, আমাকে তো উত্তর দিতেই হবে। বেশ বিনীত কণ্ঠেই বললাম : সিনেমা দেখাটাও তো আমার ডিউটির অন্তর্গত। তা আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?

ওপার থেকে ভদ্রলোক বললেন : ওহো! এটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনারা হলেন ফিল্ম ক্রিটিক। আপনাদের তো বিনে পয়সায় সিনেমা দেখার জন্মগত অধিকার।

আমি ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি যে, টেলিফোনের অপর প্রান্তের ভদ্রলোক আমার চাকরি খাবার মতো কেউ নন। তাই একটু তির্যক ভাবেই বললাম : আপনি ভুল বললেন স্যার। কথাটা জন্মগত হবে না। হবে কর্মগত।

ওপার থেকে ভদ্রলোক বললেন : সে যে গতই হোক গে যাক। বিনে পয়সায় সিনেমা দেখেন এটাই হল আদত কথা। তা সে বিনে পয়সাতেই দেখুন আর পয়সা দিয়েই দেখুন, আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু ফিল্ম রিভিউ করতে গিয়ে শিল্পীদের অত আমড়াগাছি করার দরকার কী!

আমি বললাম : আর কে কী করেন না করেন তা আমি বলতে পারব না। তবে আমি যাঁর যতটুকু

যা প্রাপ্য তাঁকে ততটুকুই দিই। অন্তত দেবার চেষ্টা করি।

ভদ্রলোক বললেন : তাই যদি হয় তাহলে এই সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় অনিল চাটুজ্যের অভিনয় নিয়ে অত মুক্তকচ্ছ হবার কারণটা কী? শুনেছি ভদ্রলোক আপনার বন্ধু। তা বন্ধু বলেই খবরের কাগজের পাতায় তাকে অমন করে বাঁশ দিয়ে ওপরে তুলতে হবে?

সেই সময়ে দেশ পত্রিকা প্রতি বুধবার প্রকাশিত হত। বুঝলাম ভদ্রলোক এরই মধ্যে ওই সপ্তাহের ফিল্ম রিভিউটা পড়ে নিয়েছেন। রিভিউটা কোন্ ছবির ছিল তা এখন আর মনে পড়ছে না। তবে ওই ছবিতে অনিল চ্যাটার্জি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। কাজেই রিভিউ করতে গিয়ে তাঁর প্রশংসা করতেই হয়েছিল। তবে বেশি নয়, মাত্র দুটি লাইন লেখা হয়েছিল ওঁর সম্পর্কে। বড়জোর বারো কী চোদ্দোটি শব্দ। তাতেই ভদ্রলোকের এত উষ্মা। অদ্ভুত ভদ্রলোক তো!

আমার একটু রাগ হয়ে গেল। তাই রাগত কণ্ঠেই বললাম : আপনি ছবিটা দেখেছেন?

ভদ্রলোক বললেন : দেখেছি মানে! হাড়ে হাড়ে দেখেছি। সমস্ত অস্থিমজ্জা দিয়ে দেখেছি।

ভদ্রলোকের কথাগুলো কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে মনে হল। অস্থিমজ্জা দিয়ে দেখা! সে আবার কেমনতরো বস্তু।

তা সে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে বললাম : আপনার কি অনিল চ্যাটার্জির অভিনয় ভাল লাগেনি?

ভদ্রলোক বললেন : একদম না। উনি ওই রোলটায় এর চেয়ে অনেক ভাল অভিনয় করতে পারতেন। সে ক্ষমতা ওঁর আছে। মনে হয় এ ছবিটায় উনি ফাঁকি মেরেছেন।

এ কী কথা! অমন সুন্দর অভিনয় করলেন অনিলবাবু, আর সেটা কিনা ওঁর ভাল লাগেনি! বলছেন কিনা অনিলবাবু এ ছবিতে ফাঁকি মেরেছেন। খুব রাগ হয়ে গেল ভদ্রলোকের ওপর। বললাম : আপনি অভিনয়ের ঘোড়ার ডিম বোঝেন। জীবনে কখনও অভিনয় করেননি তো! করলে বুঝতে পারতেন, যত ছোট কাজই হোক, এ ছবির অভিনয় অনিল চ্যাটার্জির জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

ভদ্রলোক টেলিফোনের ওপার থেকে সরস কণ্ঠে বললেন : এটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওই যে ঘোড়ার ডিম না কী বললেন, ওটাই খাঁটি কথা। ঘোড়ার যেমন ডিম হয় না, ব্যাপারটা অলীক কল্পনা, এ ছবিতে অনিল চ্যাটার্জির অভিনয়ও তাই। ভদ্রলোক প্রাণ দিয়ে, দাঁত মুখ খিচিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা আকাশকুসুম থেকে গেছে।

আমার রাগটা তখন আরও চড়ে গেছে। সেই তিক্ততা নিয়েই বললাম : আপনি তো ভারি নিন্দুক মশাই। টেলিফোনের ওপারে আত্মগোপন করে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতাকে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার নামটি জানতে পারি কি? না কি সত্যি পরিচয় দেবার সৎসাহস আপনার নেই।

ভদ্রলোক বললেন : অবশ্যই আছে। কিন্তু সে নামটা শুনলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন কী?

আমি বললাম : আপনি সত্যি পরিচয় দিলে বিশ্বাস করতে পারব না কেন?

ভদ্রলোক অতি বিনীত কণ্ঠে বললেন : অধমের নাম অনিল চট্টোপাধ্যায়।

এতক্ষণে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে আসল কণ্ঠস্বরটি বেরিয়ে এল। ইনি অনিল চ্যাটার্জিই বটেন। এতক্ষণ বোধহয় ইচ্ছে করেই কিছুটা বিকৃত স্বরে কথা বলছিলেন।

বললাম : এটা কী ধরনের রসিকতা হল অনিলবাবু?

অনিলবাবু বললেন : কোন্‌টার কথা বলছেন রবিবাবু? সেকেন্ড ভয়েসে কথা বলা, না আত্মসমালোচনা? কোন্‌টা?

আমি বললাম : দুটোই।

অনিলবাবু বললেন : কোনওটাই রসিকতা নয়। আপনি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেন তো? না করেন না?

আমি বললাম : অবশ্যই করি। প্রায় বিশ বছরের আলাপ-পরিচয়ের পরেও সে কথাটা বলার অপেক্ষা রাখে নাকি?

অনিলবাবু বললেন : তাহলে যতই কণ্ঠস্বরের হেরফের ঘটাই না কেন ওটা আপনার ধরে ফেলা

উচিত ছিল।

আমি বললাম : অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। মনটা একটু চঞ্চল হয়ে আছে তো! অফিসের গাড়িটা চলে গেলে এত রাতে ট্রাম-বাস পাব কি না সে ভাবনাটাই মাথার মধ্যে বেশি করে ছিল। তাই আপনার গলার স্বর বুঝতে পারিনি। কিংবা বলা যায় বোঝবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু এই যে এতক্ষণ ধরে অনিল চ্যাটার্জির অভিনয়ের কঠিন সমালোচনা করলেন, এটা কোন ধরনের রসিকতা।

অনিলবাবু বললেন : ওটা মোটেই রসিকতা নয় রবিবাবু। ওটা নির্ভেজাল আমার মনের কথা। নিজের অভিনয় আমার কোনও সময়েই ভাল লাগে না। মনে হয়, ইস্, এটা আমি কী করলাম। এটা আমার আরও ভাল করা উচিত ছিল। কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাই না।

আমি বললাম : ওটা খারাপ নয়। প্রকৃত শিল্পীর লক্ষণ। প্রকৃত শিল্পী যাঁরা তাঁরা নিজের কাজে কখনই তৃপ্তি পান না। কিন্তু আর দেড় ঘণ্টা পরেই রাত দুপুর হয়ে যাবে। এত রাতে আমার মতো অধমকে স্মরণ করার কী দরকার পড়ল জানতে পারি কি?

অনিলবাবু বললেন : আপনি অধমের মতো কাজ করেছেন, তাই!

আমি অবাক হয়ে গেলাম অনিলবাবুর কথা শুনে। বললাম : সে কী। আমি আবার অধমের মতো কাজ কখন করলাম!

অনিলবাবু বললেন : অধমের মতো কাজ নয়। আমার দু ফোঁটা চোখের জল কত ভ্যালুয়েবল্ সেটা জানেন! এই দু ফোঁটা চোখের জলের জন্যে পার-ডে অনেকগুলি করে টাকা গুণে দেন ছবির প্রোডিউসাররা। আপনার জন্যে সেই দু ফোঁটা চোখের জল একেবারেই বিনে পয়সায় ফেলতে হয়েছে।

আমি বললাম : আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

অনিলবাবু বললেন : বুঝতে পারছেন না? তাহলে বুঝিয়ে দিচ্ছি শুনুন। আপনার রিভিউতে আমার সম্পর্কে যে দুটো মাত্র লাইন লিখেছেন, আর সে লেখাটা এতই আন্তরিক যে আমার চোখে জল এসে গেল মশাই। আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। সকাল থেকে টেলিফোন করে এতক্ষণে আপনাকে ধরতে পারলাম।

বলতে বলতে অনিলবাবুর কণ্ঠস্বরটা যেন আবার ধরে এল।

ওঁর কথাগুলো আমাকেও ভয়ানকভাবে স্পর্শ করল। আট-দশ সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারলাম না। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললাম : আপনি এত ভাল অভিনয় করেন যে, যে কোনও ক্রিটিকই আপনার অভিনয়ের প্রশংসা করতে বাধ্য।

অনিলবাবু বললেন : করে না মশাই! করে না! প্রথম জীবনে অনেক ক্রিটিককে তেল দিয়েছি। তাঁরা মুখে অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু লেখার সময় হাতটা এমন কুঁচকে যেত যে ভাল কোনও বিশেষণ বেরোতেই চাইত না। আজকাল অবশ্য অনেকেই আমার সম্পর্কে ভাল কথা লেখেন, কিন্তু সত্যিকারের আন্তরিকতার অভাবটা তো টের পাওয়া যায়। যে কজন আন্তরিকভাবে আমার কাজের সমালোচনা করেন, আপনি তাঁদের মধ্যে একজন। আপনার মতো একজন বন্ধু পাওয়া সত্যিই আনন্দের ব্যাপার।

আমি বললাম : ব্যাপারটা তো উভয়ত। আপনার মতো একজন স্বনামখ্যাত বন্ধু থাকা তো আমার কাছেও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

অনিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : এই তো আবার আমড়াগাছি শুরু হয়ে গেল। নো নো রবিবাবু, দিস্ ইজ ভেরি ব্যাড। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা সহজ সরল থাকুক সেটাই আমি চাই।

তারপর এক সেকেন্ড নীরব থেকেই বলে উঠলেন : এই দ্যাখো, কথায় কথায় কত দেরি করিয়ে দিলাম আপনার। এগারোটা বাজে প্রায়। আপনার জন্যে অফিসের গাড়িটা বোধহয় আটকে আছে। ভেরি স্যরি। সামনের রবিবার চলে আসুন না বসুশ্রী কফি হাউসে। ডেইলি পেপারে ঢোকার পর তো আপনি আর আড্ডা দিতেই আসেন না!

আমি বললাম : যাব। খুব শীগগির একদিন যাব। সামনের রবিবার হয়তো হবে না। তার পরে একদিন যাব। আচ্ছা, এবারে রাখছি। গুড নাইট।

টেলিফোনের ওপার থেকে শোনা গেল : গুড নাইট।

তারপরই লাইনটা কেটে গেল।

এই হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। যেমন প্রচণ্ড রসিক, তেমনই প্রচণ্ড ইমোশ্যনাল। এরকম দিলখোলা নির্ভেজাল প্রাণবন্ত মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি আমার জীবনে। যে কজনকে পেয়েছি উনি তাঁদের মধ্যেও স্বতন্ত্র।

অনিল চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই আমার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। কবিতাটির শিরোনাম 'ধর্মেও আছো, জিরাফেও আছো'। অনিলবাবুও কিসের মধ্যে যে নেই তা আমি ভেবে পাই না। আমার কাছে বছর চারেক আগেরকার একটি ভিজিটিং কার্ড আছে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের, যেটি উনি নিজের হাতে আমাকে দিয়েছিলেন। সেই ভিজিটিং কার্ডে দেখতে পাচ্ছি অন্তত বাইশটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উনি কোনও কোনও না কোনও ভাবে সংযুক্ত। একটানা ওই অতগুলি প্রতিষ্ঠানের নাম পড়তে পাঠকদের হয়তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। তা সত্ত্বেও আমি সেগুলি প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারছি না। কারণ এর মধ্যে দিয়ে পাঠকরা বুঝতে পারবেন অনিলবাবুর কর্মকাণ্ড কতটা বহুমুখী। সেগুলি হল :

(১) ফেডারেশন অব ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট। (২) শিল্পী সংসদের প্রেসিডেন্ট। (৩) ইউথ গিল্ডের প্রেসিডেন্ট। (৪) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বেহালা শাখার সভাপতি। (৫) ওয়েলফেয়ার সেন্টার ফর মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড-এর চেয়ারম্যান। (৬) ঘাটশিলা বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদের প্রেসিডেন্ট। (৭) সাউথ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। (৮) পেইন্টার্স অ্যান্ড স্কালপটরসের একটি গ্রুপ, যেটির নাম ইমপ্রেশন এইট্টিসেভেন—তার প্রেসিডেন্ট। (৯) ছবি বিশ্বাস মঞ্চ নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান। (১০) কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট। (১১) ওয়েস্ট বেঙ্গল চার্টারের স্পেশ্যাল ওলিম্পিকসের ভাইস প্রেসিডেন্ট। (১২) ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট। (১৩) ফ্রেন্ডস অব সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট। (১৪) অল ইন্ডিয়া ফিল্ম এম্প্লইজ কনফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৫) ফুটবলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। (১৬) লুই ব্রেইলস্ মেমোরিয়াল স্কুল ফর দ্য সাইটলেস-এর প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান। (১৭) কমিটি ফর কমিউনাল হারমনি অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশনের জেনারেল সেক্রেটারি।

এই সতেরটি হল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এবারে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে আছেন অনিলবাবু, তার একটা হিসেব দিই। আগেই বলেছি এটা চার বছর আগেকার ভিজিটিং কার্ড। সুতরাং ইতিমধ্যে এই তালিকায় বেশ কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ঘটেছে। তার হিসেব আপাতত আমার কাছে নেই। সেগুলি সংগ্রহ করতে পারলে বারান্তরে আপনাদের জানিয়ে দেব। এখন উনি সদস্য হিসেবে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানে আছেন সেগুলি হল : (১৮) ভারত সরকারের সিনে ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্য। (১৯) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম সেন্টার 'নন্দন'-এর গভর্নিং বডির সদস্য। (২০) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিল্ম অ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্য। (২১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সদস্য। (২২) ভারত সরকারের সিনে আর্টিস্টস্ ওয়েলফেয়ার ফান্ড অব ইন্ডিয়ার ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য।

এছাড়াও গত বছর তিনি চৌরঙ্গি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

এই যে এতগুলি লেজুড় অনিলবাবুর নামের শেষে জোড়া আছে, এর কোনটাই কিন্তু তাঁর কাছে অর্নামেন্টাল পোস্ট নয়। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ভয়ানক ভাবে সক্রিয়। এতগুলি প্রতিষ্ঠানের কাজে তিনি সময় দেন কী ভাবে তা ভেবে অবাক হতে হয়। জানি অনিলবাবুর জীবনীশক্তি অফুরন্ত, কিন্তু একটা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এত কাজ করা কেমন করে সম্ভব সেটা ভেবে সত্যিই অবাক হতে হয়। আমাদের নামের পাশে একটা-আধটা লেজুড় থাকলেই আমরা ধরাকে সরা দেখি। অথচ এতগুলি

লেজুড় নিয়েও অনিলবাবু আগের মতোই মিশুকে, রঙ্গপ্রিয় এবং প্রাণবন্ত। কোনওরকম গুমোর তাঁর মধ্যে দেখিনি।

কেবল একটি দিন তাঁকে অন্য রকম দেখেছিলাম। সেটা চৌরঙ্গি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কয়েক দিন আগে। সেদিন অনিলবাবু আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, তাতে আমি রীতিমত অবাক হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এমন দিলখোলা একটি মানুষকেও দলীয় রাজনীতি বিষাক্ত করে দিতে পারল। কী অসীম ক্ষমতা আজকের রাজনীতির।

সেই দিনটার সেই ঘটনা আমার কাছে যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি বেদনাময়।

অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জীবনটাই হল বহুমুখী। একমাত্র দাম্পত্য জীবনের অংশটুকু ছাড়া। সারা জীবনে কয়েক হাজার মহিলার সঙ্গে ওঠাবসা করেছেন, ঘোরাফেরা করেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই বলতে পারবেন না, অনিলবাবু তাঁদের সঙ্গে অন্য কোনও ধরনের ব্যবহার করেছেন। অনিলবাবুর কাছে সেইসব মহিলাদের কেউ ছোট বোনের মতো, কেউ বা বড় দিদির মতো, আবার কেউ বা বউদির মতো। তার ওপর মাসীমা কাকিমাদের সংখ্যা তো অজস্র। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর সিনেমার লাইনে আছেন, কিন্তু অনিলবাবুর চরম শত্রুও (যদি থাকেন অবশ্য) তাঁর চরিত্র নিয়ে কোনও অপবাদ দিতে পারবেন না।

এই নিয়ে কবি ও সাহিত্যিক শ্রীমতী কবিতা সিংহ একবার আমাকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। কবিতা বলেছিলেন : আপনি প্রায় এক ঘণ্টার মতো সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে একটিবারও অনিলবাবুর প্রেমজীবন নিয়ে প্রশ্ন করতে পারলেন না!

ঘটনাটা ঘটেছিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে। একবার ওঁরা ঠিক করলেন অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের একটা দীর্ঘ ইন্টারভিউ ব্রডকাস্ট করবেন। কবিতা তখন ওখানকার একজন প্রথম সারির প্রোগ্রাম এক্‌জিকিউটিভ। ইন্টারভিউ নেবার দায়িত্বটা কবিতা জোর করে আমার ওপরেই চাপিয়ে দিলেন। আমার এ ব্যাপারটাতে আদৌ আপত্তি ছিল না। তার প্রথম কারণ, অনিলবাবু আমার বন্ধু। সে বন্ধুত্ব দীর্ঘকালের। ওঁর জীবনের অনেক উত্থান-পতনের ঘটনা আমার জানা। দ্বিতীয় কারণ, ফিল্ম লাইনে ওঁকে অনেক সংগ্রাম করতে করতে পায়ের নিচের মাটি জোগাড় করতে হয়েছে। তৃতীয় কারণ, ওই ভদ্রলোকের কর্মকাণ্ডের বহুমুখী ধারা।

তবে কিছুটা ভয় যে ছিল না তা নয়। সামান্য একটু এধার ওধার হলেই অনিল চ্যাটার্জি দুম করে রেগে যান। দপ্ করে জ্বলে ওঠেন আগুনের মতো। তখন কাউকে তিনি রেয়াত করেন না। তা তিনি যত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই হোন না কেন! এমন বেশ কিছু ঘটনা আমার জানা আছে। ফিল্ম লাইনের বিশ্ববিখ্যাত এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওঁর সংঘাত ঘটেছিল। তা নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছিল। কিন্তু সেসব আলোচনা আমি এখানে করতে চাই না। সেই বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এখন পরলোকগত। কাজেই সে সব আলোচনা এখন আমার কিংবা অনিলবাবুর—দু'জনের কাছেই অস্বস্তিকর লাগবে। সুতরাং ও ব্যাপারটা অনুল্লেখ থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবু সামান্য একটু ইঙ্গিত দিলাম এটাই বোঝাবার জন্য যে, অনিলবাবু একজন অকুতোভয় পুরুষ। জীবনে কোনদিন কাউকে ছেড়ে কথা কননি। বিশেষ করে যেখানে তিনি নির্দোষ। কিন্তু যেখানে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনিই দোষী, সেখানে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিতেও তাঁর বাধে না। মানবিক এই গুণটি তাঁর ভয়ানক ভাবে আছে।

তা কবিতার কথা শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম : অনিল চট্টোপাধ্যায় যে একজন বিশ্বপ্রেমিক, সেটা তো আমার বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও আপনি বলছেন আমি ওঁর প্রেমজীবন নিয়ে প্রশ্ন করিনি একবারও।

কবিতা বললেন : না না, আমি সে প্রেমের কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, উনি তো এত ছবিতে অভিনয় করেছেন, কত নায়িকার সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের কারও সঙ্গেই কি ওঁর কোনও রোম্যান্টিক সম্পর্ক ঘটেনি? সেই প্রশ্নটা করবার কথাই বলছিলাম।

আমি বললাম : হায় কপাল! সে প্রশ্ন করব কাকে? অনিল চাটুজ্যেকে? না না কবিতা, ওঁর জীবনে কোনও রোম্যান্টিক ঘটনা-টটনা নেই। সেটা আমি ভাল করেই জানি। শুধু আমি কেন, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির

তাবত মানুষ জানে। মহিলাদের সঙ্গে ওঁর কোনও জৈবিক ব্যাপার নেই। যা আছে তার সবটাই যৌগিক। গঙ্গাজলের মতো পবিত্র।

তা কবিতার কোনও দোষ নেই। যে মানুষটি মাত্র বাইশ বছর বয়স থেকে ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত সেই টগবগে যৌবন নিয়ে পথভ্রষ্ট হবার আশঙ্কাই তো বেশি। সেখানে একজন মানুষ যে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ থাকতে পারেন এটা বিশ্বাস করাই তো শক্ত। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই অনিল চ্যাটার্জির জীবনে ঘটেছে।

এর একটা বড় কারণ আছে। অনিলবাবু যাঁকে দেখে, যাঁর অনুপ্রেরণায় ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সেই মানুষটি আমাদের সকলের কাছেই একজন শ্রদ্ধেয় পুরুষ। তিনি হলেন সবার প্রিয় কালাচাঁদদা। তবে কালাচাঁদ নামে তাঁকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছাড়া আর কেউ চিনবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর পোশাকি নামে তাঁকে সকলেই চিনতে পারবেন। সেই পোশাকি নামটি হল অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

কালাচাঁদদাকে অনিলবাবু খুব ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। চিনতেন সেই ভাগলপুর থেকেই। কালাচাঁদদা ভাগলপুরের মানুষ। ওখানে সবাই ওঁকে একডাকে চেনেন। কিন্তু অনিলবাবু তো ভাগলপুরের মানুষ নন। তিনি দিল্লির মানুষ। পুরো স্কুলজীবনটা তাঁর দিল্লিতে কেটেছে। পরে কলেজের পাঠ নেবার জন্যে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। এই কলেজ জীবনটা অনিলবাবুর খুবই উজ্জ্বল। পরবর্তীকালে তো তিনি এই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। এবং এটা যে খুবই সম্মানজনক ব্যাপার সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

যাক আবার ভাগলপুরের কথায় আসি। অনিলবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরের কী সম্পর্ক? এটা নিয়ে তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম।

অনিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আরে ভাগলপুরের সঙ্গে আমার তো খুবই মধুর সম্পর্ক। ওখানে যে আমার মামাবাড়ি। কথায় আছে না, 'তাই তাই তাই, মামার বাড়ি যাই, মামার বাড়ি ভারি মজা কিলচড় নাই।' তা আমিও সেই মধুর জীবনের আস্বাদ পেয়েছি ভাগলপুরে গিয়ে।

আমি বললাম : অর্ধেন্দুদা কি আপনার মামার বাড়ির সম্পর্কিত কেউ হন?

অনিলবাবু বললেন : না, অর্ধেন্দু মুখার্জি আমার মামার বাড়ির সম্পর্কিত কেউ নন। কিন্তু আর একদিক থেকে উনি ছিলেন তার চেয়েও বেশি।

আমি বললাম : তার মানে?

অনিলবাবু বললেন : অর্ধেন্দু মুখার্জি ছিলেন ভাগলপুরের বাঙালি সমাজের পরম গর্ব। তাঁদের সকলের আত্মার আত্মীয়।

আমি বললাম : কিন্তু তার কারণটা কী বলবেন তো।

অনিলবাবু বললেন : অর্ধেন্দু মুখার্জি ছিলেন ভাগলপুরের কালচারাল কিং। সেই আমলে তিনি শিশির ভাদুড়ির সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। প্রমথেশ বড়ুয়ার সান্নিধ্যেও এসেছেন। এমন একটি মানুষ ভাগলপুরের বাঙালি সমাজের গর্ব হবেন না তো কে হবে! তাছাড়া উনি তো ভাগলপুরেরই মানুষ। সেই কারণে ভাগলপুরের মানুষের তিনি আত্মার আত্মীয়।

আমি বললাম : তা আপনার সঙ্গে কি সেই ছোটবেলা থেকেই অর্ধেন্দুদার আলাপ ছিল নাকি?

অনিলবাবু বললেন : তা ছিল বইকি। মামার বাড়ির দেশের একজন কৃতী পুরুষ। সবাই তো তাঁর ফ্যান। সেই ছোঁয়াচটা তো আমার মনেও লেগেছিল। তবে খুব যে একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল তা নয়। বেশ রাশভারি গুরুগম্ভীর মানুষ ছিলেন তো!

আমি বললাম : অভিনয় জগতের ওই কৃতী পুরুষটিকে দেখেই কি আপনার মনে অভিনেতা হবার ইচ্ছে জেগেছিল?

অনিলবাবু বললেন : একদম না। আমি তো কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি অভিনয় করব।

আমি বললাম : তাহলে?

অনিলবাবু বললেন : কলেজের পাঠ সাঙ্গ কবার পর আমি তো একটা বড় দরের চাকরিতে

ঢুকেছিলাম হে।

হ্যাঁ, অনিলবাবু একটা বেশ বড় মাপের চাকরি করতেন। এবং তাঁর চাকরি জীবনটা ছিল খুবই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু সেসব কথায় পরে আসছি। তার আগে ওঁর সিনেমায় আসার ইতিহাসটা জেনে নিই।

অনিলবাবু বললেন : ঘটনাচক্রে অর্ধেন্দু মুখার্জির কাছাকাছি হতে হয়েছিল একটা ব্যাপারে। ভাগলপুরের সুবাদে উনি আমার মুখটাই চিনতেন। আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতেন না। কিন্তু কলকাতায় দেখা হবার পর উনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ খুশি হলেন বলে মনে হল।

আমি বললাম : আপনিও অমনি সঙ্গে সঙ্গে চান্স চাইলেন অভিনয় করার?

অনিলবাবু বললেন : দূর পাগল! আমি কি ওঁর কাছে অভিনয় করবার জন্য দরবার করতে গিয়েছিলাম নাকি! আমি গিয়েছিলাম এমনি আলাপ পরিচয়টা প্রগাঢ় করতে।

আমি বললাম : তারপর?

অনিলবাবু বললেন : আমার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলববার পর উনি একবার যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন : তোমাদের মতো শিক্ষিত আর সংস্কৃতিমান ছেলেরা যদি আমাদের এই ফিল্ম লাইনে আসত, তবে এই ইন্ডাস্ট্রির চেহারাটা বদলে দেওয়া যেত। দুঃখের কথা কী জানো, ভাল ভাল ছেলেরা বড় বড় চাকরির স্বপ্ন দেখে। অর্থ আর প্রতিপত্তির স্বপ্ন দেখে। আর্ট আর কালচারের কথাটা একদম ভাবে না।

আমি বললাম : কালাচাঁদদার ওই কথার উত্তরে আপনি কী বললেন?

অনিলবাবু বললেন : আমি কিছুই বলিনি। ফিল্ম লাইনে আসা কথাটার অর্থ তো তখন আমার কাছে একটাই। অভিনয় করা। কিন্তু অভিনেতা হবার ব্যাপারে আমার তীব্র অনীহা ছিল।

আমি বললাম : কেন?

অনিলবাবু বললেন : অত্যন্ত সহজ কথা। সাহেবি স্কুল-কলেজে পড়ে কে আর অভিনেতা হতে চায় বলো। সবার মনেই অন্য ধরনের উচ্চাকাঙক্ষা থাকে। এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আমি বললাম : তারপর মতটা বদলাল কী করে?

অনিলবাবু বললেন : বদলাল পিনাকী মুখার্জিকে দেখে।

আমি বললাম : কেন? পানুদাকে দেখে মত বদলাবার কারণটা কী?

অনিলবাবু বললেন : পিনাকী মুখার্জি হলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। তিনি যখন অন্য সব উচ্চাকাঙক্ষা বিসর্জন দিয়ে ফিল্মটাকে কেরিয়ার করে নিতে পারেন, তাহলে আমার ক্ষেত্রে বাধা কী!

আমি বললাম : পানুবাবু তো অভিনেতা হননি। তিনি হয়েছিলেন পরিচালক। তার সঙ্গে আপনার ভাবনা-চিন্তা বদলের কারণটা কী?

অনিলবাবু বললেন : ওই দ্যাখো। আবার সেই অভিনেতার প্রসঙ্গটা আসছে। আমি কি অভিনেতা হবার জন্যে ফিল্ম লাইনে এসেছিলাম?

আমি বললাম : তবে কী হতে এসেছিলেন?

অনিলবাবু বললেন : এসেছিলাম পরিচালক হতে। ফিল্ম ডিরেকটার।

আমি বললাম : মাই গড! তাই তো। এখন তো মনে পড়ছে, আজ প্রোডাকসন্সের 'যোগ বিয়োগ' ছবির টাইটল কার্ডে আপনার নাম তো দেখেছি সহকারী পরিচালক হিসেবে। তা আমি ভেবেছিলাম উনি হয়তো অন্য কোনও অনিল চট্টোপাধ্যায়। আপনার নামটা এতই কমন যে যে কোনও পেশাতেই কয়েক শো করে অনিল চট্টোপাধ্যায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই তো আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র থেকে বাংলা খবর পড়েন এক ভদ্রলোক, তাঁরও নাম অনিল চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা শুনে অনিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : গ্রেট ম্যানদের নাম তো অনিল চট্টোপাধ্যায়ই হওয়া উচিত। যদিও তুমি মনে করো না যে আমি নিজেকে গ্রেট ম্যান বলে ক্লেম্ করছি।

হ্যাঁ, অনিলবাবু এইরকমই রসিক পুরুষ। উনি যখন যেখানে থাকেন সেখানটাতে রসের ছোঁয়া দিয়ে

ভরিয়ে রাখেন। সে স্টুডিওর ফ্লোরেই হোক, কিংবা বসুশ্রী কফি হাউসেই হোক, অথবা হাজরা রোডের মোড়ে পানের দোকানের সামনেই হোক।

এই তো এবারের কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কম হাসিয়ে মেরেছেন আমাদের। একেবারে উঠতি বয়সের ছেলেরা যে ধরনের রঙ্গ-রসিকতা করে ঠিক সেই রকম। মিনিস্টার কে পি সিংদেও মশাইয়ের ডিনার পার্টিতে গিয়েও ঠিক সেই অবস্থা। সর্বক্ষণ মজা করতে করতে কাটালেন। অথচ উনি এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার একজন সম্মানিত সদস্য। প্রায় এক ডজন সরকারী আর বেসরকারী কমিটির প্রেসিডেন্ট, অথবা ভাইস প্রেসিডেন্ট কিংবা সেক্রেটারি। কিন্তু ওইসব গরুগম্ভীর তকমা ওঁকে কিছুতেই রামগরুড়ের ছানাতে পরিণত করতে পারেনি।

যাক, যে কথা বলছিলাম। আগের কথার রেশ টেনে অনিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : হঠাৎ আপনার চিত্রপরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হবার সাধ হল কেন?

অনিলবাবু বললেন : বা রে! ফিল্ম ডিরেকটারদের সম্মান কত' একটা ছবি তৈরির ক্ষেত্রে তিনি হলেন ঈশ্বরের মতো। তিনি রাজা, আর সবাই হলেন তাঁর প্রজা। তাঁর হুকুমেই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যত বড় অভিনেতাই হোন না কেন তাঁর নির্দেশ মাথা হেঁট করে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হচ্ছে। কাজেই মনে মনে ঠিক করে নিলাম, ফিল্ম লাইনে যদি আসতেই হয় তাহলে ডিরেকটার হবার জন্যেই আসা উচিত। অভিনেতা হবার জন্যে নয়।

আমি বললাম : কিন্তু অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ও তো অভিনেতা হিসেবেই ফিল্মে এসেছিলেন।

অনিলবাবু বললেন : তা ঠিক। তবে উনি অভিনয় আর পরিচালনা দুটো নৌকোতেই পা রেখেছিলেন। পরের দিকে যখন পরিচালক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন তখন কদাচিৎ অভিনয় করতেন।

আমি বললাম : সেই জন্যেই আপনিও বুঝি দু' নৌকোতেই পা রেখেছিলেন? 'যোগ বিয়োগ' ছবিতে একদিকে আপনি সহকারী চিত্র পরিচালক, অন্যদিকে আবার অভিনেতাও।

অনিলবাবু বললেন : আরে না না। ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। আমার মূল কাজ ছিল পরিচালকের সহকারিত্ব। তবে ওই ছবিতে একটা চরিত্রে নেমে পড়েছিলাম হঠাৎ খুশির খেয়ালে। তাছাড়া আমি তো ওই চরিত্রটাতে অভিনয় যাকে বলে, সেসব কিছুই করিনি।

আমি বললাম : তাহলে ওটা কী করেছিলেন বলে আপনার ধারণা?

অনিলবাবু বললেন : ওটাতে তো আমি যে ভাবে কথাবার্তা বলি, চলাফেরা করি, রঙ্গতামাসা করি, সেটাই করেছিলাম। তা ওটাই যে অভিনয়ের মূল ব্যাপার, ওই ন্যাচারাল বিহেভ করা, তা কেমন করে জানব বলো।

আমি বললাম : ফিল্ম অ্যাকটিং-এর মূল ব্যাপারটাই তো তাই।

অনিলবাবু বললেন : সেটা তো আমি পরে বুঝতে পারলাম। তার আগে তো অভিনয় বলতে অন্য কিছু বুঝতাম।

আমি বললাম : কী বুঝতেন?

অনিলবাবু বললেন : আমার ধারণা ছিল অভিনয় মানে একটা দারুণ গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তাতে ন'রকমের রস থাকবে। বীররস, করুণ রস, হাস্যরস ইত্যাদি আরও কী কী সব রস আছে না। তা সেসব করতে গেলে নাকি অনেক দিন ধরে ট্রেনিং নিতে হয়। শব্দপ্রক্ষেপণের নানান সব কায়দাকানুন জানতে হয়।

আমি বললাম : হ্যাঁ, ওগুলোও তো জানতে হয়, শিখতে হয়। তবে সিনেমার ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করতে হয় অন্যভাবে।

অনিলবাবু বললেন : সেটা তো উপলব্ধি করলাম অনেক পরে। যখন আমি পেশাদার অভিনেতা হব বলে মনস্থ করলাম, তখন।

আমি বললাম : তার আগে যা কিছু অভিনয় করেছেন সেটা কি নিছক মজা পাবার জন্যেই?

অনিলবাবু বললেন : খানিকটা তাই।

আমি বললাম : তাহলে আপনি যে কিছুদিন সাংবাদিকতা করেছিলেন, সেটাও কি ওই নিছক মজা

পাবার ব্যাপার?

অনিলবাবু বললেন : না। ওটা সিরিয়াসলিই করতে চেয়েছিলাম। তবে তার পেছনেও অন্য একটা কারণ আছে।

ইংরেজিতে একটা কহাবত আছে। 'জ্যাক অব অল ট্রেডস্, মাস্টার অব নান্'। কথাটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সত্য। কিন্তু কোথাও কোথাও তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন ঘটেছে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। ভদ্রলোক জ্যাক্ অব সো মেনি ট্রেডস্, কিন্তু মাস্টার অব নান্, এ কথাটি কোনওমতেই বলা চলবে না। অনিলবাবু আজ পর্যন্ত যে যে ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েছেন অথবা হাত দিয়েছেন, তার সব কটিতেই সাকসেসফুল।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন আমার এই মন্তব্য সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা করতে পারেন : কই, অনিল চ্যাটার্জি তো চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না।

না, পারেননি। তবে এই উদাহরণটা তো অনিলবাবুর অকৃতকার্যতার কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ তিনি তো কোনও ছবির পরিচালনার কাজে হাতই দেননি। তিনি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। এবং সে কাজটা তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন বেশ কয়েক বছর যাবৎ। তাঁর সময়কালে তিনি ছিলেন প্রথম সারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরদের অন্যতম। অভিনয়কে পুরোপুরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সহকারী পরিচালকের কাজ করেছেন। পরে প্রচুর ছবির অভিনয়ের কাজ হাতে এসে যাওয়ায় তিনি ওই সহকারিত্বের পেশাটিকে গুডবাই করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে ওই বিভাগে অনিলবাবু এমনই একজন কৃতী পুরুষ যে আজও তাঁকে চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের সংস্থা ফেডারেশন অব ফিল্ম টিকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব বহন করে চলতে হচ্ছে।

সুতরাং যে কাজে তিনি হাতই দিলেন না, সেই চিত্রপরিচালক হিসেবে তিনি যে অকৃতকার্য, এই কথাটা বলি কোন্ মুখে!

তবে অনিলবাবুর মনোগত বাসনা ছিল চিত্রপরিচালক হবার। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চলচ্চিত্রের অঙ্গনে পা রেখেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সেই অভিলাষ পূরণ করেননি। ঘটনাচক্র তাঁকে অভিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

এটা নিয়ে অনিলবাবুকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম : আপনি তো ছবির পরিচালক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফিল্মে এসেছিলেন। তা সেটা ত্যাগ করলেন কেন?

অনিলবাবু বললেন : আমি তো ত্যাগ করিনি। সারকামস্ট্যান্স আমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

আমি বললাম : তার মানে?

অনিলবাবু বললেন : বারো-চোদ্দোখানা ছবিতে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। সেইসব অভিজ্ঞতার ফলে যখন আমার মনে হল এবারে ইনডিভিজুয়ালি ছবি করা যেতে পারে, তখন সে ব্যাপারে একটু-আধটু চেষ্টা যে করিনি তা নয়। কিন্তু কোনও ফল হল না।

আমি বললাম : কেন?

অনিলবাবু বললেন : তখন সে সব প্রডিউসার ছবি করতেন, তাঁরা আমার মতো একজন ইয়াং টেকনিসিয়ানের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি বোধহয়। তাঁরা ভাবতেন বয়সে একটু প্রবীণ না হলে ছবি তৈরির যোগ্যতা অর্জন করা যায় না।

আমি বললাম : সেটা ঠিক। ওই সময়ে দু-একজন ছাড়া কোনও ইয়াংম্যানকে ছবি করতে দেখা যায়নি। নতুন যাঁরা ছবি করতে এসেছিলেন তখন, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রায় যৌবন-উত্তীর্ণ। কেউ কেউ তো প্রৌঢ়ত্বের কোঠাতেই পা রেখেছিলেন প্রথম ছবি করার সময়।

অনিলবাবু বললেন : তাছাড়া তখন ইয়াং ডিরেক্টরদের স্কোপ কোথায়? পুরনো যাঁরা ছবি করছিলেন, তাঁরা এতই অ্যাকটিভ ছিলেন, এত ভাল ভাল ছবি করেছিলেন যে প্রোডিউসাররা নতুন কাউকে দিয়ে ছবি করানোর কথা তো চিন্তাতেই আনতেন না।

আমি বললাম : তার পর এই দীর্ঘকালে আর কোনও চেষ্টা করেননি?

অনিলবাবু বললেন : সত্যি কথা বলতে কী তেমনভাবে চেষ্টা আর করিনি। আসলে তখন অভিনয় নিয়ে এত মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশই ছিল না। তখন তো হাতে ছবির পর ছবি। হিরো করছি, ভিলেন করছি, ভাই করছি, দাদা করছি, এমন কি বন্ধুর রোলও করছি।

আমি বললাম : আপনার সাহস তো বড় কম নয়। নিজের ইমেজ নষ্ট হবার ভয়-ডর কি আপনার ছিল না?

অনিলবাবু বললেন : ইমেজ-নষ্টের ভয়-ডরের কথা উঠছে কেন?

আমি বললাম : বা রে! যাঁরা হিরো করেন তাঁরা যদি তার পাশাপাশি ছোটখাটো রোল করেন তাহলে হিরোর যে একটা ইমেজ সেটা রইল কোথায়?

অনিলবাবু বললেন : দূর মশায়! আমি কোনওদিন ওসব ইমেজ-টিমেজ নিয়ে ভাবি না। ইমেজটা আবার কী! আমি অভিনেতা। ভাল রোল পেলেই আমি করব। ওই যে তোমাদের ভাষায় হিরো, যে নায়িকার সঙ্গে প্রেম করবে, বিরহে যন্ত্রণা পাবে, তারপর আবার একদিন তাদের মিলন হবে, এ তো একটা বাঁধাধরা ছকের ব্যপার। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? তাই আমি সব ধরনের রোল করার পক্ষপাতী। অভিনয় করে যদি আনন্দই না পেলাম তাহলে আর অভিনয়ের ব্যাপারটাকে আঁকড়ে পড়ে থেকে লাভ কী! হ্যাঁ, স্বীকার করছি হিরোর রোল করলে টাকাটা অনেক বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু টাকাটাই কি সব? টাকার জন্যে আমি মশাই জীবনের সব আনন্দ বিসর্জন দিতে রাজি নই। তাছাড়া আমি আমার ভবিষ্যৎটা অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলাম।

আমি বললাম : কিসের ভবিষ্যৎ?

অনিলবাবু বললেন : আমার অ্যাকটিং কেরিয়ারের।

আমি বললাম : তাই নাকি? সেটা কী রকম?

অনিলবাবু বললেন : আমাদের ফিল্মে নায়ক-জীবনের স্থায়িত্ব খুবই অল্পদিনের। কারও কারও ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন উত্তম। কিন্তু সবাই তো আর উত্তমের মতো ভাগ্য করে আসে না। বেশিরভাগ হিরোকেই একদিন জিরো হয়ে যেতে হয়।

আমি বললাম : তাই কি?

অনিলবাবু বললেন : নিশ্চয় তাই। আজ যিনি হিরো হিসেবে বাজার গরম করে রেখেছেন, কাল দেখা গেল আর একজন হিরো এসে তাঁর সেই বাজারটি দখল করে বসলেন। তাছাড়া বয়সের ব্যাপারটা তো আছেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোম্যান্টিক হিরো হিসেবে বেমানান হয়ে গেলে। তখন তুমি সারভাইভ করবে কীভাবে?

আমি বললাম : কেন, তখন তিনি ক্যারেক্টার রোলে চলে যাবেন।

অনিলবাবু বললেন : ব্যাপারটা অত সহজ নয় বন্ধু। আজ তুমি একটা রাজ্যের রাজা। কাল তোমাকে বলা হল তুমি আজ থেকে তোমার সেই রাজপ্রাসাদের প্রহরী। তুমি সেটা মেনে নিতে পারবে?

আমি বললাম : সেটা মেনে নেওয়া তো সম্ভব নয়। কেউ মেনে নিতে পারে না।

অনিলবাবু বললেন : সেটা মেনে নিতে না পারলে তোমাকে রাজপুরী থেকে বিদায় নিতে হবে। আমাদের বাংলা ছবির অনেক হিরোকে দেখেছি ক্যারেক্টার রোলে আসাটা আর মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তাঁর অভিনয় জীবনের ইতি ঘটে গেল। আমার কিন্তু সে ভয়টা ছিল না। আমি হিরো করার পাশাপাশি ক্যারেক্টার রোলে কাজ করে গেছি। কাজেই আমাকে ক্যারেক্টার রোল করতে দেখলে কোনও দর্শকই ভাববেন না যে হিরোর রোল জুটছে না বলে ব্যাটাকে ক্যারেক্টার রোল করতে হচ্ছে। সুতরাং আমার ইমেজ হারাবার কোনও ভয়ই নেই।

আমি বললাম : ওরে বাবা! আপনি এতদূর ভেবে রেখেছিলেন?

অনিলবাবু বললেন : ভাবব না! যে লাইনে ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি, সেই জীবনে তো কোনও ভবিষ্যৎ নেই। গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। কিন্তু আমি তো চোখের সামনেই দেখতে পেতাম, কত নট দেহপট থাকতে থাকতেই সব হারিয়ে বসে আছে। আমি সব সময়ে তাই সতর্ক থাকতাম যাতে ওই হারাধনদের দলে নাম লেখাতে না হয়। শেষ বয়সে তো আর অন্য

কিছু করতে পারব না। কেউ আমাকে খাতির করে চাকরি-বাকরিও দেবে না। অথচ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ছেলেপুলেদের মানুষ করে তুলতে হবে। তাই অন্ধকার ভবিষ্যতের চেহারাটা কল্পনা করে নিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে রাখতাম। তবু কি সব দিক সামলে উঠতে পেরেছি! একটা সময়ে গাড়িটা বিক্রি করে দিতে হল। আর আজ তো দেখলে তোমার চোখের সামনেই কয়লাওলা এসেছিল টাকার তাগাদা দিতে।

সত্যি কথা। একটা সময়ে অনিলবাবুকে খুবই বিপন্ন হয়ে পড়তে হয়েছিল। কাজকর্ম একদম কমে গিয়েছিল। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর তো! তাই সব বিপর্যয় সামলে উঠতে পেরেছেন।

ওই সময়ে অনিলবাবুর চরিত্রের আর একটা দিক দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড অর্থাভাব, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মুখের হাসিটি ম্লান হতে দেখিনি। নিজের দারিদ্র্য নিয়ে নিজেই রসিকতা করেছেন, আর হা হা করে হেসেছেন। ওঁর সেই হাসির দাপটে দারিদ্র্য নামক শয়তানটি পালাতে পথ পায়নি।

এটাও তাঁর একটা বড় সাকসেস। এমন করে দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করতে ক'জন পারে?

এবারে ওঁর চরিত্রের আর একটি দিকের কথা আলোচনা করি। সেটা হল ওঁর সাহিত্যবোধ। সাহিত্যপ্রীতি। ওঁর একটি রচনা আমি পড়েছি আর সেটা পড়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভেবেছি, এই মানুষটি কেন সাহিত্যিক হবার চেষ্টা করলেন না। একটু চেষ্টা করলেই যে উনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারেন সেটা আজও আমি বিশ্বাস করি।

এই সাহিত্যের ব্যাপারে একবার অনিলবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওঁর প্রচণ্ড সাহিত্যপ্রীতি দেখে প্রশ্ন করেছিলাম : আপনার এই সাহিত্যপ্রীতিটা কবে থেকে জন্মেছে?

অনিলবাবু বললেন : এটা আমার ছোটবেলা থেকে। দেশী-বিদেশী লেখকদের লেখা প্রচুর সাহিত্য পড়তাম। পরে যখন ফিল্মে এলাম, তখন পড়াশোনার মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে দিলাম। আমি তো সিনেমার পরিচালক হতে চেয়েছিলাম। আর একজন পরিচালকের সাহিত্য সম্পর্কে বোধ তো অবশ্যই থাকতে হবে।

আমি বললাম : পরে তো সে সব বাসনা বিসর্জন দিয়ে অভিনেতা হয়ে গেলেন। তো অভিনেতা হতে গেলেও কি নিয়মিত সাহিত্যপাঠ করতে হবে?

অনিলবাবু বললেন : নিশ্চয়। সাহিত্য হল জীবনের দর্পণ। তা দর্পণটি তোমার সামনে না থাকলে তুমি তোমার মাথার চুলে টেরিটি বাগাবে কেমন করে?

অনিলবাবু কথাটা রসিকতার ছলে বললেন বটে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থটা গভীর ব্যঞ্জনাময়। একটু ভেবে দেখলেই এই কথাটার মানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

এই সাহিত্যপ্রীতি ছিল বলেই একটা সময়ে, যখন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, তখন তিনি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল অধুনালুপ্ত 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। উনি ছিলেন ওই পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক।

সিনেমা জগৎ নামটা শুনলে সকলেরই মনে হবে ওই পত্রিকায় সব সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারই থাকত। কিন্তু তা নয়। ওই পত্রিকায় উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সবই থাকত। পার্সেন্টেজের হিসেবে বলতে হয় সাহিত্যের ব্যাপার থাকত শতকরা ষাট ভাগ। বাকি চল্লিশ ভাগ সিনেমা এবং অন্যান্য। অতএব এই পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হলে সাহিত্যবোধ থাকতেই হবে।

তা ওই সিনেমা জগৎ উল্টোরথ, দুটি পত্রিকারই মালিক ছিলেন প্রসাদ সিংহ আর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন গিরীন্দ্র সিংহ। গিরীনদা আবার আজ প্রোডাকসন্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের কাজ করতেন অনিল চ্যাটার্জিরই মতো।

ওই গিরীনদার সঙ্গেই অনিলবাবু এসেছিলেন উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর দফতরে। এবং অনতিকাল পরেই সহকারী সম্পাদকের পদে বৃত হয়েছিলেন।

অনিলবাবু বোধহয় বছর দুই-তিন এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেদিন শুটিং থাকত সেদিন আসতে পারতেন না। কিন্তু অন্যান্য দিনগুলিতে তিনি যথারীতি সম্পাদকীয় দফতরে হাজিরা দিতেন।

সিরিয়াসলি সব কাজকর্ম করতেন।

এইভাবে চলতে চলতে তিনি হঠাৎ একদিন সাংবাদিকতার কাজটিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন।

আমি অনিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি তো সাংবাদিকতার পেশাটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন। হঠাৎ গুডবাই করলেন কেন?

অনিলবাবু বললেন : অভিনয়ের ব্যাপারে যখন ঘোরতরভাবে জড়িয়ে পড়লাম তখন আর দু'নৌকায় পা দিয়ে চলা সম্ভব হল না।

আমি বললাম : তাতে কী! অবসর সময়ে যখন পারতেন ওঁদের অফিসে যেতেন। প্রতি মাসে কাগজে তো সহকারী সম্পাদক হিসেবে নামটা ছাপা হত।

অনিলবাবু আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : তুমি বলছ কী রবি! সামান্য নাম ছাপানোর মোহে আমি আমার বিবেকের সঙ্গে তঞ্চকতা করব! এটা তো একটা ক্রাইম। আমি যখন যেটার সঙ্গে যুক্ত হই সেটা সিরিয়াসলি করি। নাম-কা-ওয়াস্তে কোনও কাজ আমি করি না। করতে চাই না। ওই ব্যাপারটাকে মনেপ্রাণে দারুণভাবে ঘেন্না করি।

অনিলবাবু জার্নালিজম ছেড়ে দেবার পর আমি ওই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিই। অনিলবাবু তখন মাঝেমধ্যে ওখানে বেড়াতে আসতেন। আমি তাঁকে কর্মরত অবস্থায় দেখিনি। তবে তাঁর কর্মকুশলতার গল্প প্রচুর শুনেছি সহকর্মীদের কাছ থেকে।

এবারে অনিলবাবুর সাহিত্যরচনা সম্পর্কে আমার মুগ্ধতার প্রসঙ্গে আসি।

১৯৬৮ সালে আমি প্রসাদ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে একটি বিশেষ উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশ করি। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, সংগীত পরিচালক, গীতিকার, নাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক, ক্রীড়াবিদ্, ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও সেই বিশেষ সংখ্যায় উত্তমকুমার সম্পর্কে লেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এবং প্রথম যে রচনাটি হাতে পেয়েছিলাম, সেটি অনিল চট্টোপাধ্যায়ের। আজ এত বছর পর আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেই অপূর্ব রচনাটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। কী অসাধারণ বাঁধুনি অনিলবাবুর সেই লেখাটিতে। উনি রচনাটির নামকরণ করেছিলেন 'উত্তম ভাবনা'। তারপর লিখেছিলেন .

"১৯৫২ সালে চলচ্চিত্র শিল্পে সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগ দেওয়ার আগেই পরিচয়। সেদিন অবিশ্যি জানতাম না যে উত্তম একদিন ভারতজোড়া নাম করবে—আমরা একসঙ্গে অভিনয় করব—আমাদের বন্ধুত্ব এত গাঢ় হবে।

সহকারী পরিচালক থাকাকালে উত্তমের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাইনি বলে দুঃখ হলেও আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু বেড়েই চলছিল।

আমি তখন পুরোপুরি অভিনেতা হিসাবে কাজ করছি। একটা ছবিতে একসঙ্গে আমাদের কাজ হচ্ছে। লাঞ্চের সময় ওর অনুরোধে একসঙ্গে খেতে বসলাম। ওই সময়ে অনেক কোম্পানিতে দু'রকম খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। 'তারকা' এবং বড় কলাকুশলীদের জন্যে 'স্পেশ্যাল', আর অন্যান্যদের 'সাধারণ' খাদ্য (অখাদ্য)। আমার শালপাতার ওপর রাখা খাবার দেখে উত্তম না খেয়ে নিজের প্লেটটা নামিয়ে রেখে দিল। প্রযোজক মশাইকে কড়া নির্দেশ দিল যে, তার জন্যে যেন কখনও স্পেশ্যাল ব্যবস্থা না হয়। [উত্তম, তোর এ ব্যবহার আমি কোনওদিন ভুলব না রে। আজকের উদীয়মান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তো দু'রকম খাবার, আলাদা মেক-আপ রুম, আর সব লাঞ্ছনা কী তা তো জানলই না। এ ব্যাপারে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভোলা যাবে না। ভুলতে পারিস উত্তম? আমরা ভুলব না, কারণ এটাও আমাদের মস্ত বড় গর্ব যে আমাদের পরে যারা এল, তাদের জন্যে আমরা আগে থেকেই অনেক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিলাম।]

আর একবার আমরা একসঙ্গে একটা ছবিতে কাজ করছি। একটা শট-এ আমাদের দু'জনকেই লাগছে। নাটকের প্রয়োজনমতো আমার প্রাধান্য থাকা উচিত, কিন্তু পরিচালকমশাই এমনভাবে আমাদের দাঁড় করালেন যে মাথার পিছন দিক ছাড়া আমার আর কিছু দেখা যাবে না। উত্তম তুমুল আপত্তি জানাল। ওর নির্দেশমতো আমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শটটা নেওয়া হল। [উত্তম, অনেকে ঘটনাটা বিশ্বাস করতে

চায় না।]

বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে আগুন লাগার ফলে প্রতিমা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।... কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নতুন মণ্ডপ ও প্রতিমা আনার সব খরচ দিলেন একজন একটা শর্তে যে জনসাধারণ দাতার নাম জানতে পারবেন না। [উত্তম, আমাকে কিন্তু সেই বারোয়ারির উদ্যোক্তারাই তোর নামটা বলে দিয়েছিল।]

একসঙ্গে কাজ করা একটা ছবির 'প্রোজেকশন' দেখে দু'জন বেরোলাম। আমার মন খারাপ দেখে উত্তম আমাকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে ব্যাপারটা কী জানতে চাইল। বললাম নিজের অভিনয় আমার ভাল লাগেনি—খুব বাড়াবাড়ি করেছি। আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'এ ছবিতে তোর প্রচুর নাম হবে।' [উত্তম, তোর বোধহয় মনে আছে যে ওই ছবির পর প্রযোজকরা আমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। একটা গাড়ি কেনাও সম্ভব হল।]

উত্তম, একদিন আড্ডা মারতে মারতেই বলিস তো, তুই এত বুঝিস কী করে? তোর কাছে কিছু জানতে (শিখতে বলাটাই ঠিক) চাইলে হেসে উড়িয়ে দিস। (আমি পর্যন্ত তোর হাসির...)

তবু, তোকে বলে রাখছি— আমার মতো ছাত্রকে তুই এড়িয়ে যেতে পারবি না। আমার গোঁ তো তুই জানিস।

এবার বলুন তো, এই লেখা পড়ার পর অনিল চট্টোপাধ্যায়ের রচনাশৈলী সম্পর্কে উঁচু ধারণা না করে পারা যায়?

কিন্তু উঁচুর পাশে যেমন নিচু না থাকলে ছন্দপতন হয়, তেমনি ওঁর সম্পর্কে আমার ভাবনার ছন্দপতন ঘটে গেল একদিন।

এভারগ্রিন অনিল চ্যাটার্জির শরীরে এখন নানা উপসর্গ। দু' কাঁধে স্পন্ডিলোসিস। হাই ব্লাড-সুগার। চোখের দৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই ডাবল সাইট। অর্থাৎ একটা জিনিসকে মাঝে মাঝে দুটো দেখেন।

এই ডাবল সাইটের ব্যাপারে একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেক বছর আগে, অনিলবাবুর তখন ভরন্ত যৌবন, একসঙ্গে অনেকগুলি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তখনই একদিন বসুশ্রী কফি হাউসে আড্ডা দিতে দিতে সখেদে বলেছিলেন : আমাদের ফিল্ম লাইনটার এ কী হাল বলো দিকি!

ফিল্ম লাইনের হাল-হকিকতের ব্যাপারে তখন আমরা সবাই অল্পবিস্তর অবহিত ছিলাম। তা নিয়ে নতুন করে কোনও উত্তেজনাও বোধ করি না। কিংবা আক্ষেপও করি না। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : নতুন করে আবার কী ঝঞ্ঝাট ঘটল অনিলবাবু?

অনিলবাবু বললেন : লাইনটা একেবারে ডাবল ফেসেড মানুষে ভরে গেছে।

আমি বললাম : এ আর নতুন কথা কী! এটা তো বরাবরই ছিল। আজ যে মানুষটা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কাল সেই মানুষটাকেই দেখছি আপনার বাপ-মা তুলে খিস্তি করছে আড়ালে আবডালে!

অনিলবাবু বললেন : সেটা তো জানি। ওসব আর গায়ে মাখি না আজকাল। কিন্তু যেখানে একটা সিরিয়াস কিছু ঘটতে চলেছে সেখানে কথার দাম থাকবে না!

আমি বললাম : সেটা তো থাকাই উচিত। তা সেরকম কী ঘটল হঠাৎ?

অনিলবাবু বললেন : হঠাৎ নয়। এরকম আজকাল আকছারই ঘটছে। আজ যেটা বলছে, কাল সেটা অস্বীকার করছে। বলছে, আমি ও কথা বলিনি তো! অধিকাংশ মানুষেরই আজকাল দেখছি দুটো করে মুখ। এরকম মিথ্যাচারণের ওপরে কি একটা ইন্ডাস্ট্রি টিকতে পারে! দেখবে, এরকম চলতে থাকলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

অনিলবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আজ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এই যে দুর্দিন তার জন্যে মানুষের অসততা অনেকাংশে দায়ী।

তাই বলে ভাল মানুষ কিংবা সৎ মানুষ কি আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নেই। নিশ্চয় আছে। তা না হলে তো এই ইন্ডাস্ট্রিটা একেবারেই ধ্বংস হয়ে যেত। তবে সে রকম মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে আসছে। সেটাই তো সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার।

যাক যে কথা বলছিলাম, চৌষট্টি বছর বয়স্ক অনিলবাবুর শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। ওঁর জন্ম

১৯৩০ সালে। চোখের কথা বাদ দিলেও দুটো হাত তাঁকে খুব ট্রাবল দিচ্ছে। কথায় কথায় বললেন, স্পন্ডিলোসিসের জ্বালায় হাত দুটো ভাল করে তুলতেও পারি না।

আমি বললাম : সে কী কথা। আপনি তো এখন এম এল এ। এখন তো অ্যাসেম্বলিতে বসে আপনাকে কথায় কথায় হাত তুলতে হবে। হাত দুটোকে ঠিক রাখুন। নাহলে খুব ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন। পার্টির কাছে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে।

অনিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : সেটা ঠিক কথা। তবে ফর ইওর ইনফরমেশন জানিয়ে রাখছি রবি যে, খাতায় কলমে আমি একজন নির্দল বিধায়ক। সাপোর্টেড বাই সি পি আই (এম)। সুতরাং শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হবার ভয় আমার নেই। আমার হাত সর্বদা ন্যায়ের পক্ষেই উঠবে।

আমি বললাম : অ্যাসেম্বলিতে এরকম কোনও ঘটনা ঘটাতে পেরেছেন?

অনিলবাবু বললেন : পারিনি মানে! এই তো কিছুদিন আগে স্বয়ং স্পিকারকে অ্যাকিউজ করলাম একটা ব্যাপারে।

আমি বললাম : তাই নাকি! কী ব্যাপারে বলুন তো?

অনিলবাবু বললেন : আমাদের স্পিকার আবদুল হালিম সাহেব সত্যজিৎ রায়কে 'ভারতরত্ন' বলে উল্লেখ করেছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করলাম। মানিকদা অস্কার পেয়েছেন, বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম উপাধি পেয়েছেন, কিন্তু তিনি তো ভারতরত্ন উপাধি পাননি। আমার সেই প্রতিবাদের খবর সারা ভারতবর্ষের সব কাগজেই তো তার পরের দিন বেরিয়েছিল। তবে মানিকদা ভারতরত্ন পেলে আমি খুবই খুশি হতাম। একদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি তো ভারতের একজন রত্নই বটেন। তাঁর দু'খানা ছবির আমি নায়ক। 'মহানগর' আর 'পোস্টমাস্টার'। সেটা আমার কাছে একটা বড় গর্বের ব্যাপার।

আমি বললাম : এটা শুনে আমার খুব ভাল লাগছে। বেশ কিছু বিধায়কের মতো আপনি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। আপনি সত্যিই একজন নির্ভীক বিধায়ক।

অনিলবাবু বললেন : সেদিন সোমেন মিত্রের সঙ্গেও আমার সেই কথাই হচ্ছিল। আমি ফরাক্কা থেকে ফিরছিলাম, সোমেনবাবুও সেই ট্রেনেই ফিরছিলেন। আমি ওঁকে কথায় কথায় বললাম, নেক্সট টার্মে আমার আর ইলেকশনে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। তবে নির্দল হিসেবে যদি আমাকে একই সঙ্গে কংগ্রেস আর সি পি এম সমর্থন করে তাহলেই দাঁড়াতে পারি। বি জে পি'র ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মুখোসটা খুলে দিতে পারি। কিন্তু সেটা তো আর সত্যিই সম্ভব নয়। আদা আর কাঁচকলা কি আর একসঙ্গে মিলবে কোনওদিন।

আমি বললাম : বি জে পি'র ওপর আপনার এই রাগ কি ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের কারণে। আপনি কি ধর্মে বিশ্বাস করেন না?

অনিলবাবু বললেন : খুব করি। ভয়ানক ভাবে করি। ধর্ম মানুষের একটা সম্পদ। একটা বিশ্বাসের জায়গা। সেই বিশ্বাস মানুষকে সৎ করে, পবিত্র করে। কিন্তু তোমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কি সেই ধর্মের প্রতি আস্থাশীল? ওরা ধর্মের নামে মানুষকে উত্তেজিত করে, তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। ওরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে পর্যন্ত মানে না। আমার লড়াই তো সেইসব ধান্দাবাজ রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে যারা মানুষকে তাদের প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে চায় না। যতসব ভণ্ড, প্রতারক। ওরা ধর্মের দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে।

বুঝলাম অনিলবাবু খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তবে কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল। এগুলো তো আমারও মনের কথা। কিন্তু অনিলবাবুর শরীরের কথা ভেবে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলাম। উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকারক। ডাক্তারের নিষেধ।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার হাতের কথা কী যেন বলছিলেন অনিলবাবু। স্পন্ডেলোসিসের কারণে হাত তো তুলতে পারছেন না বললেন। তা হাত নামাতেও কী অসুবিধে হচ্ছে?

অনিলবাবু বললেন : একদম না। এখনও যথারীতি হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে পারছি।

আমি বললাম : সে কী! আপনাকেও মানুষের কাছে হাত পাততে হয় নাকি?

অনিলবাবু বললেন : নিজের জন্যে হয় না। তবে অনের জন্যে হয়। নিজের জন্যে যদি হাত পাততে শিখতাম তাহলে কি আর এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভাড়াবাড়িতে বাস করতে হয়, না ল্যান্ডলর্ডের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। হাত পাততে পারলে এতদিনে একটা বাড়ি না হোক, একটা ফ্ল্যাট অন্তত কিনে ফেলতে পারতাম।

আমি বললাম : সে কী! আপনার মতো একজন সম্মানিত মানুষকেও বাড়িওয়ালার অত্যাচার সহ্য করতে হয়! আপনার মতো এরকম সম্মানিত ভাড়াটে থাকা তো যে কোনও বাড়িওয়ালার কাছে গর্বের ব্যাপার। আমি যদি বাড়িওয়ালা হতাম তাহলে আপনি নিজে বাড়ি করলেও আমি আপনাকে সেখানে উঠে যেতে দিতাম না। জোর করে ধরে রাখতাম।

অনিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : তোমার কথা শুনে আনন্দ পেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার ল্যান্ডলর্ড সে প্রকৃতির নন। তিনি চাইছেন আমি তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিই। তাহলে তিনি অনেক টাকা ভাড়ার ভাড়াটে আনতে পারবেন। প্রচুর টাকা অ্যাডভান্স পাবেন। এই নিয়ে দু-দুবার কেস করেও সুবিধে করতে পারেননি। দুবারই হেরে গেছেন। এখন তাই অন্যভাবে শোধ নিচ্ছেন।

আমি বললাম : কী ভাবে?

অনিলবাবু বললেন : জলটা যাতে ঠিকমতো না পাই তার চেষ্টা করছেন। তা আমি বাড়ির সবাইকে বলে রেখেছি, দরকার হলে অল্প জলে কাজ সারতে হবে। প্রয়োজনে 'কাকচান' করে দিন কাটাতে হবে। কী করব বলো। কোনও উপায় তো নেই।

আমি বললাম : নিজের জন্যে হাত পাতা যে আপনার স্বভাববিরুদ্ধ, তা তো বুঝলাম। তাহলে হাত পাতছেন কার জন্যে?

অনিলবাবু বললেন : মানুষের জন্যে। মানুষের মঙ্গলজনক কোনও কাজের জন্যে আমার হাত পেতে ভিক্ষে করতে কোনও লজ্জা নেই। বরং তাতেই আমি গৌরব বোধ করি।

আমি বললাম : তেমন দু একটা উদাহরণ দিন না।

অনিলবাবু বললেন : দু একটা কেন, আমি অন্তত দুশোটা এরকম উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু তাতে নিজের ঢাক নিজে পেটানো হবে বন্ধু। আর ওই ব্যাপারটাকে যে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি তা তো তুমি জানোই।

আমি বললাম : তবু একটা অন্তত বলবেন তো! নইলে যে তৃপ্তি পাচ্ছি না।

অনিলবাবু বললেন : বেশ, তোমার তৃপ্তির জন্যে একটা ঘটনার কথা বলছি। তবে এটা যেন আবার ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে দিও না। আমি বরাবরই দেখেছি আমার সম্বন্ধে কিছু লেখবার জন্যে তোমার হাতটা বড়ই নিশপিশ করে। তুমি হয়তো বন্ধুকৃত্য করো, কিন্তু আমি যে ভয়ানক অস্বস্তির মধ্যে পড়ি, সেটা বোঝো না কেন। লোকে ভাবতে পারে আমিই ধরাকরা করে আমার সম্বন্ধে তোমাকে দিয়ে লেখাচ্ছি।

আমি বললাম : সে তো আমি অনিল চাটুজ্যে কেন, অনেক চাটুজ্যেকে নিয়েই লিখেছি, এখনও লিখছি। তাতে লোকের মনে করাকরির কী আছে। সাংবাদিক হিসেবে এটা তো আমার কর্তব্য। আপনারা যাঁরা রুপোলি পর্দার শিল্পী, পর্দার বাইরেও যে তাঁদের আলাদা একটা জীবন আছে, সেটা কী মানুষকে জানানো আমার কর্তব্য নয়? আমার কাজ আমি করে যাব, তাতে কে কী মনে করবে সেটা আমি মাথার মধ্যে রাখি না।

অনিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : বেশ বাবা, তোমার যা ইচ্ছে তাই কোর। তবে এখন যে ঘটনাটা তোমাকে বলছি, এটা কিন্তু আর্থিক ভিক্ষার কোনও ব্যাপার নয়।

আমি বললাম : তাহলে কী?

অনিলবাবু বললেন : এটা হল রক্ত ভিক্ষার ব্যাপার।

আমি বললাম : তার মানে?

অনিলবাবু বললেন : ব্যাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি। এয়ারপোর্টের কাছে বাগুইহাটি বলে একটা জায়গা আছে জানো তো। ওখান থেকে হাতিয়াড়া পেরিয়ে রাজারহাট থানার আন্ডারে শুলংগুড়ি বলে একটা জায়গা আছে। ওই শুলংগুড়ির কয়েকজন উৎসাহী তরুণ একটা দারুণ কাণ্ড করে ফেলেছে। ওরা শুলংগুড়ি সমাজ সেবা সমিতির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটা দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র করেছে মানুষের কাছ থেকে দু টাকা চার টাকা করে চাঁদা তুলে। আর সে জন্যে সরকারের কাছে ওরা অদ্যাবধি হাত পাতেনি। সরকারের বিন্দুমাত্র সাহায্য না নিয়েই ওরা এটা করেছে।

আমি বললাম : বাঃ, বেশ ভাল ব্যাপার তো। তা ওদের সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের নাম কী?

অনিলবাবু বললেন : আরোগ্য কেন্দ্র। ওরা ওদের এই ভাল কাজের জন্য ফরেনের একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স পেয়েছে। এতে যে ওই এলাকার মানুষের কী উপকার হয়েছে তা কী বলব।

আমি বললাম : আজকের ইয়াং জেনারেশনের কাছ থেকে তো এটাই আমরা চাই। সবাই বলে এই জেনারেশনটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। শুলংগুড়ির ছেলেদের এই কাজ নিশ্চয় তাদের মুখ বন্ধ করবে।

অনিলবাবু বললেন : তাই তো করা উচিত। অন্তত আমার মুখ তো ওরা বন্ধ করেছে। ওদের কাজকর্ম দেখে আমিও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। ওরা আমাকে ওদের সমিতির প্রেসিডেন্ট করে নিয়েছে। সব কাজেই ওরা আমাকে ডাকে। আমার নির্দেশ মেনে চলে। ওদের ওই চিকিৎসাকেন্দ্র উদ্বোধন করবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস বিমলচন্দ্র বসাক গিয়েছিলেন। তিনি খুব খুশি হয়েছেন ওদের ওইসব কাজ দেখে।

আমি বললাম : কিন্তু আপনি যে ওই রক্ত ভিক্ষা করার কথা কী যেন বলছিলেন সেটা বলুন।

অনিলবাবু বললেন : সেটাই তো বলছি। ওদের ওই আরোগ্য কেন্দ্রের জন্যে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছিল ওরা। সেই ক্যাম্পের কাজ তদারক করবার জন্যে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু সেবারে যা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল তেমন ঘটনা আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে। সেই ঘটনাটার কথা ভাবলে এখনও আমার চোখে জল এসে যায়।

আমি বললাম : আপনার চোখে জল। এটা তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আমি তো আপনার চোখে চিরকাল আগুনই দেখেছি। তাছাডা আর যা দেখেছি সেটা হল স্নেহ আর ভালবাসা। হাজার দুঃখেও তো কখনও জল দেখিনি।

অনিলবাবু বললেন : আমি কিন্তু এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলছি না। সেদিন এক মহিলার যে মমতাময়ী মূর্তি আমি দেখেছিলাম, তাতে সত্যিই আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

আমি বললাম : তাড়াতাড়ি বলুন ব্যাপারটা। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

অনিলবাবু বললেন : ওরা ব্লাড ডোনেশন সেন্টারটা করেছিল একটা চষা মাঠের ওপর। সেটা ছিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন। মাথার ওপরে ঠা ঠা করছে রোদ। সব কিছু যেন ঝলসে দিচ্ছে। আমি গিয়ে দেখলাম উদ্যোক্তারা ছাড়া রক্ত দেবার আর কেউ নেই। অথচ পাশেই একটা চড়কের মেলা বসেছে, সেদিকে কাতারে কাতারে লোক চলেছে। কিন্তু আমাদের ওই ক্যাম্পের দিকে কেউ উঁকি মেরেও দেখছে না।

তা ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পরও দেখা গেল একটি লোকও আসেনি। ওই রোদে বসে বসে আমার তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বেশি জল খেতেও সাহস হচ্ছে না। আমার শরীরটা তো জুতে নেই। শেষকালে সর্দিগর্মি না হয়ে যায়। এমন সময় দেখলাম একজন বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশের মহিলা কৌতূহলবশে ওই ক্যাম্পের কাছে এলেন। তিনি সোজা এসে আমার মুখের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগলেন।

একজন আগন্তুককে দেখে আমার মনে কিছুটা সাহস ফিরে এল। আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম : মা, আমরা এখানে এসেছি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা একটা রক্তদান শিবির খুলেছি। আমাদের দাতব্য কেন্দ্রে রক্তের বড় অভাব। রক্তের অভাবে কত রোগী মারা যাচ্ছে। অথচ যারা সুস্থ তারা

অনায়াসে একটু করে রক্ত দিয়ে সেইসব রোগীদের বাঁচাতে পারে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে কেউ আমাদের ক্যাম্পের দিকে একবার উঁকি মেরেও দেখছে না।

আমার কথা শুনতে শুনতে সেই ভদ্রমহিলার কৌতূহলাক্রান্ত মুখখানা কেমন যেন কোমল হয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি কোনও কথা না বলে উল্টোদিকে হাঁটা দিলেন। আমি ভাবলাম, যাঃ, যদিও বা একজন এসেছিল তাও চলে গেল। আমাদের বরাতটাই দেখছি মন্দ।

মনে মনে এসব কথা ভাবছি, হঠাৎ দেখলাম সেই ভদ্রমহিলা আবার এদিকে আসছেন। তাঁর সঙ্গে একজন পুরুষ। দূর থেকে মনে হল তিনি ভদ্রলোককে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে আসছেন।

ভদ্রমহিলা ক্যাম্পের সামনে এসে বললেন : এই যে ইনি আমার স্বামী। আপনারা এর রক্ত নিন।

এই বলে তিনি আবার ঝড়ের গতিতে চলে গেলেন। আমরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, তিনি স্টেট বাসে ড্রাইভারি করেন। ডিউটি থেকে ফিরে দুটি ভাত মুখে দিয়ে একটু ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনেছেন রক্ত দেওয়ার জন্য।

আমি বললাম : তারপর কী হল অনিলবাবু?

অনিলবাবু বললেন : তারপর যা হল সেটা বললে কেউ বিশ্বাস করবেন না। ভদ্রমহিলা একবার করে সেই চড়কের মেলায় যাচ্ছেন আর আট দশজন করে লোক এনে ক্যাম্পের বেডে শুইয়ে দিচ্ছেন। এমনি করে সারা দিনে প্রায় দুশো লোক এনেছিলেন তিনি।

আমি বললাম : সেই ভদ্রমহিলার নাম কী?

অনিলবাবু কপালে করাঘাত করে বললেন : তাঁর নামটাই জেনে রাখা হয়নি। ওঁর ওই কাজ দেখে আমি এতোই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে নামটা জানার কথা মাথাতেই আসেনি। আমি কেবল দু চোখ ভরে ভদ্রমহিলার সেবাব্রতী রূপটি দেখেছিলাম। আর স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম : হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ল কেন আপনার?

অনিলবাবু বললেন : শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজী আমেরিকার মানুষকে অভিভূত করেছিলেন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স বলে সম্বোধন করে। তেমনি আজকের এই অঘটনটি ঘটল আমার ওই একবার 'মা' ডাকে। আমাদের দেশের মহিলারা সত্যিই মায়ের জাত। এটা কেবল কথার কথা নয়।

আমি বললাম : আপনি এইসব সমাজসেবার কাজ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে করছেন, এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু যেটাতে আপনার সর্ববৃহৎ পরিচিতি, তার কী হল,? সে ব্যাপারে আপনি আর তেমন মনোযোগ দিচ্ছেন না কেন?

অনিলবাবু বললেন : মনোযোগ দেবার উপায় নেই বলেই দিচ্ছি না।

আমি বললাম : কেন?

অনিলবাবু বললেন, : তার কারণ আমাকে আর বিশেষ কেউ ছবি করবার জন্যে ডাকে না তাই।

আমি বললাম : কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। ১৯৫৩ সালে 'যোগবিয়োগ' ছবিতে আপনার অভিনয় জীবন শুরু। ১৯৫৫ সালে প্রেমেনদা মানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ময়লা কাগজ' ছবির আপনি নায়ক। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অন্তত পাঁচশখানা ছবিতে অভিনয় করেছেন আপনি। অভিনয় খারাপ করেন তেমন কথাও কেউ বলতে পারবে না। সেই আপনি ছবিতে সুযোগ পাচ্ছেন না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

অনিলবাবু বললেন : আজকাল আর ছবি হচ্ছে কোথায় বল। যারা ছবি করছে তাদের আমি তেমনভাবে চিনি না। যাও বা ছবি হচ্ছে তার আয়ু তো দু চার সপ্তাহ। আগে যেমন ইংরেজি ছবি এক সপ্তাহ কী দু সপ্তাহ পরে উঠে যেত, আজকাল বাংলা ছবিরও সেই দশা হয়েছে।

আমি বললাম : আপনি তো এর আগে দুখানা হিন্দি ছবিও করেছেন। 'ফারার' আর 'সন্নাটা'। তাছাড়া 'নকাব' আর কী যেন একটা হিন্দি সিরিয়ালে অত সুন্দর অভিনয় করলেন। আপনার তো বম্বে থেকে ডাক আসা উচিত।

অনিলবাবু বললেন : আসছে তো। মাঝে মাঝেই আসে। অমল পালেকর তো আমাকে প্রায়ই বলে, দাদা, আপনি বম্বে চলে আসুন। ওখানে আপনি প্রচুর কাজ পাবেন। একটা বাড়ি টাড়িও করে ফেলতে

পারবেন দু চার বছরের মধ্যে। কিন্তু আমি তো যেতে পারছি না সেখানে।

আমি বললুম : কেন?

অনিলবাবু বললেন : আমার শেকড় যে এখানে দারুণভাবে বসে গেছে। সেটা ছেঁড়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এই দুর্দিনে আমার টেকনিশিয়ান বন্ধুদের ছেড়ে যাবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না।

অনিলবাবুর কথা শুনে ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। 'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলই দাও/এর মতো সুখ কোথাও কী আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও।' অনিলবাবু এখন সেই সুখেই সুখী। এই পরোপকারী মানুষটি সম্পর্কে শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনিই নত হয়ে আসে।

নির্মলকুমার

বিপ্লবীদের কাছে যেমন গীতা, আমাদের যৌবনকালে অধিকাংশ তরুণের কাছে তেমনি একখানি বই অবশ্যপাঠ্য ছিল। সেই বইটা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'শেষের কবিতা'। এখনকার তরুণরা হয়তো ওই উপন্যাসখানির পাতা উল্টে দেখার ফুরসত পান না, কিন্তু আমাদের সেই যুগটা ছিল রোম্যান্টিসিজমের যুগ। প্রেম, তা সে কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় যাই হোক না কেন, প্রেম নিয়ে সামান্যতম চিন্তা অথবা আলোচনা আমাদের রীতিমত রোমাঞ্চিত করে তুলত। সেই প্রেমের স্বর্গীয় আস্বাদ পেতেই আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়তাম 'শেষের কবিতা'-র ওপর। লাবণ্য আর অমিত রায়কে নিয়ে লেখা সেই অসাধারণ প্রেমকাহিনীর মধ্যে আমরা খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করতাম নিজেদের। নিজেকে অমিত রায় হিসেবে কল্পনা করে কী অনির্বচনীয় সুখ যে অনুভব করতাম, সেটা লিখে বোঝানো সাধ্যাতীত।

এহেন উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে শুনে রীতিমত চমকে উঠেছিলাম। সেটা ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিক। একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার শুক্রবারের সিনেমা পৃষ্ঠায় খবরটি বেরিয়েছিল। পরিচালক মধু বসু নাকি 'শেষের কবিতা'-র চলচ্চিত্র রূপায়ণের কথা চিন্তা করছেন। চিত্রনাট্য লিখছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে কে কে অভিনয় করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে পরিচালক অমিত রায়ের চরিত্রে একটি নূতন মুখের কথা ভাবছেন। খুব শিগগির শুটিং শুরু হবে।

খবরটি পড়ে চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তান্বিতও হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমেই যে কথাটি মনে হয়েছিল, সেটি হল, 'শেষের কবিতা' উপন্যাস কি সিনেমায় করা সম্ভব? এ তো আর আবেগবহুল কোনও ঘরোয়া জীবনের কাহিনী নয়, অথবা বয় মিটস গার্ল জাতীয় প্রেমের গপ্পো নয়। এর যা রস তা কি সিনেমার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব? তার ওপর এই ছবির পরিচালক হলেন মধু বসু। আমি তখনও পর্যন্ত মধু বসু পরিচালিত বিশেষ ছবি দেখিনি। সেই ছোটবেলায় 'আলিবাবা' আর 'রাজনর্তকী' দেখেছি। শুনেছি উনি আরও কয়েকটা ছবি করেছিলেন। সেগুলি আমার দেখা হয়নি। উনি সাধারণত ওঁর স্ত্রী সাধনা বসুকে নায়িকা করে ছবি করার কথা ভাবেন। সাধনা বসু দারুণ ভালো নাচতে পারেন। তাই ওঁর ছবিগুলি নৃত্যভিত্তিক হয়। সে ক্ষেত্রে মধুবাবু যে 'শেষের কবিতা' করছে যাচ্ছেন তার নায়িকা লাবণ্যের চরিত্রে কী সাধনা বসুই অভিনয় করবেন? তাঁকে মানাবে?

এইসব সাতপাঁচ চিন্তা করতে করতে একদিন চলে গেলাম নেপেনদার বাড়িতে। খবরের কাগজে তো আগেই পড়েছিলাম এই 'শেষের কবিতা' ছবির চিত্রনাট্য করছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ছবির সেই মধ্যযুগে যে ক'জন প্রথম সারির চিত্রনাট্যকার ছিলেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ হলেন তাঁদের অন্যতম। কেউ কেউ তো বলেন, তিনিই নাকি শ্রেষ্ঠতম। অন্তত উত্তমকুমার তো তাই বলতেন। তবে নেপেনদা ছাড়া আরও বেশ ক'জন চিত্রনাট্যাকার ছিলেন সেই যুগে। যেমন ধর্মমূলক ছবির ক্ষেত্রে মণি বর্মা। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত এম পি প্রোডাকসন্সের বেশ কয়েকটি ছবির চিত্রনাট্য করে প্রশংসিত হয়েছিলেন নিতাই ভট্টাচার্য। এছাড়া শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং দেবকী বসু তো ছিলেনই। ওঁদের নিজেদের ছবির চিত্রনাট্য ওঁরা নিজেই করতেন। সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্য পরিচালকের ছবির চিত্রনাট্যও করে দিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অবস্থাই বহাল ছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি'-র পর থেকে বেশিরভাগ পরিচালকই নিজেদের ছবির চিত্রনাট্য নিজেরাই করে নিতেন।

যাক, যে কথা বলছিলাম। সেই 'শেষের কবিতা'-র চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের কথাতেই আসি। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা নেপেনদা বলেই সম্বোধন করতাম। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। উনি তখন অধুনালুপ্ত 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা

করতেন। ওই পত্রিকা যে প্রেসে ছাপা হত, আমি সেই কল্পনা প্রেসে তখন কর্মরত ছিলাম। পত্রিকাটির অফিস ছিল বি৬ন স্ট্রিট আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মোড়ে একটি বাড়িতে। সত্যেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন ওই পত্রিকার কর্ণধার। আমি তাঁর অফিসে যেতাম গল্পভারতীর প্রুফ নিয়ে এবং পরবর্তী পাণ্ডুলিপি আনতে। নেপেনদার কাছ থেকে লেখা পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার ছিল। গল্পভারতীর তিন ভাগ লেখা তিনি নিজেই লিখতেন স্বনামে এবং ছদ্মনামে। তাঁর লেখায় যখন খরা চলত তখন দিনের পর দিন নিস্ফলা কেটে যেত। আবার যখন লিখতে শুরু করতেন তখন তাঁকে থামানো মুশকিল হত। অথচ না থামিয়ে উপায় ছিল না। পত্রিকার তো একটা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকে। যা কিছু দেবার তার মধ্যেই দিতে হয়।

নেপেনদা রীতিমতো মেজাজী মানুষ ছিলেন। তাঁকে লেখার জন্যে তাগাদা দিলে তিনি চটে যেতেন। আবার লেখা থামাতে বললেও চটে যেতেন। কী কারণে জানি না নেপেনদা আমাকে একটু স্নেহ করতেন। তাই কালক্রমে সত্যেনবাবু নেপেনদার কাছ থেকে লেখা আদায় এবং লেখা থেকে নিরস্ত করার দায়িত্ব আমার ওপরই চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমি নেপেনদার সামনে গিয়ে গরুচোরের মতো মুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে লেখা আদায় করতাম। আবার লেখা থামানোর জন্যেও ওই একই মুখভঙ্গি। আমার ওই গরুচোর নামকরণটি নেপেনদাই করেছিলেন। আমি তাঁর ঘরে ঢোকামাত্র তিনি ওই নামে আমাকে আপ্যায়ন করতেন। তাঁর সেই সম্বোধনে স্নেহ ঝরে ঝরে পড়ত।

তা আমার সেই উনিশ কুড়ি বছর বয়সেই আমি নেপেনদার স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে একটু একটু করে সাহসী হয়ে উঠেছিলাম। ওঁর সঙ্গে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনাও করে ফেলতাম কখনও কখনও। আমার সেই বাচালতায় নেপেনদার রেগে যাবার কথা। কিন্তু তিনি একটুও রাগ করতেন না। বেশ সহৃদয় ভঙ্গিতে শুধু বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেই নয়, বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কেও একটা ধারণা তৈরি করে দিয়েছিলেন আমার মনে। নেপেনদাব তো অগাধ পাণ্ডিত্য। ওঁর সময়কালে বিশ্বসাহিত্যের অত ভালো অনুবাদক বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। অমন একজন পণ্ডিত মানুষ যে কেমন করে সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইলেন দীর্ঘকাল সেটা আমি কিছুতেই ভেবে পেতাম না।

তা খবরের কাগজে 'শেষের কবিতা'-র চিত্রনাট্যকার হিসেবে নেপেনদার নাম দেখে আমি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন মনে মনে ভেঁজে নিয়ে একদিন দক্ষিণ কলকাতায় নেপেনদার বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লাম। ততদিনে আমি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি। রূপাঞ্জলি পত্রিকায় কর্মরত। পত্রিকার কাজে আমাকে তখন মাঝে মাঝেই নেপেনদার বাড়িতে যেতে হত।

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দিলেন রাধাদি। রাধাদি মনে রাধারানী দেবী। চল্লিশের দশকের বাংলা ছবি ও রঙ্গমঞ্চের একজন বিশিষ্ট নায়িকা। অসাধারণ সংগীতজ্ঞা। একটা সময়ে তাঁর কীর্তন গান সারা বাংলাদেশের মানুষকে বিভোর করে রেখেছিল। রাধাদি তখন নেপেনদার সঙ্গেই একত্রে বসবাস করতেন।

দরজা খুলে আমাকে দেখেই রাধাদি একগাল হেসে বললেন : কী ব্যাপার! দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ নিশ্চয়।

আমি বললাম : হ্যাঁ, রাধাদি।

রাধাদি বললেন : তোমার দাদা এখন ঠাকুরঘরে। ডাকলেও উঠবেন না। এক কাজ করো, তুমি সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ো। তোমার তো অবারিতদ্বার।

নেপেনদা ঠাকুরঘরে আছেন শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। বেশ কয়েকবার এ বাড়িতে এসেছি কিন্তু নেপেনদাকে কোনওদিন ঠাকুরঘরে দেখিনি। উনি তো একজন আধুনিক মানুষ। ইন্টেলেকচুয়াল। উনি ঠাকুরঘরে কী করছেন।

ঠাকুরঘরে গিয়ে নেপেনদাকে যে অবস্থায় দেখলাম সেটা আমার কল্পনাতীত। পরনে একখানি খাটো কাপড়। উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত। সারা ঘরের মেঝেতে জল থৈ থৈ করছে। সেই জলের মধ্যে নেপেনদা আসনপিড়ি হয়ে বসে ঠাকুরের বেদিতে মুঠো মুঠো ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রোচ্চারণের মতো উচ্চারণ করছেন, ঠাকুর ঠাকুর। তারই মধ্যে আবার গুণ গুণ করে গানও গাইছেন। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। দু চোখের চোখের দৃষ্টিতেও তারই আভাস।

নেপেনদাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার তো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। কে বলবে এই মানুষটিই একদিন মুজফফর আমেদ আর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে এই বঙ্গভূমিতে কমিউনিজমের বীজ বপন করেছিলেন।

আমি হতবাক হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ে গেল নেপেনদার। বললেন : কী খবর রবীন্দ্রনাথ?

আমি বললাম : আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল দাদা। কিন্তু আমি বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি। আপনি পুজো সেরে নিন। আমি ততক্ষণ রাধাদির সঙ্গে গল্প করছি।

নেপেনদা বললেন : তার দরকার নেই। কখন যে ঠাকুর আমার ছুটি মঞ্জুর করবেন তা তো আমি নিজেই জানি না। তুমি এখানে বসেই তোমার যা বক্তব্য আছে বলো।

আমি ঠাকুরঘরেব বাইরে জুতোজোড়া খুলে রেখে ঘরে ঢুকলাম। এক কোণে একটা টুল রাখা ছিল তার ওপরে গিয়ে বসলাম। হয়তো নেপেনদার মতোই আমার ঘরের মেঝেতে বসা উচিত ছিল। কিন্তু তার উপায় নেই। ঘরের মেঝেতে জল থৈ থৈ করছে।

আমি টুলের ওপর বসার পর নেপেনদা আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। বললেন : কী ব্যাপার বল?

আমি বললাম : আমার দুটো কথা জানবার ছিল দাদা। খবরের কাগজে পড়লাম আপনি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাস নিয়ে যে ছবিটা হচ্ছে তার স্ক্রিপ্ট করছেন। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

নেপেনদা আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন : তুমি একটু ভুল শুনেছো রবি। 'শেষের কবিতা'র স্ক্রিপ্ট আমি করছি ঠিকই। কিন্তু ওটা আমি একা করছি না। ডাইরেক্টর মধু বোস আর আমি দু'জনে মিলে স্ক্রিপ্ট করছি।

আমি বললাম : কিন্তু দাদা, 'শেষের কবিতা' উপন্যাস নিয়ে কী সিনেমা করার স্কোপ আছে? ওই ধরনের একখানা কাব্যিক প্রেমকাহিনীর রূপ রস রঙ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে কী সিনেমার পর্দায় দেখানো যাবে?

আমার কথা শুনে নেপেনদা একটু হাসলেন। তারপর বললেন : তাহলে তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি। 'শেষের কবিতা' লেখা শেষ করে গুরুদেব একদিন তাঁর কয়েকজন অনুগামীর সামনে উপন্যাসটা পড়ে শোনালেন। শুনে তো সবাই মুগ্ধ। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এ একেবারে নতুন ধরনের লেখা। এমন সব চরিত্রের সৃষ্টি গুরুদেবের পক্ষেই সম্ভব। এই বলে তাঁরা উপন্যাসের ঘটনা আর চরিত্র বিশ্লেষণ করে মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু কারও মতের সঙ্গে কারও মত মিললো না। তাই আমরা ঠিক করলাম স্বয়ং গুরুদেবকেই জিজ্ঞাসা করব, এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাটা কী?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম : আপনারা রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন?

নেপেনদা বললেন : তাই তো করেছিলাম। তখন আমাদের ইয়াং বয়স। তাই সাহসটা একটু বেশিই ছিল।

আমি বললাম : আপনাদের প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্রনাথ কী বললেন?

নেপেনদা বললেন : আমাদের কথা শুনে গুরুদেব একটু হাসলেন। তারপর বললেন, আমার একটা দুর্ভাগ্য আছে। যেখানে আমার হাঁটু জল, লোকে সেখানে ডুব জল ধরে নেয়। ব্যাখ্যা বা তত্ত্বের কথা বাদ দিয়ে, আমার অনুরোধ, 'শেষের কবিতা'কে তোমরা একটা সোজা গল্প হিসেবে দেখ'। তা গুরুদেব নিজেই যখন আমাদের মনের ধন্দ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন তখন 'শেষের কবিতা'কে একটা সোজা গল্প ভেবে নিলে ছবি করার বাধা কোথায়?

আমি বললাম : ঠিক আছে। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে যে দাদা?

নেপেনদা বললেন : আবার কী?

আমি বললাম : অমিত রায়ের রোলটা কে করছেন?

নেপেনদা একটু হেসে বললেন : কেন, তোমার করবার ইচ্ছে আছে নাকি?

আমি রীতিমতো লজ্জা পেয়ে গেলাম নেপেনদার কথা শুনে। সত্যি একটা সিনেমার হিরো কে করবে তা নিয়ে আমার এতটা আগ্রহ দেখান উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি বললাম : না না দাদা, সিনেমায় নাববার কথা আমি কল্পনাও করি না। এটা আমার নিছক কৌতূহল বলতে পারেন।

নেপেনদা বললেন : তুমি তো সিনেমার পত্রিকায় কাজ করো। তুমিই বল না ওই রোলটা করবার মতো কে আছে?

আমি বললাম : ওইরকম একটা ডায়নামিক চরিত্রে আমি তো এখনকার কাউকেই ভাবতে পারছি না। একমাত্র সমর রায়ের মধ্যে কিছুটা কবি কবি ভাব আছে। চোখ দুটোও ভাসা ভাসা। তবে অমিত রায়ের যা স্মার্টনেস তা ওঁর মধ্যে নেই বলেই তো আমার মনে হয়।

নেপেনদা বললেন : তুমি ঠিকই বলেছো। না, সমর ওই রোলটা করছে না। তবে সমর এই ছবিতে আছে। ও করছে শোভনলালের চরিত্রটা।

আমি নির্লজ্জের মতো আবার জিজ্ঞাসা করে ফেললাম : আর অমিট রে?

নেপেনদা বললেন : মধুবাবু একটি নতুন ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। ছেলেটিকে আমি দেখেছি। মনে তো হয় ভালো মানাবে। ছেলেটি হাইকোর্টে কাজ করে।

আমি বললাম : হাইকোর্টে! ইয়াং কোনও ব্যারিস্টার নাকি? তা ব্যারিস্টার হলে অমিত রায়ের চরিত্রের স্মার্টনেসটা ভালোই আসবে।

নেপেনদা বললেন : না হে, ছেলেটি জজও নয়, ব্যারিস্টারও নয়। ও হাইকোর্টে ক্লারিকাল কাজ করে। কথায় বার্তায় একদম জড়তাহীন। চোখ দুটো অসাধারণ।

আমি বললাম : ভদ্রলোকের নাম কী?

নেপেনদা বললেন : ওর নাম নির্মলকুমার চক্রবর্তী।

এর মাস আষ্টেক পরে চিত্রা সিনেমার (বর্তমান মিত্রা) পর্দায় 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় রূপে নবাগত নায়ক নির্মলকুমারকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হল যেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছেন তিনি। ওই নতুন নায়কটিকে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল। যেমন পড়েছিল 'মাইকেল মধুসূদন' ছবিতে মাইকেলের চরিত্রে উৎপল দত্তকে নিয়ে। সেটিও ছিল মধু বসুর ছবি। উৎপল দত্তর হয়েছিল ইংরেজি উচ্চারণের প্রশংসা। আর নির্মলকুমারের হয়েছিল কবিতা আবৃত্তির প্রশংসা। সেই সঙ্গে তাঁর অসাধারণ চোখ দুটোর।

নির্মলকুমারের ওই চোখ জোড়ার প্রশংসা শুনেছিলাম একজন নবাগতা নায়িকার মুখেও। না, তিনি মাধবী মুখার্জি নন। মাধবীর সঙ্গে নির্মলবাবুর পরিচয় হয়েছিল আরও অনেক পরে। যার পরিণতিতে পরিণয়। কিন্তু সেসব কথায় পরে আসছি। তার আগে সেই নবাগতা নায়িকার কথা বলে নিই।

সেই নবাগতা নায়িকার নাম সুমনা ভট্টাচার্য। নির্মলকুমারের 'শেষের কবিতা' যখন মুক্তি পেয়েছিল প্রায় তার সময়সময়েই সুমনা ভট্টাচার্য যে ছবির নায়িকা হয়েছিলেন সেটি মুক্তি পেয়েছিল। ছবির নাম 'পথনির্দেশ'। তার নায়ক ছিলেন বীরেন চ্যাটার্জি।

সুমনা ভট্টাচার্য আমার থেকে বয়সে ছোট, তৎসত্ত্বেও আমি তাকে সুমনাদি বলে ডাকতাম। সেটা ওঁর শারীরিক গঠনের কারণে। বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা ছিল সুমনাদির। সুমনাদি ছিলেন বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেত্রী স্বাগতা চক্রবর্তীর বোন। সুমনাদি পরে আর বেশি ছবি করেননি। ছবির প্রযোজনায় চলে গিয়েছিলেন। রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' ছবির উনি অন্যতম প্রযোজক ছিলেন। পরিচালক অনিল ঘোষের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়।

সুমনাদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল রূপাঞ্জলির সরস্বতী পুজোয়। পরে আলাপটা প্রগাঢ় হয়। ওঁদের বাড়িতেও যেতাম প্রায়শই।

সেই সুমনাদি একদিন বলেছিলেন : রবি, তুমি 'শেষের কবিতা' দেখেছো?

আমি বললাম : দেখেছি।

সুমনাদি বললেন : নির্মলকুমারের চোখ দুটো কী দারুণ। বল তো!

আমি বললাম : হ্যাঁ, দারুণ।

সুমনাদি কণ্ঠস্বরে রীতিমতো আবেশ জড়িয়ে বলে উঠলেন : ওইরকম একজোড়া দিঘির মতো টলটলে চোখে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে।

তারপর একটু ইতস্তত করে সুমনাদি বললেন : রবি, তুমি একদিন নির্মলকুমারকে আমাদের বাড়িতে আনতে পারো?

আমি বললাম : চেষ্টা করব।

আজ স্বীকার করছি সেরকম কোনও চেষ্টা আমি করিনি। কেমন এক ধরনের ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। জানি না, তারপর কোনও সূত্রে সুমনাদির সঙ্গে নির্মলবাবুর পরিচয় হয়েছিল কি না। তবে আমার সঙ্গে নির্মলবাবুর পরিচয় হবার পর মনে হয়েছিল, এমন একটি মানুষ, যিনি নিপাট ভদ্রলোক, যাঁর সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওতপ্রোত যোগাযোগ, তাঁকে অনায়াসে যে কোনও নায়িকার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারত। কোনরকম অঘটন ঘটবার আশঙ্কা ছিল না।

পরে, অনেক পরে, নির্মলবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ যখন রীতিমতো বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তখন তাঁর আর একটি রূপ আবিষ্কার করেছিলাম কলকাতা থেকে অনেক দূরে সেই তাজমহলের দেশে। সে কথায় পরে আসছি।

নির্মলকুমার যে সময়ে ফিল্মে এসেছিলেন সে সময়টাকে বাংলা সিনেমার সন্ধিক্ষণের যুগ বলা যেতে পারে। নিউ থিয়েটার্সের গৌরবরবি প্রায় অস্তমিত। এম. পি. প্রোডাকসন্সের পায়ের নীচের জমিটা তখনও তেমন শক্ত নয়। আজেবাজে লোকের হাতে বেশ কিছু এলোমেলো ছবি তখন তৈরি হতে শুরু হয়েছে। একজন অভিনেতা, যিনি ফিল্মটাকেই তাঁর কেরিয়ার করতে চান, তাঁর পক্ষে ওই সময়টা বিশেষ অনুকূল নয়।

তবে কেরিয়ার নিয়ে নির্মলকুমারের তেমন ভয় ছিল না। কারণ ওঁর একটা বাঁধা মাইনের সরকারি চাকরি ছিল। হাইকোর্টের চাকরি। নির্মলবাবু নিশ্চয় ভেবে নিয়েছিলেন, ফিল্মে যদি বেশি দূর এগোতে নাও পারেন, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি ক্লান্তও হয়ে পড়েন, তাহলেও তাঁর অসুবিধে হবে না। অবস্থা যদি তেমন তেমন হয় তাহলে ওয়ান ফাইন মর্নিং ফিল্ম লাইনটাকে গুডবাই করে চলে যাবেন। জীবিকার জন্যে হাইকোর্টের চাকরি তো রইলই। তার বাইরে জীবনটাকে খুঁজে নেবেন গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করে। সাহিত্যচর্চা করে। যেমন এতকাল করে আসছিলেন প্রথমে বহুরূপী আর তার পরে আনন্দম্ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে। যেমন করছেন তাঁর বন্ধু সবিতাব্রত দত্ত। সবিতাব্রতও হাইকোর্টের চাকুরে। আর তাঁরই সাহায্যে নির্মলকুমার পৌঁছোতে পেরেছিলেন মধু বসুর কাছে। নির্মলকুমারের জীবনের সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। কিন্তু সে কথা এখন থাক। ওটাতে পরে আসছি।

কোনও কোনও শিল্পীর যেমন হয়, প্রশংসা পান প্রচুর, কিন্তু সেই অনুপাতে কাজ পান না। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে নির্মলকুমারের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। 'শেষের কবিতা'-র অভিনয় করে উনি প্রশংসা যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি কাজও পেয়ে গিয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে। অথচ তখন উত্তমকুমার ভয়ানকভাবে তাঁর জায়গা করে নিয়েছেন ফিল্মে। ওদিকে অসিতবরণ আছেন, বিকাশ রায় আছেন, রবীন মজুমদারও বেশ কিছুটা আছেন। তারই মধ্যে থেকে বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে এলেন নির্মলকুমার। একের পর এক কাজ পেয়ে যেতে লাগলেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের ওই যুগসন্ধিক্ষণে দুজন এমন চিত্রপরিচালক এসে গেলেন, যাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে বাংলা ছবি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পেল। তাঁরা হলেন সত্যজিৎ রায় এবং তপন সিংহ। দুজনেই নবাগত এবং দুজনেই বিরাট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। নির্মলকুমারের সৌভাগ্য, তাঁদের মধ্যে একজনের চোখে তিনি ভয়ানকভাবে পড়ে গেলেন। তিনি হলেন তপন সিংহ। সত্যজিৎ রায়ের কোনও ছবিতেই নির্মলকুমার অভিনয় করার সুযোগ পাননি। এ নিয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট দুঃখ আছে। কিন্তু তপন সিংহ একের পর এক ছবিতে তাঁকে কুশীলব তালিকাভুক্ত করেছেন। তার জন্য নির্মলকুমারের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। নির্মলকুমার তপনবাবুর কেবল স্নেহভাজনই নন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তাঁর

অভিভাবকের মতো। তপনবাবু তো কথায় কথায় প্রায়ই বলেন : নির্মল আমার ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আমার ছবির তো বটেই, হৃদয়ের দরজাও চিরকালের মতো খোলা।

একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকের কাছ থেকে একজন শিল্পীর এটা যে কতবড় পাওয়া সেটা তো সকলেই স্বীকার করবেন। তপনবাবুর ওই অভিমতের সূত্র ধরে আমরা তো নির্মলবাবুকে মাঝে মাঝেই বলি : আপনার ভাগ্যটাকে হিংসে করতে ইচ্ছে হয় মশাই। তপনবাবুর মতো একজন বিখ্যাত মানুষের স্নেহ আর কেউ কেউ হয়তো পেয়েছেন, কিন্তু আপনার মতো এত বেশি আর কেউ বোধহয় পাননি।

আমার কথা শুনে নির্মলবাবু সলজ্জ হাসি হাসতেন। বলতেন : তপনদার কাছ থেকে এই স্নেহ পাওয়া যে গত জন্মের কত সুকৃতির ফল তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু এর ফলে কত মানুষের চক্ষুশূল যে আমাকে হতে হয়েছে, তার হিসাবটা কী আপনি রাখেন?

আমি বললাম : সে কী! আপনাকে তপনবাবু স্নেহ করবেন তাতে অন্যের গাএদাহ হতে যাবে কেন?

নির্মলবাবু হাসতে হাসতে বললেন : আমিও তো সেই কেনর উত্তরটাই খুঁজছি।

আমি বললাম : এই যে চক্ষুশূল হবার কথা আপনি বলছেন, এটা কী আপনার কনটেমপোরারি কোনও শিল্পীর?

নির্মলবাবু বললেন : না না, শিল্পীর হতে যাবে কেন! তপনদার তো কোনও বাঁধা শিল্পীর গোষ্ঠী নেই। উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেককেই তো অভিনয় করতে ডাকেন। ওঁর স্নেহ আমি যেমন পেয়েছি, তেমনি স্বরূপ দত্ত পেয়েছে, শমিত ভঞ্জ পেয়েছে, অনিল চ্যাটার্জি পেয়েছে, কালী ব্যানার্জি পেয়েছে, দিলীপ রায় পেয়েছে, তারা সবাই আমার বন্ধু অথবা স্নেহভাজন। আমাদের মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্ক খুব ভালো। ঠিক কথা, শিল্পীদেরও কিছু মানসিক দৈন্য থাকে। কিন্তু আমি যাঁদের মীন করছি তাঁরা কেউ শিল্পী নন।

আমি বললাম : তাহলে আপনি কাদের মীন করতে চাইছেন?

নির্মলবাবু বললেন : তাঁদের নাম আমি আপনার কাছে বলতে পারব না। আমার কাল্‌চারে বাধে। কেবল এইটুকুই বলতে পারি, তাঁরা কেউ অভিনেতা নন। আমি তপনদার ছবিতে একটা ভালো রোল্ পেলে তাঁদেব কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা আমার এই সৌভাগ্যকে দু চোখে দেখতে পারেন না। এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

আমি বললাম : আর বলবেন না। আমাদের ফিল্ম লাইনে ইদানীং এই জাতীয় লোকের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। দিনে দিনে আরও বাড়ছে ক্রমশ।

নির্মলবাবু বললেন : এইটে তো ভুল বললেন রবিবাবু। আমি কিন্তু লাইনের মানুষদের কথা বলছি না আদৌ।

আমি বললাম : তাহলে কাদের কথা বলছেন আপনি?

নির্মলবাবু বললেন : আন্দাজ করুন কাদের কথা বলতে পারি।

আমি বললাম : কী করে আন্দাজ করব। দোহাই নির্মলবাবু, আর সাসপেন্সে রাখবেন না। বলুন না, কাদের কাছ থেকে আপনি আঘাত পেয়েছেন।

নির্মলবাবু বললেন : বলেছি তো আপনাকে। আমি কারও নাম করতে চাই না। ওটা আমার রুচিতে বাধে। শুনেছি সাংবাদিকরা নাকি সবজান্তা হয়। তা আপনিও তো সাংবাদিক। আন্দাজ করুন না আমি কাদের কথা বলতে পারি।

আমি বললাম : তাহলে আপনি নিশ্চয় আপনার বন্ধুবান্ধবদের মীন করছেন।

নির্মলবাবু একহাত জিভ কেটে বললেন : ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনবেন না। আমার বন্ধুভাগ্য খুব ভালো। তাদের জন্যে আমি গৌরব বোধ করি।

আমি বললাম : তাহলে আবার কে রে বাবা! আমি তো মশাই মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

নির্মলবাবু বললেন : মাথাটা একটু খাটান, তবেই তো বুঝতে পারবেন। আচ্ছা আর একটু ধরিয়ে দিচ্ছি। জীবিকা হিসেবে ফিল্ম ছাড়া আরও একটা দরজা তো আমার খোলা ছিল। এবারে সেই

অ্যাঙ্গেলে একটু চিন্তা করুন।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল নির্মলবাবুর পুরনো কর্মস্থল হাইকোর্টের কথা। বলে উঠলাম : তবে কী আপনি হাইকোর্টের মানুষদের কথা বলছেন?

নির্মলবাবু বললেন : হ্যাঁ তাই। তবে কথাটা মানুষদের হবে না। ওটা হবে কিছু মানুষের। হাইকোর্টে আমার অনেক বন্ধু ছিল, এখনও আছেন, যাঁরা আমার উন্নতিতে, আমার কৃতিত্বে অনন্দ পান। কিন্তু দু-চার জন এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা আমাকে রীতিমতো ঈর্ষা করতেন। আমার সাকসেসটাকে তাঁরা আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না।

আমি বললাম : তাই নাকি। আপনার সাকসেসে তাঁদের ক্ষতিটা কী? তাঁরা তো আর অভিনয় করতে আসছেন না। বরং তাঁদেব একজন কলিগ্ নাম করেছে, সকলের প্রশংসা পাচ্ছে, এতে তো তাঁদের আনন্দই পাওয়া উচিত।

নির্মলবাবু বললেন : আমার দুর্ভাগ্য আমি সেটা পাইনি।

আমি বললাম : ব্যাপারটা একটু ডিটেলে বলুন না। না না, কারও নাম-ধাম আপনাকে বলতে হবে না। কী ঘটনাটা ঘটেছিল কেবল সেটাই বলুন।

আমাদের এইসব আলোচনা হচ্ছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে বসে। সেটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি। অসীম ব্যানার্জি পরিচালিত 'হাবানো প্রেম' ছবির আউটডোর শুটিং করবার জন্য নির্মলবাবু আগ্রায় গিয়েছিলেন। আর আমি গিয়েছিলাম সাংবাদিক হিসেবে ওই শুটিং কভার করতে। তখন আমি উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

নির্মলকুমার ছিলেন অসীম ব্যানার্জির একজন ফেভারিট আর্টিস্ট। এবং পয়মন্তও বটে। অসীমের প্রথম ছবি 'জন্মান্তর'-এর নায়ক ছিলেন নির্মলবাবু। নায়িকা ছিলেন অরুন্ধতী মুখার্জি। ছবিটি হিট্ করেছিল।

অসীমের দ্বিতীয় ছবি 'কোন একদিন'-এরও নায়ক ছিলেন নির্মলকুমার। নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরি। অরুন্ধতী আর সুপ্রিয়া দুজনেই পরবর্তীকালে নামের পাশে দেবী ব্যবহার করতেন। তা সেই 'কোন একদিন' ছবিটাও হিট্। একজন নতুন ডিরেকটারের পর পর দুটি ছবিতে নায়ক হিসেবে ছবি হিট্ করাতে অসীম নির্মলবাবুকে খুব পয়মন্ত ভাবতে শুরু করেছিলেন। যে কারণে তার পরবর্তী ছবি 'হারানো প্রেম'-এ অসীম নির্মলকুমারকে কাস্ট করেছিল। ওই ছবিতে নির্মলবাবু ছাড়াও বিশ্বজিৎ ছিলেন। কিন্তু ছবির প্রথম পর্বের পর শুটিং বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে আর বিশ্বজিৎ ডেট্ দিতে পারেননি। বোম্বাইয়ের অসীমকুমারকে তাঁর জায়গায় কাস্ট করানো হয়েছিল। ছবির নায়িকা ছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরি।

তা ওই আগ্রা পর্বের অনেক আগেই নির্মলকুমারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। উনি যখন স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতেন তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা। আমি ওঁর মনপসন্দ একখানা ইন্টারভিউ ছেপেছিলাম উল্টোরথের পৃষ্ঠায়। লেখাটি নির্মলবাবুর যে খুব ভালো লেগেছিল, সেটা আমি আড়াল থেকে ওঁর কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম। ইন্টারভিউটা ছেপে বেরনোর দিন দুই-তিন পরেই নির্মলবাবু আমার অসাক্ষাতে দেবনারায়ণ গুপ্তকে সেই লেখাটা পড়বার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে আমিও তখন দেবুদার সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্টার থিয়েটারে গিয়েছিলাম। দরজার বাইরে থেকেই নির্মলবাবুর ওই অনুরোধ কানে গিয়েছিল। মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল। নিজের লেখার প্রশংসা অন্যের মুখে শুনলে কার না ভালো লাগে বলুন। আফটার অল্ আমি তো একজন মানুষ। মুনি-ঋষি কিংবা দেবতা তো নয়।

তা যে কথা বলছিলাম। আগ্রায় গিয়ে কিন্তু আমরা একই হোটেলে থাকবার জায়গা পাইনি স্থানাভাববশত। নির্মলবাবু, সুপ্রিয়া আর বিশ্বজিৎ ছিলেন লরিস্ হোটেলে। আমি স্থান পেয়েছিলাম কাছাকাছি এম্প্রেস হোটেলে শিল্পী নৃপতি চাটুজ্যে, প্রযোজক সুবোধ দাস, পরিচালক আসীম ব্যানার্জি আর অন্যান্য টেকনিসিয়ান্সদের সঙ্গে। আমার সঙ্গে ফটোগ্রাফার হিসেবে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালের চিত্রপরিচালক অজয় বিশ্বাস। অজয় তখন থেকেই তার প্রথম ছবি 'প্রথম প্রেম'-এর জন্য পাঁয়তারা কষছিল। ট্রেনের সারাটা পথ সে তার ছবির স্ক্রিপ্ট লিখতে লিখতে গিয়েছিল।

দিনান্তে শুটিং শেষে আমরা এস্প্রেস হোটেল থেকে লরিস হোটেলে চলে আসতাম। সেখানে জমাটি আড্ডা বসতো। কিন্তু নির্মলকুমার আমাদের সেই আড্ডায় থাকতেন না। উনি তখন ব্যস্ত থাকতেন সুপ্রিয়ার মেয়ে সোমাকে নিয়ে। সোমা তখন খুবই ছোট। বছর চার-পাঁচ বয়েস। নির্মলবাবু তাকে নিয়ে ছোটা দৌড়া ইত্যাদি নানাবিধ ছেলেখেলা করতেন। নানান রকম ম্যাজিক দেখাতেন। তখন মনেই হত না, এই মানুষটি একদা 'শেষের কবিতা' ছবিতে অমিট্ রে করেছেন।

নির্মলবাবুকে ওই অবস্থায় দেখতে দেখতে মনে হত, এই অবিবাহিত পুরুষটি বিয়ে করছেন না কেন? করলে তো এইরকম একটা সুন্দর সন্তান পেতে পারতেন। তার সঙ্গে নানাবিধ খেলাধুলো করতে পারতেন। পরের মেয়েকে নিয়ে এইভাবে ছেলেখেলা করতে হত না।

এর বছর পাঁচ-সাত পরে নির্মলবাবু আমাদের এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়িকা মাধবী মুখার্জিকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের সন্তানও হয়েছে। জানিনা তাকে নিয়ে নির্মলবাবু ওইরকম ছেলেখেলায় মেতে থাকতেন কিনা। ওঁদের সংসারে গিয়ে উঁকি দেবার সুযোগ তো আমার হয়নি। বাধা ছিল না কিছু। অনায়াসে যেতে পারতাম। কিন্তু যাওয়া হয়নি।

মাধবীর সঙ্গে নির্মলবাবুর বিয়েটাও একটা চমকপ্রদ ব্যাপার। ওঁদের বিয়ের চিঠি হাতে আসার পর কতজনের কত রকম রি-অ্যাকশন যে হয়েছিল তা কী বলব। তবে সে কথা এই মুহূর্তে বলতে চাইছি না। আর একটু পরে বলব। তার আগে সেই হাইকোর্টের ঘটনাটা বলে নিই।

আগ্রায় ওই 'হারানো প্রেম'-এর আউটডোরে নির্মলবাবুকে একদিন আলাদা করে ধরলাম। বললাম : কী মশাই, আমাদের সবাইকে এমন অচ্ছুৎ করে রেখেছেন কেন? আমরা কী একেবারেই মেলামেশার অযোগ্য।

নির্মলকুমার মানুষটি তো অত্যন্ত ভদ্র। আমার কথায় খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন। বললেন : না না, ওসব কী বলছেন। সোমাকে তো সঙ্গ দেবার জন্যে একমাত্র কমলবাবুই আছেন। তা তিনিও মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অন্য কাজে। তাই বাচ্চা মেয়েটাকে একটু সঙ্গ দিই। ওর সঙ্গে খেলাধুলো করি। আর তাছাড়া আপনারা সব—

বলতে বলতে থেমে গেলেন নির্মলকুমার। আমি বললাম : থামলেন কেন? বলুন না আমরা সব কী?

নির্মলবাবু বললেন : আপনারা মাঝে মাঝে আদিরসের আলোচনায় চলে যান তো! ও রসটা আমরা আবার একদম সহ্য হয় না। তাই একটু দূরে দূরে থাকি।

আমি বললাম : আমি মশাই শক্তি চাটুজ্যের কবিতার মতো ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি। আদিরসে আমার যতটা আগ্রহ, অনাদি রসে তার চেয়ে একবিন্দু কম নয়। চলুন, আপনার সঙ্গে আজ অনাদি রসের আলোচনাই করা যাক প্রাণ খুলে।

আমার কথা শুনে নির্মলবাবু হো হো করে আকাশ ফাটানো হাসি হাসতে লাগলেন। হাসির দমকটা একটু কমতে বলে উঠলেন : আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না মশাই।

এই ফাঁকে কমলবাবুর কথাটা একটু বলে নিই। কমলবাবু হলেন সুপ্রিয়া দেবীর স্বামী বিশু চৌধুরির ভাগনে। তিনি নিজেও একজন অভিনেতা। উৎপল দত্তর লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগ্রায় গিয়েছিলেন সুপ্রিয়া আর সোমার দেখভাল করতে।

তা সেদিন নানান আলোচনার মাঝখানে নির্মলবাবুর মুখ থেকে তাঁর হাইকোর্ট জীবনের দুঃখজনক ঘটনাটা শুনেছিলাম।

নির্মলবাবু হাইকোর্টে ওল্ড রেকর্ডস সেকশনে কাজ করতেন। অফিসের কাজ সামলে প্রথম প্রথম শুটিং করতে বিশেষ অসুবিধা হত না। দরকার মতো ছুটি নিয়ে শুটিং করতেন। কিন্তু তাতেও ওঁর উধর্বতন এক অফিসারের গাত্রদাহ। মাঝে মাঝেই তিনি নির্মলবাবুকে ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলতেন।

একদিন সেই ঠেস দেওয়াটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেল যে নির্মলবাবু সহ্য করতে পারলেন না। তিনিও দুটো কথা শুনিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে। তাই নিয়ে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি। কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে কাজে রেজিগনেশন দিয়ে দিলেন নির্মলকুমার। আসবার সময় বলে

এলেন : অফিস আমায় কিছু টাকা দেয় ঠিকই, কিন্তু সম্মান দিতে পারল না। অথচ অভিনয় আমাকে টাকা যেমন দেয়, তার থেকে বেশি দেয় সম্মান। আমি সেই সম্মান নিয়েই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চাই। অতএব গুডবাই স্যার, গুডবাই!

শুধু ওই একটি দিনই নয়। নির্মলকুমারের সারাটা জীবনই তাই। তিনি কোনওদিন কোনওরকম অসম্মানের সঙ্গে আপস করেননি। এর জন্যে তাঁর ক্ষতি হয়েছে অনেক। কিন্তু সেইসব ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি সসম্মানে নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে এগিয়ে চলেছেন আজও। তেমন কিছু কিছু ঘটনা আমার জানা আছে।

নির্মলকুমার কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে তিনি চলচ্চিত্রের অভিনেতা হবেন। এটা নিয়ে তাঁর কোনও পরিকল্পনাও ছিল না। বরং হাইকোর্টে কাজ করতে করতে মঞ্চাভিনয় নিয়ে বেশ কিছুটা মেতেছিলেন। প্রথমে অল্প কিছুদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর বহুরূপী গোষ্ঠীর সঙ্গে। সেখানেও এমন বেশি কিছুদিন নয়। মাত্র একটা নাটকে কয়েক মিনিটের জন্য অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে মূলত যেটা শিখেছিলেন সেটা হল গ্রুপ থিয়েটারের নিয়মানুবর্তিতা। উপলব্ধি করেছিলেন নাট্যচেতনা। আর শম্ভু মিত্র নামক বিরাট মঞ্চব্যক্তিত্বকে কাছে থেকে দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বরের অপূর্ব কারুকার্য। কীভাবে ভয়েস থ্রো করতে হয় সেটা একলব্যের মতো অনুশীলন করেছিলেন। যেটা পরবর্তীকালে বেতার-নাট্যে অভিনয় করার সময় অসম্ভব কাজে লেগেছিল নির্মলবাবুর। তিনি যে বেতার শ্রোতাদের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন, সেটা পরোক্ষভাবে শম্ভু মিত্রেরই অবদান।

বহুরূপীর পর আনন্দম। বহুরূপী থেকে ভেঙে যাওয়া একটি গোষ্ঠীকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই নাট্য প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে ছিলেন তুলসী লাহিড়ী, সবিতাব্রত দত্ত, মহম্মদ ইসরাইল প্রমুখ এবং নির্মলকুমার। যদিও এটা নির্মলবাবুর পেশা নয়, নেশা, তবে নেশার টান যে পেশাকে পিছনে ফেলে রেখে যায় সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সারাদিন হাইকোর্টে হাড়ভাঙা খাটুনির পর সবিতাব্রত দত্তের বকুলবাগানের বাড়িতে রিহার্সাল কিংবা আলোচনার আসরে একটি দিনের জন্যেও কামাই ছিল না নির্মলকুমারের।

এই সবিতাব্রত দত্তই ছিলেন নির্মলকুমারের জীবনের ধ্রুবতারা। সবিতাব্রতও হাইকোর্টের কর্মী। কিন্তু উভয়ের পরিচয় কোর্টের সূত্রে নয়। তার অনেকদিন আগে থেকেই। নির্মলকুমারের জন্ম ভবানীপুরে, শিক্ষা ভবানীপুরে। সবিতাব্রতরও তাই।

আর ছিল ওঁদের অমৃতায়নের আড্ডা। পুরনো কলকাতার রসা রোড আর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ের এই চায়ের দোকানটি ছিল শিল্পী, শিল্পপ্রেমী আর উঠতি সাহিত্যিকদের রাঁদে-ভূ। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় যেমন কফি হাউস, কালীঘাট আর বালিগঞ্জের এই অমৃতায়ন নামক চায়ের দোকানটিরও তেমনই গুরুত্ব। তখনো বসুশ্রী কফি হাউস তৈরি হয়নি, তাই দক্ষিণ কলকাতার তাবত আড্ডা ছিল এইখানেই। এখানে আড্ডা দিতেন না কে! ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য সান্যাল, সবিতাব্রত দত্ত, নির্মলকুমার, মহম্মদ ইসরাইল প্রমুখ তরুণদের ঘোরতর আড্ডাস্থল ছিল এই অমৃতায়ন।

১৯৫২ সাল নাগাদ পরিচালক মধু বসু যখন 'শেষের কবিতা' ছবির পরিকল্পনা করলেন তখন তাতে অমিত রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন সবিতাব্রত দত্তকে। এর আগে বহুরূপীর 'চার অধ্যায়' নাটকে অতীনের চরিত্রে সবিতাব্রতকে দেখে দারুণ ভালো গেলে গিয়েছিল মধু বসুর। সবিতাব্রতকে ডেকে তিনি বললেন : দেখো, আমার এই 'শেষের কবিতা' ছবির প্রোডিউসাররা অমিত রায়ের চরিত্র করবার জন্য অভি ভট্টাচার্যের নাম সাজেস্ট করেছেন। কিন্তু আমি চাইছি নতুন কোনও মুখ। অন্তত ফিল্মে যার কোনও ইমেজ আজও তেমনভাবে তৈরি হয়নি। আমি 'চার অধ্যায়' নাটকে তোমার অতীন দেখেছি। আমার ধারণা তুমি এই রোলে বেশ মানানসই হবে।

সবিতাব্রত চুপচাপ মধুবাবুর কথা শুনলেন। তারপর বললেন : আমি কিন্তু নিজেকে ওই চরিত্রের উপযুক্ত মনে করছি না। অভিনয় হয়তো করতে পারব, কিন্তু আমাকে মানাবে না। অমিট্ রে-র চরিত্রের

মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের সাহেবিয়ানার ব্যাপার আছে। ওটা বোধহয় আমার দ্বারা হবে না।

সবিতাব্রতর কথা শুনে মধুবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন : তাহলে কী করা যায় বলো দেখি।

সবিতাব্রত বললেন : আমি একটি ছেলের নাম সাজেস্ট করতে পারি। হাইকোর্টে আমার সঙ্গে কাজ করে। আমাদের গ্রুপে নাটক করে। বেশ লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, চোখ দুটো ইম্প্রেসিভ। আমার ধারণা তাকে অমিত রায়ের চরিত্রে ভালোই মানাবে। আর অভিনয়ের ব্যাপারটা তো আপনার হাতে। আপনি তার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারেন।

মধুবাবু বললেন : তাহলে তুমি তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। খুব তাড়াতাড়ি। আমার ছবির আর সব চরিত্র কাস্ট করা হয়ে গেছে। কেবল অমিত রায়কেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমি ইমিডিয়েটলি ছবির কাজটা শুরু করে দিতে চাই।

পরের দিনই হাইকোর্ট থেকে ফেরার পথে সবিতাব্রত নির্মলকুমারকে ফেয়ারলন হোটেলের গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। মধুবাবু প্রায় সারাটা জীবন এই ফেয়ারলন হোটেলের বাসিন্দা হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। হোটেলের গেটের সামনে এসে সবিতাব্রত নির্মলবাবুকে বললেন : আমি আর ভেতরে যাচ্ছি না। তোদের কথাবার্তার মধ্যে আমার থাকা উচিত হবে না। একদম নার্ভাস হবি না। আমি বলছি ওই রোলটা তোর দ্বারাই হবে। আমি বাড়িতে আমাদের রিহার্সাল রুমে আছি। কী হল না হল খবরটা দিতে ভুলিস না যেন।

নির্মলবাবুর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি নার্ভাস ফিল্ করছিলেন নাকি?

নির্মলবাবু বললেন : একদম না। আমি তো জানতাম আমাকে মধু বসুর পছন্দই হবে না। নেহাত সবিতাব্রত দত্ত বলেছেন তাই, সেইজন্যেই দেখা করতে ডেকেছেন। এটা একটা নিছক ভদ্রতাসূচক ব্যাপার। কাজেই নার্ভাসনেস বস্তুটা মনের আনাচে-কানাচেও ছিল না।

আমি বললাম : মধুবাবুর সঙ্গে কী কথা হল?

নির্মলবাবু বললেন : বোস সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার সব খবরাখবর নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটা আমি পড়েছি কিনা? আমি বললাম, বেশ কয়েকবার পড়েছি। তখন উনি অমিত রায়ের চরিত্র সম্পর্কে আমার কী কনসেপশন সেটা জানতে চাইলেন।

আমি বললাম : উনি আপনাকে পার্ট-টার্ট কিছু পড়াননি।

নির্মলবাবু বললেন : পার্ট পড়াননি। তবে আমার আবৃত্তি শুনেছিলেন। শেষের কবিতা উপন্যাস থেকে খানিকটা পড়তে বলেছিলেন। ওই পড়ার সময় একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঘটেছিল।

আমি বললাম : কী রকম?

নির্মলবাবু বললেন : খানিকটা পড়ার পর হঠাৎ উনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ওই জায়গাটায় একটু যতি দিলেন, ওখানে তো কমা কিংবা সেমিকোলন নেই। তাহলে হঠাৎ যতি দিলেন কেন?

আমি বললাম : ওটা দিলাম বাক্যের ছন্দ সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লেখার সময় ওটা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু পড়ার সময় আমার ওটা প্রয়োজীয় মনে হয়েছে। তাই দিয়েছি।

আমি বললাম : আপনার বক্তব্য শুনে নিশ্চয় মধুবাবু খুশি হয়েছিলেন।

নির্মলবাবু বললেন : মনে তো হয় তাই। না হলে উনি আমাকে পরের দিন আবার ডেকে পাঠাবেন কেন?

আমি বললাম : পরের দিনই তাহলে ফাইনাল হয়ে গেল?

নির্মলবাবু বললেন : ফাইনাল কী সেমি ফাইনাল অথবা কোয়ার্টার ফাইনাল সেটা তো বোসসাহেবের মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না। উনি তো খুব রিজার্ভ টাইপের মানুষ। তবে অনেকক্ষণ অমিত রায়ের চরিত্রটা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, আমি এখন আপনাকে কোনও কথা দিচ্ছি না। আমার প্রোডাকসন কন্ট্রোলার মণিলাল শ্রীবাস্তব। তাকে দিয়ে আপনার কাছে খবর পাঠাবো।

আমি বললাম : খবরটা কতদিন পরে পেলেন আপনি?

নির্মলবাবু বললেন : দিন তিন-চারেকের মধ্যেই। সেদিন দুপুরে কোর্টে বসে কাজ করছি, সেই সময় মণিলালবাবু এসে বললেন, সাহেব আপনাকে এক্ষুনি একবার ডাকছেন। যেতে পারবেন? তা আমি বললাম, এক্ষুনি? দাঁড়ান, ছুটি নিয়ে আসি।

আমি বললাম : তারপর?

নির্মলবাবু বললেন : রাস্তায় যেতে যেতে মণিলালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বোস সাহেব কি আমাকে সিলেক্ট করেছেন?

মণিলালবাবু বললেন : ওটা সাহেবের ব্যাপার। সাহেবই বলবেন। আমি জানলেও মুখ খুলতে পারব না।

আমি বললাম : তখনও সব ব্যাপারটা সাসপেন্সে থেকে গেছে।

নির্মলবাবু বললেন : ঠিক তাই। মধুবাবুর মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। মণিলালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর মুখে কুলুপ আঁটা। সে এক অসহনীয় অবস্থা।

আমি বললাম : সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন কবে?

নির্মলবাবু বললেন : আমি তো মানসিকভাবে মুক্তি পেয়েছিলাম বোস সাহেব যখন আমাকে পাকা কথা দিলেন, সেইদিনই। কিন্তু পরে জেনেছিলাম আমার সিলেকশনটা ফাইনাল হয়েছিল শিলং-এ গিয়ে সাতদিন শুটিং করার পর।

আমি বললাম : সে আবার কী!

নির্মলবাবু বললেন : ওইখানেই তো মজা। সব ঘটনাটা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

আমি বললাম : ঠিক আছে, বলুন।

নির্মলবাবু বললেন : সেদিন মণিলালবাবুর সঙ্গে আমাকে ফেয়াবলন হোটেলে দেখেই বোসসাহেব চমকে উঠলেন। বললেন, এ কী মণিলাল, তুমি একেবারে ওঁকে ধরে নিয়ে এসেছো! আমি তো বলেছিলাম, ওঁকে খবরটা দিয়ে আসবে। ছুটির পর এলেও চলবে।

আমি বললাম : তাতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। অফিসে বলে ছুটি নিয়ে এসেছি।

মধুবাবু বললেন : আপনাকে আমি অমিত রায়ের চরিত্রে নেব বলে ঠিক করেছি। তবে এটা পাকা কথা নয়। পাকা কথা দেব স্ক্রিন টেস্ট দেখার পর। কাল বিকেলে পাঁচটার সময় আপনাকে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আসতে হবে। ওই স্টুডিওটা আপনি চেনেন?

আমি বললাম : না তো।

মধুবাবু বললেন : টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ার ওটা শেষ স্টুডিও। একেবারে রাস্তার ওপরেই। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। আমার একটা ছবির প্রোজেকশান আছে, সেটা দেখে ঠিক পাঁচটার সময় আসব। একটা কথা বলে রাখি আপনাকে। আমি টাইম সম্পর্কে খুব পার্টিকুলার। পাঁচটা মানে পাঁচটাই।

নির্মলবাবু বললেন : তা পরের দিন পাঁচটার বেশ খানিকক্ষণ আগেই আমি খুঁজতে খুঁজতে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম। লোকজন বিশেষ নেই। এক ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে মধুবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। শুনে তো তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, বিরক্তভাবে বললেন, মধুবাবু নেই। কী দরকার মধুবাবুর সঙ্গে। পার্ট-টার্ট চাইতে হলে আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, ওসব কিছু হবে না। কেটে পড় এখান থেকে।

নির্মলবাবু বললেন : আমি আর ভদ্রলোককে বললাম না যে মধুবাবুই আমাকে দেখা করতে বলেছেন। শুধু বললাম, মধুবাবুর সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার। তিনি কি আছেন?

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে কী ভাবলেন কে জানে। বললেন : না নেই। ওই মাঠে গিয়ে বসে থাক গে যাও। যদি আসেন দেখা হবে।

নির্মলবাবু বললেন : তা ভদ্রলোকের নির্দেশমতো আমি মাঠে গিয়ে বসে রইলাম। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। পাঁচটা যেন আর বাজতেই চাইছে না। তারপর ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা তখন সাদা রঙের একখানি বিরাট গাড়ি স্টুডিওতে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামলেন মধু বসু। বুঝলাম বোসসাহেব শুধু

নামেই সাহেব নয়। কাজেও সাহেব। সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে এরকম পাংচুয়ালিটি সচরাচর দেখা যায় না।

আমি বললাম : মধুবাবুকে দেখে আপনার ধড়ে প্রাণ এল?

নির্মলবাবু বললেন : অতটা নয়। তবে একটা উৎকণ্ঠা তো ছিলই। আমার সঙ্গে কথা বলে মধুবাবুর পছন্দ হয়েছে। ছবির রেজাল্ট কী হবে কে জানে!

আমি বললাম : তারপর কী হল?

নির্মলবাবু বললেন : গাড়ি থেকে নেমে মধুবাবু দেখলাম পূর্বোক্ত ভদ্রলোককে কী সব জিজ্ঞাসা করছেন। বুঝলাম আমাকেই খোঁজাখুঁজি চলছে। আমি মাঠে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। সে ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে আমাকে দেখালেন। মধুবাবু আমার দিকে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এখছেন? আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে প্রায় এক ঘণ্টা আগেই এসেছি। বললাম, এই খানিকক্ষণ হল।

মধুবাবু এক ভদ্রলোককে ডেকে বললেন : ত্রিলোচন, এঁকে চটপট মেক-আপ করে দাও। আমার হাতে বেশি সময় নেই।

নির্মলবাবু বললেন : বোসসাহেব যাঁকে কথাটা বললেন, পরে জেনেছিলাম তিনি বিখ্যাত রূপসজ্জাকর ত্রিলোচন পাল। যাঁর হাতে আমার জীবনের প্রথম গোঁফচ্ছেদন হয়েছিল।

আমি চমকে উঠে বললাম : সেটা কী রকম?

নির্মলবাবু বললেন : মেক-আপ রুমে ঢুকিয়ে ত্রিলোচনবাবু প্রথমেই একখানা ভোঁতা ব্লেড দিয়ে আমার গোঁফ চাঁছতে শুরু করলেন। দু-চার জায়গায় কেটেকুটে গেল। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। ত্রিলোচনবাবু বললেন, ভয়ের কিছু নেই, আমার কাছে অ্যান্টিসেপটিক বাম আছে, লাগিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমাকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে দুটো গালে থাবড়ে থুবড়ে মেক-আপ করে দিলেন। সেই মেক-আপ করা অবস্থায় মধুবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, এ কী! আপনার গোঁফ ছিল না? সেটা কী হল? আমি বললাম, ওটা তো মেক-আপ করার আগে কেটে দিলেন উনি।

মধুবাবু তখন ত্রিলোচনবাবুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : ওঁর গোঁফটা কেটে দিলে কেন!

ত্রিলোচনবাবু আমতা আমতা করে কী বললেন, বোঝা গেল না।

মধুবাবু বললেন : ঠিক আছে। আমি গোঁফ ছাড়া টেস্ট নিচ্ছি। ততক্ষণে একটা গোঁফ বেছে রাখো। পরে গোঁফ সমেত ছবি নেব।

আমি বললাম : স্ক্রিন-টেস্টের পর মধুবাবু কী বললেন?

নির্মলবাবু বললেন : টেস্ট হয়ে যাবার পর বোসসাহেব বললেন, কাল-পরশু করে প্রিন্ট হয়ে যাবে। তারপর আমি মণিলালকে দিয়ে খবর পাঠাবো। একটা কথা। আপনি কিন্তু এখনও সিলেক্ট হননি। কাজেই বাইরে কাউকে কিছু বলবেন না।

আমি বললাম : এর মধ্যে সবিতাব্রতবাবুকে কিছু বলেননি আপনি?

নির্মলবাবু বললেন : ঝুনুদার (সবিতাব্রত দত্তর ডাক নাম। প্রিয়জনেরা ওঁকে এই নামেই ডাকেন) কাছে সব কিছু খুলে বলতাম। ডে টু ডে রিপোর্ট করতাম। সেই স্ক্রিন-টেস্টের দিনও তো ঝুনুদা আমার জন্যে অমৃতায়নে ওয়েট করছিলেন। কিন্তু আমি যেতে পারছিলাম না সেখানে!

আমি বললাম : কেন?

নির্মলবাবু বললেন : ওই গোঁফহীনতার জন্যে। ছবিতে চান্স পাব কি পাব না ঠিক নেই অথচ তার আগেই গোঁফটা বিসর্জন দিতে হল। বন্ধুরা কী বলবে! তাছাড়া যারা আমার এই ছবিতে নামার তোড়জোড়ের ব্যাপারটা জানে না, তাদের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব গোঁফ না থাকার। তাই অমৃতায়নের উল্টো ফুটপাথে মধুবাবু যখন তাঁর গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলেন তখন প্রায় মিনিট পনেরো আমি গোঁফে রুমাল চাপা দিয়ে যাব কি যাব না ভেবে ইতস্তত করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়েছিল। কেন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলছি তার জন্যে মিথ্যে করে বলতে হয়েছিল, সর্দি হয়েছে। সে মিথ্যে ধোপে টেকেনি। সব ঘটনা শুনে সবাই হই-হই করে উঠেছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি সিলেক্ট হয়ে গেছি।

সেই জন্যে ধারধোর করে সবাইকে চা-ওমলেট খাওয়াতে হয়েছিল।

আমি বললাম : আপনি যে বললেন শিলং-এ সাতদিন শুটিং করবার পর আপনার সিলেকশান পাকা হয়েছিল, সেটা কী ব্যাপার?

নির্মলবাবু বললেন : আমি তো কলকাতায় বসেই জেনে গিয়েছিলাম, যে আমিই সিলেক্ট হয়েছি। আমার মাপের কোট-প্যান্ট তৈরি হয়েছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে শিলঙে গেছি শুটিং করতে। পরে জেনেছিলাম আমার কাজ দেখার পর ফাইনাল করা হয়েছিল। ওঁদের পছন্দ না হলে বাদ চলে যেতে পারতাম।

আমি বললাম : মধুবাবু কি আপনার সম্পর্কে কনফিডেন্ট ছিলেন না?

নির্মলবাবু বললেন : ওভার কনফিডেন্ট ছিলেন। যে কারণে প্রথম দফার শ্যুটিং-এর নেগেটিভ কলকাতা থেকে প্রিন্ট কবিয়ে শিলং-এ যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন বোসসাহেব সেটা দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমি বললাম : কে দেখেছিলেন তাহলে?

নির্মলবাবু বললেন : প্রোডিউসার, ক্যামেরাম্যান, প্রোডাকসন কন্ট্রোলার এবং আরও কে কে যেন! ছবি দেখার পর তাঁদের মনের মেঘ কেটে গিয়েছিল।

আমি বললাম : আপনি একটা ভালো কাজ করেছেন। হিরোর ইমেজ থাকতে থাকতেই আপনি ক্যারেকটার অ্যাকটিং-এ চলে এসেছেন।

নির্মলবাবু বললেন : ওটা তপনদার ক্রেডিট। তপন সিংহকে আমি আমাদের সময়কার শ্রেষ্ঠ ফিল্ম ডিরেক্টার বলে মনে করি। ওঁর অধিকাংশ ছবিতেই আমি কাজ করেছি। উনি যখন ওঁর 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছবিতে একেবারে ডিফারেন্ট টাইপের একটি বয়স্ক উকিলের রোল দিলেন এবং আমাকে যেভাবে ওই চরিত্রের সঙ্গে ইনভলভ করিয়ে দিলেন, সেটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সেটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমার কাছে। ওই চরিত্রে তপনদার অনুমতি নিয়ে আমি আগাগোড়া সেকেন্ড ভয়েসে অ্যাকটিং করেছিলাম, যার রেজাল্ট হয়েছিল সাংঘাতিক ভালো। দুঃখ কোথায় জানেন? তপনদার কাজের যথাযথ মূল্যায়ন আজও হল না। ওঁর থেকে অনেক লোয়ার কোয়ালিটির ডিরেকটারকে নিয়ে অযথা লাফঝাঁপ করা হয়েছে।

আমি বললাম : এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

নির্মলবাবুর জন্ম ১৯২৮ সালে ভবানীপুরে। বাবার নাম ইন্দুশেখর চক্রবর্তী। ওঁদের আদি নিবাস রাজশাহী। কিন্তু প্রায় তিনপুরুষ আগে থেকেই কলকাতার বাসিন্দা।

১৯৫৩ সালে 'শেষের কবিতা'-র পর থেকে নির্মলবাবু অদ্যাপি কত ছবিতে অভিনয় করেছেন তার হিসেব ওঁর কাছেও নেই, আমার কাছেও নেই। তবে একটা ছবিতেও যে একেবারে বাজে অভিনয় করেননি, সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত এবং উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'কমললতা' ছবিতে গহরের চরিত্রে অভিনয় করে উনি প্রেস্টিজিয়াস বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সাংবাদিকদের প্রতি নির্মলকুমারের একটা অভিমান আছে। যে কারণে উনি কাউকে ইন্টারভিউ দেন না। কেবল একবার মাত্র আমাকে দিয়েছিলেন। তখন উনি স্টার থিয়েটারে 'শ্রীকান্ত' নাটকে অভিনয় করছিলেন। সেটাই ওঁর প্রথম পেশাদার মঞ্চাভিনয়। তারপরে বিভিন্ন মঞ্চে আরও পাঁচখানি নাটকে অভিনয় করেছেন। সিনেমা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে, নাটক শুরু করেন শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে।

রেডিওতে অজস্র নাটক করেছেন। রেডিওতে ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেকালের বিশিষ্ট আবৃত্তিকার নীলিমা সান্যাল। নীলিমাদি রেডিওর সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। নিউ এম্পায়ারে সাধনা বসুর একটা নাচের প্রোগ্রামে নীলিমাদি আর নির্মলবাবু একত্রে পাঠ করেন। তিনিই নির্মলবাবুকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন গার্স্টিন প্লেসে অল ইন্ডিয়া রেডিওর অফিসে। কোনরকম অডিশান ছাড়াই প্রথম দিনই নাটকে অভিনয় করতে হয়েছিল নির্মলবাবুকে। বেতার-শ্রোতাদের কাছে উনি ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয়। সেদিন কথায় কথায় জগন্নাথ বসু বলছিলেন : নির্মলকুমারের ভয়েসের মধ্যে একটা আশ্চর্য মাদকতা

আছে। ওঁর কণ্ঠস্বরের ওই যে খয়া খয়া ভাব, ওটা শ্রোতাকে মোহিত করে রাখে।

১৯৬৮ সালে নির্মলকুমারের বিয়ে হয় তৎকালীন বিখ্যাত নায়িকা মাধবী মুখার্জির সঙ্গে। এটা আমাদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। কবে যে ওঁদের আলাপ-পরিচয় হল, ঘনিষ্ঠতা হল, সেটা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। ওটা নির্মলবাবু প্রথম জানিয়েছিলেন অসিত চৌধুরিকে, তারপরে উত্তমকুমারকে। উত্তমবাবুই ছিলেন নির্মলকুমারের তরফের বরকর্তা। সেই বিয়ে নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটেছিল।

কিন্তু না, ওই আলোচনাটা আপাতত স্থগিত থাক। ওটা বরং মাধবীর প্রসঙ্গে যখন লিখবো তখন জানালেই জমবে ভালো।

মাধবী

মাধবীকে নিয়ে লেখা শুরু করতে গিয়ে একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। কোন্‌টা ওঁর সারনেম হিসেবে ব্যবহার করব? মুখার্জি না চক্রবর্তী? বিয়ের আগে মাধবীর পদবী ছিল মুখার্জি। অভিনেতা নির্মলকুমারকে বিয়ের পর হলেন চক্রবর্তী। আর এখন তো কখনও চক্রবর্তী আবার কখনও মুখার্জি। বাংলা ছবির প্রোডিউসাররা তাঁদের ছবিতে কেউ চক্রবর্তী ব্যবহার করছেন, আবার কেউ মুখার্জি। চিত্রকর ও পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী তো ওঁকে মুখার্জি ছাড়া ভাবতেই পারেন না। আমার কাছে একদিন কথাপ্রসঙ্গে উনি সাফ সাফ এই কথাটাই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি এখন কী করি! মনান্তরের কারণে মাধবী নির্মলকুমারের সংসার পরিত্যাগ করে চলে গেছেন প্রবল অভিমানে। ওঁর দুই মেয়ে কিন্তু নির্মলবাবুর কাছেই আছে। বড় মেয়ে সিমি তো এখন সাংবাদিক। আনন্দবাজার গ্রুপের সানন্দা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ছোট মেয়ে পড়াশোনা করছে। যেহেতু মাধবী স্বামীর সংসার ছেড়ে গেছেন, তাই তাঁর পদবীতে চক্রবর্তী ব্যবহার করতে আমার আটকাচ্ছে। আবার এই সংসার ত্যাগের ব্যাপারটা যে একটা পার্মানেন্ট সেট্‌লমেন্ট সেটাও তো বলা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগেই তো মাধবী অভিমান ভুলে নির্মলবাবুর সংসারে ফিরে এলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই আবার সংসার পরিত্যাগ করে তাঁর গড়িয়ায় নতুন কেনা ফ্ল্যাটে চলে গেলেন। আবার যে ফিরে আসবেন না তাই বা কে বলতে পারে।

এমতাবস্থায় একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। ওঁর নামের পেছনে কোন লেজুড় না রেখে শুধু মাধবী বলেই সম্বোধন করা যাক। মাধবীও তো তাই করছেন। ওঁর গড়িয়ার ফ্ল্যাটের নেমপ্লেটে আগে পরে কিছু না রেখে মাধবীই লেখা আছে।

মাধবী যখন মাধবী হননি, সিনেমাতেও যখন অভিনয় শুরু করেননি, তখনই ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে বেলেঘাটার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। মহেন্দ্র গুপ্ত মশাই তাঁর দলবল নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে নাটক করতে গিয়েছিলেন। আমি তখন উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এটা পঞ্চাশের দশকের কথা। নাটক শুরু হবার আগে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

পঞ্চাশের দশকে স্টার থিয়েটার যখন নতুন করে সাজানো-গোছানো হল, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো হল, তখন সেই স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর স্থান হল না। উনি থাকলেন না, অথবা ওঁকে রাখা হল না, সে ব্যাপারটা আমি জানি না। তবে ওই সময়েই মহেন্দ্রবাবু হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে নিজেই একটা ট্রুপ করে ফেললেন। নানা ধরনের নাটক অভিনয় করতে লাগলেন কলকাতায়, কলকাতার বাইরে। সেই ট্রুপেরই অন্যতমা অভিনেত্রী ছিলেন মাধুরী মুখোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, মাধবীর আসল নাম মাধুরী। ওই নামেই তিনি শিশুকাল থেকে নাটকে অভিনয় করে আসছেন। 'বাইশে শ্রাবণ' ছবির নায়িকা করার সময় প্রযোজক বিজয় চ্যাটার্জি ওঁর নামটা বদলে মাধবী করে দিয়েছিলেন। তার আগে তপন সিংহর 'টনসিল' ছবিতে উনি নায়িকা করেছিলেন। তখনও ওঁর নাম ছিল মাধুরী। তবে ওই ছবিতে মাধবীর অভিনয় প্রতিভার থেকেও শারীরিক ক্ষীণতাটাকেই বেশি কাজে লাগানো হয়েছিল। সে সব অনেক মজার কথা। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে আমাদের প্রথম পরিচয়ের কথাটা বলে নিই।

বেলেঘাটার সেই অনুষ্ঠানে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বলে উঠলেন : কী ব্যাপার, তোমরা তো শুনেছি এয়ার-কন্ডিশন্‌ড হল না পেলে, ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে নাটক দেখতেই যাও না! তা এই প্যান্ডেলের শো-তে হঠাৎ তোমাদের পদধূলি পড়ল যে?

মহেন্দ্রবাবুর মুখে এয়ার-কন্ডিশন্‌ড কথাটা শুনে বুঝতে পারলাম উনি স্টার থিয়েটারকেই মিন করছেন। স্টার থিয়েটার সম্পর্কে ওঁর মনে তখন প্রবল অভিমান। তা আমি মহেন্দ্রবাবুর ওই কথাটাকে

পাশ কাটাবার জন্যে বললাম : আর বলেন কেন মহেন্দ্রবাবু, আমাদের প্রফেশ্যনটাই এমন যে বিয়েবাড়ি থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত সর্বত্রই যেতে হয়। আর প্যান্ডেলের কথা বলছেন! ওটা তো কোনও ব্যাপারই নয়। আপনার নাটকের এমনই আকর্ষণ যে আপনি শ্মশানে-মশানে যেখানেই অভিনয় করবেন, সেখানেই আমাদের ছুটে যেতে হবে।

মহেন্দ্রবাবু একটু হাসলেন। বললেন : বেশ মন রাখা কথা বলতে শিখেছ তো! তা দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। চা-টা খাও।

আমাদের এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে মঞ্চ করা হয়েছিল তার পেছন দিকে যেখানে পর্দা খাটিয়ে সাজঘর করা হয়েছিল, তারই সংলগ্ন একফালি ফাঁকা জমিতে।

মহেন্দ্রবাবু একটি ছেলেকে ডেকে গোটা চারেক চেয়ার আনতে বললেন। মহেন্দ্রবাবু সেদিন কী নাটক করেছিলেন তা মনে নেই। তবে সেটা যে একটা ঐতিহাসিক নাটক, সেটা মনে আছে। কারণ মহেন্দ্রবাবু একজন রাজপুরুষের পোশাক পরে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ছেলেটি এসে চারখানা চেয়ার পেতে দিয়ে গেল। মহেন্দ্রবাবু বসলেন, আমরাও বসলাম। মহেন্দ্রবাবু ছেলেটিকে বললেন : এঁদের জন্যে চা নিয়ে এসো। আর মাধুর যদি মেক-আপ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও।

মহেন্দ্রবাবু যাঁকে মাধু বলে উল্লেখ করলেন, তিনিই যে মাধবী সেটা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি পুরুষ কী মহিলা তাও বুঝতে পারিনি। কাজেই একজন মহিলা আসছেন শুনে যেমন একটা আগ্রহ থাকে সেরকম কিছু ছিল না আমার মধ্যে।

মাধু আসার আগেই চা এসে গেল। ভাঁড়ে করে। আমরা আয়েস করে চায়ে প্রথম চুমুকটি দিয়েছি, এমন সময় পর্দা সরিয়ে শাহাজাদীর পোশাক পরা একটি ছিপছিপে গঠনের তরুণী সেখানে প্রবেশ করলেন শান্ত ভঙ্গিতে।

তাঁকে দেখে মহেন্দ্রবাবু বলে উঠলেন : এই যে মাধু, এসো। এঁরা সব সাংবাদিক। আমাদের নাটক দেখতে এসেছেন। ভাল করে মন দিয়ে অভিনয় কোরো। নাহলে এঁরা কাগজে তোমার সম্পর্কে খারাপ লিখে দেবেন।

ওই মাধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ঠিক এইরকম একটি মুখ তো আমি এর আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি তা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। কেবল হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম।

মাধু ততক্ষণে তাঁর রঙমাখা দুটি হাত তুলে আমাদের নমস্কার জানালেন। সঙ্গে উপহার দিলেন এক চিলতে হাসি। হাসিটা ভারি মিষ্টি। অল্প একটু গজ দাঁত আছে। তাতে করে হাসির মিষ্টতা আরও অনেকখানি বেড়ে গেছে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন : এ হচ্ছে আমার এই নাটকের ইয়াং নায়িকা। এর নাম মাধুরী মুখার্জি। এই মেয়েটির মধ্যে দারুণ প্রতিভা আছে। ভবিষ্যতে প্রচুর নাম করবে। তোমরা এর অভিনয় দেখতে দেখতে যেন মাঝপথে চলে যেও না। তাহলে অনেক কিছু মিস্ করবে। এটা আমার রিকোয়েস্ট।

মহেন্দ্রবাবুর এই প্রশস্তি শুনতে শুনতে মাধুরী যেন লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাচ্ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ওঁর অস্বস্তি দেখে আমরাও অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

মাধুরীকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দিলেন মহেন্দ্রবাবু। ওঁর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন : তুমি এবার ভেতরে যাও মাধু। মনে মনে তৈরি হয়ে থাকো। আর একটু পরেই প্রথম বেল্ বাজবে।

মাধুরী ছোট্ট একটু নমস্কার করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

মাধুরী ভেতরে চলে যেতে আমি মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম : এ মেয়েটি কি এর আগে মিনার্ভা থিয়েটারে 'আত্মদর্শন' নাটকে অভিনয় করেছে? সে মেয়েটির বয়েস আরও কম ছিল। দুজনের মুখের মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন : তুমি ঠিকই ধরেছ। মাধু আত্মদর্শনে বৈরাগ্যের চরিত্রে অভিনয় করেছে। আরও

অনেক নাটকেই করেছে। খুব ছোটবেলা থেকেই ও অভিনয় করছে। মেয়েটি ট্যালেন্টেড।

এই যে একটু আগে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আত্মদর্শন' নাটকে মাধবী বৈরাগ্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সেটা নিয়ে পাঠকের মনে হয়তো ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা হয়তো ভাবতে পারেন বৈরাগ্য আবার কি রে বাবা! ওটা নিশ্চয় বৈরাগী কিংবা বৈরাগিনী হবে।

কিন্তু না, বৈরাগ্য নামটাই সঠিক। 'আত্মদর্শন' নাটকের চরিত্রগুলির নাম অদ্ভুত। এটি একটি আশ্চর্য নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র মন। তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে মনরাজা বলে। অন্যান্য চরিত্রগুলি হল সুমতি, কুমতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সুখ, দুঃখ, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি মানুষের মধ্যে যতগুলি ইন্দ্রিয় থাকে, এবং তার আনুষঙ্গিক যত রকমের প্রবৃত্তি থাকে, তা নিয়ে একটি অসাধারণ নাটক এই আত্মদর্শন। নাট্যকারের নাম আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে এই নাটক যে বিশ কিংবা তিরিশের দশকে অভিনীত হয়েছে, সেটা শুনেছি। রেণুবালা নামে একজন অভিনেত্রী ছিলেন সেই আমলে। তিনি সুখ-এর চরিত্রে এত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন যে পরবর্তীকালে তাঁর নামই হয়ে গেল রেণুবালা (সুখ)। ব্র্যাকেটে সুখ শব্দটি ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেওয়া হতো ইনি সেই রেণুবালা।

আমি অবশ্য আত্মদর্শন নাটকটি দেখেছি মিনার্ভা থিয়েটারে চল্লিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে। অথবা পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও হতে পারে। তখন মনরাজার ভূমিকায় অভিনয় করতেন অহীন্দ্র চৌধুরি। কিছুদিন পরে ওই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র। মাধবী তখন মাধুরী নামে ওই নাটকে বৈরাগ্যের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই নাটকে সুখ চরিত্রে যে কিশোরী মেয়েটি অভিনয় করেছিল এবং গান গেয়েছিল, তার মুখটাও ঠিক ওই মাধুরীরই মতো। মাধবী দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেনি তো? মাধবীর সঙ্গে দেখা হলে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে।

একেবারে ছোটবেলায় মাধবী ওই মাধুরী নামে ছবি বিশ্বাস পরিচালিত 'দুই পুরুষ' নাটকে ছোট শ্যামার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 'ধাত্রীপান্না' নাটকে করেছেন সরযূবালার মেয়ে। আবার অহীন্দ্র চৌধুরি পরিচালিত 'ভোলামাস্টার' নাটকে ভোলানাথের ছেলের চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। আসলে মাত্র চার বছর বয়স থেকেই মাধবীর অভিনয় জীবন শুরু। শিশির ভাদুড়ির 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পাশে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীর চরিত্রেও অভিনয় করেছেন মাধবী। 'কর্ণার্জুন' নাটকে নির্মলেন্দু লাহিড়ির সঙ্গেও অভিনয় করেছেন তিনি।

এইভাবে মিনার্ভা এবং অন্যান্য মঞ্চে সেই চার বছর বয়স থেকে চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত অভিনয় করেছেন মাধুরী। তারপরে যোগ দিয়েছেন মহেন্দ্র গুপ্তর ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দলে। দুঃখের বিষয় ওইসব নাটকের মধ্যে একমাত্র 'আত্মদর্শন' ছাড়া আর কোনও নাটকে মাধুরীর অভিনয় আমার দেখা হয়নি। এমন কি মহেন্দ্রবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও ওই বেলেঘাটার নাটকটিও পুরো দেখা হয়নি। জরুরী কাজ ছিল, তাই চলে আসতে হয়েছিল।

মাধুরীর অভিনয় এরপর আমি পুনর্বার দেখি মহিলা শিল্পী মহলের 'মিশরকুমারী' নাটকে। কানন দেবী এবং সরযূবালা দেবীর উদ্যোগে দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের সাহায্য করবার মহৎ উদ্দেশ্যে মহিলা শিল্পী মহল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরাই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহাজাতি সদনে 'মিশরকুমারী' নাটকটি করেন। এই নাটকে একজনও পুরুষ শিল্পী ছিলেন না। পুরুষ চরিত্রগুলিও মহিলারাই করেছিলেন। যেমন আবন হয়েছিলেন মলিনা দেবী। আর নাহরিন করেছিলেন মাধুরী। ভুল বললাম। তখন তিনি মাধবী। বাংলা ছায়াছবির একজন নামকরা অভিনেত্রী। বড় ভাল করেছিলেন মাধবী।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আমি মাধবীর অভিনয় প্রথম দেখি কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। হরিদাস সান্যালের প্রযোজনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'না' মঞ্চস্থ হয়েছিল সেখানে বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন আমার বন্ধু জ্ঞানেশ মুখার্জি। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায়। ওই নাটকের রিভিউ করবার জন্য আমাকে নাটকটি দেখতে হয়েছিল।

মাধবী ছিলেন ওই 'না' নাটকের নায়িকা। দীর্ঘকাল পরে আবার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছেন, তাই মাধবীর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। এই দ্বিধার ব্যাপারটা আমি নির্মলকুমারের কাছ থেকেই জানতে পারি।

সেদিন কথায় কথায় নির্মলবাবু বলেছিলেন : আমার খুব ইচ্ছে ছিল না 'না' নাটকে অভিনয় করবার। কেমন একটা সঙ্কোচ ছিল যে, লোকে কী ভাববে। স্ত্রীর দৌলতে স্বামী চান্স পাচ্ছে। এটা আমার আদৌ মনঃপুত নয়। তা মাধবীই জোর করে আমাকে স্টেজে নিয়ে গেল। বললে : এতদিন পরে নাটকে অভিনয় করতে যাচ্ছি। এখনকার স্টেজের রকম-সকম আমি জানি না। এখনকার শিল্পীদের সঙ্গেও কোনও আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই। তাই তুমি পাশে থাকলে মনে একটা জোর পাব।

নির্মলবাবু বললেন : মাধবীর এই কথাটা আমার সঙ্গত মনে হয়েছিল। তাই 'না' নাটকে অভিনয় করতে গিয়েছিলাম।

'না' নাটকে মাধবীর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন নির্মলকুমার এবং অসীমকুমার। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন মাধবী ওই নাটকে। আমিও হাত খুলে প্রশংসা করেছিলাম আনন্দবাজারের পৃষ্ঠায়।

ওই সময়ে একটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে গেল। সমালোচনা বেরোবার পর থেকেই নাটকের বিক্রি দারুণ বেড়ে গেল। নিয়মিত হাউসফুল হতে লাগল। জ্ঞানেশবাবু জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলেন যে রবিবাবুর লেখার দৌলতেই নাটকের বিক্রি বেড়ে গেছে।

জ্ঞানেশবাবু সহজ সরল প্রাণখোলা মানুষ। এ সব কথা যে পাবলিকলি বলতে নেই, সে সব বোধবুদ্ধি ওঁর নেই। এতে যে ওঁর ক্রেডিট কমে যায়, সে ব্যাপারে ওঁর কোনও হুঁশও নেই। তা নিয়ে দু-একবার ওঁকে সতর্কও করে দিয়েছি। তা কে শোনে কার কথা। জ্ঞানেশবাবু সেই আগের মতোই খোলামেলা আছেন। কিছুটা কাছাখোলাও। কত লোক যে ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজেদেব আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন, তা বুঝেও বুঝতে চান না জ্ঞানেশবাবু। থিয়েটারের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ ওই মানুষটিকে এই জন্যেই আমি শ্রদ্ধা করি। অন্তর দিয়ে ভালবাসি।

এ ছাড়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাধবীব আরও দুটি নাটক আমি দেখেছি। একটি হল 'ফেরা'। অপরটি 'ঘটক বিদায়'। প্রথমটি গভীরতর জীবনবোধেব নাটক। দ্বিতীয়টি অনাবিল হাস্যরসের। আর এই দুই ক্ষেত্রেই মাধবীর বিস্ময়কর সফলতা।

মাধবীর স্টেজ আর ফিল্ম অ্যাকটিং দুটো দুই ধরনের। অনেকে বলেন, স্টেজে অভিনয় করলে তার একটা রিফ্লেকশান নাকি ফিল্মে পড়ে। আবার ফিল্মে অভিনয় করলে স্টেজের জন্য যা প্রয়োজন তার একশো ভাগ সরবরাহ করা যায় না। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা মাধবী প্রমাণ করে দিয়েছেন। সৌমিত্রবাবুর ক্ষেত্রেও এ কথাটা খাটে।

তা এ সব কথা এখন থাক। এ সব তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। আমরা বরং আবার ফিরে যাই মাধবীর সেই অতীত জীবনে, যেখানে একটি মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক কারণে মাত্র চার বছর বয়স থেকে আজও সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। সে সংগ্রাম ঘরে বাইরে সর্বত্র।

জীবনের সেই সব তিক্ত অভিজ্ঞতা মাধবীকে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, অপরদিকে তেমনি নানা ভাবে বিধ্বস্ত করেছে। সেই সংগ্রাম আজও চলেছে। কিন্তু কেমন করে মাধবী এই সংগ্রামের শক্তি অর্জন করেছেন, তা জানতে হলে তাঁর শৈশবটাকে জানতেই হবে। জানতে হবে তাঁর পারিপার্শ্বিকতাকে। সেটা একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, অপরদিকে তেমনি বেদনাবিধুর। যেমন ওঁর হঠাৎ বিয়ে করে ফেলাটা। সেটাও যেন এক পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটক।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৩ সালে। সেই মাধুরী হয়ে গেলেন মাধবী মুখোপাধ্যায় ১৯৬০ সালে। মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' ছবির নায়িকা হিসেবে মাধুরীর নাম পাল্টে হয়ে গেল মাধবী। এটা মাধবীর দ্বিতীয় জন্ম। আর তৃতীয়বার মাধবীর জন্মান্তর ঘটল ১৯৬৮ সালে। এবারে নাম নয়, তাঁর পদবী বদলে গেল। অভিনেতা নির্মলকুমারের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর তিনি হয়ে গেলেন মাধবী চক্রবর্তী।

ইদানীং অনেকেই দেখি বিয়ের পরও তাঁর পুরনো পদবীটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। যে নামে তিনি বিখ্যাত সেখান থেকে সরে আসতে ইতস্তত করেন। কিন্তু মাধবীর মধ্যে সেই ইতস্তত ভাব আদৌ ছিল না। তিনি সানন্দে এবং সগর্বে তাঁর এই নতুন সারনেমটিকে বরণ করে নিলেন।

আজকাল মাধবীকে দেখছি তিনি তাঁর এই তৃতীয় জন্ম সম্পর্কে কিছুটা বিব্রত এবং বিপর্যস্ত। তা

নিয়ে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে বিবৃতিও দিচ্ছেন। তাই তাঁর এই তৃতীয় জন্ম নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাইছি তাঁর দ্বিতীয় জন্মের ব্যাপারটিকে পাশে ঠেলে রেখে। তবে আমি মাধবীর ওই পিরিয়ডটিকে বাইপাস করতে চাইছি না। ওটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আমি শুধু ব্যাপারটাকে আগে পরে করে নিতে চাইছি।

মাধবী যে হঠাৎ নির্মলকুমারকে বিয়ে করবেন সেটা আমাদেব কারও কল্পনাতেও আসেনি। ষাটের দশকের মধ্যভাগ, অভিনেত্রী হিসেবে মাধবীর তখন জয়জয়কার। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' করার পর ওঁর হাতে ছবির পর ছবি। ভারত সরকারের উর্বশী পুরস্কারও পেয়ে গেলেন 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে অভিনয় করে। ওটা সেই বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে সর্বভারতীয় পুরস্কার।

এই 'দিবাবাত্রির কাব্য' ছবির মুক্তির ব্যাপারে আমার একটি ছোট্ট ভূমিকা ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে কোনও ছবি হলে সে ছবির প্রতি আমার মতো অনেকেরই একটা দুর্বলতা থাকে। আমাদের সময়ে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতাম। তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সিনেমার পর্দায় এক তারাশঙ্কর ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে গৃহীত হননি। অকস্মাৎ সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'কে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিলেন। সাধারণ সিনেমা দর্শকের কাছেও, যাঁরা সাহিত্যের বিশেষ ধার ধারেন না, তাঁদের কাছেও বিভূতিভূষণ অতি পরিচিত হয়ে গেলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হতে লাগল।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্য যে, অত্যন্ত শক্তিমান কথাসাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সিনেমার জগতে অপাংক্তেয় হয়েই ছিলেন। 'দিবারাত্রিব কাব্য' ছবি হবার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি কী দুটি কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছিল বলে যতদূর সম্ভব মনে পড়ছে। কিন্তু সেসব ছবির নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। এবং সেই সব ছবি এতই সাব-স্ট্যান্ডার্ড ছিল যে তা নিয়ে কোনও আলোচনা অথবা সমালোচনা তেমনভাবে হয়েছে বলেও মনে পড়ছে না।

হঠাৎ বিমল ভৌমিক এবং নারায়ণ চক্রবর্তী 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবি করছেন শুনে কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের মনে। ওঁরা জুটি বেঁধে এর আগে 'অয়নান্ত' বলে একটি ছবি করেছিলেন। সে ছবি গুণগত কারণে এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর অসাধারণ প্রচারের গুণে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বোধহয় মোটামুটি পয়সাও দিয়েছিল।

সঙ্গত কারণেই পূর্ণেন্দু পত্রীর ওপরেই দায়িত্ব পড়ল 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির প্রচার এবং প্রচার অঙ্কনের। পূর্ণেন্দুবাবু তখন পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের সঙ্গে যুক্ত। ওঁদের মিনার্ভা হোটেলের একটি ঘরে বসেই তাঁদের ছবি এবং নিজের আঁকাজোকার কাজ করেন। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত। প্রায় প্রতিদিনই কাজের তাগিদে পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে আসতে হয় মিনার্ভা হোটেলে। সেইসব লাগামছাড়া দিনগুলো ভারী চমৎকার কাটতো আমাদের। প্রায় সারাক্ষণই সংস্কৃতিচর্চায় মুখর হয়ে থাকতাম আমরা।

তা ওখানেই একদিন দেখলাম পূর্ণেন্দুবাবু 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির লোগোর জন্য লেটারিং করছেন। কথায় কথায় বললেন : বিমলবাবুরা এত কষ্ট করে ছবিটা করেছেন কিন্তু রিলিজের কোনও ব্যবস্থা করতে পারছেন না।

সেই সময়টায় উত্তম-সুচিত্রা, উত্তম-সুপ্রিয়ার ছবির রমরমা যুগ। একটু অন্য ধরনের ছবি রিলিজের জন্য হল পাওয়াই মুশকিল। 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির মেইন কাস্টিং মাধবী, বসন্ত চৌধুরি আর অঞ্জনা ভৌমিককে নিয়ে। সুতরাং অনায়াসে রিলিজ পাওয়া মুশকিল। আমাদের আলোচনা অতএব ভাল ছবির মুক্তি পাওয়ার সমস্যা নিয়েই হতে থাকল। এইসব ছবির জন্য আমাদের মনে তখন সহানুভূতির বন্যা বইত।

সেই আলোচনার মধ্যেই পূর্ণেন্দুবাবু বললেন : দেখো না রবি একটু চেষ্টা করে, যাতে ছবিটা কোনরকমে রিলিজ পায়।

আমার সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশকের কিঞ্চিৎ হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু হলের মালিকদের সঙ্গে আদপেই নয়। তাই আমি বললাম : বিমলবাবুরা কি একটু খরচপত্র করে ছবিটার একটা শো করতে পারবেন একদিন?

পূর্ণেন্দুবাবু বললেন : তা হয়তো পারবেন। কিন্তু তাতে সমস্যার কী ভাবে সমাধান হবে?

আমি বললাম : আমি জ্যোতির্ময়বাবুকে রিকোয়েস্ট করতে পারি। উনি যদি ছবিটা দেখেন এবং ছবিটা যদি ওঁর ভাল লাগে তাহলে ওঁকে দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় যদি কিছু লিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে হয়তো কিছুটা উপকার হতে পারে।

কথাটা পূর্ণেন্দুবাবুর মনে ধরল। উনি বললেন : এটা মন্দ যুক্তি নয়। ঠিক আছে। আমি বিমলবাবুদের বলছি শো-এর ব্যবস্থা করতে। তুমি জ্যোতির্ময়বাবুকে বলে একটা দিন ঠিক করে আমাকে বোলো।

জ্যোতির্ময়বাবু অর্থে জ্যোতির্ময় বসু রায়। উনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সিনেমা এডিটর। এবং আমাদের কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সমালোচক। ভদ্রলোক আগে ছিলেন দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায়। তারপর প্রতিথযশা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ যখন দিল্লি থেকে এসে আনন্দবাজার পত্রিকার হাল ধরলেন, তখন জ্যোতির্ময়বাবু তাঁরই সঙ্গে কলকাতায় আনন্দবাজারে চলে এসেছিলেন। এখানে আসবার পর জ্যোতির্ময়বাবুকেই সিনেমা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল। তার আগে পর্যন্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দবাজারের সিনেমার ব্যাপারটা দেখতেন। এবং গৌরদার ওপরেই দায়িত্ব পড়ল জ্যোতির্ময়বাবুকে সিনেমার ব্যাপারে সড়গড় করে তোলার। এটা নিয়ে একটা মজার গপ্পো আছে। ঠিক গপ্পো নয়, এটা ঘটনাই। জ্যোতির্ময়বাবুর মুখ থেকে ঘটনাটা আমি শুনেছি।

সিনেমা বিভাগে জয়েন করার পর গৌরদা জ্যোতির্ময়বাবুকে প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন সেটি হল: আপনি সিনেমা-টিনেমা দেখেন?

জ্যোতির্ময়বাবু উত্তর দিলেন : তেমন বেশি দেখি না। কালেভদ্রে এক আধটা দেখি। তাও ইংরেজি ছবি।

গৌরদা বললেন : আপনি সিনেমার ব্যাপার কিছু বোঝেন?

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন : একদম না।

গৌরদা উৎসাহ সহকারে বললেন : তাহলে আপনিই সিনেমা-রিভিউ করার উপযুক্ত লোক।

জ্যোতির্ময়বাবু রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন গৌরদার কথা শুনে। বললেন : তার মানে?

গৌরদা বললেন : আমিও কিসসু বুঝি না। সেইজন্যেই খোলা মনে ভালকে ভাল আর খারাপকে খারাপ বলতে পারি। অল্প একটু বুঝতে পারলেই লিটল লারনিং ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং হয়ে যেত।

এটা রসরাজ গৌরকিশোর ঘোষের চরিত্র অনুযায়ী কিঞ্চিৎ মজার সংলাপ। নইলে উনি সিনেমার ব্যাপারটা ভালই বুঝতেন।

তা জ্যোতির্ময়বাবুও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সিনেমার গভীরতর বোধের ব্যাপারটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এবং সমকালের একজন শ্রেষ্ঠ ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ওঁর কিছু কিছু ছবির সমালোচনা এখনও আমার মনে রীতিমতো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

জ্যোতির্ময়বাবু কেবল চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবেই নন, মানুষ হিসেবেও অসাধারণ। এবং উচ্চমার্গের। উনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে তখন আনন্দবাজার পত্রিকার মোটা টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গেলেন। অনেকদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। এখনও উনি বোধহয় মিশনের সঙ্গেই যুক্ত আছেন।

তাই সেই জ্যোতির্ময়বাবুকে আমি বললাম 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিটা দেখার জন্যে। জ্যোতির্ময়বাবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না বটে, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। তাই 'দিবারাত্রির কাব্য'র নাম শুনেই উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ছবি দেখতে।

ছবিটা আমরা মাত্র কয়েকজন মিলে দেখেছিলাম। জ্যোতির্ময়বাবু তো ছিলেনই, বোধহয় সেবাব্রত গুপ্তও ছিলেন। সেবাবাবু তখন 'দেশ' পত্রিকার সিনেমা এডিটর।

ছবিটা দেখে জ্যোতির্ময়বাবুর খুবই ভাল লেগেছিল। সাধারণত ছবি রিলিজের সময় কিংবা রিলিজের অব্যবহিত পূর্বে ছবির রিভিউ বেরোয় দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়। কিন্তু যে ছবি রিলিজের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই, সেই 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবির বেশ বড় করে রিভিউ বেরিয়ে গেল আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এর জন্যে সন্তোষকুমার ঘোষের বদান্যতাও কম নয়। তিনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সর্বেসর্বা। একটা ভাল ছবির পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে তিনি প্রচলিত নিয়ম ভাঙার অনুমতি দিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়বাবুকে। আনন্দবাজার পত্রিকাকে অনেকে বুর্জোয়া পত্রিকা বলে কটাক্ষ করেন। কিন্তু একটি ভাল ছবির জন্যে সেই বুর্জোয়া পত্রিকার কাছ থেকে যে ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় তার তুলনা মেলা ভার।

যাক, আবার সেই ছবির কথাতেই আসি। আর কেউ স্বীকার করুক অথবা না করুক, আমি কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, জ্যোতির্ময়বাবুর ওই লেখার দৌলতেই 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিটি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে মাধবী মুখার্জি পেয়েছিলেন উর্বশী পুরস্কার। দারুণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছিলেন মাধবী ওই ছবিতে। ছবিটাও বোধহয় ছোট মাপের কোনও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল।

সেই উর্বশী মাধবীকে আমি ভেবেছিলাম হয়তো রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মতোই থাকবেন চিরকাল। উনি অবশ্যই শৈলেনবাবুর কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোনদিন মাতা হবেন কিনা সেটা নিয়ে সংশয় ছিল। ইতিমধ্যে কিছু প্রেম সশব্দে এবং নিঃশব্দ চরণে ওঁর জীবনে যে এসেছে এবং আসছে, কানাঘুষায় সে সব খবর পাচ্ছিলাম। কিন্তু মাধবীর তরফ থেকে সেই সব প্রেমের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ওঁকে নিয়ে কত কবি কবিতা লিখেছেন, কত চিত্রকরের ছবির মধ্যে ওঁকে আবিষ্কার করা গেছে, আর বিভিন্ন জনের লেখা মাধবীর প্রশস্তিতে ভরে থাকত। কিন্তু মাধবী একেবারেই নির্বিকার। উনি বরাবরই অন্তর্মুখী। ওঁর মনের কথা জানবার কত চেষ্টা কতজন করেছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকেই বিফল হতে হয়েছে।

সেই মাধবী যেদিন ঘোষণা করলেন উনি নির্মলকুমারকে বিয়ে করছেন, তখন আমরা রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। যাঁর সঙ্গে উনি সর্বসাকুল্যে দুটি কি তিনটি ছবিতে নায়িকা করেছেন এবং সেগুলির কাজ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়েছে, কেবল একটি ছবি, 'পসারিণী' সম্পূর্ণ হয়েও এক অজ্ঞাত কারণে ছবিঘরের পর্দায় প্রতিফলিত হবার সুযোগ পেল না, সেহেন নায়ক নির্মলকুমার একেবারে ওঁর জীবনের নায়ক হয়ে গেলেন, এটা যে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বোধহয় আমাদের কাছে ষাটের দশকের শ্রেষ্ঠ চমক ছিল মাধবী আর নির্মলকুমারের বিবাহ।

তবে কি মাধবী আর নির্মলকুমার গোপনে গোপনে প্রেমের খেলায় মেতেছিলেন? ব্যাপারটা খোঁজ নিতে হচ্ছে।

মাধবী ইদানীং কোথায় যেন বলেছেন যে, ওঁর সঙ্গে নির্মলকুমারের বিয়েটা কোনও প্রেমজ ঘটনার পরিণতি নয়। কেবল মাকে কথা দিয়েছিলেন যে, নির্দিষ্ট একটি মাসে উনি বিয়ে করবেন, তাই যেহেতু নির্মল ওঁর কাছে প্রথম বিবাহের প্রস্তাব রাখেন সেই হেতু উনি নির্মলকুমারকেই পাত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। এ তো সেই রূপকথার রাজারানির গল্পের মতো। রাজা একদিন শপথ করলেন যে, পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমেই যাঁর মুখ দেখবেন, তাঁর হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করবেন। তা এসব ওই রূপকথার গল্পেই চলে। বিয়েটা হল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেবল মাকে কথা দিয়েছেন বলেই নির্দিষ্ট মাসে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করে ফেলতে পারেন না মাধবী। তিনি কি এতই নির্বোধ যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ডিসিশনটা এত ক্যাজুয়ালি নেবেন। আমার মনে হয় একথা যিনি বলেছেন এবং যিনি শুনেছেন তাঁদের মধ্যে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার থেকে গেছে।

তবে একথা ঠিক যে নির্মলকুমারকে বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই মাধবীর অভিভাবকেরা মাধবীকে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। দু-চারবার তাঁকে কনে দেখার সাজে সিটিংও দিতে হয়েছে। একবার তো ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কাউকেই মাধবীর পছন্দ

হয়নি। তাই সত্যিকারের বিয়ের ডিসিশনটা খুব তাড়াতাড়িই নিতে হয়েছিল।

তবে মাধবী আর নির্মলের বিয়েটা যে প্রেমজ বিবাহ তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমার প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ওঁরা দুজনে দুজনকে প্রত্যহ টেলিফোন করতেন রাত দশটা এগারোটার পর। সে টেলিফোন দু-চার মিনিটের জন্য নয়, দু-চার ঘণ্টা তো বটেই, কখনও কখনও প্রায় ভোর হয়ে আসত কথা বলতে বলতে। উভয়ের মধ্যে চোখে চোখে প্রেম নিবেদন হয়েছিল আগেই। মৌখিক প্রেম নিবেদন ওই টেলিফোন মারফত। টেলিফোনের মধ্যেই বিয়ের প্রস্তাব আর টেলিফোনের মধ্যেই তার অ্যাকসেপটেন্স। এর চেয়ে মধুর, এর চেয়ে রোম্যান্টিক ব্যাপার আর কী হতে পারে।

নির্মলকুমার আর মাধবী ভেবেছিলেন যে তাঁদের এই গভীর রাতের প্রেমপর্বের ব্যাপারটা কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না। কিন্তু কাক-পক্ষীতে না জানলেও একজন মানুষ যে জেনে ফেলেছিলেন সেটা জানা গেল যেদিন ওঁরা গভীর রাতে বিয়ের ডিসিশন নিলেন, সেই মুহূর্তেই।

সেদিনও নির্মল টেলিফোন করেছিলেন মাধবীকে। অনেকক্ষণ মধুর প্রেমের সংলাপ চলল। তারপর যে মুহূর্তে দুজনে বিয়ের দিন স্থির করে ফেললেন সেই মুহূর্তে তৃতীয় একটি কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হতে শোনা গেল : কনগ্র্যাচুলেশন।

টেলিফোনের দুই প্রান্তে বসে নির্মল আর মাধবী দুজনই চমকে উঠলেন। বিহ্বল কণ্ঠে নির্মল বলে উঠলেন : কে আপনি?

সেই কণ্ঠস্বরটি সসঙ্কোচে জানালেন : কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমি একজন টেলিফোন অপারেটর। আপনাদের কথা প্রতিদিনই ট্যাপ করে শুনি। আজ যখন আপনারা বিয়েব ডিসিশন নিলেন তখন আর নিজেকে গোপন রাখতে পারিনি। আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

নির্মলকুমার বললেন : কী আশ্চর্য। আপনি আমাদেব সব কথা শুনেছেন এতদিন! আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই!

টেলিফোনের ভদ্রলোক বললেন : নিঃসন্দেহে অপরাধ করেছি। তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমি আপনাদের দুজনেরই অভিনয়ের ভক্ত। সেই ভক্তিটা আরও বেড়ে গেছে আপনাদের প্রেমালাপ শুনে। আপনারা যে কত কালচার্ড তার প্রমাণ পেলাম। এতদিনের এত প্রেমালাপের মধ্যে একটাও কুৎসিত শব্দ উচ্চারণ করেননি আপনারা। এত সুন্দর ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গিতে যে প্রেমালাপ করা যায় তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। দেখবেন, বিয়ের পর আপনারা খুব সুখী জীবন কাটাতে পারবেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে নির্মলবাবু আর রাগ পুষে রাখতে পারলেন না। বললেন : সব কথা যখন শুনেই ফেলেছেন তখন কী আর করা যাবে। তবে একটা রিকোয়েস্ট, আমাদের বিয়ের আগে খবরটা পাঁচকান করবেন না। আর আপনার নামটি জানতে পারি কী?

টেলিফোনের ভদ্রলোক বললেন : আমার নাম জেনে কী করবেন?

নির্মলকুমার বললেন : আপনিই তো একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের প্রেমের শ্রোতা সাক্ষী। তা আপনাকে আমাদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে চাই।

ভদ্রলোক বললেন : থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তবে পরিচয়টা অজানাই থাক। নেপথ্য থেকে আমি আপনাদের শুভ কামনা করছি।

নির্মল-মাধবীর এই বিবাহের দিন স্থিরের ব্যাপারটা সর্বপ্রথম অসিত চৌধুরিকে জানিয়েছিলেন নির্মলকুমার। ছায়াবাণীর কর্ণধার অসিত চৌধুরি ছিলেন 'কমললতা' ছবির প্রেডিউসার। ওই ছবিতে তখন কাজ করছিলেন নির্মলকুমার। খবরটা শুনে অসিতবাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন : এ তো একটা দারুণ খবর। আপনার বিয়ের সব খরচ আমার।

ক'দিন পরে ওই 'কমললতা' ছবির সেটে ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন বললেন : তুমি নাকি আজকাল গভীর প্রেম-টেম করছ নির্মল।

শুনে তো নির্মলকুমারের দু কান লাল। মিসেস সেন কোথা থেকে খবরটা পেলেন! নিশ্চয়ই অসিতবাবু বলেছেন।

ক'দিন পরে উত্তমকুমারের মুখেও ওই একই জিজ্ঞাসা। বললেন : এ্যাই নিমে, তুই একটা স্কাউন্ড্রেল। এতবড় খবরটা আমার কাছে চেপে রেখেছিস। আমাকে না দাদা বলে ডাকিস।

নির্মলকুমার এ কথার আর কী উত্তর দেবেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন।

ওঁর অবস্থা দেখে উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন . এতদিনে একটা কাজের কাজ করেছিস। তুই যে পুরুষমানুষ তার পরিচয় পাওয়া গেল। তা বিয়ের তারিখটা কবে?

নির্মলবাবু তারিখটা বললেন।

উত্তমবাবু বললেন : ঠিক আছে। তুই আমার গাড়িতে করে বিয়ে করতে যাবি। আমি নিজে তোকে নিয়ে যাব। আমি তোর বরকর্তা। বুঝলি।

নির্মলবাবু বললেন : বুঝলাম। তবে আমার বিয়ে কিন্তু গোধূলি লগ্নে। ঠিক চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোতে হবে।

উত্তমবাবু বললেন : আমি চারটের আগেই চলে আসব। তুই রেডি থাকিস।

কিন্তু আসল দিনে ঘড়িতে চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল, এমনকি ছ'টার ঘণ্টাও পড়ে গেল, কিন্তু উত্তমকুমারের আর দেখা নেই।

মাধবী মুখার্জীর ধারণা, উনি যেহেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই ওঁর সারা জীবনটা যুদ্ধ করতে করতেই কাটছে। কথাটা মাধবী মজা করে বললেও এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা তো আছেই। মাধবী যখন জন্মেছেন, সেই ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ একেবারে ভারতবর্ষের দোরগোড়ায়। কলকাতার বাতাসে তখন জাপানি বোমার বারুদের গন্ধ। একটু জ্ঞান হতে না হতেই দেখেছেন আর এক যুদ্ধ। ১৯৪৬ সালে কলকাতার বুকে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। মাধবীরা তখন থাকতেন রাজাবাজার অঞ্চলে।

সেইসব দিনের স্মৃতি আবছা হয়ে গেলেও কিছু কিছু ঘটনা এখনও তাজা। বাবা তখন ওঁদের ছেড়ে চলে গেছেন। নতুন করে সংসার পেতেছেন অন্যত্র। মা লীলা দেবী দুই কন্যাকে নিয়ে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করছেন। সেই সময়ে, সেই ১৯৪৬ সালে, প্রাণ হাতে নিয়ে কাল কাটাতে হয়েছে ওঁদের। সারা রাত নিদ্রাহীন কেটেছে। কানে ভেসে এসেছে একদিক থেকে বন্দেমাতরম্ আর অপর দিক থেকে আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি। যুযুধান দুই গোষ্ঠী মেতে উঠেছে রক্তের হোলিখেলায়। কলকাতার রাজপথ ভেসে গেছে তাজা প্রাণের টাটকা রক্তে।

ওই শিশু বয়সে চোখের সামনে ওই ধরনের রক্তপাত দেখে মাধবী হয়তো পাগলই হয়ে যেতেন, যদি না মা সর্বক্ষণ অভয় দিতেন আর বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। সেইসব বীভৎস দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ায় মাধবী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রচণ্ড জ্বর। তারই মধ্যে কানে আসছে যে কোনও মুহূর্তে ওঁদের এই বাড়িটাতেও আগুন লাগানো হতে পারে। ঠিক সেই সময়ে একদিন সকালে গুরুদ্বার থেকে শিখ সম্প্রদায়ের একটি উদ্ধারকারী দল ওঁদের সেই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। কোনও কিছু সঙ্গে না নিয়ে কেবল এক বস্ত্রে রাজাবাজারের বাড়ি থেকে পালাতে হয়েছিল সেদিন মাধবীদের।

শৈশবের এইসব ঘটনা মাধবীর মধ্যে এক ধরনের দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। তাঁর মধ্যে লড়াই করার মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। যে মানসিকতাকে আজও মাধবী সযত্নে পোষণ করে চলেছেন। লড়াইটা শুরু হয়েছে সেই শৈশব থেকে। বেঁচে থাকার লড়াই। দু'মুঠো অন্নের জন্য লড়াই। সেই অবস্থার মধ্যে লেখাপড়ার পাঠ তেমন করে নিতে পারেননি হয়তো, কিন্তু জীবনের পাঠ নিয়েছেন পুরোপুরি। একটা অন্য ধরনের জীবনদর্শন তৈরি হয়েছে তাঁর।

এই দার্শনিক প্রবৃত্তিটাকে উসকে দিয়েছেন তাঁর দাদু শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধবীর কাছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। অদ্ভুত মানুষ এই শীতলচন্দ্র। পুরনো রামায়ণ কিংবা মহাভারত খুললে দেখতে পাওয়া যাবে শীতলচন্দ্রের আঁকা অজস্র ছবি। রঙ-তুলির কাজে তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। তবে এটা তাঁর বহিরঙ্গ। আসলে তিনি ছিলেন সংসারে এক সন্ন্যাসী। মাধবীকে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। যতক্ষণ পারেন কাছে কাছে রাখবার চেষ্টা করতেন। শোনাতেন গীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলি। বাংলায় তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন : তুই হয়তো এসবের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারবি না, কিন্তু এটা শোনারও

উপকারিতা আছে। কান, মন পবিত্র হয়। মনের মধ্যে একটা ছন্দের জন্ম দেয়। সেই ছন্দটাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রেরণা দেয়।

এই আদর্শবাদী দাদু শীতলচন্দ্রই হলেন মাধবীর দেখা জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। তাঁর আদর্শে আদর্শবতী হতে পেরেছিলেন বলেই মাধবী সারা জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পেরেছেন। আজও পারছেন। বাকি জীবনটাও যে পারবেন সে বিশ্বাস রাখেন।

মাধবী প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এইসব তত্ত্বকথার অবতারণা করতে হল অতি সঙ্গত কারণেই। মাধবীর প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁকে ভুল বোঝার অবকাশ আছে। কেউ ভাবেন তিনি জেদি। কেউ ভাবেন তিনি অহঙ্কারী। কেউ ভাবেন তিনি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে পারেন না। আবার কেউ কেউ ভাবেন মাধবী ভয়ঙ্কর ইমোশ্যনাল। অনেকে আবার বোকাও ভেবে থাকেন তাঁকে। মানুষের দেওয়া এই সবকটি বিশেষণই মাধবীর কানে আসে। কিন্তু মনটাকে স্পর্শ করে না। তিনি পরম দার্শনিকসুলভ ভাবগম্ভীরতায় এই সবকিছুকেই উপেক্ষা করতে পারেন। কারণ তিনি জানেন, তিনি জীবনের একটা আদর্শেই বিশ্বাসী। সে আদর্শ হল সততার আদর্শ। নিজেকে পবিত্র রাখার আদর্শ। কে কী বলল তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। নিজের বিবেকের কাছে তিনি পরিচ্ছন্ন থাকতে চান।

এই আদর্শই তাঁকে ইদানীং উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে মানবসেবায়। তিনি ছুটে যান হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীদের পাশে। ছুটে যান স্বজনপরিত্যক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে। তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য, বাকি জীবনটা শান্তিতে অতিবাহিত করবার জন্য আশ্রম করার কথা ভাবেন। মাধবী জানেন না এই কাজে সাকসেসফুল হবেন কি না। কিন্তু এগিয়ে যেতে চান দৃঢ়চিত্তে।

মাধবীর এই যে মানসিকতা, এটা হঠাৎ করে জন্ম নেওয়া কোন ব্যাপার নয়। এর আগে কত দুঃস্থ প্রযোজকের ছবিতে যে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিয়েছেন তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। যে কেউ এসে তাঁর কাছে নিজেদের অক্ষমতার কথা বলেছেন, মাধবী সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতান্ত্রিক সংসারে এই নিয়ে কত অশান্তি হয়েছে। কিন্তু মাধবী নির্বিকার। তিনি তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থেকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অনলস সংগ্রাম করে গেছেন। স্বজনদের কাছ থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন, বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে গেছে তাঁর শরীর আর মন। কিন্তু সে যন্ত্রণার কথা কাউকে জানতে দেননি।

মাধবীকে পরিপূর্ণভাবে জানতে গেলে তাঁর এই রূপটির কথা জানতেই হবে। নইলে বাইরে থেকে ওপর ওপর বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে।

থাক এসব তত্ত্বকথা। আবার মাধবীর অভিনয় জীবনের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। একদিন কথায় কথায় মাধবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এই যে আপনি এমন প্রাণঢালা অভিনয় করতে পারেন, এটা কি কেবল অনুশীলনের দ্বারাই আয়ত্ত করেছেন, না এটা হেরিডিটরি ? আপনাদের বংশে কি কেউ অভিনয় করতেন ?

মাধবী বললেন : একদম না। আমাদের বংশে আমিই প্রথম অভিনেত্রী। তবে বংশগত ভাবে আমি শিল্পবোধটা পেয়েছি। আমার দাদু শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন অঙ্কনশিল্পী ছিলেন সেটা তো আপনাকে আগেই বলেছি। আমার মা খুব ভাল এসরাজ বাজাতে পারতেন। আমি মায়ের কাছে এসরাজ শিখেছি। পরবর্তীকালে সেতার শিখেছি।

আমি বললাম : কিন্তু অভিনয়টা আপনি কার কাছে শিখলেন?

মাধবী বললেন : একেবারে ছোটবেলায় যখন অভিনয় করতাম তখন বাংলার প্রায় সমস্ত নমস্য শিল্পীদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই কিছু না কিছু পেয়েছি। তাঁরা হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরি, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস এবং আরও কতজন। তবে তখন তো ভাল করে বোঝবার মতো বয়স হয়নি। কেবল একটা জিনিস অনুভব করতাম যে, যত ছোট চরিত্রেই অভিনয় করি না কেন, অভিনয়ের আগে আর পরে আমি যেন আলাদা মানুষ। অভিনয়ের সময় আমার ভেতরে কেমন একটা আবেগ তৈরি হয়ে যেত। বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করত। চোখে জল এসে যেত। পরে যখন বড় হলাম তখন বুঝতে পারতাম, ওই যে সব মহান শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের নির্দেশমতো আমি অভিনয় করে গেছি, তাঁরাই আমার অজান্তে আমার ভেতরে এই পরিবর্তনটা ঘটিয়ে

দিয়েছেন।

আমি বললাম : কিন্তু সিনেমার বেলায়?

মাধবী বললেন : সিনেমা তো ডিরেকটারের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে আমার গুরু ছবির পরিচালকরা। সিনেমায় আমার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছে কার হাতে জানেন?

আমি বললাম : কার হাতে?

মাধবী বললেন : একজন মস্তবড় সাহিত্যিকের হাতে। তিনি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর অনেক ছবিতে আমি কাজ করেছি। 'দুই বেয়াই', 'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে', আরও কত ছবি। আর একজন সাহিত্যিক যখন ছবির পরিচালক হন, তখন তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই আলাদা। তখন বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এখন বুঝতে পারি, আমি কত সৌভাগ্যবতী। আমার অজান্তে আমার মধ্যে সিনেমার সঙ্গে সাহিত্যের বোধও সঞ্চার করে দিয়েছিলেন প্রেমেনবাবু।

আমি বললাম : কিন্তু আপনি তো প্রথম নায়িকা হন তপন সিংহের 'টনসিল' ছবিতে। সেটা সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাধবী বললেন : আমি যে কোনদিন নায়িকা হব সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। তখনও তো আমি রোগা লিকলিকে একটা মেয়ে। ওইরকম রোগা মেয়ে কি নায়িকা হতে পারে?

আমি বললাম : তাহলে হলেন কী করে?

মাধবী বললেন : তাহলে ঘটনাটা খুলেই বলি। আমি তো তখন ছোট ছোট রোলে সিনেমা করি। সেই সূত্রে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। বিখ্যাত মেক-আপম্যান শৈলেন গাঙ্গুলির সঙ্গে আমার সেইভাবেই পরিচয়। শৈলেনবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন হঠাৎ আমাদের বাড়িতে শৈলেনবাবুর একটা চিঠি এল। তিনি আমাকে অবিলম্বে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে পরিচালক তপন সিংহের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

আমি বললাম : আপনি কি তখন তপনবাবুকে চিনতেন?

মাধবী বললেন : কী করে চিনব। ওই নামে যে কোনও ডিরেকটার আছে তাই তো জানতাম না। শুধু আমি কেন, ফিল্ম লাইনের অনেকেই জানতেন না তপনবাবুর নাম। তা শৈলেনবাবুর চিঠি পেয়ে আমি ভাবলাম, আর পাঁচটা ছবিতে যেমন ছোটখাটো রোল করি, এটাও সেইরকম কোনও ব্যাপার। শৈলেনবাবু দয়া করে আমাকে খোঁজটা দিয়েছেন।

আমি বললাম : ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গিয়ে জানতে পারলেন যে ওঁরা হিরোইন খুঁজছেন?

মাধবী বললেন : তাই তো শুনলাম। আর শুনেই তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। মনে মনে ভাবলাম, কেন মরতে এলাম এখানে। তপনবাবু তো আমার এই রুগ্ন চেহারা দেখামাত্রই নাকচ করে দেবেন।

আমি বললাম : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা গল্পে নায়িকা যে খুব রোগা ছিল, পরে আবার দারুণ মোটা হয়ে যাবে সেটা জানতেন না বুঝি? গল্পটা পড়েননি আগে?

মাধবী বললেন : কোন্ ছবির জন্যে তপনবাবু নায়িকা খুঁজছেন সেটাই তো জানি না তখনও। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের একটা ঘর ছিল, সেই ঘরে তপনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। উনি আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বললেন বটে, কিন্তু কথার থেকেও বেশি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন আমার সেই রুগ্ন শরীরটাকে।

আমি বললাম : আপনি তখন শরীরটাকে অত রোগা করে রেখেছিলেন কেমন করে? ডায়েট কনট্রোল করতেন নাকি?

মাধবী হেসে ফেললেন আমার কথা শুনে। বললেন : ডায়েটই জুটত না, তার আবার ডায়েট কনট্রোল। তখন একবেলা খাওয়া জোটে তো একবেলা জোটে না। কী দুঃসহ সেইসব দিন। মাঝে মাঝে খিদের জ্বালায় সারা শরীর কাঁপত।

আমি বললাম : ওই রোগা শরীরের দৌলতেই তাহলে 'টনসিল' ছবির নায়িকার কাজটা পেয়েছিলেন আপনি?

মাধবী বললেন : ঠিক তাই। সেই জন্যেই তো বলছি ওই ছবিটা আমার কাছে শরৎবাবুর গল্পের ভাষায় অভাগীর স্বর্গ।

আমি বললাম : কিন্তু 'টনসিল' ছবিতে আপনার অভিনয় আমার ভাল লাগেনি।

মাধবী বললেন : আমারই কি ভাল লেগেছে নাকি! আর লাগবেই বা কী করে! ও ছবিতে আমার রুগ্ন শরীরটাই শুধু কাজ করেছে। অন্য কোনও সত্তা তো কাজ করেনি। ভেবে দেখুন রবিবাবু, সিনেমার কোনও একটা চরিত্র, যার আর কোনও গুণ নেই, কেবল রোগা হওয়াটাই যার একমাত্র যোগ্যতা, সে চরিত্র কি ভাল লাগতে পারে? যে চরিত্র দর্শকের কোনও সহানুভূতি পায় না, তেমন কোনও চরিত্র কি কখনও কোনও শিল্পীকে খুশি করতে পারে? একটা বিতৃষ্ণা নিয়ে আমি ওই ছবিতে অভিনয় করে গেছি কেবল কিছু টাকার জন্যে। যে টাকা দিয়ে আমাদের সংসারের কয়েকটা দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটবে। তখন যে আমার পেটে বড় খিদে রবিবাবু!

আমি বললাম : সেই অর্থে আপনার প্রথম সার্থক নায়িকা মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ'-এর ওই চরিত্রটা।

মাধবী বললেন : ঠিক তাই। ওই ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে আমার এতদিনের সব ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেল।

হ্যাঁ, 'বাইশে শ্রাবণ'-এর মাধবীকে নিয়ে একটু ডিটেলে আলোচনা করার দরকার। কিন্তু সে কথায় যাবার আগে মাধবীর বিয়ের দিনের ঘটনাটা বলে নিই। সে দিনটা মাধবী আর নির্মলকুমারের জীবনের একটি বিশেষ দিন। এ তো আর সিনেমার নকল বর আর বউয়ের খেলা নয়। মাধবী সেদিন চেলি আর চন্দনে সুসজ্জিতা হয়ে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছেন কখন নির্মলকুমার আসবেন।

ঘড়িতে যখন ছ'টার ঘণ্টা পড়ে গেল তখন নির্মলকুমার মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। এমন একটা বিশেষ দিনে উত্তমদা তাঁকে ডোবাবেন সেটা নির্মলবাবু বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর তো চারটের সময় আসবার কথা। তাঁকে বার বার করে বলে দেওয়া হয়েছে গোধূলি লগ্নে বিয়ে।

তবে কি উত্তমদার কোনও বিপদ ঘটল। বাড়িতে টেলিফোন করে তো নো রিপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে। কী করবেন ভেবে পেলেন না নির্মলবাবু।

ওদিকে নির্মলবাবুর দাদা এসে তাগাদা দিচ্ছেন। মাধবীদের বাড়ি থেকে ঘন ঘন টেলিফোন আসছে, কেন এত দেরি হচ্ছে!

ঘড়িতে যখন ছ'টা বেজে দশ তখন একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল নির্মলকুমারদের বাড়ির নিচে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তমকুমারের চিৎকার ভেসে এল : এই নিমে। শিগগির নেমে আয়।

উত্তমবাবুর কণ্ঠস্বর শুনে নির্মলবাবুর ধড়ে প্রাণ এল। তাড়াতাড়ি বরবেশ পরা অবস্থায় নিচে নেমে এলেন। বললেন : তুমি তো ভাবিয়ে তুলেছিলে উত্তমদা। এত দেরি করতে হয়!

উত্তমবাবু বললেন : আর বলিস কেন। সেই চারটে থেকে আমি তোদের এই লেক গার্ডেন্সে চক্কর দিচ্ছি। তোদের বাড়ি আর খুঁজে পাচ্ছি না। সব দোষ এই ন্যাপাটার।

ন্যাপা হলেন উত্তমবাবুর ড্রাইভার। তাঁর ছোটবেলার বন্ধু।

নির্মলবাবু বললেন : কেন, ন্যাপাদা আবার কী দোষ করল?

উত্তমবাবু বললেন : দোষ নয়! তুই লেক গার্ডেন্সে থাকিস জানি, কিন্তু আমি তো তোর বাড়িটা চিনি না। তা ন্যাপা বললে, ও চেনে। কিস্যু চেনে না। তখন থেকে একবার এ-বাড়ি আর একবার ও-বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে আর বলছে, ওইটাই নির্মলদার বাড়ি। তা কোথায় কী! পাক্কা দুটি ঘণ্টা ঘুরিয়ে তারপর তোর বাড়ি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আর কথা নয়। শিগগির গাড়িতে ওঠ। ওদিকে মাধবীদের বাড়িতে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে!

নির্মলকুমারের হাত ধরে গাড়িতে ওঠালেন উত্তমকুমার। বললেন : এ কী রে! তোর হাত দুটো এত ঠাণ্ডা কেন?

মাধবী মুখার্জির বিয়েতে মাধবীদের তরফ থেকে কোনও আমন্ত্রণ আমি পাইনি। অতএব বিবাহ বাসরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে সেদিন যা কিছু ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আমি পেয়ে

গিয়েছিলাম আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন অনুজ সাংবাদিক বিমল চক্রবর্তীর মুখ থেকে। বিমল তখন মাধবীর খুব কাছের মানুষ। দিনের বেশির ভাগ সময় সে মাধবীর কাছাকাছি কাটাত। তার পরিষেবায় নিযুক্ত থাকত।

এই বিমল চক্রবর্তী মানুষটি এক আশ্চর্য প্রকৃতিব। বিমলের সাংবাদিকতার হাতেখড়ি হয়েছিল আমার হাতেই উল্টোরথ পত্রিকায়। বিমল আমাকে গুরু বলে সম্বোধন করত। ইদানীং যে অর্থে গুরু শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে নয়, বিমল প্রকৃত অর্থেই আমাকে গুরুর সম্মান দিত। ওর লেখার হাতটাও খারাপ ছিল না। পরবর্তীকালে ও কিছুদিন 'বিচক্র' ছদ্মনামে দেশ পত্রিকায় সিনেমা সম্পর্কিত লেখাজোখাও করেছিল। কিন্তু ও সাংবাদিকতা করাব চেয়ে শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাল কাটাতেই ভালবাসত বেশি। অন্তত দু'জন শিল্পীকে আমি জানি, যাঁদেব অন্দরমহলে বিমলের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁরা হলেন উত্তমকুমাব আর মাধবী মুখার্জি। দিন বাতের বেশির ভাগ সময় বিমল ওঁদের সঙ্গ -সুখেই কাটাত। দু-চারটে সম্মানজনক ফাইফরমায়েসও খাটত। এটা যে বিমল বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে করত তা কিন্তু নয়। ও কোনদিন শিল্পীদের এক্সপ্লয়েট করবার কথা চিন্তাও করত না। তবে মাঝে মাঝে ওঁদের কাছ থেকে অল্প কিছু টাকা-পয়সা হাত পেতে নিত বলে শুনেছি। ওঁরাও সেটা সানন্দে দিতেন বিমলকে।

তবে বিমলের একটা সাংঘাতিক দোষও ছিল। ও রীতিমত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শেষের দিকে ও তো দিবারাত্র মদ্যপান করত। একদিন সকালে ও আমার কাছে এল ওকে সাহিত্যিক সমবেশ বসুর কাছে নিয়ে যাবার আবদার নিয়ে। সমরেশবাবুর একটা গল্পের রাইট কিনতে চায় একজন প্রযোজকের জন্যে। দেখলাম সেই সাত সকালেই ওর মুখ দিয়ে মদেব গন্ধ ভুর ভুর করে বেরোচ্ছে। আমি বললাম : এই অবস্থায় কি সমরেশবাবুর কাছে যাওয়া ঠিক হবে বিমল?

বিমল একটু ম্লান হেসে বলেছিল : এরচেয়ে ভাল অবস্থায় আর কি আমাকে কোনদিন পাওয়া যাবে রবিদা!

আমি জানতাম বিমল ড্রিংকস-অ্যাডিক্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেটা যে এত মারাত্মক আকার নিয়েছে সেটা জানতাম না। ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম সমরেশবাবুর পার্ক সার্কাসের আস্তানায। সমরেশবাবুও ওর অবস্থা দেখে বলে উঠেছিলেন : এঃ বিমল, তুমি এই সক্কালবেলাতেই একেবাবে গন্ধমাদন হয়ে বসে আছ। তুমি যে মরে যাবে!

বিমলের এই নেশা করার জন্যে আমাদের মনে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু আমরা ওর ওপরে রাগ করতে পারতাম না। উত্তমবাবু কিংবা মাধবী দেবীও বিমলকে নেশার ব্যাপারটা অনেকবার বলেছেন। কিন্তু ওর ওপরে রাগ করে ওকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। এই অতিরিক্ত নেশার কারণেই বিমলকে অল্প বয়সেই পৃথিবী থেকে চলে যেত হল ওর স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে। তার মাত্র কয়েক বছর আগেই ওর বিয়ে হয়েছিল। ওর বিয়ের রিসেপশনে আমরা অনেকেই গিয়েছিলাম। উত্তমবাবুও গিয়েছিলেন। মাধবী গিয়েছিলেন কিনা ঠিক মনে পড়ছে না।

যাক সেসব কথা। বিমলের কথা থেকে আবার মাধবীর বিয়ের কথাতেই ফিরে আসি। মাধবীর বিয়ের দিন কী সব কাণ্ডকারখানা ঘটেছিল তার বেশির ভাগটাই শুনেছিলাম বিমলের মুখ থেকে। বাকিটা শুনেছি নির্মলকুমারের কাছে পরবর্তী কালে নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে।

বরবেশে নির্মলকুমারকে নিজের গাড়িতে তোলার পর তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখে উত্তমবাবু একটু রসিকতা করেছিলেন। বলেছিলেন : এ কীরে নিমে, সিনেমায় কত বিয়ের শুটিং করেছিস, কই তখন তো এমন নার্ভাস হোসনি। আজ তোর কী হল কী?

নির্মলবাবু বলেছিলেন : এটা সত্যিকারের বিয়ে বলে তাই! তবে ঠিক নার্ভাস নয়, উত্তমদা। বুকের ভেতরটা একটু কাঁপছে। এই প্রথম একটা বড় দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি তো!

ওদিকে মাধবীদের বাড়ির সামনে তখন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলছে। কেমন করে জানি রটে গেছে যে বর নিয়ে আসবেন উত্তমকুমার। তিনিই বরকর্তা। অতএব কাতারে কাতারে মানুষ এসে ভিড় করেছে মাধবীদের বাড়ির সামনে। বিয়েবাড়িতে বর দেখবার জন্যেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় জানি। এই প্রথম দেখা

গেল বর নয়, বরকর্তাকে দেখবার জন্যে হুলস্থুল কাণ্ড। যেহেতু বরকর্তাটি হলেন উত্তমকুমার। জনা দশেক পুলিশ এবং একজন সার্জেন্ট লাঠিসোঁটা হাতে নিয়েও সে ভিড়কে সামাল দিতে পারছেন না। অতএব শৃঙ্খলা বজায় রাখায় জন্য আরও কিছু পুলিশ আনানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু তো নির্মলকুমার কিংবা উত্তমকুমারই নন, চলচ্চিত্র জগতের আরও অনেক রথী এবং রথিনীরা আসবেন এই বিয়ে-বাড়িতে। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে প্রশাসনকে। তাই স্থানীয় থানা থেকে লালবাজার পর্যন্ত সবাই তটস্থ হয়ে আছে।

কিন্তু এত আটঘাট বেঁধে রেখেও শেষ পর্যন্ত অবস্থা সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে যেতে হল পুলিশবাহিনীকে। বরের গাড়ি এসে পৌঁছোতেই বরবেশী নির্মলকুমারের পাশে উত্তমকুমারকে দেখে গুরু গুরু রবে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সমবেত জনতার একটা অংশ ছুটে এল বরের গাড়ির দিকে। মৃদু লাঠি চার্জ করেও পুলিশ তাদের রুখতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিতে হয়ে গেল বরের গাড়ি।

নির্মলকুমার বললেন : সেদিন দেখেছিলাম অন্য এক উত্তমকুমারকে। নিজের শারীরিক নিরাপত্তার কথা একটুও চিন্তা না করে দু'হাতে ওই প্রচণ্ড ভিড়ের মোকাবিলা করতে করতে উত্তমদা আমাকে অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিলেন বিয়েবাড়ির ভিতরে।

আমি বললাম : পুলিশ তাহলে কী করছিল যে উত্তমবাবুকে ওইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিতে হল? না কি তারাও সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে উত্তমকুমারকে দেখছিল?

নির্মলবাবু বললেন ; না না, পুলিশের কোনও দোষ নেই। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল জনতাকে বাগে রাখার। কিন্তু উত্তমদার ভয় ছিল পুলিশ আবার না জনতাকে রুখতে গিয়ে লাঠি-ফাটি চালিয়ে বসে। বিয়ের ওই আনন্দ অনুষ্ঠানে দু-চার ফোঁটা রক্তপাত ঘটুক সেটা উত্তমদা আদৌ চাইছিলেন না। সেই জন্যেই ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধীর মতো তিনিও ভিড়ের ভেতরেই নেমে পড়েছিলেন পরিস্থিতি সামাল দিতে।

এরপর বিমল চক্রবর্তীর 'আখোঁ দেখা হাল'। বিমল বললে : নির্মলদাকে বরের আসরে বসিয়ে উত্তমদা চলে গেলেন মাধবীদির সঙ্গে দেখা করতে। উত্তমদা বললেন, নির্মলকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম মাধবী। ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওকে একটু গরম কফি টফি খাইয়ে চাঙ্গা করে তোলো। এখন থেকে তো নিমের সব দায়িত্ব তোমার।

মাধবীদি বললেন : নির্মলকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম মানে? আপনি কি চলে যাচ্ছেন নাকি? না না, ওসব হবে না।

উত্তমদা বললেন : চলে যাচ্ছি কে বললে! আমি সাজপোশাকটা পাল্টে আসতে যাচ্ছি। শুটিং থেকে সোজা আসছি তো। এই প্যান্ট শার্ট পরে বিয়েবাড়িতে থাকা যায় নাকি? আফটার অল আমি হলাম গিয়ে বরকর্তা। একটু সাজগোজ করে না এলে লোকে নিন্দে করবে যে! বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। এই যাব আর আসব।

নির্মলবাবু বললেন : সেদিন উত্তমদা যা সাজ করে এসেছিলেন তা চোখে পড়ার মতো। ইয়া চওড়া জলচুড়ি দেওয়া ধাক্কাপাড় ধুতি। উর্ধ্বাঙ্গে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। সেই পাতলা আদ্দির মধ্যে দিয়ে রঙ যেন ফেটে বেরোচ্ছে। উত্তমদার পাশে আমার অত সাধের বরবেশ একেবারে ম্লান হয়ে গেল। কী দারুণ দেখাচ্ছিল উত্তমদাকে! অত বয়স হয়েছে তখন, তবু মনে হচ্ছিল উত্তমদাকে এখনও আরও বার তিনেক অনায়াসে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায়।

বিমল বললে : সেদিন উত্তমদা অনেক রাত পর্যন্ত ছিলেন বিয়েবাড়িতে। শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে নয়, সত্যিকারের বরকর্তার মতো বিয়ের যা কিছু মাঙ্গলিক কাজ তা দাঁড়িয়ে থেকে সমাধা করিয়ে তবে বাড়ি গিয়েছিলেন।

নির্মলবাবুদের বাড়িতে বউভাতের রিসেপশনের দিন আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ উত্তমবাবুকে দেখতে পাইনি। রিসেপশন হয়েছিল নির্মলকুমারদের বাড়ির সামনে একটা মাঠে প্যান্ডেল বেঁধে। লেক গার্ডেন্সে এখন আর সেইসব মাঠ-টাঠ নেই। সব বাড়ি হয়ে গেছে।

আমি আর পূর্ণেন্দু পত্রী একসঙ্গে ওই রিসেপশনে গিয়েছিলাম। সকাল থেকে কী উপহার দেওয়া যায় তা নিয়ে গবেষণা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত নিউ মার্কেট থেকে দু'জনে দুই গুচ্ছ টাটকা লাল গোলাপ হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাধবীর দৃঢ়তাপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর চেয়ে ভাল উপহার আর কী হতে পারে। লাল রঙ মাধবীর খুব প্রিয়। উনি যে গাড়িটা কিনেছিলেন সেটাও ছিল ওই লাল রঙের। গাঢ় লাল। সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্ত তো আমার পত্রিকায় একবার লিখেছিলেন সে কথা। উনি লিখেছিলেন, লাল রং হল দৃঢ়তার প্রতীক। মাধবীর জীবন এবং মানসিকতার সঙ্গে মিলে গেছে তাঁর গাড়ির রং।

মাধবী আর নির্মলকুমারেব বউভাতের রিসেপশনের পরের দিন বিমল চক্রবর্তী এসে বলল : কাল একটা মজার কাণ্ড ঘটে গেছে রিসেপশন পার্টিতে।

আমি বললাম : কী মজার কাণ্ড?

বিমল বললে : উত্তমদা তো একটু বেশি রাত করে পার্টিতে এসেছিলেন। এসে নির্মলদা আর মাধবীদির কাছে গিয়ে চাপা গলায় বললেন : আজকের ফুলশয্যাব রাতে তোমাদের জীবনে যে ঘটনাটা ঘটবে, সেটা এর আগে কখনও ঘটেনি তো? যদি ঘটে থাকে তবে দু'জনে দু'জনের কাছে অকপটে প্রকাশ করে দিও। তাহলে বাকি জীবনে আর ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না।

আমি বললাম : উত্তমবাবুর মুখেই এমন কথা মানায়। ওঁর মতো অকপট হতে তো আমি বিশেষ কাউকে দেখি না। স্বামী-স্ত্রীর উভয়কে উভয়ের কাছে অকপট হতে বলে উনি ওঁদের সত্যিকারের সুহৃদের কাজই করেছেন।

সেই নির্মলকুমার আর মাধবীর জীবনের বর্তমান বিচ্ছিন্নতা আমার আদৌ ভাল লাগছে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওঁরা যেন ওঁদের মতদ্বৈধতা ভুলে গিয়ে আবার কাছাকাছি হতে পারেন। দু'জন ভাল মানুষেব মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা এমন করে কেন থাকবে!

এবাব আবার একবার মাধবীর অভিনয় জীবনের প্রসঙ্গে আসি।

মাধবীর অভিনয় জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তিনজন পরিচালকের দ্বারা। তাঁরা হলেন মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এবং সত্যজিৎ রায়। বাংলাদেশের আর কোন নায়িকা একত্রে এই তিন পরিচালকের ছবিতে নায়িকার কাজ করেননি।

মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিটা মাধবীর জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট। পুরনো ধারার অভিনেত্রী মাধবীকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছিলেন। অভিনীত চরিত্রের অনুভূতিটাকে আয়ত্ত করার শিক্ষা মাধবী মৃণালবাবুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। যে কারণে শুটিং-এর সময় মৃণালবাবু কখনও মাধবীকে স্বনামে ডাকতেন না। ছবিতে তাঁর যা চরিত্র সেই নামেই ডাকতেন। এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দিতেন না যে তিনি তাঁর ছবিতে মাধবী নন, ছবির চরিত্র মাত্র।

আবার ঋত্বিক ঘটকের ছিল অন্য কায়দা। তিনি চরিত্রটা বুঝিয়ে দিতেন। সিকোয়েন্সটা বুঝিয়ে দিতেন। কেমন করে অভিনয় করতে হবে সেটা দেখিয়ে দিতেন। তারপর একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন। বলতেন, যা দেখিয়ে দিলাম সেটা করতে পারবেন? মনে তো হয় পারবেন না। তবু দেখুন একবার চেষ্টা করে।

ঋত্বিকবাবু এমনিতে মাধবীকে আপনি বলতেন না। তুই বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার সময় ব্যাঙ্গার্থে আপনি ব্যবহার করতেন। সেটা শুনে মাধবীর প্রচণ্ড রাগ হয়ে যেত। ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠতেন। তারপর সারা মনপ্রাণ ঢেলে ঋত্বিকবাবুর ওই চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার চেষ্টা করতেন। এইভাবে 'সুবর্ণরেখা' ছবির অনেক অসাধারণ মুহূর্ত তৈরি হয়ে গেছে ঋত্বিকবাবুর চ্যালেঞ্জের একটা মুখের মতো জবাব দিতে গিয়ে।

মাধবীর সেই সাফল্যের পর ঋত্বিকবাবু দু'হাত তুলে ছুটে আসতেন। আনন্দে আর আবেগে মাধবীকে নিয়ে প্রায় লোফালুফি শুরু করে দিতেন। এমন পাগল প্রতিভা মাধবী জীবনে আর একটিও দেখেননি।

আর সত্যজিৎ রায়?

মাধবী বললেন : ওঁর কথা আর কী বলব। মুখের কথায় কী হিমালয়ের রূপ বর্ণনা করা যায়! আমার কাছে উনি তো হিমালয়েব চেয়েও বড়। অভিনয়ের ব্যাপারে উনি আমার ভেতরে বাইরে সব কিছু বদলে দিয়েছেন। নো-অ্যাকটিং যে সবচেয়ে বড় অ্যাকটিং এটা উনিই আমাকে সর্বতোভাবে শিখিয়েছেন। যে কারণে 'চারুলতা' কবাব পর আমি তো ঠিকই করে ফেলেছিলাম যে, আর অভিনয় করব না। আমার জীবনের সেবা প্রাপ্তিটুকু ওই চারুলতার মধ্যে দিয়েই পাওয়া হয়ে গেছে।

মাধবী প্রচণ্ড ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু তাঁব বসবার ঘরে কোন ঠাকুরদেবতার ছবি নেই। আছে রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিৎ রায়ের ছবি। বাকি দেওয়ালগুলো একেবারেই শূন্য। যেন সত্যজিৎই তাঁর ঈশ্বর।

অথচ সেই সত্যজিৎ আর মাধবীকে কেন্দ্র কবে কত না কাদা ছোড়াছুড়ি ঘটে গেছে। ওসব কথায় আমি বিশ্বাস করি না। একজন অভিনেত্রীর প্রতি একজন পরিচালকের পরম স্নেহের কদর্থ করা হয়েছে।

মাধবী বললেন . দেখুন না রবিবাবু, কাগজে কী সব উল্টোপাল্টা লেখা হয়েছে। আমি যা বলতে চেয়েছি তার উল্টো বোঝা হয়েছে। যার জন্যে আমি মংকুদির কাছে (শ্রীমতী বিজয়া রায়ের ডাকনাম) মুখ দেখাতে পারছি না। আমাদেব এতদিনকার এত সুন্দর সম্পর্ক আজ নষ্ট হতে বসেছে।

পরিচালকদেব মধ্যে তপন সিংহ আব তরুণ মজুমদারকেও মাধবীর খুব পছন্দ। তরুণবাবুর বেশি ছবিতে কাজ করেননি, তবে তপনবাবুর অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেছেন মাধবী। মাধবী বলেন : তপনবাবু অভিনযটাকে একেবারে নিংড়ে নেন ভেতর থেকে। ওঁর ছবিতে কাজ করে ভারি আনন্দ পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, ঠিক কথা। মাধবী একটা সময়ে স্থির করে ফেলেছিলেন তিনি অভিনয় ছেড়ে দেবেন। খবরের কাগজে তাঁর সে বিবৃতি বেরিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে ফিরে আসতে হল অভিনয়ের অঙ্গনে। তবে তার পুরো ক্রেডিট নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের।

নব্যেন্দুর জীবনের প্রথম ছবি 'নয়া রাস্তা'। হিন্দি ছবি। ছবিটা শেষ হয়েও মুক্তি পেল না প্রযোজকদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির কারণে। ওঁর দ্বিতীয় ছবি 'অদ্বিতীয়া'। এ ছবির প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী। কিন্তু সব কিছু তৈরি হয়েও নায়িকা পাওয়া যাচ্ছে না।

একদিন অরুণবাবু নব্যেন্দুকে বললেন : মাধবীকে নায়িকা করলে কেমন হয়?

নব্যেন্দু বললে : মাধবী তো আর অভিনয় করবেন না বলে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

অরুণবাবু বললেন : আমরা তো ওঁকে অভিনয় করতে বলছি না। একবার শুধু স্ক্রিপটা শুনতে বলছি।

তা অনেক অনুরোধ উপরোধ করে স্ক্রিপ্ট শোনানো হল। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, স্ক্রিপ্টটা শুনতে শুনতেই মাধবীর ভেতরের শিল্পীসত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এমন সুন্দর একটা চরিত্র সে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এবং সেই শিল্পীসত্তার চাপেই ব্যক্তি মাধবী তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন।

নব্যেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলাম : মাধবীকে তোমার বড় মাপের অভিনেত্রী বলে মনে হয়?

নবেন্দু বললে : তোমরা যতটা অসাধারণ ভাব, আমার কিন্তু ততটা মনে হয় না। মাধবী অবশ্যই ভাল অভিনেত্রী। মেটিরিয়ালটা খুব ভাল। যে কোনও বড় ডিরেকটার ওকে দিয়ে বড় কাজ করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু মাধবীর নিজস্বতার ব্যাপারে আমার কিছু রিজার্ভেশন আছে।

সেই মাধবী এখন পরিচালক হতে চলেছেন। চিত্তরঞ্জন ঘোষের কাহিনী নিয়ে 'আত্মজা' নামে একটা ছবি করতে চলেছেন। মা ও মেয়ের মানসিক দ্বন্দ্বের গল্প। মা করবেন মাধবী, আর মেয়ে করবেন মুনমুন সেন।

মাধবী বললেন : সবাই বলে মুনমুনের কিছু হবে না। কিন্তু ও যে একজন ভাল অভিনেত্রী, আমার ছবিতে সেটা প্রমাণ করে দিতে চাই।

মাধবীর স্বপ্ন সত্যি হোক, ঈশ্বরের কাছে সেটাই প্রার্থনা। সেই সঙ্গে আরও প্রার্থনা, মাধবী তাঁর ব্যক্তিজীবনে শান্তিলাভ করুন।

তরুণকুমার

এক-একটি মানুষ বিচিত্র রকমের ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। এই তরুণকুমারের কথাই ধরুন না কেন! আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি অভিনেতা তরুণকুমারের কথাই বলছি।

একটা সময়ে উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তার কুমারত্ব নিয়ে অনেক উঠতি অভিনেতা তাঁদের নামের সঙ্গে 'কুমার' শব্দটি সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু তরুণকুমার অথবা তস্য ভ্রাতাদের ক্ষেত্রে এ কথাটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। ওঁদের তিন ভাইয়ের পিতৃদত্ত নামেই কুমারত্ব জড়িত ছিল। বড় ভাই উত্তমবাবুর নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেজ ভাইয়ের নাম বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, আর ছোট ভাই অর্থাৎ বুড়োদার নাম তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। শৈশবে তরুণকুমারের এই বুড়ো নামকরণের একটা মজার ইতিহাস আছে। সে কথায় পরে আসছি।

যাই হোক, যে কথা বলতে চাইছিলাম সেটাতেই আসি। বলছিলাম ভাগ্যের কথা। তরুণকুমারের অসীম সৌভাগ্য এবং গর্বের কারণ, তাঁর দাদা হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের জনপ্রিয়তম শিল্পী উত্তমকুমার। অথচ এই ঘটনাটি তরুণকুমারের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুর্ভাগ্যের কারণও বটে। আমার এই কথা শুনে অনেকে হয়তো চমকে উঠতে পারেন। সুতরাং একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

অনেকের এখনও ধারণা যে তরুণকুমার সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর দাদা উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তার সহায়তায়। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর নিজের অভিনয়কুশলতার জোরে। এবং এর পিছনে দীর্ঘকালের অনুশীলন ছিল। তিনি তিল তিল করে অভিনয়ের বিভিন্ন মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করেছেন। কেবলমাত্র 'দাদার ভাই' এই পরিচয়ে তরুণকুমারের মতো একজন বড় মাপের শক্তিশালী অভিনেতা হওয়া যায় না।

অথচ তরুণকুমারকে তাঁর দাদার জনপ্রিয়তার দায় কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হয়েছে চিরকাল। দাদার জনপ্রিয়তার ছায়ায় তাঁকে অকারণে আবৃত হয়ে থাকতে হয়েছে। তরুণকুমার যদি উত্তমকুমারের ভাই না হয়ে অন্য কোনও সাধারণ মানুষের ভাই হতেন তাহলে যে তাঁর অভিনয়ের প্রতিভা নিয়ে একটা বিরাট হইচই পড়ে যেত, এ কথাটা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

তরুণকুমার যে কত বড় মাপের অভিনেতা সেটা ওঁর দাদা উত্তমকুমার খুব ভালভাবেই জানতেন। একবার নয়, একাধিকবার তা নিয়ে আমার সঙ্গে উত্তমবাবুর কথা হয়েছে। সেদিন উত্তমবাবুর সঙ্গে পুরনো দিনের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি প্রমথেশ বড়ুয়া, দুর্গাদাস, প্রভা দেবী প্রমুখ প্রয়াত শিল্পীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন। আমি সেদিনের সেই আলোচনার ধারাটা প্রয়াত শিল্পীদের দিক থেকে সমকালীন শিল্পীদের দিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে দুম্ করে একটা প্রশ্ন করে বসেছিলাম। বললাম : এখন আপনার সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মধ্যে কাকে কাকে আপনি সমীহ করে চলেন?

আমার প্রশ্নটা শুনে উত্তমবাবু একটু হাসলেন। বললেন : অত রেখে-ঢেকে কথা বলবার দরকার কী? সোজাসুজি জিগ্যেস করুন না, কার কার সঙ্গে অভিনয় করতে আমি ভয় পাই।

আমি বললাম : না না, অমন বোকার মতো প্রশ্ন আমি করতে চাই না। ভয় যে আপনি কাউকে করেন না সেটা আমি জানি। যত বড় শিল্পীই হোক, তাঁর সঙ্গে অভিনয়টাকে আপনি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। সেই জন্যেই আমি সমীহ শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম।

উত্তমবাবু বললেন : না মশাই, আমিও ভয় পাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম : সে কী! কাকে?

উত্তমবাবু বললেন : মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রী চ্যাটার্জীকে, আর ছেলেদের মধ্যে আমার ভাই বুড়ো, মানে আপনাদের ওই তরুণকুমারকে।

আমি বললাম : সে কী! ছবি বিশ্বাসকে সমীহ করেন না?

উত্তমবাবু বললেন : নিশ্চয় করি। তবে কি জানেন রবিবাবু, ছবিদার অ্যাকটিং-এর প্যাঁচ-পয়জারগুলো আমার জানা হয়ে গেছে। তাই ছবিদাকে মোকাবিলা করতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু সাবু কিংবা বুড়ো যে কখন কোন্ দিক থেকে কী প্যাঁচ মেরে আমাকে ফ্ল্যাট করে দেবে, সেই ভয়ে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়।

আমি বললাম : সাবিত্রীব ব্যাপারটা বুঝি! ও একটা ভার্সাটাইল জিনিয়াস, কিন্তু তরুণকুমার সম্পর্কে এতবড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কোন্ হিসেবে?

উত্তমবাবু বললেন : বুড়োর সঙ্গে যারা অভিনয় না করেছে তাদের সে হিসেবটা বোঝানো যাবে না। তবে সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কী জানেন রবিবাবু?

আমি বললাম : কী?

উত্তমবাবু বললেন : বুড়ো হল ঠিক সেই হাতির মতো। হাতি যেমন নিজের ক্ষমতার পরিমাপ করতে পারে না, বুড়োরও ঠিক তাই। ওর মধ্যে যে অত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, সে সম্পর্কে ও আদৌ সচেতন নয়। ওর কাছে অভিনয়টা একটা খেলার মতো। সব ব্যাপাটাই কেমন ঢিলেঢালা। হইচই করে, খলবল করে। অথচ ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড সিরিয়াস। সেটা বুঝতে পারি ও যখন ওর তূণ থেকে এক-একটা অস্ত্র বার করে।

উত্তমবাবু ওই যে তরুণকুমারকে ঢিলেঢালা খলবলে একটি মানুষ বলে উল্লেখ করলেন, সে কথাটার সত্যতা অস্বীকার করতে পারি না। আসলে তরুণকুমার একজন অত্যন্ত ভালমানুষ। মনেপ্রাণে ভালমানুষ। সেটা প্রকাশ করার জন্যে তাঁর কোন ভান বা ভণিতার প্রয়োজন হয় না। ওঁর সঙ্গে আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের আলাপ। আর এই দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ওঁকে একই মূর্তিতে, একই চেহারায় দেখে আসছি। পরের উপকার করবার জন্যে মানুষটা যেন সর্বক্ষণ মুখিয়ে আছে। আমার দেখা একটা ঘটনার কথা বলি।

তরুণকুমার তখন বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় করছেন। সেই সময়ে ওঁদের সঙ্গে একজন বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা অভিনয় করতেন। তাঁর নাম মণি শ্রীমানী। মণিদা অনেক পুরনো আমলের মানুষ। এই বিশ্বরূপা মঞ্চের নাম যখন ছিল শ্রীরঙ্গম, তখন তিনি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে সেখানে নিয়মিত অভিনয় করতেন।

বড় মাপের অভিনেতা হলেও মণিদার আর্থিক অবস্থা আদৌ বড় মাপের ছিল না। বিবেকানন্দ রোডে একটি কাগজের দোকানে সামান্য মাইনের চাকরি করতেন। তার সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটারের যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন মিলিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালান। সেই মণিদার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু মণিদার এমন সম্বল নেই যাতে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। নিজের এই দারিদ্র্য আর অক্ষমতার কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না। কিন্তু তরুণকুমার নামক একজন হৃদয়বান মানুষকে বোধহয় বলা যায়।

মণিদার কাছে সব কথা শুনে তরুণকুমার খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন : কিছু ভাববার নেই মণিদা। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মণিদা যেন কথাটা বুঝতে পারলেন না। তাই বললেন : কী হয়ে যাবে?

তরুণকুমার হাসতে হাসতে বললেন : বললাম তো, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমার মেয়ের বিয়েটা কত তারিখে যেন?

মণিদা তারিখটা বললেন।

তারপর কয়েকটা দিন তরুণকুমার উঠেপড়ে লাগলেন মণি শ্রীমানীর কন্যাদায় উদ্ধারের ব্যবস্থায়। সঙ্গে পেলেন বিশ্বরূপার সব ক'জন শিল্পী আর কলাকুশলী বন্ধুকে। ঠিক হল নাটকের একটা চারিটি শো করা হবে। তাতে যত টাকা বিক্রি হবে তার সবটাই তুলে দেওয়া হবে মণিদার হাতে।

কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল একটা শো থেকে যত টাকা উঠবে, সেটা কন্যাদায় উদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহলে কী হবে?

তরুণকুমার বললেন : ভাববার কিছু নেই। বিয়ের খরচের টাকাটা যাতে উঠে আসে তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিভাবে কী ব্যবস্থা হবে সেটা কারও কাছে প্রকাশ করলেন না তরুণকুমার। সেটা অন্ধকারেই থেকে গেল।

চ্যারিটি শো-এর সপ্তাহ খানেক আগে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন মারফত জানা গেল : অমুক দিন অমুক তারিখে বিশ্বরূপা মঞ্চে সাহায্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি তারকাসমৃদ্ধ নাটক হবে। নাটকের আগে সংগীত পরিবেশন করবেন মহানায়ক উত্তমকুমার। তাঁর গানের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করবেন বাংলা চলচ্চিত্রের আর একজন বিখ্যাত নায়ক অসিতবরণ।

এই অনুষ্ঠানের প্রবেশমূল্য আগে যা ধার্য করা হয়েছিল, সেটা প্রায় দ্বিগুণ করে দেওয়া হল। রাতারাতি হাউসফুল। দর্শকদের চাহিদায় কিছু এক্সট্রা চেয়ারও দিতে হল।

আশাতিরিক্ত টাকা হাতে পেয়ে মণিদার সে কি আনন্দ! দু'হাত তুলে সহকর্মীদের আশীর্বাদ করলেন। সেই আশীর্বাদের আওতা থেকে বিশ্বরূপার মালিক রাসবিহারী সরকার মশাইও বাদ গেলেন না। তিনি বিনা পয়সায় হলটি দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানের জন্য।

বিয়ের দিন রাত্রে মণিদার সুকিয়া স্ট্রিটের গলির মধ্যেকার নেই এঁদো বাড়িটিতে যেন চাঁদের হাট বসে গেল। সেই হাটের মধ্যমণি ছিলেন তরুণকুমার। মাটিতে পাতা পেতে খেতে বসিয়ে সবাইকে হাসি আর আনন্দ বিতরণ করার সে কি ধুম তাঁর। এমন একটি সদানন্দ পরোপকারী মানুষকে সেদিন মনে মনে অজস্র প্রণাম জানিয়েছিলাম।

এইভাবে কেবল আর্থিক সহযোগিতাই নয়, প্রচুর মানুষের মানসিক সহযোগিতাও করেছেন তরুণকুমার। তার একটি বড় উদাহরণ, তাঁর নিজের দাদা উত্তমকুমারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উত্তমবাবুর সঙ্গে একদিন তাঁর অতীতের অন্ধকারময় দিনগুলি নিয়ে কথা হচ্ছিল। উত্তমবাবু বললেন : জানেন রবিবাবু, সেইসব দিনগুলির কথা ভাবলে আমি আজও মনে মনে শিউরে উঠি। সেই সময়ে বুড়ো যদি আমার পাশে এসে না দাঁড়াত, আমাকে মানসিক ভাবে সাহস না যোগাত, তাহলে যে কি হত বলা মুশকিল।

আমি বললাম : তরুণকুমার তো আপনার ছোট ভাই। কতই বা তখন তাঁর বয়েস! তিনি কীভাবে আপনাকে সাহস যোগালেন?

উত্তমবাবু হাসতে হাসতে বললেন : বয়েস কম হলে কি হবে, ওর নাম যে বুড়ো। সেই হিসেবে অন্যকে জ্ঞান দান করবার অধিকার ওর আছে বইকি।

আমি বললাম : ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। একটু খুলে বলুন না ঘটনাটা।

উত্তমবাবু বললেন : সেসব শুনে আর কি করবেন। পাস্ট ইজ পাস্ট। আপনি যেহেতু আমাকে ভালবাসেন, তাই সেসব কথা শুনে আপনার মনেও কষ্ট হবে।

আমি বললাম : হোক কষ্ট। একটি মানুষকে ঠিকভাবে জানতে গেলে তার অতীত আর বর্তমানের সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হয়। তাই ওটা জানা আমার খুবই প্রয়োজন।

উত্তমবাবু বললেন : সেসব কথা বলতে গেলে এমন অনেকের কথা এসে যাবে, যারা এখন আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। কাজেই সেটা বলা কি ঠিক হবে?

আমি বললাম : কারও নাম না করেও তো ঘটনাটা বলা যায়। আমি আপনার সেইসব দিনের স্ট্রাগলটাকে ধরতে চাইছি। সেই সঙ্গে তরুণকুমারের তখনকার ভূমিকাটা জানতে চাইছি ভাল করে। তরুণকুমারকে মনে হচ্ছে আমার লেখার একজন উপযুক্ত সাবজেক্ট। কাজেই ওসব ঘটনা আমার জানা দরকার।

উত্তমবাবু বললেন : সর্বনাশ! আপনি এসব নিয়ে লিখবেন নাকি? এই তো ভয় ধরিয়ে দিলেন মশাই। আর তো খোলামেলা কথা বলা যাবে না আপনার সঙ্গে। সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। অনেক কিছু রেখেঢেকে বলতে হবে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : একদম রেখেঢেকে কথা বলবেন না। ঘোরতর কোনও পাপ যদি

করে থাকেন তবে সেটা আমার কাছে চেপে যেতে পারেন। সেসব বলবেন আপনার ঈশ্বরের কাছে। অথবা আপনার স্বর্গত পিতার ছবির সামনে। আমার কাছে আপাতত বাখঢাক না করে আপনার স্ট্রাগলের কথাগুলো বলে যান। যদি কিছু রাখঢাক করবার থাকে তবে সেটা আমিই করব। এটুকু সহায়তা নিশ্চয় আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারি।

উত্তমবাবু আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন : নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি।

তা সেদিন অনেক গভীর রাত পর্যন্ত উত্তমবাবুর মুখ থেকে তাঁর অতীতের সেই অশ্রু ঝরানো দিনগুলির কথা শুনেছিলাম। সেসব কথা বিস্তারিতভাবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ওসব বলব উত্তমবাবু সম্পর্কে লেখার সময়। আপাতত সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে উত্তমবাবুকে সবকিছু সামলে নেবার জন্য তরুণকুমারের কি ভূমিকা ছিল, কেবল সেইটুকুই বলব।

উত্তমবাবু বললেন : সিনেমাপাড়ায় তখন আমার নাম হয়ে গেছে 'এফ-এম-জি', অর্থাৎ 'ফ্লপমাস্টার জেনারেল'। একটা ছবিও দাঁড়াচ্ছে না। পর পর সব ফ্লপ করে যাচ্ছে। ওইসব কথা কানে আসছে আর আর আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। সেই সময়ে দু-চারজন শুভানুধ্যায়ী বাড়ি বয়ে এসে আমাকে উপদেশ দিয়ে গেলেন অভিনয়-টভিনয় ছেড়ে দিতে। ওসব কর্ম নাকি আমার দ্বারা হবে না। আমারও তখন নিজের ওপর বিশ্বাস কমে আসছে। ভাবতে লাগলাম, সত্যিই কি আমাকে অভিনয় ছেড়ে দিতে হবে!

একটানা কথাগুলি বলবার পর উত্তমবাবু থেমে গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা।

আমি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম : তারপর?

উত্তমবাবু বললেন : শুভানুধ্যায়ীদের সেই সব অযাচিত উপদেশ শুনে বুড়ো ফুঁসে উঠত। বলত : ওদের কথা বাদ দাও তো! ভগবান দুটো কান দিয়েছেন কী করতে! একটা কান দিয়ে শুনবে, আর একটা কান দিয়ে বার করে দেবে। তুমি তো আর অ্যাকটিং খাবাপ করছ না। এখন হয়তো সময়টা খারাপ যাচ্ছে। দেখবে, তোমার অ্যাকটিং একদিন না একদিন অ্যাকসেপ্ট করবেই দর্শকরা।

আমি বললাম : বুড়োদা তো ঠিক ফোরকাস্টই করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আপনি তো ঘোরতরভাবে অ্যাকসেপ্টেড হলেন আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে।

উত্তমবাবু হাসলেন। বললেন : সেদিন একমাত্র বুড়োই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দিনের পর দিন সাহস যুগিয়ে গিয়েছিল। না হলে আমার আত্মবিশ্বাস তো তখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। বিরক্ত হয়ে একদিন হয়তো সত্যি সত্যিই অভিনয় ছেড়ে দিতাম। সেই পতনের হাত থেকে বুড়োই আমাকে বাঁচিয়েছে। ওর কাছে কোনদিনও বলিনি। আজ আপনার কাছে বলছি, বুড়োর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

শুধু উত্তমবাবুর ক্ষেত্রেই নয়, আরও বহু প্রতিভাকে পতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তরুণকুমার। তার মধ্যে একটি ঘটনা তো আমার চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি।

সংস্কৃতে একটি কথা আছে : মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, সেই ঋষিদেরও মতিভ্রম ঘটে। তাঁরাও কখনও কখনও ভুল কাজ করে ফেলেন।

অভিনেতা তরুণকুমারকে আমি অবশ্য মুনি-ঋষিদের পর্যায়ে ফেলতে চাই না। কিন্তু মানুষ হিসেবে যে তিনি একজন উচ্চাঙ্গের, সে ব্যাপার আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর মনটা অনেকের চেয়ে অনেক বেশি নির্মল। যে কারণে তিনি সকলের ভালবাসা পেয়েছেন। তাঁর শত্রুর সংখ্যাও অনেকের চেয়ে কম।

সেই তরুণকুমার যদি এমন কোনও কাজ করেন, অথবা এমন একটি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করেন, যা অন্য একজন মানুষের একেবারে মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করে তার হৃদয়টাকে রক্তাক্ত করে দেয়, তখন বেশ খানিকটা আশ্চর্য হতে হয় বৈকি!

এবং সেটা আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। একদিন গভীর রাতে হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালের লাউঞ্জে বসে তরুণকুমার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : রবিদা, তোমার মতো ভিন্‌ডিকটিভ মানুষ

আমি আর একটিও দেখিনি।

কথাটা শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। বিশ্বাস করতে পারলাম না, স্বয়ং তরুণকুমার এমন শাণিত বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন। তাও কিনা আমার প্রতি। যে মানুষটির সঙ্গে তাঁর অসম্ভব হৃদ্যতার সম্পর্ক। দীর্ঘকাল একসঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন নানা উপলক্ষে।

স্পষ্টবক্তা বলে একটা সুনাম তরুণকুমারের চিরকালই আছে। যা সত্যি বলে মনে করেন তা তিনি অকপটে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। বাইরের মানুষের সামনে তো বটেই, যে মানুষটিকে তরুণকুমার অসম্ভব শ্রদ্ধা এবং সম্মান করেন, সেই তাঁর দাদা উত্তমকুমারের সামনেও তিনি অনেকবার স্পষ্ট কথা বলতে পেরেছেন।

এই যেমন সেবারে 'অমানুষ' ছবিটা দেখবার পর বলেছিলেন। শক্তি সামন্ত পরিচালিত 'অমানুষ' ছবিটির কথা নিশ্চয় অনেকের মনে আছে। উত্তমকুমার আর শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত এই ছবিটি সেই সময়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল দর্শক মহলে। অনেকদিন ধরে চলেছিল ছবিটা।

সেই ছবি রিলিজের আগে এক বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবিটা পাশাপাশি বসে দেখেছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে উত্তমকুমাব এবং তরুণকুমার। ছবি দেখে সবাই খুশি, সবাই উচ্ছ্বসিত। সেই উপলক্ষে সেদিন রাত্রে উত্তমবাবুদের গিরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে একটা পারিবারিক পান-ভোজনের আসর বসেছিল। সেই আসরে সবাই কথা বলছিল, কিন্তু তরুণকুমার একেবারে নির্বাক। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরেই উত্তমবাবু লক্ষ করলেন। তারপর এক সময়ে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন তরুণকুমারকে। বললেন : কী ব্যাপাব ছোটবাবু, তুমি আজ ছবি দেখার পর থেকে এত চুপচাপ কেন?

তরুণকুমার শুকনো গলায় উত্তর দিলেন : ও কিছু নয়।

উত্তমবাবু বললেন : নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। আমার কোনও ছবি দেখার পর তুমি তো চুপচাপ থাকবার মানুষ নও। কী হয়েছে বলতে হবে আমাকে।

তরুণকুমার মৃদুকণ্ঠে বললেন : বলছি তো, কিছু হয়নি।

উত্তমবাবু বললেন : দ্যাখ বুড়ো, আমি তোর নাড়ি-নক্ষত্র জানি। কী হয়েছে খুলে বল। কেউ কিছু বলেছে তোকে?

তরুণকুমার বললেন · কে আবার কী বলবে।

উত্তমবাবু বললেন : তাহলে এমন চুপচাপ আছিস কেন? 'অমানুষ' ছবিটা কি তোর ভাল লাগেনি?

উত্তমবাবুর এ কথার কোনও জবাব দিলেন না তরুণকুমার।

উত্তমবাবু বললেন : সবাই ছবি দেখে এত হইচই করছে অথচ তোব যে কেন ভাল লাগল না তা তো বুঝতে পারছি না। ছবিটা দর্শকরা নেবে না বলছিস্?

তরুণকুমার বললেন : কে বললে নেবে না। দারুণ ভাবে নেবে। হল থেকে নামানো মুশকিল হবে। এ ছবির ডিস্ট্রিবিউটার দাগা পিকচার্স লালে লাল হয়ে যাবে।

উত্তমবাবু বললেন : তবে! তাহলে কি আমার অভিনয় তোর ভাল লাগেনি?

তরুণকুমার বললেন : দ্যাখ দাদা, অভিনয়ের জগতে তুমি আমার আদর্শ। তোমার অভিনয় দেখে আমরা অভিনয় শিখি। সেই তোমার কাছ থেকে এমন অভিনয় দেখতে পেলে আমার মনে যে বড় কষ্ট হয় দাদা।

তরুণকুমারের কথা শুনে উত্তমবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন : আমার অভিনয়ের ডিফেক্টটা কোথায়?

তরুণকুমার বললেন : তোমার কাছ থেকে এই ধরনের অভিনয় তো আমি আশা করিনি। তোমার এই অভিনয়ের সঙ্গে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার অভিনয়ের তো কোনও তফাতই নেই।

উত্তমবাবু চুপ করে খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তরুণকুমারের দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : শোন্ বুড়ো, কোন ছবির কাহিনী এবং চিত্রনাট্য অনুযায়ী অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয়। 'অমানুষ' ছবিতে আমার চরিত্রের দুটো দিক আছে। একটা এক্সট্রোভার্ট, অন্যটা ইন্ট্রোভার্ট। আমি চেষ্টা করেছি এই দুটো দিকের একটা কমবিনেশন ঘটাতে। তোর কথা শুনে বুঝতে পারছি আমার

অভিনয় তোকে খুশি করতে পারেনি। এর আবার অন্য মতও থাকতে পারে। আমি তা নিয়ে কোন তর্কে যাব না। তবে কথা দিচ্ছি, আমার পরম স্নেহের ছোট ভাইকে খুশি করবার জন্যে যদি তেমন কোন গল্প এবং চিত্রনাট্য পাই, তবে সেটা করে দেখিয়ে দেব। সেটা যতদিন না পারছি ততদিন আমি তোকে রিকোয়েস্ট করব আগের মতো নর্মাল বিহেভ করতে। কি রে, পারবি না?

দাদার কথায় স্পষ্টবক্তা তরুণকুমার খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন। আর কোনও কথা বলতে পারলেন না।

তা উত্তমকুমার তাঁর স্নেহের ছোট ভাইকে খুশি করবার জন্যে একটা ছবিতে মারাত্মক অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন কিছুদিনের মধ্যে। ছবিটির নাম 'বিকেলে ভোরের ফুল'। এটা কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের ছবি। কাহিনী সমরেশ বসুর। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য—পীযূষ বসুর। বিখ্যাত ইংরিজি ছবি 'লাভ ইন দ্য অফটারনুন'-এর ছায়ায় 'বিকেলে ভোরেব ফুল' উপন্যাসটা লিখেছিলেন সমরেশবাবু। ওঁর কাছ থেকে আমিই গল্পের রাইট কেনার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছিলাম। যে কারণে কন্ট্রাক্টের সময় আমাকে সাক্ষী হিসেবে সই করতে হয়েছিল। আমার অনুরোধে টাকাপয়সার ব্যাপারে সমরেশবাবু কিছুটা কনসিডার করেছিলেন। ছবির নায়িকা ছিলেন হাসি, অর্থাৎ সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। সুমিত্রা সেই প্রথম একটা মনের মত রোল পেয়েছিলেন।

'বিকেলে ভোরের ফুল' ছবিটা একটা বিশেষ প্রদর্শনীতে উত্তমকুমার আর তরুণকুমার দুই ভাই পাশাপাশি বসে দেখেছিলেন। শো শেষ হবার পর উত্তমবাবু তরুণকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন : কী ছোটবাবু, তোমাব কী ওপিনিয়ান? এবারেও আমি ঠিক চিৎপুরপাড়ার মতো অভিনয় করতে পেরেছি তো?

ছবি দেখার পর তরুণকুমার তখনও একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। ঝপ করে নিচু হয়ে উত্তমকুমারের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বললেন : অসাধারণ! অসাধারণ! আমি 'লাভ ইন্ দ্য আফটারনুন' ছবিতে ওই চরিত্রে গ্রেগরি পেকের অভিনয় দেখেছি। তুমি তাঁর থেকে কোনও অংশে কম তো নয়ই, বরং কোথাও কোথাও তাঁকেও ছাপিয়ে গেছো। তবে একটা দুঃখ কি জানো, এ ছবিটা দর্শকরা তেমনভাবে নেবে বলে মনে হয় না।

উত্তমবাবু চমকে উঠলেন। বললেন : বলিস কী রে?

তরুণকুমার বললেন : হ্যাঁ দাদা, আমার মনে হচ্ছে এ ছবির বক্স অফিস তেমন এনকারেজিং হবে না।

উত্তমবাবু বললেন : তাহলেই তো মুশকিল। ভাল অভিনয় করলে বলছিস দর্শক নেবে না। আবার দর্শক নিলে সে ছবির অভিনয় তোর পছন্দ হয় না। আমি এখন কী করি বল দেখি!

উত্তমবাবুর সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি তরুণকুমার। আজও তিনি সে প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

তা এহেন স্পষ্টবক্তা তরুণকুমার সেদিন হোটেল হিন্দুস্থানে বসে আমার মুখের ওপর যখন 'ভিনডিকটিভ' শব্দটি উচ্চারণ করলেন তখন একই সঙ্গে আহত এবং অপমানিত বোধ করেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি দ্বিতীয় কোনও প্রশ্ন না করে হোটেল ছেড়ে চলে এসেছিলাম। পরবর্তী তিন-চারটে দিন মানসিক অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। তারপর বুঝতে পেরেছিলাম তরুণকুমারের মতো সুভদ্র একটি মানুষ হঠাৎ সেদিন কেন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। এর পেছনে ছোট্ট একটা ঘটনা আছে। সে কথায় পরে আসছি।

সেদিন তরুণকুমারের ওই কথাটা আমার বুকে বেশি করে বেজেছিল আমাদের মধ্যে যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেটার কথা ভেবে। আগেই বলেছি তরুণকুমারের সঙ্গে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের পরিচয় আমার। সেই পরিচয় গাঢ় হতে থাকে ষাটের দশকের গোড়া থেকে। এবং সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় ১৯৬৯ সালে যখন আমি 'প্রসাদ' পত্রিকার সেই বিখ্যাত 'উত্তমকুমার সংখ্যা' প্রকাশ করি, সেই সময়ে।

প্রসাদ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশের যতটুকু ক্রেডিট আমার, সেটা সম্ভব

হয়েছিল আমার সহকারী বিমল চক্রবর্তী এবং তরুণকুমারের অকৃপণ সাহায্যে। ওই সময়ে তরুণকুমার যে কী পরিমাণ কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করেছিলেন ওই সংখ্যাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে তা যাঁরা চোখে না দেখেছেন তাঁদের বিশ্বাস করানো যাবে না। ওই সময়ে প্রায় প্রতিদিন আমাদের মিটিং বসত। বিমল তখন 'দুর্বাসা' ছদ্মনামে লিখত। তাকে নিয়ে চরকির মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন তরুণকুমার গাড়ির তেল পুড়িয়ে।

ওই সময়ে একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। ওই সংখ্যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে উত্তমকুমার সম্পর্কে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেই তালিকায় তরুণকুমারের নামও ছিল। অন্য সকলের লেখা যথাসময়ে হাতে এসে গেল (সুচিত্রা সেন বাদে), কিন্তু তরুণকুমারের লেখা আর পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে একদিন খুব রাগারাগি করলাম। তারপর বিমল চক্রবর্তীকে লাগিয়ে রাখলাম ওঁর পেছনে।

শেষ পর্যন্ত এমন চমৎকার একটি রচনা উত্তমকুমার সংখ্যার জন্য লিখে পাঠালেন তরুণকুমার যে তার মধ্যে সম্পাদক হিসেবে আমার এতটুকু কলম ছোঁয়ানোর অবকাশ ছিল না। উনি যে অত চমৎকার লেখা লিখবেন সেটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ইচ্ছে থাকলেও সেই উত্তমকুমার সংখ্যা এখন আর সংগ্রহের উপায় নেই। তাই সেই রচনাটি আমার পাঠকদের গোচরার্থে কিছুটা উদ্ধৃত করতে চাইছি। বর্তমান প্রজন্মের এটা পড়া দরকার। এতে একজন নতুন উত্তমকুমারেব সাক্ষাৎ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই তরুণকুমারের লেখনশৈলী এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখাটির শিরোনাম ছিল 'দৈহিক শান্তি, না, মানসিক চিন্তা'। উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে। লেখাটি এইরকম—"..১৯৫৮ সাল। 'অবাক পৃথিবী' ছবির শুটিং হচ্ছে। সকাল এগারোটায় শ্যুটিং। দাদা যথাসময়ে হাজির হল মেক-আপ রুমে। আমি, এ ছবির অন্যতম প্রযোজক ঁপ্রদীপ দাশগুপ্ত (সঞ্জু), এবং পরিচালক বিশু চক্রবর্তী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দাদা প্রশ্ন করলে, 'আজ কোন্ সিন ভাই?'

বিশু চক্রবর্তী এমন একটি মানুষ যাঁকে কোনও ঝড়, কোনও ঝঞ্ঝা আঘাত করতে পারে না। খুব সহজ করে বললেন, 'সামান্য একটা সিন আছে।'

এই কথা শুনে প্রদীপ গম্ভীর। আমিও তথৈবচ। বিশু চক্রবর্তী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে প্রদীপকে সিনটা পড়তে বললেন একটু মৃদু হেসে। প্রদীপ পড়তে আরম্ভ করল।

ওই দৃশ্যে আমি আব দাদা উভয়েই আছি। আপনাদের মনে থাকতে পারে, 'অবাক পৃথিবী' ছবির মধ্যে ওই ছবির নায়ক ফাদার সেনের কাছে (আমি যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম), নিজের জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করছে। সে শটটার ব্যাপ্তি বোধহয় সাত থেকে আট মিনিট ছিল। ওই দৃশ্যের পুরো সংলাপ শোনবার পর দাদাকে কী রকম যেন ক্লান্ত দেখলাম। একটু মুচকি হেসে দাদা বিশু চক্রবর্তীকে বললে, 'এই নাকি তোমাদের সামান্য কাজ! ঠিক আছে। তোমরা লাইট ক্যামেরা সব রেডি করো। হলে আমাকে ডেকো। আমি মেক-আপ করে ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিই।'

লাইট রেডি হয়ে গেল সাড়ে বারোটার মধ্যে। তারপর প্রদীপকে মেক-আপ রুমে পাঠানো হল দাদাকে ডাকতে। প্রদীপ ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে আমার কানে কানে চুপি চুপি বললে, 'দাদা ঘুমোচ্ছে! তাহলে কি ব্রেক ফর লাঞ্চ করে দেবো? একটা বাজতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি।'

বিশুদা বললেন, 'তাই ভাল।'

এই বলে বিশুদা ব্রেক ফর লাঞ্চ বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আওয়াজ পাওয়া গেল 'হরিবোল'। সকলে ঘুরে দেখল যে দাদা চোখ মুছতে মুছতে আসছে আর বলছে, 'এই ফ্লোরে তো 'হরিবোল' বলা ছাড়া ঢোকা যাবে না। তরুণকুমার প্রযোজিত ছবি যে!'

দাদার কথা শুনে সকলে হাসতে আরম্ভ করল। দাদা নিজেও হাসতে লাগল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল, 'রিহার্সাল!'

দাদার কথা শুনে সকলের হাসি কেমন থিতিয়ে গেল। প্রদীপ স্ক্রিপ্টা চুপি চুপি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললে, 'দাদা, একবার পড়ব?'

খুব গম্ভীর ভাবে দাদা জবাব দিলে, 'দরকার নেই।'

এই দরকার নেই কথাটা আমাব যেন মনে হল উত্তমকুমার বলছে না, বলছে 'অবাক পৃথিবী'র নায়ক। সেইদিন সেই মুহূর্তে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল সেটের মধ্যে। অতবড় একটা শট—মাত্র একটা রিহার্সাল এবং একটা টেক। একেবারে পারফেক্ট। আধ ঘণ্টার মধ্যে শটটা দিয়ে ওইরকম গম্ভীরভাবে নিজেই 'প্যাক আপ' বলে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে চলে গেল দাদা; যাবার সময় বিশুদার কাঁধে হাত দিয়ে বলে গেল, 'এক্সকিউজ মি বিশুদা, এরপর আর শট হয় না।'

ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আর দাদাকে দেখতে পেলাম না। দাদার খোঁজ নিতে একজন প্রোডাকসন বয় বললে, 'দাদা ওই শুটিং-এর জামা-কাপড পরেই বাড়ি চলে গেছেন।

এরপর আমি, প্রদীপ আর বিশুদা তর্কে বসে গেলাম। বিশুদা নিজের চরিত্র অনুযায়ী গম্ভীরভাবে বললেন, এরকম হয়। এরই নাম এক্সপিরিয়েন্স, বুঝলে হে।"

প্রদীপ একটু ধর্মভীরু ছিল। সে বললে, 'দ্যাখ তরুণ, কোন অদৃশ্য শক্তি দাদাকে বোধ হয় সাহায্য করে। না হলে আমি দু'বার মাত্র ওঁকে স্ক্রিপ্টটা পড়িয়ে এলাম, পড়াবাব পর নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোলেন, আর আমরা যখন চিন্তা করছি যে ঘুমোচ্ছেন যখন, হয়তো ক্লান্ত. ব্রেক ফর লাঞ্চ দিয়ে উত্তমদাকে খাইয়ে-দাইয়ে একেবারে ক্লান্তি দূর করিয়েই শটটা নেব—সেই মুহূর্তেই দাদা আমাদের অবাক করে দিলে।'

আমি তখন কিছু বলিনি। এ রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল সেই দিনটি থেকে আরও একটি বছর পরে।

সেটা ১৯৫৯ সাল, তারিখটা সাতই ডিসেম্বর। সন্ধে সাড়ে ছ'টা। আমাদের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল। আমার বাবা মারা গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা শ্মশান থেকে ফিরে মা[illegible] ওই রিক্ত বেশ দেখব না বলে বউদিকে মায়ের কাছে রেখে আমরা তিন ভাই নিউ আলিপুরের বা[illegible] চলে গেলাম। মেজদা আর দাদা কেউ হয়তো খবরের কাগজ পড়ছিল, কেউ বা হয়তো কিছু লোকেব সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। আমার যতদূর মনে আছে, আমি মিনিট পনেরো বাদে ডাইনিং হলে রাখা একটি কোচের ওপব শুয়ে পড়েছিলাম। চিন্তা করছিলাম বাড়ির কথা, মায়ের কথা, শেষকালে বাবার কথা। জ্ঞান থেকে বাবাকে যে ভাবে দেখেছি, আর মৃত্যুর দিনে যেভাবে দেখেছিলাম, সেই আমার দেখা তিরিশ বছরের ইতিহাস।

যতদূর মনে আছে নিউ আলিপুরের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম সকাল সাতটার সময়। বেলা এগারোটার সময় মেজদা ডাকলে, 'বুড়ো, চা খেয়ে নে। তুই কী রে! কত লোক এল-গেল, এমন কী মালা সিনহা আর তার বাবা অ্যালবার্ট তোর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'তরুণবাবু চলি'। তুই চোখ খুলে বললি, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' অথচ তুই একটু উঠেও বসলি না।'

আমার মনে হল মেজদা একটু চটেছে। মেজদা আবার বললে, 'আরও অনেক এসেছিলেন। পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত, বিভূতি লাহা প্রভৃতি অনেকে। তাঁরা তোকে ডেকেছিলেন। তুই উঠেওছিলি। কিন্তু কোন কথা না বলে আবার শুয়ে পড়লি! শোক তো তুই একাই পাসনি, আমিও পেয়েছি, দাদাও পেয়েছে। কিন্তু এগুলো ঠিক না!'

আমি মেজদার কথার কোনও প্রতিবাদ না করে ফিবে গেলাম 'অবাক পৃথিবী' ছবির সেই শুটিং-এর দিনে। দুবার স্ক্রিপ্ট শুনে, শুয়ে থেকে, দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে কী করে দাদা ওই শট দেয়! তখনই বুঝে ফেললাম, একটা গুরুতর ভাবনাকে মাথায় নিয়ে যদি শোয়া যায়, এবং তখন তার সামনে যদি মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটে, তাহলেও সেই ভাবনাটাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।..."

তরুণকুমার পেশাদার লেখক নন। তিনি যে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেন, তারও কোনও পরিচয় আমি পাইনি। কিন্তু যে রকম দক্ষতায় তিনি তাঁর জীবনের দুটি ঘটনা ছোট্ট একটি লেখার মধ্যে দিয়ে বিধৃত করেছেন তা আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমার ধারণা উনি যদি নিয়মিত লেখাজোখা করেন তাহলে ওঁর জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটা চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন। সেটা আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের কয়েকটি দশকের একটা দলিল হয়ে থাকবে।

কিন্তু এহ বাহ্য। উত্তমকুমার সংখ্যা প্রকাশের জন্য উনি অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেটাও

একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা।

অভিনেতা তরুণকুমারকে দেখলে আমার কেমন যেন মনে হয়, উনি একটি বর্ণচোরা আম। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একটি হই-চই করা মানুষ। রঙ্গেরসে সর্বক্ষণে টগবগ করছেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একজন ভয়ঙ্কর সিরিয়াস মানুষ। অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত। নিজের সব কাজ ফেলে, বিন্দুমাত্র স্বার্থ না নিয়ে তিনি অন্যেব প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। ডাকলে তো বটেই, না ডাকলেও আসেন। হয়তো খবর পেলেন কারও কোনও বিপদ ঘটেছে। উনি অনতিবিলম্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কোনও কাজে লাগতে পারি কি আমি?

যাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি হয়তো তখন বিপদটা সামলে নিয়েছেন। তরুণকুমারকে তাঁর কোনও প্রয়োজনেই লাগল না। কিন্তু ওঁর এই আন্তরিক ব্যবহারে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। দু'হাত ধরে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন তরুণকুমারকে। কোন বকম বাছবিচার থাকে না। তিনি শত্রুই হোন আর মিত্রই হোন, ধনীই হোন আর নির্ধনই হোন, সকলের ক্ষেত্রেই তিনি উদারহৃদয়।

এই নিয়ে তরুণকুমারের কাছে আমি একবার মৃদু অনুযোগ করেছিলাম। বলেছিলাম : অন্যের বিপদে এমন আন্‌কল্‌ড ফর এগিয়ে যাবার কী দরকাব তোমার? ওরা কি তোমাকে ডেকেছিল বিপত্তারণের ভূমিকা নিতে?

তরুণকুমার হাসতে হাসতে বলেছিলেন : সে তুমি বুঝবে না রবিদা। এগুলো আমাব এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম · ইন্‌ভেস্টমেন্ট! সে কি?

তরুণকুমার বললেন . আমার যদি কখনও বিপদ ঘটে তখন যাতে অন্যেরা এসে আমার পাশে দাঁড়ান, সেই জন্যেই আমার এই 'লাভ-লেবার' দাদন দিয়ে রাখলাম আর কী!

কথাটা বলে আবার হাসতে শুরু করলেন তরুণকুমার। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন: আসল কথাটা কী জানো রবিদা, কেউ বিপদে পড়েছে শুনলে আমি যেন স্থির থাকতে পারি না! আমার ভেতর থেকে কেউ যেন আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় সেখানে।

তরুণকুমারের কথাটা আমার মনে ধরল। বেসিক্যালি যাঁরা গুড ম্যান, তাঁদের সকলেরই বোধহয় এই রকম হয়।

উত্তমকুমার যখন বোম্বাইতে 'ছোটিসি মুলাকাত' ছবি করার সময় বিপদে পড়েছিলেন, তখনও এইরকম ভেতরের তাগিদে নিজের সব কাজকর্ম ফেলে রেখে বোম্বাই ছুটে গিয়েছিলেন তরুণকুমার।

সেই সময়ে উত্তমবাবুর মাথায় কী যে ভূত চেপেছিল কে জানে! তার আগে বেশ কয়েকবার উত্তমবাবুর কাছে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করার অফার এসেছে, কিন্তু উত্তমবাবু তার কোনওটিই গ্রহণ করে নি। সেই সময়ে বোম্বাই মার্কেটে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল যে, উত্তমকুমার পাছে এক্সপোজড হয়ে যান তাই হিন্দি ছবিতে অভিনয় করছেন না। তিনি যে বোম্বাইয়ের বড় বড় অভিনেতাদের চেয়ে লেসার ট্যালেন্টেড, এবং পাছে সেটা ধরা পড়ে যায়, তাই হিন্দি ছবির কাজ নিতে সাহস করছেন না।

এইসব রটনা উত্তমকুমারের ভাল লাগবার কথা নয়। তিনি মনে মনে তেতেই ছিলেন। তাতে ইন্ধন জোগালেন তাঁর কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী। তাঁরা বললেন : গুরু, তুমি নিজে একখানা হিন্দি ছবি প্রোডিউস করে এর মুখের মতো জবাব দিয়ে দাও। দেখিয়ে দাও 'তুম্ ভী কিসিসে কম নেহি'। সত্যিকারের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যে কী দাপট সেটা একবার বুঝিয়ে দাও হিন্দিওয়ালাদের।

উত্তমকুমারকে হিন্দি ছবির প্রোডাকসনে নামানোর ব্যাপারে এইসব সো-কল্‌ড শুভানুধ্যায়ীদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু স্বার্থ ছিল। সেটা বোঝা গিয়েছিল পরবর্তীকালে। নিষেধ করেছিলেন ওঁর আর এক শুভানুধ্যায়ী ছায়াবাণীর অসিত চৌধুরি মশাই। কিন্তু উত্তমবাবু তাঁর নিষেধ শোনেননি। ভাল করে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তিনি হিন্দি ছবির প্রোডাকসনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

এই ছবির জন্যে উত্তমবাবু তাঁর প্রথম জীবনের সেই ছবির কাহিনীটিকেই বেছে নিয়েছিলেন, যেটি তাঁর জীবনের একটি মাইলস্টোন। আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'অগ্নিপরীক্ষা'। হিন্দির জন্যে নামকরণ করা হল 'ছোটিসি মুলাকাত'। পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন তাঁর বন্ধু আলো সরকারকে। সংগীত পরিচালনার

জন্যে বেছে নিলেন শঙ্কর জয়কিষণকে। আর নায়িকা নির্বাচিত করলেন বর্তমান লোকসভার সদস্যা বৈজয়ন্তীমালাকে। বৈজয়ন্তীর তখন দারুণ পপুলারিটি। শঙ্কর-জয়কিষণেরও তাই। তাঁরা দু'জনে রাজ কাপুরের ছবিগুলির গান বলে বলে হিট্ করাচ্ছেন।

তা উত্তমবাবুর এই প্রোডাকসনে গোড়ার দিকে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজকর্ম চলছিল। উত্তমবাবু কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে গিয়ে শুটিং করে আসতেন। বাকি ব্যাপারটা তাঁর ওখানকার শুভানুধ্যায়ীরাই দেখতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ওইসব শুভানুধ্যায়ীদের লুকনো নখ আর দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

উত্তমবাবুর তখন পুরোপুরি নাস্তানাবুদ অবস্থা। পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে উত্তমবাবু প্রোডাকসন বন্ধ করে দেবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে প্রোডাকসনের হাল ধরতে এগিয়ে এলেন তরুণকুমার। কলকাতায় বাংলা ছবিতে তখন তরুণকুমারের হাতে প্রচুর কাজ। সেই সব কাজের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে, কিছু নতুন যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে তিনি বোম্বাই পাড়ি দিলেন দাদাকে রক্ষা করতে। এতে তাঁর কেরিয়ারের বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল বলে আমি পরবর্তীকালে শুনেছি।

সেই সময়ে আমি তরুণকুমারকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম : এই যে তুমি এতবড় ত্যাগ স্বীকার করলে, সেটা কি কেবল তোমার দাদা বলেই?

তরুণকুমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন : শুধু নিজের দাদা কেন, যে কেউ ওই অবস্থায় আমার সাহায্য চাইতেন, আমি তাঁর দিকেই দু'হাত বাড়িয়ে দিতাম। একটা বাঙালির ছেলে অহেতুক বোম্বাইওয়ালাদের হাতে নাস্তানাবুদ হবে, এটা কী সহ্য করা যায়?

বোম্বাইয়ে প্রোডাকসনের কাজে তরুণকুমারের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল। তাই নিয়ে দু-একজন ছদ্মবেশী শুভানুধ্যায়ী উত্তমকুমারের কান ভাঙাতে এসেছিলেন। কিন্তু উত্তমবাবু তাঁদের পত্রপাঠ দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : বুড়োর যদি কিছু ফল্ট থাকে তবে সেটা ওর অনভিজ্ঞতার কারণে। কিন্তু ওর স্পিরিটটাকে আমি সম্মান করি। নিজের কাজ নষ্ট করে ক'টা মানুষ এভাবে এগিয়ে আসতে পারে। বুড়ো আমার হীরের টুকরো ভাই।

তা এই হীরের টুকরো ভদ্রলোকটি আমার একবার প্রচণ্ড উপকার করেছিলেন। আমি তখন প্রসাদ পত্রিকার উত্তমকুমার সংখ্যা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। রীতিমতো নাস্তানাবুদ অবস্থা। সেই সময়ে আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন তরুণকুমার।

তবে ওই বিপদ সম্পর্কে উত্তমবাবু আমাকে গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। উত্তমকুমারকে নিয়ে একটা বড় কিছু করা দরকার, এটা অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম। সেই ভাবনা থেকেই উত্তম-সংখ্যার পরিকল্পনা। তা এই পরিকল্পনা নিয়ে একদিন উত্তমবাবুর সঙ্গে তাঁর ময়রা স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে দেখা করলাম। ওঁর সাহায্য ছাড়া তো এ ব্যাপারে এক পাও এগনো যাবে না, তাই।

তা আমার প্রস্তাব শুনে উত্তমবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন : দূর মশাই, ওসব তো যারা মারা যায় তাদের নিয়ে সংখ্যা-টংখ্যা বেরয়। আমি কী মারা গেছি নাকি?

আমি বললাম : বালাই, ষাট। আপনি মারা যাবেন কেন! আপনাকে এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। আপনাকে সামনে রেখেই তো পরবর্তী কালের শিল্পীরা লড়াই করবে। আর সেই তাদের জন্যেই তো আমার এই উত্তমকুমার সংখ্যা। আপনার জীবিতকালেই তো আপনার অ্যাসেসমেন্ট হওয়া দরকার। আমার তো মনে হয় এটাই সঠিক পদ্ধতি। নইলে মারা যাবার পর চিতার ওপর মঠ তুলে লাভটা কী!

আমার বক্তব্যের আন্তরিকতা বোধহয় উত্তমবাবুর মনটাকে স্পর্শ করেছিল। তাই কিছুটা কিন্তু কিন্তু করেও তিনি মত দিয়েছিলেন। তবে সেই সঙ্গে আমাকে সাবধান করেও দিলেন। বললেন : কাজটা কিন্তু খুব সহজ হবে না। আপনাকে অনেক কিছু অড্ ফেস্ করতে হবে। শত্রুর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যাবে আপনার।

তা সেই উত্তমকুমার সংখ্যার জন্যে আমার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তরুণকুমার। তবে উত্তমবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমাকে একটার পর একটা হার্ডল পেরোতে হচ্ছিল। প্রচুর বাধা-বিপত্তি

আসছিল নানা দিক থেকে। অনেক টিটকারি সহ্য করতে হচ্ছিল।

ওই সময় একদিন রাত্রে ময়রা স্ট্রিটে বসে উত্তমবাবু আমাকে বললেন : একটা ব্যাপারে কিন্তু গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে রবিবাবু। আমাকে ঠিক ঠিক অ্যাসেস্ করতে গেলে কেবল আমার অতীতটাকে জানলেই তো চলবে না। আমার একেবারে রুটটাকে জানা দরকার। কোন্ বংশে আমার জন্ম, কী ধরনের রক্ত আমার ধমনী দিয়ে বইছে, সেটাও আপনার জানা দরকার।

উত্তমবাবুর কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই বললাম : কী বলতে চাইছেন সেটা আরও খোলসা করে বলুন তো।

উত্তমবাবু বললেন : আমি চাইছি আপনি একবার আমাদেব বারাসতের বাড়ি থেকে ঘুরে আসুন। আমাদের এই চাটুজ্যে বংশের মূল তো ওখানেই।

উত্তমবাবুরা যে বারাসতের আদি বাসিন্দা সেটা জানতাম। কিন্তু সেই গ্রামের বাড়ির সঙ্গে ওঁদের কোন যোগাযোগ আছে কী না সেটা জানা ছিল না। তাই বললাম · আপনারা তো সবাই কলকাতায়। বারাসতের বাড়িতে কে থাকেন তাহলে?

উত্তমবাবু বললেন : কে নয়, বলুন কে কে। আমার জ্যাঠতুতো ভাইরা থাকেন, বউদিরা থাকেন, আর থাকেন আমাদের কুলদেবতা। সে এক দারুণ ব্যাপার। যান যান, নিজের চোখেই দেখে আসুন সবকিছু।

আমি বললাম : বেশ, আপনি তাহলে নিয়ে চলুন আমাকে।

উত্তমবাবু বললেন : ওরে বাব্বা, আমার একদম মরবার ফুরসত নেই। নিজের প্রোডাকসনের জন্যে ডেট্ দিতে পারছি না। করবাবু, মানে আমার ছবির ডিরেক্টর অজয় কর মশাই তার জন্যে রাগারাগি করছেন ভয়ানক।

আমি বললাম : তাহলে কী করে যাওয়া হবে?

উত্তমবাবু বললেন : তার জন্যে ভাববার কিছু নেই। বুড়ো আপনাকে নিয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি এ ব্যাপারটা বুড়োই তো আমার মাথায় ঢুকিয়েছে। ওর এই ভাবনাটাকে তারিফ করতেই হয়। আপনি একটু বুড়োর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিন। ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

এর তিনদিন পরেই তরুণকুমারের সঙ্গে দেখা হল। বললাম : বারাসত যাবার ডেটটা ঠিক করে ফেলুন।

তরুণকুমার যেন দারুণ আবাক হয়েছেন সেইভাবে আমার দিকে তাকালেন। বললেন : হঠাৎ বারাসত যাবার বাসনা কেন হল তোমার? সেখানে কী আছে? কোন ফাংশান-টাংশান নাকি?

আমি বললাম : আর ন্যাকামি করতে হবে না। বারাসতে তোমাদের পুরনো বাড়ি দেখতে যাব। এই ব্যাপারটা তো তুমিই উত্তমবাবুর মাথায় ঢুকিয়েছ!

তরুণকুমার বললেন : এঃ, দাদা বলে দিয়েছে তাহলে! দাদার পেটে দেখছি একটাও কথা থাকে না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম : দাদা তো আর তোমার মত বর্ণচোরা নয়। খুব সহজ সরল মানুষ।

তরুণকুমার বললেন : তাহলে তুমি বলতে চাইছো আমি খুব ব্যাঁকা-ট্যারা গোছের লোক?

আমি বললাম : তার থেকেও মারাত্মক। নিজের সব ক্রেডিট অন্যকে যে বিলিয়ে দিতে চায় সে কী সুবিধের মানুষ? এটা খুব খারাপ অভ্যেস। এর পরে একদিন দেখবো কাউকে খুন করে মেরে ফেলে সেই ক্রেডিটটাও অন্যের ঘাড়ে চালান করে দিচ্ছো।

আমার কথা শুনে তরুণকুমার হো হো করে আকাশ ফাটানো হাসি হাসতে লাগলেন। স্পষ্ট দেখলাম হাসির দমকে ওঁর লক্ষ্মীট্যারা চোখ দুটি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওঁদের ভাইদের সবাইকারই চোখ একটু ট্যারা। যাকে বলে লক্ষ্মীট্যারা। উত্তমবাবুর তো বটেই। বরুণবাবুর চোখ অবশ্য ভাল করে লক্ষ করিনি। তাঁরও নিশ্চয় এই রকমই হবে।

তা সেদিন ডেট ফিক্স করে ফেললাম বারাসত যাবার। পরের রবিবার যাওয়া হবে। তরুণকুমার গাড়ি নিয়ে সকাল আটটার মধ্যে আমার বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আসবেন।

তরুণকুমার বললেন : তোমার সঙ্গে আর কে যাবে?

আমি বললাম : কে আবার যাবে! আমার আর কে আছে বল।

তরুণকুমার বললেন : বিমলেটা কোথায়? তাকে তো ক'দিন দেখছি না।

আমি বললাম : তার দুর্দশার কথা আর বোল না। উত্তমকুমার সংখ্যার লেখা জোগাড়ের জন্যে তাকে রাতদিন ঘুরতে হচ্ছে। নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে তার। কেউ দশ লাইনের একটা লেখা দেবেন, তার জন্যে তাঁর পিছনে দশবার ঘুরতে হচ্ছে।

তরুণকুমার বললেন : ওই রোগেই তো বাঙালি মরেছে। উত্তমকুমারকে নিয়ে লেখা যে! নইলে কোনও সাহেবকে নিয়ে লিখতে বল, দশ মিনিটের মধ্যে লেখা হয়ে যাবে। দাদা তো তোমাকে এই জন্যেই আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছিল। তা সে যাককে মরুকগে। শখ করে বংশদণ্ডটি পেছনে নিয়েছো, এখন আর আক্ষেপ করে কী হবে বল। তা তোমার বাড়িটা বিডন স্ট্রিটের ঠিক কোন জায়গায় গো রবিদা?

আমি বললাম : হেদুয়ার ঠিক উত্তর দিকে রাযবাগান স্ট্রিটে। নামেই স্ট্রিট, আসলে ওটা একটা গলি। ওই গলিতে ঢুকে ডানদিকে আর একটা গলি পাবে—

হঠাৎ আমার কথা থামিয়ে দিয়ে তরুণকুমার বললেন : ওরে বাবা, অত গলির গলি তস্য গলির ভিতর ঢুকতে টুকতে পারবো না। আমি হেদোর পাশে গাড়িটা রাখব, তুমি আমায় খুঁজে নিও।

আমি বললাম : এই তো এখনকার দিনের আর্টিস্টদের দোষ। আর পাঁচজনের মতো রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে চায় না। অথচ সুলালদা, মানে জহর গাঙ্গুলিকে দেখেছি রাস্তায় টো টো করে ঘুরতে। কালোদা মানে অসিতবরণ এখনও রেগুলার বাজারে যান।

তরুণকুমার বললেন : সুলালদাদের দিনকাল আলাদা ছিল। তখনকার দিনে মানুষ শিল্পীদের দেখার জন্যে এমন হ্যাংলামি করত না। আর কালোদা যখন নিউ থিয়েটার্সের খুব পপুলার হিবো ছিলেন তখন নিশ্চয় রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতেন না।

আমি বললাম : রাস্তায় ঘুরলে দোষ কী! তাতে তো একটা জনসংযোগ হয়।

তরুণকুমার বললেন : সংযোগ বলে সংযোগ। একেবারে প্রাণান্তকর সংযোগ। একটা ঘটনার কথা বলি শোন। লেক মার্কেটের কাছে একটা ছোট রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে। খানিকক্ষণ পরে তোমার ওই জনসংযোগের ঠ্যালায় একটা ট্যাক্সি ধরে পালিয়ে বাঁচি।

আমি বললাম : কেন, লোকজন কী তোমার ওপর হামলে পড়েছিল নাকি?

তরুণকুমার বললেন : একদম নয়।

আমি বললাম : তাহলে?

তরুণকুমার বললেন : হাঁটতে হাঁটতে মিনিট দশেক পরে দেখলাম আমার পেছনে পেছনে একপাল কাচ্চাবাচ্চা মিছিল করার মতো করে হাঁটছে আর দু'পাশে বারান্দায় মেয়েরা ঝুঁকে ঝুঁকে তাই দেখছে। যেন সার্কাসের কোনও জন্তু হঠাৎ খাঁচা ভেঙে লোকালয়ে এসে পড়েছে। কী যাচ্ছেতাই অবস্থা বল দেখি!

আমি হাসতে হাসতে বললাম : দৃশ্যটা খুবই মনোরম সন্দেহ নেই।

পরের রবিবার আটটা নয়, ন'টার সময় তরুণকুমারের গাড়ি এসে দাঁড়াল হেদোর সামনে। তরুণকুমারের পাশে ওর বউ সুব্রতা। দু'জনেরই চোখে কালো চশমা। দূর থেকে একটা প্রোফাইলে তরুণকুমারকে উত্তমকুমারের মতো দেখতে লাগছিল।

আমি বসন্ত কেবিনের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। গাড়ির পাশে এসে বললাম : তোমাকে একটু নামতে হবে।

তরুণকুমার চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন : কেন?

আমি বললাম : এক ভদ্রমহিলা তোমাকে ডাকছেন।

তরুণকুমারের বয়স যখন আরও কম ছিল, তখন তাঁকে একটা প্রোফাইলে সত্যিই উত্তমকুমারের মতো দেখতে লাগত। আজকের স্থূলদেহী তরুণকুমারকে দেখলে সে কথাটা বিশ্বাস করতে সত্যিই

কষ্ট হবে। বাঙালি শিল্পীরা এই মেদবৃদ্ধির ব্যাপারটা সম্পর্কে কেন যে সচেতন থাকেন না, সেটা আমি বুঝতে পারি না। উত্তমকুমার শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, আসন করতেন। যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় করেন। কিন্তু উত্তমবাবুরও দেখেছিলাম শেষের দিকে শরীরে বেশ মেদ জমে গিয়েছিল। শুধু ব্যায়াম করলেই তো হবে না, খাবার-দাবারের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। এ জিনিসগুলো অনেকেই সিরিয়াসলি ভাবেন না। আজকালকার শিল্পীরা তো নয়ই। ফলে বাঙালি শিল্পীরা অল্প বয়সেই কেমন বুড়িয়ে যান। বম্বেতে দেখেছি একমাত্র কাপুর ফ্যামিলির মানুষজন ছাড়া আর সকলেই শরীর সম্পর্কে ভয়ানকভাবে সচেতন।

কিন্তু শরীরের কথা আপাতত থাক। আবার আমরা ফিরে আসি বিডন স্ট্রিটে, যেখানে হেদোর ধারে গাড়ি নিয়ে তরুণকুমার আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর পাশে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় যাঁর পরিচয় আমার 'স্মৃতিব সরণি'-র পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন বলে আমি মনে করি। তাঁর সম্পর্কেও আমার কিছু বক্তব্য আছে, তবে সেটা আরও খানিকটা পরে, যখন আমি তরুণকুমারের বিশ্বরূপা পর্ব নিয়ে আলোচনা করব।

দূর থেকে তরুণকুমারের গাড়ি দেখতে পেয়ে আমি গাড়ির পাশে গিয়ে বললাম : তোমাকে একজন ভদ্রমহিলা ডাকছেন।

তরুণকুমার চোখ থেকে রোদ চশমাটা খুলে ফেলে আমার দিকে তাকালেন। কণ্ঠস্বরে রসিকতার ছোঁয়া মিশিয়ে বললেন : এক ভদ্রমহিলা তো আমার পাশেই বসে আছেন। এরপর আর এক ভদ্রমহিলার ডাকে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়াটা কী ঠিক হবে রবিদা?

আমি বললাম : যে ভদ্রমহিলা তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন তিনি তোমাব অতি পরিচিত। খুব ছোটবেলা থেকেই তোমাদের আলাপ-সালাপ।

তরুণকুমার বললেন : এই দ্যাখো রবিদা, তুমিও শেষ পর্যন্ত লেগ-পুল করছ। সুব্রতার মনে বিষ ঢুকিয়ে দিতে চাইছ। তোমাদের পাড়ার কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ থাকতেই পারে না। ভবানীপুর হলেও না হয় একটা কথা ছিল। তা ভদ্রমহিলার নাম কী? তিনি কি অভিনয়-টভিনয় করেন।

আমি বললাম : একদম না। তিনি নিতান্তই গৃহবধূ। তোমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক।

তরুণকুমার বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন আমার কথা শুনে। বললেন : তাই নাকি! কী নাম বল তো ভদ্রমহিলার?

আমি বললাম : তাঁর ভাল নামটা আমি জানি না। ডাকনাম অলু।

নামটা শুনে তরুণকুমার লাফিয়ে উঠলেন। বললেন : তুমি কি আমাদের আহিরিটোলার মামাতো বোন অলের কথা বলছ? সে কি তোমাদের পাড়ায় থাকে?

আমি বললাম : শুধু পাড়ায় নয়, একেবারে মুখোমুখি বাড়িতে। দুই বাড়ি থেকে দুই বাড়ির অন্দর মহল পর্যন্ত দেখা যায়।

তরুণকুমার বললেন : কী কাণ্ড দেখ! আমি তো একদম জানতাম না যে অলের শ্বশুরবাড়ি তোমাদের পাড়ায়।

তারপর হাতের ঘড়িটার দিকে একবার দেখে নিয়ে একটু কিন্তু-কিন্তু করে বললেন : এখন তো অলের সঙ্গে দেখা করা যাবে না রবিদা। এমনিতেই আমার আসতে দেরি হয়ে গেছে। এরপর আরও দেরি করলে বারাসত পৌঁছতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। যে জন্যে যাওয়া সেটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

আমি বললাম : তা হোক! অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে তোমাকে নামতেই হবে। আমি বউদিকে কথা দিয়েছি।

তরুণকুমার বললেন : কথা যখন দিয়েছ তখন তো নামতেই হবে। কিন্তু সুব্রতা থাক গাড়িতে। ও নামলে অসুবিধে আছে। মেয়েরা এমন গল্পে মশগুল হয়ে যায় যে আড্ডা থেকে টেনে তোলাই মুশকিল।

আমি বললাম : সেই ভাল। সুব্রতা গাড়িতেই থাকুন। তবে গাড়ির কাচ যেন বন্ধ থাকে। বাইরে থেকে কেউ যেন বুঝতে না পারে যে ভেতরে একজন ফিল্মস্টার বসে আছেন। সেটা জানাজানি হলেই মুশকিল।

তরুণকুমার বললেন : হ্যাঁ, কাচ বন্ধই থাক। তাছাড়া গোপাল তো রইল। আমরা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে আসছি।

গোপাল হলেন তরুণকুমারের গাড়ির ড্রাইভার। কিন্তু বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। গোপালের সঙ্গে এঁরা এমন ব্যবহার করেন যে বাইরের মানুষ ভাবতে পারে গোপাল এঁদের আত্মীয়। উত্তমবাবুর ড্রাইভার ন্যাপার ক্ষেত্রেও তাই। চাটুজ্যেবাড়ির মানুষদের মধ্যে এই কালচারটা আছে।

গাড়ি থেকে নেমে তরুণকুমার আমার পিছু পিছু চললেন বউদির সঙ্গে দেখা করতে। বউদি মানে ওঁর মামাতো বোন অল।

বউদির এই অল্ নামের একটা ইতিহাস আছে। শুনেছি ছোটবেলায় একেবারে পুতুলের মতো দেখতে ছিলেন বউদি। সেই জন্যে উত্তমবাবুরা ওঁর নাম দিয়েছিলেন ডল্। তা ছোটবেলায় বউদিকে কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে উনি আধো-আধো ভাষায় বলতেন, আমার নাম অল্। ওঁর মুখে ডল্টা অল্ হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে সবাই ওঁকে অল্ বলেই ডাকতে শুরু করলেন।

শ্বশুরবাড়িতে এসে অল্ বউদির নামটা পাল্টে আলো হয়ে গেল। ব্যানার্জিবাড়ির ছোট কাকিমা বললেন : অল্ আবার কী নাম! আমি ওকে আলো বলে ডাকব। আমার নাম তো ছায়া। তার সঙ্গে আলো নামটা বেশ মানানসই হবে।

ব্যানার্জিবাড়ির বড় ছেলে গোবিন্দদার সঙ্গে যখন আলো বউদির বিয়ে হয় তখন আমি রায়বাগান স্ট্রিটের পার্মানেন্ট বাসিন্দা। বিয়েতে প্রচুর ধুমধাম হয়েছিল। গোবিন্দদার ভাল নাম রাজেন ব্যানার্জি। গোবিন্দ ওঁর ডাকনাম।,বউভাতের দিন আলো বউদিকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। একেবারে গ্রিসিয়ান ছাঁদের মুখ। 'লেজেন্ডস্ অব গ্রিস অ্যান্ড রোম'-এ গ্রিক দেবীদের যেমন বর্ণনা আছে, অবিকল সেই রকম দেখতে। পববর্তীকালে পাড়াতে যত নতুন বউ এসেছে, তার প্রত্যেকবারই আমি বউদিকে বলতাম : আপনার ফার্স্ট পোজিশনটা এখনও কেউ কেড়ে নিতে পারল না বউদি।

বউদির বিয়ের দিন আহিরিটোলার মামার বাড়িতে উত্তমবাবুরা সবাই এসেছিলেন। কিন্তু বউভাতের দিন একমাত্র মেজোভাই বরুণবাবুই এসেছিলেন। উত্তমবাবু এবং তরুণকুমারের বাইরে শুটিং ছিল সেদিন। রায়বাগান পাড়ার মানুষেরা সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত উত্তমকুমার ও তরুণকুমারকে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি। এবং তার পরও কোনওদিন ওঁরা ফ্লাইং ভিজিট করতে আসেননি আলো বউদির শ্বশুরবাড়িতে।

এটা নিয়ে বউদির মনে একটা চাপা অভিমান ছিল। সেটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। সেই জন্যেই সেদিন তরুণকুমারকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে এনেছিলাম।

বউদির বাড়িতে আসবার আগে তরুণকুমার কিন্তু কিন্তু করছিলেন বটে, কিন্তু ব্যানার্জিদের দরজায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তরুণকুমারের চেহারা আর চরিত্র দুটোই বদলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়েই হাঁক পাড়লেন : কইরে অল কোথায়?

তরুণকুমারের গলার আওয়াজ পেয়ে বউদি শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অভিমান ফুটে উঠল। বললেন : যাও ছোড়দা, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

তরুণকুমার হাসতে হাসতে বললেন : কেন রে, কথা বলবি না কেন?

বউদি বললেন : দু-চারশো মাইল দূরে নয়, এই ভবানীপুরে থাক, অথচ একবার বোনের বাড়ি আসতে পার না।

তরুণকুমার বললেন : কেন রে, এই তো এসে গেলাম।

বউদি তেমনি অভিমানভরা কণ্ঠে বললেন : তুমি কি আজ আমার বাড়িতে এসেছ নাকি! আমি সব জানি, তুমি কেন এ-পাড়ায় পা দিয়েছ!

এর উত্তরে তরুণকুমার কি বলেছিলেন, সেটা আর আমার শোনা হয়নি। আমি নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম বারাসত যাত্রার উদ্দেশ্যে টুকিটাকি গোছগাছ করে নিতে।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম মিনিট দশ পনেরো পরে। দেখি তখন বউদির সঙ্গে বেশ জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন তরুণকুমার। শুধু তিনিই নন, ওঁর দেরি দেখে গাড়িতে সুব্রতাকে রেখে গোপালও এসে জুটেছে।

সেও দিব্যি আড্ডায় জমে গেছে।

সেই আড্ডা ভাঙাতে আরও মিনিট দশেক সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। বারাসতের উদ্দেশে আমাদের গাড়ি যখন রওনা দিল তখন আমার হাতের ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে।

তরুণকুমার তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে একপলক দেখে নিয়ে বললেন : এঃ হে, বড্ড দেরি হয়ে গেল গো রবিদা।

আমি বললাম : বারাসতে খবর দেওয়া আছে তো যে আমরা যাচ্ছি?

তরুণকুমার বললেন : তা আছে। তবে এত দেরি দেখে দাদা আবার পুজোটা না সেরে ফ্যালে।

আমি চমকে উঠলাম তরুণকুমারের কথা শুনে। বললাম : সে কি! উত্তমবাবুও কি বারাসত গেছেন নাকি? উনি তো আমাকে বলেছিলেন যেতে পারবেন না। কাজ আছে।

তরুণকুমার বললেন : ওই দাদা নয়। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি আমার জ্যেঠতুতো দাদা। তিনি আমাদের কুলদেবতার নিত্যপূজা করেন। অদ্ভুত মানুষ। আলাপ হলেই বুঝতে পারবে।

আমি বললাম : তোমাদের কুলদেবতার কী মূর্তি? তোমরা কি শাক্ত, না শৈব, না বৈষ্ণব।

তরুণকুমার বললেন : এর কোনওটাই নয়। আমাদের কুলদেবতার রূপ বর্ণনা করা যায় না। ওটা নিজের চোখে দেখে উপলব্ধি করতে হয়।

আমি অবাক হয়ে গেলাম তরুণকুমারের কথা শুনে। সারা জীবনে অনেক রকম মূর্তিই তো দেখেছি। একটু হেরফের হলেও সেইসব দেবদেবীর একটা স্পষ্ট চেহারা আছে। এঁদের কুলদেবতার চেহারা কি তার চেয়ে স্বতন্ত্র? তরুণকুমারের কথায় ওঁদের কুলদেবতা সম্পর্কে একটা কৌতূহল জেগে উঠল মনের মধ্যে।

নানারকম কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের গাড়ি বারাসতে পৌঁছে গেল। অমৃতবাজার পত্রিকার স্বনামখ্যাত সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষেদের বাড়ি 'শিশিরকুঞ্জ' এই বারাসতেই অবস্থিত। ওঁদের বিশাল কম্পাউন্ডের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি ডানদিকে বেঁকে গেছে, সেই রাস্তাতেই উত্তমবাবুদের আদি বাড়ি। তবে বেশ খানিকটা ভেতরে যেতে হয়।

হঠাৎ ওই রাস্তার ধারেই একটি ছোট্ট একতলা বাড়ির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তরুণকুমার। বললেন : এই বাড়িটা কার জানো রবিদা?

আমি বাড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললাম : কার?

তরুণকুমার বললেন : তোমার তপনদার 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিটার কথা মনে আছে? তাতে যিনি মেহের আলির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সেই বিখ্যাত 'তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়', সেই রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এটা।

আমি বললাম : আরে, আমি তো ভদ্রলোককে বেশ ভালভাবে চিনি। আমার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ আলাপ আছে। আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার অফিসে বহুবার গেছেন। প্রচুর আড্ডা দিয়েছি ওঁর সঙ্গে। তা ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হত না?

তরুণকুমার বললেন : এখন আর হবে না রবিদা। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বিকেলের দিকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে রবিদা বাড়িতে আছে কিনা। তখন আসা যাবে। রবিদা আবার আমাদের আত্মীয় হন।

আমি বললাম : তাই নাকি!

তরুণকুমার বললেন : হ্যাঁ তাই। তবে আত্মীয় বলে নয়, দাদা ওকে খুব ভালবাসে ওর অভিনয়ক্ষমতার জন্যে। টেরিফিক অ্যাকটর।

একজন অ্যাকটরের মুখে তার সমকালীন আর একজন অ্যাকটরের প্রশংসা শুনে খুব ভাল লাগল। এটা সচরাচর দেখা যায় না। তবে তরুণকুমারের ব্যাপারটা আলাদা। উনি আলাদা জাতের মানুষ।

তবে এই যে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তরুণকুমার 'টেরিফিক অ্যাকটর' বিশেষণটি ব্যবহার করলেন এটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি। তখন সিংহর 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে মেহের আলির চরিত্রে ওঁর অভিনয় দেখে তো চমকে উঠেছিলাম। তারপর থেকে প্রচুর ছবিতে দারুণ দারুণ অভিনয় করেছেন উনি। তবে আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে পীযূষ বসু পরিচালিত 'সুভাষচন্দ্র' ছবিতে ওঁর অভিনয়।

সুভাষচন্দ্রের শিক্ষক বেণীমাধব দাসের চরিত্রে কী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন রবীনবাবু, যেটা আজও ভুলতে পারিনি। অথচ ওই মানুষই আবার 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে ভিলেন ডাক্তারের চরিত্রে যখন অভিনয় করেন তখন সাধারণ মানুষ হয়তো ভেবে নিতে পারে যে লোকটার চরিত্রই ওইরকম। এত চরিত্রানুগ ওঁর অভিনয়।

অথচ রবীনবাবু সিনেমা জগতে তেমন ভাবে নিজের স্থান করে নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় চলে যেতে হল। যাত্রাজগতেও তিনি তুফান তুলেছিলেন তাঁর অভিনয়ের দাপটে। কিন্তু সেটাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার প্রধান কারণ ওঁর মদ্যপানের প্রতি আসক্তি। মদ তো অনেকেই খান, কিন্তু রবীনবাবু যেভাবে মদের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলেন তা বড়ই মর্মান্তিক।

আমার ধারণা রবীনবাবুর এই মদ্যপানের প্রতি আসক্তি জন্ম নিয়েছিল ফ্রাস্ট্রেশন থেকে। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেও তাই মনে হত। ওঁর থেকে অনেক লেসার ট্যালেন্টেড অভিনেতা ওঁর থেকে অনেক বেশি সম্মান, অনেক বেশি অর্থ পেতে লাগলেন দেখে উনি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। মদ নামক বিষ পান করে নিজেকে জর্জরিত করে ফেললেন। অকালেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে তরুণকুমারদের আদি বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম সেখানে। পুরনো আমলের একখানি দোতালা বাড়ি। আধুনিকতার ছোঁয়া নেই এ-বাড়ির কোথাও, কিন্তু এর প্রতিটি ইটের গায়ে আভিজাত্যের ছোঁয়া লেগে আছে। বাড়িতে পা দিয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল।

বাড়ির মতোই এ-বাড়ির অধিবাসীদের সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছোঁয়া। সহজ সরল বেশবাসে সাধারণ কয়েকজন নরনারী, কিন্তু কথায় বার্তায় পরিশীলিত। তরুণকুমারের দাদা-বউদিরা সবাই আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। উত্তমকুমার কিংবা তরুণকুমার যে ওঁদের বংশের সন্তান, এ নিয়ে ওঁদের গর্ব আছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে যে এঁরা ধন্য তেমন আদেখলেপনা নেই এতটুকুও। এঁরা যা ঠিক সেইভাবেই নিজেদের প্রোজেক্ট করেন। এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই। বরং নিজেদের প্রাচীন আভিজাত্যের দম্ভ আছে।

উত্তমকুমারের বাবা প্রয়াত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও ঠিক এই ধরনের আভিজাত্য দেখেছি, যেটা তিনি এই বারাসত থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তমকুমার যখন খ্যাতির তুঙ্গে, দুহাতে পয়সা রোজগার করছেন, কনিষ্ঠ পুত্র তরুণকুমার চিত্র ও মঞ্চজগতের একজন নামকরা অভিনেতা, তখনও তিনি মেট্রো সিনেমার একটি তুলনায় অকিঞ্চিৎকর চাকরিতে স্থির থেকেছেন। পরিবারের মানুষেরা অনুযোগ করলে তিনি মৃদু হেসে তাঁদের কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। শারীরিক সক্ষমতা থাকা পর্যন্ত সেই চাকরিই করে গেছেন। পুত্রদের ওপর নির্ভরশীল হতে চাননি। এমনই ছিল তাঁর মানসিক দৃঢ়তা। এরই নাম আভিজাত্য। এটা তিনি আহরণ করেছিলেন বারাসতের এই চাটুজ্যেদের আদি বাড়ি থেকে।

এখানে এসে সুব্রতাও যেন কেমন হঠাৎ বদলে গেলেন। এতক্ষণ তাঁর চোখে ছিল কালো রঙের রোদ চশমা। সারা রাস্তাটা হাসি আর মস্করা করতে করতে এসেছেন। এখানে যখন গাড়ি থেকে নামলেন তখন তাঁর মাথায় একমাথা ঘোমটা। রোদ-চশমা স্থান নিয়েছে ভ্যানিটি ব্যাগের অন্দরে। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন সুশীলা গৃহবধূর মতো। ভাসুরদের সকলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আমরাও বাদ পড়লাম না। তারপর জায়েদের সঙ্গে গলাগলি করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। আমাদের পাতে দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য পরিবেশন করলেন সুব্রতাই। বড় ভাল লাগছিল ওকে দেখে।

আমি কিছুতেই আগেকার সুব্রতার সঙ্গে ওকে মেলাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না, এই কি সেই সুব্রতা সেন যে একদা বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের আখড়ায় শরীরচর্চা করত, তাঁদের ট্যাবলোতে অংশগ্রহণ করত।

এর সবটাই কি এই বাড়ির, অথবা এবাড়ির কুলদেবতার মহিমা? কুলদেবতাকে দেখে আমি সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। মূর্তি বলতে কিছুই নেই। বাড়ির সামনে একটি প্রাচীন বটগাছ। সেই গাছের কাণ্ডের

কিছুটা অংশে ঠিক অবিকল মানুষের মতোই নাক-চোখ-মুখ স্পষ্ট। সেই মুখ এবং তার পাশের কিছুটা অংশে সিঁদুর লেপা। উত্তমবাবুদের সর্বজ্যেষ্ঠ জ্যেঠতুতো ভাই প্রতিদিন দুইবেলা ভক্তিভরে এই কাষ্ঠমূর্তির পূজা করেন। স্থানীয় মানুষজন অসম্ভব ভক্তি করেন এই দেবতাকে। তাঁদের সকলের ধারণা চাটুজ্যেবাড়ির সব উন্নতির মূলে এই দেবতার কৃপা।

হয়তো তাই, হয়তো নয়। কিন্তু আমি তা নিয়ে আর বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবকাশ পেলাম না। কারণ ততক্ষণে কালাপাহাড়ের মতো সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন আমার আর এক প্রিয় শিল্পী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু এ কোন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি দেখছি। ইনি কি আমার সেই অতি পরিচিত সুদর্শন সুভদ্র শিল্পী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডার মধ্যে দিয়ে আমাদের সবাইকে মোহিত করে রাখতেন?

তরুণকুমারের সঙ্গে সুব্রতার বিয়ে হয়েছিল ১৯৬২ সালে। সুব্রতার পদবী ছিল তখন সেন। অভিনেত্রী হবার জন্যে সুব্রতা অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। তখন ও বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের আখড়ায় নিয়মিত দেহচর্চা করত। মনতোষবাবু তখন প্রায়ই তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পেশী-প্রর্দশনী করতেন বিভিন্ন জায়গায়। সেই সব শোয়ের শেষে একটা আশ্চর্য-সুন্দর আইটেম থাকত। সময় লাগত মিনিট কুড়ি-পঁচিশ। সেই আইটেমগুলি রচিত হত বিভিন্ন মনীষীর জীবনকথার ওপর ভিত্তি করে। কখনও যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে, কখনও গৌতমবুদ্ধকে নিয়ে। সেই আইটেমগুলিতে অন্যান্যদের সঙ্গে সুব্রতা ছিল মাস্ট। সেখানে শারীরক্রিয়া প্রদর্শনের সঙ্গে কিছুটা অভিনয়েরও প্রয়োজন হত। ওই পঞ্চাশের দশকে ওইরকম একটি প্রদর্শনীতে আমি সুব্রতাকে প্রথম দেখি।

সেই সময়ে আমি কিছুদিনের জন্য 'কল্পনা' নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম সহকারী সম্পাদক হিসেবে। সম্পাদক ছিলেন 'স্বয়ংসিদ্ধা' উপন্যাসের খ্যাতিমান লেখক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিলালবাবু বয়স্ক মানুষ। বেশি দৌড়দৌড়ি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই পত্রিকার মুখ্য দায়িত্বভার আমাকেই বহন করতে হত। সেই সময়ে আমাদের পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত একটি ছেলে একজন তরুণীর ছবি এনে আমাকে বললে : এই ভদ্রমহিলা পেশাদার শিল্পী হিসেবে অভিনয় করতে ইচ্ছুক। আপনি যদি এঁর একটা ছবি ছেপে দেন তাহলে প্রযোজক-পরিচালকদের নজরে পড়তে পারেন ইনি।

ছেলেটি আমার হাতে ছবিটা দিতেই আমি মেয়েটিকে চিনতে পারলাম। ইনিই সেই মনতোষ রায়ের গ্রুপের ট্যাবলো-অভিনেত্রী। কিন্তু তখন ওইভাবে একটি অভিনয়েচ্ছু মহিলার ছবি পত্রিকার পয়সায় ব্লক করে ছাপার একটু অসুবিধা ছিল। কর্তৃপক্ষ অন্য কিছু মনে করতে পারতেন। তাই আমি ছেলেটিকে বললাম : তুমি যদি এই ছবিটার ব্লক তৈরি করে এনে দিতে পার তাহলে আমি ছেপে দিতে পারি। আমাদের পক্ষে ব্লক করার অসুবিধা আছে।

দিন তিনেকের মধ্যেই ছেলেটি সুব্রতা সেনের একটা মিনিমাম সাইজের ব্লক তৈরি করে এনে দিয়েছিল। আমি 'কল্পনা' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় সেটি ছেপেও দিয়েছিলাম। বিনিময়ে আশা করেছিলাম সুব্রতা সেনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি আসবে। কিন্তু সেরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি।

সুব্রতা সেন বিশ্বরূপা মঞ্চে অভিনয় শুরু করার পর ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। স্টার থিয়েটারে যখন ও অন্যতম নায়িকা করছিল তখন থেকে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু আমি কোনদিন ওকে কল্পনা পত্রিকায় ছবি ছাপা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করিনি। হয়তো সুব্রতা ছবি ছাপার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ঠিকই, তবে সেটা আমার বদলে সেই ছেলেটির বরাতে জুটেছে। কমবয়সী উঠতি অভিনেত্রীদের তো প্রচুর গুণগ্রাহী থাকে। সেই ছেলেটি হয়তো তাদেরই একজন। সুব্রতা তাকেই হয়তো 'কল্পনা' পত্রিকার কেষ্টবিষ্টু ভেবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

তবে এই ঘটনাটা উল্লেখ করার মতো কোনও ঘটনা বলে আমি মনে করি না। ব্যাপারটা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন হঠাৎ তরুণকুমার প্রসঙ্গে সুব্রতার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল। এরকম

নেপোয় দই মারার ঘটনা আমাদের ফিল্ম লাইনে প্রায়শই ঘটে কিনা! এগুলো কৌতুক কাহিনী হিসেবে জমে ভাল।

যাক, যেটা বলছিলাম সেটাই বলি। সুব্রতার সঙ্গে তরুণকুমারের বিয়ের কথা। সুব্রতা যখন বিশ্বরূপায় অভিনয় করছে তরুণকুমার তখন সেখানকার অন্যতময় নায়ক। বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'ক্ষুধা' নাটকে কালী ব্যানার্জী, বসন্ত চৌধুরি আর তরুণকুমার তখন একদম ফাটাফাটি কাণ্ড করছেন। দর্শকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে ওই নাটকখানা।

ওই সময়ে একটা কম্বিনেশান নাইট হল বিশ্বরূপায়। একটা ঐতিহাসিক নাটক। তাতে তরুণকুমার আর সুব্রতা দু'জনেই ছিলেন। সেই নাটকের ইনটারভ্যালে তরুণকুমার তার রাজকীয় জুতোজোড়াটা উইংসের পাশে খুলে রেখে একটা চেয়ারে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সুব্রতা সেখান দিয়ে যাবার সময় চলার পথে একজোড়া জুতো পড়ে থাকতে দেখে বলে উঠলেন : এই মরেছে, এখানে আবার কে জুতো খুলে রেখে গেল।

এই বলে সুব্রতা পা দিয়ে জুতো জোড়াটাকে ওখান থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

তরুণকুমার বসে ছিলেন আধো-অন্ধকারে। তিনি ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর বাঘের মতো গলায় বলে উঠলেন : এই মেয়েটা! এটা কী হল?

সুব্রতা দেখেননি ওখানে তরুণকুমার বসে আছে। তিনি ওইরকম গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে থতমত খেয়ে গেলেন। কী করবেন অথবা কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

তরুণকুমার আবার বললেন : বড়দের জুতো ওইভাবে পা দিয়ে কিক্ করতে তোমার লজ্জা করে না। যাও, হাত দিয়ে জুতো দুটো তুলে যেখানে ছিল সেখানে রেখে এসো।

এইরকম অপমানকর কথা শুনে সুব্রতার দুচোখ জলে ভরে গেল। কিন্তু তিনি কোনও কথা না বলে হাত দিয়ে জুতোজোড়াটাকে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

সেই হল পূর্বরাগের সূত্রপাত। তবে কেবলমাত্র সুব্রতার মনেই।

ঘটনাটা শুনেছিলাম তরুণকুমারের মুখ থেকে। শুনতে শুনতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : প্রেমের ব্যাপারটা কি কেবল সুব্রতার দিক থেকেই একতরফা ছিল? তোমার দিক থেকে কি সেরকম কিছু হয়নি?

তরুণকুমার বললেন : একদন না। আমার তখন প্রেম করবার অবসর কোথায়! আমি তো তখন বিপ্লবীদের মতো একনিষ্ঠ।

আমি বললাম : কী সর্বনাশ! তুমি কি বিপ্লবের রাজনীতিও করতে নাকি?

তরুণকুমার বললেন : পাগল হয়েছে! আমি চিরকালই রাজনীতি থেকে হাজার হাত দূরে।

আমি বললাম : তবে যে বললে বিপ্লবীদের মতো একনিষ্ঠ?

তরুণকুমার বললেন : তার মানে বিপ্লবীদের সামনে যেমন একটিই লক্ষ্য ছিল দেশমাতৃকার মুক্তি। আমারও তেমনি লক্ষ্য ছিল কেমন করে বড় অভিনেতা হওয়া যায়। বিশেষ করে যখন বিশ্বরূপা মঞ্চে একই সঙ্গে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো পরিচালক আর নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর সন্তোষ সিংহের মতো অভিনয় শিক্ষক পেয়েছি। অমৃদের আস্বাদ যে পেয়েছে তার কাছে কি ওইসব প্রেম-ট্রেমের মতো পানসে ব্যাপারের কোনও আকর্ষণ থাকে রবিদা!

আমি বললাম : তাহলে তোমাদের বিয়েটা ঘটল কী করে? একটা পক্ষ একেবারে প্রেমহীন হয়ে থাকলে সেটা কি সম্ভব?

তরুণকুমার বললেন : আমারও প্রেম এসেছিল, তবে অনেক দেরিতে। তার আগে জয়শ্রী সেন আমাকে বললেন, সুব্রতা নাকি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি সে কথার কোনও গুরুত্ব দিলাম না। তারপর কালীদা যেদিন আমাকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ইত্যাদি বলে তিরস্কার করলেন সেদিন থেকে আমি সচেতন হলাম সুব্রতার ব্যাপারে। ওকে সঙ্গে নিয়ে ইংরিজি সিনেমা দেখতে লাগলাম। ওর মনের গভীরতা বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। মানে ওর কালচারাল লেভেলটা যাতে আমার কাছাকাছি আনা যায় তার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমি বললাম : তারপর?

তরুণকুমার বললেন : তারপর একদিন সুব্রতা সেন সুব্রতা চ্যাটার্জি হয়ে গেল। তারিখটা ছিল ১৯৬২ সালের ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন।

শুধু নিজের বিয়েই নয়, মহুয়া রায়চৌধুরিরও বিয়ে দিয়েছিলেন তরুণকুমার। তরুণকুমার একা নন, ওঁর সঙ্গে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। মহুয়া তখন তরুণকুমারদের তপন থিয়েটারে অভিনয় করছে আর তিলক চক্রবর্তীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু এ বিয়েতে মহুয়ার বাড়ি থেকে প্রচণ্ড আপত্তি।

এমত অবস্থায় মহুয়া আর তিলককে একদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওদের চার হাত এক করে দিলেন তরুণকুমার। এর জন্যে একটু বেনিয়মের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁকে। সাধারণত এক মাসের নোটিশ দিতে হয় রেজিস্ট্রারের কাছে। কিন্তু তরুণকুমার তাঁর প্রভাব খাটিয়ে এক মাসটাকে এক দিনে পরিণত করেছিলেন। তারপর মহুয়াকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে।

এ ব্যাপারটা মহুয়ার বাবা নীলাঞ্জনবাবু সহজে মেনে নেননি। তিনি ভবানীপুর থানায় তরুণকুমারের নামে মহুয়াকে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার অভিযোগ আনলেন।

উর্ধ্বতন পুলিশ মহলে তরুণকুমারের বিশেষ পরিচিতি ছিল। আজও আছে। তিনি তৎকালীন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বীরেন সাহার পরামর্শ চাইলেন। সব ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনে বীরেনবাবু বললেন : ঠিক আছে। ভাববার কিছু নেই। মহুয়া তো আর নাবালিকা নয়।

ওদিকে ভবানীপুর থানা নীলাঞ্জনবাবুকে বললেন : আপনার অভিযোগ টিকবে না মশাই। মহুয়া যদি আমাদের কাছে বলে যে সে স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে গেছে, বিয়ে করেছে, তখন তো আপনিই ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন। কাজেই যা হয়ে গেছে সেটাকে মেনে নিন। তিলক চক্রবর্তী তো ভাল ছেলে, ভাল চাকরি করে। এ বিয়েটা আপনার মেনে নেওয়াই উচিত।

নীলাঞ্জনবাবু সে পরামর্শই মেনে নিয়েছিলেন। সাময়িকভাবে তরুণকুমারের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারপর থেকে তরুণকুমার তাঁর পরম শুভানুধ্যায়ী। মহুয়ার মৃত্যুর সময় তরুণকুমার আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছিলেন, তার তো তুলনা হয় না।

এইভাবে নানা জনকে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন তরুণকুমার। আমার তো মনে হয় তাঁর নামটা তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় না হয়ে বিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায় হলেই বোধহয় মানাতো ভাল।

তরুণকুমারের জন্ম ১৯৩১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলায় মামার বাড়িতে। ওঁদের সব ভাইয়েরই জন্ম আহিরিটোলায়। উত্তমকুমার জন্মেছেন ১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। তারপর বরুণকুমার। ওঁর জন্মসালটা জানি না। অঙ্কের হিসেবে উত্তমকুমারের সঙ্গে তরুণকুমারের বয়সের তফাৎ সাড়ে চার বছরের। তবে দেখলে সেটা মনে হত না। মনে হত যেন দুই বন্ধু। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য তাইই ছিলেন দুজনে দুজনের কাছে।

তরুণকুমারের ডাক নাম বুড়ো। ওটা রেখেছিলেন ওঁর পিসিমা। খুব অল্প বয়স থেকেই স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন তরুণকুমার, যেটা উত্তমকুমারও পারেননি। ওইভাবে কথা বলতে দেখেই পিসিমা বুড়ো নামকরণ করেছিলেন। সিনেমা লাইনে এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে তরুণকুমার 'বুড়ো' নামেই সমধিক পরিচিত।

অভিনয়ের ব্যাপারটা তরুণকুমারের মধ্যে সেই শৈশব থেকেই ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই পাড়ায় বৈশাখী ক্লাবে অভিনয় করেছেন। প্রথম অভিনয় 'সাজাহান' নাটকে সিপারের চরিত্রে। উত্তমকুমার ওই নাটকে দিলদারের চরিত্রটি করেছিলেন।

চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় পরিচালক অর্ধেন্দু সেনের 'হ্রদ' ছবিতে। সেটা ১৯৫৪ সাল। বিমল করের এই মনস্তাত্ত্বিক গল্পটির নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তিনি। ফলে সে বছরের উল্টোরথ পুরস্কারটি তাঁর হাতেই এসেছিল। তখনকার দিনে উল্টোরথ পুরস্কারের গুরুত্ব বি এফ জে এ পুরস্কারের মতোই ছিল।

ঠিক তার চার বছর পরে তরুণকুমারও উল্টোরথ পুরস্কার পেয়ে গেলেন 'অবাক পৃথিবী' ছবিতে ফাদারের চরিত্রে অভিনয় করে। উত্তমকুমারের চার বছর পরে জন্মেছেন তরুণকুমার। অভিনয়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দাদার থেকে চার বছর পরেই পেলেন তিনি। অঙ্কের এই হিসেবটা আমার কাছে

ভারি মজার লাগে।

'অবাক পৃথিবী' ছবির প্রযোজক ছিলেন তরুণকুমার। মধুসংলাপী নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ছিলেন এ ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। পরিচালনা করেছিলেন বিশু চক্রবর্তী।

বিধায়কদার সঙ্গে তখন তরুণকুমারের খুবই ঘনিষ্ঠতা। বিশ্বরূপা মঞ্চে তাঁর লেখা 'ক্ষুধা' নাটকে গজার চরিত্রে অভিনয় করে দারুণ নাম করেছেন তরুণকুমার। নিজের প্রযোজিত প্রথম ছবিতে তাই সেই বিধায়ক ভট্টাচার্যের নামটাই ভেবেছিলেন তরুণকুমার। আর যেমন রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল, তেমনি ছবির গল্প ভাবার আগেই নায়কের নামটি ভেবে রাখা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, সে নামটি হল উত্তমকুমারের।

'অবাক পৃথিবী' ছবির চিত্রনাট্য লেখার পর একটি অসাধারণ পার্শ্বচরিত্র বেরিয়ে এল সেই চিত্রনাট্য থেকে। সে চরিত্রটি এক বৃদ্ধ ফাদারের। এবং যে চরিত্রে অভিনয় করবার মতো একজন শিল্পীই আছে। তিনি হলেন ছবি বিশ্বাস।

ছবি বিশ্বাসকে চিত্রনাট্য শোনানোর ভার পড়ল তরুণকুমারের ওপর। ছবিদা বললেন : পুরো স্ক্রিপ্টটা আমাকে শোনাতে হবে না। গল্পটা বল, আর আমাকে যে চরিত্রটা করতে হবে সেটা ডিটেইলে পড়।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁর চরিত্রটা শুনলেন ছবি বিশ্বাস। তারপর বললেন · বাঃ, চমৎকার স্ক্রিপ্ট পড়িস তো তুই। তা এই চরিত্রটা আমাকে না দিয়ে-তুই নিজেই কর না।

তরুণকুমার বললেন . পাগল হয়েছেন ছবিদা! এরকম একটা হেভি রোল আমি করব তেমন কথা আপনি ভাবলেন কেমন করে!

ছবিদা এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তরুণকুমারের মুখের দিকে। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তুই একবার বিশুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। আজকালের মধ্যেই।

বিশু অর্থে এই ছবির পরিচালক বিশু চক্রবর্তী। বিশুবাবু তার পরের দিনই দেখা করলেন ছবিদার সঙ্গে। ছবিদা বললেন : দেখ বিশু, আমি তোদের ছবিতে অভিনয় করতে পারবনি। আমার হাতে অন্য ছবির কাজ আছে। আই অ্যাম স্যরি।

বিশুবাবু বললেন : সর্বনাশ! তাহলে কী হবে ছবিদা? ওই চরিত্রে অভিনয় করার লোক আমি কোথায় পাব?

ছবিদা বললেন : আমার একটা সাজেসান আছে। সেটা নিস্ তো বলি।

বিশুবাবু বললেন : কী সাজেসান?

ছবিদা বললেন : আমার ওই চরিত্রটা তোরা বুড়োকে দিয়ে করা।

বিশুবাবু চম্‌কে উঠলেন কথাটা শুনে। বললেন : বুড়ো ভাল অভিনয় করতে পারে জানি। কিন্তু তা বলে এই রোলটা—

বিশুবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ছবিদা বলে উঠলেন : নয় কেন? যোগ্য শিল্পীকে তার মর্যাদা দিতে তোদের এত কার্পণ্য কেন রে? ছবি বিশ্বাস কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? নতুন শিল্পী তৈরি করতে হবে না? বুড়ো এক ঘণ্টা ধরে নানা ভাবে অ্যাকটিং করে যে ভাবে চরিত্রটা আমাকে শোনাল তাতে তো আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি বলছি এই চরিত্রটা বুড়োকেই দে। তোরা একটা ভাল ডিভিডেন্ড পাবি।

বিশুবাবু আর কোনও কথা না বলে উঠে এলেন সেখান থেকে। পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন, উত্তমবাবুর কাছে। সব শুনে উত্তমবাবু বললেন : অন্ধকারে হেঁটে লাভ কী বিশুদা। ছবিদা যখন বলছেন তখন বুড়োকে দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কী হয়!

'অবাক পৃথিবী' ছবির সেই ফাদারের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করলেন তরুণকুমার। তারপর থেকে অন্তত চার-পাঁচশো ছবিতে আমি ওঁর অভিনয় দেখেছি। কখনও নায়ক, কখনও সহ-নায়ক কখনও বা অতি ক্ষুদ্র কোনও চরিত্র। কিন্তু 'অবাক পৃথিবীর ফাদার সব থেকে বেশি উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার চোখে।

এবারে যে কারণে আমি একদিন গভীর রাত্রে হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালে তরুণকুমারের কাছ থেকে 'ভিন্‌ডিকটিভ' উপাধি পেয়েছিলাম, সেই ঘটনাটার কথা বলি। ওটা অন্য কারণেও হতে পারে। তবে আমার অনুমান 'নহবত' নাটকের সমালোচনার কারণ ছিল এর পেছনে।

তরুণকুমার আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়দের কল্পতরু গোষ্ঠী প্রথম যখন দক্ষিণ কলকাতার তপন থিয়েটারের দায়িত্ব নিলেন তখন সেখানে তাঁদের প্রথম নাটক ছিল 'নহবত'। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এবং পরিচালনা। এর আগে রঙমহল থিয়েটারে 'নহবত' অনেকদিন চলেছিল।

তপন থিয়েটারে 'নহবত' নাটকে তরুণকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল প্রমুখ কল্পতরু গোষ্ঠীর অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে বিকাশ রায়, প্রদীপ মুখার্জি, মহুয়া রায়চৌধুরি প্রভৃতি শিল্পীরাও ছিলেন। তা সত্ত্বেও তপন থিয়েটারে তখন দর্শক হচ্ছিল না। কাজেই ওঁরা অনুভব করলেন খবরের কাগজের লোকজনদের দেখিয়ে কিছু রিভিউ দরকার।

আমি তখন দেশ পত্রিকায় কাজ করি। নিয়মিত কাজের বাইরে সিনেমা-থিয়েটারের রিভিউ লিখি। একদিন দুপুরে আমাদের আনন্দবাজার অফিসে বিকাশ রায় এলেন। এসেই সোজা ঢুকে গেলেন দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের ঘরে। একটু পরেই আমার ডাক পড়ল ওই ঘরে। আমাকে দেখে সাগরদা বললেন : রবি, বিকাশ এসেছে ওদের 'নহবত' নাটকের রিভিউর ব্যাপারে। তুমি কবে দেখতে যেতে পারবে সেটা বিকাশের সঙ্গে কথা বলে নাও।

আমি বিকাশদার সঙ্গে কথা বলে একটা ডেট ঠিক করে নিলাম। যাবার সময় বিকাশদা বলে গেলেন : একটু দেখিস ভাই রবি, তোদের রিভিউর ওপর একটা গ্রুপ আর অনেকগুলো মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

নাটকটা দেখলাম। এর আগে রঙমহলে দেখেছিলাম। ভাল লেগেছিল। এবারে নাটকে নতুন কিছু সংযুক্তি ঘটেছে। তার ফলে আরও বেশি ভাল লাগল। কেবল একটাই ত্রুটি নজরে পড়ল। তরুণকুমার তাঁর অভিনয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু এক্সটেম্পো দিচ্ছিলেন। সেগুলি দর্শকরা প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলেন। কিন্তু ওই ব্যাপারটা মূল নাটকটাকে থামিয়ে দিচ্ছিল। বার বার এই ঘটনায় রসভঙ্গ ঘটছিল। আমার কাছে সেটা বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল।

আমি মন খুলে নাটকটার দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলাম। সাধারণত দেশ পত্রিকার রঙ্গজগৎ বিভাগটি সিনেমা রিভিউ দিয়ে শুরু হয়। আমি সেই সংখ্যায় নাটকটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। একটি বড় ছবিও দিয়েছিলাম লেখার শুরুতে, যাতে রিভিউটি বিশেষত গুরুত্ব পায়। সেই রিভিউতে অবশ্যই তরুণকুমারের সমালোচনা করা হয়েছিল।

পরের দিন বিকাশদা টেলিফোন করে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 'নহবত' নাটকের ওই দীর্ঘ সমালোচনার জন্য। তার দিন চারেক পরেই হোটেল হিন্দুস্থানে তরুণকুমারকে পানরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি আরও কিছু অভিনন্দনের প্রত্যাশায় ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি আমাকে দেখে বলে উঠলেন : তোমার মতো ভিনডিকটিভ মানুষ আমি আর একটিও দেখিনি রবিদা!

কথাটা শুনে আমি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলাম। একটিও কথা না বলে ওখান থেকে চলে এসেছিলাম।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তরুণকুমারের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু আজও তিনি আমাকে দেওয়া তাঁর সেই 'ভিনডিকটিভ' বিশেষণটি প্রত্যাহার করেননি। কবে করবেন তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে একাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাংবাদিক রবি বসু।

সন্ধ্যা রায়

শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়কে আমি গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা রূপে তাঁকে আমি দেখেছি। স্টুডিওর ফ্লোরে তাঁর কর্মনিষ্ঠরূপ দেখেছি, স্টুডিওর বাইরে পরিশীলিত আলাপচারিতায় দেখেছি। বিশ্বজিতের টালিগঞ্জের বাড়িতে আড্ডাধারী রূপে দেখেছি সন্ধ্যা রায়কে। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে একজন কৌতুকময়ী মানুষ লুকিয়ে আছে, সেটা কোনদিনই জানতে পারতাম না, যদি না প্রয়াত প্রোডাকসন কন্ট্রোলার দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ঘটনাটি না শুনতাম। সেটা দিয়েই সন্ধ্যা রায়কে নিয়ে লেখাটা শুরু করছি।

কিন্তু ওই ঘটনাটাকে কৌতুকের কাহিনী বলব না ভৌতিক কাহিনী বলব, সেটাই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তবে সেটা বিচারের ভারটা নিজের কাঁধে না রেখে আমার মনে হয় পাঠকদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু তার আগে দিলীপবাবুর একটু পরিচিতি দেওয়া আবশ্যক। তাহলে কাহিনীর সত্যাসত্য নিরূপণের সুবিধা হবে।

পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর প্রোডাকসন ইউনিটটি সাজিয়েছিলেন কলকাতার সেরা মানুষদের নিয়ে। প্রত্যেকটি বিভাগে তনুবাবু তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কালচারের দিকটিতেও বিশেষভাবে নজর দিতেন। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর প্রোডাকসন কন্ট্রোলার। কিন্তু ওই বিভাগের মানুষদের যেমন চোখ কথা কইছে মুখ কথা কইছে ভাব থাকে, দিলীপবাবুর তা ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং মিতভাষী। সব সময়ে মুখে মৃদু হাসিটি লেগেই থাকত। আর কাজকর্ম করতেন খুব গুছিয়ে গাছিয়ে। তাই তরুণ মজুমদারের প্রোডাকসনের বাইরে শ্রীমতী সন্ধ্যাকে যখন অন্য প্রোডাকসনের হয়ে আউটডোরে শুটিং-এ যেতে হত, তখন সন্ধ্যার দেখভাল করবার জন্য তনুবাবু দিলীপবাবুকেই পাঠাতেন।

তা সেবার সন্ধ্যা রায়ের আউটডোর পড়েছিল বীরভূমের সাঁইথিয়া অঞ্চলে। ছবির নাম 'চিঠি'। পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এটি নব্যেন্দুর তৃতীয় ছবি। আসলে নব্যেন্দুর তৃতীয় ছবি ছিল 'রাণুর প্রথম ভাগ', যেটি রাষ্ট্রপতির পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু 'চিঠি' আগেই মুক্তি পেয়েছিল তাই ওটিকে তৃতীয় ছবি হিসেবে ধরা হয়। নব্যেন্দুর প্রথম ছবি 'নয়া রাস্তা' হিন্দি ভাষায় তোলা। প্রযোজকদের মধ্যে গণ্ডগোলের কারণে সেন্সর হয়েও মুক্তি পায়নি। দ্বিতীয় ছবি 'অদ্বিতীয়া', আর তৃতীয় ছবি 'চিঠি'।

'চিঠি' ছবিটি নব্যেন্দু অপেরা ফর্মে করতে চেয়েছিল। গোড়ার দিকের খানিকটা তাইই ছিল। কিন্তু প্রযোজক আর এল গুপ্তার কানের কাছে ওই ছবির একজন বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী ক্রমাগত বলে যেতে লাগলেন যে, এরকম অপেরা ফর্মে কাজ করাটা নব্যেন্দুর পক্ষে কঠিন। এটা একজনই করতে পারেন, তিনি হলেন মানিকদা। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়। প্রযোজক গুপ্তাজি ওইসব কথাবার্তা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। নব্যেন্দুকে ডেকে বললেন : প্যারে নব্যেন্দু, তুমি ভাই ওসব অপেরা ফর্ম-টর্ম ছেড়ে দিয়ে স্ট্রেট একটা ছবি বানিয়ে ফেল। ওসব এক্সপেরিমেন্টের কী ফল হবে তা তো কেউ বলতে পারে না। স্ট্রেট করাই ভালো।

ফলে ছবিটার খানিকটা অপেরায় আর বাকিটা গতানুগতিক ফর্মে তৈরি হয়ে মুক্তি পেল। প্রেস শো-এর পরে আমি আর আনন্দবাজারের ফিল্ম ক্রিটিক জ্যোতির্ময় বসুরায় নব্যেন্দুকে চেপে ধরেছিলাম। বলেছিলাম : এ কী মারাত্মক ভুল করলেন মশাই। পুরোটা অপেরা ফর্মে করতে পারলে আপনি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একজন পাইওনিয়র হয়ে থাকতে পারতেন। এ তো না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে গেল।

নব্যেন্দু আমাদের অভিযোগের কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে কপালে দুটি আঙুল ঠেকিয়েছিল কেবল। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় ওই ফর্মে 'হীরক রাজার দেশে' ছবি করে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন।

তা সেসব কথা থাক। সন্ধ্যা রায়ের কথায় ফিরে আসি। নব্যেন্দুর 'চিঠি' ছবিতে সন্ধ্যা রায়ের কিন্তু

নায়িকা হবার কথা ছিল না। নব্যেন্দু অপর্ণা সেনকে চুক্তিবদ্ধ করেছিল নায়িকা করার জন্য। কিন্তু নানা কারণে ছবির কাজ বেশ কিছুদিন পিছিয়ে গিয়েছিল। আর ততদিনে অপর্ণার সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। শারীরিক কারণের জন্য অপর্ণা 'চিঠি' ছবিতে কাজ করতে রাজি হলেন না। প্রস্তাব দিলেন, মাস ছয়েক পিছিয়ে দিলে তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজি হওয়া নব্যেন্দুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনিতে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। এরপর আরও ছ'মাস অপেক্ষা করতে গেলে ছবির কাজটাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই নতুন নায়িকার খোঁজ চলতে লাগল।

'চিঠি' ছবির নায়িকা একজন গ্রামের মেয়ে। পরবর্তীকালে তাকে বাধ্য হয়ে শহরে এসে শহুরে মেয়ে হয়ে উঠতে হয়েছিল। ওই চরিত্রে কমেডির যেমন প্রাধান্য ছিল, তেমনি কোনও কোনও জায়গা রীতিমত সিরিয়াস ছিল। একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী ছাড়া ওই চরিত্রে রূপ দেওয়া মুশকিল। নায়িকার যা বয়স তাতে অপর্ণা সেন ছাড়া তো আর কারও কথা ভাবাই যাচ্ছে না। তাহলে উপায়?

উপায় খুঁজে বার করলেন নব্যেন্দুর স্ত্রী ইতু। ইতু এমনিতে গৃহবাসিনী। নিজের স্বামী পুত্র এবং সংসার ছাড়া অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নয় রবীন্দ্রভারতীর নাট্যবিভাগের এই স্কলারশিপ পাওয়া প্রাক্তন ছাত্রীটি। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভূতা হয়ে অনেক দুরূহ সমস্যা সমাধান করে দেন। সেই ইতুই প্রপোজাল দিলেন নায়িকাব চরিত্রে সন্ধ্যা বায়কে নেবার জন্য। বললেন : সন্ধ্যার কাছে গ্রাম্য চরিত্রে যেমন দারুণ অভিনয় পাওয়া যাবে, তেমনি শহুরে অংশেও।

ইতুর এই প্রস্তাবটা সকলের মনে ধরল। কিন্তু সন্ধ্যা রায়েব ব্যাপারে নব্যেন্দুর একটা মানসিক অসুবিধা ছিল। এর আগে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণচোরা' ছবিতে অভিনয় করার সময় সন্ধ্যার সঙ্গে নব্যেন্দুর কিছু মান-অভিমানের ব্যাপার ঘটেছিল। তার ফলে উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। নব্যেন্দু 'বর্ণচোরা' ছবিতে অরবিন্দবাবুর সহকারী ছিল।

অথচ তার আগে নব্যেন্দুর সঙ্গে সন্ধ্যার এমনই ঘনিষ্ঠতা ছিল যে সন্ধ্যা নব্যেন্দুকে প্রপোজাল দিয়েছিল ছবি ডিরেকশন দেবার। সন্ধ্যা রায় নায়িকা, বিশ্বজিৎ নায়ক আর নব্যেন্দু পরিচালক। ছবির টাকা যোগাবেন অন্য কেউ। কিন্তু ওই তুচ্ছ মান-অভিমানের কারণে সে প্রস্তাবটা বাস্তবে রূপ পায়নি। কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল।

ইতুর প্রস্তাবটা সর্বান্তঃকরণে মনে ধরা সত্ত্বেও নব্যেন্দু ইতস্তত করছিল সেই পুরাতন মান-অভিমানের কথা ভেবে। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তাই একদা সন্ধ্যা রায়ের কাছে 'চিঠি' ছবির নায়িকা করার প্রস্তাব পাঠাতে হল। আর সন্ধ্যা সঙ্গে সঙ্গে সেটা অ্যাকসেপ্ট করলেন। পুরনো মান-অভিমানের কোন প্রশ্নই তুললেন না। সত্যিকারের শিল্পী যাঁরা হন তাঁদের কাছে অভিনীতব্য চরিত্রটাই বড়। ব্যক্তিগত মান-অভিমানের প্রশ্ন অবান্তর। সন্ধ্যা যে একজন প্রকৃত শিল্পী, এই ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই নায়িকা নির্বাচনের ব্যাপারটা যে সঠিক ছিল সেটা পরবর্তীকালে অপর্ণা সেনের একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। অপর্ণা বলেছিলেন : সন্ধ্যাদি অসাধারণ অভিনয় করেছেন। আমিও এত ভালো করতে পারতাম না।

অপর্ণা যে একজন বড় শিল্পী এবং সেই সঙ্গে একজন বড় মাপের মানুষ, তাঁর ওই মন্তব্য থেকে সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন প্রকৃত শিল্পীই আর একজন শিল্পীর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন। কোনরকম ইগোর দ্বারা পরিচালিত হন না।

তা সেই 'চিঠি' ছবির আউটডোর শুটিং করতে একদিন রাত্রে নব্যেন্দুর ইউনিট দার্জিলিং মেলে চেপে বসল। টেকনিসিয়ানরা উঠল রিজার্ভ করা দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ক্যামেরাম্যান রেজা গেলেন প্রথম শ্রেণীর একটি আলাদা কম্পার্টমেন্টে। অভিনেত্রী শিউলি মুখার্জিও তাই। আর একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় একসঙ্গে রইলেন ছবির প্রযোজক নব্যেন্দু, নায়িকা সন্ধ্যা রায়, তাঁর কেয়ারটেকার দিলীপ ব্যানার্জি আর বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেত্রী নিভাননী দেবী।

নিভাননী দেবীকে হয়তো আজকের প্রজন্মের অনেকেই চিনতে পারবেন না। বরং তাঁর মায়ের নাম করলে অনেকে চিনতে পারবেন। নিভাদির মা হলেন চুনীবালা দেবী। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'

ছবির সেই বিখ্যাত ইন্দির ঠাকুরুণ। সেই ইন্দির ঠাকরুণের কন্যাই হলেন নিভাননী দেবী।

নিভাদি তাঁর সমকালে বাংলা ছায়াছবি এবং রঙ্গমঞ্চের একজন উজ্জ্বল চরিত্রাভিনেত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করেছেন। শুধু শিশিরবাবু কেন, সেই আমলে কার সঙ্গেই বা করেননি। আর ছায়াছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু থেকে শুরু করে সেই আমলের সব ক'জন বিখ্যাত পরিচালকের ছবিতে অভিনয় করেছেন নিভাদি।

শুধু অভিনেত্রীই নন, মানুষ হিসেবেও নিভাদি ছিলেন তুলনাহীনা। তাঁর পাইকপাড়ার রানী রোডের বাড়িতে যখনই গেছি, নিভাদি সাদরে বুকে টেনে নিয়েছেন। একটি মুহূর্তের জন্যেও মনে করতে দেননি যে আমি ওই বাড়িতে অভ্যাগত। মাঝে মাঝে বলতেন : তোমরা আবার সাংবাদিক কী গো, তোমরা তো আমার বাড়ির ছেলে।

সেই নিভাদির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। স্বজনবিয়োগের ব্যথা অনুভব করেছিলাম। সেই ব্যথা আজও যায়নি। নিভাদির কথা লিখতে গিয়ে তাই বুকটা টন টন করছে।

যথাসময়ে এইসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে দার্জিলিং মেল ছাড়ল। একটু পরেই সবাই নানা রকম গল্পে মশগুল হয়ে পড়লেন। কথায় কথায় ভগবানের কথা উঠল। নব্যেন্দুই প্রথম মন্তব্য করল : আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।

নব্যেন্দুর কথা শুনে নিভাদি কপালে দু'হাত জড়ো করে ঠেকিয়ে বললেন : ভগবানে বিশ্বাস করো না কী গো। ভগবান ছাড়া আমাদের আর আছেটা কে?

সন্ধ্যা বললেন : আমি ভগবানেও বিশ্বাস করি আবার ভূতেও বিশ্বাস করি।

গুপ্তাজি বললেন · হামি ভাগওয়ানে বহোত বিশওয়াস করি, লেকিন ভূত-টুত একদম বিশওয়াস করি না।

নিভাদি বললেন : সে কী গো বাবা। তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো আর ভূতে বিশ্বাস করো না! মানুষ যেমন ভগবানের সৃষ্টি তেমনি ভূতও তো ভগবানের সৃষ্টি। ভগবানকে মানলে ভূতকেও মানতে হবে।

গুপ্তাজি বললেন : তা মানতে হয় কি না জানি না, তবে হামি মানি না। ভূত-পেরেত উ সব গপ্ কথা আছে।

সন্ধ্যা বললেন : আর কোনও ভূত মানুন আর না মানুন, বীরভূমের ভূত আপনাকে মানতেই হবে গুপ্তাজি। বীরভূমের ভূত বড় সাংঘাতিক ভূত।

গুপ্তাজি বললেন : সে দরকার হলে হামি রামনাম করে দিবে। তাহলেই সব ভূত ভেগে পালাবে।

সন্ধ্যা বললেন : বীরভূমের ভূত তো শুনেছি রামনামেও যায় না।

গুপ্তাজি বললেন : তবে কী নামে যায়?

সন্ধ্যা বললেন : তা আমি জানি না। আমি তো আর ভূত দেখিনি কখনও।

গুপ্তাজি হাসতে হাসতে বললেন : থাকলে তো দেখবেন। না থাকলে আর কী করে দেখতে পাবেন সন্‌ঝাজি।

সন্ধ্যা বললেন : ওটা বরাতের ব্যাপার। আপনার যদি বরাতে থাকে তবে এবারের আউটডোরেই আপনি ভূতের দেখা পেয়ে যেতে পারবেন।

এই কথা বলে সন্ধ্যা রায় একবার নব্যেন্দুর দিকে, আর একবার দিলীপবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

সবাই কথা বললেও দিলীপবাবু ছিলেন নির্বাক শ্রোতা। এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। কিন্তু সন্ধ্যার শেষ কথাটা শোনার পর তাঁর মধ্যে যেন ঈষৎ চঞ্চলতা দেখা গেল। তাঁর ঠোঁটের কোণে বোধহয় এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই আবার সেটা মিলিয়ে গেল।

যথাসময়ে ট্রেন এসে পৌঁছল সাঁইথিয়া স্টেশনে। পুরো ইউনিটকে রিসিভ করলেন গুপ্তাজির বন্ধু বালুবাবু। তিনি ওখানকার একজন সম্পন্ন ব্যবসায়ী। তারপর সবাইকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি রাইস মিলে। ওখানেই শুটিং পার্টির থাকার বন্দোবস্ত।

সেটা বোধহয় ১৯৭১ সাল। পশ্চিমবঙ্গের চতুর্দিকে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা। যে কোনও

কারণেই হোক রাইস মিলের কাজ তখন বন্ধ। মিলের অভ্যন্তরে একটি দোতলা বাড়ি। বাড়িটিতে লোকজন কেউ নেই। চতুর্দিক খাঁ খাঁ করছে। মিলের যে দু-চারজন পাহারাদার আছে তারা একটু দূরে তাদের কোয়ার্টারে থাকে। বাড়িটির ওপরতলার কয়েকটি ঘরে শিল্পীরা রইলেন। টেকনিসিয়ানরা নিচের তলায়।

রাইস মিলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং ঘরে ঘরে লণ্ঠনের ব্যবস্থা। আশেপাশে কোনও লোকালয় নেই। সব দেখেশুনে সন্ধ্যা বলে উঠলেন : চমৎকার ভৌতিক পরিবেশ।

একটা দিন বিশ্রাম। তারপরের দিন থেকে কাজ শুরু হবে। দোতলার দক্ষিণ দিক ঘেঁষে পাশাপাশি এল শেপের তিনটি ঘর। একটি ঘরে সন্ধ্যা একা রইলেন। তার পাশের ঘরে শিউলি মুখার্জী আর নিভাননী দেবী। শেষ ঘরটি নির্দিষ্ট হল গুপ্তাজি আর নব্যেন্দুর জন্য। দিলীপবাবু রইলেন সন্ধ্যা আর শিউলিদির ঘরের লাগোয়া বারান্দার ওপর।

সেদিন সন্ধেবেলা ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠল। ঘরের মধ্যে কিছুটা ভ্যাপসা গরম। কাজেই ছাদের ওপর মাদুর বিছিয়ে গল্পগুজবের আসর বসল। নানান কথাবার্তার ফাঁকে সন্ধ্যা বলে উঠলেন : আমার তো মনে হচ্ছে দু-চারদিনের মধ্যেই ভূতের দেখা পাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার কথা শুনে নিভাদি নিজের মনেই বলে উঠলেন : রাম রাম।

পরের দিনও শুটিং শুরু হল না। নব্যেন্দুর প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের তাড়সে সে ভুল বকতে লাগল। এখানে তো ভালো ডাক্তার নেই। গুপ্তাজি আর বালুবাবু দুজনে মিলে ঠিক করলেন নব্যেন্দুকে সাঁইথিয়া নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে প্রচুর ভালো ডাক্তার আছে। কিন্তু নার্সিং-এর জন্যে একজন লোক দরকার। হসপিটালে ট্রেইন্ড নার্স বেশ কয়েকজন আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ বাড়িতে ডিউটি করে না।

নব্যেন্দুর একটা বদ অভ্যেস ছিল। এখনও সেটা আছে। জ্বর হলে টেম্পারেচার যাই হোক না কেন সে একটা ঘোরের মধ্যে অনর্গল শেক্‌সপিয়ার আউড়ে যায়। অথবা কোনও নাটকের ডায়লগ।

অনেকেই হয়তো জানেন না, পরিচালক হবার আগে নব্যেন্দু নিয়মিত অভিনয় করত পেশাদার রঙ্গ মঞ্চে। স্টার থিয়েটারে, রঙমহলে। তবে বেশির ভাগ সময় নাটকের সাবস্টিট্যুট থাকতে হত। দু-চারটে নাটকে নিজস্ব বোলও পেয়েছিল। তবে সেগুলো বলবার মতো তেমন কিছু নয়। স্টার থিয়েটারে নব্যেন্দু আশিসকুমারের সাবস্টিট্যুট ছিল। আশিস করত স্বামী বিবেকানন্দর চরিত্র। নব্যেন্দুকে প্রতিদিনই বলত : আমার পার্ট করা হবে না তোর কোনদিন। আমার একদিনও কামাই হবে না।

অভিনয় করার সুযোগ পাক আর না পাক, বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয় দেখতে দেখতে নব্যেন্দু অভিনয়ের ব্যাপারটা রীতিমত আত্মস্থ করে নিয়েছিল। তার ওপরে ছিল স্বর্গত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের শিক্ষকতা। বীরেনদা নব্যেন্দুকে খুব ভালোবাসতেন। অভিনয় শেখাতেন। রেডিওতে হাতে ধরে বীরেনদাই নিয়ে গিয়েছিলেন নব্যেন্দুকে।

এই অভিনয় শেখাটা পরবর্তীকালে ভয়ানক কাজে লেগেছে নব্যেন্দুর। চিত্র পরিচালক হবার পর সে আর কোনদিন অভিনয় করেনি। কিন্তু তার ছবির শিল্পীদের নিয়ে অসম্ভব ভালো অভিনয় করিয়ে নিতে পেরেছে। সেরকম অনেক উদাহরণ আছে। অভিনয়ের সঙ্গে যার কোনদিন কোনও সম্পর্ক ছিল না সেই শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়কে 'পরশুরামের কুঠার' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করিয়ে ভারতশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছে নব্যেন্দু।

কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। মূল প্রসঙ্গে আসি। জ্বরগ্রস্ত নব্যেন্দুর নার্সিং করার কী হবে সেটা নিয়ে সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু সকলের চিন্তার নিরসন করলেন নিভাননী দেবী। নিভাদি বললেন : নব্যেন্দুকে আমিই দেখাশোনা করব। নার্সে কী দরকার। ও সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে আসছে। আমি তো ওর মায়েরই মতো। আমি না দেখলে ওকে কে দেখবে।

সুতরাং অসুস্থ নব্যেন্দুর সঙ্গে নিভাদিও গেলেন সাঁইথিয়া। সেখানে ডাক্তারদের দেওয়া দু'দাগ ওষুধ পেটে পড়তেই নব্যেন্দুর জ্বর সেরে গেল। কিন্তু একটা ঘোরের মধ্যে আরও একটা দিন কাটল।

তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা নব্যেন্দু আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। নিভাদি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। নব্যেন্দু সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই মাঝে মাঝে শেক্‌সপিয়ার আউড়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ নব্যেন্দুর কণ্ঠ

থেকে বেরিয়ে এল আর একটি কণ্ঠস্বর। নব্যেন্দু বলে উঠল : নিভা, আমায় চিনতে পারছো নিভা?

নব্যেন্দু কোনদিন নিভাদিকে এমন ভাবে নাম ধরে ডাকে না। ও চিরকাল নিভাদি বলে। পাইকপাড়ায় ওদের আদি বাড়ির কাছেই নিভাদির বাড়ি। কাজেই তার মুখে এমন করে নিভা ডাক শুনে চমকে উঠলেন নিভাদি। বললেন : কী বাবা নব্যেন্দু, তোমার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?

নব্যেন্দুর গলা থেকে আবার সেই কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। এবার যেন আরও একটু সুরেলা। নব্যেন্দু বললে : আমায় চিনতে পারলে না নিভা? আমাদের এতদিনের পরিচয়!

এবারে নিভাদি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন : কে! কে আপনি? কে কথা বলছেন?

নব্যেন্দু বললে : এখনও চিনতে পারলে না নিভা? এত দিনের এত কথা সব এমন করে ভুলে যেতে পারলে তুমি!

নব্যেন্দুর কপালের ওপর নিভাদির হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে যেন অন্য এক ধরনের চঞ্চলতা এসে গেল। পরম অনুরাগের সুরে নিভাদি বলে উঠলেন : দুগ্গাবাবু, এতদিন পরে আপনার মনে পড়ল আমাকে!

বলতে বলতে তাঁর দু ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল আচ্ছন্ন নব্যেন্দুর মুখের ওপর।

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, নিভাননী দেবী যাঁকে দুগ্গাবাবু বলে উল্লেখ করলেন, তিনি হলেন বাংলা চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের এককালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুদর্শন নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমতী সন্ধ্যা রায় পরিকল্পিত কৌতুক-কাহিনীর আরও বেশ কিছু আমার জানা আছে। কিন্তু তার সবগুলি প্রকাশ করা উচিত হবে না। সেটা করতে গেলে আমাব পুরো রচনাটিই কৌতুকাশ্রিত হয়ে যাবে। আমি কেবল 'চিঠি' ছবির সাঁইথিয়ার আউটডোরের দ্বিতীয় ঘটনাটি জানিয়েই সন্ধ্যা রায়ের জীবনের অন্য প্রসঙ্গে চলে যাব, যেখানে শ্রীমতী সন্ধ্যাকে এক মমতাময়ী রূপে দেখা যাবে।

এবারে নব্যেন্দু চ্যাটার্জি এবং নিভাননী দেবীকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কাহিনী, তার উপসংহারে আসি। সেদিন নিভাদি গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, অসুস্থ নব্যেন্দুর দেহে দুর্গাদাসের আত্মা আশ্রয় করেছিলেন। তা না হলে রাইস মিলের ক্যাম্পে ফিরে এসে সকলের কাছে সেই রাত্রের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করবেন কেন! কেবল সবিস্তারেই নয়, তার সঙ্গে যা ঘটেনি তেমন কিছু কিছু দৃশ্য সংযোগও করেছিলেন নিভাদি। নব্যেন্দুর পক্ষে সে সব কথার প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। কারণ সে তো তখন সজ্ঞানে ছিল না।

দিলীপ ব্যানার্জির মুখে নব্যেন্দু আর নিভাদিকে কেন্দ্র করে দুর্গাদাস কাহিনী শোনবার পর একদিন আমি নব্যেন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : নব্যেন্দু, তুমি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখেছ কখনও?

নব্যেন্দু বললে : স্টেজে দুর্গাবাবুর অভিনয় আমি দেখিনি কখনও। দেখা সম্ভবও ছিল না। কারণ তিনি যখন মারা যান তখনও আমি ভালো করে কৈশোর পেরোইনি। তবে ফিল্মে আমি দুর্গাদাসবাবুর অভিনয় দেখেছি। তাছাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড-নাট্যে তাঁর কণ্ঠস্বর অনেকবার শুনেছি। আমাদের বাড়িতে দুর্গাদাসবাবু অভিনীত নাটকের অনেক রেকর্ড ছিল। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আমাকে দারুণ আকর্ষণ করত।

আমি বললাম : সেই জন্যেই বুঝি অসুস্থতার ভান করে নিভাদির সঙ্গে তুমি দুর্গাবাবুর ভয়েস নকল করে কথা বলেছিলে।

নব্যেন্দু বললে : না না, তোমার ওই সন্দেহটা ঠিক নয়। সেদিন সত্যিই আমার জ্ঞান ছিল না। নিভাদি বলেছিলেন বটে যে দুর্গাদাসের আত্মা নাকি আমাকে ভর করেছিল। কিন্তু আমার সে সব কিছু মনে নেই। তবে হ্যাঁ, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে সন্ধ্যার ইঙ্গিতের কারণে একবার ভূত সেজে আমার প্রোডিউসার গুপ্তাজিকে ভয় দেখানোর ইচ্ছে হয়েছিল বটে, তবে তার আর সুযোগ পেলাম কই। তার আগেই তো গুপ্তাজির সঙ্গে সত্যিকারের ভূতের মোলাকাত হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সে ঘটনাটাও আমি দিলীপবাবুর মুখ থেকে শুনেছি। তবে তার মাঝখানে কিছু ফাঁকফোকর ছিল সেটা ভরাট করে নিয়েছি নব্যেন্দুর সঙ্গে নানান কথার ফাঁকে ফাঁকে।

সেদিনের ঘটনাটা খুবই রোমহর্ষক ছিল। এবং যার পরিণতিতে প্রাণান্তকর কিছু ঘটে যেতেও পারত।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে তেমন কিছু ঘটেনি। কিংবা বলা যায়, যেহেতু গুপ্তাজি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, তাই স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। পুরো ঘটনাটি শুনলে সেটা বুঝতে পারা যাবে।

জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর নব্যেন্দু পুরোদমে শুটিং শুরু করে দিল তার 'চিঠি' ছবির। ওই লোকেশানে সন্ধ্যা রায়ের গ্রাম্য জীবনের অংশটাই টেক করা হচ্ছিল। আর তার সবটাই অপেরা ফর্মে। এই নতুন ফর্মে কাজ করতে সন্ধ্যার খুব ভালো লাগছিল। সে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছিল। তার কাজ দেখে ডিরেক্টার প্রোডিউসার থেকে শুরু করে টেকনিসিয়ানরা পর্যন্ত সবাই খুশি।

সারাদিন কাজ করার পর রাইস মিলের কোয়ার্টারে ফিরে এসে ছাদের ওপর জমাটি আসর বসত। আর সেই আসরে একবার না একবার ভূতের প্রসঙ্গ উঠতই। আর সেটা বেশির ভাগ সময়ে ওঠাত সন্ধ্যা নিজেই।

এর আগে নব্যেন্দুর মারফত দুর্গাদাসের আত্মার ঘটনাটা ঘটে গেছে। সেটা নিভাদিব মুখ থেকে গুপ্তাজি সবিস্তারে শুনেওছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুপ্তাজির মতের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি জোর গলায় বলতেন : ভূত-ফুত সব বাজে কথা। নব্যেন্দুর যেটা হয়েছিল সেটা ডিলিরিয়াম। নিভাদি ভিতু মানুষ আছেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন একঠো আত্মা নব্যেন্দুর কাছে আসিয়েছিল।

গুপ্তাজির কথা শুনে সন্ধ্যা হাসতে হাসতে বলেছিলেন : অত বড়াই করবেন না গুপ্তাজি। আপনি জানেন না, বীরভূমের ভূতেরা কত সাংঘাতিক। তারা হয়তো ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার কথা শুনছে। কে জানে, আজ রাতেই তাদের কেউ আপনার ঘরে হানা দেবে কিনা!

কিন্তু তেমন কোন অঘটন সেদিন রাত্রে ঘটল না। পরের দিন সকালে লোকেশানে এসে হাসতে হাসতে গুপ্তাজি বললেন : এই দেখুন সন্ঝাজি, আমি বাহাল তবিয়তে আছি। ভূত আমার কিছু করতে পারেনি। মালুম হচ্ছে কী আপনার ভূতেরা আমাকে ভি ডর পায়।

সন্ধ্যা মিটি মিটি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন : তাই তো দেখছি।

পর পর দিনদিন কোনও অঘটন ঘটল না। তার ফলে গুপ্তাজির আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। তিনি এবার উলটে ভূতের ব্যাপারে সন্ধ্যাকেই টিটকিরি দিতে লাগলেন। তিনি বললেন : কই সন্ঝাজি, আপনার ভূতেদের কাছে আমাদের কোম্পানির কল্‌-কার্ড পাঠান। আমাদের শুটিং তো প্রায় শেষ হতে চলল। আর কবে তাঁদের দর্শন পাওয়া যাবে?

গুপ্তাজির কথা শুনে সন্ধ্যা কাঁচুমাচু মুখে বললেন : কী ব্যাপার বলুন দেখি! বীরভূমের ভূতেরা কি সব মরে হেজে গেল নাকি। এখনও যদি তাদের দেখা না পাওয়া যায় তাহলে তো আমার মান-ইজ্জত বলে আর কিছু থাকে না।

সন্ধ্যার সেই আকুল আক্ষেপের বার্তাটি বোধহয় বীরভূমের ভূতের রাজার কানে গিয়েছিল। তাই সেদিন রাত্রেই রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে গেল।

আগেই বলেছি সেই সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। তারই সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধীরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। কোনও কোনও অঞ্চলে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গিয়েছিল। সমাজবিরোধীরা সেই সব অপকর্ম নকশালবাদের নামে চালিয়ে দিচ্ছিল। এটা গুপ্তাজিদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। কারণ ঠিক তার আগের দিনই লক্ষাধিক টাকা কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল শুটিং-এর খরচ চালানোর জন্য। ওই টাকার সিকিওরিটির চিন্তাটা প্রবল হয়ে উঠেছিল গুপ্তাজি আর তাঁর বন্ধু বালুবাবুর মনে। আগেই বলেছি বালুবাবুই এবারের শুটিং-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরই রাইস মিলের কোয়ার্টারে এসে উঠেছে পুরো ইউনিট।

বালুবাবু বললেন : আমার কাছে একটা রিভলভার আছে। লাইসেন্স আমারই নামে। আপনাদের মধ্যে কেউ রিভলভার চালাতে জানেন নাকি?

গুপ্তাজি বললেন : না বালুবাবু, আমি তো রিভলভার চালাতে জানি না।

নব্যেন্দু বললে : আমি জানি।

নব্যেন্দুদের বাড়িতে বন্দুক আছে নব্যেন্দুর বাবার। নব্যেন্দুরা চার ভাইই বন্দুক চালানো শিখেছে বাবার কাছে। শুধু বন্দুক চালানোই নয়, ঘোড়ায় চড়া, সোর্ড খেলা ইত্যাদিও শিখেছে। অথচ নব্যেন্দুদের

বাড়িটা ছিল আর্ট অ্যান্ড কালচারের জন্য বিখ্যাত। নব্যেন্দুর বড়দা আর সেজদা দু'জনেই সংগীতশিল্পী। নব্যেন্দুর মা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই আমলের হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির সংগীতশিল্পী। তাঁর একাধিক গানের রেকর্ড ছিল বাজারে। আর সেজদা নিখিল চট্টোপাধ্যায় তো রীতিমতো বিখ্যাত সুরকার। দীর্ঘকাল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকারী ছিলেন। সহকারী না বলে সহযোগী বলাই বোধহয় সঙ্গত। নিজেও একজন নামকরা সংগীত পরিচালক। আকাশবাণীর অডিশন বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত। নব্যেন্দুর অধিকাংশ ছবির তিনিই সংগীত পরিচালক। এই সংগীতের সঙ্গে কেমন করে ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো ইত্যাদি যুক্ত হয়েছিল, সেটা আমার কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

যাই হোক নব্যেন্দু রিভলভার চালাতে পারে জেনে গুপ্তাজি আর বালুবাবু দু'জনেই আশ্বস্ত হলেন। বালুবাবু তাঁর লোডেড রিভলবারটি নব্যেন্দুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন : মনে হয় এখানে কোনও হামলা হবে না। আমাকে সব মহলের লোকেরাই ভালোবাসে। আমি তাদের অনেক কাজে লাগি। তবু সেফটির জন্যে রিভলভারটা রেখে গেলাম। হামলা হলে সরাসরি রিভলভার চালিয়ে দেবেন। তারপর খুনই হোক আর জখমই হোক তার সব দায়িত্ব আমার।

এর আগে ক'দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। মনের সুখে শুটিং করছিল নব্যেন্দুরা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে ছাদে আড্ডা বসেছিল ভাঙা চাঁদের আলোয়। কিন্তু সেদিন বিকেল থেকে আকাশ মেঘে মেঘে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। সন্ধের পর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তাই সেদিন আর ছাদে আড্ডা জমানো গেল না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হল সবাইকে।

খেতে খেতে নব্যেন্দু বললে : কাল যদি বৃষ্টি হয় তাহলেই কেলেঙ্কারি। আউটডোরের এই অংশে বৃষ্টির কোনও সিকোয়েন্স নেই। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।

গুপ্তাজি বললেন : আমি শুটিং-এর কথা ভাবছি না। শুটিং দু-একদিন হ্যামপার করলে কোনও ক্ষতি নেই। সেটা আমি সামলে নিতে পারব। আমি ভাবছি টাকাটার সিকিওরিটির কথা। এইসব রাত্রেই তো শুনেছি ডাকুরা হামলা করে।

ক্যামেরাম্যান রেজা সাহেব বললেন : টাকাটা তো আপনি সাঁইথিয়ার ব্যাঙ্কে বালুবাবুর অ্যাকাউন্টে জমা রেখে দিতে পারতেন গুপ্তাজি। তারপর একটু একটু করে তুলে নিয়ে কাজ চালাতেন?

গুপ্তাজি বললেন : আমি বালুকে সে কথা বলেছিলাম। কিন্তু বালু বললে ওর অসুবিধা আছে। ওর এখন ইনকাম ট্যাক্সের সঙ্গে কেস চলছে। তাই আনঅ্যাকাউন্টেড টাকা রাখা যাবে না।

সন্ধ্যা রায় বললেন : আমি আবার ভাবছি অন্য কথা।

গুপ্তাজি বললেন : কী কথা?

সন্ধ্যা বললেন : এইরকম মেঘলা রাত্রেই শুনেছি ভূতেরা নিজেদের ঘর ছেড়ে লোকালয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নিভাননী দেবী এ কথা শুনে খেতে খেতে বিষম খেয়ে ফেললেন। তারই মধ্যে বলে উঠলেন : রাম রাম!

দিলীপবাবু স্বল্পভাষী মানুষ। তিনি বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। তাঁকেও দেখা গেল কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠতে সন্ধ্যার ওই ভূত চরে বেড়াবার কথা শুনে।

সেদিন রাত্রে শোবার সময় বালুবাবুর দেওয়া রিভলভারটাকে বালিশের নিচে রেখে শুয়ে পড়ল নব্যেন্দু। গুপ্তাজি নব্যেন্দুর পাশের বেডেই শোন। তিনি শোবার আগে দরজাটা ভালো করে ছিটকিনি দেওয়া আছে কিনা দেখে নিলেন। তারপর জানালা দুটোর দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কোন জানালাতেই গরাদ দেওয়া নেই। জানালার কোন পাল্লাও নেই। জানালার পাশেই বারান্দা। সেই বারান্দা দিয়ে অনায়াসেই জানালা টপকে ঘরে আসা যায়।

গুপ্তাজি বললেন : এ প্যারে নব্যেন্দু, এ তো বহোৎ মুসিবত কি বাত।

নব্যেন্দু বললে : আবার কী মুসিবত হল?

গুপ্তাজি বললেন : ঘরের জানালার তো পাল্লাও নেই, গরাদও নেই।

নব্যেন্দু বললে : তাতে কী হল। এটা তো আমি প্রথম দিনই দেখে নিয়েছি। এখনও পর্যন্ত কোনও

মুসিবত তো হয়নি!

গুপ্তাজি বললেন : অন্য দিনের রাত আলাদা। আজ দেখছো না কেমন অন্ধেরা রাত। ডাকুরা তো এক লাফে জানলা টপকে ঘরে ঘুসে যেতে পারবে।

নব্যেন্দু বললে : না না, তেমন কিছু হবে না। নিচে তো আমাদের এত লোক আছে। ডাকাত পড়লে তারা চিৎকার করে উঠবে না। তারপর তো আমার কাছে রিভলভার আছেই। একটা গুড়ুম করলেই ডাকাতরা পালাতে পথ পাবে না।

গুপ্তাজি বললেন : হ্যাঁ, সেটা একটা ভবসার কথা বটে। তাহলে আমি নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ি, কী বলো?

নব্যেন্দু বললে : হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন দেখি। আমি তো রইলাম আপনার পাশে।

রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ গুপ্তাজির ডাক শোনা গেল। তিনি বললেন : এ প্যারে নব্যেন্দু, এ ভাই নব্যেন্দু!

গুপ্তাজির ডাকে নব্যেন্দুর ঘুম ভেঙে গেল। সে শুয়ে শুয়েই জড়ানো কণ্ঠে বললে : কী হল কী গুপ্তাজি?

গুপ্তাজি বললেন : তোমার বালিশের নীচে রিভলভারের নলটা কোন দিকে আছে একবার দেখো না ভাই।

নব্যেন্দু বললে : ওটা ঠিক দিকেই আছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন তো!

গুপ্তাজি বললেন : না ভাই, তুমি একবার বালিশটা তুলে দেখ। আমার মনে লিচ্ছে কী যে ওটা আমার দিকেই তাক্ করা আছে।

নব্যেন্দু বিরক্তি সহকারে বললেন : না না, আপনার দিকে তাক্ করা নেই। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

গুপ্তাজি বললেন : তবু তুমি একবার দেখো না ভাই। আমার মনটা কেমন খচ খচ করছে। ওইরকম অবস্থায় আমার ঘুম আসে না।

নব্যেন্দু অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে বিছানার ওপর উঠে বসল। ঘরের মধ্যে মিট মিট করে যে লণ্ঠনটা জ্বলছিল, সেটার শিখা বাড়িয়ে দিলে। তারপর গুপ্তাজির দিকে চোখ রেখে বালিশটা তুলে বললে : এই দেখুন, রিভলভারের নল আপনার দিকে তাক করা নেই।

বালিশের নীচে রিভলভারের অবস্থান দেখে গুপ্তাজি চমকে উঠলেন। বললেন : এ কী করেছ তুমি! রিভলভারের নলটা তো আমার বিছানার দিকেই তাক্ করে রাখা!

নব্যেন্দু এবার ঝুঁকে পড়ে রিভলভারটা দেখলে। সত্যিই তাই। নলটা গুপ্তাজির দিকেই বটে। জিভ কেটে বললে : স্যরি গুপ্তাজি, আমার ভুল হয়ে গেছে। এই দেখুন, অন্যদিকে নলটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি। আর নলটা আপনার দিকে থাকলেই বা কী হবে, ট্রিগারে চাপ না পড়লে তো আর ফায়ার হবে না।

গুপ্তাজি বললেন : ওসব ফায়ার আর্মসকে আমার বিশ্বাস নেই। কখন ঘুমের ঘোরে ট্রিগারে হাত পড়ে যাবে, সেটা বলা যায় নাকি।

নব্যেন্দু বললে : এবারে তো আর ভয় নেই। নলটা তো এখন অন্যদিকে ঘোরানো। এবারে আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আর ডাকাডাকি করবেন না। কাল ভোর থেকেই শুটিং আছে, অবশ্য আকাশের অবস্থা যদি ভাল থাকে।

শেষ রাতের দিকে আবার নব্যেন্দুর ঘুম ভেঙে গেল। তবে এবার আর গুপ্তাজির ডাকে নয়, তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত গোঁ গোঁ আওয়াজে। নব্যেন্দু ধড়মড় করে উঠে বসে লণ্ঠনের মৃদু আলোতে দেখলে, গুপ্তাজি তাঁর বিছানার ওপর সটান বসে আছেন। তাঁর মুখ রক্তশূন্য। সেখান থেকে কেমন এক ধরনের আওয়াজ বেরোচ্ছে। আর তাঁর থেকে হাত চারেক দূরে ঘরের মেঝের ওপর একটি শ্বেতশুভ্র মূর্তি লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে নিখুঁত ভরতনাট্যমের মুদ্রায় নৃত্য করছে। সেই মূর্তির বুকের কাছ থেকে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিচ্ছে।

নব্যেন্দুকে উঠে পড়তে দেখে সেই শ্বেতশুভ্র মূর্তি সেই আলো-আঁধারির মধ্যে হঠাৎ জানালা টপকে

বারান্দার ওপর দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই রোমহর্ষক দৃশ্যের জের কতক্ষণ স্থায়ী ছিল বলা যায় না। তবে একটু পরে গুপ্তাজির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা দেখে বললেন : রাত চারটে বেজে গেছে। নব্যেন্দু, তুমি তোমার ইউনিটকে ঘুম থেকে তুলে দাও। যত তাড়াতাড়ি পারো লোকেশানে বেরিয়ে পড়। আমি আজ সকালের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব। তোমার ওপরে বাকি সব দায়িত্ব রইল। যত তাড়াতাড়ি পার প্যাক-আপ করে কলকাতা ফিরে যেও। এই ভূতুড়ে বাড়িতে আর একদিনও আমি থাকব না।

গুপ্তাজির কথাগুলো নব্যেন্দু শুনল বটে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে অন্য ব্যাপারে। সে তখন মনে মনে গবেষণা করছে, ভূতেদের চোখগুলো কী বুকের কাছে থাকে, আর সেখান থেকে কী টর্চের আলোর মতো উজ্জ্বল আলো বেরোয়?

সন্দেহের ভঞ্জনটা হয়েছিল আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। স্নান-টান সেরে লোকেশানে বেরোবার আগে নব্যেন্দু দেখেছিল সন্ধ্যা রায়ের ঘরের সামনে বারান্দার ওপর একখানি সদ্যভেজা শাদা খোলের শাড়ি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। অনেকটা সেই নৃত্যরত ভূতের শরীরের পোশাকটির মতো। আর সন্ধ্যার ঘরের ভেতর থেকে তার মৃদু কণ্ঠের অনুযোগ শোনা যাচ্ছে। সন্ধ্যা বলছেন : ছি ছি দিলীপবাবু, আপনার এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি। আপনাদের ধরে আনতে বললে বেঁধে আনেন আপনারা। উনি হলেন আমাদের প্রোডিউসার, আমাদের অন্নদাতা। একটা ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে আপসোসের আর সীমা থাকত না। তাছাড়া টর্চটা আপনি বারান্দার ওপর ফেলে এলেন কী বলে। ভাগ্যিস আমার চোখে পড়ে গেল। অন্য কারও চোখে পড়লে সবাই আমাকে দোষী করত।

তার উত্তরে দিলীপবাবু মৃদুকণ্ঠে কী বললেন, সেটা আর শোনা গেল না। তবে নব্যেন্দু বুঝতে পারল, দিলীপবাবু প্রোডাকসন ম্যানেজার হিসেবে যতই ভালো হোন না কেন, অ্যাকটর হিসেবে একদম ভালো নয়। ভূতের অ্যাকটিংটা উনি মোটেই ভালো করতে পারেননি। পরের কোনও একটা ছবিতে দিলীপবাবুকে কাস্ট করে ভালো করে অ্যাকটিংটা শিখিয়ে দিতে হবে। তুলনায় বরং দুর্গাদাসের চরিত্রে তার প্রক্‌সি দেওয়া অনেক ভালো হয়েছিল। নিভাদি এখনও বিশ্বাস করেন সেদিন সত্যিই দুর্গাদাসের আত্মা তার শরীরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেটা নব্যেন্দু করেছিল সন্ধ্যার ইঙ্গিত পেয়ে। আর আজকের ভৌতিক ব্যাপারটার পুরো পরিকল্পনাটা সন্ধ্যা রায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত।

রসময়ী সন্ধ্যা রায়ের এই ধরনের রসিকতার আরও দু-একটা ঘটনা আমার জানা আছে। কিন্তু সেগুলোর কথা এখন আর বলছি না। পরে যদি কখনও সুযোগ পাই বলব। এখন বরং সন্ধ্যা রায়ের জীবনের অন্য ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে আসি। বিশেষ করে আমাদের উল্টোরথের প্রযোজনায় তৈরি 'মণিহার' ছবির কিছু ঘটনার প্রসঙ্গে।

এই 'মণিহার' ছবিটি সন্ধ্যা রায়ের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র। ওঁর ছবি দিয়ে পুরো এক পাতার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল কলকাতার তিন-চারটি দৈনিক পত্রিকায়। আমার তো মনে হয় কলকাতার অন্য কোনও নায়িকার ভাগ্যে এমন সুযোগ ঘটেনি।

সেটাও একটা মজার ব্যাপার।

আমাদের আমলে যে সব প্রথম সারির অভিনেত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের অধিকারিণী। তাঁদের একজন হলেন শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জি আর অপরজন হলেন শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়। তবে শারীরিকভাবে এঁরা স্বল্প দৈর্ঘের হলে কী হবে, অভিনয় প্রতিভায় এঁদের দৈর্ঘ্য ছিল অনেকের চেয়ে বেশি। এর মধ্যে সন্ধ্যাকেই আমার বেশি বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। কেন এটা মনে হত তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

অরুন্ধতী দেবী জন্মসূত্রে এক বনেদি পরিবারের কন্যা। তাঁর পঠন-পাঠন শান্তিনিকেতনে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যও পেয়েছিলেন সম্ভবত। বিবাহসূত্রে এমন একটি মানুষকে পেয়েছিলেন যাঁর সঙ্গে আর্ট অ্যান্ড কালচারের নিবিড় সম্পর্ক। তিনি হলেন এককালের আকাশবাণীর বড় ধরনের কর্মকর্তা এবং পরবর্তীকালের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে

অরুন্ধতী দেবীর জীবন কেটেছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে একজন বড় অভিনেত্রী হওয়াটা আমার কাছে তেমন বিস্ময়কর মনে হয়নি।

কিন্তু সন্ধ্যা? তিনি এসেছেন একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। সে পরিবারের সঙ্গে আর্ট অ্যান্ড কালচারের বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল বলে আমি অন্তত শুনিনি। সেখান থেকে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বিস্ময়কর ব্যাপার বইকি। অভিনয়ের একটা সহজাত প্রতিভা যে সন্ধ্যার মধ্যে ছিল সেটা তাঁর প্রথম দিককার ছবিগুলি দেখেই বুঝতে পারা গিয়েছিল। এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়, সন্ধ্যা আজ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত কোনও চরিত্রের প্রতিই অবিচার করেননি। ছবি হয়তো ভালো হয়নি, দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করেছে, কিন্তু সন্ধ্যার অভিনয় খারাপ হয়েছে এমন অপবাদ তাঁর অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারবে না।

সন্ধ্যা রায় তাঁর সমকালে নায়িকা হিসেবে প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলি তাঁকে পেতে হয়েছে রীতিমতো লড়াই করে। সেই সময়ে বাংলা ছবিতে শক্তিময়ী নায়িকার ছড়াছড়ি। সাবিত্রী, সুচিত্রা, অরুন্ধতী, সুপ্রিয়া, মাধবী এবং আরও অনেকে। অভিনয়ে তাঁরা কেউই কম যান না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যা রায় একের পর এক ছবিতে সুযোগ পেয়েছেন। সেটা কেবলমাত্র তাঁর অভিনয় ক্ষমতার কারণেই নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর শোভনসুন্দর মনোমুগ্ধকর ব্যবহার। তিনি যেসব প্রযোজকের ছবিতে অভিনয় করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর ব্যবহারে খুশি। তিনি জ্ঞানত কাউকে কোনও কটু কথা বলেননি। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। টাকা-পয়সা হয়তো ঠিকমতো পাননি কারও কারও কাছ থেকে, কিন্তু তার জন্যে তাঁর ব্যবহারের কোনওরকম তারতম্য ঘটেনি। যার ফলে যে টাকাটা নির্ঘাত ডুবে গেছে বলে মনে হয়েছিল, সেই প্রযোজক পরবর্তীকালে উপযাচক হয়ে সন্ধ্যার টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সিনেমা লাইনে খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

প্রযোজকরা একজন নায়িকার কাছে প্রধানত তিনটি জিনিস খোঁজেন। প্রথম কথা, তিনি একটা গলাকাটা রেট চাইবেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি শুটিং-এর জন্যে ঠিকমতো ডেট দেবেন এবং নিষ্ঠাভরে কাজ করবেন। আর তৃতীয়ত, প্রযোজক, পরিচালক এবং অন্যান্য শিল্পী ও টেকনিসিয়ানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। এই তিনটি গুণই সন্ধ্যার মধ্যে বিদ্যমান। শুধু বিদ্যমানই নয়, বলা যায় বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। তাই সন্ধ্যাকে কোনওদিন কাজের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়নি। পরবর্তীকালে সন্ধ্যা যখন পরিচালক তরুণ মজুমদারের সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন, তখন তরুণবাবুর সবগুলি ছবিতে তিনি প্রধান ভূমিকায় তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে বাইরের ছবির অফার অজস্র ভাবে এসেছে। তরুণ মজুমদারের ছবিতে সন্ধ্যা রায়কে তো কেবল অভিনয়ই করতে হত না, সেইসঙ্গে প্রোডাকসনের অন্যান্য অনেক ব্যাপার দেখতে হত। তা সত্ত্বেও সন্ধ্যা বাইরের ছবিতে যতটা সম্ভব পেরেছেন কাজ করেছেন। আমি তো মাঝে মাঝে তাঁর এই অফুরন্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। এত কাজের চাপ, কিন্তু সন্ধ্যার মুখে মৃদু হাসিটুকু সব সময়েই লেগে থাকত। সেটা লোক দেখানো হাসি নয়, অন্তরের গভীর স্তর থেকে উঠে আসা আনন্দের অভিব্যক্তি।

আমাদের 'মণিহার' ছবির নায়িকার চরিত্রে সন্ধ্যার কাজ করার ব্যাপার নিয়ে রীতিমতো মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বলার আগে 'মণিহার' ছবিটিকে কেন আমাদের ছবি বলছি সেটা জানিয়ে রাখি আপনাদের।

এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো জানেন না যে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে উল্টোরথ নামক একটি পত্রিকার প্রচণ্ড রমরমা ছিল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে উধাও হয়ে যেত, এমনই ছিল উল্টোরথ পত্রিকায় চাহিদা। উল্টোরথে সাহিত্য এবং সিনেমা এই দুইয়ের আশ্চর্য সমাহার ঘটেছিল। বাংলার বিখ্যাত সব সাহিত্যিক সেই পত্রিকায় লিখতেন। আর সিনেমা বিভাগে একখানা ছবি কিংবা দু লাইন লেখা বেরোলেই শিল্পীদের দারুণ পাবলিসিটি হয়ে যেত। প্রযোজকরা রীতিমত ধরনা দিতেন উল্টোরথে তাঁদের খবর ও ছবি ছাপানোর জন্য।

উল্টোরথের কর্ণধার ছিলেন উত্তর কলকাতার বনেদি সিংহ পরিবারের ছেলে প্রসাদ সিংহ। আর তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রসাদদার বন্ধু গিরীন্দ্র সিংহ। ওই সিংহ পদবীর জন্যে অনেকে তাঁদের দুই ভাই

মনে করতেন। কিন্তু আসলে তা নয়। ওঁরা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

কিন্তু এই অভিন্ন হৃদয়তায় চিড় খেয়ে গেল একটি ঘটনায়। প্রসাদদা চাইতেন তাঁরই মতো গিরীনদারও ভাবনা-চিন্তা উল্টোরথকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হোক। এতকাল তাই চলছিল। হঠাৎ ষাটের দশকে গিরীনদার ছবি প্রযোজনা করবার বাসনা হল। গিরীনদা উল্টোরথে ঢোকবার আগে কিছুকাল পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহকারিত্ব করেছিলেন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত অভিনেতা বিধায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়ও তখন অর্ধেন্দুদার সহকারী ছিলেন। কাজেই সিনেমার ব্যাপারটা গিরীনদার অস্থিমজ্জায় জড়িত ছিল। যে কারণে তাঁর ছবি প্রযোজনা করবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু প্রসাদদা চাইতেন না উল্টোরথ ছাড়া গিরীনদার অন্য কোনও অ্যাকটিভিটি থাকুক। তাই গিরীনদা নিজের নামে নয়, আমাদের ফটোগ্রাফার হেমেন মিত্রকে প্রযোজক হিসেবে শিখণ্ডী খাড়া করে 'প্রভাতের রঙ' নামে একটি ছবি প্রযোজনায় হাত দিলেন। সে ছবির পরিচালক ছিলেন অজয় কর। কাহিনীটি ছিল ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের লেখা। নায়ক আর নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিশ্বজিৎ এবং শর্মিলা ঠাকুর। সংগীত পরিচালনা করেছিলেন তৎকালীন হট-ফেবারিট মিউজিক ডাইরেক্টর হেমন্তদা। অর্থাৎ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'প্রভাতের রঙ' ছবির প্রযোজনার সঙ্গে যে গিরীনদা জড়িত থাকতে পারেন, এটা প্রসাদদা স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি জানতেন যে হেমেন ওই ছবির প্রযোজক। আর হেমেন যেহেতু উল্টোরথের ফটোগ্রাফার তাই প্রসাদদা উল্টোরথে ওই ছবির দারুণ ভাবে পাবলিসিটি করতে থাকলেন। শেষের দিকে প্রসাদদার মনে বোধহয় কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তাই মাঝে মাঝেই হেমেনকে জিজ্ঞাসা করতেন: হ্যাঁ রে হেমেন, ছবি প্রোডিউস করার মতো এত টাকা তুই পেলি কোথা থেকে?

হেমেন তো আর গিরীনদার নাম করতে পারে না। তাই এর নাম ওর নাম করে কাটিয়ে দিতো। প্রসাদদা সেসব কথা পুরোটা না হলেও কিছুটা বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি জানতেন, অনেকের ব্ল্যাক মানি থাকে, তারা নিজেরা আসরে না নেমে অন্যের নামে ছবি করে।

আমি কিন্তু গিরীনদার এ ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতাম। গিরীনদাই আমাকে বলেছিলেন, প্রোডাকসনের ব্যাপারে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে যুক্তিযাক্তাও করতেন। কিন্তু গিরীনদা বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে আমি যেন প্রসাদদাকে কিছু না বলি। আমি গিরীনদার অবস্থা বিবেচনা করে প্রসাদদার কাছেও সবকিছু চেপে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এত ভালো পরিচালক, ভালো মিউজিক ডিরেকটার, অত ভালো নায়ক-নায়িকা থাকা সত্ত্বেও 'প্রভাতের রঙ' ছবিটি ফ্লপ করে গেল। দর্শকরা ছবিটিকে একদমই গ্রহণ করল না। গিরীনদা টাকা কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন তা আমি জানি না, কিন্তু সে টাকার পুরোটাই জলে গেল।

ছবি ফ্লপ হওয়ার জন্য প্রসাদদা হেমেনকে সহানুভূতি জানালেন। তারপর বললেন : যাক গে, মরুক গে, তোর তো আর টাকা নয়। যাদের অঢেল ব্ল্যাক মানি আছে তাদের অমন দু-এক লাখ টাকা জলে গেলেও কিছু যায় আসে না। তবে তোর জন্যে দুঃখু হচ্ছে। তোর অত হাড়ভাঙা খাটুনি, তার সবটাই মাঠে মারা গেল।

প্রসাদদার কথা শুনে হেমেন কিছু বলল না। চুপ করে রইল। কিন্তু ছবি ফ্লপ হবার জন্যে তার যে দুঃখ হবার কথা তার চিহ্নমাত্র হেমেনের মুখে ফুটে উঠতে না দেখে প্রসাদদার মনের মধ্যে কেমন একটা সন্দেহ উঁকি দিল।

সেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে গেল সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই। বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন প্রবীণ পাবলিসিটি অফিসার আমাদের উল্টোরথের অফিসে মাঝে মাঝে আসতেন। বিধুদা এককালে সাংবাদিকতা করতেন। তিনি ছিলেন বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন, অর্থাৎ বি. এফ. জে. এ-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম।

সেই বিধুদা একদিন সন্ধেবেলা এলেন আমাদের অফিসে। তাঁর বরাদ্দ চাচার হোটেলের চিকেন কাটলেট তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে বিধুদা বললেন : গিরীনের জন্যে বড় দুঃখ হয় হে প্রসাদ! অতগুলো টাকা একেবারে জলে গেল।

প্রসাদদা বিধুদার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন : গিরীনের টাকা জলে গেল মানে?

বিধুদা বললেন : 'প্রভাতের রঙ' ছবিটা ফ্লপ করায় গিরীনের টাকা জলে গেল না!

প্রসাদদা বললেন : 'প্রভাতের রঙ' ছবিতে গিরীনের টাকা জলে যাবে কেন! ওটা তো হেমেনের ছবি। তাও হেমেনের নিজের টাকা নয়। অন্য লোকের টাকা।

বিধুদা বললেন : আরে সেই অন্য লোকটাই তো গিরীন।

প্রসাদদা বললেন : কী আজেবাজে বকছেন বিধুদা! গিরীন এত টাকা পাবে কোথা থেকে যে ছবির পেছনে টাকা ঢালবে।

বিধুদা বললেন : কোথা থেকে পেয়েছে সেটা আমি কেমন করে জানব! গিরীন তো তোমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তুমি সে ব্যাপারে খোঁজখবর নাও। তবে একটা ব্যাপারে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি প্রসাদ। গিরীন যে ছবি প্রোডিউস করছে এটা ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানে একমাত্র তুমি ছাড়া। সত্যি ভাই, তোমার মত এমন অন্ধবিশ্বাসী বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

উল্টোরথ অফিসে বসে এসব কথাবার্তা আমার সামনেই হচ্ছিল। বিধুদার কথা শুনে প্রসাদদা আর কোনও কথা বললেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম প্রসাদদার মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় তাঁর টকটকে ফর্সা মুখখানা কালো হয়ে গেছে।

বিধুদা চলে যাবার পরও প্রসাদদা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও কথা বলতে পারেননি। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রসাদদা নীরবতা ভঙ্গ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : গিরীন যে ছবি প্রোডিউস করছে সেটা তুই জানতিস?

আমি প্রসাদদার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

প্রসাদদা এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন : তোকে আমি আমার নিজের দাদাদের থেকেও বেশি বিশ্বাস করতাম। সেই তুইও আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করলি রবি?

প্রসাদদার ওইরকম কণ্ঠস্বর শুনে আমার সারা শরীরটা কেঁপে উঠল। কাতর কণ্ঠে বললাম : আমি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি প্রসাদদা!

প্রসাদদা বললেন : তবে গিরীনের ছবি করার কথা আমাকে বলিসনি কেন?

আমি বললাম : গিরীনদা আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন। আমাকে দিয়ে প্রমিস করিয়ে নিয়েছিলেন আপনাকে যাতে কোনও কথা না বলি।

আমার কথা শুনে প্রসাদদা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপরে বললেন : ঠিক আছে। এর জবাব গিরীনকে আমি দোব।

পরের দিন সকাল থেকে প্রসাদদা যেন অন্য মানুষ। আগের দিনের ঘটনার কোনও ছাপ নেই তাঁর মুখে। উল্টে গুন গুন করে একটি গানের কলি তাঁর মুখে ভেসে বেড়াতে লাগল। 'এ গান তোমার শেষ করে দাও নতুন সুরে বাঁধো বীণাখানি'। গানটি নিউ থিয়েটার্সের 'দিদি' ছবিতে কে. এল. সায়গলের গাওয়া। গানটি প্রসাদদার খুব প্রিয়। প্রসাদদা এর আগে যখন 'চলন্তিকা' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন রাজরোষে পড়ে 'চলন্তিকা' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় প্রসাদ সিংহ আর যাতে কোনওদিন কোনও পত্রিকার সম্পাদক না হতে পারেন সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারিও করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন তিনি উল্টোরথ পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তার সর্বেসর্বা হওয়া সত্ত্বেও সম্পাদক হিসেবে প্রসাদদার নাম ছিল না। নাম ছিল ওঁদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ী মাস্টারমশাই মনোজ দত্তর নাম। এই মনোজ দত্ত ছিলেন একজন সদানন্দ পুরুষ। আমাদের সকলের প্রিয় মনোজদা। গড়পারে ওঁদের বনেদি পরিবার। অভিনেতা স্বরূপ দত্তের উনি নিজের কাকা।

'চলন্তিকা' বন্ধ হয়ে যাবার পর প্রসাদদা প্রায়ই গুণ গুণ করে 'এ গান তোমার শেষ করে দাও' গানখানি গাইতেন। তারপর একদিন দেখা গেল উনি একেবারে সম্পূর্ণ নতুন সুরে, নতুন আঙ্গিকে 'উল্টোরথ' পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

বিধুদার সেদিনের সেই ঘটনার পরদিন প্রসাদদাকে আবার নতুন করে 'এ গান তোমার শেষ করে

দাও' গাইতে শুনে বুঝতে পারলাম প্রসাদদা মনে মনে নতুন কোনও মতলব আঁটছেন। কিন্তু সে ভাবনাটা যে 'মণিহার' ছবির, তা বুঝতে পারিনি।

তরপর একদিন সন্ধেবেলা এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রসাদদা পরিচালক সলিল সেনকে 'মণিহার' ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব দিলেন। প্রসাদদার ইচ্ছে ছিল অন্য একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়ার। তিনি হলেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের সহকারী দিলীপ দে চৌধুরি। কিন্তু তাঁকে যথাসময়ে পাওয়া গেল না। আর ঠিক সেই সময়ে নাট্যকার ও পরিচালক সলিল সেন তাঁর একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন উল্টোরথে প্রকাশের জন্য।

কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তা আমি সম্ভবত বর্তমানের পৃষ্ঠায় পাঠকদের ইতিপূর্বে জানিয়েছি। সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছি না। প্রসাদদা সলিলবাবুকে 'মণিহার' ছবির কাহিনীর আউটলাইনটি বলে দিলেন। সেটা 'দিদি' ছবির বিপরীত। 'দিদি' ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। একটি পুরুষকে দুই বোন ভালোবেসেছিল। 'মণিহার'-এ একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল দুই ভাই।

ছোট ভাইয়ের চরিত্রটি যে বিশ্বজিৎকে দেওয়া হবে সেটা প্রসাদদা আগেই ভেবে রেখেছিলেন। আর বড় ভাইয়ের চরিত্রে ভেবেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির নায়ক অরুণ মুখোপাধ্যায়কে। অরুণকে প্রসাদদা অনেক আগে থেকেই চিনতেন। তখন অরুণ নিয়মিত শম্ভু মিত্র নির্দেশিত বহুরূপী গোষ্ঠীর নাটকে অভিনয় করত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরুণের জায়গায় কাস্টিং-এ এসে গেলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অরুণের ব্যাপারে বাধা দিয়েছিলেন 'মণিহার' ছবির পরিবেশক চণ্ডীমাতা ফিল্মসের নারায়ণ সাধুখাঁ। তিনি বললেন : অরুণবাবু খুবই ভালো অভিনেতা সন্দেহ নেই। তবে বড় ভাইয়ের ওই হেভি রোলে একজন গ্ল্যামারওলা শিল্পীর দরকার। নইলে আমার পক্ষে ব্যবসা করা মুশকিল হবে।

ব্যবসার প্রসঙ্গ ওঠাতে প্রসাদদা একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। অতএব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করলেন তিনি। সৌমিত্র ছিলেন প্রসাদদার সেকেন্ড চয়েস। এই নামটি নারাণবাবুর মনঃপূত হল।

কিন্তু নায়িকার ব্যাপারে প্রসাদদা অনড় রইলেন। উনি একজন নতুন মেয়েকে চান।

প্রসাদদা বললেন : দুজন নামকরা নায়কের মাঝখানে সুযোগ দিলে একটি নতুন মেয়েকে অনায়াসে বার করে আনা যাবে। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

সেই মর্মে 'নতুন নায়িকা চাই' বলে উল্টোরথের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তার উত্তরে ভুরি ভুরি ছবি আসতে লাগল। বাংলাদেশে যে নায়িকা হবার জন্যে এত মেয়ে মুখিয়ে বসে আছে সেটা আগে জানতাম না। বরং আমার একটা উল্টো ধারণা ছিল। বাজারে ফিল্ম লাইন সম্পর্কে একটা অহেতুক বদনাম আছে। আমার ধারণা ছিল ভদ্রবাড়ির মেয়েরা তাই সিনেমা লাইনটাকে সযত্নে পরিহার করে চলেন। কিন্তু ওই হাজার হাজার ছবি আর আবেদন দেখে আমার এতদিনের ধারণাটাকে পাল্টে নিতে হল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'মণিহার' ছবির নায়িকা নির্বাচিত হলেন সন্ধ্যা রায়। সন্ধ্যা রায় নিশ্চয়ই নবাগতা নন এবং তিনি আবেদনপত্রও পাঠাননি। তা সত্ত্বেও এটা কেমন করে সম্ভব হল?

বরং আমরা তো ধরেই নিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী সুন্দরী বন্দনা সিংহ হবেন আমাদের 'মণিহার' ছবির নায়িকা। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যা রায় কেমন করে 'মণিহার'-এর নায়িকা হলেন, সেটা জানতে গেলে ঘটনার আরও একটু গভীরে যেতে হবে।

আমার অনেকদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে সলিল সেন পরিচালিত 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' সন্ধ্যা রায়ের প্রথম ছবি। ছবিটি ১৯৫৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল। অনেক পরে এ ব্যাপারে আমার ভুল ভেঙেছিল। তখন জানতে পেরেছিলাম যে, সন্ধ্যা রায়ের প্রথম ছবি রাজেন তরফদার পরিচালিত 'অন্তরীক্ষ', যেটি 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছবির অন্তত মাস দশেক আগে মুক্তি পেয়েছিল।

এই ভুলটা শুধু আমিই নয় উল্টোরথ পত্রিকা গোষ্ঠীর সকলেই করেছিলেন। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছবিতে দুটি প্রধান নারী চরিত্রে ছিলেন মঞ্জুলা ব্যানার্জি এবং সন্ধ্যা রায়। দুজনেই দারুণ অভিনয়

করেছিলেন। আমরা তখন ওঁদের নবাগত শিল্পী বলে কত ক্যাপশন করেছি। দিনের পর দিন নিউজের মাধ্যমে নবাগতা বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমাদের এই ভুলটা তখন কেউ ধরিয়ে দেয়নি। কোনও প্রতিবাদও আসেনি।

আমার এখনও মনে পড়ে না 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে সন্ধ্যা রায় কোন্ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ওই ছবিটি অবশ্য আমি একবারের বেশি দুবার দেখবার সুযোগ পাইনি। ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জোর আলোচনা হয়েছিল নতুন পরিচালক রাজেন তরফদারকে নিয়ে। তার কারণ সত্যজিৎ রায়ের পর তিনিই দ্বিতীয় অঙ্কনশিল্পী, যিনি ছবি করতে এলেন। তারও পরে এসেছেন ও. সি. গাঙ্গুলি এবং পূর্ণেন্দু পত্রী। রাজেনবাবু ছিলেন জে ওয়াল্টার টমসন কোম্পানির আর্ট ডিরেক্টর। শুনেছি সত্যজিৎবাবু তাঁর অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু সত্যজিৎবাবু প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' করে বিশ্বব্যাপী এত নাম করে ফেলেছিলেন যে তাঁর পর রাজেন তরফদারের ফিল্ম করতে আসা নিয়ে দর্শক এবং সিনেমার আলোচকদের মধ্যে একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল।

'অন্তরীক্ষ' ছবিতে রাজেনবাবুর কাজের পাশাপাশি আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম দুজন শিল্পীর অসাধারণ অভিনয়। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ছবির নবাগতা নায়িকা কাজল চ্যাটার্জি আর একজন হলেন ভিলেন চরিত্রে কালীপদ চক্রবর্তী। কালীপদবাবু তার আগে অনেকদিন ধরেই পেশাদার থিয়েটারে অভিনয় করেছেন, ছবিতেও টুকটাক কাজ করেছেন, কিন্তু রাজেনবাবু যেন তাঁকে নবজন্ম দিলেন। কালীপদবাবুর পিঙ্গল চোখের তারা দুটিকে কী দুর্দান্তভাবে ব্যবহার করেছিলেন রাজেনবাবু যে কী বলব! অনেকে বলেন, 'উত্তরফাল্গুনী' ছবিতে সুচিত্রা সেনের স্বামীর চরিত্রেই কালীবাবুর শ্রেষ্ঠতম কূট চরিত্রাভিনয়। কিন্তু আমার তো 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে আরও অনেক বেশি ভালো লেগেছিল কালীপদবাবুকে। ওই ছবির প্রিন্ট এখন আর আছে কি না জানি না। থাকলে আমার এই উক্তির সত্যাসত্য মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারত।

কাজল চ্যাটার্জি পরবর্তী কালে পরিচালক দীনেন গুপ্তকে বিয়ে করে কাজল গুপ্ত হয়েছেন। দীনেনবাবু 'অন্তরীক্ষ' ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন। অসম্ভব ভালো কাজ করেছিলেন তিনি। জানি না ওঁদের জীবনের পূর্বরাগের সূচনা ওই 'অন্তরীক্ষ' ছবির সময় থেকেই হয়েছিল কি না!

'অন্তরীক্ষ' ছবিতে নতুন পরিচালক, নতুন নায়িকা, নতুন করে আবিষ্কৃত একজন কূট চরিত্রাভিনেতা আমাদের সারা মনটাকে এমনভাবে অধিকার করে রেখেছিল যে, সন্ধ্যা রায় নামে একজন নবাগতা শিল্পী যে সেই ছবিতে প্রথম চিত্রাবতরণ করলেন, তার কোনও খোঁজই রাখিনি। কিন্তু 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছবিতে সন্ধ্যা রায় ভীষণভাবে নজরে পড়েছিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছিলাম তাঁর বিস্ময়কর অভিনয়। বিশেষ করে যে দৃশ্যে তিনি নিজের শরীরে সাপ লুকনো আছে এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে নিজেকে বিবস্ত্র করছেন, সেই দৃশ্যের কথা তো আজও ভুলতে পারিনি। যেমন জোরালো অভিনয় তেমনি জোরালো এক্সপ্রেশন। নবাগতা মঞ্জুলা ব্যানার্জি আর সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলাম বাংলা ছবির জগতে ওই দুই শিল্পীর স্থায়িত্ব সম্পর্কে।

আমার এই অনুমান পুরোপুরি মিলে গিয়েছে সন্ধ্যা রায় সম্পর্কে। আজ তিনি বাংলা ছবির প্রথম সারির অভিনেত্রী। কিন্তু মঞ্জুলা ব্যানার্জি সম্পর্কে মিলে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মিলল না। মঞ্জুলা এরপর আরও কয়েকটি ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করলেন। বিশেষ করে সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'অগ্নিসম্ভবা' ছবিতে তাঁর অভিনয় ছিল তুলনাহীন। কিন্তু সেই মঞ্জুলা শেষ পর্যন্ত অভিনয় জীবনটাকেই গুডবাই করলেন।

আমার বন্ধু অসীমকুমার সরকার কার্তিক চ্যাটার্জি পরিচালিত 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছবিতে নিমাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করে দারুণ নাম করেছিল। ওই একটি ছবিতে কাজ করেই অসীম রাতারাতি স্টার হয়ে গেল। স্টার শব্দটা আমি প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করলাম। নইলে স্টার শব্দের একটা ব্যপকতা আছে। সেই অর্থে ক'জন শিল্পীকেই বা স্টার আখ্যা দেওয়া যায়। তবু আমাদের সিনেমা লাইনে দেখেছি একটু নাম-ধাম করলেই তাকে স্টার বলে উল্লেখ করা হয়। সেই হিসেবে অসীমকুমারও স্টার আখ্যা পেয়ে গিয়েছিল।

আমাদের দেশে মাইথোলজিকাল ছবিতে ভালো অভিনয় করতে পারলে শহর আর গ্রাম সব মিলিয়ে বেশ একটা পপুলারিটি হয়। কিন্তু তারপর তার পক্ষে সামাজিক ছবিতে কাজ পেতে বেশ অসুবিধা হয়। অসীমেরও তাই হয়েছিল। 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছবির পর সে বিশেষ কাজকর্ম পাচ্ছিল না। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছুক্ষণ' ছবিতে কিংবা সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'কাজল' ছবিতে অত ভালো কাজ করার পরও অসীমের মাইথোলজিকাল দশা কাটছিল না। ওর মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন এসে যাচ্ছিল, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

ঠিক সেই সময়ে অসীম 'জল জঙ্গল' বলে একটি ছবিতে নায়কের চরিত্রে কাজ পেয়ে গেল। সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে মনোজ বসু রচিত এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। খবরটা শুনে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম। এই ধরনের একটা ওয়াইল্ড চরিত্রই অসীমের জন্যে খুব দরকার ছিল। আরও উল্লসিত হয়েছিল ছবির নায়িকার নাম শুনে। তিনি হলেন মঞ্জুলা ব্যানার্জি। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছবিতে এই ধরনের বন্য চরিত্রই তিনি করেছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা রায়ের কথা মনে পড়ে গেল। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছবিতে মঞ্জুলা আর সন্ধ্যা দুজনের অভিনয় আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও সন্ধ্যার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি ছিল। মঞ্জুলার চেহারার মধ্যে যে বন্যতা সেটা যেন সিনেমার জন্যে সাজানো বন্যতা। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে সেটা ছিল একেবারেই সহজাত। আমার এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' এবং বিজয় বসুর 'বাঘিনী' ছবিতে সন্ধ্যার অভিনয়ের কথা ভাবলে। ওই চরিত্রগুলিতে যেন সন্ধ্যা ছাড়া আর কাউকেই মানায় না।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ছবি দেখার পর সন্ধ্যা রায়ের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের কথা আমি বেশ জোর গলাতেই বলে বেড়াতাম। এই নিয়ে আমার বন্ধুমহলে আমাকে খানিকটা টিটকিরিও শুনতে হত। তারা বলত, তুমি যতই বলো ভাই, ওইরকম শর্ট হাইট নিয়ে ছবির নায়িকা হওয়া যায় না। প্রথম প্রথম দু-চারটে ছবিতে কাজ হয়তো পাবে, তারপর একদিন আপনা থেকেই সরে যেতে হবে সন্ধ্যা রায়কে।

আমি এসব কথার জোর গলায় কোনও প্রতিবাদ করতাম না। মনে মনে দুঃখ পেতাম বন্ধুদের দূরদর্শিতার অভাব দেখে। ওরা কেবল সন্ধ্যার শরীরের শর্ট হাইটের কথাই চিন্তা করল! ওর অ্যাকটিং-এর যে হাইট তার কথাটা ভাবল না।

আমি খুশি আমার অনুমান সত্যি হয়েছে। তবে সেদিন 'জল জঙ্গল' ছবিতে মঞ্জুলার জায়গায় যদি সন্ধ্যা রায়কে কাস্ট করা হতো তবে আরও বেশি খুশি হতাম। তবে মঞ্জুলার ব্যাপারটাও মন্দের ভালো বলতে হবে। অসীম আর মঞ্জুলাকে পাশাপাশি মানাবে ভালো। অসীমের দুঃখের কপালটা বোধহয় বদল হল এবার।

কিন্তু তখন কি আর জানতাম অসীমের সত্যিকারের দুঃখের জীবন তখন থেকেই শুরু হল। সেটার আঁচ পেয়েছিলাম 'জল জঙ্গল' ছবির আউটডোর থেকে ফেরার পর অমূল্যবাবুর কথায়।

নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান অমূল্য মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন অদ্ভুত মানুষ। উনি ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের একজন গোঁড়া ভক্ত। বয়সের তফাত থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে ওঁর এক ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। একটু সময় পেলেই উনি উল্টোরথ পত্রিকার অফিসে এসে আমার সঙ্গে রামকৃষ্ণ আলোচনায় বসে যেতেন। ওঁর সান্নিধ্য আমার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে প্রচুর সহায়তা করেছে। তবে ওইসব আলোচনায় বসলে অন্যান্য কাজকর্ম একেবারেই মাটি হয়ে যেত। ঠাকুর রাঁধা আর চুল বাঁধার কথাটা সহজ করে বললেও আমার পক্ষে দুদিক বজায় রাখা প্রাণান্তকর হয়ে উঠত। তবু আমি মনেপ্রাণে চাইতাম অমূল্যবাবু ঘন ঘন আসুন।

তা সেবার 'জল জঙ্গল'-এর আউটডোর থেকে ফিরে অমূল্যবাবু বললেন : রবিবাবু, আপনি অসীমকুমারের বন্ধু বলে কথাটা আপনাকেই সর্বাগ্রে না জানিয়ে পারছি না। অসীম বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করতে চলেছে।

অমূল্যবাবুর কথা শুনে মনে হল অসীম নিশ্চয় কোনও গোঁয়ার্তুমির কাণ্ড করেছে। এমনিতে ও খুব শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু একবার রেগে গেলে দুর্বাসার বাবা। ওর তখন কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়।

নিশ্চয় শুটিং-এর সময় এমন কোনও কাণ্ড ঘটেছে যাতে ও এই ছবিটার কাজ ছেড়ে দিয়েছে অথবা দিতে চলেছে। এটা খুবই খারাপ ব্যাপার। একটু আক্ষেপের সুরে অমূল্যবাবুকে বললাম : সত্যিই এটা অসীমের ভুল সিদ্ধান্ত। এভাবে একটা কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

অমূল্যবাবু বললেন : ছেড়ে দেওয়া কী বলছেন রবিবাবু, ও তো ধরেছে।

আমি বললাম : তার মানে! কী ধরেছে অসীম?

অমূল্যবাবু বললেন : শুনবেন কী ধরেছে? অসীম মঞ্জুলাকে ধরেছে।

আমি বললাম : মঞ্জুলাকে ধরেছে মানে?

অমূল্যবাবু বললেন : অসীম মঞ্জুলাকে বিয়ে করবে বলে ডিসিশান দিয়েছে।

আমি বললাম : এটা তো শুভ সংবাদ। এটাকে অসীমের ভুল সিদ্ধান্ত বলছেন কেন?

অমূল্যবাবু বললেন : বলছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে। আপনার থেকে তো আমার বয়স বেশি। জীবনের অনেক কিছু দেখেছি। এই জাতীয় বিয়েগুলি সাধারণত সুখের হয় না।

তা অমূল্যবাবুর অনুমান যে সত্যি সেটা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল। অসীম বিয়ে করেছিল মঞ্জুলাকে, মে ফেয়ারে ফ্ল্যাটও নিয়েছিল। কিন্তু দু-এক বছরের মধ্যেই শুনলাম ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মঞ্জুলা ফিল্ম ছেড়ে অন্য প্রফেস্যানে চলে গেছে।

সন্ধ্যা রায় আর মঞ্জুলা ব্যানার্জি দুজনে প্রায় একই সময় ফিল্মে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নিজেকে দারুণবাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর একজন চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন। এইসব দেখেশুনে মনে হয়, ফিল্মে সুযোগ পাওয়াটাই বড় কথা নয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার, বিকশিত করার জন্য একটা জেদ থাকা দরকার। সন্ধ্যার সেটা ছিল। তাই তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন। এই নিষ্ঠাটা একজন অভিনেত্রীর কাছে খুবই জরুরি। লড়াই করার মানসিকতা না থাকলে কখনও বড় হওয়া যায় না। সন্ধ্যাকেও প্রচণ্ড লড়াই করে জিততে হয়েছে। সহজে কোনও ব্যাপারটাই আসেনি। সে কথায় পরে আসছি। আপাতত আমাদের 'মণিহার' ছবির নায়িকা হবার ঘটনাটা বলি।

'মণিহার' ছবির কথাটা সাতকাহন করে বলছি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বলছি এই কারণে যে 'মণিহার' ছবিটা সন্ধ্যার জীবনের একটি দিকচিহ্ন।

'মণিহার' ছবির নায়িকা কে হবেন তা নিয়ে আমরা সকলেই একটা সাসপেন্সের মধ্যে ছিলাম। কেবল আমরাই নয়, উল্টোরথের পাঠক-পাঠিকারাও ছিলেন। প্রত্যহ অন্তত একশোখানা করে চিঠি আসত নায়িকার নাম জানতে চেয়ে। এই কৌতূহলটা আমরাই তৈরি করেছিলাম। প্রতি সংখ্যাতেই 'মণিহার' সংক্রান্ত সংবাদ বিশদভাবে ছাপা হত, কেবল নায়িকার নামটি ছাড়া। সেই জায়গায় বিরাট একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকত।

একদিন বেলা বারোটা নাগাদ প্রসাদদা খেতে যাবার আগে আমার হাতে একখানা কাগজে মোড়া ব্লক দিয়ে বললেন : পাঠকদের চিঠিপত্রের জ্বালায় তো জান অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই ব্লকটা হল 'মণিহার' ছবির নায়িকার। এই সংখ্যাতেই এটা ছেপে দিস বেশ লাগসই ক্যাপশন দিয়ে।

কাগজটা খুলে আমার চোখ ছানাবড়া। এ কী ব্যাপার! এ ব্লকটা একজন মানুষের মুখের ছবির থেকে করা ঠিকই, কিন্তু সেটা বোঝবার উপায় নেই। ব্লকটা তৈরি করে সেটা খণ্ড খণ্ড করে কাটা রয়েছে। তারপর সেই কাটা অংশগুলো এলোমেলোভাবে এখানে সেখানে কাঠের ওপর পেরেক দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এটা ছাপা হবার পর কেউ যদি ধৈর্য ধরে কাটা অংশগুলো অন্য একটা কাগজে আঠা দিয়ে জোড়ে তাহলে আসল চেহারাটি বেরিয়ে আসবে।

প্রসাদদার মাথা থেকে প্রচারের এমন একটি কায়দা বেরিয়েছে দেখে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কিন্তু নিজের মনেও তো একটা কৌতূহল ছিল। তাই বললাম : প্রসাদদা, এটা একটা দারুণ ব্যাপার হবে। খুব হইচই পড়ে যাবে চারদিকে। তবে আসলে মুখটা কার সেটা একটু বলুন না আমাকে।

প্রসাদদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন : ওটা তোর কাছেও সাসপেন্সে থাক। আসল ব্লকটা আমার আলমারিতে চাবি দেওয়া রইল। ওটা নেক্সট ইস্যুতে ছাপা হবে। তার আগে এই ভাঙা ব্লকটাকে নিয়ে একটা ভালো করে ক্যাপশন ভাব দেখি। আমি তো মাথা খাটিয়ে একটা জিনিস বার করেছি। এবারে

সেটাকে আরও ওপরে তোলার জন্য তোর কেরামতিটা দেখি।

তা আমি মাথা খাটিয়ে যে ক্যাপশনটা লিখেছিলাম তার জন্য নিজেরই নিজের পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করেছিল। আমি পাঠকদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিলাম যে, 'মণিহার'-এর নায়িকা কে তা এই সংখ্যাতেই জানাবার জন ব্লক ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মেশিন চালাবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ক্কড় ক্কড় ক্কড় ক্কড়াৎ শব্দ। দেখা গেল ঠিক ওই ব্লকখানাই ভেঙে চুরমার। কিন্তু যেহেতু আমাদের আর নতুন ব্লক তৈরি কবাবার মতো সময় হাতে ছিল না, তাই ওই ভাঙা ব্লকটিকেই ছেপে দিতে হল। উৎসাহী পাঠকরা ইচ্ছে করলে কাটা অংশগুলিকে জোড়া দিয়ে নায়িকার আসল চেহারাটা খুঁজে বার করতে পারেন। নতুবা আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী সংখ্যায় নতুন ব্লক ছাপা হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত, লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

তা এই ক্যাপশন দেখে প্রসাদদা বিকেলে এসে সত্যি সত্যিই আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিনে। এই ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূপ যখন প্রসাদদার কাছে 'মণিহার' ছবির নায়িকার নাম জানতে চাইলাম, তখন উনি একেবারে মৌনীবাবা সেজে গেলেন এবং অন্য কাজে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দিন চারেকও গেল না, পাঠকদের কাছ থেকে রাশি রাশি খামে মোড়া চিঠি আসতে লাগল। তাঁরা সবাই জোড়া দিয়ে নায়িকার আসল চেহারাটি বার করে ফেলেছেন। তিনি হলেন সন্ধ্যা রায়। আমি অবশ্য ওঁর নামটা পবের দিন সকালবেলাতেই জানতে পেরেছিলাম। আমাদের মেসিনম্যানরা ফর্মা ছাপতে ছাপতেই কাটা অংশ জোড়া দেবার কাজ সেরে ফেলেছিল এবং আমাকে একটা কপি উপহার দিয়েছিল।

এইভাবে নানা নাটকীয় ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে আমরা 'মণিহার' ছবির নায়িকা হিসেবে সন্ধ্যা রায়ের যে পাবলিসিটি করেছিলাম, তিনি তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিলেন সুন্দর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। চরিত্রটির মধ্যে এমনিতে খুব বেশি একটা নাটকীয়তা ছিল না, কিন্তু শ্রীমতী সন্ধ্যা সাইলেন্ট অ্যাকটিংটা অপূর্ব করেছিলেন। বিশেষ করে সংগীতের অংশে। লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে এই ছবিতে বেশ কিছু রাগাশ্রয়ী গান গাওয়ানো হয়েছিল। সন্ধ্যা সেইসব গানে অপূর্ব লিপ দিয়েছিলেন। আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম তাঁর অভিনয় দেখে। বিশেষ করে প্রসাদদা। তাই ছবির কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদদা ডিসিশন নিয়ে নিলেন ছবি রিলিজের দিন সবকটি সংবাদপত্রে সন্ধ্যা রায়ের বিরাট মুখের ছবি দিয়ে ফুল পেজ বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এর আগে কোনও বাংলা ছবির ফুল পেজ বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে ছাপা হয়নি। পরেও হয়েছে কি না আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আর এই বিজ্ঞাপনের দৌলতে সন্ধ্যা রায় বিরাট একটা মর্যাদা পেয়ে গেলেন বাংলা সিনেমার জগতে।

প্রসাদ সিংহ 'মণিহার' ছবির রিলিজ দেখে যেতে পারেননি। তার আগে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল গলব্লাডার অপারেশন করাতে গিয়ে। শুনেছি এই অপারেশনে শতকরা একজন রোগী মারা যান কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রসাদদার জীবনে সেই দুর্দৈব ঘটেছিল। এইভাবেই একটি কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘনিয়ে এসেছিল।

এই লেখাটা লিখতে লিখতেই 'আমার প্রিয় গান' সিরিজে 'মণিহার' ছবির একটি গান শুনতে পেলাম দূরদর্শনের পর্দায়। শ্রীমতী সন্ধ্যার মুখে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়/কে যেন গো ডেকেছে আমায়' গানখানি শোনা গেল। গানটা শুনতে শুনতে আরও একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। এটা প্রাসঙ্গিক কী অপ্রাসঙ্গিক তা জানি না, তবে ঘটনাটা পাঠকদের কাছে না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

'মণিহার' ছবির পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসাদদা ঠিক করে রেখেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে মিউজিক দেওয়াবেন। সেইমতো তাঁর সঙ্গে কথা বললেন প্রসাদদা। তবে সঙ্গে দুটি শর্ত ছিল। প্রথম শর্ত, নায়িকার মুখে দেবার জন্যে অনেকগুলি গানে তাঁকে সুর দিতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত, গানগুলির অধিকাংশই রাগাশ্রয়ী হতে হবে।

শুনে হেমন্তদা বললেন : রাগাশ্রয়ী গান কি আজকাল চলবে! আজকালকার যা পাবলিক—

প্রসাদদা বললেন : চলবে কি না চলবে সেটা দেখার তো আপনার দরকার নেই। ক্ষতি যদি হয় তো আমার হবে। আপনি পারবেন কি না সেটা বলুন।

প্রসাদদার মুখে এই ধরনের দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনে হেমন্তদার মনেও একটা দৃঢ়তা এসে গেল। হেমন্তদা বললেন : পারব না কেন, নিশ্চয়ই পারব। বেশ আনন্দের সঙ্গেই পারব। আজকালকার প্রোডিউসাররা তো কেউ এই ধরনের প্রস্তাব দেয় না। নইলে আমিও তো চাই রাগাশ্রয়ী গান সিনেমার পর্দায় আসুক।

তা অসাধারণ সুর করেছিলেন হেমন্তদা। ছবি রিলিজ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মুখে মুখে 'মণিহার' ছবির গান ফিরতে লাগল। প্রথম মাসেই এত রেকর্ড বিক্রি হল যে রয়্যালটি বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা এসে গেল প্রোডিউসারের হাতে। গ্রামোফোন কোম্পানির সেই চেক আমিই হাতে করে রিসিভ করেছিলাম।

লতা মঙ্গেশকরও গানের সুর শুনে এত খুশি হয়েছিলেন যে নিজের পারিশ্রমিকের অঙ্ক তো কমিয়ে দিলেনই, উপরন্তু রেকর্ড বিক্রির রয়্যালটি বাবদ একটি পয়সাও নিলেন না। সবটাই প্রোডিউসারকে দিয়ে দিলেন। এটাও একটা ইতিহাস।

আর শ্রীমতী সন্ধ্যা রায়? ছবির গানগুলি জনপ্রিয় করার মূলে তাঁর অবদান ছিল বইকি। তিনি যে অত ভালো লিপ দিতে পারেন গানে, সেটা আমার আগে জানা ছিল না। তাঁর এই গুণটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন পরিচালক তরুণ মজুমদার, যাঁর সঙ্গে শ্রীমতী সন্ধ্যার জীবন পরবর্তীকালে কঠিন বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল। এবারে সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

অবশেষে সন্ধ্যা রায় 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তার একটা হদিস পাওয়া গেল। সে হদিসটি সন্ধ্যা নিজেই দিলেন। ক'দিন আগে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাঁর টালিগঞ্জের এন এন সেন লেনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়ির নাম 'সন্ধ্যানীড়'। অনেক মমতার সঙ্গে সন্ধ্যা রায় আর তাঁর স্বামী তরুণ মজুমদার দু'জনে মিলে এই বাড়িটি করেছেন। এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করে তাঁদের অনেক পরিকল্পনা। অবসর গ্রহণের পর এখানেই তাঁরা গড়ে তুলবেন একটি অরফ্যানেজ। নিরাশ্রয় অসহায় শিশুরা এখানে পাবে শিক্ষা স্নেহ আর মমতা। তাই নিয়ে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার কাজও চলছে। টালিগঞ্জের আর এক প্রান্তে আরও একটি বাড়ি তৈরি করার কথা হচ্ছে, যেখানে কেবল শিশুরাই নয়, অবহেলিত বৃদ্ধরাও তাঁদের বার্ধক্যের বারাণসী খুঁজে পাবেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা রূপায়ণের কিছু বিলম্ব আছে। ওঁদের দু'জনের কেউই তো আর এখনই অবসর নিতে পারছেন না। আগামী কয়েকটি বছর এখনও স্বকর্মেই ব্যস্ত থাকতে হবে ওঁদের।

যে কথা বলছিলাম। 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে সন্ধ্যার অভিনীত চরিত্রের হদিস তিনি নিজেই দিলেন। সেদিন সকালে সদ্যস্নাতা সন্ধ্যাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। ভেজা চুল পিঠময় ছড়ানো। কপালের মাঝখানে একটি বড়সড় টিপ। মমতাময়ী এক মাতৃমূর্তি। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এই বয়সেও সারা মুখে কিশোরীর কোমলতা এবং সরলতা।

সন্ধ্যা বললেন : 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে আমার রোলটা ছিল নায়িকা কাজল চ্যাটার্জির বন্ধুর। তখন আমার মাত্র বারো বছর বয়েস।

ও হরি! সেইজন্যেই ওই ছবিতে সন্ধ্যা নজরে পড়েননি। নবাগতা যদি হয় কিশোরী আর তার রোল যদি তেমন সিগনিফিক্যান্ট না হয়, তাহলে তো নজরে না পড়বারই কথা। তাই সন্ধ্যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু মাত্র বারো বছর বয়সে যদি কেউ টাকার জন্যে অভিনয় করতে আসে তাহলে তার পিছনে নিশ্চয় কোনও করুণ ইতিহাস থাকে। সন্ধ্যারও তাই ছিল। সেটাও সন্ধ্যার মুখ থেকে জানা গেল। তবে তার আগে আমাকে মৃদু অনুযোগ শুনতে হল সন্ধ্যার কাছে থেকে।

সন্ধ্যা বললেন : আমাকে নিয়ে আপনার লেখাটা অসাধারণ হচ্ছে। আপনি যে কবে থেকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করেছেন, এটা ভাবতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে। এই কথাগুলো বলতে বলতে সন্ধ্যার মধ্যে আমার কিছুটা আবেগ এসে গেল। সেটা সামলাবার জন্যে একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন : কিন্তু আপনার একটি মন্তব্য নিয়ে আমার আত্মীয়স্বজনরা একটু আহত হয়েছেন রবিবাবু।

আমি বললাম : তাই নাকি! কোন্ মন্তব্যের জন্যে বলুন তো?

সন্ধ্যা বললেন : ওই যে আপনি লিখেছেন আমি নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। সেই কথাটাই ওঁদের বেদনা দিয়েছে।

আমি বললাম : কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি আপনি দারিদ্র্যের কারণেই ফিল্মে অভিনয় করতে এসেছিলেন, সেটা কি মিথ্যে?

সন্ধ্যা বললেন : না। সেটাও যেমন সত্যি, তেমনি আমি যে যশোর জেলার এক বিশিষ্ট উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে, সেটাও তেমনি সত্যি।

আমি বললাম : তাই নাকি? তাহলে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো!

সন্ধ্যার হাতে সেদিন সকালে বিশেষ সময় ছিল না। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেখানে যাবার সময় হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে সন্ধ্যা সংক্ষেপে তাঁর শৈশব আর কৈশোরের অতীত জীবনটা একটুখানি মেলে ধরলেন।

যশোর জেলার মাগুরা সাব ডিভিশনের বেজপাড়া গ্রামে সন্ধ্যাদের আদি বাড়ি। ওঁর বাবার নাম সতীশচন্দ্র গুহরায় চৌধুরি। সন্ধ্যার পূর্বপুরুষরা ওই অঞ্চলের ছোটখাট জমিদার ছিলেন। যেমন বর্ধিষ্ণু পরিবার, তেমনি অর্থোডক্স। বাড়ির মেয়েদের বাইবে বেরনো নিষেধ। এমন কি পড়াশোনা করতে যাওয়ার। যা কিছু পড়াশোনা সব ঘরে বসে করতে হবে মেয়েদের। সঙ্গত কারণেই লেখাপড়ার ব্যাপারটা বাধাপ্রাপ্ত হত। সেই অবস্থার শিকার হতে হয়েছিল সন্ধ্যাকেও। তাই গ্রামের বাড়িতে বসে লেখাপড়ার ব্যাপারটা খুব বেশিদূর এগোয়নি সন্ধ্যার। তবে পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে ওটা তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ওঁদের পরিবারের ওপর নেমে এল ভীষণ বিপর্যয়। পর পর দু' বছরের মধ্যে সন্ধ্যার বাবা আর মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। সন্ধ্যা তখন ন' বছরের কিশোরী।

সন্ধ্যার জন্মসালটা নিয়ে একটু মতদ্বৈধতা আছে। সন্ধ্যা বললেন : আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি আমার জন্ম ১৯৪৬ সালে। কিন্তু আমার নিজের মনেই তা নিয়ে একটু সন্দেহ আছে। ঠিক ঠিক সালটা যাঁরা বলতে পারতেন তাঁরা যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন তখন আমার ভাল করে জ্ঞানই হয়নি। এই সালটা শুনেছি আমার দিদিমার মুখ থেকে। তিনি আবার আন্দাজে আন্দাজে বয়সটার হিসেব করেছিলেন। কাজেই আমার জন্মের সালটা ১৯৪৫-ও হতে পারে, আবার ১৯৪৭-ও হতে পারে। সঠিক সালটা আমি জানি না। তবু আমার পার্সোনাল রেকর্ডে ১৯৪৬ সালটাই লিখে রেখেছি।

সন্ধ্যা রায়ের জন্ম কিন্তু যশোরের বেজপাড়া গ্রামে নয়। উনি জন্মেছিলেন নবদ্বীপের পোড়ামাতলায়। ওই মন্দিরে ঢেলা বেঁধেই সন্ধ্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। যে কারণে পোড়ামাতলার মন্দির সম্পর্কে সন্ধ্যার একটা সফ্‌ট কর্নার আছে। সন্ধ্যা বললেন : ওই রাস্তা ধরে ওয়ান ওয়াল শো করবার জন্যে যখনই যাই, তখনই আমি পোড়ামাতলার মন্দিরটা একবার দর্শন করে আসি। ওটা যেন আমার শৈশবকালের ঘরে ফেরা। ওই মন্দিরে অন্যদের বাঁধা ঢেলাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর আমার দুটো চোখ জলে ভরে যায়। বার বার স্বর্গতা মায়ের কথা মনে পড়ে। অন্যের কাছে এই ধরনের সেন্টিমেন্ট হয়তো একটা হাস্যকর ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে মোটেই তা নয়।

এই নবদ্বীপে সন্ধ্যা রায়ের দিদিমা থাকতেন। সন্ধ্যার বাবা তাঁর জন্যে স্বতন্ত্র আস্তানার ব্যবস্থা করেছিলেন এই নবদ্বীপেই। সন্ধ্যারা তারপর কলকাতায় চলে এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে। জামাইবাবু তখন তাঁর গার্জেন।

এই কলকাতাতেই মাত্র বারো বছর বয়স থেকে সন্ধ্যার কর্মজীবন শুরু। সে এক দুঃসহ দিন। একমুঠো ভাত তখন সন্ধ্যার কাছে অমৃতের সমতুল। শরীর ঢাকবার জন্যে একখানির বেশি দু'খানি জামা নেই। ছেঁড়া জামা গায়ে একটি বারো বছরের কিশোরী দুঃসহ বেদনায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত তারই সমবয়সী মেয়েদের ফিটফাট পোশাক পরে স্কুলে যাওয়া।

সেই সময়ে সন্ধ্যারা পাইকপাড়ায় রাণী রোডে থাকতেন। একদিন দেখলেন ওই পাড়ার একটি মেয়ে সকালবেলা সাজগোজ করে কোথায় যেন যাচ্ছে। নিছক কৌতূহলের বশেই সন্ধ্যা তাকে তার গন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। মেয়েটি বললে, সে কাজের সন্ধানে স্টুডিওতে যাচ্ছে।

কথাটা খট করে সন্ধ্যার মাথার মধ্যে গিয়ে বিঁধল। মেয়েটিকে তিনি অনুনয় করলেন : আমাকে

নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে। আমিও তোমার মতো কাজ করতে চাই।

মেয়েটি খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যার দিকে। ওর কচি কচি মায়াময় মুখখানার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর বললে : আমার সঙ্গে গেলেই কাজ পাবি কি না বলতে পারব না। তবু চল্ তো দেখি।

মেয়েটিই বাসভাড়া দিয়ে সন্ধ্যাকে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি ছবিতে এক্সট্রার কাজ করত। সন্ধ্যা নিজের পরনের ফ্রকটায় একটা গিঁট বেঁধে নিয়ে হাজির হয়েছিল টালিগঞ্জের এক স্টুডিওতে, যেখানে রাজেন তরফদার নামে এক ভদ্রলোক 'অন্তরীক্ষ' নামে একটি ছবির শুটিং করছিলেন।

রাজেনবাবু তাঁর ওই ছবির জন্য সন্ধ্যার বয়সী, অর্থাৎ বারো-তেরো বছরের একটি মেয়েকে খুঁজছিলেন। অনেকগুলি মেয়েকে তিনি দেখেওছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তাঁর মনঃপুত হয়নি। এক্সট্রাদের লাইনের মধ্যে সন্ধ্যাকে দেখে হঠাৎ তাঁর ভালো লেগে গেল। ওকে কাছে ডাকলেন, দু-চারটি কথা বললেন। পল্লীবালারা যে সব দুষ্টুমি এবং ডানপিটেপনা করে, সেসব পারে কি না জেনে নিলেন। তারপর মেক-আপ রুমে পাঠিয়ে দিলেন পোশাক পাল্টানোর জন্য।

সন্ধ্যার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার সেই গিঁট দেওয়া ছেঁড়া ফ্রকটা এখনও আছে?

সন্ধ্যা বললেন : ও মা! সে তো কবে পুরোটাই ছিঁড়ে গেছে। তারপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

আমি বললাম : ওটা রেখে দেওয়া উচিত ছিল স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

আমার কথা শুনে সন্ধ্যা একটু হাসলেন। বললেন : অদ্ভুত কথা বললেন আপনি রবিবাবু। সেদিন সেই মুহূর্তে আমার কাছে একবেলা পেট পুরে খাওয়া আর দিনের শেষে পাঁচটা টাকা একটা বৃহৎ প্রাপ্তি বলে মনে হয়েছিল। অভিনেত্রী হব, নাম-ধাম করব, গাড়ি-বাড়ি হবে এসব তো ক্ষীণতম ভাবনাতেও ছিল না। স্মৃতিরক্ষার মতো এত বড় কথাটা ভাবব কী করে!

আমি বললাম : 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে কত দিনের কাজ ছিল আপনার?

সন্ধ্যা বললেন : প্রথম দিন তো রাজেনবাবু বলেছিলেন পর পর দশদিন কাজে আসতে হবে। দুপুরের খাবার পাব আর পাঁচটা করে টাকা পাব। শুনে তো আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। দশটা দিন পেট পুরে খেতে পাব সেটাই তো মস্ত বড় কথা। তার ওপর আবার প্রতিদিন পাঁচ টাকা হিসেবে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা। সে যে অনেক টাকা! প্রথম কাজ করতে এসে অতগুলো টাকা একসঙ্গে রোজগার করতে পারবো সেটা তো কোনওদিনই ভাবিনি। তা সেই দশ দিনের কাজটা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ষাট দিনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমি বললাম : বলেন কী! দশ দিনের কাজ বাড়তে বাড়তে একেবারে ষাট দিন।

সন্ধ্যা বললেন : রাজেনবাবুর কাজের ধারাই ওইরকম। কাজ করতে করতে ওঁর কোনও দিক্-বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। নিজের মনেই কাজ করে যান। বাজেটের কথা ভাবেন না। প্রযোজকের কথা ভাবেন না। ছবির পারফেক্শানটাই তখন ওঁর কাছে বড় কথা। 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে তো দশ দিনের কাজ ষাট দিন হয়েছিল, আর 'গঙ্গা' ছবির বেলায় কী হয়েছিল জানেন?'

আমি বললাম : কী হয়েছিল?

সন্ধ্যা বললেন : আট মাসের কাজটা চার বছরে শেষ হয়েছিল। প্রযোজক প্রথম প্রথম দিন অথবা শিফটের হিসেব রাখতেন। পরে দিন গোনার ব্যাপারটা ছেড়ে দেন।

আমি বললাম : 'গঙ্গা' ছবির প্রযোজকের নাম শুনেছিলাম পাগলাবাবু। তা ছবির শুটিং-এর দিন গুনতে গুনতে কি উনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বলে ওঁর ওই নাম?

আমার কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেললেন। বললেন : না না, তা নয়। ওঁর ডাক নামটাই ছিল পাগলাবাবু।

তা ওই 'গঙ্গা' ছবিতেই সন্ধ্যা রায় একটা বিরাট এক্সপোজার পেয়ে গেলেন। আমার তো মনে হয় তখনকার বাংলা সিনেমার জগতে সমরেশ বসুর আঁকা 'গঙ্গা' উপন্যাসের গামলি পাঁচীর চরিত্রে রূপ

দেবার জন্যে সন্ধ্যা রায় ছাড়া আর কেউ ছিলেনই না। তরুণ মজুমদার সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন: কাদা-মাটি মাখা চরিত্রে, তার মানে যেসব ক্যারেকটার সয়েল থেকে উঠে এসেছে, সেইসব চরিত্রে সন্ধ্যা আনপ্যারালাল। এটা শুধু এক-আধবার নয়, বার বার প্রমাণিত হয়েছে ছবির পর্দায়।

সন্ধ্যা রায় পরিচালক তরুণ মজুমদারের ঘরনী। 'পলাতক' ছবির পর থেকে আজ পর্যন্ত, শেষের দিকের কয়েকটি ছবি বাদ দিয়ে, তনুবাবুর সবক'টি ছবিতে সন্ধ্যা রায় আছেন। বেশিরভাগ ছবিতেই তিনি নায়িকা। যেখানে নায়িকা নন, সে ছবিতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ধ্যা ফিল্মের জগতে যাঁকে গুরু বলে মানেন, অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন, তিনি হলেন রাজেন তরফদার।

সেই বারো বছর বয়সে সন্ধ্যা রায় ছিলেন একখণ্ড কাদামাটির তাল। রাজেন তরফদারই প্রথম সেই কাদামাটির তালটিকে নিজের মতো করে ছেনেছুনে অভিনেত্রী তৈরি করেছেন। রাজেনবাবু আজ প্রয়াত। কিন্তু আজও সন্ধ্যা তাঁকেই তাঁর গড়ফাদার বলে মনে করেন। এখনও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার জানান।

এই শ্রদ্ধানিবেদিত নমস্কার সন্ধ্যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজেনবাবুর কাছ থেকে সন্ধ্যার পাবার আর কিছু নেই। মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকটি বছর রাজেনবাবু কর্মহীন ছিলেন। পরিচালনার কাজ ছিল না তাঁর হাতে। মাঝে মাঝে দু-একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন মাত্র। সেই সময়ে সন্ধ্যা তাঁকে অনায়াসে ভুলে যেতে পারতেন। এই লাইনে কতজনকেই তো দেখেছি তাঁর আবিষ্কারককে ভুলে যেতে। কিন্তু সন্ধ্যা কোনওদিন রাজেনবাবুকে ভুলে যাননি, কিংবা তাঁর সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেননি। এ একটা মহৎ গুণ সন্ধ্যার। এই গুণের জন্য তাঁকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি।

তরুণ মজুমদারের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল সন্ধ্যার অভিনয়ের রেঞ্জ নিয়ে। তনুবাবু যখন সন্ধ্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন কাদামাটি মাখা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে, তখন আমি তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর 'আলোর পিপাসা' ছবির চরিত্র নিয়ে।

তনুবাবু বললেন: ওইখানেই তো সন্ধ্যার বৈশিষ্ট্য। যে কোনও চরিত্রকেই ও অনায়াসে ধরে নিতে পারে। চট করে একটা চরিত্রের ভেতরে প্রবেশ করার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। সেই যুগে, যখন সন্ধ্যা আদ্যন্ত কমার্শিয়াল ছবির নায়িকা করছে, সেই সময়ে 'আলোর পিপাসা'-র নায়িকার মতো একটি ডিফিকাল্ট চরিত্রে ওর অভিনয় আমাকেও বিস্মিত করে তুলেছিল।

ওই 'আলোর পিপাসা' ছবিতে সত্যিই বিস্মিত করার মতো অভিনয় করেছিলেন সন্ধ্যা রায়। রীতিমতো অন্তর্মুখী তাঁর অভিনয়। কমার্শিয়াল ছবির নায়িকা হিসেবে তাঁর মধ্যে যে চঞ্চলতা, যে চপলতা এর আগে দেখেছি, সেসব কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। তাঁর চলাফেরা, তাকানো, সন্ন্যাসীর প্রতি আত্মনিবেদনের ভঙ্গি, বেদনাহত হৃদয়ের নির্বাক আর্তি, সব মিলিয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর চেহারা।

আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, সন্ধ্যা রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় কোন্ ছবিতে, তাহলে আমি সর্বাগ্রে 'আলোর পিপাসা' ছবির নামই করব। বার বার ইচ্ছে করে ছবিখানা আবার দেখতে, কিন্তু সে দেখার সুযোগ আর পেলাম না। দূরদর্শনে তো কত ছবি বার বার ঘুরে ফিরে আসে, কিন্তু 'আলোর পিপাসা' আর আসে না। কেন তা আমি জানি না। ওই ছবির প্রিন্ট কি আর নেই? যদি কোনওদিন আপনারা কেউ 'আলোর পিপাসা' দেখার সুযোগ পান তাহলে আমার কথাগুলো মিলিয়ে নেবেন।

তরুণ মজুমদারকে ওই ছবি সম্পর্কে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম: কতদিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে সন্ধ্যা রায়কে ওই ছবির উপযোগী করে তুলতে হয়েছে আপনাকে?

তনুবাবু তার উত্তরে বলেছিলেন: একদিনও আলাদা করে রিহার্সাল দিতে হয়নি। আমি কেবল সন্ধ্যাকে চরিত্রটি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। তারপর কোন্ এক মন্ত্রবলে সন্ধ্যার মধ্যে থেকে ওই চরিত্রটি নিখুঁতভাবে বেরিয়ে এসেছে। আমি চেয়েছিলাম ষোল আনা, কিন্তু সন্ধ্যা আমাকে দিয়েছে আঠারো আনার থেকেও বেশি।

ঠিক এই একই ধরনের কথা বলেছিলেন পরিচালক বিজয় বসু তাঁর 'বাঘিনী' ছবির প্রথম দিনের প্রোজেকশান দেখে বেরিয়ে আসার পর। ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির প্রোজেকশান রুমের বাইরে বড়

গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছছিলেন বিজয়বাবু। তাঁর দুই চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। বিজয়বাবু বললেন : শুটিং করার সময় আমি বুঝতে পারছিলাম সন্ধ্যা বেশ বড় মাপের আর্টিস্ট। এডিটিং করবার সময় সেই বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু প্রোজেকশান দেখবার পর মনে হল, সন্ধ্যা আমার সমস্ত ধ্যান-ধারণার বাইরে একজন অনেক বড় আর্টিস্ট।

বিজয়বাবুর এই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। 'বাঘিনী' ছবির প্রোডাকশনের সঙ্গে আমি কিছুটা জড়িত ছিলাম। আমাদের 'মণিহার' ছবির পর গিরীনদার একক প্রযোজনা হল 'বাঘিনী'। সমরেশ বসুর কাছ থেকে গল্পের রাইট কেনার পরই গিরীনদা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নায়িকা হিসেবে কাকে নেওয়া যায়। গল্পে নায়িকার নামটা কী ছিল সেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কুন্তি কিংবা ওই জাতীয় কিছু হবে। তা আমি সন্ধ্যা রায়ের কথা বলেছিলাম। গিরীনদা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে বলেছিলেন: আমিও ওই নামটাই ভেবেছি রে রবি।

গিরীনদার কাছে সন্ধ্যা রায়ের নামটা বললাম বটে, কিন্তু আমার নিজের মনে একটু সন্দেহ ছিল। ওইরকম একটা দাপুটে চরিত্র সন্ধ্যা রায় ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারবেন তো? ছবির পরিচালক ছিলেন বিজয় বসু। তিনিও সন্ধ্যার নামটা অ্যাপ্রুভ করলেন, কিন্তু তাঁর মনেও একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। তবে শুটিং দেখে আমরা সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিলাম। আর কিছু না হোক একেবারে গুবলেট হয়ে যাবে না ব্যাপারটা। মোটামুটি উতরে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত ভালো অভিনয় করবেন সন্ধ্যা, সেটা আমরা কেউই ভাবিনি। তনুবাবু যে সন্ধ্যাকে একজন পোটেনসিয়াল আর্টিস্ট বলেন, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই।

সন্ধ্যা রায় অভিনীত আরও অনেক চরিত্র আমার ভালো লেগেছে। সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনা করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবু কয়েকটি চরিত্র সম্পর্কে তো বলতেই হবে। তবে তার আগে সন্ধ্যার চরিত্রের আর একটি বিরাট দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চাই। সেটি হল তাঁর মমতাময়ী রূপ।

আর সে কথা বলতে গেলে সবার আগে ভারতবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী রাখী গুলজারের কথাই বলতে হয়।

শ্রীমতী সন্ধ্যা রায় এত ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যেটা আমাদের বাংলা ছবিতে আর কোনও অভিনেত্রী করেছেন বলে মনে হয় না। কয়েকটা উদাহরণ দিই।

এমনিতে সন্ধ্যা রায়কে দেখলে কিংবা কথা বললে মনে হবে ওঁকে যেন শান্তশিষ্ট সর্বংসহা চরিত্র ছাড়া আর কোনও কোনও চরিত্রে মানায় না। অঞ্জন চৌধুরির 'ছোট বউ' ছবিতে যে ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সেইরকম আর কী! কিন্তু সেই ওঁকেই যখন তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা' ছবিতে দুর্গার চরিত্রে দেখি, তখন ব্যক্তি সন্ধ্যা রায় আর অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়কে কিছুতেই এক করে মেলাতে পারি না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসে স্বৈরিণী দুর্গা সম্পর্কে এক লাইনের একটি অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছিলেন : 'মেয়েটি সর্বাঙ্গ দিয়া হাসে।' বইয়ের পাতা থেকে অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায় হুবহু সেই চরিত্রটা উঠিয়ে এনেছিলেন। অসিত সেনের 'আগুন' ছবিতে সন্ধ্যা রায় যাযাবরীর চরিত্রে অনেকটা ওইরকমই অভিনয় করেছিলেন। 'আগুন' উপন্যাসটাও ওই তারাশঙ্করবাবুরই লেখা। এর পাশাপাশি 'ফুলেশ্বরী', 'সূর্যতপা' কিংবা 'নিমন্ত্রণ' ছবিতে সন্ধ্যা রায়কে দেখলে বিস্মিত হতে হয় বৈকি! মনে হয় তনুবাবুর কথাটাই ঠিক। কথায় কথায় তনুবাবু একদিন বলেছিলেন : অভিনয়টা যেন সন্ধ্যার রক্তের মধ্যে, তার সমগ্র অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। একবার তাকে চরিত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলে আর তার দিকে ফিরে তাকাবার দরকার হয় না। সে তখন পাহাড়ী ঝর্নার মতো স্বতঃস্ফূর্ত।

আবার তেজি ধরনের চরিত্রে সন্ধ্যার জুড়ি মেলা ভার। 'বাঘিনী' ছবির কথা তো আগেই বলেছি। তেমনি আর এক তেজি চরিত্র 'সংসার সীমান্তে' ছবিতে। পেশায় দেহপসারিণী, কিন্তু অন্তর থেকে নিষ্পাপ। যে কারণে সে চোর সৌমিত্রকে অনায়াসে বলতে পারে যে, 'আমি তো আর তোর মতো চুরি করে খাই না, দস্তুরমতো গতর খাটিয়ে খাই।' যে বিশ্বাসের জায়গা থেকে সন্ধ্যা কথাগুলি উচ্চারণ করেন, সেই বিশ্বাস খুব কম অভিনেত্রীর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এই অভিনয় ধরনের দেখতে

দেখতে সন্ধ্যার প্রতিভাকে মনে মনে কতবার যে সেলাম জানিয়েছি, তার কোনও হিসেব নেই আমার।

আবার ওই একই সন্ধ্যাকে যখন কমেডি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখি তখন পুনরায় একদফা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে হয়। তরুণ মজুমদারের 'একটুকু বাসা' ছবির কথাটা একবার ভাবুন। সে কী অভিনয়! কিংবা রাজেন তরফদারের 'জীবন কাহিনী' ছবির প্রথম দিককার খানিকটা অংশে।

পাশাপাশি ধর্মমূলক ছবিতেও সন্ধ্যাকে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়েছে। 'বাবা তারকনাথ' ছবিটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারকেশ্বরে মহিলা সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ওই ছবির পর থেকেই বেড়ে গেছে। চঞ্চল চপল রোম্যান্টিক ভূমিকাতেও সন্ধ্যার কৃতিত্ব কিছু কম নয়। বিশ্বজিতের সঙ্গে জুটি বেঁধে 'মায়ামৃগ', 'স্যরি ম্যাডাম' এবং আরও অনেক ছবিতে সন্ধ্যার রোম্যান্টিক রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। বস্তুত একটা সময়ে অনেক প্রযোজক তো ভাবতেই শুরু করেছিলেন যে, উত্তম-সুচিত্রার মতো না হোক, তারই কাছাকাছি একটা রোম্যান্টিক জুটি তৈরি করা যায় বিশ্বজিৎ আর সন্ধ্যা রায়কে নিয়ে। ঠিক সেই সময়ে বিশ্বজিৎ বোম্বাই পাড়ি দিলেন। সুতরাং এই ধরনের কোনও এক্সপেরিমেন্ট আর করা গেল না।

এ তো গেল নায়িকা সন্ধ্যা রায়ের পরিচয়ের একটা রূপরেখা। কিন্তু তিনি যখন নায়িকা নন, চরিত্রাভিনেত্রী, কখনও বোন, কখনও বউদি, কখনও বা লাঞ্ছিতা কোনও নারী, তখনও তাঁকে এমনই চরিত্রানুগ মনে হয়েছে, যা রীতিমত প্রশংসনীয়। যে কারণে সত্যজিৎ রায়ের মতো অন্য ধরনের চিত্রপরিচালকও সন্ধ্যা রায়কে উপেক্ষা করতে পারেননি।

বাংলা ছবিতে সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় ছাড়াও অন্য একটি বড় ভূমিকা আছে। সেক্ষেত্রে তিনি অবশ্য নেপথ্যাচারিণী। তাই তাঁর সেই রূপের সঙ্গে বাংলা ছবির দর্শকদের কোনও পরিচয় নেই। তরুণ মজুমদার পরিচালিত ছবিগুলির ক্ষেত্রে তাঁর এই নেপথ্য ভূমিকা দেখা গেছে। সবাই জানেন তরুণ মজুমদার তাঁর ছবিতে অনেক নতুন শিল্পীকে সুযোগ দিয়েছেন যাঁদের কেউ কেউ আজ ভারতবিখ্যাত। যেমন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। 'বালিকা বধূ' ছবিতে যখন তাঁকে নেওয়া হয় তখন মৌসুমী রীতিমত অপ্রাপ্তবয়স্কা। তাঁর বয়স এতই কম ছিল যে তনুবাবুর অধিকাংশ ছবির যিনি সংগীত পরিচালক, সেই অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও বলে ফেলেছিলেন : এ যে একেবারেই বাচ্চা মেয়ে! একে দিয়ে অত বড় চরিত্রে অভিনয় করাবেন কেমন করে?

তনুবাবু মৌসুমীর মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন যা তাঁর বিশ্বাসের জায়গাটাকে মজবুত করে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তাকে তিনি সন্ধ্যার হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিছুটা মাজাঘষা করবার জন্য। স্বামীর এই অভিলাষ সন্ধ্যা পুরোপুরি পূর্ণ করেছিলেন। প্রায় ছ' মাসের ওপর তিনি মৌসুমীকে নিজের বাড়িতে নিজের কাছে রেখে 'বালিকা বধূ' ছবির উপযোগী করে তুলতে পেরেছিলেন। অবশ্যই তনুবাবুর নির্দেশ পুরোপুরি মেনে। মৌসুমীর আসল নাম তো মৌসুমী নয়, ইন্দু। ছবির জন্যে তনুবাবুই তার মৌসুমী নাম রেখেছিলেন। সেই মৌসুমী কালক্রমে ভারতবিখ্যাত অভিনেত্রী হয়েছেন। যে বাচ্চা মেয়েটি সম্পর্কে হেমন্তদা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, সেই বাচ্চা মেয়েটিই পরে তাঁর পুত্রবধূ হয়েছিলেন। একজন সুখী এবং পরিপূর্ণ গৃহবধূ। খুব জানতে ইচ্ছে করে, সন্ধ্যা কি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমীকে গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছিলেন? এর পরে যখন সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হবে তখন এই তথ্যটা জেনে নিতে হবে।

শুধু মৌসুমীর ক্ষেত্রেই নয়, মহুয়া রায়চৌধুরীর ক্ষেত্রেও অনেকটা এই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল সন্ধ্যা রায়কে। তবে তুলনায় কিছুটা কম। কিন্তু মহুয়াকে অবশ্য নিজের কাছে রাখার দরকার হয়নি। মহুয়া তার বাবা-মায়ের কাছেই থাকত।

মহুয়ার প্রথম ছবি তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'। অথচ মহুয়ার এ ছবিতে অভিনয় করবার কোনও কথাই ছিল না। তনুবাবু তাঁর ওই ছবির জন্যে অন্য একটি মেয়েকে নির্বাচন করেছিলেন। মেয়েটি বয়স এবং চেহারা সব দিক থেকেই মানানসই। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা হাস্কি ভাব। তনুবাবু তাই মেয়েটির মাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার মেয়ের গলার স্বরটা এইরকম নাকি?

পাছে ওই কণ্ঠস্বরের কারণে মেয়ে বাতিল হয়ে যায় তাই তার মা বললেন : না না, ওর গলার স্বর

খুব ভালো। ক'দিন আগে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি হয়েছিল তো, তাই গলার স্বরটা একটু ভারি হয়ে গেছে। দুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

তনুবাবু মেয়েটির মায়ের কথা বিশ্বাস করে প্রোডাকসনের শুটিং-এর ডেট ঠিক করে ফেললেন। প্রথম কাজটা হবে আউটডোরে, তাই সেখানে লোক চলে গেল সব ব্যবস্থা করতে। 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবির প্রোডিউসার ছিলেন কে. এল. কাপুর প্রোডাকসন্স। যেটি দেখাশোনা করতেন রবীন্দ্রনাথ মালহোত্রা ওরফে মামাজি। এই মামাজি সম্পর্কে আমি মহুয়াকে নিয়ে লেখবার সময় বিস্তারিতভাবে লিখেছি। সেটা পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়।

এদিকে দুদিনের জায়গায় সাতদিন পরেও মেয়েটির গলার হাস্কি ভাব গেল না। তনুবাবু খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাধারণ সর্দি-কাশি হলে তো এতদিন লাগে না সারতে! তবে কি মেয়েটির কণ্ঠস্বরটাই ডিফেকটিভ?

সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য তনুবাবু তাঁর একজন আত্মীয়ের কাছে মেয়েটিকে পাঠালেন। তিনি একজন বিখ্যাত ই এন টি স্পেশ্যালিস্ট। একটি মুখবন্ধ খামে তনুবাবু তাঁকে লিখলেন : আপনি মেয়েটির গলা পরীক্ষা করে আমাকে জানান সেখানে কোনও ডিফেক্ট আছে কি না? যদি থাকে তাহলে চিকিৎসা করালে কতদিনে সারতে পারে সেটাও জানাবেন।

সেই ডাক্তার ভদ্রলোক ছিলেন তনুবাবুর ভগ্নিপতি। তিনি খুব ভাল করে মেয়েটিকে পরীক্ষা করলেন। তারপর একখানা মুখবন্ধ করা খামে লিখে পাঠালেন : মেয়েটির ভয়েস টোটালি ড্যামেজড। একে দীর্ঘকাল চিকিৎসাধীনে রাখতে হবে। তার পরও সম্পূর্ণ সারবে কি না তার কোনও গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না।

চিঠি পেয়ে তনুবাবুর মাথায় হাত। সঙ্গে সঙ্গে শুটিং-এর প্রস্তুতি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। প্রোডিউসারকেও জানিয়ে দিলেন : আপাতত শুটিং বন্ধ। নতুন হিরোইন খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর কাজ শুরু করা যাবে না।

এই নায়িকা-সমস্যা নিয়ে তনুবাবু যখন খুবই বিব্রত তখন একদিন এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর অফিসে। তনুবাবু তখন ইউনিটের সবাইকে নিয়ে জরুরী মিটিং-এ বসেছিলেন। তার মধ্যেই ভদ্রলোক খোলা দরজার মধ্যে নিজের আধখানা শরীর প্রবিষ্ট করিয়ে বললেন : জানি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তা সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে এক মিনিটের জন্যে কথা বলতে এলাম।

তনুবাবু ভদ্রলোককে দেখে রীতিমত বিরক্ত হলেন। বললেন : আমরা এখন একটা জরুরী ব্যাপারে ব্যস্ত। আপনি অন্যদিন আসবেন।

ভদ্রলোক বললেন : আমি সেই দমদম থেকে আসছি। শুনলাম আপনি আপনার ছবির জন্যে নতুন মেয়ে খুঁজছেন। আমার মেয়েটিকে যদি আপনি এক মিনিটের জন্যে দেখে রাখেন তাহলে আমি পরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

তনুবাবু তেমনি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন : বললাম তো পরে আসবেন। আমি এখন খুবই ব্যস্ত। আপনাকে এক মিনিটও সময় দিতে পারছি না।

তনুবাবুর কথা শেষ হতে না হতে ভদ্রলোকের পেছন দিক থেকে একটি বাচ্চা মেয়ের মুখ দেখা গেল। সে মুখে অপার কৌতূহল। এই ঘরের মধ্যে কী এমন বস্তু আছে যেটা দেখবার জন্যে বাবা এসে দাঁড়িয়েছে সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে।

তনুবাবু চমকে উঠলেন বাচ্চা মেয়েটির মুখখানা দেখে। কী সরল তার চোখের দৃষ্টি। মুখখানাও লাবণ্যে ভরা।

মুহূর্তের মধ্যে তনুবাবুর মুখ থেকে বিরক্তির রেখা উধাও হল। তিনি মেয়েটিকে বললেন : তুমি একটু ভেতরে এস তো।

তনুবাবুর ডাক শুনে মেয়েটি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। একটা ভয়ের ভাব দেখা গেল তার মুখে। সে বাবার মুখের দিকে তাকাল।

বাবা বললেন : উনি তোমায় ডাকছেন। তুমি ভেতরে যাও।

মেয়েটি ভীরু ভীরু পায়ে তনুবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তনুবাবু তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনিও ভেতরে এসে বসুন।

বাবা ভেতরে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা ততক্ষণে জন্ম নিয়েছে। একটা হার্ডল তো ভগবানের ইচ্ছেয় পেরনো গেছে। এখন সবটাই নির্ভর করছে তাঁর মেয়ের ওপর। ও কি তরুণ মজুমদারের মতো এমন বিখ্যাত একজন পরিচালককে খুশি করতে পারবে?

ভদ্রলোক চেয়ারে বসার পর তনুবাবু মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কী?

মেয়েটি কোনও উত্তর না দিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবা বললেন : উনি তোমার নাম জিজ্ঞাসা করছেন। তোমার নাম বল।

মেয়েটি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিলে : আমার নাম সোনালি রায়।

তনুবাবু ভদ্রলোকের জন্য চা আনতে বললেন। তারপর মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

আরও দু-চারটি কথা বললেন তার সঙ্গে। তারপর ভদ্রলোকের কাছে তাঁর মেয়ের সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিয়ে বললেন : আপনি একবার কাল বিকেলের দিকে আপনার মেয়েকে নিয়ে আসতে পারবেন?

ভদ্রলোক আশান্বিত কণ্ঠে বললেন : কেন পারব না। নিশ্চয় আসব।

তনুবাবু বললেন : আমি এখন কোনও কথা দিচ্ছি না। কোন আশাও দিচ্ছি না। আমার একটু ভাববার সময় দরকার। যা বলবার কাল বিকেলে বলব আপনাকে।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞচিত্তে তনুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

বাড়ি ফিরে তনুবাবু সন্ধ্যাকে বললেন : আজ একটি নতুন মেয়েকে দেখলাম। আমার মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। কাল বিকেলে আবার আসতে বলেছি। তুমিও কাল বিকেলে মেয়েটিকে একবার দেখো।

সন্ধ্যা বললেন : তোমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন আমি আর দেখে কী করব।

তনুবাবু বললেন : তবু একবার দেখে নাও। কী জানি হয়তো মৌসুমীর মতো এর জন্যেও তোমাকে কিছুটা সময় দিতে হতে পারে।

পরের দিন সকালে মামাজিকে টেলিফোন করলেন তনুবাবু মিনার্ভা হোটেলে। বললেন : আমি আমার ছবির হিরোইন খুঁজে পেয়েছি। আজ বিকেলে যদি একবার আসেন তবে মেয়েটিকে দেখাতে পারি আপনাকে।

টেলিফোনের ওপার থেকে মামাজি উত্তর দিলেন : আপনার যখন পছন্দ হয়েছে তখন আমার দেখার তো কোনও দরকার নেই। শুটিং তাহলে ঠিক শিডিউল মতোই শুরু করা যাচ্ছে তো?

তনুবাবু বললেন : তাই তো আশা করছি।

এই হল মহুয়ার প্রথম ছবিতে নামার ইতিহাস। সোনালি রায়কে তার পরের দিন বিকেলেই 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবির নায়িকা হিসেবে ফাইনাল করেছিলেন তনুবাবু। নামটা শুধু বদলে দিয়েছিলেন। সোনালির জায়গায় মহুয়া।

তা সেই মহুয়াকেও খানিকটা ঘষামাজা করতে হয়েছিল সন্ধ্যা রায়কে। সেই মাজা ঘষার কাজটা এতই সুচারু হয়েছিল যে তনুবাবু পরবর্তীকালে 'দাদার কীর্তি, ছবিতে অমন একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা মহুয়াকে দিতে সাহস করেছিলেন।

শুধু কি এইটুকুই। তনুবাবু পরিচালনার অন্যান্য কাজকর্মেও সন্ধ্যাকে ইনভলভ করিয়েছিলেন। মেক-আপ, কস্টিউম, এমনকি স্ক্রিপ্টের ব্যাপারেও। স্বামীর সঙ্গে এক ছাদের নীচে বসবাস করার সুবাদে পরিচালনার অনেক ব্যাপারে পোক্ত হয়ে উঠেছিলেন সন্ধ্যা রায়।

তনুবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আপনি তো বলছেন অভিনয়ের ব্যাপারটা সন্ধ্যার অস্থিমজ্জায় জড়ানো। কিন্তু আপনার প্রোডাকসনের সঙ্গে এতকাল জড়িত থাকার সুবাদে সন্ধ্যার তো সে সম্পর্কে একটা ভালোরকম জ্ঞান লাভ হয়েছে। এখন সন্ধ্যার ওপর যদি ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায় তাহলে কি সেটা উনি করতে পারবেন?

আমার প্রশ্নটা শুনে তনুবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন : দেখুন রবিবাবু, অভিনয় এবং টেকনিক্যাল ব্যাপার ছাড়াও একজন পরিচালককে আরও অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। যেমন আউটডোরের লোকেশান খুঁজে বেড়ানো। ক্যামেরা, টেকনিসিয়ান আর আর্টিস্টদের ডেট অ্যাডজাস্ট করা। প্রোডিউসারের সঙ্গে যথাযথ সংযোগ রাখা এবং অর্থকরী ব্যাপারটা সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থাকা। একজন পুরুষের পক্ষে এগুলো অনায়াসে সম্ভব। কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে এ ব্যাপারে বেশ কিছু অসুবিধে আছে। এই লোকেশান হান্টিং-এর ব্যাপারটাই ধরুন না। দিনের পর দিন রোদ ঝড় জল উপেক্ষা করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চষে বেড়ানো, একজন মহিলার পক্ষে লোডটা একটু হেভিই হয়ে যায়। তা সন্ধ্যা যদি এ ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারে তাহলে ওর পক্ষে ছবি পরিচালনার কাজটা মোটেই শক্ত হয়ে উঠবে না। ওর ইমাজিনেশান আছে, ঝটপট স্পট ডিসিশান নেওয়ার ক্ষমতা আছে, সবার ওপরে যে ব্যাপার, সকলের সঙ্গে হাসিমুখে অ্যাডজাস্ট করে চলা, সেটা ও খুব ভালোই পারে। নিজের ব্যক্তিত্বটাকে সম্পূর্ণ অটুট রেখেও। এটা খুব বড় ব্যাপার। কিন্তু আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনাকে কি কেউ সন্ধ্যাকে দিয়ে ছবি পরিচালনার কথা বলেছে নাকি?

আমি বললাম : না না, সেরকম কেউ কিছু বলেনি। তবে এর আগে তো দেখেছি, মঞ্জু দে কিংবা অরুন্ধতী দেবী তপন সিংহের প্রোডাকসনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে থাকতে নিজেরাই একদিন পরিচালক হয়ে গেলেন। তেমনি সন্ধ্যাও তো আপনার প্রোডাকসনের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই ওঁরও একদিন পরিচালক হবার সম্ভাবনা আছে কি না, অথবা দায়িত্ব দিলে উনি সেটা করতে পারবেন কিনা, সেটাই খোঁজ নিচ্ছিলাম। এটা নিছকই কৌতূহল।

তনুবাবু বললেন : আমার তো মনে হয় সন্ধ্যা সেটা পারবে। হয়তো অনেকের থেকে ভালোভাবেই পারবে। আপনার কৌতূহল মেটাবার জন্যে আমি আমার এই অভিমতটুকুই দিতে পারি।

এ তো গেল সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় জীবনের কথা। এবারে সন্ধ্যা রায়ের আর একটা রূপের কথা বলি। সেটা ওঁর মানবতার দিক। ওঁর মমতাময়ী রূপের প্রকাশ।

এটা সেই ১৯৬০ সালের কথা। তখনও সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে তরুণ মজুমদারের বিয়ে হয়নি। সেই সময়ে সন্ধ্যা পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'আহ্বান' ছবির আউটডোর শুটিং করবার জন্য রানাঘাট গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একটি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েটির নাম রাখী। রাখী মজুমদার। রানাঘাটের শচীন্দ্রনাথ মজুমদারের মেয়ে। তাকে দেখে সন্ধ্যার এত ভালো লেগে গেল যে শচীনবাবুর কাছ থেকে তাকে প্রায় ভিক্ষা চেয়ে এনেছেন। উদ্দেশ্য মেয়েটিকে নিজের বোনের মতো কাছে রাখবেন। লেখাপড়া শেখাবেন। ভালো বিয়ে দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

যেহেতু সন্ধ্যা একদিন নিজে দরিদ্র ছিলেন, তাই অন্যের দারিদ্র্যে তাঁর প্রাণ কাঁদত। সেই কান্নার মানসিকতা থেকেই রাখীকে সঙ্গে নিয়ে আসা। না, তাকে অভিনেত্রী তৈরি করার কোনও বাসনা ছিল না সন্ধ্যার। বরং উল্টোটাই ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্য। তাই একদিন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। কয়েক বছর পরে রাখী একদিন বাড়ি থেকে পালাল। পালাল অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে। অজয় তখন আমাদের উল্টোরথ পত্রিকার সাংবাদিক এবং ফোটোগ্রাফার। পরে অজয় চিত্রপরিচালক হয়েছিল।

সন্ধ্যাকে না জানিয়ে অজয় রাখীকে বিয়ে করল। খবরটা পেয়ে সন্ধ্যার প্রাণটা ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ করেননি। লোকদেখানো হা-হুতাশও করেননি। তবে বুকটা ভেঙে গিয়েছিল।

আমরা তো ধরেই নিয়েছিলাম যে সন্ধ্যা এরপর আর কোনও মানুষের উপকার করবেন না। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে সন্ধ্যা আজও মানুষের উপকার করে চলেছেন। তাঁর যে কত গোপন দান আছে তার হিসেব বাইরে প্রকাশ না পেলেও আমরা কিছু কিছু জানি বৈকি।

সেই মানসিকতা থেকেই সন্ধ্যা অনেকটাই এগিয়ে গেছেন অরফ্যানেজ প্রতিষ্ঠার কাজে। একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ভবিষ্যৎ তাঁকে কোন পথে নিয়ে যাবে তা আমি জানি না। হয়তো তিনি চিত্রপরিচালক হবেন। কিংবা হয়তো মাদার টেরিজার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেবাব্রতী হবেন।

তবে তিনি যাই হোন, সব ব্যাপারেই আমার শুভেচ্ছা রইল।

ছবিদা

১৯৩৬ সালের ১৩ জুন উত্তরা সিনেমায় 'অন্নপূর্ণার মন্দির' নামে একটি ছবি মুক্তি পেল। দর্শকদের মধ্যে ছবিটা নিয়ে যত না হৈ-চৈ পড়ল, তার থেকে বেশি পড়ল ওই ছবির নতুন নায়ককে নিয়ে। নায়কের নামটিও বড় অদ্ভুত। ছবি বিশ্বাস। ছবি সাধারণত মেয়েদের নামই হয়। কিন্তু ওই সুদর্শন তরুণের নাম ছবি কেন হল তা দর্শকদের কাছে একটা ধাঁধার মতোই হয়ে রইল।

ওই একটা ছবির সাফল্যে ছবি বিশ্বাস আত্মগরিমায় রীতিমতো স্ফীত হয়ে গেলেন। ভাবলেন এরপর তাঁর জীবনে ছবির বান ডাকবে। প্রযোজক-পরিচালকরা তাঁর দরজায় এসে লাইন দেবেন। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলেন। সুতরাং কালক্ষেপ না করে তিনিই হাজির হতে লাগলেন প্রযোজক আর পরিচালকদের দরজায়। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি।

ছবি বিশ্বাস যখন নতুন সুযোগের জন্য এ-দরজায় ও-দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, এক ভদ্রলোক নকি তাঁর অভিনয়ের এমন দুর্নাম করে বেড়াচ্ছেন যে তাঁর পক্ষে আর নতুন সুযোগ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দু-একটি প্রায়-হওয়া কাজও ছিটকে বেরিয়ে গেল ওই অচেনা এবং অদেখা ভদ্রলোকের বিরূপ মন্তব্যে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন ভদ্রলোকের নাম নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। ছোটখাট কমেডি রোলে অভিনয় করেন। কিন্তু বড় বড় প্রযোজক ও পরিচালকও তাঁর মতামতের গুরুত্ব দেন। ছবি বিশ্বাসের তখন একমাত্র কাজ হল নতুন সুযোগের সন্ধানে ঘুরে না বেড়িয়ে সর্বাগ্রে নৃপতিবাবুকে খুঁজে বার করা।

খুঁজে পেলেন। কালী ফিল্মস স্টুডিও থেকে একদিন বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক দূর থেকে চিনিয়ে দিলেন নৃপতি চাটুজ্যেকে। ছবিবাবু তাকিয়ে দেখলেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, রোগা পটকা, আজানুলম্বিত বাহু, কথা বলবার সময় বকের মতো গলাটা এগিয়ে পিছিয়ে আসে। আশ্চর্য! এই রোগা লিকলিকে কমেডিয়ানটির এত ক্ষমতা! দেখা যাক।

ছবিবাবু এগিয়ে গেলেন সেদিকে। নৃপতিবাবুর কাছাকাছি হয়ে বললেন : এই যে শুনুন—

নৃপতিবাবু কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। ছবিবাবুর ডাকে তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। মুখে একটা রহস্যময় হাসির ঢেউ খেলে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন : আমাকে বলছেন?

ছবিবাবু বললেন : আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নৃপতিবাবু বিস্ময়ের ভান করে বললেন : আমার সঙ্গে? তা বলুন।

ছবিবাবু বললেন : এখানে নয়, একটু নিরিবিলি চাই।

নৃপতিবাবু একবার ছবি বিশ্বাসের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর ঢোলা পাঞ্জাবির হাতা দুটো গুটিয়ে নিজের মাস্‌ল দুটো ফোলাবার চেষ্টা করলেন। একটুও ফুলল না। তখন হাতা দুটো টেনে দিয়ে বললেন : ওই ওদিকে চলুন।

ছবিবাবুকে নিয়ে একটু তফাতে একটা গাছের ছায়ায় নিরিবিলিতে এসে দাঁড়ালেন নৃপতিবাবু। তারপর বললেন : এবারে বলুন।

ছবিবাবু বেশ রাগত কণ্ঠেই বললেন : আমার পেছনে এভাবে লেগেছেন কেন?

নৃপতিবাবু তাঁর লম্বা শরীরটা ঝুঁকিয়ে ছবিবাবুর পেছন দিকটা দেখে নিয়ে বললেন : কই, লাগিনি তো!

ছবিবাবু বললেন : ঠাট্টা রাখুন। এভাবে চারদিকে আমার বদনাম করে বেড়াচ্ছেন কেন?

নৃপতিবাবু এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : বদনাম করার মতো কাজ করেছেন, তাই বদনাম করে বেড়াচ্ছি।

ছবিবাবু বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : বদনাম করার মতো কাজ করেছি আমি? কই, আমার

তো কিছুই মনে পড়ছে না।

নৃপতিবাবু বললেন : বদনাম করার মতো কাজ নয়! অন্নপূর্ণা মন্দিরে যা অভিনয় করেছেন সেটা কি সুনাম করার মতো?

ছবি বিশ্বাস চোখ কপালে তুলে বললেন : বলেন কী মশায়! দর্শকরা আমার অভিনয়ের প্রশংসা করছে, খবরের কাগজও খারাপ কিছু লেখেনি। তা সত্ত্বেও আপনি বলবেন আমার অভিনয় বাজে?

নৃপতিবাবু বললেন : আপনি নিজেই ভেবে দেখুন না বাজে কিক না!

ছবিবাবু বললেন : কী জানি মশায়! আমি তো তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া করে বুঝিয়ে দিন কোথায় আমার অভিনয়ের খামতি।

নৃপতিবাবু বললেন : অপ্রিয় সত্য কথাটা সহ্য করতে পারবেন তো?

ছবিবাবু বললেন : নিশ্চয় পারব। আমি বনেদি বংশের ছেলে। সত্যি কথা, তা সে যত অপ্রিয় হোক, মেনে নেবার মতো উদারতা আমার আছে।

এরপর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নৃপতিবাবু ব্যাখ্যা করে বোঝালেন অন্নপূর্ণার মন্দির ছবিতে কোথায় কোথায় ছবিবাবুর অভিনয় ত্রুটি। হাঁটা-চলা থেকে শুরু করে বাচনভঙ্গি পর্যন্ত সব কিছুর বিস্তৃত এবং সহৃদয় সমালোচনা।

এই সামান্য কমেডিয়ানের অসামান্য পাণ্ডিত্যে এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন ছবি বিশ্বাস। ওঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন : আপনাকে আমি আগে চিনতে পারিনি প্রভু। আজ থেকে আপনি আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। এখন থেকে আপনার নির্দেশ মতোই আমি চলব। আমার সব দায়িত্ব আপনি নিন।

ততক্ষণে আবার ছদ্মবেশটি পরে নিয়েছেন নৃপতি চাটুজ্যে। ঢোলা পাঞ্জাবির আড়াল থেকে লম্বা লিকলিকে হাতখানি বার করে ছবি বিশ্বাসের মস্তকে স্থাপন করে একগাল হেসে বললেন : তথাস্তু।

সেই দায়িত্ব আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। সেই আনুগত্যও আজীবন অটুট রেখেছিলেন ছবি বিশ্বাস।

এ ঘটনাটা আমার ছবিদার মুখ থেকেই শোনা। ১৯৫১ সলে ছবিদার সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয়ের প্রথম দিনটি থেকেই ছবিদা আমায় আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছরে ছবিদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। একটু একটু করে জেনেছি মহাসমুদ্রের মতো হৃদয়বান ওই মানুষটিকে।

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে ছবিদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ১৯৬২ সালের জুন মাসের সেই শোকাবহ দিনটির স্মৃতি আমার মতো অনেক প্রবীণের মনেই এখনও জ্বলজ্বল করছে। এক মর্মান্তিক মোটর দুর্ঘটনায় ছবিদা প্রাণ হারিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার স্টুডিওপাড়া থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার আর জি কর হসপিটাল পর্যন্ত সে এক শোকবিহ্বল মানুষের মিছিল।

এই আঘাতটা নৃপতিদার বুকেই বেজেছিল সবচেয়ে বেশি। ছবিদার মৃত্যুসংবাদ পাবার পর নৃপতিদা সেই যে শয্যা নিয়েছিলেন, অনেকে ভেবেছিলেন সেইটাই বোধহয় তাঁর শেষ শয্যা। ছবিদার মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হয়েছিলেন অনেকেই, কিন্তু নৃপতিদার মতো এমন করে ভেঙে পড়তে কাউকেই দেখিনি। অনেকদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানির পর অনেক কষ্টে সেবার নৃপতিদাকে সুস্থ করে তোলা গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে নৃপতিদাকে আর আগের ফর্মে ফিরে পাওয়া যায়নি। হাসি আর রসিকতা যেন তাঁর কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিল। বাঁচতে হয় তাই বেঁচে আছেন। কাজ করতে হয় তাই করছেন। খেতে হয় তাই খাচ্ছেন। জীবন সম্পর্কে যেন সব কিছুই হারিয়ে বসে আছেন তিনি।

নৃপতিদার জুবিলি পার্কের বাড়িতে ছবিদার জন্যে আলাদা একটি বিছানা নির্দিষ্ট ছিল। ছবিদা যখন নৃপতিদার বাড়িতে আসতেন তখন ওই বিছানায় বসতেন, খেতেন, শুতেন। ছবিদার মৃত্যুর পর নৃপতিদা ওই বিছানায় কাউকে বসতে দিতেন না। একবার ওঁর গৃহে রাত্রিবাসের সময় আমি ওখানে বসতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলেন নৃপতিদা : ওখানে নয়, ওখানে নয়, ওটা ছবির বিছানা। আমি নিজেও ওখানে বসি না।

বুঝলাম নৃপতিদা ছবিদার ব্যবহৃত ওই বিছানাটিকে স্মৃতিচিহ্নের মর্যাদা দিতে চান।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : আচ্ছা নৃপতিদা, আপনি ছবিদাকে অত ভালোবাসেন। তাহলে অন্নপূর্ণার মন্দির রিলিজের পর ওঁর নামে অত নিন্দেমন্দ করে বেড়াতেন কেন? একজন নতুন শিল্পী, আপনার ওইসব মন্তব্যে ওঁর কেরিয়ার তো শেষ হয়ে যেতে পারত। বাংলা সিনেমা তো তাহলে কোনদিনই ছবি বিশ্বাসকে পেত না। কতবড় ক্ষতি হয়ে যেত বলুন তো?

নৃপতিদা একটু ম্লান হেসেছিলেন। বলেছিলেন : সেদিন ওই ট্রিটমেন্ট না করলে তো কোনও দিনই ছবি বিশ্বাসকে পাওয়া যেত না। অন্নপূর্ণার মন্দির-এ আমি ওর শ্যুটিং দেখেছি, ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। বুঝেছিলাম এক টুকরো আগুন হঠাৎ ছিটকে এসে পড়েছে। ওর শিক্ষা-দীক্ষা আভিজাত্য আর ওই সুদর্শন চেহারা, কী অসাধারণ মুখশ্রী, চোখ-নাক—গোটা দুই তিন ছবিতে চান্স পাবে, তারপর অসৎসঙ্গে পড়ে ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। যার শেষ পরিণতি নিষিদ্ধপল্লীর কোনও এক বাড়িতে রোগে শোকে দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। আমাদের ফিল্ম লাইনে তেমন উদাহরণের তো অভাব নেই। সুতরাং আমি চেয়েছিলাম, ও আমার কাছে আসুক, আমার নির্দেশ মেনে চলুক, আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করুক। তাই ওই ট্রিটমেন্ট। বলুন, ভুল করেছিলাম কি?

বলতে বলতে হু হু করে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন নৃপতিদা। আর আমি ওঁর মুখোমুখি বসে ভাবতে লাগলাম, ভালোবাসা কত গভীর হলে এত অশ্রু নিষ্কাষিত হয়। সত্যিই বড় ভাগ্যবান ছিলেন ছবিদা।

ছবিদার জন্ম ১৯০০ সালে। উত্তর কলকতার বিডন স্ট্রিট অঞ্চলে। ওঁদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগনা জেলার ছোট জাগুলিয়ায়। খুবই বর্ধিষ্ণু পরিবার, অভিজাত বংশ। রাজা শশাঙ্কদেবের বংশধর ওঁরা। বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। পরবর্তীকালে ছবিদা যখন সিনেমা ও থিয়েটারের কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত তখনও তাঁর দুর্গোৎসবের সময় দেশের বাড়িতে যাওয়া চাই-ই চাই।

ছবিদার আসল নাম শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। ডাকনাম ছবি। ছোটবেলায় ওঁকে ঠিক ছবির মতো দেখতে ছিল বলে ওঁর মা আদর করে ওই নামে ডাকতেন। পরে ওটাই আসল নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলের কাছে। ছোটবেলাতেই মা মারা যান। বাবার নাম ভূপেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। শৈশবে মাতৃহারা এই সন্তানটি পিতার আদর এবং সর্বকর্মে অত্যধিক প্রশ্রয় পেতেন। ওঁর কোন আবদারই অপূর্ণ থাকত না। সেইহেতু অভিনয়কে যখন পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন স্থির করলেন, তখন বাড়ি থেকে কোনও আপত্তি ওঠেনি। নতুবা ওঁদের যা বংশমর্যাদা এবং চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতাদের তখন যা সুনাম (!) তাতে ও ব্যাপারটা সহজে ঘটে উঠতে পারত না।

ছবিদা কিন্তু স্টুডেন্ট হিসেবে খুব ভালো ছিলেন। হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে প্রেসিডেন্সিতে চান্স পেয়েছিলেন। সেখান থেকে বিদ্যাসাগর কলেজ। ওখান থেকেই বি. এ. পাস করেন। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে ঝোঁক। বড়ির বড় হলঘরে পর্দা খাটিয়ে অভিনয় করতেন। দর্শক ছিলেন আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-পড়শিরা।

ছবিদার জীবনের প্রথম অভিনয় যাত্রার আসরে। সিকদারবাগান বান্ধব সমাজের 'নদীয়া বিনোদ' পালায় নিমাই সাজতেন তিনি। তখনকার কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কয়েকটি শখের যাত্রার দল ছিল। সিকদারবাগান বান্ধব সমাজ তারই একটি। কিন্তু অভিনয়কে পেশা করার কথা ছবিদা চিন্তা করেন ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউটে শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয় দেখবার পর। শিশির-কুমারের ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ির সঙ্গে ছবিদার পরিচয় ছিল। তাঁরই মাধ্যমে শিশিরবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন ছবিদা।

সিনেমায় ছবিদাকে প্রথম সুযোগ দেন কালী ফিল্মসের প্রতিষ্ঠাতা পি. এন. গাঙ্গুলি। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে। ১৯৩৬ সালে। দ্বিতীয় ছবি এর দু'বছর বাদে ১৯৩৮ সালে সতু সেন পরিচালিত 'চোখের বালি'। ১৯৩৯ সালে দুখানি ছবি। নরেশ মিত্র পরিচালিত 'শর্মিষ্ঠা' এবং শিশির ভাদুড়ি পরিচালিত 'চাণক্য'। ১৯৪০ সালেও দুখানি ছবি। সতু সেন পরিচালিত 'স্বামী-স্ত্রী' এবং ফণী বর্মা পরিচালিত 'নিমাই সন্ন্যাস'। শেষোক্ত ছবিতে ছবিদা দারুণ জনপ্রিয়তা পান।

কিন্তু দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন দেবকী বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'নর্তকী' ছবিতে

ছবিদার অভিনয় দেখে। এক অশীতিপর বৃদ্ধ সাধুর চরিত্রে তিনি রূপদান করেছিলেন। ওই বছরই হেম চন্দ্র পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে একটি অতি ক্ষুদ্র চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় আপামর দর্শকের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এরপর থেকে তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ছবি। কোথাও নায়ক আবার কোথাও নায়কের বাবা। কোথাও পলিশ্‌ড ভিলেন আবার কোথাও কণ্ঠীধারী বৈরাগী। বার বার তিনি পেয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা।

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছবিদা অভিনয়ের ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। সারা জীবন অজস্র ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। কত দুরূহ চরিত্রে যে তিনি রূপদান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। স্যুট-টাই পরিহিত সাহেবি চরিত্রের পাশাপাশি কর্পদকহীন গাঁজখোরের চরিত্র—সর্বত্রই তিনি সমানভাবে স্বচ্ছন্দ। হিং বিক্রয়কারী কাবুলিওয়ালার চরিত্রে তিনি যেমন মানানসই, তেমনই মানানসই তৎকালীন জীবিত কিংবদন্তি দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিতের চরিত্রে। তাঁর অসামান্য অভিনয় দেখে দাদাঠাকুর নিজেও বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের তিনটি ছবিতে ছবিদা অভিনয় করেছেন। এই তিনটি ছবি যেমন সত্যজিতের পরিচালন-সৌকর্যে সমৃদ্ধ, তেমনি ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ের কারণেও। ছবি তিনটি হল 'জলসাঘর', 'দেবী' এবং 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। তিনটি ছবিতেই ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে তা স্বয়ং সত্যজিৎ রায় বার বার স্বীকার করেছেন। ছবিদা বেঁচে থাকলে সত্যজিৎ হয়তো তাঁর পরবর্তী কোন ছবিতে ওঁকে নিয়ে আরও বড় কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে পারতেন।

ছবিদার দ্বারা অভিনীত ছবির সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া মুশকিল। এই ছোট্ট পরিসরে তার সবগুলি নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র পরিচালিত 'মানিক' ছবিটিতে বিশেষ কারণে স্মরণীয়। এই ছবিতে ছবিদা আদ্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে অভিনয় করেছেন এবং তাঁর মুখে একটিও সংলাপ ছিল না। শুধুমাত্র চোখ এবং মুখের অভিব্যক্তিতে তিনি চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলেন। ওই শায়িত অবস্থাতেই এমন সব নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেন যা দর্শককে অভিভূত করে তোলে।

ছবিদার বাংলা-প্রীতি একটা মনে রাখার মতো ব্যাপার। যৌবনে এবং প্রৌঢ় বয়সে তিনি বার বার বম্বে থেকে হিন্দি ছবির অফার পেয়েছেন এবং প্রতিবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজ কাপুর তাঁর 'একদিন রাত্রে' ছবির শ্যুটিং করবার জন্য তঁকে বম্বে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি। তাই রাজ কাপুর তাঁর পুরো ইউনিট নিয়ে কলকাতায় এসে ছবিদার অংশটার শ্যুটিং করে নিয়ে যান। এই ছবিতে ছবিদা এক সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রে অভিনয় করেন এবং দর্শকদের রীতিমত বিস্মিত করেন। এই ছবিতে তাঁর লিপে সলিল চৌধুরি সুরারোপিত মান্না দে-র গাওয়া একটি গান ছিল। 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয় সব সত্যি/ঘুরিয়েই দুনিয়ার লাট্টু ভগবান হারিয়েছে লেত্তি।' এই ব্যঙ্গগীতির অন্তর্নিহিত রূপটি ছবিদার অভিনয় দারুণভাবে ফুটে ওঠে। ছবিদার ওই অভিনয় নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ব্যাপার।

ছবিদা অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে দুটি ছবি পরিচালনাও করেন। 'প্রতিকার' এবং 'যার যেথা ঘর'। দুটি ছবিই বক্স অফিসের দিকে থেকে অসফল। এই অসাফল্য ছবিদাকে বেশ কিছুটা দমিয়ে দেয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে ছবিদার ছবির সংখ্যা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল। আবার তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরে আসেন শরৎচন্দ্র রচিত 'শুভদা' ছবিতে এক গাঁজাখোরের ভূমিকায়। ছবিদা আবার আস্তে আস্তে কাজ পেতে থাকেন। তপন সিংহ পরিচালিত 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে অভিনয়ের পর থেকে কোন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রে ছবিদাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেই পারতেন না প্রযোজক এবং পরিচালকেরা।

এর আগে যেসব ছবির নাম উল্লেখ করেছি সেগুলি ছাড়া আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির নাম উল্লেখ করছি। সেগুলি হল ছদ্মবেশী, জীবনসঙ্গিনী, বন্দি, সমাধান, অশোক, মাটির ঘর, পরিণীতা, মিলন, বন্দেমাতরম, গরমিল, দাবী, দুই পুরুষ, চন্দ্রশেখর, বিরাজ বৌ, সংগ্রাম, দম্পতি, অপরাজিতা, দুর্গেশনন্দিনী, কালসাপ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাত্রির তপস্যা, পথে হল দেরি, সবার উপরে, শেষ পর্যন্ত, শশীবাবুর সংসার ইত্যাদি। এছাড়া আরও বহু ছবিতে ছবিদা অভিনয় করেছেন যেগুলির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তাঁর শেষ অভিনীত ছবিটির নাম হল 'বধূ'।

সিনেমার পাশাপাশি থিয়েটারেও ছবি বিশ্বাসের সাফল্য উল্লেখ করবার মতো। শুধু অভিনয়ই নয়, বেশ কিছু নাটক তিনি পরিচালনাও করেছেন। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাটকের বিক্রি যখন বেশ পড়ে এসেছিল তখন ছবিদা প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে ওখানে অভিনয় করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন মোটা টাকার অফার ছেড়ে দিয়ে। শিশিরবাবুকে তিনি এতই সম্মান করতেন।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম অভিনীত নাটকের নাম 'সমাজ'। এছাড়া উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো মীরকাশেম, দুই পুরুষ, বিজয়া, প্রফুল্ল, ধাত্রীপান্না, ঝিন্দের বন্দি ইত্যাদি। 'দুই পুরুষ' নাটকে নাটুবিহারীর চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের বিশেষ প্রশংসা পায়। এছাড়া কম্বিনেশন নাইটের অভিনয়গুলিতে ছবিদাকে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যেত। স্টার থিয়েটারে 'শ্রেয়সী' নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। সিনেমার কাজের চাপে শেষের দিকে আর তিনি মঞ্চে অভিনয় করতে পারতেন না প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও।

১৯৫৯ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত করেন। বেশ কয়েকবার তিনি বি এফ জে এ-র পুরস্কার পেয়েছেন।

ছবিদার মতো দিলখোলা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে খুব গম্ভীর মানুষ বলে মনে হত। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনাসামনি হতে ভয় পেতাম। কিন্তু একবার হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে তাঁর মতো মমতাময় রসিক পুরুষ আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যেত না। সেই রসিক মানুষ ছবিদার জীবনের দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই নিবন্ধ শেষ করব।

জীবনের একটা সময়ে ছবিদা প্রচুর মদ্যপান করতেন। ব্যস, ওই মদ্যপানই। আনুষঙ্গিক কোন বদ নেশা তাঁকে কোনদিন আকৃষ্ট করেনি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কাজকর্ম শেষ করার পর মদ্যপান। কোন কোন দিন মাত্রা একটু বেশি হয়ে যেত। সেদিন দু-একটা মজার কাণ্ড করে ফেলতেন।

একদিন এক ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে ওঁরই পয়সায় সন্ধে থেকে মদ্যপান করেছেন। রাত্রে রাস্তায় নেমে ছবিদা তাঁকে 'গুডনাইট' করলেন। অর্থাৎ এইবার আসতে আজ্ঞা হোক। ভদ্রলোক কিন্তু সে কথার মর্ম বুঝলেন না। তিনি বায়না ধরলেন : ছবিবাবু, আপনি তো সাউথের দিকেই যাচ্ছেন, আমায় একটু নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

ছবিদা মনে মনে খুব বিরক্ত হলেন। সারা সন্ধে এই ভদ্রলোকের বকবকানি শুনতে শুনতে তিনি তিতিবিরক্ত। এখন একটু নিষ্কৃতি চাইছেন তাও পাবেন না। মাথার মধ্যে একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি ভদ্রলোককে গাড়িতে তুললেন। তারপর টালিগঞ্জের দিকে না গিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিলেন উত্তর কলকাতা অভিমুখে।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন : ও কী ছবিবাবু, আপনি উল্টোদিকে যাচ্ছেন কেন?

ছবিদা গম্ভীর গলায় বললেন : চুপ করে বসুন তো মশাই। এদিকে ছোট্ট একটা কাজ আছে, সেটা সেরে তারপর বাড়ি যাব।

ছবিদার গাড়ি শ্যামবাজার পার হয়ে বি টি রোড ধরল। তারপর ডানদিকে বেঁকে দমদম। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামালেন। তারপর ভদ্রলোককে বললেন : একবার নেমে দেখুন তে রাস্তার ওপর কী যেন একটা পড়ে আছে। ওটাকে তুলে ফেলে দিন।

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামতেই ছবিদা তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর থেকে ভদ্রলোক আর কখনো ছবিদার পয়সায় মদ্যপান করতেও চাননি, গাড়িতে লিফ্ট নিতেও চাননি।

ঘটনাটা শোনার পর ছবিদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : আচ্ছা ছবিদা, ভদ্রলোককে তো অত রাত্রে এয়ারপোর্টের কাছে ছেড়ে দিয়ে এলেন। ওঁর কাছে যদি পয়সা না থাকত তাহলে টালিগঞ্জ ফিরতেন কীভাবে?

ছবিদা হেসে বলেছিলেন : পয়সা নেই কী রে। ব্যাগ ভর্তি টাকা। কিন্তু এমনই কঞ্জুষ যে বেরিয়ে আসবার আগে বেয়ারাটা যখন টিপসের আশায় ওকে সেলাম করল তখন কেমন নির্বিকারভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগল। সেই জন্যেই তো অত রেগে গিয়েছিলাম।

আর একবারের একটা ঘটনা বলি। সেবারেও অনেক রাত্রে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরছেন ছবিদা।

প্রচণ্ড শীত। বাঁশদ্রোনিতে ওঁর বাড়ির সামনে এসে দেখলেন একজন কনস্টেবল শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে। এমনিতেই ছবিদার মনটা নরম, তার ওপর মদ্যপানের ফলে আরও নরম হয়ে উঠেছে। শীতে কাতর কনেস্টবলটিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন : আহা, তোমার কত কষ্ট! ঠিক আছে, তুমি আমার বিছানায় গিয়ে শোও, আমি তোমার হয়ে পাহারা দিচ্ছি।

এ কথা শুনে কনস্টেবলটির তো আক্কেল গুড়ুম। সে এক হাত জিভ কেটে বললে · ইয়ে আপ কেয়া বলতে হেঁ বাবু। নেহি নেহি—ইয়ে কভি নেহি হো শক্তা!

ছবিদাও নাছোড়বান্দা : কাহে নেহি হো শক্তা? আহা, তোমার কত কষ্ট! তুমি আমার বিছানায় শোবে চলো। আমি তোমার হয়ে পাহারা দেব।

সেও যাবে না, ছবিদাও ছাড়বেন না। রীতিমতো টানাটানি, চ্যাচামেচি। ফলে বউদির ঘুম ভেঙে গেল। উনি তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নেমে এলেন। প্রায় জোর করে ছবিদাকে টেনে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকালেন। অনিচ্ছুক ছবিদা যেতে যেতেও সমানে আক্ষেপ করে চলেছেন : আহা, তোমার কত কষ্ট। তুমি আমার বিছানায় শোবে চলো, আমি তোমার হয়ে পাহারা দেব। আহা তোমার কত কষ্ট...

আপাতদৃষ্টিতে এটাকে মাতলামি মনে হলেও ছবিদার অবচেতনে যে আর একটা মন কাজ করত সেটা কি অস্বীকার করা যায়। মাতলামির মধ্যেও একটা মানবতাবোধ—এটাই বা কজনের মধ্যে থাকে।

এমন একটি মানুষের জন্যে বুকটা তো খাঁ খাঁ করবেই।

কাননদি

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩৫ সালের মে মাসের শেষাশেষি। তার কয়েকদিন আগে রূপবাণী সিনেমায় জ্যোতিষ ব্যানার্জি পরিচালিত রাধা ফিল্মসের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। আর মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হৈ চৈ।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটি এর আগে কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। জহর গাঙ্গুলি, শান্তি গুপ্তা, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ প্রমুখ তখনকার নামকরা শিল্পীরা সেই নাটকে অভিনয় করেছেন। দর্শকরা হৈ-হৈ করে নাটক দেখেছে আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

কিন্তু ছবির 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকের জনপ্রিয়তাকে অনেক বেশি ছাপিয়ে গেল। তার কারণ হল কাননবালা। ছবিতেও জহর গাঙ্গুলি, তুলসী চক্রবর্তী ইত্যাদি আছেন—যাঁরা নাটকেও ছিলেন। কিন্তু নীহারিকার চরিত্রে কাননবালাকে তো আর নাটকে দেখা যাবে না। তিনি কোনওদিন নাটক করেননি। আর করবেনও না বোধহয়। কাজেই নীহারিকার বেশে কাননবালাকে দেখবার জন্যে দর্শক হন্যে হয়ে উঠল।

হন্যে হবার কারণও আছে। কাননবালা তখন ইয়ং বেঙ্গলের হার্টথ্রব। বাংলা ফিল্মে তখন ওঁর চেয়ে সুন্দরী অভিনেত্রী হয়তো ছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেহারায় কাননবালার মতো মাদকতা ছিল না। এর পরের দশকে দেখেছি মহিলাদের কাছেও কাননবালা রীতিমত গ্রহণীয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর অনুকরণে কানের দুল গড়াচ্ছেন, তাঁর ফ্যাশানে শাড়ি ব্লাউজ ব্যবহার করছেন। কলকাতার রাস্তার ফুটপাতে চট বিছিয়ে কাননবালার পাসপোর্ট সাইজের ছবি বিক্রি হচ্ছে। কোনও কোনও ছবিতে কাননবালার মাথায় পাসিং-শো মার্কা বিলিতি টুপি।

না, তখনও কাননবালা দেবিত্বে ভূষিতা হননি। তখনও তিনি জনমনোরঞ্জিনী কাননবালাই।

এই কাননবালাকে নিয়েই একটা কাণ্ড ঘটে গেল রূপবাণী সিনেমায়।

১৯৩৫ সালের মে মাসের শেষাশেষি একদিন শো চলছে। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। পর্দায় তখন মানস আর নীহারিকারূপী জহর গাঙ্গুলি আর কাননবালার লোকদেখানো প্রেমপর্ব চলছে। আর সেই প্রেমপর্বে কাননবালা এমন গদগদ ভঙ্গি করে অভিনয় করলেন যে সামনের সারির এক তরুণ দর্শকের মাথা খারাপ হয়ে গেল তা দেখে। সে তীরবেগে পর্দার দিকে ছুটে গেল মোহময়ী কাননবালাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে।

প্রেক্ষাগৃহে হৈ হৈ পড়ে গেল। রূপবাণীর গেটকিপাররা দৌড়ে গিয়ে উন্মত্ত দর্শকটিকে আটকালেন। পরের দিন 'ভগ্নদূত' পত্রিকায় ছোট্ট করে এই প্রেম পাগল তরুণের কাণ্ড ছাপার অক্ষরে বেরিয়েও গেল।

তা কাননবালা তখন শুধু ইয়ং বেঙ্গলের কেন, অনেক প্রৌঢ় পুরুষেরও হার্টথ্রব ছিলেন। কাননবালা তখন সেই যুগের সেক্স-সিম্বল। জনান্তিকে জানিয়ে রাখি, এই প্রতিবেদকও তখন ফুটপাত থেকে চার পয়সা দিয়ে কেনা কাননবালার একখানা চোখঠারা ছবি অনেকদিন মানিব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বয়ে বেড়িয়েছিল।

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে কাননবালা দেবীত্বে উত্তীর্ণা হয়েছিলেন। নিজের গুণে, সৌজন্যে এবং ভদ্রতায় তিনি মানুষের শ্রদ্ধা আর সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন। কাননবালা থেকে হয়েছিলেন কানন দেবী।

একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে বন্যাত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চিত্রতারকাদের একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে শিল্পীদের স্বাক্ষর করা একটি ব্যাট নিলাম করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর পাশে বসে সেই নিলাম পরিচালনা করেছিলেন কানন দেবী।

দৃশ্যটি দেখে আমার বন্ধু 'অচলপত্র'-র সম্পাদক দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের একটি লেখার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই পত্রিকায় 'অদ্য ও প্রত্যহ' নামে একটি বিভাগ ছিল। সেখানে দীপেনবাবু লিখেছিলেন : যে সিঁড়ি বেয়ে সম্মানের শীর্ষ থেকে সাধনা বসু তরতর করে মাটিতে নেমে এলেন, সেই সিঁড়ি বেয়েই কানন দেবী ধীরে ধীরে সম্মানের শীর্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর নিজের চেষ্টায়। নিজের সাধনায়।

খুব খাঁটি কথা। হাওড়ার ঘোলাডাঙার নোংরা বস্তি থেকে উত্তরিত হতে হতে সগৌরবে ও সসম্মানে রাজ্যপালের পাশে এসে বসতে পারার পিছনে থাকে অনেক কৃচ্ছ্রসাধনার ইতিহাস। সেই সাধনার দৌলতে কাননদেবী আজ একজন মহিয়সী মহিলা। এর মধ্যে কোনও ফাঁকিবাজি নেই।

হাওড়ার ঘোলাডাঙার বস্তিতে কাননদেবীর সেই শৈশব আবাসের আজ আর কোনও অস্তিত্ব আছে কি না জানি না, কিন্তু কাননদেবীর বর্তমান আবাস এক নম্বর রিজেন্ট গ্রোভের বিশাল অট্টালিকাটির দিকে তাকালে তাঁর জীবন পরিক্রমার বিরাট সাফল্যের একটা পরিমাপ করা যায়। শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনিই নত হয়ে আসে। দানে ধ্যানে ভক্তিতে এবং ভালোবাসা বিতরণে কানন দেবী আজ সকলের অগ্রণী। সকলের শ্রদ্ধেয়া।

কাননদেবীর জন্ম কিন্তু কোনও বস্তিতে নয়। ওঁর বাবা রতনচন্দ্র দাস ছিলেন এক সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কেরানি। আয় উপায় মন্দ ছিল না। কিন্তু রতনবাবু খরচের ব্যাপারে এতই মুক্তহস্ত ছিলেন যে, তিনি যখন গত হলেন তখন রেখে গেলেন একরাশ ঋণের বোঝা। কাননদেবীর মা নিজেদের যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে ঋণমুক্ত হয়ে এক আত্মীয়র বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেখানে জুটতে লাগল নিত্য গঞ্জনা আর নিত্য অপমান। এই অবস্থা বেশিদিন সহ্য করা গেল না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয় বস্তির একটি ঘরে।

বাবা রতনবাবু কিন্তু একটি জিনিস দিয়ে গিয়েছিলেন কাননদেবীকে। শৈশবে তিনি খুব যত্ন করে ওঁর গান শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কাননদেবীর কণ্ঠে ঈশ্বরদত্ত একটা সুর ছিলই। পরবর্তীকালে তা পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের দুই দিকপাল সুরকার পঙ্কজ মল্লিক এবং রাইচাঁদ বড়ালেন সংস্পর্শে এসে।

কাননদেবীর চলচ্চিত্রজীবন শুরু হয় মাত্র দশ বছর বয়সে। তুলসী ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রলোক, যাঁকে কাননদেবী ডাকতেন কাকাবাবু বলে, তিনি ওঁর হাত ধরে নিয়ে আসেন ম্যাডান কোম্পানিতে। সেটা ১৯২৬ সাল। ম্যাডানের নির্বাক ছবি 'জয়দেব'-এ কাননদেবী রাধার ভূমিকা পেয়েছিলেন। পুরো ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তি হয়েছিল পঁচিশ টাকার। তার মধ্যে হাতে পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ টাকা। বাকিটা প্রণামী দিতে হয়েছিল এখানে-ওখানে।

এর পরের বছর ১৯২৭ সালে ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের 'শঙ্করাচার্য' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকা পেয়েছিলেন কাননদেবী। এটিও নির্বাক চলচ্চিত্র।

এর চার বছর পরে বাংলা ছবি যখন কথা বলতে শিখল তখন প্রথম বাংলা সবাক চিত্রটিতে কাননদেবী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন। ম্যাডান থিয়েটার্স প্রযোজিত এই ছবির নাম 'জোর বরাত'। পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিষ ব্যানার্জি। কাননদেবীর বিপরীতে নায়ক ছিলেন জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ছবিটি ১৯৩১ সালের ২৭ জুন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমানে বিধান সরণি) ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম বাংলা সবাক ছবির নায়িকা হিসেবে কাননদেবীর নাম ওইদিন থেকে ইতিহাসভুক্ত হয়ে রইল।

ওই ১৯৩১ সালে তিনি আরও তিনটি ছবিতে অভিনয় করেন। ছবিগুলির নাম 'ঋষির প্রেম', 'প্রহ্লাদ' ও 'কংস বধ'। তিনটি ছবিই ম্যাডান কোম্পানির। তার মধ্যে প্রহ্লাদ এবং কংস বধ এবং পরের বছরের 'বিষ্ণুমায়া' ছবিতে কাননদেবীকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল পুরুষের ভূমিকায়। এর মধ্যে প্রহ্লাদ ছবিতে ছিল নারদের ভূমিকা। নিজের কণ্ঠে গান গাইতে হয়েছিল ওই চরিত্রে।

কিন্তু একজন পনেরো-ষোলো বছরের সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা তরুণীর পক্ষে তাৎপর্যহীন পুরুষ চরিত্রে অভিনয় ভালো লাগবে কেন? তাই ম্যাডান কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ১৯৩২ সালে যোগ

দিলেন রাধা ফিল্মসে। ওখানে পরবর্তী তিন বছরে 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'মা', 'কণ্ঠহার', 'বাসবদত্তা' এবং 'মানময়ী গার্লস স্কুল ছবিতে অভিনয় করে অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। এর মধ্যে মানময়ী গার্লস স্কুল-এ তো অসম্ভব জনপ্রিয়তা পান, যে কথা এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি।

ওই সময়ে কাননদেবী নতুন করে সঙ্গীত সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। বাংলা ছবিতে তখনও প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হয়নি। সিংগিং স্টারের তখন প্রচণ্ড চাহিদা। লখনৌ-এর এক ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিলেন। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠস্বর সঠিক তালিমের গুণে অসাধারণ হয়ে উঠল। ১৯৩৫ সালে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত জে এন ঘোষের সহায়তায় কাননদেবীর প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হল। ট্রেনার ছিলেন সঙ্গীতের আর এক বিস্ময় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

বস্তুত একটা সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কাননদেবী গায়িকা হিসেবে বড় না অভিনেত্রী হিসেবে বড়? সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। নিউ থিয়েটার্সের যুগে মুক্তি, সাথী, বিদ্যাপতি, সাপুড়ে ইত্যাদি ছবিতে যখন কাননদেবীর গান বাংলার আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলেছে তখন মনে হত গাইয়ে হিসেবে কাননদেবী বড়। আবার নিউ থিয়েটার্সের 'পরিচয়' ছবিতে কিংবা এম পি প্রোডাকসন্সের 'শেষ উত্তর' ছবিতে উনি যখন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে বি এফ জে এ-র পুরস্কার পাচ্ছেন তখন মনে হত অভিনেত্রী হিসেবে তিনি বড়। সেই আমলে বি এফ জে এ পুরস্কারের অসাধারণ সম্মান ছিল।

কানন দেবীর অভিনয় এবং সাঙ্গীতিক প্রতিভা দুটোই স্ফুরিত হয় নিউ থিয়েটার্সে এসে। পঙ্কজ মল্লিকের শিক্ষকতায় ওঁর গাওয়া 'মুক্তি' ছবির রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত খুশি করেছিল। দর্শকদের তো মুখে মুখে ফিরত্ই। পরবর্তী পর্যায়ে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'সাথী' ছবিতে 'ঘর যে আমায় ডাক দিয়েছে হারিয়ে যাওয়া নাম ধরে' এবং বিদ্যাপতি' ছবিতে 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া' কিংবা কাজি নজরুলের সুরে সাপুড়ে ছবিতে 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই' ইত্যাদি গান তো সুদূর গ্রামাঞ্চলেও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

রাইচাঁদ বড়াল মশাই আমার কাছে গল্প করেছিলেন : গানের ব্যাপারে কাননের ছিল ঐশ্বরিক প্রতিভা। তখনকার দিনে তো শুটিং-এর সময় গান টেক করা হত। 'সাথী' ছবিতে কানন আর সাইগল রাজপথের ওপর গান গাইতে গাইতে শ্যুটিং করছে। ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে বাদ্যযন্ত্রীরা বাজাতে বাজাতে ওদের পেছনে পেছনে আসছে। তার মধ্যে সায়গলের দু-চারবাব তালভঙ্গ হয়ে সুর কেটে গেছে। কিন্তু কাননের গান ছিল একেবারে পারফেক্ট।

তা কাননদেবীর গানের কদর তখন শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত প্রযোজক এন সি সিপ্পির বাড়িতে গিয়ে দেখেছি কাননদেবীর গাওয়া বাংলা আর হিন্দি গানের রেকর্ড থরে থরে সাজানো। সিপ্পি সাহেব ছিলেন কাননদেবীর গানের প্রচণ্ড অনুরাগী।

বিখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্তও একই অভিমত পোষণ করতেন। তাঁর সুরে কানন দেবীর গাওয়া 'শেষ উত্তর' ছবির 'তুফান মেল যায়' অথবা 'আমি বনফুল গো' কিংবা 'যোগাযোগ' ছবির 'যদি ভালো না লাগে তো দিও না মন' ইত্যাদি গান কীভাবে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হত তা আজ আর বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কমলবাবুর সুরে দেবকী বসুর 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে অশোককুমারের সঙ্গে কাননদেবীর গাওয়া 'অনাদি কালের স্রোতে ভাসা মোরা দুটি প্রাণ' গানখানি তো রীতিমত মাদকতার সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৭ সালে ওই ছবিতে অভিনয় করবার জন্য কাননদেবী এক লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। ওই অঙ্কের টাকা তখন বোম্বাইয়ের শিল্পীরাও পেতেন না বলে শুনেছি।

ঠিক কোন সালে মনে নেই, বোধহয় চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কাননদেবী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হলেন ব্যারিস্টার অশোক মৈত্রের সঙ্গে। সারা বাংলাদেশে তাই নিয়ে হইচই পড়ে গেল। সবাই ধরে নিলেন বিখ্যাত হেরম্ব মৈত্রের বাড়ির বধূকে নিশ্চয় আর অভিনয় কিংবা গান করতে দেওয়া হবে না। একটা আক্ষেপ ঘুরে বেড়াতে লাগল সকলের মুখে মুখে।

কাননদেবী কিন্তু উল্টোটাই ভেবেছিলেন। অত বড় একটা কালচার্ড ফ্যামিলিতে নিশ্চয় অভিনয় কিংবা সংগীতের ব্যাপারে উদারতা থাকবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটল না। কাজেই অচিরেই বিবাহ-

বিচ্ছেদ ঘটে গেল। কোনওরকম তিক্ততার সৃষ্টি না করে উভয় পক্ষই এই বিচ্ছেদ মেনে নিলেন। বাংলার রসপিপাসু মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আগে যেসব ছবির নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলি ছাড়াও কাননদেবী আর যেসব ছবিতে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিউ থিয়েটার্সের অভিনেত্রী ও পরাজয় এবং এম পি প্রোডাকসন্সের বিদেশিনী, পথ বেঁধে দিল, তুমি আর আমি, অনির্বাণ, বাঁকা লেখা। বেশ কয়েকটি হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি।

১৯৪৮ সালে প্রযোজনায় নামলেন কাননদেবী। প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন শ্রীমতী পিকচার্স। এঁদের প্রথম ছবি 'অনন্যা'।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে কাননদেবীর সঙ্গে বিয়ে হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুর এ ডি কং শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে। হরিদাসবাবু অত্যন্ত সুদর্শন, সজ্জন, সংস্কৃতিমান এবং প্রকৃত অর্থে একজন ভদ্রলোক। প্রথম দিকের দু-তিনটি ছবি ছাড়া পরবর্তীকালে শ্রীমতী পিকচার্সের সব ছবি তিনিই পরিচালনা করেন। 'অনন্যা' ছাড়া শ্রীমতী পিকচার্সের বাকি ছবিগুলির নাম : মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, নববিধান, দেবত্র, আশা, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি। এই সব ছবিতেই কাননদেবী অভিনয় করেছেন। এছাড়া ওই প্রতিষ্ঠানের বাকি ছবিগুলির নাম হল, বামুনের মেয়ে, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, এবং আঁধারে আলো। শেষোক্ত ছবিটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায় এবং কার্লোভি ভ্যারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য নির্বাচিত হয়।

কাননদেবী বার তিনেক বিদেশে গেছেন। প্রথমবারে ১৯৪৭ সালের ৬ আগস্ট। ঐতিহাসিক ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে লন্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের অনুষ্ঠানে একটি গান করেন 'আমাদের যাত্রা হল শুরু'। ওইবারে সফরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ভিভিয়েন লে, ক্লার্ক গ্যাবেল, স্পেন্সার ট্রেসি, ক্যাথরিন হেপবার্ন, মার্না লয় প্রমুখ বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের।

অভিনয় থেকে অবসরগ্রহণ করলেও কাননদেবী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরে দাঁড়াননি। তখনও তিনি ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির একজন ডিরেক্টর। ইন্ডাস্ট্রির নানা বিপদে আপদে সকলের পাশে এসে দাঁড়ান তিনি। দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের সাহায্যের জন্য মূলত তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল 'মহিলা শিল্পীমহল'।

১৯৬৮ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিতা হন। ১৯৭৬ সালে পান চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে বড় সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার'।

খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শীর্ষে উঠেও কাননদেবী কিন্তু তাঁর পুরনো দিনের সুহৃদদের ভুলে যাননি। তেমন একটি ঘটনা বলে এই রচনা শেষ করব।

কবি ও গীতিকার প্রণব রায়, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, লেখক ও সম্পাদক সুনীল ধর এবং চলচ্চিত্র প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল এই চারজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ঠাট্টা করে বলা হত চতুর্মুখ। এই চতুর্মুখের একত্রে নৈশবিহার ছিল সারা কলকাতার আলোচনার বস্তু। নির্ভেজাল আড্ডা, উত্তম সাংস্কৃতিক আলোচনা, গান গাওয়া আর নিজেদের রচনা পাঠ ছিল সেইসব নৈশবিহারের সূচিপত্র। চারজনেই খুব মেজাজি মানুষ ছিলেন। প্রণব রায়ের একটা হুডখোলা গাড়ি ছিল। সেটা নিয়ে ওঁরা কলকাতা পরিক্রমা করতেন। একদিন মধ্যরাত্রে ওঁদের খেয়াল হল, সবাই নাকি বলে কলকাতা শহরে টাকা ওড়ে। সেটা তো কোনওদিন দেখা হয়নি। আজ সেটা দেখতে হবে।

এই বলে গাড়ি নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন সেই পুরনো দিনের ভাসমান হাওড়া ব্রিজের ওপরে। গঙ্গার দুরন্ত হাওয়ার তালে তালে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনা নতুন পাঁচ টাকার নোটের একটি বান্ডল তাঁরা হাওয়ায় উড়িয়ে চাক্ষুষ করলেন টাকা ওড়ানো। তখনকার দিনের পাঁচশো টাকার দাম এখন অনেক। অত টাকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার মতো মেজাজি মানুষ ছিলেন এই চতুর্মুখ।

কাননদেবী তাঁর প্রথম জীবনের সংগ্রামের দিনে এই চারমূর্তির কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পেয়েছেন। নানা ভাবে। এঁরা ছিলেন তাঁর সত্যিকারের সুহৃদ।

কালক্রমে কাননদেবী অনেক ওপরে উঠে গেলেন। এখন আর তাঁর সঙ্গে আগের মতো আড্ডা দেওয়া যায় না। তবে দেখা হলেই কুশল বিনিময় হয়।

শ্রীমতী পিকচার্স হবার পর প্রণববাবু তার সঙ্গে যুক্ত হলেন গীতিকার হিসেবে এবং ফণিবাবু প্রচার-সচিব হিসেবে। পাঁচুগোপালবাবু ততদিনে বোধহয় পরলোকগত হয়েছেন আর সুনীলবাবু তাঁর পত্রিকা তুলে দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে চাকরি করছেন। চারমূর্তির আড্ডাটা তখন ভেঙে গেছে।

অনেকদিন পরে ধর্মতলার মোড়ে ফণিবাবুর সঙ্গে সুনীলবাবুর দেখা। কথায় কথায় কাননদেবীর প্রসঙ্গ উঠল।

সুনীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কানন কেমন আছে রে?

ফণিদা বললেন : ভালোই তো আছেন।

সুনীলবাবু বললেন : তোর সঙ্গে দেখাটেখা হয়?

ফণিদা বললেন : হয় বৈকি। ওঁর কোম্পানিতে চাকরি করি, কাজেই মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হয়।

সুনীলবাবু বললেন : কানন এখনও সেই আগের মতোই আছে?

ফণিদা বললেন : মনে হয় আছে। তবে আমি তো আর সেই আগের মতো ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলতে পারি না। হাজার হোক তিনি এখন আমার মনিব।

সুনীলবাবু বললেন : হ্যাঁরে ফণি, একদিন কাননের শ্যুটিং দেখা যায় না?

ফণিদা বললেন : কেন যাবে না। এই তো পরশুই আছে এন টি এক নম্বরে। তুই বেলা বারোটা নাগাদ চলে আয়। আমি ওখানেই থাকব।

নির্দিষ্ট দিনে সুনীলবাবু শুটিং দেখতে গেলেন। ফণিদা ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরে ঢুকলেন। এসে দাঁড়ালেন একটা আলো-আঁধারি জায়গায়। একটু দূরে সেটের মধ্যে অনেকগুলি উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। তার মধ্যে রাজেন্দ্রাণীর মতো বিচরণ করছেন কাননদেবী।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাননদেবীকে দেখলেন সুনীলবাবু। প্রায় বাইশ বছর পরে তাঁকে দেখছেন। আগের চেয়ে অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্না হয়েছেন। অনেক বেশি সুন্দর।

খানিকক্ষণ শ্যুটিং দেখার পর সুনীলবাবু বললেন : আজ চলি রে ফণি। অনেকদিন পরে কাননকে দেখলাম। বড় ভালো লাগল ওকে দেখে।

সুনীলবাবু চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পরে সেট থেকে বেরিয়ে ফণিদার সামনে এসে দাঁড়ালেন কাননদেবী। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : ফণিবাবু, আপনার পাশে এতক্ষণ যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি কি তাঁকে চিনতাম?

ফণিদা মাথাটা নিচু করে ততোধিক মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন : আজ্ঞে হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি ওঁকে চিনতেন।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কাননদেবী। মনে হল তিনি যেন ফিরে গেছেন অনেকদিন আগেকার ফেলে আসা দিনগুলিতে। তারপর একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ফিরে গেলেন উজ্জ্বল আলোকিত সেটের মাঝখানে।

সাবিত্রী

মুখ থেকে মেক-আপটা তুলতে তুলতে সাবিত্রী চ্যাটার্জি বললে : তুমি তো আর্টিস্টদের নিয়ে রেগুলার লিখছো রবিদা। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মারা যাবার পর। আমারটা অন্তত বেঁচে থাকতে থাকতেই লিখো।

কথাটা শুনে আমি ধমকে উঠলাম। বললাম : কী আজেবাজে বকছ সাবু। বালাই ষাট। তুমি এত তাড়াতাড়ি মরতে যাবে কেন! তুমি হলে আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তোমার কাছ থেকে আমাদের যে এখনও অনেক কিছু পাবার আছে।

একটু আগেই কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে ব্যারাকপুরের সুকান্ত সদনে 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকের নায়িকা নীতা সেজে প্রায় হাজারখানেক দর্শককে চোখের জলে ভাসিয়ে সাজঘরে ফিরে এসেছে সাবিত্রী। শেষ দৃশ্যের উত্তেজনাপূর্ণ অভিনয়ের দাপটে তার বুকটা তখনও ওঠানামা করছে।

আমার কথা শুনে হাতটা থেমে গেল সাবিত্রীর। আয়নার সামনে রাখা ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খেল। তারপর জীবনানন্দের বনলতা সেনের 'পাখির নীড়ের মতো' চোখ দুটো আমার মুখের ওপর মেলে দিয়ে বললে : মরা বাঁচার কথা কেউ কী বলতে পারে রবিদা। মানুষ এই আছে, এই নেই। আমিও কী চাই এত শিগগির মরে যেতে। অনেক দিন বাঁচতে চাই। তবে সেটা বাঁচার মতো বাঁচা। কাজের মধ্যে বাঁচা। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমি কাজ করে যেতে চাই। কাজকর্মহীন অবস্থায় বেঁচে থেকেও মরার মতো বাঁচতে আমি চাই না।

আমি বললাম : কাজ তো তোমার হাতে এখন প্রচুর। অনেকগুলো ছবি করছ, নাটক করছ। একটা সময়ে যে কর্মহীন হয়ে পড়েছিলে, সেটা তো তোমার নিজেরই দোষে। প্রচণ্ড অভিমান করে অভিনয়ের জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল!

রঙমাখা মুখের ওপর তুলো ঘষতে ঘষতে আয়নার দিকে চোখ রেখেই সাবিত্রী বললে : করব না অভিমান! আমার ওপরে কত অবিচার হয়েছে সেটা জানো? শুধু আজ বলে নয়, সারাটা জীবন আমাকে কতবার যে অবিচারের শিকার হতে হয়েছে।

আমি বললাম : সেসব কথা ভুলে যাও। ওগুলো যত ভাববে ততই শরীর আর মনের ক্ষতি হবে। সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো দিকি। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোমাকে কেবল 'অন্যতমা শ্রেষ্ঠা' নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে দেখে যেতে চাই।

খুব আবেগপূর্ণ দৃশ্যে যে ভাবে অভিনয় করে, কণ্ঠস্বরের মধ্যে তেমনি আবেগের ঢেউ তুলে সাবিত্রী বললে : আশীর্বাদ করুন রবিদা, আপনার মনের ইচ্ছে যেন পূরণ করতে পারি।

কথাটা শেষ করে মুখে পাউডার বোলাতে বোলাতে সাবিত্রী আজকের অভিনয়ের সময় যে তিরিশটা বছর বয়েস কমিয়ে ফেলেছিল সেটাকে বিদায় দিয়ে স্বমূর্তিতে ফিরে এল। তাই দেখে আমার পাশে দাঁড়ানো আমার গৃহিণী রাণু দেবী অস্ফুটে বলে উঠলেন : বাঃ, কী সুন্দর দেখতে!

যত চাপা গলাতেই বলুক রাণুর কথা সাবিত্রীর কানে গিয়েছিল। ঝকঝকে দাঁতে একমুখ হাসি উপহার দিয়ে বললে : সুন্দর না হাতি। বউদি নিজে সুন্দর বলে আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

সাবিত্রীর কথা শুনে রাণু খুব বিব্রত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল : না না, আপনি সত্যিই খুব সুন্দরী।

সাবিত্রী আমার দিকে ফিরে বললে : আমার সুন্দরী বউদিকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেও না গো রবিদা।

আমি বললাম : আমি ভাই একটু প্রাচীনপন্থী মানুষ। 'পথি নারী বিবর্জিতা' এই আপ্তবাক্যটিকে দারুণ শ্রদ্ধা করি।

আমার কথা শুনে রাণু ঝলসে উঠল। বললে : দেখুন না ভাই, নিজে কত জায়গায় যায়, কিন্তু আমাকে কোথাও নিয়ে যায় না।

সাবিত্রী বললে : সত্যি রবিদা, এটা তোমার ভারি অন্যায়। যত তাড়াতাড়ি পারো বউদিকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়িতে যেও। যাবার আগে একটা ফোন করে জেনে নিও আমি বাড়িতে আছি কিনা! এখন তো তোমার আশীর্বাদে একটু বেশি বেশি কাজকর্ম করছি।

আমি বললাম : তুমি যখন হুকুম করছ তখন তো একদিন যেতেই হবে। তবে তোমার বউদিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কিনা বলতে পারছি না।

সাবিত্রী বললে : না না, ওরকম কোরো না রবিদা। মহিলাদের একটু মর্যাদা দিতে শেখো। সারাজীবন ওই মর্যাদা আদায়ের জন্যেই তো আমি লড়াই করে চলেছি। তুমি অন্তত আমার সেই লড়াইকে সম্মান দাও। বউদিকে একদিন অতি অবশ্যই নিয়ে যেও।

আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম সাবিত্রীর ওই দৃপ্ত ভঙ্গিটুকুর দিকে। একটু সংবিত ফিরে পেয়ে বললাম : নিশ্চয় নিয়ে যাব সাবিত্রী।

কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া যায় না। আমি থাকি বেলঘরিয়ার কাছে রথতলায়। আর সাবিত্রী সেই নিউ আলিপুরে। কয়েক যোজন দূরত্ব। তাই হাজার ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আর সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীর আমন্ত্রণের কথা ভুলেও গিয়েছিলাম।

কয়েক মাস পরে একদিন বাধ্য হলাম সাবিত্রীর বাড়ি যেতে। সামনে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসেসিয়েশন, অর্থাৎ বি এফ জে এ-র পুরস্কার বিতরণ উৎসব। আমরা পূর্বাহ্নেই ঠিক করে নিয়েছিলাম শিল্পীদের প্রাপ্য পুরস্কারগুলি শিল্পীদের হাত দিয়েই দেওয়াব। সাবিত্রী বেশ কয়েকবার বি এফ জে এ অ্যাওয়ার্ড উইনার। তাই সাবিত্রীকে মঞ্চে তোলা বিশেষ দরকার। ওটা আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু লোকমুখে শুনলাম সাবিত্রী নাকি অভিমান করে বসে আছে। ও যতবার বি এফ জে এ-র পুরস্কার পেয়েছে, তার প্রতিটাই শ্রেষ্ঠা চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে। শ্রেষ্ঠ নায়িকার সম্মান একবারও পায়নি। এই নিয়ে ওর মনে অভিমান আছে। গত কয়েক বছর তাই বি এফ জে এ-র অনুষ্ঠানে ও আসেনি। এবারও আসবে না।

সাবিত্রীর এই অভিমানের কথা শুনে মনে মনে হাসলাম। মেয়েটা ভারি অবুঝ তো! ও চিরকালই অভিমানী। একটু বেশি পরিমাণে অভিমানী। ছায়াছবি কিংবা মঞ্চের জগতে লড়াই করতে করতে ওকে ওর জায়গা করে নিয়ে হয়েছে। কেউ ওর জন্যে বরণডালা সাজিয়ে রাখেনি। নিজের চেষ্টায়, নিজের অধ্যবসায়ে, প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বরণমালা গলায় পরতে হয়েছে। তাই এতটুকু অবহেলা, এতটুকু অবিচার ও সহ্য করতে পারে না। অভিমানে ফেটে পড়ে। এই অভিমানের বশে ও নিজের যে কত ক্ষতি করেছে তার হিসেব রাখাই দুষ্কর।

কিন্তু একটা জিনিস ও বোঝে না কেন! শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা চরিত্রাভিনেত্রীর পুরস্কার পাওয়া অনেক গৌরবের ব্যাপার। একজন নায়িকা চিত্রনাট্যের অনেক বেশি সাহায্য পায়। চরিত্রভিনেত্রীর সে সুযোগ অনেক কম। তারই মধ্যে থেকে দর্শক আর সমালোচকের প্রশংসা আদায় করে নিতে হলে অনেক বেশি ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতার পরিচয় সাবিত্রী বার বার দিয়েছে। সমালোচকদের পুরস্কার আদায় করে নিয়েছে।

তাছাড়া ওর সমসময়ে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ছিলেন প্রচণ্ড গ্ল্যামারের অধিকারিণী। বেশ ভালো ভালো কয়েকটি চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা ভেবেই কয়েকটি চরিত্র লেখাও হয়েছিল তাঁর যুগে। সুতরাং সুচিত্রা সেন যদি শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কারটি ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তাতে দুঃখের কী আছে। আর এ সমস্ত ব্যাপারগুলো তো স্পোর্টিংলি নিতে হয়। সাবিত্রীর মতো একজন বড়ো মাপের অভিনেত্রীর এই স্পিরিটটা তো থাকা উচিত। ওর আশেপাশে যারা থাকে তারা যদি এই জিনিসটা সাবিত্রীকে ঠিকমতো বোঝাতে পারত তাহলে হয়তো ওকে এভাবে অন্ধ অভিমানের শিকার হতে হত না।

এই তো সেদিন কোথায় যেন পড়লাম, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, তাঁর কালের তো বটেই,

এখনও পর্যন্ত তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্রবাবু ঠিকই বলেছেন। তিনি ছবিতে এবং মঞ্চে দুই জায়গাতেই সাবিত্রীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। খুব কাছে থেকে তার প্রতিভার পরিমাপ করেছেন। তিনি যথার্থই বুঝেছেন সাবিত্রী কত বড় দরের অভিনেত্রী। এর পরও কি সাবিত্রীর অভিমান করা সাজে?

আমাদের দেশে একই সঙ্গে মঞ্চে আর ছায়াছবিতে সফল অভিনেত্রীর সংখ্যা খুবই কম। নেই বললেই চলে। অনেক ভেবে ভেবেও গীতা দে আর সাবিত্রী ছাড়া আর বিশেষ কাউকে তো মনে পড়ছে না। এই উভয় ক্ষেত্রেই কত বিচিত্র ধরনের চরিত্রে সাবিত্রী অভিনয় করেছে। দর্শককে একই সঙ্গে হাসাতে আর কাঁদাতে ওর মতো আর কেউ পেরেছে কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে? দর্শকরা তার অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে মুঠো মুঠো প্রশংসা ছুঁড়ে দিয়েছেন তার দিকে। তা সত্ত্বেও সাবিত্রী 'কিছুই পেলাম না' বলে কেন যে অভিমান করে সেটা আমার মাথায় আসে না।

তা সাবিত্রীর এই অভিমানটা ভাঙানো দরকার। সামনেই বি এফ জে এ-র অনুষ্ঠান। তার আগেই ব্যাপারটা করতে হবে। বি এফ জে এ-র সভাপতি হিসেবে এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

সাধারণত আমরা অ্যাওয়ার্ড উইনার্সদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ জানাই। শিল্পী এবং কলাকুশলী সহ ইন্ডাস্ট্রির বাকি সবাইকে ক্যুরিয়ার যোগে কার্ড পাঠিয়ে দিই। সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করতে গেলে প্রায় ছ'মাস সময় লেগে যাবে। সেটা তো আর সম্ভব নয়। তবে অ্যাওয়ার্ড উইনার্সদের নেমন্তন্ন করতে যাবার পথে যদি কারও বাড়ি পড়ে তাহলে সেখানে ঘুরে আসা হয়।

কিন্তু সাবিত্রীর বাড়ির দিকে, অর্থাৎ নিউ আলিপুরে আমাদের কোনও অ্যাওয়ার্ড উইনার নেই। এক আছেন তপন সিংহ। কিন্তু তিনি কন্যার অসুস্থতা নিয়ে বিব্রত। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর কাজটা অনেক আগেই করা হয়ে গেছে। আর আছেন অপর্ণা সেন। কিন্তু তিনি তখন আমেরিকায়। সুতরাং সেখানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওঁর কার্ডটা ক্যুরিয়র মারফত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব কেবলমাত্র সাবিত্রীর বাড়িতে যাবার জন্যেই আলাদা প্রোগ্রাম করতে হল।

এই যাত্রায় আমার সঙ্গে তিনজন দুঁদে চলচ্চিত্র সাংবাদিক ছিলেন। তাঁরা হলেন, 'আজকাল' পত্রিকার চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর নির্মল ধর এবং 'গণশক্তি' পত্রিকাব তপন বসু। নিউ আলিপুরের এন ব্লকে সাবিত্রীর বাড়িতে যখন গিয়ে আমরা পৌঁছলাম, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। টপ ফ্লোরে সাবিত্রীর ফ্ল্যাটের কোলাপসিবল্ গেট তালাবন্ধ। ভেতরের ঘরে টি-ভিতে প্রদর্শিত বাংলা ছায়াছবির সংলাপগুলো শোনা যাচ্ছে।

গেট ধরে নাড়াচাড়া করতে একটি বাচ্চা মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে · কাকে চাই?

আমি বললাম : সাবিত্রীকে একবার ডেকে দাও তো!

এরপরই মেয়েটির দিক থেকে প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল, 'আপনার নামটা কী বলুন?' কিন্তু সেরকম কোনও প্রশ্ন না করে মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। আমি মনে মনে হাসলাম। মেয়েটি নির্ঘাত আমাকে কোনও ছবির প্রোডিউসার ভেবেছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই হাউসকোট পরা অবস্থায় সাবিত্রী বেরিয়ে এল। তার চোখেমুখে জিজ্ঞাসা। হঠাৎ আমাকে দেখে আনন্দে তার সারা মুখ ঝলমল করে উঠল। খুশি খুশি গলায় বলে উঠল : দাদা এসেছেন! এক মিনিট।

এই বলে সাবিত্রী ত্রস্ত পায়ে ভেতর থেকে চাবি এনে গেটটি উন্মোচিত করল। আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। সাবিত্রী আমাদের যে ঘরে টিভি চলছিল সেই ঘরেই বসাল। টিভি-র সাউন্ডের ভল্যুমটা কমিয়ে দিলে।

আমার সঙ্গে যে সব সাংবাদিকরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সাবিত্রীর নিশ্চয় পরিচয় আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওঁদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এটা আমার কর্তব্য। এতে মানুষকে সম্মান জানানো হয়। অনেককে দেখেছি নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, এই ভদ্রতাসূচক কর্তব্যটি ভুলে যান। ভাবেন, এতে তাঁর গুরুত্ব কমে যাবে। এ ব্যাপারটা আমি শিখেছি চিত্রপরিচালক নবেন্দু

চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। নব্যেন্দু তাঁর বাড়িতে কোনও অভ্যাগত এলে তাঁকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এমন কি অন্তঃপুরবাসিনীদেরও ডেকে এনে। এটা নব্যেন্দুর একটা মহৎ গুণ।

আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্বের পর সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এলাম। বললাম : তুমি পর পর কয়েক বছর বি এফ জে এ-র অনুষ্ঠানে যাচ্ছ না কেন সাবু?

সাবিত্রী একটু উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে : তোমরা আমাকে প্রাইজ দাও না তো। আমি কেন তোমাদের অনুষ্ঠানে যেতে যাব?

আমি বললাম : মিথ্যে কথা! তুমি অনেকবার বি এফ জে এ-র পুরস্কার পেয়েছ। সে সব ছবি আমার কাছে আছে।

সাবিত্রী বললে : সে তো সাইড অ্যাকট্রেস হিসেবে। হিরোইন হিসেবে তোমরা তো আমাকে কখনও পুরস্কার দাওনি।

আমি বললাম : সাইড অ্যাকট্রেস কি অ্যাকট্রেস নয়? তাছাড়া হিরোইন হিসেবে পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে সাইড অ্যাকট্রেস হিসেবে পুরস্কার পাওয়া অনেক বেশি সম্মানের। তাতে অনেক বেশি ক্ষমতার দরকার হয়।

সাবিত্রী বললে : কিন্তু হিরোইন হিসেবে পুরস্কার পাওয়ার গ্ল্যামারই আলাদা। সাইড অ্যাকট্রেসের পুরস্কারগুলো কেমন যেন সেকেন্ড গ্রেড পুরস্কার বলে আমার মনে হয়।

এ্যাই মরেছে! এত বড় একজন ক্ষমতাশালী অভিনেত্রী, সেও কিনা গ্ল্যামারের মোহে ভুগছে। ওর মন থেকে এই ব্যাপারটা দূর করে দেওয়া দরকার। এই ভাবনাটা খুব ক্ষতিকারক।

আমি বললাম : তুমি কি অ্যাকটিং থেকে রিটায়ার করছ নাকি সাবু?

কথাটা শুনে সাবিত্রী চমকে উঠলো। বললে : না! না তো! কে বললে?

আমি বললাম : তাহলে তুমি ভাবছ কেন যে ভবিষ্যতে তুমি বেস্ট হিরোইন হিসেবে পুরস্কার পাবে না?

সাবিত্রী ঠোঁট ফুলিয়ে বললে : আমাকে বাচ্চা মেয়ে পেয়ে ভোলাচ্ছ নাকি? এই বয়েসে আর হিরোইন হওয়া যায়?

আমি বললাম : নিশ্চয় যায়। এখন ইন্ডাস্ট্রিতে কত শক্তিমান তরুণ পরিচালক সব এসেছে। তারা গ্ল্যামারযুক্ত নায়িকাকে তত পছন্দ করে না। তারা শক্তিমান অভিনেত্রী খোঁজে। গৌতম ঘোষ আছেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আছেন নব্যেন্দু চ্যাটার্জি আছেন। এঁদের মধ্যে কেউ না কেউ তোমাকে নায়িকা করে নিশ্চয় ছবি করবে। তোমার বয়েসের নায়িকাকে নিয়ে গল্প ভাববে। আর তুমি যেমন ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী, তাতে সে ছবির জন্যে তুমি বি এফ জে এ পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারো।

কথাটা শুনে সাবিত্রীর চোখ-মুখ ঝলমল করে উঠল। একটু চাপা গলায় বললে : তুমি বলছ আমাকে নায়িকা করে আবার ছবি হবে সেই আগেকার মতো।

আমি বললাম : নিশ্চয় হবে।

সাবিত্রী এরপর আর কোনও কথা বলল না। মাথাটা নিচু করে বসে রইল।

আমি বললাম : যাক, যে জন্যে এসেছি সেই কথাটা বলি। সামনের নয় আগস্ট বি এফ জে এ-র ফাংশান। এবারে তোমাকেই আসতেই হবে কিন্তু।

এই বলে সাবিত্রীর হাতে কার্ডটা ধরিয়ে দিলাম। সাবিত্রী খাম থেকে কার্ডটা বার করে পড়তে লাগল। হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠে বললে : এই সেরেছে।

আমি বললাম : কী হল?

সাবিত্রী বললে : ন' তারিখে যে আমার শুটিং আছে।

আমি বললাম : বেশ তো। শুটিং সেরেই আসবে। আমাদের তো ছ'টায় শুরু হচ্ছে। তুমি সাতটা নাগাদ এসো। মোট কথা, তোমাকে আসতেই হবে। আমরা তোমাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে স্টেজে তুলতে চাই।

সাবিত্রী বললে : শুটিং কি এখানে নাকি। আউটডোরে। পাল্লা রোডে। বর্ধমান না বীরভূম কোন্

জেলায় কে জানে।

আমি বললাম : বেশ তো। ডিরেক্টারকে বোলো বেলা দুটো নাগাদ তোমাকে ছেড়ে দিতে। তাহলে তুমি গাড়ি করে ফাংশনের টাইমের মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে যাবে।

সাবিত্রী বললে : ছিঃ রবিদা, তাই কখনও পারি! কত কষ্ট করে আজকাল বাংলা ছবি হচ্ছে জানো তো। একটা আউটডোরের কত খরচ! তার মধ্যে আমি কখনও বায়না ধরতে পারি যে আমাকে দুপুরবেলায় ছেড়ে দিতে হবে! না না, সে আমি পারব না। তবে তোমাদের ফাংশন তো রাত ন'টা পর্যন্ত চলবে। তার মধ্যে যদি কলকাতায় ফিরতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই একবার নন্দনে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

এই হল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। যেমন কর্তব্যনিষ্ঠ, তেমনি মুডি, আর তেমনি অভিমানী। সেই সঙ্গে মুখরাও বটে। ওই জন্যেই তো ভানুদা, মানে কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে 'কটকটি' বলে ডাকতেন।

হ্যাঁ, এই ভানুদার হাত ধরেই সাবিত্রীর অভিনয়ের জগতে প্রবেশ। সেটা সেই ১৯৫১ সালে। তবে সে সব কথা বলবার আগে ওর ঢাকা আর কুমিল্লার শৈশবের দিনগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা দরকার। কেমন করে একটা কিশোরী মেয়ের চোখের সামনে থেকে জীবনের রামধনু রঙটা মুছে গেল, সেটা জানা তো সর্বাগ্রে দরকার। সেই দুঃসহ জীবনবোধ থেকেই তো সাবিত্রীর অভিনেত্রী হয়ে ওঠা।

রক্তমাংসের সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে আমি প্রথম প্রত্যক্ষও করি ১৯৫২ সালে। তার আগে দেখেছি ছায়াছবির পর্দায়। 'পাশের বাড়ি' ছবিতে। সাবিত্রীকে নায়িকা করে ওটিই প্রথম ছবি। ওই ১৯৫২ সালেই মুক্তি পেয়েছিল শ্রী, প্রাচী এবং পূর্ণ সিনেমায়। ছবির পরিচালক ছিলেন সুধীর মুখার্জি। ওই ছবির নায়িকার চরিত্রটি পাবার পেছনে অনেক ঘটনা আছে। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে সাবিত্রীকে প্রথম চাক্ষুষ করার ব্যাপারটা বলে নিই।

উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স নামে একটি নাট্য সংগঠন ছিল। তার সদস্যরা অধিকাংশই ছিলেন অফিসকর্মী। বিশেষ করে ডাক এবং তার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। ওই ১৯৫২ সালে ওঁরা একটা নাটক করেছিলেন 'মনের অন্তরালে' নামে। এই দলের নাট্য পরিচালক যিনি ছিলেন তাঁর নাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কিন্তু আমাদের সিনেমা-থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় নন। এই অজিতবাবু পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী। নাটকটা ওঁর বাবার লেখা। তাঁর নাম ছিল, যতদূর মনে পড়ছে, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিংবা অন্য কোন নামও হতে পারে, ঠিক স্মরণে আসছে না।

এই ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্সের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন পঞ্চানন দত্ত। যিনি এখন শ্রীপঞ্চানন নামে সিনেমার প্রচার সচিব হিসেবে বিখ্যাত। পঞ্চানন ছিল ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্সের একজন সক্রিয় সদস্য। ক্লাবের স্যুভেনিরের জন্যে প্রচুর বিজ্ঞাপন জোগাড় করত। বড় বড় সাহেব কোম্পানি থেকে কী অদ্ভুত তৎপরতায় ওই বাংলা নাটকের স্যুভেনিরের জন্য বিজ্ঞাপন জোগাড় করে আনত। তখনও পর্যন্ত কলকাতার মার্চেন্ট হাউসগুলোতে বিলিতি সাহেবদেরই আধিপত্য ছিল।

আমার সঙ্গে পঞ্চাননের প্রথম আলাপ ওই নাটকের স্যুভেনির ছাপার সময়। আমি তখন শিবনারায়ণ দাস লেনে কল্পনা প্রেসে কম্পোজিটরি করি। ওই প্রেসেই পঞ্চাননদের স্যুভেনির ছাপা হয়েছিল। সেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। এবং তার বছরখানেকের মধ্যেই পঞ্চানন আমার ভগ্নিপতিত্বে অভিষিক্ত হল। তা নিয়েও অনেক ঘটনা। কিন্তু সেসব আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। সেটা আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

পঞ্চাননের সঙ্গে ওদের নাটকের বোর্ড রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিলাম শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। তখন শ্রীরঙ্গম থিয়েটার নাম পালটে বিশ্বরূপা হয়েছে কি? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এই নাটকের নায়িকাকে দেখে কেমন একটা চমক লাগল। মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগছে। একটা আড়ালে পঞ্চাননকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম : তোমাদের নাটকের নায়িকার নামটি কী হে?

পঞ্চানন অবাক হয়ে বললে : সে কী! তুমি সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে চিনতে পারলে না? 'পাশের বাড়ি' ছবির হিরোইন। সারা কলকাতায় ওকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। টক্ অব দ্য টাউন।

মাই গড! 'পাশের বাড়ি' রিলিজ করার পর সাবিত্রীকে নিয়ে সারা কলকাতা যে উত্তাল সেটা তো আমার অজানা নেই। ইতিমধ্যে দু বার দেখা হয়ে গেছে ছবিটা। কিন্তু সেই ছবির নায়িকা যে এমন একটা অকিঞ্চিৎকর অ্যামেচার ক্লাবের নাটকে অভিনয় করছে সেটা কেমন করে বুঝব!

পঞ্চাননের কথা শোনার পর সাবিত্রীর রিহার্সাল আরও মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। মেয়েটি তো দেখতে সাদামাটা। চেহারায় কেমন মালিন্যের ছাপ। পোশাক-পরিচ্ছদেও তেমন জৌলুস নেই। ফিল্মস্টারদের যেমন অতিরিক্ত ঠমক-ঠামক প্রদর্শনের চেষ্টা দেখা যায়, সেরকম কোন চেষ্টাই মেয়েটার মধ্যে নেই। কিন্তু রিহার্সাল দিচ্ছে খুব দাপটের সঙ্গে। স্বয়ং ডিরেক্টারকেও ধমক-ধামক দিতে ছাড়ছে না। রিহার্সালের প্রতিটি মুহূর্তেই সে সিরিয়াস। অ্যামেচার ক্লাবের ভাড়া করা অভিনেত্রীরা যেমন হা-হা হি-হি আর খোশগল্প করে সময় কাটায় তেমন কোন চেষ্টা চেষ্টা এই সাবিত্রী চ্যাটার্জির নেই। দেখে-শুনে বেশ ভালো লেগে গেল মেয়েটিকে।

কেবল যখন ওর সিনের রিহার্সাল থাকছে না তখন মাঝে মাঝে গিয়ে বসছিল একেবারে হলের পেছনের সারিতে বসে থাকা কয়েকটি যুবকের পাশে। কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে গল্প করে আসছিল। আমি ভেবেছিলাম ওরা বোধহয় সাবিত্রী চ্যাটার্জির বাড়ির লোক। তখনও পর্যন্ত আমি কোন সিনেমার হিরোইনকে চর্মচক্ষে দেখিনি। তাঁদের বাড়ির লোকজনদের তো নয়ই। তাই হিরোইনদের বাড়ির লোকজনকে দেখার একটা কৌতূহল ছিল। ওই কম বয়সে যা হয় আর কী!

পেছনের দিকে গিয়ে দেখলাম তিন-চারজন যুবক বসে আছে। তাঁদের মধ্যে একজন আমার মুখচেনা। তাঁর নাম নির্মল চক্রবর্তী। বিবেকানন্দ রোডের ওপর ওঁদের একটা প্রেস আছে। কালিকা প্রেস। বিখ্যাত কালিকা টাইপ ফাউন্ড্রি যাঁদের, তাঁদেরই প্রেস। ওই বাড়িতেই পরে উল্টোরথ পত্রিকার অফিস হয়েছিল। ছাপাখানার লাইনের লোক বলেই নির্মলবাবু আমার মুখচেনা। পরে ওঁকে দু-একটা ছবিতে অভিনয় করতে দেখেছি। 'মহিষাসুর বধ' না কী একটা ধর্মমূলক ছবিতে নির্মলবাবু দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

নির্মলবাবু দেখতে খুব সুপুরুষ। সাবিত্রী রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে নির্মলবাবুর পাশে গিয়েই বসছিল। নিচু গলায় কী সব আলোচনা করছিল। ওদের দুজনকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে বেশ ভালো লাগছিল। তখন তো বিশেষ জ্ঞানগম্যি হয়নি। দুজন তরুণ-তরুণীকে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখলে ভাবতাম ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে। সাবিত্রীও বামুনের মেয়ে আর নির্মলবাবুও বামুনের ছেলে। জাতের মিল যখন আছে তখন ওদের বিয়ে হতে বাধা কোথায়?

কথাটা ভেবে খুব ভালো লেগেছিল। আমার চেনাশোনা কোন মানুষের সঙ্গে সিনেমার নায়িকার বিয়ে হবে ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ বোধ করেছিলাম। তখন কি আর জানতাম যে দুটো পয়সা রোজগারের জন্য সাবিত্রীকে কী পরিমাণ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হচ্ছে। সিনেমার নায়িকা হবার পরও অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করতে হয়েছে ওই দুটো পয়সা রোজগারের জন্যেই। সেদিনও হয়তো তেমনি কোন কথাই হচ্ছিল নির্মল চক্রবর্তীর সঙ্গে। নির্মলবাবু তো শুনতাম মাঝে মাঝেই ছবি প্রোডিউস করার কথা ভাবতেন। নইলে এর পরে তো নির্মলবাবুর সঙ্গে সাবিত্রীর মেলামেশার কোন খবর আর শুনিনি। বিয়ে তো অনেক দূরে কথা! সেদিন কি আর জানতাম সাবিত্রী সারা জীবনে বিয়েই করবে না। পরবর্তীকালে তার অঢেল টাকা-পয়সা হয়েছে, প্রচুর নাম-যশ হয়েছে, নিউ আলিপুরে নিজের বাড়ি হয়েছে, কিন্তু 'নিজের ঘর' বলতে যা বোঝায় সেটা তো কোনকালেই হল না।

সাবিত্রীর সেই ঘর না বাঁধতে পারার দুঃখের কথায় পরে আসছি। তার আগে কী রকম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মাত্র দশ-বারো বছর বয়স থেকেই অর্থোপার্জনে নামতে হয়েছিল, সেই দুঃসহ দিনগুলির কথা বলি।

সাবিত্রীর জন্ম সম্ভবত ১৯৩৭ সালে। সম্ভবত কথাটা এই কারণে বললাম যে আমি কোনদিন সাবিত্রীকে মুখ ফুটে তার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে আমার রুচিতে

বাধে। যদি কেউ নিজে থেকে বলেন তবে সেটা আলাদা কথা। খুব ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই, আর পুরুষরা কত মাইনে পান সেটাও জিজ্ঞাসা করতে নেই। উনি কেন নিষেধ করেছিলেন আমি জানি না। কিন্তু বাবার ওই কথাটা আমি আজও মেনে চলি।

তবে সাবিত্রীর জন্মসালটা আমি আন্দাজে আন্দাজে বার করেছি। পরিচালক সুধীর মুখার্জির সহকারি বিনু বর্ধনের মুখে একবার শুনেছিলাম, সাবিত্রী যখন ওঁদের 'পাশের বাড়ি' ছবিতে অভিনয় করতে আসে তখন তার বয়েস মাত্র পনেরো বছর। অতটুকু মেয়ে ওইরকম একটি দাপুটে চরিত্রে অভিনয় করতে পারবে কি না তা নিয়ে সুধীরবাবুর মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জোর গলায় সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, ও নিশ্চয় পারবে। ভানুদার সার্টিফিকেট আর সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলে সুধীরবাবু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সাবিত্রী 'পাশের বাড়ি'-র হিরোইন হিসেবে চান্স পেয়েছিল ওই পনেরো বছর বয়সেই। সেটা ছিল ১৯৫২ সালের গোড়ার দিক। ওই হিসেব করেই আমি সাবিত্রীর জন্মসাল ১৯৩৭ ধরেছি। এটা সঠিক কি না তা সাবিত্রীই বলতে পারবে।

সাবিত্রীদের পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের একটি গ্রামে। কিন্তু ওর জন্ম হয়েছে কুমিল্লার হাজিগঞ্জে। ওর বাবা শশধর চ্যাটার্জি ছিলেন হাজিগঞ্জের স্টেশনমাস্টার। সেই রেলওয়ে কোয়ার্টার্সেই সাবিত্রীর জন্ম।

আমাদের দেশে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি হয়। কলকাতার নার্সিংহোমে এটা হয় না, কিন্তু দেশে-ঘরে এখনও এই প্রথাটা প্রচলিত আছে। বিশেষ করে আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এটা একটা অবশ্য প্রচলিত প্রথা ছিল। কিন্তু সাবিত্রীর জন্মের সময় উল্টো ব্যাপার ঘটেছিল। শঙ্খধ্বনির পরিবর্তে সারা পরিবারে শোনা গিয়েছিল ক্রন্দনের ধ্বনি।

এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণটা কী?

সাবিত্রী তার পিতামাতার দশম সন্তান। ওর মা ইচ্ছাময়ী দেবী এর আগে যে ন'টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তার সবগুলিই কন্যা। শেষ সন্তানের জন্মের পর দীর্ঘ সাতটি বছর আর তিনি গর্ভবতী হননি। এই সময়ে তিনি কত ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করেছেন একটি পুত্রসন্তানের জন্য। তাই দীর্ঘকাল পরে পুনরায় গর্ভবতী হতে সকলেই আশা করলেন, ঠাকুর যখন এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন এবারে নিশ্চয় পুত্রসন্তানই হবে।

কিন্তু আঁতুড়ঘরে শুয়ে শুয়ে ইচ্ছাময়ী দেবী যখন শুনলেন এবারেও তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তখন দুঃখে শোকে জ্ঞান হারালেন। সেই জ্ঞান ফিরতে পুরো তিনটি দিন সময় লেগেছিল।

স্বভাবতই সকলের ধারণা হতে পারে যে কন্যাসন্তান হয়ে জন্মানোর অপরাধে সাবিত্রী নিশ্চয় সকলের কাছে অবহেলিত ছিল। কিন্তু না। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। ওর অন্য সব দিদিদের চেয়ে বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে বাবা-মায়ের কাছে। সে যখন যা করতে চেয়েছে তাতে কেউ বাদ সাধেনি। ফলে সেই ছোটবেলা থেকেই সাবিত্রী মনে মনে স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে।

এই যে তার জন্মলগ্নে এত কান্নাকাটি এ ব্যাপারে সাবিত্রীর প্রতিক্রিয়া কী? সাবিত্রী বললে : একটু জ্ঞান হবার পর আমার জন্মলগ্নের কান্নাকাটির ঘটনাটা যখন শুনলাম তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সমাজের এ কী অন্যায়! বাবা-মায়ের মৃত্যুর সময় মেয়ে কেন তাঁদের মুখে জল দিতে পারবে না? মেয়েদের দেওয়া পিণ্ডে কেন পিতৃপুরুষ উদ্ধার পাবে না? এমন শাস্ত্র কারা তৈরি করেছে? যারা এই শাস্ত্র তৈরি করেছে তারা কি মেয়েদের পেট থেকে জন্মায়নি? মায়ের পেট থেকে জন্মে সেই মায়ের জাতকে অপমান করার অধিকার কোথা থেকে পেল?

একটু থেমে সাবিত্রী আবার বললে : সেই ছোটবেলা থেকেই আমার মনে এইসব প্রশ্ন আসত। ভেবে ভেবে কূলকিনারা পেতাম না। বড় হয়ে তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বাবা-মায়ের মনের এই পুত্রহীনতার ক্ষোভ আমি মিটিয়ে দেব। একটি ছেলে থাকলে সে যা যা করত, আমি তার থেকে বেশি কিছু করে সবাইকে দেখিয়ে দেব, মেয়েরাও এ সংসারে ফ্যালনা নয়। আমি পিণ্ড দিয়ে তাঁদের 'পুত'

নামক নরক থেকে হয়তো উদ্ধার করতে পারব না, কিন্তু সংসারের দুঃখের নরক থেকে তাঁদের উদ্ধার করবই করব।

সেটা সাবিত্রী করেছে। অনেক বেশি পরিমাণেই করেছে। বাবা-মায়ের সব দুঃখ ঘুচিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। শেষ জীবনে তাই তো শশধরবাবু প্রায়ই বলতেন : সাবি আমার মেয়ে নয়, ও আমার ছেলে। ও যা করেছে তা একটা ছেলে থাকলেও করত কি না সন্দেহ।

বাবা অবশ্য অন্য মেয়েদের বিয়ে-থা নিজেই দিয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই ভালো ঘর-বরে পড়েছে। কিন্তু সাবিত্রী তার কর্তব্য করতে গিয়ে নিজের জীবনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার তুলনা হয় না। ঘর বাঁধবার কত সুযোগ তো তার সামনে এসেছিল। কত ছেলে তাকে বিয়ে করে মাথায় করে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু সাবিত্রী তাদের কারও ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। কর্তব্যের তাগিদে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ সে বিসর্জন দিয়েছে। কারণ হিসেবে সাবিত্রী বলেছে : বিয়ে করার পর বাবা-মায়ের প্রতি যত কর্তব্যই করি না কেন, একটা সময়ে তাতে ভাঁটা পড়তই। নিজের সংসারে হয়তো তাই নিয়ে কোন না কোনদিন গণ্ডগোল, ভুল-বোঝাবুঝি, মান-অভিমান ঘটতই। তার চেয়ে এই তো ভালো। বেশ ঝাড়া হাত-পা। কারও মতামতের তোয়াক্কা করবার দরকার নেই। ঘর বাঁধার সুখের চেয়ে এ যে আমার জীবনে অনেক বড় সুখ রবিদা।

• সাবিত্রীর এই মহান আত্মত্যাগের তুলনা হয় না। আমার চোখে সাবিত্রী কেবল একজন বড় অভিনেত্রীই নয়, ও একজন মহিয়সী মহিলা।

সাবিত্রীর কাছে শৈশবেব স্মৃতি বড় সুখের। বড়ই মধুর। বিক্রমপুরে কনকসার গ্রামের এজমালি পৈতৃক বাড়ির চেয়েও বেশি করে মনে আছে কমলাপুরে বিরাট জমির ওপর বাবা যে আলাদা করে বাড়ি করেছিলেন, সেই বাড়িটার কথা। বাড়ির সামনে কী চমৎকার বাগান, তাতে নানা রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে থাকত। উঠোনের দক্ষিণ দিকে একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছ। ফুল ফোটবার সময় তার নিচেটা ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত। কচি কচি হাতে সেইসব ফুল কুড়িয়ে হাতের মুঠোয় রেখে বার বার শোঁকা। কলকাতার দুঃসহ জীবনধারার মাঝখানে পড়ে সে সব অনুভূতি হারিয়ে গেছে। বাড়ির পেছনে কত বড় ফলের বাগান ছিল। আম জাম কাঁঠাল লিচু—ভিন্ন ভিন্ন সিজ্‌নের ভিন্ন ভিন্ন ফল—কী অপূর্ব তার স্বাদ। পার্টিশানের এক ধাক্কায় তার সব কিছুই ফেলে চলে আসতে হল সাবিত্রীর বাবাকে। এক মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করলেন। ওই বিরাট চকমেলানো বাড়ির বদলে পেলেন টালিগঞ্জের সামান্যতম জমির ওপর খুপরি দুখানা ঘর।

সাবিত্রী বললে : অবস্থার বিপাকে পড়ে বাবাকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল, কিন্তু দেশের বাড়ির স্মৃতি তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেননি। হবেই তো! নিজের উদয়াস্ত পরিশ্রমের টাকায় তৈরি করা বাড়ি, তাকে ঘিরে কত স্বপ্ন! দশ মেয়ে বিয়ে-থার পর তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে আসবে, হৈ হৈ করে দিন কাটাবে বুড়ো-বুড়ির কাছে। কয়েকটা দিনের জন্যে স্বর্গ মাটিতে নেমে আসবে সেইসব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যে বাবার! একদিন যে মানুষটা ছিলেন দুর্বার, অকুতোভয়, সর্বদা হৈ চৈ করে জীবন কাটাতে ভালোবাসতেন, কলকাতায় এসে সেই মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেলেন। ওঁর শেষের দিকের জীবনে হয়তো অর্থের প্রাচুর্য আমি এনে দিতে পেরেছি, কিন্তু তাঁর সেই পুরনো জীবনটাকে তো ফিরিয়ে দিতে পারিনি। সেটা দেবার ক্ষমতাও তো আমার ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আক্ষেপটা থেকেই গেছে।

অনেকের ধারণা দাঙ্গা আর দেশবিভাগের কারণে সাবিত্রীরা রেফ্যুজি হয়ে উদ্বাস্তুদের পায়ে পা মিলিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতা এসেছিলেন। এটা একেবারে ভুল কথা। ওরা নিঃস্ব হয়ে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল ঠিকই, তবে রেফ্যুজি হয়ে নয়। কোন রেফ্যুজি ক্যাম্পেও ওদের জীবন কাটাতে হয়নি। সাবিত্রীর বাবা কলকাতায় এসে টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠেছিলেন সম্পত্তি বিনিময়ের সূত্রেই।

সাবিত্রীদের টালিগঞ্জের সেই বাড়িতে আমি গেছি ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে। আমি তখন রূপাঞ্জলি পত্রিকায় কাজে ঢুকে পড়েছি। শিল্পীদের সবাইকে নিয়ে আমরা সরস্বতী পুজো করতাম। সেই উপলক্ষে খুঁজে খুঁজে সাবিত্রীর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। আমাদের এই পুজো হত বালিগঞ্জের

ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের কাছে একটা বাগানওলা বাড়িতে। সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান হত। খরচের টাকার সিংহভাগটাই বহন করা হত রূপাঞ্জলি পত্রিকার পক্ষ থেকে। বাকি টাকাটা সংগ্রহ করা হত শিল্পীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। সাবিত্রীর কাছেও গিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্যেই।

সাধারণত ফিল্মস্টারদের ঘরদোর একটু চাকচিক্যময় হয়। কিন্তু সাবিত্রীদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম একেবারে উল্টো। অনেকগুলো মানুষ কোনরকমে মাথা গুঁজে পড়ে আছে একটি বাড়িতে। বাইরের লোক এলে বসাবার একটু ভালো ব্যবস্থাও নেই। বাড়ির মানুষগুলিরও কী মলিন মলিন চেহারা। আমি সাবিত্রীর খোঁজ করতে বোধহয় ওর কোন এক দিদি, তাঁর মুখেও খানিকটা সাবিত্রীর আদল, একটু উঁচু গলায়, 'এই সাবি, তাকে কে ডাকছে দ্যাখ' বলে ভেতরে চলে গেলেন আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে।

একটু পরে সাবিত্রী বেরিয়ে এল। চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ। বোধহয় রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি। ওকে ওই অবস্থায় দেখে আমি আর লজ্জায় চাঁদার কথাটা বলতে পারলাম না। কেবল পুজোর আমন্ত্রণপত্রটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওকে আসবার জন্যে অনুরোধ করলাম। অন্তত সন্ধের দিকে বিচিত্রানুষ্ঠানে।

কার্ডটা হাতে নিয়ে সাবিত্রী একটু হাসল। হাসিটাও ক্লান্তি মাখানো। বললে : খুব চেষ্টা করব যাবার। কোন কারণে যদি যেতে না পারি তাহলে কিছু মনে করবেন না।

এই বলে সাবিত্রী ভেতরে চলে গেল। একটু বসতেও বলল না। চা-টা অফার করা তো দূরের কথা।

না, সেদিন সাবিত্রীর ওই ব্যবহারে কোন দুঃখ পাইনি। আমিও তো তখন দুঃখের সঙ্গে সংগ্রামরত একটি মানুষ। বরং সাবিত্রীদের সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তাই অনুভব করেছিলাম।

দারিদ্র্য মানুষকে কত সহজ করে দেয় দেখুন।

থাক সেসব কথা। আবার সাবিত্রীর জীবনের সেই প্রথম দিনগুলির কথায় ফিরে আসি।

সাবিত্রী কিন্তু ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসেনি। এসেছে তার অনেক আগেই। একেবারে একা। এবং সেই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তার উত্তর থেকে দক্ষিণ পুরো কলকাতাটাই পরিক্রমা করা হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ভারি মজার ঘটনা।

চরম দুরবস্থার মধ্যেও সাবিত্রী তার কিশোরী বয়সে খুব মনোযোগ দিয়ে নাচটা শিখেছিল। না, আধুনিক কিংবা রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে হাত-ঘোরানো নাচ নয়। রীতিমত শাস্ত্রীয় নৃত্য। আর সে নাচ শেখাটা আবার যার-তার কাছে নয়। ভরতনাট্যমের ভারতবিখ্যাত নৃত্যগুরু মারুথাপ্পা পিল্লাইয়ের কাছে। শুনেছি বৈজয়ন্তীমালাও নাকি এই গুরুর কাছেই নাচ শিখেছিলেন।

গুরুর কাছে নাচের তালিম নেবার সময় সাবিত্রীর চোখের সামনে একটা রঙিন স্বপ্ন ভেসে বেড়াত। কালক্রমে সে একজন ভারতবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী হবে। কাগজে কাগজে তার ছবি বেরোবে। সমালোচকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তার নাচ দেখে উচ্ছ্বসিত করতালিতে তাকে অভিনন্দিত করবে। না, নাচের পশরা সাজিয়ে বিদেশে যাবার কল্পনা সে করেনি। সেই পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ক'জনের ভাগ্যেই বা বিদেশে যাবার সুযোগ ঘটত! এক উদয়শঙ্কর ছাড়া!

কিন্তু এই নাচকে কেন্দ্র করে সাবিত্রীর জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে লজ্জায় ঘেন্নায় আর রাগে সে সারা জীবনের মতো নাচকে বর্জন করল। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে সে উপলব্ধি করল, এই নিষ্ঠুর সমাজে তার মতো কপর্দকহীন মানুষের কাছে নৃত্যশিল্পকে মাধ্যম করে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া যাবে না। সাবিত্রীর জীবনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথায় পরে আসছি। তার আগে সাবিত্রীর কলকাতায় প্রথম আসার ব্যাপারটা একটু ছোট করে বলে নিই।

সাবিত্রী কলকাতায় এসেছিল দেশ ভাগের বেশ কিছুকাল আগে। তখনও একেবারেই বালিকা। আর এসেছিল একেবারে একা। একা বলতে সেই অর্থে একা নয়। এসেছিল এক প্রতিবেশী পরিবারের সঙ্গে। বাবা-মা কিংবা দিদিরা কেউ সঙ্গে আসেনি।

কলকাতা ছিল সাবিত্রীর কাছে কানে-শোনা এক স্বপ্নের জগৎ। ওদের ওই গ্রামের বাড়িতে কালেভদ্রে কেউ যখন কলকাতা থেকে আসত, তখন তাদের কাছে কলকাতার গল্প উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনত সাবিত্রী।

মনে মনে ভাবত, তার জীবনে কি এমন সুদিন কোনকালে আসবে যাতে সে কলকাতার রাস্তায়, তার সেই স্বপ্নের সাম্রাজ্যে হেঁটে-চলে বেড়াতে পারবে?

হঠাৎ সেদিন যখন শুনল তাদের প্রতিবেশীরা সন্তানের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন, তখন সাবিত্রী বায়না ধরে বসল, ওদের সঙ্গে সেও কলকাতা যাবে। তার স্বপ্নপুরীতে বিচরণের এই সুযোগ সে হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

সাবিত্রীর বায়না শুনে ওর বাবা শশধরবাবু পড়ে গেলেন মহা মুশকিলে। এই এতটুকু মেয়ে কলকাতায় যাবে কি! কলকাতার বিশাল জনারণ্যে একবার হারিয়ে গেলে ওকে কী আর খুঁজে পাওয়া যাবে! উনি চেষ্টা করলেন সাবিত্রীকে নিরস্ত করতে।

কিন্তু সাবিত্রী নিষেধ শোনবার মেয়ে নাকি! সেই ছোটবেলায় ও যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। এক আকাশের চাঁদ ছাড়া সাবিত্রীর আর সব আবদারই বাবা-মাকে মেটাতে হয়েছে। এবারেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। প্রতিবেশী পরিবারের সঙ্গে সাবিত্রীকে কলকাতা যাবার অনুমতি দিতে হল। ঠিক হল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তার দুই দিদির যে কোন একজনের শ্বশুরবাড়িতে সাবিত্রীকে পৌঁছে দিলেই চলবে। তারপর আর প্রতিবেশীদের কোনও দায়িত্ব নেই। এটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অতএব প্রতিবেশীরা রাজি হয়ে গেলেন।

একখানা টিনের সুটকেশে কিছু জামাকাপড় আর বাবার দেওয়া টাকা-পয়সার সঙ্গে নিজের জমানো পয়সা নিয়ে কলকাতা রওনা হল সাবিত্রী। গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটে প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে সেই সুটকেশ গেল হারিয়ে। সুটকেসের মধ্যে ছিল কলকাতার দিদিদের ঠিকানা। শেয়ালদা স্টেশনে এসে অনেক মনে করে করে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে এক দিদির আবছা একটা ঠিকানা মনে পড়লো। প্রতিবেশীরা খুঁজে খুঁজে সাবিত্রীকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন। মুশকিল হল অন্য কারণে। দিদি-জামাইবাবু তখন কলকাতায় নেই। শিলিগুড়িতে তাঁদের ছেলের কাছে গেছেন। কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। বরানগরে আর এক দিদি থাকেন। তাঁর শ্বশুর বরানগর থানার ও সি। একটা রাত কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে কাটিয়ে পরদিন বরানগরে পৌঁছে দেওয়া হল সাবিত্রীকে। সেখানেও বেশিদিন থাকা হয়নি। দিন দশেকের মধ্যেই দিদির শ্বশুর ট্রান্সফার হয়ে গেলেন জয়নগরে। তার কয়েক মাস পরে তিনি আবার ট্রান্সফার নিয়ে চলে এলেন টালিগঞ্জ থানার ও সি হয়ে। সেদিন কে জানত এই টালিগঞ্জই হবে সাবিত্রী চ্যাটার্জি নামক এক কিশোরীর বাকি জীবনের কর্মভূমি।

কলকাতায় আসার পর প্রথম দু-এক মাস বাবার চিঠি আসত, 'তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়া আইস'। পরে তিনিই চিঠি লিখে জানালেন, 'এখন আসিবার দরকার নাই। দেশে প্রচণ্ড দাঙ্গা চলিতেছে। আমরাও চেষ্টা করিতেছি কলিকাতায় চলিয়া যাইবার'।

চিঠি পেয়ে সাবিত্রীর ফুর্তি দেখে কে! স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকা হবে, এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর আছে নাকি। সাবিত্রীকে পড়াশোনা করার জন্যে কালীঘাটের ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করে দেওয়া হল। ভর্তি করে দেওয়া হল নাচের স্কুলে। সেটা ছিল সাবিত্রীর সাম্প্রতিকতম আবদার।

কয়েক মাস পরেই সাবিত্রীর সোনাদির শ্বশুর বদলি হয়ে গেলেন দূর মফস্বলের এক থানায়। টালিগঞ্জের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল। সোনাদিরা উঠে গেলেন ভবানীপুরের স্কুল রো-তে একটি ভাড়া বাড়িতে। তার কিছুদিনের মধ্যে সাবিত্রীদের পুরো ফ্যামিলি চলে আসতে বাধ্য হলেন কলকাতায়। সোনাদির ওই একচিলতে ভাড়া বাড়িতে এতগুলি মানুষকে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হল। টালিগঞ্জের বিনিময় করা বাড়ির পজেশন্ পাওয়া গেল আরও বেশ কিছুকাল পরে। সে যে কী দুঃসহ অবস্থা!

এই যে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে টানাপোড়েন, তার মধ্যেই সাবিত্রীর মনোজগতে আরও কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে গেছে। দুঃখের পৃথিবীর আসল চেহারাটা ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন কোনও একটা ব্যাপারে বায়না করবার আগে ও অন্তত দশবার চিন্তা করে।

এই দুঃসহ অবস্থাটা যখন মনের মধ্যে ভয়ানক ভাবে চেপে বসত তখন তো থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার আশায় সাবিত্রী সিনেমা দেখতে বেরিয়ে পড়তো। টিকিটের পয়সার সংস্থান হতো স্কুলে যাবার ট্রাম-বাস ভাড়া বাঁচিয়ে। চোখের সামনে দুঃখের যে ভয়াবহ চেহারা, তার থেকে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে

সাময়িক মুক্তি খুঁজে নিত সে।

ঢাকায় থাকতে প্রচুর সিনেমা দেখত সাবিত্রী। কানন দেবী ছিল তার প্রিয় নায়িকা। ছবি দেখে বাড়ি ফেরার পর কানন দেবীর অনুকরণে সে ঘুরত ফিরত, কথা বলত, গান গাইত। কানন দেবী ছিল তার কাছে স্বপনপুরীর রাজকন্যার মতো।

এই যে অনুকরণ প্রবৃত্তি, এটা সাবিত্রীর ছোটবেলা থেকেই ছিল। কলকাতাতেও সে তাই করত। একবার রাজ কাপুর-নার্গিসের 'বরষাত' ছবি দেখে এসে গোটা ছবিটাই কপি করে বাড়ির লোককে শুনিয়েছিল সে। পুরুষ-মহিলা সব ক'টি চরিত্র। বাড়ির সবাই মজা পেয়েছিল তার এই বিচিত্র অভিনয় দেখে। সেই অতটুকু বয়সেই সাবিত্রী বুঝতে পেরেছিল দুঃখকে যত বেশি ভয় করা যাবে সে ততই মাথার ওপর চেপে বসবে। দুঃখকে জয় করার যদি অন্য কোনও রাস্তা চোখের সামনে খোলা না থাকে তবে হাসি গান আর আনন্দ দিয়ে দুঃখকে পাল্টা ভয় দেখাতে হবে।

ওর সেই ছোটবেলার এই অনুভূতিটাকে সাবিত্রী সারা জীবন কাজে লাগিয়েছে। দুঃখের ভারে কখনোই ও মুষড়ে পড়েনি। দুঃখকে জয় করেছে আনন্দ দিয়ে। চরম দুঃখের মুহূর্তেও সাবিত্রীর মতো অমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে আমি আর কাউকে দেখিনি। যে মুহূর্তে ওর ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠার কথা, সেই মুহূর্তে ওর গলা দিয়ে গান বেরিয়ে এসেছে! এই মানসিকতার তুলনা হয়?

দুঃখের সঙ্গে এইভাবে লড়াই করতে গিয়ে সাবিত্রী একদিন অনুভব করল, ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। পেটে খিদে থাকলে মুখ দিয়ে হাসি বেরোয় না। গলা দিয়ে গান বেরোয় না। তাই সবার আগে দরকার টাকা। যে টাকা দিয়ে চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, নুন-তেল কেনা যায়।

সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম : সেইজন্যেই কী টাকা রোজগারের জন্যে সিনেমায় অভিনয় করার মনস্থ করেছিলে তুমি?

সাবিত্রী বললে : না না, একদম না। সিনেমায় কেমন করে নামা যায় তাই আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল বিরাট বড়লোক না হলে সিনেমায় নামা যায় না। কত বড়লোক হতে হবে তা কানন দেবীকে দেখে বুঝেছিলাম।

আমি বললাম : কানন দেবীর সঙ্গে তোমার ছোটবেলা থেকেই আলাপ ছিল নাকি?

সাবিত্রী বললে : না। তবে কানন দেবীকে আমি একবার দেখেছিলাম ছোটবেলায়। উনি নিজে ডেকে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমাকে আদর করেছিলেন। চকোলেট খেতে দিয়েছিলেন।

আমি বললাম : কী রকম?

সাবিত্রী বললে : তখন আমি সোনাদির কাছে টালিগঞ্জ থানার কোয়ার্টার্সে থাকি। একদিন থানার কনস্টেবলদের উত্তেজিত হয়ে বলাবলি করতে শুনলাম, কানন দেবী এসেছেন। কানন দেবী এসেছেন। শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম কানন দেবীকে দেখতে। উনি বোধহয় কোনও দরকারে আমার দিদির শ্বশুরের কাছে এসেছিলেন। তিনি তো ও-সি ছিলেন টালিগঞ্জ থানার। তাঁর ঘর থেকে বেরোতেই কানন দেবীর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কী অপূর্ব দেখতে। ঠিক যেন রাজরানির মতো। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে কানন দেবী একটু থমকে দাঁড়ালেন। একটু হাসলেন। ওঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও খুব সুন্দর দেখতে। তাঁর দিকে ফিরে কানন দেবী বললেন : কী সুন্দর চোখ দুটো দেখ মেয়েটির! ওঁর কথায় সেই ভদ্রলোকও আমার দিকে তাকালেন। বললেন : হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর!

আমি বললাম : শুনে তুমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলে নিশ্চয়?

সাবিত্রী একটু হেসে বললে : আটখানা কী বলছো রবিদা! আমি তখন আহ্লাদে ষোলোখানা। সেই শিশুকাল থেকে ওঁকে সিনেমার পর্দায় দেখছি। আর আজ তো একেবারে চোখের সামনে জলজ্যান্ত কানন দেবী! আমার বুকের ভেতর তখন কেমন যেন করছে!

আমি বললাম : তারপর?

সাবিত্রী বললে : উনি আমাকে হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন। কাছে যেতে মাথায় হাত বুলিয়ে আমার নাম জিজ্ঞা করলেন। নাম বলব কী তখন আমার কথা জড়িয়ে আসছে। কোনরকমে নিজের নামটা

বললাম। শোনার পর উনি আমার থুতনি ধরে একবার আদর করলেন। তারপর হাতের ব্যাগ খুলে একটা চকোলেট আমার হাতে দিলেন। একটু হেসে চলে গেলেন একটা বড় গাড়িতে করে।

একটু দম নিয়ে সাবিত্রী বললে : জানো রবিদা, সেই চকোলেটটা আমি দু-তিনদিন খেতে পারিনি। হাতে নিয়ে ঘুরতাম। মাঝে মাঝে গন্ধ শুঁকতাম। মনে হত ওঁর হাতের ছোঁয়া চকোলেটটায় লেগে আছে। খেয়ে ফেললেই ছোঁয়াটা হারিয়ে যাবে।

আমি বললাম : তারপর?

সাবিত্রী বললে : তিনদিন পরে দেখলাম চকোলেটটা আপনি গলে গিয়ে রাংতামোড়া কাগজটায় জড়িয়ে গেছে। কানন দেবীর স্মৃতিচিহ্নের ওই দুর্দশা দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

আমি বললাম : পরে যখন ছবির নায়িকা হলে তখন কানন দেবীর কাছে এই ব্যাপারটা গল্প করনি?

সাবিত্রী বললে : করেছিলাম তো! কিন্তু কাননদির সে সব কথা কিছুই মনে নেই। একদম মনে করতে পারলেন না।

আমি বললাম : কাননদি এই যে সেদিনের কথা মনে করতে পারলেন না, তার জন্যে তোমার দুঃখ হয়নি?

সাবিত্রী বললে : একদম না। কারণ আমিও তো ততদিনে পাকাপোক্ত অভিনেত্রী হয়ে গেছি। কত জায়গায় কত নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। কথাবার্তাও হয়। তার সব কথা কী মনে রাখা যায়?

সাবিত্রী একটু থেমে আবার বললে : তাছাড়া টালিগঞ্জ থানার সেদিনের সেই ঘটনার অনুভূতিটা তো আমার নিজস্ব ব্যাপার। তার সঙ্গে তো কাননদির কোনও যোগাযোগ নেই। সুতরাং ওঁর মনে থাকবার কথাও নয়। আমার সেই অনুভূতিটাকে আমি সাত রাজার ধন একটি মানিকের মতো স্মৃতির কোটরে তুলে রেখেছি। তার জন্যে কাননদির ওপর রাগ, দুঃখ কি অভিমান করার তো কোনও কারণ নেই।

সাবিত্রী সংসারের দুঃখ মোচনের জন্য টাকা রোজগার করতে বেরিয়ে পড়েছিল মাত্র বারো-তেরো বছর বয়সেই। কারও নিষেধ শোনেনি। আর এটা সে করবার প্রেরণা পেয়েছিল বাবার সংগ্রামী মূর্তি দেখে।

সাবিত্রীর বাবা শশধরবাবুর, যিনি একদিন রেলের স্টেশন মাস্টার ছিলেন, দু' হাতে রোজগার করতেন আর চার হাতে খরচ করতেন, দেশে যাঁদের চকমেলানো বাড়ি, সে বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে বারো মাসে তেরো পার্বণ, সেই মানুষটি যেদিন জগুবাবুর বাজারের পাশে ছোট্ট একটা পান-বিড়ি-সোডা-লেমোনেডের দোকান দিলেন, তখন সাবিত্রী শিউরে উঠেছিল। বাড়ি থেকে সবাই আপত্তি করেছিল এই ধরনের ব্যবসা করায়। কিন্তু বাবা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন : প্রেস্টিজ! প্রেস্টিজ নিয়ে ধুয়ে খাব নাকি! চোখের সামনে মেয়েগুলো খিদের জ্বালায় ছটফট করবে আর আমি প্রেস্টিজের কথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো। তাছাড়া আমি তো চুরিও করছি না, ডাকাতিও করছি না। কোনরকম উঞ্ছবৃত্তিও করছি না। নিজের পরিশ্রমে রোজগার করবো। কাজের আবার ছোট-বড় আছে নাকি!

বাবার কথাটা সাবিত্রীর মনে খুব দোলা দিয়েছিল। সেদিন থেকেই তক্কে তক্কে ছিল, তাকেও সম্মান বাঁচিয়ে কিছু না কিছু রোজগার করে বাবার হাতে তুলে দিতে হবে। সংসারের জন্যে একটা মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে, আর বাকি সকলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে, এ বড় অন্যায়।

শশধরবাবুর সেই জগুবাবুর বাজারের দোকান কয়েক মাস পরেই উঠে গেল। শুধু পরিশ্রম করলেই ব্যবসা দাঁড়ায় না। ব্যবসা চালাবার অন্ধিসন্ধি জানা দরকার। ভূতপূর্ব স্টেশন মাস্টারের সেটা জানা ছিল না। তিনি সরল মনে মানুষকে বিশ্বাস করেছেন। তাদেরকে ধারে জিনিস দিয়েছেন। এবং অধিকাংশ মানুষই আর উপুড়হস্ত করেনি। ফলে দোকানটা একদিন উঠেই গেল। সংসারের সামনে অন্ধকার ছিলই। এখন সেটা গাঢ়তর হল।

সাবিত্রী কার কাছে যেন শুনেছিল, টালিগঞ্জে স্টুডিওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে নাকি ভিড়ের দৃশ্যে অভিনয় করবার জন্যে লোক নেয়। দশ টাকা করে পাওয়া যায়। সাবিত্রী দু-তিন দিন সময় নিয়েছিল ভাবতে। তারপর একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে এক্সট্রাদের সঙ্গে লাইন দিয়ে

দাঁড়ালো।

সাবিত্রীর সেদিন ভাগ্যটা ভালো ছিল। কী যেন একটা ছবিতে নাচের দৃশ্য আছে। তাতে সখি সাজার জন্যে মেয়ে দরকার। একজন রোগামতন লোক এসে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : তোমাদের মধ্যে যারা নাচ জানো তারা সামনের দিকে এগিয়ে এসো।

আরও দু-চারটি মেয়ের সঙ্গে সাবিত্রীও এগিয়ে এল। লোকটি তাকে দেখে বললে : এই খুকি, তুমি এখানে কী করতে এসেছো। যাও, বাড়ি যাও। এখানে সিনেমার জন্যে লোক নেওয়া হচ্ছে।

সাবিত্রী বললে : আমিও তো সিনেমা করতে চাই।

লোকটি খেঁকিয়ে উঠল। বললে : সিনেমা করতে চাই বললেই সিনেমা করা যায় নাকি? তুমি নাচ জানো?

সাবিত্রী বললে : আমি ভরতনাট্যম জানি।

লোকটি বললে : ওসব নাট্যম-ফাট্যম এখানে চলবে না। এটা কী থিয়েটার নাকি! এখানে নাচের সিনের জন্যে লোক নেওয়া হচ্ছে।

সাবিত্রী বললে : ভরতনাট্যমও তো নাচই।

লোকটি এবার একটু থতমত খেয়ে গেল। বললে : তাই নাকি! তাহলে তুমি এদিকে এসোত।

সেদিন সারাদিন উপবাসী থেকে সখির দলে ভিড় বাড়িয়ে যে নাচ নাচতে হল, তার জন্যে নৃত্যগুরু মারুথাপ্পা পিল্লাইয়ের কাছে নাচ শেখার দরকার ছিল না। সন্ধেবেলা দশটি টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া মাত্র রোগামতন লোকটি এসে তার হাত থেকে দশ টাকার নোটটা কেড়ে নিয়ে একটি পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দিলে। সাবিত্রী চিৎকার করে উঠল : আপনি আমার পাঁচটা টাকা নিয়ে নিলেন কেন?

লোকটি বললে : ওটা আমার দস্তুরি। ওটা না দিলে কাজ পাওয়া যায় না।

রাগে সাবিত্রীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে উঠেছিল। ভেবেছিল ওই পাঁচটা টাকাও দলা পাকিয়ে লোকটার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে আসে। তারপরই মনে হয়েছিল, ওই পাঁচটা টাকার দামও তার কাছে আজ অনেক। ওই টাকা দিয়ে চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, তেল-নুন কেনা যায়। আধপেটা খেয়েও একটা বেলা বেঁচে থাকা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : পরে যখন হিরোইন হলে আর ওই লোকটার দেখা পাওনি?

সাবিত্রী বললে : কেন পাব না। তখন ওই লোকটাই আমাকে 'দিদি দিদি' বলে কত খাতির করত। পান থেকে চুনটি খসতে দিত না।

আমি বললাম : তুমি তখন কোন প্রতিশোধ নাওনি?

সাবিত্রী বললে : ছিঃ! তাই কখনো নিতে পারি রবিদা। দিদি হবার পর কি আর ছোট ভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়?

অবশেষে সাবিত্রী চ্যাটার্জির জন্মের সঠিক সালটির হদিশ পাওয়া গেল। সেদিন সকালে সাবিত্রী নিজেই টেলিফোন করে জানাল : রবিদা, তোমার হিসেবে একটু গোলমাল থেকে গেছে।

সাবিত্রীর গলাটা কেমন ধরা-ধরা। টেলিফানের ওপ্রান্ত থেকে একটু যেন কাশির আওয়াজও শুনতে পেলাম। বললাম : কী ব্যাপার! তোমার কি শরীর খারাপ নাকি সাবু?

সাবিত্রী বললে : হ্যাঁ রবিদা। দিন দুই হল ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে। কাশিটাও বেড়েছে।

আমি বললাম : নিশ্চয় তুমি বাইরে কোথাও শো করতে গিয়েছিলে! সেখানেই ঠাণ্ডা লাগিয়েছ!

সাবিত্রী বললে : ঠিকই ধরেছ রবিদা। দিন চারেক আগে কলকাতার বাইরে একটা কল্-শো ছিল। মনে হয় সেখানেই ঠাণ্ডা লেগেছে।

আমি বললাম : ওইসব শো-টোগুলো এখন ছাড়ো তো দেখি। নিজের শরীরটা আগে না অভিনয় আগে!

সাবিত্রী বলল : তুমি বলছ কী রবিদা! অভিনয় ছেড়ে ঘরে বসে থাকলে আমি বাঁচব?

আমি বললাম : না না, অভিনয় ছাড়তে বলছে কে তোমাকে! তোমার মতো শিল্পীরা এখনও অভিনয়

করছে বলেই তো বাংলা নাটকগুলো এখনও বসে দেখা যায়। নইলে অভিনয়ের নামে আজকাল যা সব চলছে চারদিকে। আমি বলছি সেই সঙ্গে শরীরটার কথাও তো মনে রাখতে হবে। ভালো করে-ডাক্তার দেখাচ্ছ তো?

সাবিত্রী বললে : আমার তো অ্যান্টিবায়োটিক চলে না। কবিরাজি করাচ্ছি। তাতে ভালো ফলও পাচ্ছি।

আমি বললাম : ওটা খুব ভালো। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মতো ভালো জিনিস আর হয় না, যদি ভালো কবিরাজ হাতে থাকে। তা একটু আগে হিসেবের কথা কী বলছিলে যেন?

সাবিত্রী বললে : তুমি আমার বয়েসের হিসেবটা ঠিক ঠিক লেখোনি।

সাবিত্রীর কথা শুনে টেলিফোনের এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে কেঁপে উঠলাম। এই রে! মেয়েদের একবারে স্পর্শকাতর জায়গাটায় হাত দিয়ে ফেলেছি! এমনিতে আমি মেয়েদের বয়েসের ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভয় পাই। তার ওপর এ আবার সাবিত্রী চ্যাটার্জির মতো মুডি অভিনেত্রী। অবিলম্বে একটি বিস্ফোরণ ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।

অতএব আত্মরক্ষার জন্যে প্রসঙ্গটা একটু হালকা করে দেওয়া দরকার। একটু হেসে কণ্ঠস্বরে একটু তরলতা এনে বললাম : হিসেবের কথা আর বলো না সাবিত্রী। অঙ্কে আমি ভয়ানক কাঁচা। যে কারণে সারা জীবন কোন হিসেবই মেলাতে পারলাম না।

সাবিত্রী বললে : সে তো আমিও পারিনি। সারা জীবন ধরে যতবারই হিসেব কষতে গেছি, সব হিসেব ওলটপালট হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত নিট প্রাপ্তি যেটা, সেটা হল চোখে জলের। কিন্তু আমি জীবনের সেসব বড় বড় হিসেবের কথা বলছি না রবিদা। আমি একটা ছোট্ট হিসেবের কথা বলছি। তুমি আমার বয়েসটা দু'বছর বাড়িয়ে লিখেছ।

আমি বললাম : সে কী! তোমাদের 'পাশের বাড়ি' ছবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টার বিনু বর্ধন যে আমায় বলেছিলেন, তুমি যখন ওদের ছবিতে অভিনয় করতে আসো তখন তোমার বয়েস পনেরো। সেই হিসেবে তোমার জন্মের সাল নাইনটিন থার্টিসেভেনই তো হয়!

সাবিত্রী বললে : বিনুদা তোমায় ঠিক কথা বলেননি। আমি যখন 'পাশের বাড়ি'-তে অভিনয় করতে যাই, তখন আমার বয়েস তেরো। তখনও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরিনি। ওই ছবির স্ক্রিন-টেস্ট নেবার সময় আমাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে শাড়ি পরানো হয়েছিল। আরও কত কী কাণ্ড করানো হয়েছিল।

আমি বললাম : তাই নাকি! প্লিজ সাবিত্রী, ওই ঘটনাটা একটু ডিটেলে বলো না।

সাবিত্রী বললে : সব কথা কী টেলিফোনে বলা যায় রবিদা! তুমি একদিন বাড়িতে চলে এসো। সব খুলে বলব তোমাকে। দেখছ না টেলিফোন কোম্পানি ইতিমধ্যে তিন বার পি-পি করে সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। তার মানে চারটে কল্ চার্জ করা হয়ে গেল। তুমি কাল-পরশুর মধ্যে একদিন সকালের দিকে চলে এসো। তার পরদিন আবার থাকব না। সুবোধ ঘোষের কাহিনী নিয়ে 'কথামালা' বলে একটা শ্রুতিনাটক হচ্ছে। তাতে অভিনয় করবার জন্যে দুর্গাপুর চলে যাব। তুমি বরং কালই এসো। তবে দশটার আগে এসো না। শরীরটা ভালো নয় বলে একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠছি।

আমি বললাম : সে কী! এটা তো একটা বদ অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। শুটিং থাকলে কী করবে? তখন তো ন'টার মধ্যে স্টুডিওতে হাজির হতে হবে!

সাবিত্রী বললে : কাজ থাকলে আমার অন্য চেহারা রবিদা। কাজ আমার কাছে সঞ্জীবনী টনিকের মতো। আউটডোরে গেলে তো ভোর পাঁচটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়ি। আর কাজ না থাকলে একটু বেশি বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি দিই। জীবনে তো কোন সুখই পেলাম না। এই বয়েসে একটু শয্যাসুখ করে নিচ্ছি আর কি।

আমি বললাম : তা নাও। তবে দুর্গাপুর যাওয়া-আসার পথে কান-মাথা গলা-টলা একটু ভালো করে ঢেকে নিও। যা ঠাণ্ডা পড়েছে। তোমার শ্রুতি-নাটক কোন দিন শুনিনি। কেমন হচ্ছে তোমাদের নাটক?

সাবিত্রী বললে : ভালোই তো। বেশ ভালো। আমার সঙ্গে যে দুটি ছেলে-মেয়ে অভিনয় করছে, তারাও খুব প্রমিসিং। একজন হল রঞ্জন ভট্টাচার্য। রঞ্জনকে তো তুমি নিশ্চয় চেনো?

আমি বললাম : হ্যাঁ চিনি। বিজন থিয়েটারে 'অপরাজিতা' নাটকে ওর অভিনয় দেখেছি। তাছাড়া টি-ভি'তে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' উপন্যাসটা নিয়ে 'বিবাহ অভিযান' বলে যে সিরিয়ালটা হচ্ছে সেখানে তো ও দারুণ করেছে। আমার তো মনে হয় ছেলেটির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

সাবিত্রী বললে : ঠিক বলেছ। তাছাড়া সিনেমার উঠতি নায়িকা ইন্দ্রানী দত্তও বেশ ভালো করছে। তোমাকে একদিন নাটকটা দেখাব।

নতুন শিল্পীদের সম্পর্কে সাবিত্রীর এই উচ্ছ্বাসটা বেশ ভালোই লাগল। সেদিন কে যেন বলছিলেন নতুন জেনারেশনকে নাকি সাবিত্রী বরদাস্ত করতে পারে না। তাঁর কথাটা যে কত মিথ্যে তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম।

তাছাড়া আরও একটা কথা। সাবিত্রীর মতো পুরনো দিনের শিল্পীরা চিরকাল অভিনয়ের ব্যাপারটাকে পুজো করে এসেছে। স্টেজ কিংবা স্টুডিওর ফ্লোর তাদের কাছে ছিল মন্দিরের মতো। আজ যদি সেখানে দেখে নতুন প্রজন্মের কোন মেয়ে অভিনয়ের ব্যাপারটাকে গৌণ করে রেখে শারীরিক ছলাকলা প্রদর্শন করে প্রোডিউসার কিংবা ডিরেক্টারদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে, তবে তো রাগ হতেই পারে। সেখানে যদি কাউকে দু-একবার ধমক-ধামক দিয়ে থাকে তবে আমি তো তার মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পাই না। সাবিত্রী জ্যেষ্ঠের কর্তব্যই করেছে। ভালোই করেছে। নইলে বাংলা ফিল্মের এই যে দুর্দশা চলছে, এটাও তো তার একটা কারণ। ছলাকলা প্রদর্শন করে এক শ্রেণীর প্রোডিউসার কিংবা ডিরেক্টারদের মাথা হয়তো ঘোরানো যায়। কিন্তু দর্শকদের মাথা বড় শক্ত। সেটা ঘোরাতে গেলে অভিনয়ের ব্যাপারে মনোনিবেশ করতেই হবে। স্টুডিওর প্রাঙ্গণ হলো মন্দিরের প্রাঙ্গণ। সেখানে দেবদাসীর নৃত্য চলে। কুৎসিৎ নর্তন-কুর্দনের স্থান সেটা নয়।

ইতিমধ্যে টেলিফোনের ভিতর আবার একবার পি-পি আওয়াজ শোনা গেল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম : ওই দেখ সাবিত্রী, আবার একটা কল্ বেড়ে গেল। আমি আর তোমার ফোনের মিটার বাড়াব না। এখন রাখছি। কাল-পরশুর মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। শরীরটাকে সাবধানে রেখো। তোমার কাছে আমাদের এখনও অনেক প্রত্যাশা।

সাবিত্রী আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি মিটার ওঠার ভয়ে তাড়াতাড়ি রিসিভারটা রেখে দিলাম। কাল-পরশুর মধ্যে তো দেখা হচ্ছেই। তখন বাকি কথা হবে।

তবে সাবিত্রীর বাড়ি যাবার আগে আমার পক্ষ থেকে ত্রুটি সংশোধনটা করে রাখি। আমি যে এর আগে আন্দাজ করে লিখেছিলাম, সাবিত্রীর জন্মসাল ১৯৩৭, সেটা ঠিক নয়। সাবিত্রীর কথা অনুযায়ী ওটা হবে ১৯৩৯।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ত্রুটি সংশোধন করে রাখতে চাই। আমি এর আগে যাত্রার মহানায়ক স্বপনকুমার প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে জানিয়েছিলাম যে, ওঁর প্রথম ছবি 'রূপ সনাতন'-এর পরিচালক ছিলেন পশুপতি কুণ্ডু। কিন্তু এই তথ্যটি সঠিক নয়। প্রবীণ চিত্র পরিচালক সুনীলবরণ একটি চিঠি লিখে জানিয়েছেন ওই ছবির পরিচালক ছিলেন তিনিই। এই তথ্যের সমর্থনে তিনি 'রূপ সনাতন' ছবির বুকলেটের একটি জেরক্স কপি পাঠিয়েছেন। সেখানে দেখতে পাচ্ছি ওই ছবির পরিচালক সুনীলবরণ। আর পশুপতি কুণ্ডু ছিলেন ওই ছবির ব্যবস্থাপক। আমি স্বপনবাবুর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তথ্যটি পেশ করেছিলাম। আমার উচিত ছিল আমার কাছে রক্ষিত চিত্রগুপ্তের খতিয়ানটি একবার উল্টে পাল্টে দেখে নেওয়া। অথবা স্মৃতির ভাণ্ডারটিকে একবার ঝাঁকিয়ে নেওয়া। সেটা না করে আমি অন্যায় করেছি। পরিচালক সুনীলবরণ এবং আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এ ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর সুনীলবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাকে একবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন : 'সাবিত্রী স্টেজ-অ্যাকট্রেস হিসেবে বড় না ফিল্ম-অ্যাকট্রেস হিসেবে?' আমি তার কোনও সদুত্তর দিতে পারিনি। সাবিত্রীকে যখন মঞ্চের কোনও চরিত্রে দেখি তখন মনে হয় স্টেজ-অ্যাকট্রেস হিসেবেই ও বড়। আবার যখন ফিল্মে দেখি তখন মনে হয় অতবড় ফিল্ম-অ্যাকট্রেস আর হয় না। সব ধরনের চরিত্রেই ও সমান দক্ষ। কী সিরিয়াস আর কী সিরিও-কমিক। শুটিং-এর সময় যখন ওকে কাঁদতে বলা হয় তখন ওর এক বিন্দু গ্লিসারিনের দরকার হয় না। আর কী

কন্ট্রোল। চোখের জলটা চোখেই ধরা থাকবে না গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে এটা জেনে নিয়ে ও হুবহু সেই রকমই করত। স্টেজেও ঠিক তাই। কিন্তু সাবিত্রী নিজে বলে ওর সিরিও-কমিক চরিত্রই বেশি ভালো লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কেন?

সাবিত্রী বললে : তা ঠিক বলতে পারব না। তবে সেই ছোটবেলা থেকে অভাবের তাড়নায় অনেক চোখের জল তো ফেলতে হয়েছে। তাই চোখের জলের আলাদা কোন চার্ম আমার কাছে নেই। বরং হাসবার আর হাসাবার সুযোগ পেলে সেটা চুটিয়ে করে নিই। দুঃখ নামক বস্তুটিকে কাঁচকলা দেখাবার এই তো বড় সুযোগ।

বুঝলাম সাবিত্রী জীবনবোধের অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে।

স্টেজ আর ফিল্ম দুটোই সাবিত্রীর কাছে সমানভাবে গ্রহণীয়। তবু ওর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারা যায় স্টেজের প্রতি ওর একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। তার কারণ ওর অভিনয় জীবন শুরুই হয়েছিল স্টেজের মধ্যে দিয়ে। তবে তা কমার্শিয়াল কোনও স্টেজে নয়। একটি গ্রুপ থিয়েটারের মারফত। গ্রুপটির নাম উত্তর সারথি। আর তাদের ওই প্রোডাকশনের নাম 'নতুন ইহুদি'। সেই পঞ্চাশের দশকে উদ্বাস্তুজীবনের ওপর গঠিত এই নাটকটি সারা বাংলাদেশে হুলস্থুল ফেলে দিয়েছিল। ঠিক বিজন ভট্টাচার্যদের 'নবান্ন'-র মতো। আগাগোড়া পূর্ববঙ্গের ভাষায় এই নাটকটি অবলম্বন করে ছবিও হয়েছিল ওই 'নতুন ইহুদী' নাম দিয়ে। নাটকের কুশীলবরাই ছিলেন সেই ছবিতে।

ওই উত্তর সারথি গ্রুপে অভিনয় করতে যাওয়াটা সাবিত্রীর জীবনের এক বিরাট ঘটনা। আর তেমনি নাটকীয়ও বটে। প্রায় রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে অভিনয় করানো হয়েছিল। সেই ঘটনাটা সাবিত্রীর মুখ থেকেই শোনা যাক।

সাবিত্রী বললে : আমি তখন ভিক্টোরিয়া ইস্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। মাত্র তেরো বছর বয়েস। কলকাতায় আসার পর জামাইবাবু আমাকে দেশের থেকে এক ক্লাস উঁচুতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। তা পড়াশোনায় আমার কোনদিনই তেমন মন ছিল না। তখনও নয়, এখনও নয়। যা কিছু আগ্রহ ছিল সিনেমা দেখায়। বাড়ি থেকে ইস্কুল যাবার জন্যে ট্রাম-বাসের ভাড়া নিতাম। কিন্তু ইস্কুলে যেতাম পায়ে হেঁটে। সেই পয়সায় সপ্তাহে একটা করে সিনেমা দেখতাম।

সেই যে টালিগঞ্জ থানায় জামাইবাবুর কোয়ার্টারে থাকবার সময় একবার কানন দেবীকে দেখেছিলাম, তিনি আমায় চকোলেট খেতে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে সিনেমা আর্টিস্টদের চোখে দেখার জন্যে আমি ছটফট করতাম। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর মোড়ে, আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর্টিস্ট দেখবার জন্যে। পেতামও দেখতে। ছবি বিশ্বাসকে দেখতে পেতাম, জহর গাঙ্গুলিকে দেখতে পেতাম, ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেখতে পেতাম। ওঁরা সব গাড়ি করে যেতেন। ছোট ছোট আর্টিস্টদের দেখতে পেতাম কখনও ট্রামের জানলায়, কখনও বা পায়ে হাঁটা অবস্থায়। অভিনেত্রীদের দেখা তেমন পেতাম না। ওঁরা বোধহয় গাড়ির মধ্যে মুখ লুকিয়ে যেতেন। একবার শুধু রেণুকা রায়কে দেখেছিলাম ট্যাক্সি করে যেতে। উনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে কী ব্যাপারে যেন হাসছিলেন।

ইস্কুলে পড়ার সময় আমার একটা নেশা ছিল। না, ঠিক নেশা বলব না, শখ ছিল। রাংতামোড়' পান খাওয়া। রাসবিহারীর মোড়ে একটা পানের দোকান ছিল। কাঁচা বরফের ওপর পান দোকান ছিল কাঁচা বরফের ওপর পান সাজিয়ে রাখত। মিষ্টি মশলা দিয়ে সেই পান রাংতায় মুড়ে দিত। চার পয়সা করে দাম নিতো। চমৎকার খেতে। সেই পান চিবুতে চিবুতে রাসবিহারীর মোড়ে কিছুক্ষণ আড্ডা মারতাম বন্ধুদের সঙ্গে।

সেইরকম আড্ডা দিতে দিতেই একদিন নজরে পড়ল রোগামতন একটা লোক আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। শুধু তাকানো নয়, বড় বড় দুটো চোখ দিয়ে যেন আমাকে গিলে খাচ্ছে। শুধু সেই একদিনই নয়, পর পর ক'দিনই দেখলাম লোকটি উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথম প্রথম খুব রাগ হত। ইচ্ছে হত লোকটার সামনে গিয়ে বেশ কড়া করে দুটো কথা শুনিয়ে

দিই। মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা বার করে দিই। ওসব ব্যাপারে আমি একটু ডানপিটেই ছিলাম। পরে ঠিক করলাম, ওসব লোককে গ্রাহ্য না করাই ভালো। গ্রাহ্য করতে গেলেই পেয়ে বসবে।

ওই রকম একদিন পান চিবুতে চিবুতে বান্ধবীদের সঙ্গে গুলতানি সেরে একটা সময়ে বাসে উঠতে যাব, দেখি কী ওই রোগা লোকটা আমার সামনে এসে হাজির। চোখাচোখি হতেই একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে : তুমি কি আরতির বোন?

আরতি হল আমার এক বড় দিদি। বিয়ের পর চক্রবর্তী হয়েছে। আরতিদি দারুণ ট্যালেন্টেড। দারুণ গান গাইতে পারে। আমরা যখন ঢাকায় ছিলাম তখন ও ঢাকা রেডিও স্টেশনের নিয়মিত শিল্পী ছিল। পরিচালক প্রভাত মুখার্জি তখন ঢাকা রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টার ছিলেন। আরতিদির অ্যাকটিং-এর ট্যালেন্ট ছিল। কত লোক ওকে সিনেমায় অভিনয় করাতে চেয়েছে। বাবা রাজি হননি।

তা এই লোকটার মুখে আরতিদির নাম শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। লোকটা আমার দিদির নামও জানে দেখেছি। তা জানতেই পারে। হয়তো দিদির শ্বশুরবাড়ির পাড়ার কেউ। কিন্তু আমার দিকে অমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে কেন? মতলবটা কী?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি বললে : তোমারে আমি চিনি। কোথায় থাকো তাও জানি। ঠিক তোমার মতো একটি মাইয়াই আমি খুঁজতেছিলাম। তোমারে আমার খুব পছন্দ হইছে।

লোকটার কথা শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। কী সাহস। এই এত লোকের মাঝখানে আমাকে কিনা এইসব কথা বলছে! কী করব বুঝতে পারছি না। চেঁচিয়ে লোক জড় করব নাকি।

এবার লোকটি বললে : অমন ব্যাজার মুখ করনের কোন প্রয়োজন নাই। পছন্দের কথাটা আমি কোন কু-উদ্দেশ্যে বলি নাই। ক'দিন ধইরা তোমার চলন-বলন সব লক্ষ করে দ্যাখলাম তুমিই পারবে। তুমি আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবে? বাঙ্গাল ভাষার নাটক। আগাগোড়া দ্যাশের ভাষা।

এইবারে লোকটির মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি। তখনি মনে পড়ল সিনেমার পর্দায় দেখেছি। ছবিতে ছোট ছোট পার্ট করে। লোককে খুব হাসাতে পারে। তবে নায়ক তো আর নয় যে খাতির করে কথা বলতে হবে। বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম : এই ব্যাপারে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমার কথায় লোকটি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বললে : তোমার তাইলে আপত্তি নাই। ঠিক আছে, আমি কালই তোমাগো বাড়ি যামু।

পরের দিনই ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। কেমন করে ঠিকানা পেলেন জানি না। বাবার সঙ্গে যখন কথা বলতে লাগলেন তখনই জানতে পারলাম, উনি আমাদের আত্মীয় হন। আমার মেজদি ওঁর সম্পর্কে কাকিমা। ভদ্রলোকের নাম সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। এককালে দারুণভাবে রাজনীতি করতেন। এখনও করেন অল্প সল্প। কোথায় যেন একটা ভালো চাকরি করেন। তার সঙ্গে করেন সিনেমায় অভিনয়। সিনেমায় ওঁর নাম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভানুদা বাবাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন। পূর্ববঙ্গের রিফিউজিদের নিয়ে একটা নাটক লেখা হয়েছে। নাটকটা লিখেছেন সলিল সেন। আগাগোড়া সব চরিত্রের মুখেই বাঙাল ভাষার সংলাপ। তাতে আমাকে অভিনয় করতে হবে। নাটকের নাম 'নতুন ইহুদি'।

নামটা শুনেই বাবা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। বললেন : ঠিকই তো! আমরা তো এখন নতুন ইহুদিই বটে।

বাবা এক কথায় আমাকে অভিনয় করতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। সদ্য নিঃস্ব হয়ে আসা ছিন্নমূল একটি মানুষ। ওই ফিলিংসটাই বোধহয় কাজ করেছিল বাবার মনে। ওই ভানুদা আমাকে এসে নিয়ে যাবেন। উনি যখন আমাদের আত্মীয়, তখন ওঁর সঙ্গে কোথাও পাঠাতে বাবার কিংবা বাড়ির আর কারুরই আপত্তি হল না।

নির্দিষ্ট দিনে ভানুদার সঙ্গে আমি চললাম চেতলায় 'উত্তর সারথি'-র রিহার্সাল রুমে। পায়ে জুতো নেই। স্কুলে যে শতছিন্ন কেডস্ জোড়াটা পরে যাই, সেটা কোন ভদ্র সমাজে দেখানো যায় না। তাই খালি পায়েই চললাম ভানুদার সঙ্গে।

রাস্তায় এসে খানিকটা চলার পর হঠাৎ আমার পায়ের দিকে নজর পড়ল ভানুদার। অবাক হয়ে বললেন : জুতা পরে আসোনি?

আমি নির্বিকারভাবে বললাম : থাকলে তো পরব?

ভানুদা একটু থমকে আমার দিকে তাকালেন। নতুন ইহুদিদের দৈন্যের চেহারাটা যেন এক মুহূর্তে পড়ে নিলেন। তারপর বললেন : আইস আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি রাসবিহারীর মোড়ে একটা জুতোর দোকানে ঢুকে আমায় একজোড়া জুতো কিনে দিলেন।

সেই জুতো, আমার জীবনের সেই অক্ষয় স্মৃতি মাখানো জুতো জোড়াটা ছিঁড়ে যাবার পরও আমি যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিলাম। নতুন বাড়িতে আসার সময় জুতোজোড়া কোথায় যে হারিয়ে গেল তা আর খুঁজে পেলাম না। ওই হারানো জুতো জোড়াটার জন্যে আমার আজও বড় কষ্ট হয়। ওই জুতোজোড়াটাই তো ছিল আমার নতুন পথের দিশারী।

সাবিত্রী চ্যাটার্জীর জীবনের প্রথম দিকে কোনও সাফল্যই সহজে আসেনি। ভাগ্য তাকে বার বার সোনালি হাতছানি দিয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এটা শুধু একবার নয়। বার বার। সেই ঘটনায় আসবার আগে চলুন চেতলায় উত্তর সারথি-র রিহার্সাল রুমটা ঘুরে আসা যাক, যেখানে যাবার জন্যে অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরী সাবিত্রীকে রাসবিহারীর মোড় থেকে সদ্য সদ্য একজোড়া নতুন জুতো কিনে দিয়েছেন।

উত্তর সারথির 'নতুন ইহুদি' নাটকের রিহার্সালের ব্যবস্থা হয়েছিল চেতলায় বলীন সোমের বাড়িতে। বলীনবাবু নিজেও একজন দক্ষ অভিনেতা। প্রচুর বাংলা ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। বেশ কয়েকটি নাটকেও। মানুষটি যেমন রুচিশীল, তেমনই ভদ্র।

রিহার্সাল রুমের মানুষগুলিকে দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। ভানুদা যখন সাবিত্রীকে সকলের সামনে পেশ করলেন তখন প্রত্যেকেই সাবিত্রীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করলেন। সাবিত্রী যেন তাঁদের সকলের ছোট বোন। আর কী স্নেহমাখা ব্যবহার প্রত্যেকের।

এইসব দেখে সাবিত্রীর চোখে জল এসে গেল। এমন সস্নেহ ব্যবহার সে তো এর আগে কোনদিন বাইরের পৃথিবী থেকে পায়নি। এর আগে যতবার এক্সট্রার চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে স্টুডিওতে গিয়ে লাইন দিয়েছে, তখন তার কপালে জুটেছে লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞা। আর এখানে? আজও তো তার মলিন বেশ। উপবাসী রোগা চেহারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই একঘর মানুষ তো তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছেন না। এতটুকু অবহেলা করছেন না ছিন্নমূল এক কিশোরীকে!

কেবল একজন ভদ্রলোক ভানুদার দিকে তাকিয়ে বললেন : ভানু, এ কি পারবে? বয়েসটা যে বড্ড কম!

তারপর নিজেই যেন নিজেকে সংশোধন করে নিলেন। বললেন : তবে একদিক থেকে ঠিকই আছে। পুরোপুরি রিফিউজি রিফিউজি চেহারা। 'নতুন ইহুদি' পরিবারের উপযুক্ত। তা হ্যাঁ গো মেয়ে, তুমি বাঙলা ভাষায় কথা বলতে পারবে তো? না কি কলকাতায় এসে দেশের ভাষা ভুলে গেছ?

সাবিত্রী বেশ তেজের সঙ্গে জবাব দিলে : পারুম না ক্যান্! আমি বাংগাল দ্যাশের মাইয়া।

সাবিত্রীর কথা শুনে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। ভানুদার দিকে তাকিয়ে বললেন : ভানু না তোর চোখ আছে রে! ঠিক জিনিসটিকে তুলে এনেছিস। হুবহু আমাদের নাটকেরই ক্যারেকটার।

ভানুদার গোঁফ নেই। থাকলে তখনই তাতে একবার তা দিয়ে নিতেন। তবু ঠিক সেইরকম ভঙ্গিতেই বললেন : এইটা জানবেন কানুদা। ভানু যখন যে কাম করে হেউডা ঠিকই করে। আপনারাই সেটা বুঝতে পারেন না।

ভানুদার সেই ভঙ্গি দেখে ঘরের সবকটি মানুষই একযোগে হেসে উঠলেন।

সাবিত্রী তখনও এঁদের কাউকেই চিনত না। একটু পরেই জানতে পারল ওই ভদ্রলোকই এই 'নতুন ইহুদি' নাটকের পরিচালক। ওঁর নাম কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ও মা! এঁরই নাম কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুখটা এত চেনা চেনা লাগছিল। এঁকে তো কত ছবিতে

দেখেছে। কী ভালো পার্ট করেন। কিন্তু এই ভদ্রলোক তো চাঁছাছোলা কলকাতার ভাষায় কথা বলছেন। উনি নাটকে বাঙাল কথা বলতে পারবেন তো?

শুধু উনি কেন, এই নাটকে আরও যাঁরা যাঁরা অভিনয় করছেন, সেই চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, বিনু বর্ধন, বলীন সোম, বাণী গাঙ্গুলি—এঁরা সকলেই তো কলকাতার ভাষায় কথা বলছেন। তাহলে কী করে কী হবে!

পরে রিহার্সাল দিতে দিতে সাবিত্রী সবিস্ময়ে দেখেছে কী পূর্ববঙ্গ আর কী পশ্চিমবঙ্গ, উভয় দেশের ভাষাতেই এঁদের প্রত্যেকের কী অসামান্য দক্ষতা। যখন যে ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষাতেই কত ফ্লুয়েন্ট। অভিনয় করতে গেলে এই রকমটাই হতে হবে। সাবিত্রী কি কোনদিন পারবে ওঁদের মতো হতে?

এই উত্তর সারথি গ্রুপের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন নাট্যকার সলিল সেন। ভদ্রলোককে দেখে সাবিত্রী রীতিমত অবাক হয়েছিল। এই মৃদুভাষী ভদ্রলোকটি অতবড় একটা নাটক লিখেছেন। আর কী তীব্র এই নাটকের বিষয়বস্তু! তার সংলাপ! সাবিত্রী মনে মনে প্রণাম জানিয়েছিল সলিল সেনকে। এর আগে জীবনে কোনদিন কোনও লেখককে সামনাসামনি দেখেনি সে। তার ধারণা ছিল সাহিত্যিক কবি নাট্যকারেরা এক-একজন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অনেকটা ভগবানের মতো। সাধারণ মানুষ তাঁদের নাগাল পায় না। সলিল সেনকে দেখে সাবিত্রীর সে ভুল ভেঙে গেল। ইনি তো কত আপনার করে নিয়েছেন তাকে। ঠিক নিজের দাদার মতো। সাবিত্রীর তো নিজের কোনও দাদা নেই। সব ক'জনই দিদি। এতদিনে একসঙ্গে এতগুলি দাদা পেয়ে সাবিত্রীর মন কানায় কানায় ভরে গেল। আনন্দে চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সব আনন্দ উবে গেল। অকস্মাৎ রিহার্সাল বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল, এই নাটক মঞ্চস্থ করা যাবে না বোধহয়। সঠিক কারণটা জানত না সাবিত্রী। সম্ভবত আর্থিক কারণই হবে।

হায় ভগবান! এ তুমি কী করলে! একটুখানি আশা দিয়ে আবার তা কেড়ে নিলে! আবার সাবিত্রীর চোখে জল এসে গেল। তবে এবার আর আনন্দে নয়, দুঃখে।

চোখের ওই দুঃখের জল শুকোতে না শুকোতেই আবার একপ্রস্থ আনন্দের হাতছানি এসে গেল সাবিত্রীর সামনে। গুরু মাকথাপ্পা পিল্লাইয়ের কাছে ভরতনাট্যম শিখতে শিখতে সাবিত্রী স্বপ্ন দেখত একদিন এই নাচের জন্যই সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। কাগজে কাগজে ছবি ছাপা হবে। ঠিক সেই রকম একটা সুযোগই এসে গেল তার সামনে।

কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে কতখানি ফারাক, চোদ্দ বছর বয়সের কিশোরী সাবিত্রীর সে সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই ছিল না। সেই জ্ঞানোদয় এবারেই হল। এবং সেটাও অজস্র চোখের জলের মধ্যে দিয়ে।

দক্ষিণ কলকাতায় তখনকার দিনে একটি নামকরা নাচের ট্রুপ ছিল। তাঁদের একটা দিন পনেরোর ট্যুর ছিল দিল্লি, আজমীর, জয়পুর ইত্যাদি কয়েকটি জায়গায়। সাবিত্রী সেই গ্রুপে চান্স পেয়েছিল ওই অল্প বয়সেই তার নাচে দক্ষতার জন্য। আর এই ট্যুরের কী মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা! সাবিত্রীর সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে সারা জীবনের মতো নাচকে বিদায় জানিয়েছিল। সেই ঘটনাটা সাবিত্রীর মুখ থেকেই শোনা যাক।

সাবিত্রী বললে : ওই ট্রুপের সঙ্গে ট্যুরে যাবার ডাক পেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠেছিলাম। এর আগে কখনও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও যাইনি। তার ওপর এটা তো আর নিছক বেড়াতে যাওয়া নয়, নাচ দেখাতে যাওয়া। তাই আনন্দটা ছিল আরও বেশি।

কিন্তু প্রথমেই একটা হোঁচট খেলাম। ট্রুপ থেকে বলে দেওয়া হল, কোন গার্জেন সঙ্গে নেওয়া চলবে না। একা একা যেতে হবে। তখনই মনটা মুষড়ে পড়ল। তাহলে বোধহয় আমার আর যাওয়া হল না। বাবা কি রাজি হবেন তাঁর চোদ্দ বছরের মেয়েকে একা একা বাইরে যেতে দিতে। বিশেষ করে তখন পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মেয়েদের নিরাপত্তার বিশেষ অভাব ছিল। তাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রচুর অসামাজিক কাজকর্ম চলছিল। কাগজে সে সব খবর ছাপাও হত।

আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম ঠিক তাই হল। বাবা বললেন : না না, সাবিকে আমি এভাবে একা একা বাইরে ছাড়তে পারব না।

ছুটে গেলাম ট্রুপের কর্তাব্যক্তিদের কাছে। অনেক অনুনয় বিনয় করে বললাম : আমার সঙ্গে একজন গার্জেনকে যাবার ব্যবস্থা করে দিন আপনারা।

কর্তাদের একজন বললেন : পাগল হয়েছ! এক্সট্রা একজনের যাওয়া-আসা থাকা-খাওয়ার খরচ কত জানো! আমরা তো আর দানছত্র খুলে বসিনি। সেরকম হলে নিজের খরচে গার্জেন নিয়ে যাও। আমরা খড়জোর তার লজিং-এর ব্যবস্থাটা করে দিতে পারি।

হায় ভগবান! তাহলে আর আমার যাওয়া হল না। যাদের দিন আনি দিন খাই অবস্থা, তাদের পক্ষে কি ভারত ভ্রমণের বিলাসিতা সম্ভব?

বাড়িতে এসে কাউকে কিছু না বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সেই চোখের জলে বালিশের বেশ খানকটা অংশ ভিজেও গেল।

আমাকে ওইভাবে চুপচাপ শুয়ে পড়তে দেখে বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। আস্তে আস্তে এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : সাবি, কাঁদিস না মা। উঠে বোস। আর কোনও উপায় নেই যখন তখন তুই একাই যা। তবে খুব সাবধানে থাকিস মা। মেয়েদের তো পদে পদে ভয়। একা একা যেন কোথাও যাস না।

বাবার কথা শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। এক হাত দিয়ে চোখের জলটা মুছতে মুছতে বললাম : তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বাবা। আমি একা-একা কোথাও বেরোব না। আরও অনেক মেয়েই তো যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে থাকব, তাদের কাছেই শোবো, তাদের সঙ্গেই বেরোব।

বাবা বললেন, তাই করিস মা। তুই ভালোভাবে না ফেরা পর্যন্ত আমাদের যে কীভাবে কাটবে তা ঈশ্বরই জানেন। মানুষের কাছে সদয় ব্যবহার তো আমরা আর এখন পাই না। এদেশে এখন আমরা হলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আমাদেরও যে দেশে প্রচুর জায়গাজমি ছিল, চকমেলানো বাড়ি ছিল, সে কথা আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই আমাদের মেয়েদেরও কেউ সম্মান দিতে চায় না। তুই মা, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিস। দলের সঙ্গে মানিয়ে-গুনিয়ে চলিস। তোর যা বেপরোয়া মেজাজ, কট কট করে লোককে কথা শুনিয়ে দিস, সেটাকেই তো আমার বড় ভয় মা!

আমি বললাম : তুমি একদম চিন্তা কোরো না বাবা। আমি এ ক'দিন খুব লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকব।

বাবা বললেন : তবে মা, সব গোছগাছ করে নে। তোদের তো আবার কালই যাওয়া। হাতে তো আর বেশি সময় নেই।

বাবার কথা শুনে হাসি পেয়ে গেল। গোছগাছ আবার কী! আমাদের কি এখন সেই অবস্থা যে বেডিং-টেডিং ব্যাগ-ব্যাগেজেস্ নিয়ে ট্যুরে বেরোব। বাবা তাঁর পুরনো আমলের পূর্ববঙ্গীয় মেজাজে কথাটা বলে ফেলেছেন।

আমার একটা রঙচটা টিনের সুটকেশ ছিল। তার মধ্যে গোটা দুই ফ্রক আর গোটা দুই শাড়ি ভরে নিলাম। এই অল্প কিছু পোশাক নিয়েই পনেরোটা দিন কাটাতে হবে। মুশকিল হল শীতের পোশাক নিয়ে। এখন শীতকাল। তাছাড়া যেখানে যেখানে যাচ্ছি সেখানে শীতের বড়ই প্রকোপ। কিন্তু আমার তো কোনও শীতের পোশাক নেই। কী হবে তাহলে?

মুশকিল আসানটা বাবাই করে দিলেন। তাঁর বহু কষ্টের অর্জিত টাকা থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে হরলালকার দোকান থেকে একটা মেয়েদের কোট কিনে এনে দিলেন। তখন অবশ্য সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল। কিন্তু তা হলেও পাঁচ টাকার কোট কেমন হতে পারে কল্পনা করো রবিদা। তবু সেই অল্পদামি কোটখানা পেয়েই আমার আনন্দ যেন আর ধরে না। আমি যেন এক মুহূর্তে ধনীকন্যা হয়ে গেলাম।

হাওয়া স্টেশনে গিয়ে দেখলাম অন্য এক দৃশ্য। সব কটি মেয়ের সঙ্গেই একজন দু'জন করে গার্জেন এসেছে। আর কী তাদের ঠাট-বাট, কী তাদের সাজ-পোশাক। এঁরা প্রত্যেকেই বালিগঞ্জের উচ্চবিত্ত পরিবারের মানুষ। তুলনায় আমি হলাম টালিগঞ্জের বস্তিবাসিনীর মতো।

এখন আর বালিগঞ্জের সেই রমরমা নেই। কিন্তু তখন বালিগঞ্জ মানেই ছিল ধনীদের পাড়া। দক্ষিণ

কলকাতার চেহারাটা তখন ছিল বিচিত্র রকমের। ভবানীপুর মানেই হল বনেদি পাড়া। তার পাশে কালীঘাট হল পোটো আর পাণ্ডাদের পাড়া। কালীঘাটের কোনও ইজ্জত নেই। সেটা পেরিয়ে বালিগঞ্জ হল ঝকঝকে তকতকে ধনীপল্লী। আর সেটা পেরিয়ে টালিগঞ্জের গ্রাম্য চেহারা। আমি সেই টালিগঞ্জের মেয়ে। কাজেই বালিগঞ্জিনীদের কাছে অচ্ছুৎকন্যার মতো। আমাকে দেখে তাদের চোখমুখের যা চেহারা হয়েছিল তাতে আমার এই কথাই মনে হয়েছিল।

উদ্যোক্তারাও দেখলাম বালিগঞ্জের মানুষদের নিয়েই মত্ত। রীতিমত তোষামোদ করছেন তাঁদের। আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। অনেক অনুনয়-বিনয় করবার পর দয়া করে আমার বসার জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাই। যাবার আগে প্রাণ ভরে দুটো কথা শুনিয়ে দিয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাবার সতর্কবাণীর কথা। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, সবাইকার সঙ্গে মানিয়ে-গুনিয়ে চলতে। কাউকে কটু কথা না শোনাতে।

সেদিন ওই হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনাই করেছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, ঠাকুর, আমি যেন বালিগঞ্জের চেয়েও অভিজাত কোন পাড়ায় গিয়ে থাকতে পারি। তা ঈশ্বর পরম করুণাময়। তিনি এক দুঃস্থ কিশোরীর প্রার্থনা শুনেছিলেন। পরবর্তীকালে আমি তাঁরই দয়ায় একটা চারতলা বাড়ি করতে পেরেছিলাম নিউ আলিপুরে।

সাবিত্রীর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : ওই অতবড় নাচের ট্রুপে তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মতো একটি মানুষও খুঁজে পেলে না? ভারি আশ্চর্য তো!

সাবিত্রী বললে : পেয়েছিলাম রবিদা। মাত্র দুটি মানুষকে পেয়েছিলাম যাঁরা আমাকে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। তাঁদের একজন হলেন ছবিদি। ওঁর সঙ্গে ওই হাওড়া স্টেশনেই প্রথম আলাপ। আমি মনমরা হয়ে একপাশে বসে আছি দেখে তিনি নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাঁর স্নেহসূচক কথাবার্তা শুনে ওরই মধ্যে কিছুটা খুশিতে মন ভরে গিয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আর একজন?

সাবিত্রী বললে : তাঁর নাম শ্যামদা। তাঁর পদবী কী সেটা আমি জানি না। তিনি ট্রুপে বাঁশি বাজাতেন। আমরা সকলে তাঁকে শ্যামদা বলেই ডাকতাম।

আমি বললাম : শ্যামবাবু তোমার কী উপকারে লেগেছিলেন?

সাবিত্রী বললে : শ্যামদার উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না রবিদা। ট্রেনের মধ্যে রাত্রে শোবার সময় সবাই রঙ-বেরঙের কম্বল বার করে ঝপ ঝপ করে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আমার তো কোনও কম্বল নেই। একটা চাদর পর্যন্ত নেই গায়ে দেবার। আমি আমার সেই পাঁচ টাকার কোটটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম গুটিসুটি মেরে। একটু রাত বাড়তেই শীত বলে কোথায় আছি। ট্রেনের জানলা-দরজা সব বন্ধ। তবু তার মধ্যে যেটুকু ফাঁক-ফোকর আছে তারই মধ্যে দিয়ে ছুটে আসতে লাগলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিতে লাগল। আমি শীতের চোটে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। এমন সময় দেখলাম আমার সারা শরীর কে যেন একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, শ্যামদা। তিনি তাঁর গায়ের চাদরখানি খুলে সস্নেহে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছেন। এই উপকার ভোলো যায়? আমি তো কোনদিন ভুলতে পারব না। শ্যামদার ব্যবহারে সেদিন আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। আর সেদিনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, এই পৃথিবীটা কেবল খারাপ মানুষেই পরিপূর্ণ নয়। আমার মতো দুঃখী মানুষকে স্নেহ করার মতো মহৎ মনের মানুষও আছেন।

যাই হোক, আবার ওই ট্যুরের প্রসঙ্গেই আসি। দিল্লিতে নেমে সবাই যে যার মতো ঘর কিংবা জায়গা দখল করে নিলেন। আমার স্থান হল একটা বড় হল ঘরে একগাদা মেয়ের সঙ্গে। তারা সবাই গ্রুপ নাচিয়ে। অথচ আমার সোলো পিস্ ছিল এই প্রোগ্রামে।

এই ধরনের অবিচার কিন্তু আমার মনে কোনও ছাপ ফেলেনি। আমি মগ্ন হয়ে আছি নাচ দেখানোর পর প্রশংসার আশায়। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য দেখো, আমাদের প্রোগ্রাম মোটেই জমল না। টুকরো টুকরো

ভাবে আমার প্রশংসা কেউ কেউ করে গেলেন বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারটাই যখন হৃদয়গ্রাহী হল না তখন আমার ইনডিভিজুয়াল পারফরমেন্স নিয়ে মাথা ঘামাবে কে?

ইতিমধ্যে একটি অঘটন ঘটে গেল। আমার সেই টিনের সুটকেসটি চুরি হয়ে গেল। ওই হরি ঘোষের গোয়ালের মধ্যে কে যে চুরি করেছে তার হদিস পাওয়া গেল না। সুটকেসের মধ্যে আমার দু-চারটি কাপড়-জামার সঙ্গে আমার নিজের জমানো পনেরোটি টাকা ছিল। কত কষ্টে যে ওই টাকা কটা জমিয়েছিলাম তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কাপড়-জামার জন্যে নয়, ওই পনেরোটি টাকার জন্যে দুঃখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। আমি শুনেছিলাম দিল্লিতে ভালো ভালো নানা ডিজাইনের চুড়ি পাওয়া যায়, জয়পুরে নাকি চমৎকার পাথরের বাসন পাওয়া যায়। ইচ্ছে ছিল নিজের আর দিদিদের জন্যে কিছু চুড়ি, আর মায়ের জন্যে পাথরের থালা-বাটি কিনে নিয়ে যাব। ভগবান এই সামান্য আশাটুকুও পূর্ণ করলেন না।

ট্যুরের বাকি দিনগুলি আমাকে ওই একই জামা-কাপড়ে কাটাতে হল। রাত্রে পরে শোবার জন্যে আর একটা রঙচটা ছাপা শাড়ি ছিল। সেটা সেদিন কেচে মেলে দিয়েছিলাম, ভাগ্যিস চোরের দৃষ্টি সেদিকে পড়েনি! নইলে আমাকে আরও বেশি অসুবিধেয় পড়তে হত।

জয়পুরে তখন প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ। একদিনের মধ্যে আমার গাল-টাল ফেটে গেল। ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল। সে কী দুঃসহ অবস্থা। তারই মধ্যে একটি ঘোষণা শুনে আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত।

ঠিক দিল্লির মতোই জয়পুরেও দু-তিনটি শো ফ্লপ করল। ট্রুপের কর্তারা বললেন, আমাদের হাতে আর টাকা-পয়সা নেই। প্রত্যেককে নিজের নিজের খরচে কলকাতা ফিরে যেতে হবে।

কথাটা শুনে আমি তো হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কে আমাকে কলকাতা ফেরার ভাড়া দেবে! কাঁদতে কাঁদতেই গিয়ে ছবিদির শরণাপন্ন হলাম।

ছবিদির সঙ্গে তাঁদের বাড়ির লোক ছিলেন। ছবিদি অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কী যেন আলোচনা করলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তোকে আমরা কলকাতা ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু তোকে হাওড়া স্টেশনে ট্রামে তুলে দিলে তুই একা একা বাড়ি ফিরতে পারবি তো? আমরা তো নর্থের দিকে যাব। তোকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না।

আমি বললাম : খুব পারব ছবিদি। তোমার এই দয়ার কথা কোনদিনই ভুলতে পারব না।

সত্যিই ভুলিনি রবিদা। ছবিদি যদি সেদিন না থাকতেন তাহলে তোমাদের এই সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে হয়তো জয়পুরে কোন মাড়োয়ারির বাড়িতে ঝি-গিরি করে জীবন কাটাতে হত।

আমি বললাম : দুঃখ করে আর কী করবে বলো সাবিত্রী। এরই নাম জীবন। এইসব উত্থান-পতন আছে বলেই না জীবনের এতো মাধুর্য। যাক গিয়ে তারপর, কী হল বলো।

সাবিত্রী বললে : কলকাতায় ফিরেই একটা সুসংবাদ পেলাম। উত্তর সারথি থেকে আমাদের বাড়িতে লোক এসেছিল। 'নতুন ইহুদি'র রিহার্সাল আবার শুরু হয়েছে। আমাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছে।

আমার চিরকালই ধারণা ছিল অভিনয়ের ব্যাপারে সাবিত্রী চ্যাটার্জি ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার অধিকারিণী। কিন্তু সে ভুলটা সাবিত্রীই ভাঙিয়ে দিয়েছিল। ওর এই অভিনয় জীবনের সাফল্যের পিছনে মানুষেরও যে একটা বিরাট অবদান আছে সেটা ওর সঙ্গে কথা বলার পর জানতে পেরেছিলাম। জানতে পেরেছিলাম, ঈশ্বর ওর মধ্যে একটা তীব্র অনুভূতির জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু অভিনয়ের অ আ ক খ-টা ওর মানুষের কাছে থেকেই শেখা।

সাবিত্রীকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম : অভিনয়টা তো তোমার কাছে জলভাত। আমার তো মনে হয় তুমি মায়ের পেট থেকেই অভিনয়ের ট্রেনিং নিয়ে তারপরে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে।

সাবিত্রী তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় বড় করে বলেছিল : এটা তোমার একদম ভুল ধারণা রবিদা। নিজেকে যে কোনও চরিত্রে প্লেস করবার সময় আমার একটা আলাদা অনুভূতি হয় ঠিকই। কিন্তু কেবল তাতেই তো আর অভিনয় করা যায় না। অভিনয় করতে হলে অভিনয়ের গ্রামার জানাটা যে ভয়ানক দরকার। আর সেটাই হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন আমার গুরু।

আমি বললাম : তোমার কোনও গুরু আছে বলে তো শুনিনি কোনদিন। কে তিনি?

সাবিত্রী বললে : তিনি হলেন কানুদা।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম : কানুদা মানে? অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়?

সাবিত্রী বলল : হ্যাঁ, তিনিই। কানুদা আমাকে হাতে করে গড়েপিটে অভিনেত্রী তৈরি করেছেন। 'নতুন ইহুদি' রিহার্সালে পড়ার আগে আমিও ভাবতাম, এর আর শেখার কী আছে। এ তো আমাদের পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষের জীবনের ঘটনা। এর আদ্যোপান্ত তো আমার জানা আছে। তাদের সুখ-দুঃখ বেদনা-যন্ত্রণা এ তো সব আমারই জীবনের ঘটনা। স্টেজে দাঁড়িয়ে একেবারে ফাটাফাটি কাণ্ড করে ছাড়ব। কিন্তু কার্যকালে দেখলাম ব্যাপারটা অত সোজা না।

আমি বললাম : কেন?

সাবিত্রী বললে : ঘটনাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি। প্রথম দিন রিহার্সালে বসে দু-লাইন ডায়লগ বলতে গিয়েই হিমসিম খেয়ে গেলাম। বুকের মধ্যে একটা অনুভূতি ছটফট করছে, কিন্তু মুখে সেটাকে প্রকাশ করতে পারছি না। যে কথাগুলো বলছি সেটা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাচ্ছে। এটা কেন যে হচ্ছে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। তখন কানুদাই আমাকে পথনির্দেশ করে দিলেন।

আমি বললাম : সেটা কী?

সাবিত্রী বললে : কানুদা আমাকে প্রথমেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পথেব হদিশ দিয়েছিলেন। আমার ওই নাজেহাল অবস্থা দেখে উনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, দ্যাখ সাবি, অভিনেত্রী হতে গেলে সবার আগে তোকে নিজের মুখ নিজেকে দেখতে শিখতে হবে।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম : তাই আবার হয় নাকি কানুদা? নিজের মুখ কি নিজে দেখা যায় কখনও?

কানুদা বলেছিলেন : যায় রে যায়। তার জন্যে প্রচণ্ড অনুশীলনের দরকার। আর সেটা যতদিন না পারছিস ততদিন তুই বড় অভিনেত্রী হতে পারবি না।

আমি বলেছিলাম : ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো না কানুদা। আমি তো একজন বড় অভিনেত্রীই হতে চাই কানন দেবীর মতো।

কানুদা বললেন : কারও মতো নয়। তোকে হতে হবে তোর নিজেরই মতো। তুই যখন রিহার্সাল দিস তখন সামনে যারা বসে আছে, মনে কর তারা দর্শক, তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছিস। তোর পাশে দাঁড়িয়ে যারা অভিনয় করছে, তাদের মুখগুলোও দেখতে পাচ্ছিস। কিন্তু তোর নিজের মুখ তো দেখতে পাচ্ছিস না। সেটা দেখতে শিখতে হবে। তুই একটা ডায়লগ বলছিস। সেটা নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিস। কিন্তু সেইসব মুহূর্তে তোর মুখের কী এক্সপ্রেশন হওয়া উচিত, সেটা তোকে নিজেকেই ঠিক করতে হবে। সেই আনন্দ, সেই দুঃখ নিজের মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তোর তৃতীয় নয়ন দিয়ে সেটা তোকে নিজেকেই দেখতে হবে। সেটা যেদিন পারবি, সেদিন বুঝবি তুই কেল্লা ফতে করে দিয়েছিস। তোকে নিয়ে নাচানাচি হবে, লাফালাফি হবে। চারিদিকে তোর জয়জয়কার পড়ে যাবে।

আমি বললাম, সেটা কী করে শিখতে পারব কানুদা?

কানুদা বললেন, সেই টেকনিকটাই তো তোকে ডিরেক্টার শেখাবে। সেটাই হল অভিনয়ের গ্রামার। একটা উদাহরণ দিই শোন। ধর তুই যে চরিত্রটা করছিস সেটা খুব দুঃখের। তুই যদি স্টেজের ওপর কান্নাকাটি করে চোখের জলে বুক ভিজিয়েও ফেলিস তাহলেও দেখবি দর্শকদের চোখে তোর জন্যে এক ফোঁটাও জল আসছে না। তোকে করতে হবে কী, বুকের মধ্যে দুঃখের তীব্র অনুভূতিটা রেখে সেই অদৃশ্য কান্নাটা অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে দর্শকদের মনে পৌঁছে দিতে হবে। দেখবি তোর দুঃখে দর্শকরা কেঁদে ভাসাচ্ছে। ঠিক তেমনি ভেতরের আনন্দটাকেও নিজে না হেসে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই যে হাসি কিংবা কান্না নিয়ন্ত্রণ করার টেকনিক, সেটাই অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শিখতে হবে।

কানুদার এই উপদেশ আমি চিরটাকাল অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি রবিদা। আর কানুদা আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন কী করে অভিনয়ের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। কতটুকু রাখতে হয় আর কতটুকু ছাড়তে হয়, এ সবই কানুদার কাছে শেখা। নাটক আমি অনেকের কাছ থেকেই শিখেছি,

তাঁদের অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কানুদার কাছ থেকে যা পেয়েছি তার তুলনা হয় না। কানুদাই হলেন আমার প্রকৃত নাট্যগুরু। এ কথাটা আমি চিরকাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যাব।

সবিত্রীর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কানুদাকে একজন বড় অভিনেতা হিসেবে জানতাম। যদিও তাঁকে নিয়ে এক সত্যজিৎ রায় আর কখনও কখনও সুশীল মজুমদার ছাড়া আর কেউ তেমন বড় চরিত্র বিশেষ ভাবেননি। একবার একটি ছবিতে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভূমিকা করেছিলেন, এই যা। কিন্তু কানুদা যে এতবড় ট্রেনার ছিলেন সেটা সাবিত্রী না বললে জানতে পারতাম না। জানব কী করে। তাঁকে তো আমাদের প্রফেশনাল স্টেজে নাটকের ডাইরেকশান দিতে দেখিনি আমি। এখন মনে হচ্ছে কানুদার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। ক'জনেরই বা সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে আমাদের দেশে!

যাক কানুদার প্রসঙ্গ ছেড়ে এখন আবার সাবিত্রীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার নাট্যজীবনে কানুদা ছাড়া আর কার কাছে তুমি কৃতজ্ঞ?

সাবিত্রী বললে : সে তো অনেকের কাছেই। তাঁদের সকলের কথা বলতে গেলে তো একটা বিশাল মহাভারত হয়ে যাবে। তবে কানুদা ছাড়া আর একজনের কাছে আমি ভয়ানক ভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন ভানুদা।

আমি বললাম : ভানুদাও কী তোমার ট্রেনার ছিলেন নাকি?

সাবিত্রী বললে . তা নয়। তবে ভানুদা যা করেছেন তার ঋণ কৃতজ্ঞতা জানিয়েও শোধ করা যায় না। তিনিই আমাকে হাতে ধরে নাট্যজগতে এনেছিলেন। এমন কী তাঁরই দৌলতে ফিল্মের নায়িকা হবার চান্স পেয়েছি। তাছাড়া যখনই আমার জীবনে কোন দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে তখন ভানুদাই এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন। আমার জন্যে লড়াই করেছেন। এত স্নেহ আমি বাবা মা আর দিদিরা ছাড়া আর কারও কাছে পাইনি।

আমি বললাম : তোমার প্রতি ভানুদার যে এত স্নেহ তার কারণটা কী?

সাবিত্রী বললে : স্নেহ করবেন না। উনি তো বলতে গেলে আমাকে জন্মাতে দেখেছেন। অতএব স্নেহের পরিমাণ তো একটু বেশি হবেই।

আমি বললাম : ভানুদা তোমাকে জন্মাতে দেখছেন মানে?

সাবিত্রী বললে : না. ঠিক জন্মাতে নয়। তবে ভানুদা যে আমার জন্মের পর ষষ্ঠীপুজোর দিন আমার মুখ দেখে এসেছিলেন সেটা আমি পরে ভানুদার মুখ থেকেই শুনেছি। উনি তো আমার সেজদির আত্মীয় ছিলেন। বোধহয় সেই সুবাদেই দশমহাবিদ্যার বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন আমার ষষ্ঠীপুজোর দিন।

আমি অবাক হয়ে বললাম : 'দশমহাবিদ্যার বাবা'! সেটা আবার কী?

সাবিত্রী হাসতে হাসতে বললে : আমরা তো দশ বোন। তাই আমাদের দেশের ওই অঞ্চলের মানুষজন আমার বাবাকে আদর করে 'দশমহাবিদ্যার বাবা' বলে ডাকতেন। এই ডাকের মধ্যে কোন ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ ছিল না। রসিকতাও নয়। এই ডাকটা ছিল নির্ভেজাল ভালোবাসার।

আমি বললাম : তোমাদের 'নতুন ইহুদি' নাটকটা আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। তবে তোমাদের ওই নাটকটা যখন ছবি হল তখন সেটা দেখেছি। ছবিটা আমার খুব ভালো লেগেছিল।

সাবিত্রী বললে : আমরা যারা ওই নাটকে অভিনয় করেছিলাম, ছবিতেও তারাই করেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কী ছবির চেয়ে নাটকটা আমার বেশি ভালো লেগেছিল।

আমি বললাম : কেন?

সাবিত্রী বললে : নাটকটা করবার সময় আমরা দর্শকদের কাছ থেকে কী তারিফ পেয়েছি তা তোমাকে কী বলব? ছবির দর্শকদের রি-অ্যাকশনটা তো আমরা তেমন করে উপভোগ করতে পাই না, যতটা নাটকে পাই। কাগজে কাগজে প্রচুর প্রশংসা বেরিয়েছিল 'নতুন ইহুদি' নাটকটার। শুনেছি 'নবান্ন' নাটকের সময়েও নাকি এই রকম একটা হইচই হয়েছিল। আমার তো 'নবান্ন' নাটক দেখা হয়নি। সে সুযোগও ছিল না। তাছাড়া তখন আমার বয়সটা এতই কম যে দেখলেও কিছু বুঝতে পারতাম না। তবে একটা কথা ভেবে বড় দুঃখ হয় রবিদা।

আমি বললাম : কী কথা?

সাবিত্রী বললে : 'নবান্ন' নাটক নিয়ে আজও যে পরিমাণ হইচই হয়, 'নতুন ইহুদি' নাটক নিয়ে সেটা হয় না কেন? ওটাও যেমন দুর্ভিক্ষের ওপর একটা ডকুমেন্ট, চাষীদের সংগ্রাম, এটাও তো তেমনি দাঙ্গা আর দেশবিভাগের ওপর একটা ডকুমেন্ট। এটাও তো ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের নাটক। তাহলে?

আমি বললাম : 'নবান্ন' নাটকটা নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাই তার আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। তাছাড়া ওই নাটকটা ছিল গণনাট্য সংঘের। ওটা একটা সুসংহত গোষ্ঠী। একটা পলিটিক্যাল পার্টি ছিল তাদের পেছনে। তোমাদের তো আর তা নয়। এটা একটা বিক্ষিপ্ত প্রয়াস। তাই তেমন হইচই হচ্ছে না। তবে হওয়া উচিত ছিল বলেই আমি মনে করি।

সাবিত্রী ঠোঁট উলটে বললে : কী জানি বাবা! তোমাদের ওসব পলিটিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝি না। ভালো জিনিসের কদর না হলে, পরবর্তীকালের ইতিহাসে তার উল্লেখ না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগে।

আমি বললাম : যাক গে। ওসব কথা ভেবে মন খারাপ না করাই ভালো। তার চেয়ে তুমি কী ভাবে ছায়াছবির নায়িকা হলে সেই কথাটা বলো।

সাবিত্রী বললে : সেটাও তো ভানুদারই দৌলতে। এই উত্তর সারথির রিহার্সাল রুমে বসেই আমার বরাত খুলে গিয়েছিল।

আমি বললাম : একটু ডিটেলে বলো।

সাবিত্রী বললে : তখন 'নতুন ইহুদি'র বেশ কয়েকটা শো হয়ে গেছে। প্রশংসার বন্যায় আমরা সবাই ভেসে যাচ্ছি। এই সময়ে একদিন রিহার্সাল রুমে নিছক আড্ডা দিচ্ছি সবাই। এমন সময় বিনুদা এলেন ওখানে। বিনুদা মানে বিনু বর্ধন ছিলেন আমাদের গ্রুপের একজন সদস্য। তিনি পরিচালক সুধীর মুখার্জির সহকারি ছিলেন। সুধীরদা তখন 'পাশের বাড়ি' ছবিটা করবার তোড়জোড় করছেন। মনের মতো নায়িকা পাচ্ছেন না বলে ছবির কাজে হাত দিতে পারছেন না। বিনুদা রিহার্সাল রুমে বসে সেইসব কথাই বলছিলেন।

হঠাৎ ভানুদা বলে উঠলেন : তরা কি রকম নায়িকার খোঁজ করতাছস্?

বিনুদা বললেন : দেখতে-শুনতে তেমন ভালো না হলেও চলবে। তবে খুব চটপটে আর রসিক হওয়া চাই। ছবিটি সিরিও-কমিক তো!

ভানুদা একবার আড়চোখে আমাকে দেখে নিলেন। তারপর বললেন : হিরোইনের বয়সটা কত সেইটা ক।

বিনুদা বললেন : এই ধরো আঠারো কি উনিশ।

ভানুদা বললেন : ফার্স্টক্লাশ। তুই কটকটিরে লইয়া যা সুধীরদার কাছে।

'কটকটি' নামটা শুনে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। কিছু বললাম না। চুপ করেই রইলাম।

ভানুদা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর বললেন : আরে তদের এই সাবিত্রীরে আমি কটকটি বইলা ডাকি।

বিনুদা বললেন : কেন?

ভানুদা বললেন : দেখস না ও কিরকম মুখ ঝামটা দিয়া কটমট কইরা কথা শুনায়। তগো হিরোইনের জন্যে তো এইরকম একটা কটকটি মাইয়াই দরকার।

বিনুদা বললেন : কিন্তু বয়েসটা যে মিলছে না। বড্ড কম হয়ে যাচ্ছে।

ভানুদা বললেন : মাইয়া মাইনষের বাড় তো তালগাছের মতন। তোদের শুটিং শুরু হতে হতে দেখবি কটকটি গায়ে-গতরে অনেকখানি বেড়ে গেছে। চল, একা তোর দ্বারা হইব না। আমিও যাই সুধীরদার কাছে।

সবাই মিলে গেলাম সুধীরদার কাছে। সুধীরদাও প্রথমে খুঁতখুঁত করছিলেন আমার কম বয়েস আর

রোগা চেহারা দেখে। কিন্তু ভানুদার লম্বা সার্টিফিকেটের পর রাজি হয়ে গেলেন।

ওই 'পাশের বাড়ি' ছবিতে আমাদের উত্তর সারথি গ্রুপেরই জয়জয়কার। ছবিতে আমার হিরো ক্যাবলার চরিত্র করেছিলেন সত্যদা। মানে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ভানুদা করেছিলেন সেকেন্ড লিড। খ্যাংরা কাঠির ওপর আলুর দম। ভানুদার তখন যা চেহারা তাতে ছবির ডায়লগের ওই বিশেষণটা দারুণ খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

সুধীরদা দিন চারেক পরে আমাকে রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে যেতে বললেন। আমার টেস্ট নেওয়া হবে শুনে মনটা আমার আনন্দে নেচে উঠল।

টেস্ট নেবার দিন একটা সুটকেসে কাপড়-চোপড় ভরে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। স্টুডিওতে ঢোকবার সময় আমার যেন গরবে মাটিতে পা পড়ছে না। ফাইনাল সিলেকশান তখনও হয়নি, তাতেই এত গরব। আজ থেকে আমার লাঞ্ছনার দিন শেষ হল। এর আগে এইসব স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরে বেড়িয়েছি একটা এক্সট্রার কাজের জন্যে। কত মুখঝামটা, কত গঞ্জনা সহ্য করেছি। আজ আমার চলাফেরা রাজেন্দ্রাণীর মতো। আজ থেকে আমি কানন দেবীর সমগোত্রীয়। কানন দেবী যেমন একদিন আমার হাতে চকোলেট দিয়ে গাল টিপে আদর করেছিলেন, আমিও তেমনি আগামী দিনের কোন সাবিত্রী চাটুজ্যের হাতে চকোলেট তুলে দেবার অধিকার পেয়ে গেলাম।

কিন্তু ট্রায়াল দিতে গিয়ে বুঝলাম, ছবিতে হিরোইন করার কাজটা এত সহজ নয়। সারাদিন ধরে আমাকে হন হন করে হাঁটানো হল, ছোটানো হল। নানাভাবে ডায়লগ বলানো হল। তারপরে বলা হল আবার পরের দিন আসতে। ডিরেক্টারের গম্ভীর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না আমার কাজ তাঁদের পছন্দ হয়েছে কি না? তবে পরের দিন যখন আসতে বলেছেন তখন মনে হয় আমি পরীক্ষায় পাস করে গেছি।

পরের দিন আমাকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হল। আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তাহলে তো আমি পাস করেছি। না হলে ক্যামেরা নিয়ে শুটিং হবে কেন? স্টিল ফটোগ্রাফারই বা নানা ভঙ্গিতে আমার ছবি নেবে কেন!

তৃতীয় দিন আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হল। বিকেলবেলা দেখলাম সুধীরদা আর প্রোডিউসার দুজনের মুখে হাসি। সুধীরদা বললেন : তোমাকে দিয়েই চলবে।

ও মা! তাহলে এই তিনদিন ধরে আমার পরীক্ষা নেওয়া হল। শুটিং শুরুই হয়নি। যাক গে, শেষ পর্যন্ত যে পাস করতে পেরেছি সেই ঢের। মনটা খুশিতে নেচে উঠল। কাল থেকে আমি বান্ধবীদের কাছে ডাঁট দেখিয়ে বলতে পারব, জানিস আমি কে? আমি হলাম 'পাশের বাড়ি' ছবির হিরোইন।

সত্যিকারের শুটিং শুরু হল দিন সাতেক পরে। প্রথম দিন শুটিং করে বাড়ি ফেরার পর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁ রে সাবি, টাকা-পয়সা কত কী দেবে-টেবে কিছু কথা হল নাকি?

আমি বললাম : না বাবা, সেসব কথা তো কিছু হয়নি।

বাবার কপালে একটু চিন্তার রেখা দেখা গেল। কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন : তুই যেন আগ বাড়িয়ে টাকা-পয়সার কথা বলতে যাস না। মাঝখানে যখন ভানু আছে, সেই সব ঠিক করে দেবে।

কিন্তু টাকা-পয়সা তো অনেক দূর, দিন চারেক পরে ছবির শুটিং-ই বন্ধ হয়ে গেল। শোনা গেল, ছবির ভাগ্য অনিশ্চিত। আর কোনদিন শুটিং হবে কি না সেটাই সন্দেহ।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে গেল। এ ক'দিন আনন্দে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম। সেখান থেকে আমাকে কে যেন রুক্ষ মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলে। প্রচণ্ড কান্না পেয়ে গেল আমার। ভাগ্য আমাকে নিয়ে আর কত ছিনিমিনি খেলবে! বার বার এইভাবে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে!

কোনরকমে চোখের জল সামলে বাড়ি ফিরে এলাম। দুঃসংবাদটা বাবাকে দিলাম। বাবা বললেন : ওসব ছবির কাজ-টাজ ছেড়ে দাও। বড় অনিশ্চিতের ব্যাপার। তার চেয়ে থিয়েটারে চেষ্টা কর। তোমার তো থিয়েটার করে কিছু নামধাম হয়েছে। বড় অভিনেত্রী যদি হতে চাও তাহলে থিয়েটারটাকেই মাধ্যম করে নাও।

সত্যি কথা বলতে কী, বাবা কোনদিন সিনেমা ব্যাপারটাকে সুনজের দেখেননি। আমার দিদি আরতির কাছেও অনেক সিনেমার অফার এসেছিল। বাবা তার সবগুলিকেই নাকচ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি হলাম একটা ভয়ঙ্কর জেদি মেয়ে। এত সহজে হেরে যাওয়া তো আমার চলবে না। আমি বড় অভিনেত্রী হতে চাই। এবং সেটা হতে হবে সিনেমার মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু কে আমাকে সুযোগ দেবে? একবার হিরোইন হিসেবে সিলেক্ট হবার পর আর তো এক্সট্রার দলে লাইন দেওয়া চলে না। সে বড় অসম্মানের ব্যাপার। কোন উপায় না দেখে আড়ালে বসে চোখের জল ফেলি। রাতের ঘুম চলে যায়। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়।

আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তখন চরমে। আমরা যে দুটো ঘরে এতগুলো লোক কোনরকমে মাথা গুঁজে থাকতাম, উপায়ান্তর না দেখে তারই একটা ঘর বাবা ভাড়া দিয়ে দিলেন। কিন্তু ক'টাকাই বা পাওয়া যেত তা থেকে! কোনরকমে অনশনে অর্ধাশনে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

এমন সময় ভাগ্যদেবী আবার একবাব মুখ তুলে চাইলেন। প্রোডাকশন থেকে খবর দিয়ে গেল, 'পাশের বাড়ি' ছবির শুটিং আবার শুরু হচ্ছে। তবে এবার আর রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে নয়। শুটিং হবে দক্ষিণেশ্বরে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে। অনেক বড় বড় ছবির শুটিং হয়েছে ওই স্টুডিওতে। শৈলজানন্দের সুপারহিট 'শহর থেকে দূরে'-র শুটিং ওখানেই হয়েছিল। জাঁ রেনোয়ার বিখ্যাত 'দ্য রিভার' ছবির শুটিংও ওখানে হয়েছে। স্টুডিওটি এখন আর নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ওই স্টুডিও কেন, কলকাতার বহু স্টুডিওই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। বাংলা ছবির এখন বড়ই দুরবস্থা।

এবারের শুটিং-এ প্রথম দিনই আমার পারিশ্রমিক ঠিক হয়ে গেল। মাসিক দুশো টাকা। এবং সেইদিনই ভাউচার সই করিয়ে আমার হাতে অগ্রিম একশো টাকা ধরিয়ে দেওয়া হল।

একশো টাকা! এ যে অনেক টাকা। জীবনে কখনও অতগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পাইনি। সেই পঞ্চাশের দশকের একশো টাকার দাম আজকের তুলনায় অনেক গুণ বেশি।

সেদিন ভাল করে কাজে মন দিতে পারলাম না। কেবলই চিন্তা কখন বাড়ি ফিরে যাব। বাবার হাতে টাকাগুলো তুলে দিতে পারব। টাকা হাতে পেয়ে বাবার আনন্দে ঝলমল করা মুখটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম।

শুটিং প্যাক-আপ হবার পর যেন হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরে গেলাম। দৌড়ে গিয়ে বাবার হাতে একশো টাকার নোটটা ধরিয়ে দিলাম।

টাকাটা হাতে পেয়ে বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন। তাঁব বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে গেল। বাবার মতো ওইরকম শক্ত মানুষের চোখে জল দেখে আমিও আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

'পাশের বাড়ি' ছবির নায়িকা হিসেবে অগ্রিম পাওয়া একশো টাকার নোটখানা বাবার হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে এমন মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা ঘটবে, এটা সাবিত্রী কল্পনাও করেনি। নোটখানা হতে নিয়ে জলভরা চোখে বাবা বললেন : সাবি রে, আমার সংসারে অনেক অভাব, অনেক অনটন, কিন্তু তোর এই টাকা দিয়ে আমি তোর নামে একটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি। সেটাই হবে তোর মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আমি আশীর্বাদ করছি মা লক্ষ্মীর দয়ার এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিনে দিনে উপচে পড়বে। তুই জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারবি।

তা বাবার সেই আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ওই 'পাশের বাড়ি' ছবির পর থেকে সাবিত্রীর জীবনে ছবির প্লাবন বয়ে গিয়েছিল।

'পাশের বাড়ি' ছবি যে এমন ভাবে হিট করবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। বোধহয় ওই ছবির নির্মাতারাও নয়। আগাগোড়া সব নতুন মুখ, সিরিও-কমিক ছবি, সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরিও তখন খ্যাতির শিখরে ওঠেননি, তা সত্ত্বেও ছবি সুপার সুপার হিট। প্রয়াত গায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও এই ছবির একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর গাওয়া গানগুলি তো বাজার মাতিয়ে দিয়েছিল। ফলে সাবিত্রীর ভাগ্যটাও খুলে দেল। আমাদের দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রেওয়াজ আছে। নায়ক কিংবা নায়িকা যত ভালো অভিনয়ই করুক না কেন, ছবি হিট না করলে তাঁর কোনও

ডিম্যান্ড তৈরি হয় না। নতুন ছবিতে ডাক পড়ে না। আর পর পর দুটো ছবি যদি ফ্লপ করে তাহলে 'অপয়া' বলে বদনাম কিনতে হয়। যেমন হয়েছিল উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে। একমাত্র তিনিই লড়াই করে শেষ পর্যন্ত জিতেছিলেন। দারুণ ভাবে জিতেছিলেন। নইলে কত শক্তিমান শিল্পী যে প্রথম ছবি ফ্লপ হবার দরুন ছবির লাইন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যায়।

যাক সে কথা। আবার সাবিত্রীর কথাতেই ফিরে আসি। 'পাশের বাড়ি' হিট করার পর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সাবিত্রীর কদর বেড়ে গেল। যাঁরা এতদিন ওরা কেমন ভাবে বেঁচে আছে, কী খেয়ে বেঁচে আছে, সে খবর নেবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেননি, তাঁরা এখন ঘন ঘন সাবিত্রীদের ওই এক কুঠুরির সংসারে হানা দিতে লাগলেন। প্রতিদিন এত অতিথি অভ্যাগতর আগমনে নানা সমস্যা দেখা দিতে লাগল। অতিথিরা বসবেন দাঁড়াবেন কোথায়?

এই সময় সাবিত্রীর বাবা একটা বুদ্ধির কাজ করলেন। ছোট্ট একফালি যে বারান্দাটা ছিল, তাতে একটা পার্টিশান তুলে ড্রইংরুম বানিয়ে ফেললেন। ড্রইংরুম বলতে যে ছবিটা চোখের সামন ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে সাবিত্রীদের ড্রইংরুমের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে একটা গোল টেবিল কিনে আনা হল। বাড়িতে যে চারখানা চেয়ার ছিল, সেগুলির স্থান হল টেবিলের চারদিকে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, এই গোল টেবিলটাকে সাবিত্রী খুব পয়মন্ত বলে মনে করে। অনেক বড় বড় কন্ট্রাক্ট সই করেছে ওই টেবিলের ওপর রেখে। তাই আজও সেই গোল টেবিলটাকে সযত্নে রেখে দিয়েছে তার নিউ আলিপুরের বাড়িতে। তার প্রথম জীবনের সুখের স্মারক সেই জুতো জোড়াটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই টেবিলটাকে সাবিত্রী নষ্ট করতে রাজি নয়।

ড্রইংরুম বানানোর আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ফিল্ম লাইনের লোকদের আনাগোনার কারণে। ফিল্ম লাইনের লোক বলতে দু-চারজন প্রোডাকশন ম্যানেজার আর কিছু টাউট। তারা এসে ফালতু গল্প করত, চা খেত আর বড় বড় বুকনি ঝাড়ত। এমন সব গল্প ফাঁদত যাতে মনে হত তারা একবার মুখের কথাটি খসালেই প্রোডিউসররা সাবিত্রীকে লুফে নেবে তাদের ছবিতে। এই যে সন্ধ্যারানী আজ সন্ধ্যারানী হয়েছে, এ নাকি তাদেরই দৌলতে।

সাবিত্রী এইসব লোকের ধাপ্পাবাজি বুঝতে পারত, কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলতে পারত না। এদের চটালে মুশকিল আছে। এরা উপকার করতে পারুক আর না পারুক অপকারের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। হয়তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে রটিয়ে দেবে সাবিত্রী খুব মুখরা, অভদ্র, ফিল্ম লাইনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কথা বলে, অথবা একটা ছবি হিট করার পরই এমন টাকা চাইছে যা কানন দেবীর পারিশ্রমিককেও হার মানিয়ে দেয়।

সুতরাং দিনের পর দিন সাবিত্রীকে মুখ তেতো করে এইসব মানুষের গালগল্প শুনতে হত, আর ক্রমাগত চা-বিস্কুটের যোগান দিয়ে যেতে হত। আত্মীয়স্বজন এলে তাদের তবু নিজেদের বিছানায় বসতে দেওয়া যায়। কিন্তু এইসব মানুষগুলিকে তো আর সেখানে বসানো যায় না। এদের জন্যেই ড্রইংরুমের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

তা একদিন সেই ড্রইংরুমে সত্যি সত্যিই লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো পড়ল। তিনি এলেন আশার আলো দুলিয়ে, সুখের সৌরভ ছড়িয়ে। তাঁর স্নিগ্ধ রূপের ছটায় ওই একফালি বারান্দা আলোকিত হয়ে উঠল। সেই লক্ষ্মীর নাম সুনন্দা দেবী। সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার দিনের এক অসাধারণ অভিনেত্রী।

এই প্রজন্মের মানুষ হয়তো সুনন্দাদির নামই শোনেননি। তাঁর কোনও ছবিই হয়তো দেখেননি। কিন্তু আমাদের আমলে তিনি ছিলেন ছায়াছবির একজন সেরা অভিনেত্রী। নিউ থিয়েটার্সের 'কাশীনাথ' ছবি দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। তারপর থেকে নিউ থিয়েটার্স এবং তার বাইরে যত ছবি সুনন্দাদি করেছেন, তার প্রতিটিতেই তিনি দর্শককে বিমুগ্ধ করেছেন। এই তো দিন চারেক আগেই নন্দনে দাঁড়িয়ে নিউ থিয়েটার্সের বর্তমান কর্ণধার দিলীপ সরকার মশাইয়ের সঙ্গে সুনন্দাদির সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তাঁর কাছেই শুনলাম উনি 'কাশীনাথ' ছবির একটা প্রিন্ট খুঁজে পেয়েছেন। তার ক্যাসেট করে দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছেন। এ এক অতীব সুসংবাদ। দর্শকরা দূরদর্শনে ওই 'কাশীনাথ' ছবিটি দেখলে বুঝতে পারবেন সুনন্দাদি কত বড় মাপের অভিনেত্রী ছিলেন। আমারও ইচ্ছে আছে সুনন্দাদিকে নিয়ে কিছু

লিখবার। বেশ কিছু প্রবীণ পাঠক পত্র মারফত আমাকে সে অনুরোধ জানিয়েছেন। সুনন্দাদি তো কেবল একজন বড় অভিনেত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সার্থক প্রযোজকও। তাছাড়া মানুষ হিসেবে অতুলনীয়া। ওরকম স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব আর দরদী মন আমি খুব কমই দেখেছি।

সেই সুনন্দাদি একদিন এসে হাজির হলেন সাবিত্রীদের বাড়িতে। সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। ওঁকে দেখে তো সাবিত্রী ভীষণ ঘাবড়ে গেল। অতবড় একজন অভিনেত্রী তাদের এই গরিব বাড়িতে। সাবিত্রী কী করবে ভেবে পেল না। কোথায় বসাবে, কী ভাবে আপ্যায়ন করবে, সেটা ঠিক করতে পারল না।

সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন সুনন্দাদি নিজেই। তিনি সোজা একেবারে সাবিত্রীদের বেডরুমে ঢুকে গেলেন। সাবিত্রীর বাবা আর মায়ের সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্তা শুরু করলেন, যেন তিনি তাঁদের কতদিনের পরিচিত। কত আপনার জন। ওঁদের সব আড়ষ্টতা ভেঙে দিলেন এক মুহূর্তে।

তারপর সুনন্দাদি সাবিত্রীকে ডেকে নিজের কাছে বসালেন। বললেন : এবার যেজন্য এসেছি সেই কাজের কথাটা বলি।

সাবিত্রীর বাবা লুঙ্গির ওপর জামাটা পরে নিয়ে বেরোচ্ছিলেন মাননীয়া অতিথিকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে। সুনন্দাদি বুঝতে পেরে বাধা দিলেন তাঁকে। বললেন : আমাকে খাতির করে মিষ্টির প্লেট ধরে দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। ধরে নিন না আমিও আপনাদের আর একটি মেয়ে। তাছাড়া আমি তো বাইরে কিছু খাই না। মিছিমিছি কতকগুলো পয়সা নষ্ট হবে! তার চেয়ে আপনারা আপনাদের গেরস্থালীর কাজে মন দিন। আমি সাবিত্রীর সঙ্গে দুটো কাজের কথা বলে নিই।

এই বলে সুনন্দাদি সাবিত্রীর হাত ধরে বাইরের সেই সো-কল্ড ড্রইংরুমে এসে বসলেন। বললেন : আমি 'পাশের বাড়ি' ছবিতে তোমার অভিনয় দেখেছি সাবিত্রী। আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি অভিনয় জগতে আনকোরা নতুন। কিন্তু কী সাবলীল তোমার অভিনয়। দারুণ ফ্রি। নতুন বলে মনেই হয় না একেবারে। আমার ধারণা ভাবিষ্যতে তুমি একজন বড় অভিনেত্রী হবে। যদিও আমি অভিনয়ের বিশেষ কিছুই বুঝি না। এখনও শিক্ষানবিশ। তবু সেই সামান্য জ্ঞান নিয়েই তোমার সম্পর্কে এই কথাটা বলতে পারি।

সাবিত্রী চমকে উঠল সুনন্দা দেবীর কথা শুনে। চমকানিটা তার অভিনয়ের প্রশংসা করছেন বলে নয়। চমকে উঠল এতবড় একজন অভিনেত্রী নিজেকে এখনও শিক্ষানবিশ বলছেন, এই কথাটা শুনে।

বাবার মুখে সাবিত্রী একটা কথা প্রায়ই শোনে। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। সাবিত্রী শুনেছে সুনন্দা দেবী একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। সত্যিকারের শিক্ষিত যাঁরা তাঁরা বোধহয় এইরকমই বিনয়ী হন। সাবিত্রীও এখন থেকে বিনয়ী হবার চেষ্টা করবে। দারিদ্র্যের পীড়নে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেনি ঠিকই। তা বলে শিক্ষিত হতে বাধা কোথায়। স্কুলের লেখাপড়াটাই তো সব নয়। আসল লেখাপড়া তো হয় জীবনের পাঠশালায়।

তবু সাবিত্রী মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করল সুনন্দা দেবীর বক্তব্যের। সুনন্দাদির সহজ সরল সুন্দর ব্যবহারে সাবিত্রীর সব আড়ষ্টতা তখন কেটে গেছে। বললে : কী যে বলেন সুনন্দাদি। আপনি নাকি শিক্ষানবিশ। কত বড় অভিনেত্রী আপনি। আমি তো আপনার অভিনয়ের একজন অন্ধ ভক্ত।

সুনন্দাদি সাবিত্রীর কথা শুনে একটু হাসলেন। বললেন : সেটা তুমি মনে করতে পারো কিন্তু আমি পারি না। তোমাকে একটা কথা বলি সাবিত্রী। তুমি তো একদিন বড় অভিনেত্রী হবে। সেইসব দিনগুলিতে সকলের কাছে যত প্রশংসাই পাও না কেন, তুমি নিজে বিশ্বাস করবে, মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, তোমার অভিনয় মোটেই ভালো হয়নি। এর থেকে অনেক ভালো অভিনয় তুমি করতে পারতে। নইলে তুমি যদি ভেবে নাও যে সবাই যখন তোমার অভিনয়ের প্রশংসা করছে তখন তুমি একটা কেউকেটা, সেদিন থেকে জানবে তোমার পতন শুরু হয়ে গেল। আমার এই কথাটা মনে রেখো। ভবিষ্যতে উপকার হবে।

সাবিত্রী মাথাটা নিচু করে বললে : আপনার কথা চিরকাল মনে থাকবে সুনন্দাদি। কোনদিন ভুলব না।

সুনন্দাদি সাবিত্রীর কথা শুনে একটু হাসলেন। আদর করে সাবিত্রীকে বুকে টেনে নিলেন। তারপর

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন : পাগলি মেয়ে! শোনো এবারে কাজের কথা বলি। আমি পর পর দুটো ছবি প্রোডিউস করছি। প্রথম ছবিটার নাম 'শুভদা'। শরৎচন্দ্রের কাহিনী। তোমাকে তার নায়িকা করতে হবে। দ্বিতীয় ছবিরও নায়িকা তুমিই হবে। সে ছবিটার নাম 'কাজরী'। দুটো ছবিই ডাইরেকশান দেবেন বেণুবাবু। মানে নীরেন লাহিড়ি। তোমার কোনও আপত্তি নেই তো সাবিত্রী?

সাবিত্রী বললে : আপত্তি কী বলছেন সুনন্দাদি! এ তো আমার সৌভাগ্য!

সুনন্দাদি বললেন : কিন্তু একটা কথা আছে। এ দুটো ছবির একটাও কিন্তু হাসির ছবি নয়। তোমাকে নায়িকা করতে চাই শুনে অনেকে আমাকে নিষেধ করছে। তাবা বলছে, হাসির ছবিতে তুমি ফাটাফাটি অ্যাকটিং করেছ বটে, কিন্তু এসব সিরিয়াস ছবিতে পারবে না। এতে অনেক চোখের জল ফেলতে হবে। সেটা তোমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি তাদের কারও কথা শুনিনি। আমি বলেছি, তুমি নিশ্চয় পারবে। তুমি পারবে তো আমার মুখ রক্ষা করতে?

সুনন্দাদির কথা শুনে মনে মনে হাসল সাবিত্রী। বিগত কয়েকটা বছর চোখের জল যাদের নিত্যসঙ্গী তেমন কোনও মেয়ের পক্ষে অভিনয় করতে গিয়ে চোখের জল ফেলাটা এত শক্ত নাকি! মুখে বলল : আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন সুনন্দাদি, আমি যেন আপনার চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার মতো অভিনয় করতে পারি।

সাবিত্রীর কথায় বাধা দিয়ে বললাম : সেটা তো তুমি পেরেছিলে সাবিত্রী। দর্শকরা তো বটেই, 'শুভদা' ছবি দেখে সাংবাদিকরাও তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

সাবিত্রী বললে : তার সব ক্রেডিটটা কিন্তু আমার নয়। সিনেমার অ্যাকটিং যে কী জিনিস সেটা আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন সুনন্দাদিই। কানুদা যেমন আমার নাট্য জীবনের গুরু, সুনন্দাদি তেমনি আমার সিনেমা জীবনের গুরু।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

সাবিত্রী বললে : সুনন্দাদিই প্রথম আমাকে চরিত্র বুঝতে শিখিয়েছিলেন। শরৎবাবুর একখানা বই আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এর মধ্যে থেকে 'শুভদা' গল্পটা মন দিয়ে পড়। তিন-চারবার করে পড়বে। তাহলেই বুঝতে পারবে শুভদা চরিত্রের বিশেষত্ব কী! সত্যি কথা বলতে কী রবিদা, সুনন্দাদিই আমার জীবনের একটা দিকের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে তো গল্প উপন্যাস পড়ার আমার কোনও অভ্যেস ছিল না। সুনন্দাদির দৌলতেই ওই অভ্যেসটা হয়ে গিয়েছিল। এখন তো আমি গল্প-উপন্যাস না পড়ে একটা দিনও থাকতে পারি না।

আমি বললাম : কিন্তু শুভদার চরিত্রের ওই যে দুঃখটা, সেটা তো তোমাকে অ্যাকটিং-এর মধ্যে দিয়ে আনতে হয়েছিল। তাহলে তোমার কোনও ক্রেডিট নেই বলছ কেন?

সাবিত্রী বললে : আমার ব্যক্তিগত জীবনেও তো তখন দুঃখের সঙ্গে সহাবস্থান চলছে। কাজেই দুঃখের যন্ত্রণাটা তো আমার ভেতরেই ছিল। সুনন্দাদি আর পরিচালক বেণুদা সেটাকেই উসকে দিয়েছিলেন। তবে সুনন্দাদি আরও একটা ব্যাপার যা করেছিলেন তার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না।

আমি বললাম : সেটা কী?

সাবিত্রী বললে : আমার একটা খুব বদ অভ্যেস ছিল। কথায় কথায় ভুরু দুটো কুঁচকে ফেলতাম। আর ঠোঁট টিপে থাকতাম। থিয়েটারে ওটা চলে যেত। কিন্তু সিনেমায় ক্যামেরার চোখে তো ওটা ভয়ানক ভাবে ধরা পড়ে যেত। তাই সুনন্দাদি সব সময়ে আমার পেছনে লেগে থেকে ওই মুদ্রাদোষগুলো ছাড়িয়ে দিলেন। সেটা না হলে এই যে সারা জীবন ধরে এত সব বিচিত্র অভিনয় করেছি, তা তো আর করতে পারতাম না। এই যে আজ আমি সাবিত্রী হয়েছি তার পেছনে সুনন্দাদির অবদান যে কতখানি তা তো আমি ভুলতে পারব না। তিনি আমাকে ধরে ধরে সিনেমার উপযোগী হাঁটা-চলা পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। সুনন্দাদি ওয়জ এ গ্রেট লেডি! তাঁর পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত আমাকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। সুনন্দাদি আর তাঁর স্বামী সুধীর জামাইবাবুকে আমি আমার নিজের দিদি-জামাইবাবু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না। সেসব আমার একটা বড় সুখের দিন গেছে রবিদা! সেই সুনন্দাদি যখন অকালে চলে গেলেন তখন তো আমি আছাড়িপিছাড়ি করে কেঁদেছিলাম। আমাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে

গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ির সকলে।

আমি বললাম : তুমি কেবলি দুঃখের কথাটা বড় করে বলো সাবিত্রী। এ তোমার এক ধরনের দুঃখবিলাস।

সাবিত্রী বললে : ঠিক বলেছেন রবিদা! দুঃখটা আমার কাছে এক ধরনের বিলাসই বটে। ওটা আমার গর্ব, আমার অহঙ্কার। এক ধরনের অলঙ্কারও বলতে পারো।

আমি বললাম : এবারে একটু সুখের কথা বল। দু-একটা অনন্দের স্মৃতি রোমন্থন কর।

সাবিত্রী বললে : আনন্দের কথা বলতে গেলে আমার প্রথমেই 'শুভদা' ছবিব মহরত দৃশ্যের কথাটা মনে পড়ে। এর আগে 'পাশের বাড়ি' ছবিতে যখন অভিনয় করেছি তখন যেন একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করেছি। শুটিং যখন করেছি তখন আশেপাশে কোনও তরঙ্গ ওঠেনি। সেটা উঠেছিল ছবি রিলিজের পর। কিন্তু 'শুভদা' ছবির প্রথম দিনের শুটিং-এই যে ঘটনাটা ঘটল তাতে আমার আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম : সেটা বলো। ওই ধরনের কথাই তো শুনতে চাইছি।

সাবিত্রী বললে : 'শুভদা'-র মহরত শটটা আমাকে নিয়েই হয়েছিল। ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছিলেন নিউ থিয়েটার্সের সেই বিখ্যাত পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র, যাঁর তোলা 'প্রতিশ্রুতি' ছবিটা দেখে আমি সেই বালিকা বয়েসেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। 'শুভদা' ছবির সেদিনের শটটার মধ্যেও ভেঙেপড়া কান্না ছিল। আর ছিল চার লাইনের ডায়লগ। বেণুদা আমাকে খুব যত্ন করে বুঝিয়ে রিহার্সাল দিয়ে যখন শট্ টেক্ করতে বললেন, তখন হাসির ছবি 'পাশের বাড়ি'-র নায়িকা সাবিত্রী যেন একেবারে অন্য মানুষ। আমি যেন এক মুহূর্তেই শরৎচন্দ্রের বইয়ের শুভদা হয়ে গেলাম।

শটটা শেষ হতেই হেমবাবু দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। পরিচালক নীরেন লাহিড়িকে বললেন : এ মেয়েটিকে কোথায় পেলে বেণু! এ যে টেরিফিক অভিনয় করে!

তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রেখে কত প্রশংসা করলেন। হাসির ছবির নায়িকা কান্নার রোলেও পাস মার্ক পেলাম বলে আমার তখন কী আনন্দ। আনন্দের চোটে চোখে জল এসে গেল।

সাবিত্রীকে ধমক দিয়ে আমি বললাম : আবার চোখে জল। তুমি এত অনায়াসে চোখে জল আনো কী করে বলো তো সাবিত্রী?

সাবিত্রী বললে : তাহলে তোমাকে আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি রবিদা। কোনও দুঃখের দৃশ্যে অভিনয় করতে গেলে আমার জীবনের ছোটবেলার সেই ঘটনাটার কথা দারুণভাবে মনে পড়ে যায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটায় মোচড় দিতে থাকে। তীব্র বেদনায় আমার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। সে ঘটনাটা ঘটেছিল আমার সেই আট বছর বয়সে।

ছায়াছবির শুটিং-এর সময় কিংবা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার সময় সাবিত্রী চ্যাটার্জি এই যে মুহূর্তের মধ্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, এটা আমার কাছে খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। এজন্যে কোনদিনই তার চোখে গ্লিসারিন দেবার দরকার হয়নি। কী কায়দায় যে সাবিত্রী ওভাবে চোখে জল এনে ফেলে তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে যে করুণ এবং মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনলাম, তাতে আমার মতো কঠিন চরিত্রের মানুষের চোখ দুটো জলে ভরে গেল। সেই মর্মন্তুদ কাহিনীটা সাবিত্রীর মুখ থেকেই শোনা যাক।

সাবিত্রী বললে : আমার বাবা যেমন সৌখিন মানুষ ছিলেন, তেমনি ছিলেন আমোদপ্রিয়। গান-বাজনা-অভিনয় এইসব দারুণ ভালোবাসতেন। আমাদের বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। হারমোনিয়াম বাঁয়া-তবলা ইত্যাদি সবই ছিল। তার ওপর মাঝে মাঝে বাড়িতে স্টেজ বেঁধে বাবা আমাদের দিদিদের দিয়ে যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদি করাতেন।

সেবার দুর্গা পুজোর আগে বাবা ঠিক করলেন 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা করাবেন দিদিদের দিয়ে। জোর কদমে রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। দিদিরা পার্ট মুখস্থ করতে লাগল। কেবল আমিই বাদ। আমার তখন আট বছর মাত্র বয়েস। ওই বয়েসের কোনও চরিত্র 'নিমাই সন্ন্যাস' পালায় ছিল না। পার্ট পেলাম না

বলে আমার কোনও দুঃখ নেই। দিদিরা সব প্লে করবে, তাতেই আমার আনন্দ।

হঠাৎ বাবা ঠিক করলেন, এবার পুজোর সময়টা আমরা কমলাপুরে থাকব না, দেশের বাড়িতে কাটাব। আমাদের কনকসারের দেশের বাড়িতে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হত। বাবা বললেন : এবারের এই 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা দেশের বাড়িতে হবে। '

তাই শুনে আমার কী আনন্দ। জ্ঞান হবার পর থেকে কখনও দেশের বাড়িতে পুজো দেখিনি। জোর কদমে আমাদের গোছগাছ শুরু হয়ে গেল।

পঞ্চমীর দিন আমরা কনকসারে দেশের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের পেয়ে জ্যাঠামশাইয়ের সে কী আনন্দ। ওখানে যাওয়ামাত্র আমি একজন বন্ধু পেয়ে গেলাম। সে হল আমার জ্যাঠতুতো বোন কণা। আমারই বয়সি হবে। কী মিষ্টি দেখতে। দুই বন্ধুতে মিলে আমরা হৈ-চৈ করে বেড়াতে লাগলাম। দিদিরা ব্যস্ত হয়ে রইল তাদের রিহার্সাল নিয়ে।

সপ্তমীর দিন 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা হল। সারা রাত জেগে আমি আর কণা বসে বসে দিদিদের অভিনয় দেখলাম। পালা যখন শেষ হল তখন ভোর হয়ে গেছে। আমি আর কণা দু'জনে দুটো ফুলের সাজি নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে ফুল তুলতে বেরোলাম। ওই ফুলের নেশায় কখন একটা সময়ে দেখলাম আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

আমি যখন ফুল তুলে বাড়িতে ফিরলাম তখনও কণা ফেরেনি। মনে মনে একটু হিংসে হল। কণা নিশ্চয় এতক্ষণ ধরে আমার থেকে অনেক বেশি ফুল তুলে ফেলেছে। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, কণা ফিরলে ওর সঙ্গে আর কথা বলব না। আড়ি করে দেব।

সকাল সাতটা থেকে মহাষ্টমীর পুজো শুরু হয়ে গেছে। আটটা বাজল, ন'টা বাজল, তখনও কণার ফেরার নাম নেই। মনে মনে ভাবলাম মেয়েটা ভারি বোকা তো! পুজো শেষ হয়ে গেল আর ফুল এনে কী হবে!

বেলা দশটা পর্যন্ত কণা ফিরল না দেখে সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কণার কথা। আমরা দুজনে যে একসঙ্গে ফুল তুলতে বেরিয়েছিলাম সেটা তো সবাই জানে। আমি বললাম : কণা কোথায় তা তো বলতে পারব না। ও তো ফুল তুলতে তুলতে অন্য দিকে চলে গেল। তারপর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি তো ভেবেছিলাম, ও আমার আগেই বাড়ি ফিরে এসেছে।

এত বেলা পর্যন্ত কণা ফিরছে না দেখে সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। জ্যাঠামশাই বললেন : দেখ গে যাও, পাড়ার কারও বাড়িতে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে।

বেলা যখন এগারোটা তখন কণাকে খোঁজবার জন্যে তিন-চারজন লোক বেরিয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক পরে তাদেরই একজন এসে খবর দিলে, খিড়কি পুকুরের পাড়ে কণার কাপড়-জামা পড়ে আছে। কিন্তু কণা সেখানে নেই।

আমি আর কণা দু'জনেই সেদিন শাড়ি পরে বেরিয়েছিলাম ফুল তুলতে। খবরটা পেয়ে সবাই ছুটল খিড়কি পুকুরের দিকে। আমিও ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম পুকুরের পাড়ে কণার পরনের ডুরে শাড়ি আর লাল রঙের জামাটা পড়ে আছে। কণা নেই।

কণার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু হল। কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন তিন-চার জন সেই কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরটায় নেমে পড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কণার দেহটা পুকুরের জল থেকে তুলে আনা হল। তখন সেটা নিথর, নিস্পন্দ।

কণার সেই নিথর দেহটা যখন জল থেকে তুলে মা দুর্গার পায়ের কাছে রাখা হল, তখন মহাষ্টমীর সন্ধিপুজোও শেষ। কণার সেই দেহটার ওপরে আছড়ে পড়ে জ্যাঠামশাই চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন : আমার প্রতিমা চিরকালের মতো বিসর্জন হয়ে গেল।

তারপর কণার দেহটাকে জড়িয়ে ধরে সে কী আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না জ্যাঠামশাইয়ের। আর আমি? সেই আট বছর বয়েসে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, শোক কী জিনিস। কণার জন্যে তখন আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন উথাল পাথাল করছে। অসম্ভব একটা যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে দু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অঝোর ধারায় অশ্রু।

সাবিত্রীর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : 'শুভদা' ছবির মহরতে তোমার চোখে যে জল এসেছিল, সেটা কী ওই কণার মৃত্যুর কথা ভেবে?

সাবিত্রী বললে : ঠিক ধরেছেন রবিদা। আমি যখন শুনলাম ওই দৃশ্যে আমার চোখে জল আনতে হবে তখন সবার আগে কণার কথাটাই মনে এসেছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল আপনা থেকেই।

আমি বললাম : এখনও কণার কথা মনে করে চোখে জল আনতে হয় তোমাকে?

সাবিত্রী বললে : না রবিদা। এখন যে চরিত্রে দুঃখের ব্যাপার থাকে সেখানে আপনা থেকেই চোখে জল এসে যায়। এখন কাঁদতে বললেই কেঁদে ফেলতে পারি। হাসতে বললে বিনা কারণেই হেসে ফেলতে পারি। অভিনয়টা এখন আমার কাছে জলভাতের মতো হয়ে গেছে।

আমি বললাম : সে কী। চরিত্র নিয়ে ভাবতে হয় না তোমাকে?

সাবিত্রী বললে : তেমন করে ভাববার দবকার হয় না। আমি যখন কোন বই পড়ি, তার কোনও একটা চরিত্র যেন আমি নিজেই হয়ে যাই। তার সুখ দুঃখ সব আমার নিজের হয়ে যায়। তেমনি যখন আমাকে কোন স্ক্রিপ্ট শোনানো হয়, তখন ভেতরে ভেতরে চরিত্রটা আমার মধ্যে কাজ করতে থাকে। আমি যেন তখন মনেপ্রাণে সেই চরিত্রটাই হয়ে যাই। এটা কেন হয়, কেমন করে হয়, তা আমি জানি না। মাঝে মাঝে জোর করে ভাবতে চেষ্টা করি, না, আমি তো সাবিত্রী চ্যাটার্জি। কিন্তু কিছুতেই সেটা সম্ভব হয় না। আমার ভেতর থেকে আর একটা আমি বেরিয়ে এসে সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে ঘাড় ধরে বার করে দেয়। আর কোন অভিনেত্রীর এটা হয় কিনা জানি না, কিন্তু আমার হয়।

বুঝতে পারলাম সাবিত্রী খুবই সেনসেটিভ। অভিনয়ের একটা সহজাত ব্যাপার ওর মধ্যে আছে। যে কারণে এত বিভিন্ন ধরনের চরিত্র ও সাকসেসফুলি করতে পেরেছে। আমি তো ওকে কোন চরিত্রে ফেইল্ করতে দেখিনি।

যাই হোক্ আবার সাবিত্রীর ছবির কথাতেই ফিরে আসি। 'শুভদা'-র পব সাবিত্রী সুনন্দাদিদের 'কাজরী' ছবির নায়িকা হয়েছিল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ওই ছবিতে সুচিত্রা সেনও অভিনয় করেছিলেন। তবে তিনি ছিলেন পার্শ্ব চরিত্রে।

'শুভদা' ছবিতে কাজ করতে গিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে আর একজন মহিলার আলাপ হয়েছিল। তিনিও সাবিত্রীকে ঠিক নিজের ছোট বোনের মতোই কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন মঞ্জু দে। মঞ্জুদিকে আমি একজন বড়ো মাপের অভিনেত্রী বলে মনে করি। মঞ্জুদি ওই 'শুভদা' ছবিতে ছোট্ট একটা রোল করেছিলেন। এক বাঈজির ভূমিকায়। সাবিত্রীকে তিনি কী চোখে দেখেছিলেন কে জানে। তপন সিংহের 'উপহার' ছবিতে সাবিত্রী যে নায়িকা করতে পেরেছিল, সেটা মঞ্জুদিরই চেষ্টায়। মঞ্জুদি তখন তপনবাবুর ছবির সর্বেসর্বা।

সাবিত্রী বললে : 'উপহার' ছবি করার সময় আমি খুব রোগা ছিলাম। তপনদা বললেন, এত রোগা নায়িকা তো চলবে না। তখন মঞ্জুদি বললেন, ওকে মোটা করার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তারপর মঞ্জুদি কী করলেন জানেন রবিদা! প্রতিদিন ভোরবেলা গাড়ি করে আমাদের বাড়িতে চলে আসতেন। আমাকে জোর করে ঘুম থেকে তুলতেন। তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে আমাকে ছেড়ে দিতেন। ঘড়ি ধরে একটি ঘণ্টা আমাকে রোজ হন হন করে হাঁটতে হতো। পুরো দু'মাস এইভাবে করিয়েছিলেন। তারপর আমি একদিন অবাক হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার গালগুলো বেশ পুরুষ্টু হয়ে গেছে, সারা শরীরে একটা ঢলো ঢলো লাবণ্য।

মঞ্জুদির সঙ্গে সেই যে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেটা ওঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। মঞ্জুদির শেষ জীবনটা কী মর্মান্তিক ভাবুন তো! অতবড় একজন শিল্পী, অত শিক্ষাদীক্ষা, শেষ জীবনটা প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে কাটিয়ে গেলেন। ধারে-দেনায় অসুখে-বিসুখে একেবারে জেরবার হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলেছিলাম। ওটা ছিল আমার আত্মীয়বিয়োগের মতোই একটা ঘটনা।

আমি বললাম : মঞ্জুদি ছাড়া আর কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে তোমার ওইরকম আত্মিক সম্পর্ক ছিল সাবিত্রী?

সাবিত্রী বললে : সম্পর্ক তো আমার সকলের সঙ্গেই ভালো ছিল রবিদা। যাঁরা এখন জীবিত আছেন তাঁদের সবাই আমাকে ভালোবাসেন।

আমি বললাম : আর যাঁরা প্রয়াত?

সাবিত্রী বললে : তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে চন্দ্রাদিকে। চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার বয়েসের কতো ডিফারেন্স। কিন্তু উনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন একেবারে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডের মতো। চন্দ্রাদির ব্যবহারটা ছিল কখনও মায়ের মতো, কখনও দিদির মতো, আবার কখনও বন্ধুর মতো। কী দিল্‌খোলা মানুষ। বিকাশদার 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবি করার সময় বেশ কিছুদিন আউটডোরে কাটিয়েছিলাম চন্দ্রাদির সঙ্গে। সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলাম। উনি একজন সত্যিকারের মমতাময়ী মহিলা। পাখি যেমন করে তার বাচ্চাদের আগলে রাখে পুরো আউটডোরটা উনি আমাকে সেই ভাবে আগলে রেখেছিলেন।

এই 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির আউটডোরে একটা ঘটনায় সাবিত্রীর জীবন সংশয় ঘটতে চলেছিল। প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে সাবিত্রী ফিরে এসেছিল। আর তার মূলে ছিলেন উত্তমকুমার। কিন্তু সে ঘটনায় যাবার আগে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সাবিত্রীর যোগদানের কথাটা বলে নিই। এ ব্যাপারে আমারও একটা ছোট্ট ভূমিকা ছিল।

কলকাতার অ্যামেচার স্টেজে গোপাল চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অভিনেতা ছিলেন। ১৯৫১ সালে আমি যখন রূপাঞ্জলি পত্রিকায় কাজ করছি তখন আমার সঙ্গে গোপালের আলাপ হয়। ওর বউ মঞ্জুশ্রীও অ্যামেচারে অভিনয় করত। ওরা থাকত শোভাবাজারে। বেশ বনেদি বাড়ি।

সেই গোপাল এক সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসটাকে নাটকে রূপান্তরিত করে ফেলল। ওর বাড়ির দোতলায় বসে আমরা নাটকটা পড়লাম। গোপালের ইচ্ছে ছিল ওটা নিয়ে অ্যামেচারে অভিনয় করাবে। সেই প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম না। বললাম : এত ভালো নাটক তুমি লিখেছ, এটাকে অ্যামেচারে দু-চারটে অভিনয় করিয়ে নষ্ট কোর না। তার চেয়ে বরং অ্যামেচার আর প্রফেশ্যনাল এই দুই স্টেজ থেকে শিল্পীদের নিয়ে প্রফেশ্যনাল শো কর। নাটক যদি দর্শকদের ভালো লেগে যায় তাহলে বেশ কিছুদিন চালিয়ে এটা থেকে দু-চার পয়সা রোজগার করতে পারবে।

কথাটা গোপালের মনে ধরল। দু'জনে বসে যুক্তি করলাম কী করা যায়। গোপালের ইচ্ছে ছিল নাটকটা নিজে ডাইরেকশান দেবার। তাতেও আমি বাধা দিলাম। বললাম : সমস্ত ব্যাপারটা প্রফেশ্যনালি চিন্তা কর। তাতে হয়তো একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। কিন্তু আখেরে লাভ হবে।

আমার এই প্রস্তাবে মঞ্জুশ্রীও সমর্থন জানাল। তখন সবাই মিলে ধীরাজ ভট্টাচার্যের কাছে যাওয়ার মনস্থ করলাম। ধীরাজদা তো নাটক শুনে দারুণ খুশি। কিন্তু তার পরই এমন একটা কথা বললেন যাতে আমরা ভয়ানক অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। ধীরাজদা বললেন, তিনিই হাজারি ঠাকুরের রোলটা করবেন।

ধীরাজদার ওই প্রস্তাবে চিন্তায় পড়ে গেলাম আমরা। ধীরাজদার তখন যা পপুলারিটি সেটা ভিলেন হিসেবে। হাজারি ঠাকুরের মতো এইরকম একটি নরম চরিত্রে দর্শকরা কি তাঁকে নেবেন? কিন্তু এখন তো আর করার কিছু নেই। এক বলা যায়, না, আপনাকে ডিরেকশান দিতে হবে না। কিন্তু সেটা বলাও তো সম্ভব নয়। ধীরাজদা প্রবীণ অভিনেতা। আমাদের শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর মনে আঘাত দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা করুণাময় ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিতে হল।

হাজারি ঠাকুর তো ধীরাজদা করবেন, কিন্তু পদ্ম ঝি কে করবে? আমরা মনে মনে গীতশ্রী দেবীর কথা ভেবে রেখেছিলাম। গীতশ্রীদি অ্যামেচারে অভিনয় করেন, প্রফেশ্যনাল স্টেজে করেন, আবার সিনেমাতেও অভিনয় করেন। এম পি প্রোডাকসন্সের 'কার পাপে' ছবিতে উত্তমকুমারের বিপরীতেও অভিনয় করেছেন। কিন্তু ধীরাজদা অন্য একজনের নাম প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন : আমার ইচ্ছে পদ্ম ঝি'র চরিত্রে সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে নিই। উত্তর সারথির 'নতুন ইহুদি' নাটকে আমি ওর অভিনয় দেখেছি। তাছাড়া 'পাশের বাড়ি' ছবিতে ওর অভিনয় তো তোরা সবাই দেখেছিস। মেয়েটার মধ্যে দারুণ পসিবিলিটি আছে। আমার ধারণা একদিন ও খুব বড় অভিনেত্রী হবে। তাছাড়া ওকে নিলে টাকাটাও কম লাগবে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকটা লেখা হয়েছিল ১৯৫১ সালে। কিন্তু মঞ্চস্থ করার ব্যাপারটা পাকাপাকি হয় ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি। সাবিত্রীর 'পাশের বাড়ি' ছবিটা ততদিনে হিট্ করে গেছে। সারা শহরে সাবিত্রীর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। ও পদ্ম ঝি করলে আমরা একটা গ্ল্যামার পাব। কিন্তু ও কি পারবে পদ্ম ঝি-র মতো ওরকম একটা গুরুতর চরিত্রে অভিনয় করতে? ঝগড়াটে অংশটা ও হয়তো দারুণ করবে, কিন্তু শেষের দিকে যে করুণ ব্যাপার আছে সেটা কি ও ঠিক ঠিক করতে পারবে?

ধীরাজদা বললেন : সেটা নিয়ে তোরা মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? নাটকটা তো আমি ডিরেকশান দিচ্ছি। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দে।

শেষ পর্যন্ত প্রথম শোয়ের কাস্টিং যা দাঁড়াল তা মোটামুটি আমাদের পছন্দ হল। ধীরাজদা নিজে করলেন হাজারি ঠাকুর, সাবিত্রী পদ্ম ঝি, নটিলাল করলেন ভানুদা, মানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর যে গীতশ্রীদিকে আমরা পদ্মঝির ভূমিকায় ভেবেছিলাম তিনি করলেন কুসুমের চরিত্রটা। সব মিলিয়ে নাটকটা দারুণ জমে গেল। কাগজে দারুণ প্রশংসা। এমনকি রেডিওতেও নাটকের সমালোচনা করা হল।

সব থেকে বেশি প্রশংসা পেল সাবিত্রী। কাস্টিং পালটে পালটে আদর্শ হিন্দু হোটেল বহুবার হয়েছে। সাবিত্রী ছাড়াও আরও অনেকে করেছেন পদ্ম ঝি। কিন্তু সাবিত্রীর মতো অত প্রশংসা আর কেউ পাননি।

এদিক থেকে সাবিত্রী খুব সৌভাগ্যবতী। প্রথম ছবিতে নেমেই হিট্। আবার প্রফেশ্যনাল বোর্ডে প্রথম নাটকেও হিট্। আর ওই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকের পরথেকে সাবিত্রীর ভাগ্যের আর একটা দরজা খুলে গেল।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। কোন নাটকই তেমনভাবে জমছিল না। ফলে কম্বিবেশন নাইট করে করে কোনরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হচ্ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চকে। এমন সময় স্টার থিয়েটারের মালিক তাঁর থিয়েটারটাকে ভেঙেচুরে এয়ার কন্ডিশন্ড করে নতুন নাটক নামাবার ব্যবস্থা করলেন। পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কোন নাটকেই দর্শকের মনঃপূত হচ্ছে না বলে ওঁরা ঠিক করলেন অনুরূপা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসটাকে নাটক করবেন। নাট্যরূপ দিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। আর পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র। ওই নাটকের নায়িকা বোবা মেয়ে শ্যামলীর চরিত্র করবার জন্যে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবীকে ঠিক করা হল।

নাটক যখন রিহার্সালে পড়ব পড়ব করছে তখন সরযূদি একদিন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' দেখতে এলেন রঙমহলে। সাবিত্রীকে তখন চিনতেন না সরযূদি। ওর অ্যামেচারের নাটক 'নতুন ইহুদি' কিংবা 'পাশের বাড়ি' ছবি কোনটাই দেখেননি তিনি। রঙমহলে সাবিত্রীর পদ্ম ঝি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এ মেয়ে তো আগুনের ফুলকি। একে পেশাদারি নাটকে কাজ করতে পারলে ব্যংলা রঙ্গমঞ্চ খুবই উপকৃত হবে।

শো শেষ হবার পর সরযূদি গ্রীনরুমে গেলেন সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সরযূদি এসেছেন শুনে সাবিত্রী তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে এল সাজঘর থেকে সামনে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

সরযূদি সাবিত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : তুমি তো দারুণ অভিনয় করেছ সাবিত্রী। তুমি যদি নিয়মিত থিয়েটার করো তবে তোমার অনেক নামযশ হবে। আমি সামান্য একজন অভিনেত্রী। এখনও অভিনয় শিখছি বলতে পারো। আমার ওই সামান্য জ্ঞান নিয়েই বলছি, তুমি একদিন অনেক বড় অভিনেত্রী হবে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি তাই যেন হয়।

পরের দিনই সরযূদি স্টার থিয়েটারে গিয়ে শিশিরবাবুকে বললেন : আপনারা আমাকে শ্যামলী করতে বলছেন বটে, কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না। শ্যামলীর জন্যে আরও কম বয়েসের মেয়ে দরকার। আমি কাল রঙমহলে একটি মেয়ের অভিনয় দেখলাম। তার নাম সাবিত্রী চ্যাটার্জি। অতটুকু মেয়ে, কিন্তু কী তার ব্যক্তিত্ব। কী দাপটে অভিনয় করল। আমি বলি কী আপনারা ওই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলুন। ওকেই শ্যামলীর পার্টটা দিন। আমি বরং নায়ক অনিলের মায়ের চরিত্রটা করব।

শিশিরবাবু বললেন : রঙমহলে ওটা তো সেমি-অ্যামেচার একটা নাটক। ওখানে ভালো করেছে বলে যে এখানেও ভালো করবে তার তো কোনও মানে নেই। পাবলিক স্টেজে অ্যাকটিং করতে গেলে অনেক বুকের জোরের দরকার। এক্সপ্রেশনের তীব্রতা থাকা দরকার। নতুন মেয়েকে নিলে রিস্ক হয়ে

যাবে। ওটা আপনিই করুন।

সরযূদি বললেন : আমি বলছি ও করতে পারবে। আমার কথার ওপর ভরসা রাখুন। আপনারা আজ-কালের মধ্যেই ওর সঙ্গে কথা বলুন।

সাবিত্রী বললে : সরযূমা এত জোর দিয়ে বলেছিলেন বলেই স্টার থিয়েটারে শ্যামলীর রোলটা আমি পেয়ে গেলাম। তুমি তো জানো রবিদা, সেই সময়ে ওই নাটকটা একটানা পাঁচশো নাইট করে একটা রেকর্ড করেছিল। তার আগে আর কোন বাংলা নাটক একটানা এতদিন চলেনি। পরে অন্য থিয়েটার সেই রেকর্ডটা ভেঙেছে। কিন্তু রাস্তাটা স্টার থিয়েটারই দেখিয়েছিল। দর্শককে আবার নাটকমুখী করেছিল।

আমি বললাম : মনে আছে বইকি। তোমাকে আর উত্তমবাবুকে নিয়ে ওই নাটকে একটা পেয়ার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের অভিনয় নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল।

সাবিত্রী বললে : উত্তমদাকে তো আমিই এনেছিলাম ওই স্টার থিয়েটারে অভিনয় করতে। নইলে উত্তমদার তো মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করার ব্যাপারটা পাকা হয়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম : তোমার সঙ্গে উত্তমবাবুর আগে থেকে আলাপ ছিল নাকি?

সাবিত্রী ঠোঁট টিপে হেসে বললে : ছিল না আবার। প্রথম আলাপ 'নতুন ইহুদি' নাটকের স্টেজ রিহার্সালের সময়। আর প্রথম আলাপের দিনই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল।

উত্তমকুমার নামক মানুষটির সঙ্গলাভ সাবিত্রী চ্যাটার্জির জীবনের এক দুরন্ত প্রাণচঞ্চল ঘটনা। দীর্ঘ একটি যুগ ধরে ওই মানুষটির সঙ্গে অভিনয়ে তো বটেই, অভিনয়ের বাইরেও নানা সুখে দুঃখে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাবিত্রী। সে সব কথায় পরে আসছি। তার আগে উত্তমকুমার আর সাবিত্রীর প্রথম আলাপ কী ভাবে ঘটল সেটা সাবিত্রীর মুখ থেকেই শোনা যাক।

সাবিত্রী বললে : উত্তমদার প্রথম ছবি 'কামনা' আমি দেখিনি। তোমাকে তো বলেছি রবিদা, আমি ছবি দেখার পোকা ছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, 'কামনা' ছবিটা আমার দেখা হয়নি। ছবিটা বেশিদিন চলেওনি। কিন্তু আমার বন্ধু-বান্ধবদের মুখে শুনলাম ওই ছবির হিরোকে নাকি ফাইন দেখতে। মুখের হাসিটা নাকি দারুণ। আমার খুব আপসোস হতে লাগল। পরে শুনলাম ওই উত্তমকুমারই নাকি নাম বদলে অরূপকুমার নামে 'মর্যাদা' ছবিতে অভিনয় করছেন। সেই সুযোগটা আর ছাড়িনি। ছবি রিলিজের প্রথম দিনই ভবানীপুরের ইন্দিরা সিনেমায় ছবিটা দেখে নিয়েছিলাম। আর অরূপকুমারকে দেখে মনে হল শুধু ফাইন নয়, সুপারফাইন। কী অদ্ভুত হাসি, কী দারুণ তাকানোর ভঙ্গি।

সাবিত্রীর এই উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : উত্তমবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপটা কীভাবে হল সেটা বলো।

সাবিত্রী বললে : তাই তো বলতে যাচ্ছি। মাঝখান থেকে তুমি বাধা দিয়ে দিলে। এরকম করলে বলার মুড থাকে?

তারপর ভেতর বাড়ির দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় বললে : আরতিদি, রবিদাকে খানিকটা নতুন গুড়ের পায়েস দিয়ে যাও তো। রবিদার কথা বলার মুখটা তাহলে খানিকক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকবে।

আমি বললাম : সেটা মন্দ প্রস্তাব নয়। পিঠে-পায়েস আমার খুব প্রিয় জিনিস। শুধু পিঠে-পায়েস কেন, যে কোনও মিষ্টিরই আমি পোকা।

সাবিত্রী বললে : এই শীতকাল-ভোরটা আমাদের বাড়িতে নানা রকমের পিঠে হয়। তুমি যে কোনওদিন সন্ধেবেলা চলে এসো। গাণ্ডেপিণ্ডে পিঠে-পায়েস খেয়ে যেও।

আমি বললাম : আমি এলে তো একা আসব না। বন্ধু-বান্ধবদেরও নিয়ে আসব তোমার বাড়ির পিঠে খেতে।

সাবিত্রী বললে : তা এসো না। তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি মানুষজনকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালোবাসি। তবে মিষ্টি আমার দু'চোখের বিষ। তুমি চাইলে আমি তোমাকে এই মুহূর্তে একশোটা টাকা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু দুটো রসগোল্লা খেতে বললে পারব না। মিষ্টি দেখলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি বললাম : ওই তো আরতিদি পায়েস নিয়ে হাজির হয়েছে। আমি মুখ বন্ধ করে খাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে উত্তমকুমারের সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপের ব্যাপারটা বলতে পারো।

সাবিত্রী বললে : আমাদের সেদিন 'নতুন ইহুদি' নাটকের বোর্ড রিহার্সাল চলছে কালিকা থিয়েটারে। এখন যেটা কালিকা সিনেমা, তখন ওটা ছিল কালিকা থিয়েটার। রিহার্সালের মাঝখানে শুনলাম নতুন নায়ক অরূপকুমার আসবেন আমাদের রিহার্সাল দেখতে। শুনে বুকের মধ্যে ছলাত করে উঠল। আমার কী ভাগ্য। ওরকম একজন সুদর্শন নায়ককে চোখের সামনে দেখতে পাব। হয়তো দুটো কথা বলার সুযোগও পাব। কেমন একটা পুলকের ঘোরের মধ্যে রিহার্সাল দিতে লাগলাম।

এমন সময় খবর পেলাম উনি এসে গেছেন। তাই শুনে পড়ি কী মরি করে ছুটলাম তাঁকে দেখতে। আর সেটা করতে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটে গেল। ছুটে আসতে গিয়ে একটা কাঠ না কিসে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। পা কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু তাতেও আমাকে দমাতে পারল না। সেই রক্তাক্ত পা নিয়েই ছুটলাম নায়ককে দেখতে।

আমাকে ওইভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে অরূপকুমার বলে উঠলেন : এ কী কাণ্ড! ছি ছি, এমন করে দৌড়তে আছে। দেখো তো কত রক্ত পড়ছে। ও মশায়, ডেটল-টেটল কিছু আছে নাকি আপনাদের! ওর পায়ে একটু লাগিয়ে দিন না। নইলে তো সেপটিক হয়ে যাবে।

আমার তখন ফ্রক আর শাড়ির মাঝামাঝি বয়েস। কিন্তু সেই বয়েসের একটি মেয়ের জন্যে ছায়াছবির নায়কের এই উৎকণ্ঠা আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে। আমার কিশোরী বুকটার মধ্যে পুলকের শিহরণ। আমার সব যন্ত্রণা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

অরূপকুমারের কথা শুনে ভানুদা বলে উঠলেন : কাটব না পা। যা চঞ্চল। সর্বক্ষণ যেন নাইচ্যা বেড়ায়। তবে তরে কী কমু উত্তম, অতটুকু মাইয়া হইলে কী হইব, পার্ট যা করে এক্কেরে ফাটাফাটি কাণ্ড। তুই দ্যাখলে অবাক হইয়া যাবি।

অরূপকুমার তাঁর সেই রমণীমোহন হাসি হেসে বললেন : তাই নাকি ভানুদা, তুমি এত বড় সার্টিফিকেট দিচ্ছ। তাহলে তো আমাদের ক্লাবে ওকে অভিনয় করাতে হয়।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : 'কৃষ্টি ও সৃষ্টি' বলে আমাদের একটা ক্লাব আছে। আমরা ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকটা করছি। অ্যামেচার শো। ওই নাটকে তোমার বয়েসি একটি মেয়ের দরকার। তুমি করবে?

প্রস্তাবটা শুনে বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। বাব্বা, স্বয়ং নায়ক অনুরোধ করছে, আর আমি অভিনয় করব না! কিন্তু মুখে বললাম : বাবা যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার আপত্তি নেই।

আমার কথা শুনে অরূপকুমার একটু হাসলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে! তোমার বাবার পারমিশান নিতে আমি যাব তোমাদের বাড়িতে। তোমাদের ঠিকানাটা কী?

আমি ঠিকানাটা বললাম। ভানুদা ভালো করে ডেস্টিনেশানটা বুঝিয়ে দিলেন। অরূপকুমার বললেন : ঠিক আছে। আমাদের নাটকের ব্যাপারটা আর একটু এগোক। তারপর আমি যাব তোমাদের বাড়িতে।

এই বলে উনি চলে গেলেন। তারপর উনি আবার এসেছিলেন আমাদের 'নতুন ইহুদি'-র শো দেখতে। সেদিন আর আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। ভানুদার কাছে শুনলাম, উনি নাকি আমার অভিনয়ের খুব প্রশংসা করে গেছেন। শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। প্রশংসায় কার না মন ভরে বলো। বিশেষ করে সিনেমার নায়কের প্রশংসা।

এরপর অনেকদিন চুপচাপ। অরূপকুমার আবার তাঁর পুরনো উত্তমকুমার নামে ফিরে গেছেন। ছবি-টবি করছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন সকালে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমাদের বাড়ির কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। একখানা ঘরে সবাই মিলে মাথা গুঁজে থাকা। হঠাৎ উত্তমকুমারের আগমনে সারা বাড়িতে হুলুস্থূল পড়ে গেল। একদিকে যেমন আনন্দ, অন্যদিকে তেমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ছেঁড়া বালিশ, বিছানা, চাদর ইত্যাদি লুকোবার জন্যে।

আমাদের প্রাথমিক উত্তেজনা একটু থিতিয়ে আসার পর আমরা উত্তমকুমারকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করে বসালাম। উনি বললেন, ওঁদের নাটকে আমার অভিনয় করার ব্যাপারে উনি বাবার পারমিশান নিতে

এসেছেন।

সব শুনে বাবা বললেন : অনুমতি দিতে রাজি আছি। তবে দুটি শর্তে। এক, টাকা দিতে হবে এবং তার মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসী লোক দিয়ে সাবিকে নিয়ে যেতে হবে এবং রিহার্সাল আর শোয়ের পর লোক দিয়ে পৌঁছে দিতে হবে।

বাবার এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি আর একটি শর্ত যোগ করলাম। বললাম : অন্য কেউ নয়, আপনি নিজে এসে আমায় নিয়ে গেলে আর পৌঁছে দিলে তবেই যাব। নতুবা নয়।

উত্তমকুমার তাঁর দুটো চোখ ছোট করে একটু হাসলেন। তারপর বললেন : বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

এই বলে তিনি বাবার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন। অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও চা-টা কিছুই খেলেন না।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই ওঁদের 'আজকাল' নাটকের রিহার্সাল শুরু হল। উত্তমকুমার নিজে আমাকে প্রতিটি দিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন, আবার পৌঁছে দিয়েছেন। দেখতে দেখতে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক ওঁর সঙ্গে গড়ে উঠতে লাগল। খিদে লাগলে রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়াতেন। যেন কত আপনজন। সেই থেকে আমি ওঁর 'সাবু' আর উনি আমার 'উত্তমদা'।

ওইভাবে চলতে চলতে একদিন দেখলাম উনি সত্যিই আমাদের বাড়ির মানুষ হয়ে গিয়েছেন। রিহার্সাল ছাড়াও নিয়মিত আসতে লাগলেন আমাদের আটপৌরে দৈন্যের সংসারে। নোংরা, ছেঁড়া বিছানাপত্তর, ভালোভাবে আপ্যায়ন না করতে পারা, এসব কিছুই কেমন সুন্দরভাবে মানিয়ে নিলেন। তখন আর আমাদেরও লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি করার সঙ্কোচটা রইল না।

উত্তমদার একটা অসাধারণ গুণ ছিল। যাদের ভালো লাগত, তাদের তিনি মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিতেন। তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন। উত্তমদা তো এমনিতে খুব হাসিখুশি হুল্লোড়ে মানুষ ছিলেন। তার সেইসব মধুর অন্তরঙ্গ ব্যবহার আজও আমার দিদিরা, বাড়ির মানুষরা ভুলতে পারেননি। উত্তমদা আমার মা-বাবাকে তো বটেই, দিদিদেরও খুব সম্মান করতেন। ঘরোয়া রান্না খুব পছন্দ করতেন বলে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে খেয়ে যেতেন। আজও যখন আমি উত্তমদার পছন্দের কোনও রান্না করি তখন বুকের ভেতরটা ব্যথায় বেদনায় টনটন করে ওঠে। আর তো তিনি কোনদিন বলতে আসবেন না যে, সাবু, তোর ওইদিনের রান্নাটা খুব ভালো হয়েছিল। ওটা আর একদিন করে খাওয়াস তো!

জানি সবাইকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু উত্তমদা কেন অত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেল রবিদা?

আমি সাবিত্রীর কথায় পরম দার্শনিকের মতো জবাব দিলাম : এটাই পৃথিবীর নিয়ম সাবু। ওই নিয়ে আক্ষেপ করে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে তুমি বলো উত্তমবাবুদের ক্লাবের ওই নাটকটায় তোমার অভিনয় কেমন হয়েছিল।

সাবিত্রী বোধহয় একটু ইমোশ্যনাল হয়ে পড়েছিল। একটু সময় নিল নিজেকে সামলে নিতে। তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বললে : ওদের 'আজকাল' নাটকটা হয়েছিল রঙমহলে। আমি লতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। আমার অভিনয় দেখে উত্তমদা তো দারুণ খুশি। ওদের আরও একটা নাটকে আমি অভিনয় করেছি। সেটার নাম 'কিনু গোয়ালার গলি'।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ওটা কী সন্তোষকুমার ঘোষের লেখা কাহিনীর নাট্যরূপ?

সাবিত্রী বললে : ঠিক জানি না রবিদা। তখন তো আমি সাহিত্য-টাহিত্য বিশেষ পড়তাম না। তবে তাই হবে হয়তো। সন্তোষবাবুর ওই বইটা আমার কিন্তু আজও পড়া হয়নি।

আমি বললাম : তারপরে কী হল বলো।

সাবিত্রী বললে : উত্তমদার সঙ্গে আমি এই সময়ে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম গভীরভাবে। উনি আমার ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করতেন। আমিও তাই করতাম। আমার জীবনে দুটি মানুষকে আমি দেখেছি আমার অভিনয় সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে অন্যের কাছে প্রশংসা করতে। তার একজন হলেন ভানুদা, আর অন্যজন উত্তমদা। যে কারণে উত্তমদার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্যে আমি

সচেষ্ট থাকতাম। স্টারে 'শ্যামলী' নাটকের কাজটা আমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। উত্তমদা তখন মিনার্ভা থিয়েটারে 'ঝিন্দের বন্দী' নাটকে অভিনয় করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। ছবিদা, মানে ছবি বিশ্বাস ছিলেন ওই নাটকের পরিচালক। উত্তমদা ময়ূরবাহনের রোল করেছিলেন। আমি উত্তমদাকে স্টারে চলে আসবার কথা বলাতে উত্তমদা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন : সেই ভালো। দু'জনে একই স্টেজে কাজ করব। একসঙ্গে যাওয়া-আসা করব। অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটাতে পারব।

তা আমাদের এই দু'জনে একসঙ্গে কাজ করার যে এত আগ্রহ তার জন্যে আমাদেরকে কম দুর্ভোগ পোয়াতে হয়নি। আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে একটি পত্রিকা আমাদের দুজনের নামে একটা গুজব রটিয়ে দিলে। তারা লিখলে, উত্তমদা নাকি আমাকে বিয়ে করে বালিগঞ্জের একটা ফ্ল্যাটে সংসার পেতেছে। সেই গুজবটা একসময় ছড়াতে ছড়াতে উত্তমদার বাড়িতে গিয়েও পৌঁছল। গুজব তো নয় যেন আগুন। এই নিয়ে উত্তমদার বাড়িতে চরম অশান্তি। গৌরীবৌদি তো ক্ষেপে লাল। উত্তমদাও বেকায়দায় পড়ে ক্ষিপ্ত। তখন আমি উত্তমদাকে বললাম : দেখো উত্তমদা, যা সত্যি নয় তা নিয়ে অহেতুক অশান্তি করে লাভ কী! ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি গৌরীবৌদিকে সব বুঝিয়ে বলব।

তা আমি গৌরীবৌদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলাম সব ঘটনাটা। বৌদিও তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে উত্তমদার বাড়িতে আমাকে নিয়ে আর কোনও অশান্তি হয়নি।

এই যে উত্তমদাকে জড়িয়ে আমার নামে এত রটনা, এত লেখালেখি, আমার বাবা কিন্তু সে সম্পর্কে কোনদিন কোনও প্রশ্ন করেননি আমাকে। কারণ তিনি অন্তত এটুকু বিশ্বাস করতেন যে, তার মেয়ে আর যাই করুক, কারও সংসার ভাঙবার মতো নীচ মানসিকতা তার নেই।

একটা সত্যি কথা আজ তোমাকে বলি রবিদা। উত্তমদা সম্পর্কে আমার একটা দুর্বলতা সেদিনও ছিল, আজও আছে। কিন্তু আমার যদি তেমন ইচ্ছে বা মনোবৃত্তি থাকত, এবং তখন আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে ইচ্ছে করলেই আমি উত্তমদাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতাম। কিন্তু তেমন ইচ্ছে আমার কোনদিনই হয়নি। নিজের সুখ আর তৃপ্তির জন্যে অন্যের ঘর ভাঙব তেমন নীচতা আমার মনে কোনওদিনই স্থান পায়নি।

এতক্ষণ একটানা কথা বলতে বলতে সাবিত্রী একটু দম নিলে। তারপর বললে : এই যে সর্বেন্দ্রকে নিয়ে আমার সম্পর্কে এত রটনা, তার জন্যে কি সর্বেন্দ্রর সংসারটা ভেঙে গেছে? সর্বেন্দ্র আমার আর আমাদের পরিবারের সকলের বন্ধু হয়েই এ বাড়িতে এসেছিল। সেই বন্ধুত্বের মর্যাদা সে চিরকাল রেখে গেছে। আজ সর্বেন্দ্র নেই। কিন্তু সর্বেন্দ্রর সংসারের সঙ্গে আমাদের সেই প্রীতির সম্পর্ক সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। আমাদের দুই পরিবার আজও পরস্পরের বন্ধু।

আমি বললাম : তোমাকে আর উত্তমবাবুকে নিয়ে এই যে রটনা, তার জন্যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মানুষের কাছে তোমাকে কোনও দুর্ভোগ পোয়াতে হয়নি?

সাবিত্রী বললে : হয়নি আবার। দেবকী বসুর মতো একজন শ্রদ্ধেয় পরিচালক, তাঁর সঙ্গে পর্যন্ত আমার একদিন এই ব্যাপার নিয়ে বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেছে।

আমি বললাম : সেটা কী রকম?

সাবিত্রী বললে : দেবকী বসু ছিলেন আমাদের কালের একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক। ওঁর ছবিতে কাজের সুযোগ পেলে যে কোনও অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী নিজেদের ধন্য মনে করতেন। সবাই ওঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি ভয়ও করতেন। রীতিমত সমীহ করে কথা বলতেন। উনি ছিলেন খুব রাশভারী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং নীতিনিষ্ঠ। কাজের সময় ভীষণ সিরিয়াস এবং ডিসিপ্লিনড।

সেই দেবকীবাবুর একটা ছবিতে আমি একবার কাজের সুযোগ পেলাম। ছবিটির নাম 'নবজন্ম'। এই ছবিতে উত্তমদা ছিলেন, অরুন্ধতী দেবী ছিলেন। কাজটা পেয়ে আমার খুব আনন্দ হল।

শুটিং শুরুর আগে আমাকে একদিন সুচিত্রা সেন বললে : সাবিত্রী, খুব সাবধান। শুটিং-এর সময় অভিনয় মনোমত না হলে, কিংবা কান্নার দৃশ্যে ঠিকমতো এক্সপ্রেশন দিতে না পারলে দেবকীবাবু বেত মেরে কাজ আদায় করে নেন। ওঁর বেতে আবার নম্বর দেওয়া থাকে। কাকে কোন্ নম্বরের বেত দিয়ে

মারবেন তা আগেভাগে কেউ জানতে পারে না।

কথাটা শুনে তো আমি থ' মেরে গেলাম। বেত খেয়ে অভিনয় করতে হবে এমন তো কখনও শুনিনি। এ কি গুরুমশাইয়ের পাঠশালা নাকি।

আমার তখন রীতিমত নামডাক হয়েছে। বয়েসটা কম, তার ওপর রক্তটাও গরম। আমি তো বরাবরই একটু ডাকাবুকো ধরনের ছিলাম। তাই একদিন সোজাসুজি দেবকীবাবুর সামনে গিয়ে বললাম : শুনেছি আপনি নাকি কান্নার দৃশ্যে বেত মেরে কান্নার অভিনয় আদায় করে নেন। তার জন্যে আপনার নম্বরী বেতও আছে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমার যেন বেত-টেত মারবেন না। আমার বাবাও কোনওদিন আমার গায়ে হাত তোলেননি। কান্নার দৃশ্যে কী রকমটা চান, আমায় বুঝিয়ে বলবেন। আমি ঠিক ঠিক সেইরকম কান্না আপনাকে দেব। আমার সে অভ্যেসটা আছে।

আমার ধৃষ্টতা দেখে দেবকীবাবু তো অবাক। ঠিক তখনই আমাকে কিছু বললেন না। পরে নাকি একজনের কাছে বলেছিলেন, মেয়েটা তো খুব বাচাল।

সাবিত্রীর কথা শুনে আমি বললাম : এর মধ্যে তোমার উত্তমকুমার সম্পর্কিত ঘটনার ব্যাপারটা কোথায়? এ তো তোমার কান্নাকাটির ব্যাপার।

সাবিত্রী বললে : সে কথায় আসছি রবিদা। আমি তো মন দিয়ে দেবকীবাবুর ছবিতে কাজ করতে লাগলাম। দেবকীবাবু প্রায়শই সাধু ভাষায় কথা বলতেন। ওঁর কথার মধ্যে অনেক রকম মানে খুঁজে পাওয়া যেত। মাঝে মাঝে তিনি শুদ্ধ ভাষায় রসিকতাও করতেন।

একদিন দেবকীবাবু আমাকে বললেন : সাবিত্রী, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাস্য ছিল।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। জিজ্ঞাসাটা যে কী জাতীয় হবে সেটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ভেতরে ভেতরে খুব নার্ভাস হয়ে পড়লাম। কিন্তু মুখে সে ভাবটা প্রকাশ না করে বললাম : কী বলুন?

দেবকীবাবু বললেন : উত্তমের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

আমি বললাম : আর পাঁচজন অভিনেতার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, উত্তমদার সঙ্গেও সেই সম্পর্ক।

দেবকীবাবু বললেন : তাহলে উত্তম তোমাকে 'সাবু' বলে ডাকে কেন?

আমি বললাম : উনি আমাকে ওই নামেই ডাকতে ভালোবাসেন, তাই।

দেবকীবাবু বললেন : এই ভালোবাসা কোথা থেকে এল, কী হতে জন্মাল?

কথাটা শুনে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। দেবকী বসুর মতো একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ, তাঁর এই অযথা কৌতূহল কেন! হয়তো উনি রহস্য করছেন। কিন্তু আমি কি ওঁর রহস্যের পাত্রী। নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বললাম : আমার নামটা তো বড়। এবং উচ্চারণেও দীর্ঘ। তাই উনি এই ভালোবেসেই নামটাকে শর্টকাট করে নিয়েছেন। আমাদের এই নটীর লাইনে সবাই তো সতী সাবিত্রী। কারুর কোনও কলঙ্ক নেই। তাই 'সাবিত্রী' নামটা খুবই বেমানান বলে উত্তমকুমার ভালোবেসে আমায় 'সাবু' নামে ডাকেন।

আমার ওই দুঃসাহসী কথাবার্তা শুনে দেবকীবাবু বোধহয় খুশিই হয়েছিলেন। কারণ, আমার স্পষ্টই মনে আছে, আমার উত্তর শুনে তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

আমি বললাম : আচ্ছা সাবিত্রী, তুমি যে সেদিন বললে উত্তমবাবুর হাতে তোমার মৃত্যু ঘটতে পারত। তুমি একেবারে মরণের দোরগোড়া থেকে ফিরে এসেছিলে! সেটা কী ব্যাপার?

সাবিত্রী বললে : ওঃ, সে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। কী ভাবে যে বেঁচে গিয়েছিলাম ঈশ্বরই জানেন। আর একটু হলেই আমি মরণের কোলে ঢলে পড়তাম। সেটা ঘটলে আর তোমাকে কষ্ট করে আমার জীবনকাহিনী লিখতে হত না। দু'দিন খবরের কাগজে হইচই হত। তারপর কেয়া চক্রবর্তীর মতো আমাকেও সবাই ভুলে যেত।

আমি বললাম : কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটেছিল সেটা বলবে তো!

সাবিত্রী বললে : বলছি রে বাবা, বলছি। তুমি যা তাড়া দাও না, একটু ভালো করে নিঃশ্বাস ফেলবারও সুযোগ দাও না। সেবারের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিল দীঘায় বিকাশ রায়ের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবির

আউটডোরে।

উত্তমকুমার মাঝে মাঝেই কথাপ্রসঙ্গে বলতেন : সাবুর সঙ্গে অ্যাকটিং করবার সময় খুব অ্যালার্ট থাকতে হত। বিশেষ করে ওর চোখ দুটোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতাম।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কেন?

উত্তমবাবু বলেছিলেন : ওর চোখের দৃষ্টিতে অসম্ভব পাওয়ার। এমনিতে সাবুর চোখের দৃষ্টি খুব সরলতা মাখানো। কিন্তু সরলতা যে এত তীক্ষ্ণ হয় তা আগে কোনদিন জানতাম না। তাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অভিনয় করবার সময় বেশ কায়দা করে, তার মানে দর্শককে বুঝতে না দিয়ে, আমার চোখটাকে ওর দৃষ্টির আড়ালে রাখবার চেষ্টা করতাম।

আমি বলেছিলাম : তাহলে অ্যাকটিং করবার সময় আপনাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলত বলুন?

উত্তমবাবু বললেন : তা তো চলতই। এই প্রতিযোগিতার মানসিকতাটা প্রত্যেক আর্টিস্টের মধ্যেই আছে। কেউ কি চায় অ্যাকটিংয়ের সময় অন্যের হাতে মার খেতে! এতে দুজনেরই অভিনয়টা দারুণভাবে খোলে। দর্শকরাও তৃপ্তি পায় সে অভিনয় দেখে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সাবিত্রীর কাছে আপনি কখনও অ্যাকটিংয়ে মার খেয়েছিলেন?

উত্তমবাবু বললেন : তা খেয়েছি বইকি। তবে খুব বেশিবার নয়। ওর সঙ্গে কাজ করবার সময় খুব অ্যালার্ট থাকতাম তো। তবে একবার এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ওর হাত থেকে রেহাই পাইনি। পড়ে পড়ে মার খেতে হয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কী রকম?

উত্তমবাবু বললেন : বেণুদা, মানে পরিচালক নীরেন লাহিড়ির ডিরেকশানে 'লাখ টাকা' বলে একটা ছবিতে সাবুর অপোজিটে অভিনয় করেছিলাম। এটা সেই নাইনটিন ফিফটি থ্রির কথা বলছি। তা ওই ছবির একটা সিনে আমার মুখে একটা ডায়লগ ছিল, যাতে আমি একজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছি যে, তার 'হাই ব্লাড প্রেশার'। তা এই ডায়লগের এগেইনস্টে সাবিত্রীর মুখে কোন ডায়লগ ছিল না। ও কেবল রি-অ্যাক্ট করবে। এই চান্সটা পেয়ে আমার মাথার মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। আমি দেখলাম সিনটা নিজের হাতে নিয়ে নেবার এই একটা সুযোগ। তা আমি করলাম কী, ওই 'হাই ব্লাড প্রেশার' ডায়লগটাকে থ্রো করার সময় খুব পিকে তুলে দিলাম। বুকের মধ্যে যতটা দম আছে সব একত্র করে লম্বা করে বলে উঠলাম 'হা-ই ব্লা-ড প্রে...শা...র'। ভাবলাম যে এরপর আমার হাতে পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া সাবুর আর কিছু করার নেই। তা এর রি-অ্যাকশনে ও কী করল জানেন? শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আপনার!

আমি বললাম : কী করল সাবিত্রী?

উত্তমবাবু বললেন : আমি ডায়লগটাকে টেনে যতটা ওপরে তুলেছিলাম, ও তার থেকেও বেশি উঁচুতে গলার মধ্যে থেকে একটা শিউরে ওঠার আওয়াজ বার করে আমাকে একদম নো-হোয়্যার করে দিলে। কী সাংঘাতিক পাওয়ারফুল আর্টিস্ট যে আপনাদের সাবিত্রী চাটুজ্যে, কী বলব আপনাকে। অথচ যখন ও এই অ্যাকটিংটা করল তখন তো ওর বেশি বয়েস নয়। নেহাতই বাচ্চা।

আমি বললাম : শুনেছি তো আপনাদের মধ্যে দারুণ ভাব-ভালোবাসা ছিল। তা সত্ত্বেও আপনারা দুজনে দুজনকে এভাবে টাইট দেবার চেষ্টা করতেন?

উত্তমবাবু বললেন : অ্যাকটিংয়ের সময় ওসব ভাব-ভালোবাসা টাসা কিছু নয়। ওখানে বাপ ছেলেকে রেয়াত করে না। প্রত্যেকেই প্রমিনেন্স পাবার চেষ্টা করে। না হলে অ্যাকটিং জমবে কী করে!

তা 'লাখ টাকা' ছবির প্রসঙ্গে উত্তমবাবুর ওই কথাগুলো সাবিত্রীকে একদিন বলেছিলাম। বললাম : সাবিত্রী, তোমার কাছেই শুনেছি, বেণুদার 'লাখ টাকা' ছবিতে তুমিই রিকোয়েস্ট করে উত্তমবাবুকে রোলটা পাইয়ে দিয়েছিলে! সেই উত্তমবাবুকে তুমি অ্যাকটিংয়ের সময় ওইভাবে টাইট দিলে কী বলে?

সাবিত্রী বললে : আমার কিছু মনে নেই রবিদা। অনেকদিন আগেকার ঘটনা তো। তবে টাইট ফাইট ওসব আমি কিছু বুঝি না। আমি আমার মতোই অ্যাকটিং করে যাই। তুমিই বলো না, একটা বিপদের

কথা শুনলে বুকের মধ্যে থেকে একটা শিউরানোর আওয়াজ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে কিনা! আমি তাই করেছিলাম। এখন উত্তমদা যে আমাকে টাইট দেবার জন্যে ওরকম করে হাই পিচে ডায়লগটা তুলেছিলেন তা আমি কেমন করে জানব! পরে কাজ করতে করতে বুঝেছি উত্তমদা নিজেকে প্রমিনেন্ট করবার জন্য চিত্রনাট্যেও অদল-বদল ঘটিয়ে দিতেন। তেমন একটা ঘটনা ঘটেছিল ঢুলুদার 'নিশিপদ্ম' ছবির সময়।

আমি বললাম : ঢুলুদা মানে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছ তো?

সাবিত্রী বললে : হ্যাঁ। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে আমরা সবাই ঢুলুদা বলেই ডাকি। গোটা ইন্ডাস্ট্রির কাছেই উনি ঢুলুদা। সাহিত্যিক বনফুলের ভাই উনি। পরিচালক হিসেবে যেমন ভালো, মানুষ হিসেবে তার থেকেও অনেক ভালো। আমি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি।

আমি বললাম : 'নিশিপদ্ম' ছবির সময় ঘটনাটা কি ঘটেছিল?

সাবিত্রী বললে : 'নিশিপদ্ম' গল্পটা বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিংয়ের কচুরি' গল্পের সিনেমা রূপান্তর। উত্তমদা ওই ছবিতে যে রোলটা করেছিলেন তার নাম অনঙ্গ দত্ত। তোমার মনে আছে রবিদা, ওই ছবিতে উত্তমদার লিপে মান্নাদার গাওয়া একটা গান ছিল, 'না না না, আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না'। নচিদার দেওয়া সুর। গানটা খুব হিট করেছিল।

আমি বললাম : মনে নেই আবার! এখনও তো ওই গানটা কোথাও বাজলেই উত্তমবাবুর দুর্দান্ত অ্যাকটিংয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

সাবিত্রী বললেন : আমারও মনে পড়ে যায় রবিদা। উত্তমদা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে শালপাতার ঠোঙায় হিংয়ের কচুরি, বাঁ হাতে কোঁচানো ধুতির খুঁট। দরজায় দাঁড়িয়ে উত্তমদার মুখে সেই মন ভোলোানো দুষ্টু হাসি, মুখে মিষ্টি করে 'পুষ্প' ডাক, আজও যেন সেই ডাক শুনতে পাই কান পাতলে। সেই দুষ্টু হাসি দেখতে পাই চোখ বুজলে। সেসব কি ভোলো৷ যায়!

বলতে বলতে সাবিত্রী যেন ফিরে গেল 'নিশিপদ্ম' ছবির শুটিংয়ের সেইসব দিনগুলিতে। দু-এক মিনিট আনমনা হয়ে রইল। তারপর আবার বললে : এই অনঙ্গ দত্তর ক্যারেকটারটা কিন্তু বিভূতিবাবুর গল্পে ছিল না। ওটা ঢুলুদারই তৈরি করা।

আমি বললাম : 'নিশিপদ্ম'র চিত্রনাট্যে উত্তমবাবু কী অদল-বদল ঘটিয়েছিলেন সেটা বলো না সাবিত্রী।

সাবিত্রী বললে · ওই ছবির মূল চিত্রনাট্যের শেষ দৃশ্যে আমার প্রেফারেন্স ছিল। উত্তমদার কোন ভূমিকা ছিল না। আমাদের দিয়ে ছবি শেষ করা হচ্ছিল। কিন্তু উত্তমদা তাতে বাদ সাধলেন।

আমি বললাম : তার মানে?

সাবিত্রী বললে : আমি যে রোলটা কবেছিলাম সেই পুষ্প ছিল দেহপসারিণী। শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, পুষ্পকে তার ছেলে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে রিকশায় তুলছে। পুষ্পর অশ্রুসজল দুই চোখে একই সঙ্গে সামাজিক স্বীকৃতি আর নিজের ঘর ফিরে পাবার স্বপ্ন। আনন্দ ও তৃপ্তির ছোঁয়া। দৃশ্যটি কাট করেই চলে যাবে কুমোরটুলির পোটোপাড়ায়। সেখানে দেখা যাবে জয়ধ্বনি দিয়ে চালচিত্রে সাজানো মা দুর্গার প্রতিমা গাড়িতে তোলা হচ্ছে। দৃশ্যটি অর্থবহ। অর্থাৎ মাকে সমাজে বরণ করে নেওয়ার স্বীকৃতি। ছবি এখানেই শেষ।

আমি বললাম : কিন্তু 'নিশিপদ্ম ছবিটা তো ওখানে শেষ হয়নি।

সাবিত্রী বললে : সেই কথাই তো বলছি। উত্তমদা স্ক্রিপ্ট শুনে বললে : ঢুলুদা, ছবিটা ওখানে শেষ করা চলবে না। সবই ঠিক আছে। কিন্তু শেষকালে আর একটা দৃশ্য জুড়ে দিতে হবে। আর সেই দৃশ্যে অনঙ্গ দত্ত, অর্থাৎ আমাকে প্রেফারেন্স দিতে হবে।

ঢুলুদা বললেন : তা কেমন করে হবে! মূল গল্পটা তো পুষ্পর ওপর। সেই তো নিশিপদ্ম। সেখানে অনঙ্গ দত্ত আসছে কী করে?

উত্তমদা বললেন : তা জানি না। সেটা তোমার ভাবনা। তবে তোমার ছবিতে উত্তমকুমার থাকবে অথচ তার কোন পরিণতি থাকবে না, সেটা দর্শকরা মেনে নেবে কী? যেমন করেই হোক শেষ দৃশ্যে

আমাকে আনতেই হবে।

সাবিত্রী বললে : এই নিয়ে ঢুলুদার সঙ্গে উত্তমদার তুমুল তর্কাতর্কি। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢুলুদা রাজি হলেন উত্তমদার প্রস্তাবে। ছবির শেষতম পর্বে একটি নতুন দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হল। পুষ্প রিকশয় উঠতে যাবার আগে অনঙ্গ দত্তকে বললে, আজ আপনাকে প্রণাম ছাড়া আর কিছু দেবার নেই আমার। উত্তরে অনঙ্গ দত্ত বললে, আজ আমার চোখের জল পবিত্র গঙ্গাজল হয়ে গেল। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তমদার এক চোখে জল আর অন্য চোখে হাসি। কী অপূর্ব অভিনয়। চিরকাল মনে রাখার মতো।

আমি বললাম : ওই যে ছবির দৃশ্যটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন উত্তমবাবু, তাতে তোমার রাগ হয়নি সাবিত্রী?

সাবিত্রী বললে : একদম না। আমি পেশাদার অভিনেত্রী। ডিরেকটার যা বলবেন সেটা মেনে চলা আমার ধর্ম। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া অভিনয় করার সময় এরকম বহু চ্যালেঞ্জ আমার সামনে এসেছে। সেগুলোর সঠিক মোকাবিলা আমি করতে পারলাম কি না, সেটাই বড় কথা। 'নিশিপদ্ম' ছবিতে আমার অভিনয় কি তোমাদের খুশি করতে পারেনি?

আমি বললাম : পারেনি আবার! তোমার অভিনয়ের তো দারুণ প্রশংসা হয়েছিল।

সাবিত্রী বলললে : তা হলে? শুধু শুধু যেচে মান, কেঁদে সোহাগ করতে যাব কেন?

আমি বললাম : তুমি যে বললে দীঘাতে বিকাশ রায়ের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবিতে উত্তমবাবুর হাতে তোমার প্রাণসংশয় হতে চলেছিল, সেটাও কি এরকম কোনও ঘটনার কারণে?

সাবিত্রী এক হাত জিভ কেটে বললে : না না, ছি ছি! সেই ঘটনার পিছনে ওসব মতান্তর বা মনান্তরের কোনও কারণই নেই। উত্তমদা যে কোন চরিত্র করতে গেলে কী পরিমাণ ইনভলভড হয়ে পড়তেন, তারই ফলশ্রুতি সেদিনকার সেই ঘটনা।

আমি বললাম : একটু খুলে বলো না ব্যাপারটা।

সাবিত্রী বললে : বিকাশদা নিজে তো একজন বড় অভিনেতা, তাই শিল্পীদের কাছ থেকে সেরা অভিনয়টা কীভাবে আদায় করে নেবেন, সেটা খুব ভালোভাবেই জানতেন। তা সেবার যখন উনি অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবি করতে গেলেন তখন তার শুটিং-এর স্পট ঠিক করলেন দীঘায়। না দীঘার সমুদ্র নয়, আমাদের দরকার মরুভূমি। দীঘার বালিয়াড়ি হল আমাদের ছবির মরুভূমি। ওই ছবিতে বিকাশদা নিজে করেছিলেন অবধূতের চরিত্র। চন্দ্রাদি, মানে চন্দ্রাবতী দেবী ভৈরবী। অনিল চ্যাটার্জি ছড়িদার। উত্তমদা করেছিলেন থিরুমল আর আমি কুন্তী। বিকাশদা তাঁর পুরো ইউনিট নিয়ে মাসখানেকের জন্যে আস্তানা গেড়েছেন দীঘায়। আমরা সব তাঁবু খাটিয়ে আছি। বিকাশদা সেখানে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন যে ক'দিনের মধ্যে আমরা সবাই ছবির চরিত্র এবং ঘটনার অংশীদার হয়ে গেলাম।

অভিনয়ের আগে অবধূতের মূল উপন্যাসটা পড়ে এতই রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম যে লোকেশনে পৌঁছে দু'একদিনের মধ্যে আমি যেন ভেতরে ভেতরে কুন্তীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম। সারাদিন টানা শুটিং। মাঝে দুপুরে ঘণ্টাখানেক রেস্ট। তারপর আবার শুটিং। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিলই না বলতে গেলে। দীঘা তো তখন এখনকার মতো জনবহুল আর জমজমাট হয়নি।

বালির ওপর তাঁবু খাটিয়ে আমাদের বসবাস। সারাদিন শুটিং-এর পর যখন তাঁবুতে ঢুকতাম তখন আর শরীরের কিছু অবশিষ্ট থাকত না। বিকাশদা বলতেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে সকলের শরীর সারিয়ে দেব। এখন ছবির প্রয়োজনে সবাইকে এইভাবেই অভ্যস্ত হতে হবে।

ওই প্রচণ্ড খাটুনির মধ্যেও একটু-আধটু গল্পগুজব হত, আড্ডা হত, ছবির পরের দিনের শট নিয়ে আলোচনা হত। তারপর আমরা খাওয়া দাওয়া করে সেই ধুলোবালি মাখা অবস্থাতেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতাম।

প্রথম দিন থেকেই উত্তমদাকে দাড়ি কামাতে দেননি বিকাশদা। দু'একবেলা যেতে না যেতেই দেখলাম উত্তমদা কেমন যেন বদলে যাচ্ছেন। সেই হাসিখুশি আড্ডাবাজ মানুষটি আর নেই। পরিবর্তে কেমন চুপচাপ, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন না। কেবল একমনে বসে বসে বালির ওপর আঁকিবুকি

কাটছেন। ক'দিনের মধ্যে একগাল দাড়িতে উত্তমদার মুখখানাও অন্যরকম হয়ে গেল। ঠিক যেন অবধূতের বইয়ের থিরুমল।

ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল থিরুমল অর্থাৎ উত্তমকুমার তখন উন্মাদ। পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ। সেই অবস্থায় সে আচমকা ঘুমন্ত কুন্তীর, অর্থাৎ আমার গলাটা টিপে ধরবে।

দৃশ্যটা বিকাশদা পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দিলেন আমাদের দুজনকে। একসময় শুটিংও শুরু হল। উত্তমদা তখন ধ্যানস্থ। বোঝা যাচ্ছিল অনেক আগে থেকেই উত্তমদা পাগলের মুড নিয়ে প্রস্তুত। কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। আমিও ওদিকে ঘুমোবার নাম করে চোখ বুঝে পড়ে আছি।

হঠাৎ মনে হল সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ জুড়ে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। যে কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলব।

চোখ খুলে দেখি উত্তমদার দুটো হাত আমার গলার ওপর সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে। কিছুতেই তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারছি না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত গলগল করে বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তার পর আর কিছু মনে নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম, বিকাশদা প্রচণ্ড ধমকাচ্ছেন উত্তমদাকে। বলছেন : তুই কি সত্যি সত্যি মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাইছিলি উত্তম! এর নাম ন্যাচারাল অ্যাকটিং! ছি ছি ছি!

এত ছি-ছিক্কারের পরও উত্তমদার কোনও ভাবান্তর নেই। ও যেন তখনও একটা ঘোরের মধ্যে আছে। কেমন শূন্য দৃষ্টিতে বিকাশদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

তারপর যখন এই ঘোরটা কাটল তখন নিজের কৃতকর্মের জন্যে সে কী লজ্জা। সে কী উৎকণ্ঠা! বললে : সাবু কেমন আছে? ওর কিছু হয়নি তো?

তারপর আমার হাত দুটো ধরে বললেন : প্লিজ সাবু, আমাকে ক্ষমা করে দে। বিশ্বাস কর, আমি সজ্ঞানে কিছু করিনি। তোকে আমি কখনও নিজের হাতে মারতে পারি!

এই হল উত্তমদা। আর এই হল চরিত্রের প্রতি তার ইনভলভমেন্ট। একটা মানুষ তো আর এমনি এমনি বড় অভিনেতা হয় না।

উত্তমদার এই ঘটনাটা আমাকে দারুণভাবে ইন্সপায়ার করেছিল। পরবর্তী একটা দৃশ্যগ্রহণের সময় আমিও এইভাবে ইনভলভড হয়ে পড়েছিলাম।

আমি বললাম : সেটা কী রকম।

সাবিত্রী বললে : ওই 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ছবিতে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে থিরুমল ক্রমশ চোরাবালির অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে কুন্তীর চোখের সামনে। তিল তিল করে। কুন্তী অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। কিছু করার উপায় নেই তার। আর সেই কিছু না করতে পারার দুঃখে সে উন্মাদের মতো থিরুমলের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠছে।

দৃশ্যটা বিকাশদা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন : সাবিত্রী, তোর ভালোবাসার মানুষ তোর চোখের সামনে ডুবে যাচ্ছে। দেখে তুই কী করবি? নিশ্চয় বাঁচাবার চেষ্টা করবি? কিন্তু সেই সুযোগ যদি না থাকে? তাহলে আর কিছু করতে না পেরে উন্মাদের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তুই তার নাম ধরে ডাকবি। অতএব সেই কথাটা মনে রেখে, তোর গলায় যত শক্তি আছে, তাই দিয়ে তুই থিরুমলকে ডাকবি। তার জন্যে, তোর গলা ফেটে যাক, চিরে যাক, রক্তপাত হোক, গলা নষ্ট হয়ে যাক, তবু তুই চিৎকার করে ওকে ডাকবি। প্রয়োজন হলে এখানে, না হলে কলকাতা গিয়ে স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার দিয়ে তোর গলার চিকিৎসা করাব। সে দায়িত্ব আমার। কিন্তু তার আগে আমি তোর কাছ থেকে ওই ন্যাচারাল অ্যাকটিংটা চাই।

বিকাশদার মুখে ওই ধরনের উত্তেজনাময় কথাগুলি শুনতে শুনতে আমার মনের ভিতর এক দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। শুটিং-এর থিরুমল আর বাস্তবের উত্তমকুমার দুজনেই একাকার হয়ে গেল। মনের মধ্যে ভেসে উঠল উত্তমদার সঙ্গে অনেকদিনের নানা সুখ দুঃখের স্মৃতি। যেন সত্যিই আমার একান্ত ভালোবাসার মানুষ আজ চোরাবালির গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরা চলতে শুরু করেছে কি না জানি না, সাউন্ড টেক করা হচ্ছে কিনা জানি না, আমি পাগলের মতো শরীরের ভেতরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে

থিরুমলের নাম ধরে চিৎকার করে উঠলাম। আর তারপরই অবশ হয়ে লুটিয়ে পড়লাম বালির ওপরে।

দু'চার মিনিটের মধ্যেই আমার ওই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বিকাশদা চিৎকার করে উঠলেন: ওয়েল ডান সাবিত্রী। আমি যা চেয়েছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি পেয়ে গেছি।

সাবিত্রী বললে : সেদিন কেমন ভাবে চিৎকার করে উঠেছিলাম সেটা বুঝতে পারিনি। পরে ছবি রিলিজ করলে হলের মধ্যে বসে আমার নিজের চিৎকারে আমি নিজেই চমকে উঠেছিলাম রবিদা। বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল।

আমি বললাম : উত্তমকুমার সম্পর্কে তো বললে। এবারে তোমার অন্য নায়কদের সম্বন্ধে কিছু বলো।

সাবিত্রী বললে : সেদিক থেকে আমি খুব ভাগ্যবতী। আমার সময়কার এমন কোনও নায়ক নেই যার সঙ্গে আমি অভিনয় করিনি। তাঁদের প্রত্যেকেই কম বেশি ট্যালেন্টেড। প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করে আমি আনন্দ পেয়েছি। তবে ওদের মধ্যে সৌমিত্রর কথা আলাদা করে বলতে হয়। সৌমিত্রর সঙ্গে আমি প্রথম অভিনয় করি মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি' ছবিতে। তখনই বুঝেছিলাম ও একজন বড় মাপের অভিনেতা। পরে ওর সঙ্গে স্টেজেও করেছি। তখন দেখেছি, ও আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও অনেকদূর এগোবে ও। আর একজন হলেন বসন্ত চৌধুরি। অভিনেতা হিসেবে যত বড়, মানুষ হিসেবেও তত বড়। কী প্রচণ্ড অভিজাত্য। ওঁর সম্পর্কে আমার একটা আলাদা শ্রদ্ধা আছে।

সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে নিয়ে এই প্রতিবেদন এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। 'স্মৃতির সরণি' পর্যায়ে এত বড় লেখা আর কাউকে নিয়ে লিখিনি। পাঠক-পাঠিকারা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লেখাটি পড়েছেন। তার জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তা সত্ত্বেও সাবিত্রীর জীবনের অনেক ঘটনাই অকথিত রয়ে গেল। পরে কোন এক সময়ে সেগুলি প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু একটি কথা প্রকাশ না করে আমি শান্তি পাচ্ছি না।

সাবিত্রীর সঙ্গে ক'দিন কথাবার্তা বলতে বলতে বুঝতে পারছিলাম, ও বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। সর্বেন্দ্রর মতো একজন অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যুতে ও বড় একা হয়ে পড়েছে। তাই সেদিন ও যখন হাহাকারের সুরে বলে উঠল : আমি এখন আর নিজেকে নিয়ে ভাবি না রবিদা। ভাবি আমার এই এত বড় বাড়ি আর সম্পত্তি নিয়ে। আমার অবর্তমানে এগুলির কী হবে!

সত্যিই সাবিত্রীর এই সমস্যাটা চিন্তা করার মতো। আমি বলেছি : সাবিত্রী, তুমি বরং একটা বিয়ে করে ফেল। তোমার একটা নিজস্ব ঘর দরকার।

আমার কথা শুনে সাবিত্রী চুপ করে রইল। এই মৌনতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয় তাহলে আমার মতো খুশি কেউ হবে না। অনেকদিন ধরে ঘরে-বাইরে অনেক সংগ্রাম করতে করতে সাবিত্রী আজ ক্লান্ত। ওর জীবনে একটু শান্তির বড় দরকার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সাবিত্রী যেন সেই শান্তির সন্ধান পায়।

সংক্ষিপ্ত শিল্পী পরিচিতি

অহীন্দ্র চৌধুরি (১৮৯৫—১৯৭৪)

কলকাতায় জন্ম। পিতা চন্দ্রভূষণ চৌধুরি। পড়াশুনা করছেন, সখের নাটক করেছেন। ভবানীপুর বান্ধবসমাজের হয়ে যাত্রাও করেন। তিনকড়ি চক্রবর্তীর সহায়তায় আর্ট থিয়েটারে যোগ দেন। ১৯২১ সালে 'ফটো প্লে সিন্ডিকেট' প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেন। ওই প্রতিষ্ঠানের 'সোল অফ আ স্লেভ' তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি। একাধিক ছবিতে তিনি নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। পেশাদারী মঞ্চে 'কর্ণার্জুন'-এ প্রথম অভিনয়। তারপর অসংখ্য নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল', 'মিশরকুমারী', 'চরিত্রহীন', 'তটিনীর বিচার', 'কঙ্কাবতীর ঘাট' উল্লেখ্য। তিনি কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান-এ নাম ভূমিকায় অভিনয় করে। 'সাজাহান' চরিত্রটিকে একটি নতুন পরিধি দেন তিনি।

অহীন্দ্র চৌধুরি প্রথম শিল্পী যিনি স্বেচ্ছায় অবসর নেন অভিনয় জগৎ থেকে। শেষ মঞ্চাভিনয় ১৯৫৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। সর্বশেষ অভিনীত নাটক 'সাজাহান'। ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডি. লিট দেন। কেন্দ্রীয় সংগীত নাটক আকাডেমিও তাঁকে পুরস্কৃত করেন। নাটক নিয়ে অধ্যাপনাও করেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : জীবনসঙ্গিনী, বন্দী, মানে না মানা, সোনার সংসার, স্যার শঙ্করনাথ ইত্যাদি।

অনিল চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০—১৯৯৬)

পিতা নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে কলেজ জীবন কাটিয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্সে। পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে ছবির জগতে যুক্ত হয়ে পড়েন। একাধিক ছবিতে সহকারী পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছেন। সেসময়ে একাধিক ছবিতে ছোটখাট চরিত্রে অভিনয় করেন। চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা হিসেবে প্রথম ছবি নরেশ মিত্র পরিচালিত 'উল্কা'। প্রথম অভিনীত ছবি আজ প্রোডাকশনের 'যোগবিয়োগ'। পরবর্তী সময়ে বহু বাংলা ছবির নায়ক হয়েছেন খ্যাতির সঙ্গে। চরিত্রাভিনেতা হিসেবেও তিনি সমান সমান। একধিক পুরস্কার পেয়েছেন। বেতার নাটকেও অংশ নিয়েছেন। অভিনয় করেছেন একাধিক হিন্দি ছবিতেও। ব্যক্তিগত জীবনে পরবর্তী সময়ে সমাজসেবা করেছেন। কলকাতার 'চৌরঙ্গী' কেন্দ্রে নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হন। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত একাধিক ছবির সঙ্গে শিল্পী হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মহানগর, অগ্নিসংস্কার, মেঘে ঢাকা তারা, নির্জন সৈকতে, আগুন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেন।

অজিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩০—)

জন্ম কলকাতাতে। পরিবারের মধ্যে সাঙ্গীতিক পরিবেশ ছিল। প্রথম জীবনে প্রাথমিক পড়াশুনার

পাট শেষ করে সংগীতসাধক পঙ্কজকুমার মল্লিকের সংস্পর্শে আসেন। রেডিওর সঙ্গেও যুক্ত হন। হরবোলার প্রতিভা তাঁর মধ্যে ছিল। পশুপাখির ডাক ডেকে আমোদ বিতরণ করেছেন পেশাদারী শর্তেও। কানন দেবীর গাওয়া 'তুফানমেল' গানটির সঙ্গে সহকারী অ্যারেঞ্জার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। প্রথম অভিনয় করেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৃহলক্ষ্মী' ছবিটিতে। পরিচিতি পান সুকুমার দাশগুপ্তের 'সাত নম্বর বাড়ি'তে অভিনয় করে। তারপর একাধিক ছবিতে মূলত কৌতুক অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করেছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায়ের সঙ্গে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি পেশাদার মঞ্চের একাধিক নাটকে খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছেন। উল্লেখ্য অভিনীত নাটক উল্কা, দূরভাষিনী, কবি, নহবৎ ইত্যাদি। পরবর্তী পর্যায়ে সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ সাড়ে চুয়াত্তর, একটুকু বাসা, সজারুর কাঁটা ইত্যাদি।

অরুন্ধতী দেবী (১৯২৪—১৯৯০)

অধুনা বাংলাদেশের বরিশালের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। গ্র্যাজুয়েশান নেওয়ার পর এম. এ. পড়েছেন। শান্তিনিকেতনে সংগীত নিয়ে পড়াশুনা করেন। গান শিখেছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে। গানের পাশাপাশি নাচের চর্চাও করেছেন নিয়ম করে। ছোট থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয় করেছেন অল্প বয়সেই। আকাশবানীর সঙ্গে শিল্পী হিসেবে যুক্ত হন। নিউ থিয়েটার্স সংস্থার বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'মহাপ্রস্থানের পথে'তে নায়িকায় ভূমিকার অভিনয়ের সুযোগ পান। প্রথম ছবিই জনপ্রিয়তা পায়। খ্যাতি পান শিল্পী নিজেও। তারপর একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। বাংলা ছবির জনপ্রিয় নায়কদের প্রত্যেকের বিপরীতেই নায়িকা হয়েছেন। প্রথম জীবনে পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ওঁরা একত্রে ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। পরে পরিচালক তপন সিংহকে বিবাহ করেন। ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, পদিপিসির বর্মী বাক্স ছবিগুলি পরিচালনা করেন। বিজয় বসু পরিচালিত 'ভগিনী নিবেদিতা' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ মহাপ্রস্থানের পথে, ছেলে কার, নদ ও নদী, জতুগৃহ, বিচারক, ভগিনী নিবেদিতা, চলাচল, পঞ্চতপা ইত্যাদি।

অনুপকুমার (১৯৩০)

জন্মেছেন কলকাতায়। পিতা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ দাস। সেই কারণে পরিবারের পটভূমিতে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। বালক বয়সেই তাই ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি) পরিচালিত 'হালবাংলা' ছবিতে শিশুশিল্পীর ভূমিকা অভিনয় করেন। সেটিই প্রথম ছবি। মুক্তি পায় ১৯৩৮ সালে। বড় হয়ে প্রথম অভিনয় করেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'সংগ্রাম' ছবিটিতে। তারপর একাধিক ছবিতে চরিত্রাভিনেতা, নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। করছেন। পাশাপাশি পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটক শ্যামলী, ঘর, স্বীকৃতি, অঘটন, চন্দনপুরের চোর ইত্যাদি। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশান-এর পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। অভিনেত্রী অলকা গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ পলাতক, জীবন কাহিনী, নতুন জীবন, উত্তরপুরুষ, আলোর পিপাসা, অগ্নিপরীক্ষা, বিরাজ বউ, কলঙ্কিত নায়ক, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ইত্যাদি।

অনুভা গুপ্তা (১৯৩০—১৯৭২)

জন্মেছিলেন দিনাজপুরে। পিতা রমেশচন্দ্র গুপ্ত। ছোট থেকেই খেলাধুলো, গান-বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হলেও বিভিন্ন স্কুল এবং শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছেন। আসল নাম মৃদুলা। মেগাফোন কোম্পানিতে যুক্ত হন গায়িকা হিসেবে। সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ জাগায়।

ডিল্যুক্স পিকচার্সের 'সমর্পণ' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। যদিও প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'বিশ বছর আগে'। পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'শ্রীশ্রীমা' ছবিতে 'সারদামণি'র ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচণ্ড জনখ্যাতি পান। নায়িকার চরিত্রের পাশাপাশি চরিত্রাভিনয়ও করেছেন একাধিক ছবিতে। ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধি, সম্রাট অশোক ছবিগুলিতে। মঞ্চাভিনয়েও পারদর্শিনী ছিলেন। প্রথমে বিবাহ করেন বিশিষ্ট খেলোয়াড় অনিল দে-কে। পরে অভিনেতা রবি ঘোষের সহধর্মিনী হন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : রত্নদীপ, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, চাঁপাডাঙার বউ, কবি, শেষ পর্যন্ত, কাঞ্চনজংঘা ইত্যাদি।

অসিতবরণ (১৯১৬—১৯৮৪)

জন্ম কলকাতায়। ম্যাট্রিকুলেশান পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর চাকরি করেন। স্থানীয় ক্লাবের সদস্য হয়ে তবলা বাজানো শেখেন। বেতারে তবলাবাদকের চাকরি নেন। আসরেও বাজাতেন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে তবলা বাজাতে গিয়ে পরিচয় হয় বিশিষ্ট শিল্পী পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে। সেই সূত্রেই নিউ থিয়েটার্সের 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। পরিচালক হেমচন্দ্রের 'প্রতিশ্রুতি'-র সূত্রে জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি লাভ। তারপর বহু ছবিতে নায়ক হয়েছেন। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। মঞ্চে উল্লেখ্য অভিনয় পরিণীতা, কথা কও, সেতু, ডাঃ শুভঙ্কর ইত্যাদি নাটকে। একাধিক ছবিতে স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : কাশীনাথ, প্রত্যাবর্তন, কার পাপে, বন্ধু, মেঘমুক্তি, পলাতক, চলাচল, এন্টনী ফিরিঙ্গী, স্মৃতিটুকু থাক ইত্যাদি।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৪—১৯৬২)

জন্মাষ্টমীর দিন জন্মেছিলেন বলে বাবা শিবচন্দ্র নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। বউবাজার স্কুলে পড়তে পড়তে গ্লুকোমা রোগের প্রভাবে অন্ধ হয়ে যান। কণ্ঠ ভালো ছিল, গানের প্রতি আগ্রহ ছিল বলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়েই আত্মমগ্ন হয়ে যান। টপ্পা, ধ্রুপদ, ধামার শিক্ষা করেন। শশীভূষণ দে, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন তাঁর সংগীতগুরু। কলকাতার বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এইচ. এম. ভি বা গ্রামোফোন কোম্পানির হয়ে গানের রেকর্ড করেন মাত্র আঠার বছর বয়সে। সংগীত সাধনার পাশাপাশি কৃষ্ণচন্দ্র দে অভিনয়ও করেছেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'ভিক্ষুক' চরিত্রটি স্মরণীয়। ও চরিত্রের ঠোঁটে ছিল—'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে' র মত স্মরণীয় গান। নাটকের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণেই হাতিবাগানের 'রঙমহল' মঞ্চটি তৈরি করান। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন অন্যতম স্বত্বাধিকারী। ছবির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। গায়ক অভিনেতা হিসেবে তিনি একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। প্রথম ছবি নিউ থিয়েটার্স নিবেদিত দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'চণ্ডীদাস'। বাংলা ছাড়াও হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন কৃষ্ণচন্দ্রবাবু। বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছেন। ছবির নাম 'পূরবী'। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যশস্বী শিল্পী মান্না দে।

কানন দেবী (১৯১৬—১৯৯২)

জন্মেছিলেন কলকাতাতেই। পিতা রতনচন্দ্র দাস। পিতার মৃত্যুর পর তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় ম্যাডান কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। তখন বয়স দশ। ১৯২৬ সালে ম্যাডান কোম্পানির নির্বাক ছবি 'জয়দেব'-এ 'শ্রীরাধা'র ভূমিকায় প্রথম অভিনয়। অভিনীত প্রথম সবাক ছবি জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জোর বরাত'। এরপর প্রহ্লাদ, কণ্ঠহার, বাসবদত্তা ইত্যাদি অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন। জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ছবিতে 'নীহারিকা' চরিত্রে অভিনয় করে।

অভিনয়ের পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতিও আকৃষ্ট হন। উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখেন। ছবিতে গান গেয়েছেন বহুবার। প্রথম রেকর্ড ডিস্ক প্রকাশিত হয় মেগাফোন কোম্পানি থেকে। পরবর্তী সময়ে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাধিক দ্বি-ভাষিক ছবিতেও অভিনয় করেন। প্রমথেশ বড়ুয়া এবং কুন্দনলাল সায়গলের সঙ্গে কানন দেবীর জুটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। 'শ্রীমতী পিকচার্স' নামে নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তোলেন। 'অনন্যা', 'নববিধান', 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' ইত্যাদি ছবিগুলি প্রযোজনা করেন। একাধিক ছোট বড় পুরস্কারে ভূষিতা কানন দেবী ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' এবং 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর স্বামী বিশিষ্ট পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মানময়ী গার্লস স্কুল, মুক্তি, শেষ উত্তর, মেজদিদি ইত্যাদি।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫—)

জন্ম রাজস্থানে। পিতা শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট থেকেই গান বাজনা অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন। চাকরি করেছেন বেশ কিছুদিন। শখের দলে নাটক করেছেন নিয়মিত। যোগাযোগ ঘটে বিশিষ্ট অভিনেতা অর্ধেন্দু মুস্তাফির পুত্র ভুবনেশ মুস্তাফির সঙ্গে। তাঁর নাটকের দলে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন। যোগাযোগ ঘটে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে। তাঁর নির্দেশনায় একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকারীর কাজ করেছেন কিছুদিন। ওই পরিচালকের 'শশীনাথ' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। তারপর বাংলা ছবিতে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে স্থায়ী আসন করে নেন। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে অভিনয় করে জনসমাদর পান পরবর্তী সময়ে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'তে নামভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, চাঁপাডাঙার বউ, সাহেব বিবি গোলাম, পণ্ডিতমশাই, পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আলো আমার আলো ইত্যাদি।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২১—১৯৯৪)

কলকাতায় জন্ম। পিতা মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রিপন কলেজে পড়তে পড়তেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ইংরেজ আমলের সেনাবাহিনীতে কাজ করতে করতেই দোভাষীর চাকরি করেন। ফাঁকে ফাঁকে শখের নাটকে অভিনয় করতেন। পাড়ার পরিচিত 'পাঁচুবাবু'র সূত্রে হিরন্ময় সেনের 'বার্মার পথে' ছবিতে সুযোগ পেয়ে যান। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৭ সালে। তারপর কাজ করলেন 'তথাপি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ইত্যাদি ছবিতে। খ্যাতি পান সত্যেন বসুর 'বরযাত্রী'তে 'গণশা' চরিত্রে অভিনয় করে। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি নাটকেও অভিনয় করেছেন বরাবর। গণনাট্য সংঘের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এক সময়ে। স্মরণীয় অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়ের পরশ পাথর, তপন সিংহের আরোহী, হাঁসুলি-বাঁকের ইতিকথা, লৌহকপাট, ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক, অগ্রদূতের বাদশা, সবার উপরে, অগ্রগামীর ডাকহরকরা, মঙ্গল চক্রবর্তীর সোনার হরিণ ইত্যাদি ছবিতে। শেষদিকে অঞ্জন চৌধুরির গুরুদক্ষিণা, কালীবাবুকে নতুন করে জনপ্রিয় করে দেয়। একাধিক মঞ্চসফল নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল ছ শতবর্ষ আগে', 'ক্ষুধা', 'পরস্ত্রী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'সমাধান' ইত্যাদি। ছবি প্রযোজনাও করেছেন। প্রযোজিত ছবি 'সুরের আগুন'। তিনি ছিলেন বাংলা ছবির খ্যাতিমান চরিত্রাভিনেতা।

উল্লেখযোগ্য ছবি : বরযাত্রী, পরশ পাথর, নীল আকাশের নিচে, বাদশা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, লৌহকপাট, গুরুদক্ষিণা ইত্যাদি।

গঙ্গাপদ বসু (১৯১০—১৯৭১)

যশোহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। পিতা নকুলচন্দ্র বসু। কলকাতায় চলে এসে বি. এ. পাশ করেন। মাত্র ন বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন। সেটা ছিল শখের অভিনয়। অভিনয় সহ সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ছোট থেকেই। ছাত্রজীবনে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। পেশা হিসেবে

সাংবাদিকতাকে বেছে নেন। সত্যযুগ, কৃষক, দৈনিক বসুমতী-র সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি পান। পরবর্তী সময়ে 'নাট্যচক্র' প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত হন। শম্ভু মিত্রের নাট্যগোষ্ঠী 'বহুরূপী'র সদস্য ছিলেন। অন্য ধরনের নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও পাশাপাশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। প্রথমে মনোজ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'তথাপি' ছবিটিতে অভিনয়ের সুযোগ পান। খ্যাতিলাভ করেন নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল-এ অভিনয় করে। তারপর একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। শেষ মঞ্চাভিনয় 'রাজা অয়াদিপাউস' নাটকে। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : ছিন্নমূল, পথিক, জলসাঘর, এখানে পিঞ্জর, দাদাঠাকুর ইত্যাদি।

গীতা দে (১৯৩১)

জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম অজিতকুমার ঘোষ। ছোটবেলা থেকে পরিস্থিতির চাপে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। এক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী রাধারানী দেবী। তিনিই গান শিখিয়েছিলেন। রাধারানী দেবীর সহায়তায় নাট্যনিকেতন-এ অভিনয় শুরু করেন। তারপর নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী নরেশ মিত্র প্রমুখের সংস্পর্শে এসে অভিনয় চর্চা করেন নিয়ম করে। শিশির ভাদুড়ী নির্দেশিত নাটক 'তখৎ-এ-তৌস' পরিচিতি এনে দেয়। শিশিরবাবুকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করতেন। একাধিক মঞ্চে বহু নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। প্রেমাংশু বসুর নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। একাধিক নাটকে অভিনয় করেন ওই দলের হয়ে। উল্লেখ্য নূরজাহান, শেষের কবিতা, অরূপরতন। বালিকা অভিনেত্রী হিসেবে প্রথম অভিনয় ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আহুতি' ছবিতে। বড় হয়ে প্রথম অভিনয় নীরেন লাহিড়ির 'দম্পতি'তে। তারপর বহু ছবি। মূলত বাংলা ছবিতে চরিত্রাভিনয় করেই খ্যাতি পেয়েছেন। বর্তমানেও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : ডাইনি, মুখুজ্যে পরিবার, সাথীহারা, সূর্যসাক্ষী, মহাশ্বেতা, শিল্পী, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার ইত্যাদি।

ছবি বিশ্বাস (১৯০০—১৯৬২)

বিডন স্ট্রিটের বনেদি পরিবারে জন্মেছিলেন। পিতা ভূপতিনাথ বিশ্বাস। ভূপতিবাবু ছেলের নাম রেখেছিলেন শচীন্দ্রনাথ। ডাক নাম ছবি। হিন্দু স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ, পরে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়েছেন। বাড়িতে অভিনয়, গানবাজনার পরিবেশ ছিল। তাই যৌবনে যুক্ত হন 'হাওড়া নাট্যসমাজ', 'কাঁকুড়গাছি নাট্য সমাজ' ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে। অ্যামেচার নাটকে অভিনয় করলেও প্রথম জীবনে পেশা হিসেবে বীমা এজেন্টের কাজ বেছে নেন। পাটের দালালিও করেছেন। অভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন বলে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত প্রযোজকের সহায়তা পেয়ে যান। প্রথম অভিনয় করেন প্রিয়নাথবাবু প্রযোজিত 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে। নায়কের চরিত্র ছিল। তারপর একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। জীবনসঙ্গিনী, সমাধান, বন্দী, দুই পুরুষ, শুভদা উল্লেখ্য ছবি। আরও পরে সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজংঘা, জলসাঘর, দেবী, তপন সিংহের কাবুলীওয়ালা, সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'দাদাঠাকুর'-এ অভিনয় করে কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন। মঞ্চেও তিনি সমান সফল। 'নিমাই সন্ন্যাস' দিয়ে শুরু করবার পর 'সমাজ', ধাত্রীপান্না', 'চরিত্রহীন', 'বিজয়া', 'ঝিন্দের বন্দী' ইত্যাদি নাটকের জন্যে ছবি বিশ্বাস স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 'দাদাঠাকুর'-এ তিনি যখন নামভূমিকায় অভিনয় করেন তখন 'দাদাঠাকুর' শরৎপণ্ডিত জীবিত ছিলেন। এটি একটি নজির। ছবি বিশ্বাস 'যার যেথা ঘর', 'প্রতিকার' ছবি দুটি পরিচালনাও করেছেন। সংগীত নাটক একাদেমি পুরস্কার বিজয়ী ছবি বিশ্বাস আরও একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মটর দুর্ঘটনায় আকস্মিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

উল্লেখযোগ্য ছবি : বন্দী, জীবনসঙ্গিনী, দুই পুরুষ, কাঞ্চনজংঘা, জলসাঘর, কাবুলীওয়ালা, দাদাঠাকুর ইত্যাদি।

তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩১)

জন্ম কলকাতাতে। পিতা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়। বাবা কাকাদের নিজস্ব নাটকের ক্লাব 'সুহৃদ সমাজ'-এ সখের অভিনয় করেই অভিনয়ের পথে যাত্রা শুরু করেন পড়াশুনার ফাঁকে। তারপর নাটকের নানান দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পরবর্তী সময়ে। যেমন 'ভারতীয় শিল্পী সংঘ', 'বৈশাখী' ইত্যাদি। 'অ্যামেচার আর্টিস্ট' দলে অভিনয় করতে করতে পরিচালক অর্ধেন্দু সেনের 'হ্রদ' ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান। ১৯৫৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হ্রদ' তরুণকুমার অভিনীত প্রথম ছবি, যার নায়ক ছিলেন উত্তমকুমার। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দ্বি-শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছোট ও নানা চরিত্রে তাঁকে দেখা গেছে। নিজের মতে খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন 'হাত বাড়ালেই বন্ধু', 'অবাক পৃথিবী', 'ন্যায়দণ্ড', 'কাল তুমি আলেয়া', 'দাদাঠাকুর' ইত্যাদি ছবিগুলিতে। পেশাদার মঞ্চে একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। 'আরোগ্য নিকেতন', 'ক্ষুধা', 'সেতু', 'চৌরঙ্গী', 'আসামী হাজির', 'নহবৎ', 'ঘটক বিদায়' উল্লেখ্য। অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধায়ের সঙ্গে মিলিত ভাবে কল্পতরু গোষ্ঠী তৈরি করেন। ওই গোষ্ঠীর নিজস্ব মঞ্চ 'মহানায়ক উত্তমমঞ্চ' যার মালিক তরুণকুমার এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে 'অশ্লীল' নাটকটির নির্দেশক ছিলেন। এক সময়ে মানু সেনের সঙ্গে সহকারী পরিচালকেরও কাজ করেছেন। বিয়ে করেন অভিনেত্রী সুব্রতাকে। বর্তমানে তরুণকুমার ছবি, নাটক, যাত্রা, টি ভি সিরিয়ালের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ অবাক পৃথিবী, দাদাঠাকুর, হাত বাড়ালেই বন্ধু, ন্যায়দণ্ড, চৌরঙ্গী, কাল তুমি আলেয়া ইত্যাদি।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩—১৯৪৩)

কালিকাপুরের জমিদার বংশে জন্ম। পিতা তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পোশাকি নাম দুর্গাচরণ। লেখাপড়ায় মন ছিল না তেমন। অল্পবয়সেই গ্রামের শখের নাটকের দলে যোগ দেন। তারপর ভর্তি হন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। সেই সূত্রে 'ম্যাডান' কোম্পানির টাইটেল রাইটারের কাজ পান। মঞ্চের দৃশ্যপটও আঁকতেন। দুর্গাদাসের সুপুরুষ চেহারা দেখে নরেশচন্দ্র মিত্র ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেন। ছবির নাম 'মানবপুত্র'। মুক্তি পায় ১৯২৩ সালে। নির্বাক ছবি। তারপর একাধিক নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন। প্রথম সবাক ছবি 'দেনা পাওনা'। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস' সহ 'মীরাবাঈ', 'দেশের মাটি', 'দিদি' 'মহুয়া' ইত্যাদিতে অভিনয় করেন। শেষ ছবি প্রিয়বান্ধবী। মঞ্চেও দুর্গাদাস অভিনীত 'কর্ণার্জুন' 'মাটির ঘর' 'চন্দ্রগুপ্ত' উল্লেখযোগ্য নাটক। পেশাদার মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক 'কর্ণার্জুন'। সর্বশেষ অভিনীত নাটক 'কাঁটা ও কমল'। সে যুগের বিচারে দুর্গাদাস ছিলেন জনপ্রিয়তম তারকা শিল্পী।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ চণ্ডীদাস, দিদি, পরশমণি, অবতার, প্রিয়বান্ধবী।

নবদ্বীপ হালদার (১৯১১—)

বর্ধমান জেলার অখ্যাত গ্রামে জন্ম। শখের নাটকের দলে অভিনয় করতেন ছেলেবেলা থেকেই। কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে চাকরি করেন কিছুদিন। দেবকীকুমার বসুর 'পঞ্চশর' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। তারপর বাংলা ছবিতে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন মূলত কৌতুকশিল্পী হিসেবে। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। বিশেষ ধরনের কণ্ঠস্বরের জন্যে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ছবির পাশাপাশি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নকশা বা হাস্যকৌতুক পরিবেশন করতেন। হাসির গানও গেয়েছেন। তার মধ্যে 'শরীরটা আজ বেজায় খারাপ', 'প্যাস্তফ্যাচাং তরকারি' জনপ্রিয়তা অর্জন করে ব্যাপকভাবে।

উল্লেখ্যযোগ্য ছবি ঃ মানিকজোড়, কালোছায়া, সাড়ে চুয়াত্তর, পাত্রী চাই, হানাবাড়ি, শহর থেকে দূরে ইত্যাদি।

নির্মলকুমার (১৯২৮)

কলকাতায় জন্ম। বি কম পাশ করেন। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন প্রথম তারুণ্যে। বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সাহিত্যচর্চা করেছেন অভিনয়ের পাশাপাশি। আবৃত্তি করার ক্ষেত্রে সহজাত প্রতিভা ছিল বরাবরই। পরিচালক মধু বসুর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে শিল্পী হিসেবে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম ছবিতেই খ্যাতি পান। তারপর বহু বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। পেশাদার মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য মঞ্চাভিনয় না, প্রজাপতি, শ্রীকান্ত। অসংখ্য বেতার নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ শেষের কবিতা, আগুন, চলাচল, ক্ষণিকের অতিথি, কমললতা, লালপাথর, আপনজন ইত্যাদি।

পঙ্কজকুমার মল্লিক (১৯০৫—১৯৭৮)

কলকাতায় জন্ম। বাবা মণিমোহন মল্লিক। বাড়িতে ধর্মচর্চা পুজোপাঠ চলতো নিয়ম করে। তাই ধর্ম সঙ্গীতের প্রভাব ছিল ছোটবেলায়। পরে সঙ্গীতের প্রতি উৎসাহ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। বিখ্যাত সংগীত সাধকদের সংস্পর্শে আসেন। মার্গসঙ্গীতের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হয়ে ওঠেন পরবর্তী সময়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসারের ক্ষেত্রে পঙ্কজবাবুর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মূলত সংগীত পরিচালক এবং সুগায়ক পঙ্কজ মল্লিক ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাধিক ছবিতে সংগীত পরিচালনাও করেছেন। প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া পরিচালিত বহু আলোচিত ছবি 'মুক্তি' হল পঙ্কজ মল্লিক অভিনীত প্রথম ছবি। এ ছবিতে স্বকণ্ঠে গানও পেয়েছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ছবিতে তিনি নায়ক হন। সুগায়ক সংগীত পরিচালক এবং অভিনেতা পঙ্কজকুমার অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 'সংগীত শিক্ষার আসরে'র মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। মহালয়ার দিনের 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি আজও পঙ্কজবাবুর করা গানের সুরের জন্যে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ মুক্তি, ডাক্তার, দেশের মাটি, আলোছায়া ইত্যাদি।

পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৭—১৯৭৪)

প্রকৃত নাম নগেন্দ্রনাথ। জন্মেছিলেন দার্জিলিঙে। তাই নাম পাহাড়ী। ছাত্রজীবনে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়েছিলেন। তারপর ভর্তি হন লখনউয়ের ম্যরিস কলেজে। সেখানে গান শেখেন নিয়ম করে। মূলত হিন্দুস্থানী সংগীত। তখনকার যুক্তপ্রদেশের দেশীয় রাজার ব্যক্তিগত সচিবের চাকরি করেন কিছুদিন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার। নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতলে তৈরি প্রমথেশচন্দ্র পরিচালিত 'রূপলেখা'য় অভিনয় করার সুযোগ পান প্রথম। যদিও সে ছবিতে কাজ করা সম্ভব হয় নি। প্রথম অভিনয় করেন দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'মীরাবাঈ' ছবিতে। প্রথম ছবিতেই খ্যাতি পাওয়ার পর নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবিতে অভিনয় করেন। তার মধ্যে 'বিদ্যাপতি', 'ভাগ্যচক্র' ইত্যাদি আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ছবিতেও কাজ করেছেন। ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন। কণ্ঠদান বলতে গান গেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ছবির এক অপরিহার্য চরিত্রাভিনেতা। 'বিদ্যাসাগর', 'গিরীশচন্দ্র', 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' ছবিগুলিতে তিনি নামভূমিকায় অভিনয় করেন। একাধিকবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এর পুরস্কার পেয়েছেন। পেশাদারী মঞ্চেও একবার অভিনয় করেছেন। বিশ্বরূপা মঞ্চে পাহাড়ী সান্যাল 'আসামী হাজির' নাটকে অভিনয় করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ বিদ্যাপতি, শুভদা, বড়দিদি, সাহেব বিবি গোলাম, জীবনতৃষ্ণা, বিদ্যাসাগর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, দীপ জ্বেলে যাই ইত্যাদি।

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯০৩—১৯৫১)

আসামের গৌরীপুরের রাজপরিবারে জন্ম। পিতা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস. সি পাশ করেন। শিকার, খেলাধুলো এবং ছবি তোলার প্রতি আগ্রহ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'স্বরাজ পার্টি'র সদস্য ছিলেন। সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল পারিবারিক সূত্রে। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহের জন্যে ছবির কাজ শিখতে একাধিকবার বিদেশে গেছেন। প্রথম অভিনয় করেন 'পঞ্চশর' ছবিতে। পরিচালক ছিলেন দেবকীকুমার বসু। প্রথমে বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস তারপর নিউ থিয়েটার্স সহ একাধিক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন পরিচালক অভিনেতা হিসেবে। নিজেও 'বড়ুয়া ফিল্মস' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। হিন্দি বাংলা মিলিয়ে অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। কানন দেবীর সঙ্গে তাঁর জুটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একাধিক ছবি পরিচালনা করেছেন। মুক্তি, দেবদাস, শেষ উত্তর তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মুক্তি, দেবদাস, শাপমুক্তি, শেষ উত্তর, গৃহদাহ, রজত জয়ন্তী ইত্যাদি।

বিমল দেব (১৯২৯—)

জন্ম কলকাতায়। পিতা চন্দ্রবিনোদ দেব। পড়াশুনার পাশাপাশি অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল। ঠিক পেশা হিসেবে না নিলেও একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। একাধিক গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অসিত বসুর নাটকের দলে অভিনয় করে পরিচিতি পান। খ্যাতি এসেছে শ্যামল সেনের 'চলাচল' গোষ্ঠীর 'যদুবংশ' নাটকে অভিনয়ের পর। নাটকের পাশাপাশি একাধিক ছবিতেও অভিনয় করেছেন। পূর্ণেন্দু পত্রী-র 'স্ত্রীর পত্র' ছবিতে প্রথম উল্লেখ্য চরিত্র করেন। তারপর স্বল্প অবকাশে একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। কৌতুকশিল্পীর ভূমিকাও পালন করেছেন কয়েকটি ছবিতে।

উল্লেখযোগ্য ছবি : স্ত্রীর পত্র, জনঅরণ্য, শেষরক্ষা, দৌড় ইত্যাদি।

মণি শ্রীমানী (১৯১০—১৯৭৮)

উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট শ্রীমানী পরিবারে জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সহায়তায় অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। নাট্যাচার্যের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্টার থিয়েটারের শিল্পী হিসেবে একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। পেশাদার মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' নাটকে। শিশির ভাদুড়ী পরিচালিত 'টকি অফ টকিজ' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। তারপর বহু বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন চরিত্রাভিনেতা হিসেবে। সর্বশেষ অভিনীত ছবি তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা'। ছবিটিতে তাঁর ভূমিকা অসমাপ্ত রয়ে যায় মৃত্যুর কারণে। সেই ভাবেই মুক্তি পায় 'গণদেবতা'। কোন পুরস্কার পাননি। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশংসা করেছিলেন 'যোগাযোগ' নাটকটিতে তাঁর অভিনয় দেখে।

উল্লেখযোগ্য ছবি : মণিহার, ধন্যি মেয়ে, গণদেবতা ইত্যাদি।

মাধবী চক্রবর্তী (১৯৪৩)

জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে অল্পবয়সে পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হয়েছিল। সেই সূত্রে প্রভা দেবীর স্নেহধন্যা হয়ে ওঠেন। শিশু শিল্পী হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'দুই বেয়াই' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। প্রথম তারুণ্যে প্রথম অভিনয় তপন সিংহের টনসিল-এ। পরিচিতি আসে মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ'-এ নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে। তারপর একাধিক ছবি। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহের একাধিক বিখ্যাত ছবিতে অভিনয় করেছেন খ্যাতির সঙ্গে। বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে অভিনয় করে ভারতের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার 'উর্বশী' পান। পেশাদার মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য নাটক না, ঘটক বিদায়, বিন্দুর ছেলে ইত্যাদি। ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতা নির্মলকুমারের সহধর্মিনী। ছবি পরিচালনাও করেছেন। নাম 'আত্মজা'। একাধিক ছবি

প্রযোজনা করেছেন। উল্লেখ্য ছবি সেক্ষেত্রে 'সুবর্ণলতা'।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ চারুলতা, বাইশে শ্রাবণ, মহানগর, সুবর্ণরেখা, স্ত্রীর পত্র, শঙ্খবেলা, দিবারাত্রির কাব্য, গণদেবতা ইত্যাদি।

মিহির ভট্টাচার্য (১৯১৭—১৯৭১)

জন্মেছেন কলকাতায়। পিতার নাম দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে পড়েছিলেন। অল্প বয়স থেকে অ্যামেচার নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসেন তারপর। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আশ্রয়ী 'বিপ্রদাস' নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি পান। পরবর্তী সময়ে একাধিক পেশাদার মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটক প্রতাপাদিত্য, বিপ্রদাস, মা, জনা, কঙ্কাবতীর ঘাট, সিরাজদ্দৌলা, শ্যামলী ইত্যাদি। অভিনয়ের সূত্রে পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রথম অভিনয় করেন ওই পরিচালকের 'রাজকুমারের নির্বাসন'এ। তারপর একাধিক ছবি। খ্যাতি পান জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'কর্ণার্জুন'-এ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করে। যাত্রার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ কর্ণার্জুন, পথের দাবী, গৃহলক্ষ্মী, সাত নম্বর বাড়ি, পতিব্রতা, ভাবীকাল, অন্নপূর্ণার মন্দির, সাহেব বিবি গোলাম ইত্যাদি।

রবীন মজুমদার (১৯১৭—১৯৮৩)

হুগলী জেলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম। পিতা অমূল্য কুমার মজুমদার। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এস. সি পাশ করেন। ছেলেবেলা থেকে গান বাজনার প্রতি আকর্ষণ ছিল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন বীরেন নিয়োগীর কাছে। নিউ থিয়েটার্সের একজন কর্মচারীর সূত্রে যোগাযোগ ঘটে যায় প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে। সুযোগ পান প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'শাপমুক্তি' ছবিতে। প্রথম ছবিতেই স্বকণ্ঠে গান গাইলেন। ছবি এবং সেই গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। তারপর একাধিক ছবিতে নায়ক করেছেন। সায়গলের পর রবীন মজুমদার হয়ে ওঠেন বাংলার জনপ্রিয়তম নায়ক গায়ক। খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন দেবকীকুমার বসুর 'কবি' ছবিতে নিতাই কবিয়াল চরিত্রে রূপদান করে। ছবিতে অভিনয় এবং গান গাওয়ার পাশাপাশি রেডিওতে গান গেয়েছেন। মেগাফোন সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটক উল্কা, আসামী হাজির ইত্যাদি। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত হীরক রাজার দেশে-তে অভিনয় করেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ শাপমুক্তি, গরমিল, কবি, সমাধান, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৫—১৯৯৭)

জন্ম কলকাতায়। পিতা বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সিটি কলেজে পড়েন। সখের নাটকে অভিনয় করতে শুরু করেন অল্পবয়স থেকে। একাধিক শৌখিন নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিচালক সত্যেন বসুর 'বরযাত্রী' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৫১ সালে। প্রথম নায়কের ভূমিকা করেন সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পাশের বাড়ি'-তে। জনপ্রিয় হন ওই ছবি থেকেই। ছবির পাশাপাশি মঞ্চেও অভিনয় করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের হয়েও নাটকে অভিনয় করেছেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে খ্যাতির সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য নাটক ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সেমসাইড, স্বীকৃতি, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বেগম মেরি বিশ্বাস, আসামী হাজির, চৌরঙ্গী ইত্যাদি। নিজে একাধিক নাটক রচনা করেছেন, নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। রচিত নাটক শেষ থেকে শুরু, নহবত, পঙ্গপাল তাঁকে নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। নহবত চলার ক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করে। তাঁর নেতৃত্বে ইঙ্গিৎ এবং কল্পতরু দুটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরি হয়। ছবি ও মঞ্চের পাশাপাশি যাত্রায় অভিনয় করেছেন। আবৃত্তি এবং কৌতুক নকশা পরিবেশন করেছেন। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। কল্পতরুর উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতায় 'মহানায়ক উত্তমকুমার মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করেন। সাংস্কৃতিক

কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও করেছেন দীর্ঘদিন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : পাশের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, বউঠাকুরানীর হাট, কুহেলী, দাদার কীর্তি, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, নিষ্কৃতি, বড়ভাই ইত্যাদি।

সন্ধ্যা রায় (১৯৪৬)

জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহরে। অল্পবয়সে বাবা মাকে হারিয়ে মামার বাড়ির আশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠেন। মামার বাড়ি ছিল খুলনায়। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ হয় নি। অল্পবয়সেই চলে আসতে হয় কলকাতায়। দল বেঁধে শুটিং দেখতে গিয়ে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'মামলার ফল' ছবিতে এক্সট্রার পার্ট করেন। স্টুডিওতে সন্ধ্যাকে দেখে 'অন্তরীক্ষ' ছবিতে সুযোগ দেন পরিচালক রাজেন তরফদার। একই সঙ্গে আরও সুযোগ আসে। তার মধ্যে উল্লেখ্য সুধীরবন্ধুর 'বৃন্দাবনলীলা'। 'বৃন্দাবনলীলা'ই সন্ধ্যা রায় অভিনীত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মামলার ফল' এর পর। খ্যাতি এনে দিল রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা', সলিল সেনের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। প্রথম জনপ্রিয়তা পেলেন চিত্ত বসুর 'মায়ামৃগ'তে অভিনয় করে। তারপর একাধিক ছবিতেই সন্ধ্যা নায়িকা হয়েছেন। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, রঞ্জিত মল্লিক ইত্যাদি সকলেরই বিপরীতে নায়িকা করেছেন। পরিচালক তরুণ মজুমদারকে বিয়ে করেন। তরুণবাবুর পরিচালনায় 'সংসার সীমান্তে' 'ফুলেশ্বরী' 'নিমন্ত্রণ' 'গণদেবতা' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। হিন্দি ছবিতেও তিনি কাজ করেছেন। তার মধ্যে 'আসলি নকলি', 'রাহগীর' উল্লেখ্য। মঞ্চে এবং যাত্রায় অভিনয় করেছেন। বর্তমানে অভিনয়ের সঙ্গেই যুক্ত আছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি : গঙ্গা, সংসার সীমান্তে, মণিহার, বাবা তারকনাথ, ছোট বউ, তিন অধ্যায়, অশনি সঙ্কেত, গণদেবতা ইত্যাদি।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৭)

অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লাতে জন্ম। পিতা শশধর চট্টোপাধ্যায়। অল্পবয়সে কলকাতায় চলে আসেন। ছোটবেলা থেকেই রোজগারের প্রয়োজনে ট্যুরিং পার্টির সঙ্গে ঘুরতে হয়েছে নৃত্যশিল্পী হিসেবে। অ্যামেচার ক্লাবের হয়ে অর্থের বিনিময়ে অভিনয় করতেন। নাচ শিখেছিলেন অভিনয়ের পাশাপাশি। পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় 'পাশের বাড়ি' ছবিতে প্রথম অভিনয় করবার সুযোগ পান। নায়ক ছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ছবিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তারপর অনেক ছবিতে সুযোগ পেয়েছেন। উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নায়কের বিপরীতে নায়িকা করেছেন একাধিকবার। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও জনপ্রিয় হয়েছেন প্রথম থেকেই। উত্তমকুমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে স্টার রঙ্গমঞ্চে 'শ্যামলী'তে অভিনয় করেই খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। তারপর শ্রীকান্ত, পরিণীতা, ঘর, অমরকণ্টক, সেই রাত, পরস্ত্রী-তে অভিনয় করেছেন। একাধিকবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশান প্রদত্ত পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন মঞ্চ এবং ছবিতে।

উল্লেখযোগ্য ছবি : পাশের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, মরুতীর্থ হিংলাজ, বালুচরি, নিশিপদ্ম, মঞ্জরী অপেরা, ডাকহরকরা, কাল তুমি আলেয়া ইত্যাদি।

হরিধন মুখোপাধ্যায় (১৯০৭)

চব্বিশ পরগণার অখ্যাত গ্রামে জন্ম। পিতা ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। হরিধনবাবুর প্রকৃত নাম দীনবন্ধু। ধর্মমূলক সংগীত এবং পাঁচালী পাঠ করতেন ছোটবেলা থেকে তাই তাঁর নাম হয়ে যায় 'হরিধন'। কীর্তনের দল গড়েছিলেন একসময়ে। সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন বলে গানকে পেশা হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন। নিজের নামেই 'দীনবন্ধু সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন। গানের পাশাপাশি অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল। শখের নাটকে অভিনয় করতে করতে পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ পান। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সান্নিধ্যে এসে প্রথম অভিনয় করেন 'মায়া' নাটকে। তারপর একাধিক নাটকে। উল্লেখ্য অভিনীত নাটক মায়া, নিষ্কৃতি, যুগদেবতা, দেবদাস, সেমসাইড, আমি মন্ত্রী হব, স্বীকৃতি ইত্যাদি।

প্রথম অভিনীত ছবি শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে'। তারপর বাংলা ছবিতে মূলত কৌতুকশিল্পী হিসেবে খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা পান। একাধিক ছবিতে স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ সন্ধি, এইতো জীবন, ভাবীকাল, একটুকু বাসা, ফুলেশ্বরী, সাড়ে চুয়াত্তর, সেই চোখ ইত্যাদি।

সংকলক : রিণ্টু চট্টোপাধ্যায়